মানুষের অধিকার

চ্যাটার্জি পাব্‌লিশার্স
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

Published by B. Chatterji
for Chatterji Publishers,
15, Bankim Chatterji Street,
Calcutta-12

প্রকাশ কাল—শ্রাবণ ১৩৩৯

Printed by S. Chatterji,
Chatterji Printers,
42A, Malanga Lane,
Calcutta-12

সূচি

উপন্যাস

রথযাত্রা/৯

জনগণ/১১১

প্রতিধ্বনি/২২৫

মানুষের ভূমিকায়/৩৩৯

গল্প

ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী/৩৯১

প্রার্থী/৪০৬

যেখানে সীমান্ত নেই/৪১১

কোনো একদিন/৪৩৪

সীমান্ত/৪৪৮

পাড়ি/৪৫৪

উপন্যাস

রথযাত্রা

দূর থেকে একটা ফিল্মি গানের সুর বাতাসে ভেসে আসছে। কারা যেন 'বিলাইতি' বাদ্যযন্ত্রে একনাগাড়ে সুরটা বাজিয়ে যাচ্ছে।

উত্তর থেকে দক্ষিণে যে ন্যাশনাল হাইওয়েটা বরাবর চলে গেছে তার ওপব দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছিল নাটোয়ার বা নাটুয়া। ওই গান এবং সুরটা তার খুবই চেনা। তবে কবে কোথায় শুনেছিল, মনে নেই। পেটের দানার জন্য সারা দুনিয়া তাকে চষে বেড়াতে হয়। ঘুরতে ঘুরতে কোনো শহরে, বাজারে বা গঞ্জেটঞ্জে শুনে থাকবে।

সুরটা নিয়ে এখন ভাবার সময় নেই। অন্যমনস্কর মতো নাটোয়ার একবার শুধু পিছন ফিরে ভুরুর ওপর হাতের আড়াল দিয়ে তাকায়। প্রায় আধ মাইল তফাতে ন্যাশনাল হাইওয়ে যেখানে কাস্তের বাঁকানো ফলার মতো ডাইনে ঘুরে গেছে সেখানে আবছাভাবে কিছু লোকজন দেখা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে কয়েকটা মোটর টোটরও। সব মিলিয়ে ছোটোখাটো একটা জুলুস বা মিছিলই বলা যায়। খুব সম্ভব সুরটা ওখান থেকেই আসছে।

ফিল্মি গানের সুর বাজিয়ে কোথায় চলেছে মিছিলটা? এদিকেই আসছে কি? নিস্পৃহ চোখে খানিক তাকিয়ে থাকে নাটোয়ার। তারপর ঘুরে ফের হাঁটতে শুরু করে। নষ্ট করার মতো পর্যাপ্ত সময় তার হাতে নেই।

আপাতত নাটোয়ার চলেছে মনচনিয়া গাঁয়ে আধবুড়ো ফকিরার কাছে। তাকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে সোজা চলে যাবে নমকিপুরা টৌনে বা টাউনে বড়ে জমিমালিক রাজপুত মিলিটারি সিং-এর প্রকাণ্ড হাভেলিতে। তাঁর আসল নাম লালধারী সিং। প্রচণ্ড বদমেজাজ এবং গমগমে গলার জন্য লোকের মুখে মুখে তাঁর ওইরকম একটা জবরদস্ত নাম চালু হয়ে গেছে।

মিলিটারি সিং ডেকে পাঠাননি, তবু নাটোয়ার যে ফকিরাকে সঙ্গে করে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েছে তার উদ্দেশ্য একটাই। নাটোয়ারের ধারণা, ওখানে গেলে হয়তো কামাইয়ের কিছু বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু দুপুরের আগে আগে নমকিপুরায় পৌঁছুনোটা খুবই জরুরি। কেননা তারপর আর কাউকে 'দর্শন' দেন না মিলিটারি সিং। দুপরে উৎকৃষ্ট ভরপেট ভোজনের পর পরিপাটি একটি দিবানিদ্রা লাগান। তারপর জমকালো পোশাক পরে সারা গায়ে দামি সেন্ট ঢেলে পুরোনো আমলের একটি ফোর্ড গাড়িতে চেপে বেরিয়ে পড়েন। লোকে বলাবলি করে, নমকিপুরা থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে অনেক বড় টাউন ফুলগঞ্জে তাঁর একজন রাখনি বা রক্ষিতা আছে। সেখানে কয়েক ঘন্টা মৌজ করে ফিরতে ফিরতে মাঝ রাত হয়ে যায়। বছরে দু-চারবার মিলিটারি সিং-এর লোক এসে নাটোয়ারকে ডেকে নিয়ে যায়। এই যাতায়াতের কারণে তাঁর কিছু কিছু শখ আর অভ্যাসের খবর জেনে গেছে সে।

নাটোয়ারের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমে তার পেটানো মজবুত শরীর। রোদে-পড়া তামাটে চামড়া, চৌকো থুতনি, ঘাড় পর্যন্ত অযত্নে নেমে আসা রুক্ষ চুল, গায়ে কয়েক দিনের খাপচা খাপচা দাড়ি। তার আপাত সরল মাঝারি দুই চোখের তলায় খানিকটা নিষ্ঠুরতা যেন লুকোনো আছে, যে কোনো মুহূর্তে সেটা বেরিয়ে আসতে পারে। পরনে খেলো ফুল প্যান্ট আব রং-জ্বলে-যাওয়া সবুজ জামা।

এখান থেকে মাইল দুই পুবে নাটেয়ারের গাঁ তেতরিয়া। সেখানে বহুকালের পুরোনো টুটোফুটো টিনের চালের কোমর-বাঁকা একখানা ঘর ছাড়া পার্থিব সম্পত্তি বলতে তার আর কিছুই নেই। নেই বাপ-মা, ভাই-বোন। বছর চারেক আগে একটা শাদি করেছিল। কিন্তু আওরতটা ছিল বেজায় বদ, বিয়ের ছ' মাসের মাথায় এক ছোকরাব সঙ্গে পালিয়ে যায়। নাটোরার প্রতিজ্ঞা করেছিল, ধবতে পারলে গলা টিপে তাকে শেষ করে ফেলবে। কিছুদিন খোঁজাখুঁজিও করেছে নাটোয়ার, কিন্তু মেয়েমানুষটা বেবাক উধাও হয়ে গেছে, আর তাব দেখা পাওয়া যায়নি।

এক 'ধুর' চাষের জমিও নেই নাটোয়ারের। কাজেই পেটের কারণে চাষের মরশুমে খেতমজুরি থেকে শুরু করে, ঠিকাদারদের জঙ্গল-কাটাইয়ের কাজ পর্যন্ত অনেক কিছুই তাকে করতে হয়। তা ছাড়া সে একজন নাম-করা 'বীটার' বা জঙ্গল-হাঁকোয়া। প্রচুর হল্লা বাধিয়ে, ক্যানেস্তারা পিটিয়ে বনের জানোয়ারদের শিকারির বন্দুকের পাল্লার ভেতর নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এ অঞ্চলে তার জুড়ি নেই। আগে এ জন্য প্রায়ই তার ডাক আসত। কিন্তু সরকার থেকে শিকারের ওপর ইদানীং মারাত্মক কড়াকড়ি করা হয়েছে। তাই বলে চোরাগোপ্তা বাঘ-ভাল্লুক মারা কি আর বন্ধ আছে? আগের মতো না হলেও বছরে এক-আধবার শিকারিরা তাকে ডেকে পাঠায়। রক্ত-জমিয়ে দেওয়া এক ধরনের ছুরির খেলাও জানে নাটোয়ার। এই খেলাটা মিলিটারি সিং-এর ভীষণ পছন্দ।

গেল বছর বর্ষার পর থেকে কয়েকটা মাস নানারকম রোগ-ব্যারাম আর শ্বাসকষ্টে ভুগেছে নাটোয়ার। কাজে বেরুবার মতো তাগদ ছিল না তার। জমানো টাকা যা ছিল, বসে বসে খেয়ে শেষ হয়ে গেছে। তার ওপর দামি দামি ওষুধের খরচ। এখন অবশ্য পুরোপুরি সেরে উঠেছে সে। একটা পয়সা হাতে নেই। তা ছাড়া সবে বৈশাখ মাস পড়েছে। এখন খেতির কাজ কোথায় মিলবে? তাই ভোর হতে না হতেই তেতরিয়া থেকে বেরিয়ে পড়েছে। ছুরির খেলাটা একা দেখানো যায় না, তার জন্য ফকিরাকে দরকার।

মিলিটারি সিং যতবার নাটোয়ারের খেলা দেখেছেন, চোখের পাতা ফেলতে পারেননি। খেলা শেষ হলে তার পিঠ চাপড়ে বলেছেন, 'হারামজাদকা ছৌয়া, তুই একটা জাদুগর। বিলকুল ভেলকি দেখিয়ে ছাড়লি।' হারামজাদকা ছৌয়াটা গালাগাল নয়, ওটা মিলিটারি সিং-এর আদর এবং বিস্ময়ের প্রকাশ। শুধু তারিফই করেন না তিনি, হাতও তাঁর যথেষ্ট দরাজ। খুশি হয়ে প্রতিবার তিনি যা বখশিশ দেন তাতে একটা মাস বেশ আরামেই কেটে যায় নাটোয়ারের। সেই সঙ্গে ফকিরারও। এই ব্যাপারটা মাথায় রেখেই সে আশায় আশায় নমকিপুরায় চলেছে। মিলিটারি সিংকে ছুরির খেলাটা দেখাতে পারলে বেশ কয়েক দিনের জন্য সে নিশ্চিন্ত। তার ভেতর চাষের মরশুম শুরু হয়ে যাবে।

হাইওয়ের দু'ধারে উঁচুনিচু কাঁকুরে ডাঙায় হতচ্ছাড়া চেহারার সব গ্রাম ছাড়া ছাড়া ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এক নজরেই টের পাওয়া যায়, ওগুলো গরিব হাভাতেদের উপনিবেশ।

চলতে চলতে একবার আকাশের দিকে তাকায় নাটোয়ার। বৈশাখের এই গোড়াতেই এবার আকাশ জুড়ে মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে। ছেঁড়া ছেঁড়া কালচে মেঘের টুকরোগুলো উল্টোপাল্টা হাওয়ায় লক্ষ্যহীনের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। রোদ উঠেছে বেশ খানিকক্ষণ আগে, কিন্তু মেঘের জন্য তার তেজ ঢের কম।

গেল বছর এ অঞ্চলে ভয়াবহ অনাবৃষ্টি গেছে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত একটানা লু-বাতাস বয়ে যেত। আগুনের হলকার মতো অসহ্য তাপে ঝলসে গেছে গাছপালা, মাঠঘাট, শস্যক্ষেত্র। মাটি ফেটে চারিদিকে এখনও হাঁ হয়ে আছে। কিন্তু এবার লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, খুব তাড়াতাড়িই বর্ষা নেমে যাবে।

এ এক সৃষ্টিছাড়া এলাকা। এখানে পালা করে এক বছর খরা হলে, পরের বছর বন্যা অবধারিত। নিয়ম অনুযায়ী এবার প্রবল বর্ষায় সব ভেসে যাবে।

হঠাৎ হইচই কানে আসতে আকাশের দিক থেকে চোখ নামিয়ে আনে নাটোয়ার। হাইওয়ের দু' পাশের গাঁগুলো উজাড় করে নানা বয়সের মানুষ, বাচ্চাকাচ্চা থেকে থুত্থুড়ে বুড়োবুড়ি পর্যন্ত সবাই বেরিয়ে আসছে। খয়াটে রুগ্ণ খই-ওড়া চেহারা তাদের। বাচ্চাগুলোর গায়ে জামাটামার বালাই নেই বললেই হয়। বাকি সবার পরনে ময়লা ঠেঁটি ধুতি, শাড়ি, লুঙ্গি, পাজামা বা সস্তা খেলো কাপড়ের সালোয়ার-কামিজ।

এত মানুষকে বাড়িঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে দেখে রীতিমতো অবাকই হয় নাটোয়ার। যদিও নমকিপুরায় যাওয়ার খুবই তাড়া রয়েছে, তবু কৌতূহলের বশে দাঁড়িয়ে যায় সে। একটা মাঝবয়সী লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে ভেইয়া, এত্তে আদমী পাক্কীতে চলে আসছে!' পাক্কী বলতে পাকা সড়ক অর্থাৎ ন্যাশনাল হাইওয়ে।

লোকটা পালটা প্রশ্ন করে, 'তুমি কিছু জানো না?'

'কী জানব?'

লোকটা এবার আঙুল বাড়িয়ে পেছন দিকের সেই মিছিলটা দেখিয়ে দেয়। ফিল্মি গানের সেই সুরটা বাজাতে বাজাতে ওরা এদিকেই আসছে। নাটোয়ার বলে, 'ওরা কারা?'

তার এত বড় অজ্ঞতায় প্রথমটা হাঁ হয়ে যায় লোকটা। তারপর যেন করুণা করেই বলে, 'আরে ভাই, ভারতমাতা রথ আসছে। তা-ই দেখতে লোকজন ভিড় করছে।' সে আরও জানায়, কাল-পরশু দু'দিন ধরে তিন চারটে লোক টাঙ্গায় করে ন্যাশনাল হাইওয়েতে টহল দিতে দিতে মাইকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, আজ সকালে ভারতমাতা রথ এই রাস্তা দিয়ে যাবে। তাকে 'স্বাগত্' জানাতে সবাই যেন শুদ্ধ মনে দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। এটা তাদের পবিত্র কর্তব্য।

ইদানীং নানা ধরনের রথযাত্রার কথা কানে আসছে নাটোয়ারের। রামচন্দ্রজিকা রথ, প্রগতি রথ, সম্মার্গ রথ, সুচৈতন্য রথ, সদ্ভাবনা রথ, ইত্যাদি। বড় বড় নেতারা দামি মোটর বা ভ্যান গাড়ির রথ বানিয়ে সেগুলোতে চড়ে দেশে নাকি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অন্য সব রথের কথা শুনলেও ভারতমাতা রথের কথা এই প্রথম শুনল নাটোয়ার। আসলে তাদের তেতরিয়া গাঁ-টা হাইওয়ে থেকে অনেক দূরে, মাঠের মাঝখানে। পায়ে হাঁটা ছাড়া সেখানে যাওয়া অসম্ভব। ভারতমাতা রথের পাবলিসিটিওলারা টাঙ্গা থেকে নেমে কষ্ট করে আর অতদূরে যায়নি। গেলে জানতে পারত নাটোয়ার।

মাঝবয়সী লোকটা আর দাঁড়ায় না, নাটোয়ারের চাইতে ভারতমাতা রথের আকর্ষণ তার কাছে অনেক, অনেক বেশি। মিছিলটা যেদিক থেকে আসছে, ভীষণ ব্যস্তভাবে সে সেদিকে এগিয়ে যায়। রথটা যেন অদৃশ্য বঁড়শি তার নাকে আটকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

নাটোয়ার আবার হাঁটতে শুরু করে। ভারতমাতা রথ নিয়ে এই মুহূর্তে তার কোনো আগ্রহ নেই।

আরও খানিকক্ষণ হাঁটার পর হাইওয়ে থেকে ডান দিকে একটা কাচ্চী বা কাঁচা রাস্তায় নেমে যায় নাটোয়ার। এই রাস্তাটা ধরে সিকি মাইলের মতো হাঁটলে ফকিরাদের মনচনিয়া গাঁ।

মনচনিয়ায় ঢোকার মুখেই ফকিরার প্রায় ধসে-পড়া মাটির ঘর। গরিবের চাইতেও গরিব এই লোকটার হাল নাটোয়ারের চাইতেও খারাপ। নাটোয়ার ঝাড়া হাত-পা লোক, দুনিয়ায় সে একেবারে একা। কিন্তু ফকিরার রয়েছে বিবি এবং বারো তেরো বছরের মেয়ে। তিনটে পেট চালাতে তার জিভ বেরিয়ে যায়।

বাইরে থেকে নাটোয়ার ডাকতে থাকে, 'ফকিরা চাচা, ফকিরা চাচা—'

জং-ধরা নড়বড়ে টিনের দরজা খুলে মাঝবয়সী জোহরা বিবি এবং তাদের মেয়ে আমিনা বাইরে এসে দাঁড়ায়। জোহরার পরনে ময়লা চিটচিটে শাড়ি, আমিনার গায়ে ছেঁড়াখোঁড়া তালি-মারা সালোয়ার আর ঢলঢলে কামিজ। রোগা পাকানো চেহারা দু'জনেরই। দেখামাত্র টের পাওয়া যায়, উপোস তাদের নিত্যসঙ্গী, মাসে কম করে দশ দিন শুধু জলের ওপর ভরসা করে কাটাতে হয়।

ফকিরার বাড়িতে আব্রুর কড়াকড়ি নেই। তা ছাড়া নাটোয়ার তাদের 'আপনা আদমি'—একরকম ঘরের লোক। আগে থেকে খবর না দিয়ে আচমকা এসে পড়ায় জোহরা অবাক হয়ে যায়। বলে, 'আরে তুম? অ্যায়সা আচানক?'

নাটোয়ার বলে, 'হাঁ, জরুরি কাজ আছে। চাচা কোথায়?'

'ঘরে শুয়ে আছে।'

'ডেকে দাও।'

'তুমি দেখছি ঘোড়ায় চেপে এসেছ! ভেতরে এসো।'

আমিনাও মায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে, 'আও না নাটুয়া ভেইয়া।' নাটোয়ারকে সে খুবই পছন্দ করে।

নাটোয়ার বলে, 'এখন ভেতরে যাওয়ার সময় নেই রে আমিনা। তোর আব্বুকে তুরন্ত পাঠিয়ে দে।'

জোহরা বিবি বলে, 'এত্তে রোজ বাদে এলে। বাইরে থেকেই চলে যাবে?'

'হাঁ চাচী, এখনই আমাদের নমকিপুরায় যেতে হবে। দুফারের আগে মিলটারি সিংজির সাথ দেখা করতে না পারলে সব বরবাদ।'

মিলিটারি সিং-এর হাভেলিতে কী উদ্দেশ্যে নাটোয়াররা যায়, জোহরা বিবির তা অজানা নয়। ওখানে যাওয়া মানে দু-চারটে পয়সা ঘরে আসা। তবু বিমর্ষ হয়ে পড়ে সে। বলে, 'জরুর চাক্কুকা খেল দেখাতে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'লেকেন—' কথা শেষ না করেই থেমে যায় জোহরা।

নাটোয়ার বলে, 'লেকেন কী?' তার গলায় ব্যগ্রতা ফুটে বেরোয়।

'তোমার চাচা তো যেতে পারবে না।'

বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে নাটোয়ারের। সে দু'পা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, 'কেন?'

জোহারা বিবি বলে, 'সাত রোজ ধরে তোমার চাচার ভারী বুখার।'

দম-আটকানো গলায় নাটোয়ার জানতে চায়, কী ধরনের অসুখ হয়েছে ফকিরার।

জোহরা বিবি জানায়, ধুম জ্বর হয়েছিল, তবে কাল রাত থেকে জ্বরটা আর নেই, কিন্তু ফকিরার সারা গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা, মাথায় 'দর্দ'। বিছানা থেকে উঠতে গেলে টলে পড়ে যায়।

অর্থাৎ যে আশা নিয়ে নাটোয়ার এতদূর দৌড়ে এসেছে, সেটা ধুক করে নিভে যায়। কেননা ফকিরাকে বাদ দিয়ে ছুরির খেলাটা দেখানো অসম্ভব। প্রায় ভেঙেই পড়ে সে, দুই হাত উলটে দিয়ে বলে, 'তব্ তো সব কুছ পুরা চৌপাট।' গভীর হতাশায় তার গলার স্বর ঝাপসা হয়ে আসে।

জোহরা বিবি কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মাটির দেওয়াল ধরে ধরে বাইরে বেরিয়ে আসে ফকিরা। এমনিতেই তার শরীর অনেক আগেই ভেঙেচুরে তেউরে গিয়েছিল। ক'দিনের জ্বরে এমন হাল হয়েছে যে তার দিকে তাকানো যায় না। চোখ এক কড় গর্তে ঢুকে গেছে, তার তলায় গাঢ় কালির পোঁচ। কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। গায়ে মাংস বলতে কিছুই নেই, হাড়ের ওপর ঢিলে জিলজিলে চামড়া জড়ানো। পরনে দলা-মোচড়া হয়ে যাওয়া লুঙ্গি আর হাত-কাটা ফতুয়া ধরনের জামা। সে নির্জীব গলায় বলে, 'চল নাটুয়া, আমি মলটারিজির হাউলিতে (হাভেলি) যাব।' ফকিরা যে নাটোয়ার এবং জোহরাবিবির সব কথাই ঘরের ভেতর থেকে শুনেছে সেটা টের পাওয়া যায়।

জোহরা বিবি উদ্বিগ্ন মুখে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'নেহী নেহী, তোমার তবিয়ত ঠিক নেহী। ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো। বেরুতে হবে না।'

ফকিরা বলে, 'শুয়ে থাকলে চলবে! ঘরে একগো পাইসা নেহি। কামাই-ধান্দা না করলে সিরিফ ভুখা মরতে হবে।'

শঙ্কিত জোহরাবিবি স্বামীকে ঠেকাবার চেষ্টা করে। বলে, 'লেকেন তুমি ভুগে ভুগে এত দুব্‌লা হয়ে পড়েছ! নমকিপুরায় যাবে কী করে? তারপর ওই খতারনাক চাক্কুকা খেল! মাত্‌ যাও আমিনাকে আব্বু।'

বিবিকে বোঝায় ফকিরা, যেখানে টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে না যাওয়াটা বিলকুল বেওকুফি। পয়সার গন্ধে তার কমজোর শরীরে হাতির তাকত এসে যাবে, জোহরা যেন কোনোরকম দুশ্চিন্তা না করে।

জোহরাবিবি আরও বারকয়েক আপত্তি জানায়, বাধা দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে সব গ্রাহ্য করে না ফকিরা। নাটোয়ারের সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ে।

দুর্বল শরীরে জোরে জোরে পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল ফকিরার। সাতদিন ভোগার পর যেটুকু শক্তি এখনও অবশিষ্ট আছে তা জড়ো করে নাটোয়ারের পাশাপাশি চলতে চলতে আকাশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয় সে। বলে, 'উপরবালা তোকে পাঠিয়ে দিয়েছে নাটুরা। আজ কিছু কামাই করে না আনলে চুল্‌হা ধরানো বন্ধ। সিরিফ ভুখা থাকতে হ'ত।'

ফকিরা ধরেই নিয়েছে মিলিটারি সিং-এর কাছ থেকে ভালোমতো বখশিশ মিলবেই। কিন্তু বিনা আমন্ত্রণে তারা নমকিপুরার চলেছে। যদি কোনো কারণে মিলিটারিজির 'দর্শন' না মেলে, কিংবা তিনি ছুরির খেলা দেখতে রাজি না হন? না না, তেতরিয়া থেকে এতদূর আসার পর এ সব খারাপ চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে সাহস হয় না নাটোয়ারের। বরং ফকিরার এবং নিজের উৎসাহকে উসকে দেওয়ার জন্য বলে, 'চিন্তা নায় করনা চাচা। জরুর পাইসা কামাই হবে।'

একসময় দু'জনে হাইওয়ের কাছাকাছি এসে পড়ে।

দুই

'বোল রাধা বোল, সঙ্গম হোগা কি নেহী—
তেরে মনকা গঙ্গা আউর মেরে মনকা যমুনা,
বোল রাধা বোল—'

কিছুক্ষণ আগে যে গানের সুরটা দূর থেকে আবছাভাবে কানে আসছিল, এবার সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শহরে-বাজারে গঞ্জেটঞ্জে ঘুরতে ঘুরতে রেডিওতে মাইকে এই গানটা কয়েক শো বার শুনেছে নাটোয়ার। এই গানের সুর এবং কথা এমনই যে রক্তকে নাচিয়ে দেয়, বুকের ভেতর ঝড় তুলতে থাকে।

ফকিরা পাশ থেকে ক্ষীণ গলায় বলে, 'জরুর ভারতমাতা রথ আসছে।'

হাইওয়ের দিকে চোখ রেখে নাটোযার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি এই রথের কথা জানো নাকি? কারা এটা বার করেছে?'

'আমি তা জানব কোত্থেকে? তোর চাচির দশটা কান আর বিশটা আঁখ। তার চোখকানের বাইরে দুনিয়ার কিছু হওয়ার জো আছে! সে-ই কাল এই রথটার খবর নিয়ে এসেছিল।' একটানা কথাগুলো বলে একটু থামে ফকিরা। কিছুক্ষণ হাঁপায়। তারপর ফের শুরু করে, 'তুই তো তিন চার মাস এধারে আসিসনি। এর ভেতর এ রকম আরও পাঁচ সাতটা রথ পাক্কী দিয়ে আংরেজি বাজনায় ফিলমকা গানা বাজাতে বাজাতে গেছে।'

নাটোয়ার উত্তর দেয় না; মোটামুটি এই খবরটা সেই মধ্যবয়সী লোকটার মুখে আগেই পেয়েছে। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে সে।

হাইওয়েতে আসতেই নাটোয়ারের চোখে পড়ল, যে মিছিলটাকে একসময় ধুধু দেখাচ্ছিল সেটা কাছে এসে পড়েছে। মিছিলটার সামনের দিকে বিশাল ব্যান্ডপার্টি। বাজিয়েদের একই রকমের জমকালো পোশাক, মাথায় সোনালি বর্ডার-দেওয়া কালো টুপি, পায়ে বুট। নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে তালে তালে পা ফেলে তারা সুরটা বাজিয়ে চলেছে। 'বোল রাধা বোল, সঙ্গম হোগা কি নেহী—'

ব্যান্ড পার্টির পর একটা খোলা জিপে চার-পাঁচটা লোক, কেউ বসে, কেউ বা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজনের গলায় একটা মাইক ঝুলছে।

জিপের পর একটা মাটাডোর ভ্যানকে চমৎকার রথের মতো সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে। তার মাঝখানে প্লাস্টিকের ফুল-লতা-পাতা দিয়ে বানানো বিরাট ছত্রির তলায় মখমলে-মোড়া সিংহাসন ধরনের আসনে হাতজোড় করে বসে আছেন বিপুল চেহারার ধবধবে ফর্সা একটি লোক। মাথায় ছোটো ছোটো করে ছাঁটা চুল, পেছন দিকে এক গোছা টিকি। কপালে পুরু করে চন্দন লেপা। গোলাকার মুখে চমৎকার স্বর্গীয় একটি হাসি ধরে রেখেছেন তিনি। গায়ের চামড়া তার এত মিহি এবং মসৃণ, মনে হয় মাখন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। তাঁর পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি আর ফিনফিনে ধুতি, পায়ে কারুকাজ-করা নাগরা।

মাটাডোর ভ্যান অর্থাৎ রথটার দু'ধারে সামনে এবং পেছনে লাল সালুর ওপর সাদা দেবনগরী হরফে লেখা আছে : 'ভারতমাতা রথ।' তার তলায় 'ভবিষ্য যাত্রা।'

বছর কয়েক আগে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের লোকজনেরা এই অঞ্চলে এসে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে কিছু টিনের চালা তুলে প্রাইমারি স্কুল বসিয়েছিল। তেমন একটা স্কুলে দিনকতক যাতায়াত করে একটু আধটু পড়তে আর নামটা সই করতে শিখেছে নাটোয়ার। তারই দৌলতে সালুর ওপর লেখাগুলোর মর্ম বুঝতে পারছে সে।

মাটাডোরের পর একটা নতুন ঝকমকে মোটর। সেটার ভেতর কিছু লোক বসে আছে। গাড়িটার সামনের দিকের কাচে একটা সাদা কাগজে ইংরেজিতে কী যেন লিখে আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। সমাজ কল্যাণ দপ্তরের দেহাতী স্কুল থেকে যে বিদ্যাটুকু নাটোয়ার সংগ্রহ করতে পেরেছে তার জোরে ওই ইংরেজিটা পড়া যায় না।

মোটরের পর একটা খোলা ট্রাকে স্টেনলেস স্টিলের ঢাউস ঢাউস ডেকচি, সিলভারের হাঁড়ি, প্লাস্টিকের বালতি এবং নানা ধরনের প্রচুর মালপত্র। সব শেষে ঘোড়ায় টানা দু'টো টাঙ্গায় কয়েকটা লোক বসে আছে। তাদের চাড়া-দেওয়া গোঁফ, চওড়া কাঁধ, বিশাল বুকের ছাতি আর লালচে নির্মম চোখ বুঝিয়ে দেয়, মানুষ হিসেবে তারা কতটা সাঙ্ঘাতিক। একজনের হাতে আবার একটা দো-নলা মুঙ্গেরি বন্দুক আর বুকের ওপর আড়াআড়ি টোটার মালা ঝুলছে। আরেকজনের হাতে একটা বেঢপ লম্বা টিনের চোঙা।

টাঙ্গা দু'টোর পর অবশ্য এই এলাকার কিছু গেঁয়ো গরিব লোকজন পায়ে হেঁটে মিছিল করে চলেছে।

নাটোয়ার মাটাডোরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। একবার পাটনায় এক শিকারির বাড়ি গিয়ে প্রথম টিভি দেখেছিল সে। তখন 'রামায়ণ' সিরিয়ালটা দেখানো হচ্ছিল। আরেক বার গিয়ে দেখেছে 'মহাভারত'। সেকালে অর্থাৎ সত্য ত্রেতা আর দ্বাপরে দেবতা এবং দানবেরা রথে চড়ে ঘুরে বেড়াত। সে সব রথ আকাশেও উড়ে বেড়াতে পারত। মাটাডোরটা দেখতে দেখতে রামায়ণ মহাভারতের আমলের রথের কথা মনে পড়ে যায় নাটোয়ারের। কার কাছে সে শুনেছিল, এখন নাকি ঘোর কলি চলছে। কলিযুগে রথ দেখতে দেখতে সে হাঁ হয়ে যায়।

একবারে সামনের দিকে ব্যান্ডপার্টির পর জিপে যে লোকটির গলায় মাইক ঝোলানো রয়েছে তার কণ্ঠস্বর খুবই জবরদস্ত। মাঝে মাঝে মাইকটা মুখের সামনে তুলে ব্যান্ড পার্টির বাজনদারদের থামিয়ে দিয়ে সে বলতে থাকে, 'ভাইয়ো আউর বহেনো, পাপ আর ভ্রষ্টাচারে ইন্ডিয়া, মতলব ভারত বিলকুল বোঝাই হয়ে গেছে। যেদিকেই তাকাবেন সেদিকেই দুর্নীতি, গন্ধা আদমিদের ভিড়। লোভে লালচে ভারতবাসী পুরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার সুযোগ নিচ্ছে বাইরের নানা দেশ। যুগ যুগ ধরে চালু ইন্ডিয়ার মহান সোসাইটি আর ধর্মকে তারা খতম করে দিতে চায়। আমাদের দেশের মধ্যেও বহোত দুশমন রয়েছে। তারা বাইরের ষড়যন্ত্রে মদত দিচ্ছে। লেকেন এই চক্রান্ত জান দিয়ে রুখতে হবে। সোসাইটি আর ধর্মই যদি শেষ হয়ে গেল, ইন্ডিয়ার থাকবে কী? ভাইয়ো আউর বহেনো, দেশের মানুষের হুঁশ ফেরানো আর ধর্ম আর সমাজকে বাঁচাবার জন্যে তারানাথ মিশ্রজি রথযাত্রা শুরু করেছেন। ওই দেখুন তারানাথজি আর তাঁর 'ভারতমাতা রথ'। বলে মাটাডোর এবং সেটার মাঝখানে জমকালো ছত্রির তলায় জোড়হাত করে বসে-থাকা বিপুলাকার তারানাথকে দেখিয়ে দেয়।

লোকটার গলায় অলৌকিক শক্তি। এরপর গাঁক গাঁক করে সে যা বলে যায় তা এইরকম। ধর্ম আর সোসাইটিকে রক্ষা করতেই শুধু নয়, তিনি জানেন ভারতবাসী বড়ই কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। ধর্ম ইত্যাদির মতো পেটের দানাও খুবই মূল্যবান এবং জরুরি। তাই সবার জন্য রোটি, কাপড়া এবং মকানের কথাও তিনি চিন্তা করেছেন। দেশের মানুষের জন্য সুখী, মহান স্বপ্নের ভারত তিনি গড়ে দেবেন। দুখ-কষ্ট ঘুচে সকলের মুখে যতদিন না হাসি ফুটছে তাঁর 'ভারতমাতা' 'রথ' চলতেই থাকবে। দুখী ভারতবাসীর ধর্ম, সোসাইটি, রোটি, কাপড়া এবং মকানের জিম্মেদার তারানাথজি; তাদের সুরক্ষার দায়িত্ব তাঁর।

সবশেষে লোকটা বলে, 'তারানাথজি ভবিষ্যৎ ভারতের কথা ভেবে এই রথযাত্রায় পাঁচ পাঁচ গাঁওয়ের পরে একটা করে আধারশিলা বসাতে বসাতে (শিলান্যাস করতে করতে) যাবেন।' একটু থেমে ফের বলে, 'আরেকটা কথা, তারানাথজি অগেলা চুনাওতে আপনাদের এই এলাকা থেকে লোকসভার উন্মিদবার হচ্ছেন। তাঁর ভরসা আছে, আপনারা তাঁকে মদত করবেন।' বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে টাঙ্গার সেই মারাত্মক চেহারার লোকগুলোর উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, 'এ দুমরলাল, অব্ স্লোগান তো দে—'

এরা বোধহয় রথযাত্রার নানারকম কাজকর্ম নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। এবার চোঙা হাতে সেই লোকটা অর্থাৎ দুমরলাল উঠে দাঁড়িয়ে চোঙাটি মুখে লাগিয়ে চেরা চেরা বাজখাঁই গলায় চিৎকার করে ওঠে, 'ভারতমাতা—'

টাঙ্গার অন্য লোকগুলি গলা মিলিয়ে চেঁচায়, 'জিন্দাবাদ—'

'তারানাথ মিশ্র—'

'জিন্দাবাদ।'

'ভবিষ্যযাত্রা—'

'জিন্দাবাদ।'

'মহান ভারতকো—'

'রক্ষা কর।'

টাঙ্গার তাগড়াই লোকগুলোই শুধু স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। হাইওয়ের দু'ধারে উৎসুক গেঁয়ো মানুষের জটলা। তাদের দিক থেকে কোনোরকম সাড়া নেই।

ভারতমাতা রথ এবং সেটার পেছনে ট্রাক আর মোটর-টোটরের কনভয় থেমে যায়নি, ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল। একেবারে পেছনে যে পঞ্চাশ ষাট জনের মিছিলটা চলেছে, ফকিরা এবং নাটোয়ার কখন তাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে দিয়েছে, নিজেদেরই খেয়াল নেই।

ওদিকে হঠাৎ স্লোগান থামিয়ে দুমরলাল কোঁচকানো হিংস্র চোখে দু'ধারের জটলার দিকে তাকাতে তাকাতে হুমকে ওঠে, 'শালেরা গুংগা নাকি? গলার নলিয়া থেকে আওয়াজ বার করতে পারিস না?' বলেই কণ্ঠস্বর কয়েক পর্দা চড়িয়ে দেয়, 'ভারতমাতা—' তারপর গলা নামিয়ে দেয়, 'এবার বল জিন্দাবাদ—'

সবাই নয়, মাত্র কয়েকজন গেঁয়ো মানুষ এধার ওধার থেকে ভয়ে ভয়ে বলে ওঠে, 'জিন্দাবাদ—'

এর পর দুমরলাল তাদের কাছ থেকে আরও কয়েকটা 'জিন্দাবাদ' আদায় করে ছাড়ে।

সরু সরু, কমজোর পায়ের ওপর শরীরটাকে খাড়া রাখতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল ফকিরার। মাথা ভীষণ টলছে। প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে সে এগিয়ে যায়।

পাশ থেকে নাটোয়ার একবার ফকিরাকে লক্ষ করে। তারপর তার দুই চোখ চলে যায় ভারতমাতা রথের দিকে। যে গতিতে গাড়িগুলো চলছে তাতে পেছন পেছন হাঁটলে দিনের আলো থাকলে নমকিপুরায় পৌঁছুনোর আশা নেই। নাটোয়ার খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়ে। আবার সে ফকিরার দিকে তাকায়। চাপা গলায় ডাকে, 'চাচা—'

ফকিরা দুর্বল স্বরে সাড়া দেয়, 'কী বলছিস?'

নাটোয়ার রাস্তার পাশের ঢালু জমি দেখিয়ে গলা আরও নামিয়ে দেয়, 'চল ওধার দিয়ে ঘুরে যাই।'

গোটা হাইওয়ে জুড়ে তারানাথ মিশ্রর ভারতমাতা রথ চলছে। সোজা যাওয়ার উপায় নেই। নাটোয়ার চাইছে, সড়ক থেকে মাঠে নেমে রথটাকে পাশ কাটিয়ে বেশ খানিক দূরে গিয়ে তারা হাইওয়েতে উঠবে। ফকিরা বলে, 'সে-ই ভালো।'

কিন্তু নাটোয়াররা রাস্তার কিনারে যাওয়ার আগেই দুমরলাল চোঙা মুখে লাগিয়ে চেঁচাতে থাকে, 'ভাইয়ো আউর বহেনো, আপনারা দলে দলে জুলুসে সামিল হন। বেফায়দা কাউকে হাঁটতে হবে না। যারা তারানাথজির আধারশিলা বসানো দেখতে যাবেন তাদের সবাইকে দুফারে 'বঢ়িয়া ভোজন' করানো হবে। আইয়ে আইয়ে, তুরন্ত চলা আইয়ে—'

এবার সড়কের দু'পাশের লোকজনদের মধ্যে খানিকটা উত্তেজনা দেখা দেয়। নিজেদের ভিতর ফিস ফিস করে তারা কিছু একটা পরামর্শ করতে থাকে। বঢ়িয়া ভোজন অর্থাৎ উত্তম আহারের ব্যাপারটা তাদের রীতিমতো চঞ্চল করে তুলেছে।

ধুরন্ধর দুমরলাল জনতার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল। সে বার বার উৎকৃষ্ট 'ভোজন'-এর কথা বলে তাদের ফুসলাতে থাকে, 'আইয়ে আইয়ে, চিন্তাকি কোঈ বাত নেহী। জুলুসে সামিল হলে 'পুণ'ও হবে, লাভও হবে।'

দ্বিধা যেটুকু ছিল, দ্রুত কেটে যায়। দু'পাশ থেকে নানা বয়সের বেশ কিছু মেয়েমানুষ এবং পুরুষ হাইওয়েতে নেমে আসে। মুহূর্তে মিছিলটা আরও খানিকটা লম্বা হয়ে যায়।

'ভোজন'-এর কথায় নাটোয়ার এবং ফকিরা কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে পড়েছিল। নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'কী করবে চাচা? এরা তো খিলাতে পিলাতে চাইছে।'

ফকিরা বলে, 'পাইসা তো আর দেবে না, সিরিফ খিলাবে। লেকেন নিজের পেটটা ভরলেই চলবে! ঘরে তোর চাচি আর আমিনা রয়েছে। তাদের জন্যে কিছু নিয়ে যেতে হবে না?' একটু থেমে বলে, 'তোর আর কী। একেলা আদমি, ঘরে বালবাচ্চা, জরু উরু নেই। নিজের একটা পেট নিয়েই তোর চিন্তা। আমাকে তিন তিনগো পেটের কথা ভাবতে হয়।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে নাটোয়ার। জোহরা বিবি এবং আমিনার কথা একটু আগে তার মাথায় ছিল না। ঠিকই তো, ফকিরা নিজে খাবে অথচ ঘরে বিবি আর মেয়ে উপোস দিয়ে থাকবে, তা তো হয় না। তা ছাড়া দুপুরে না হয় ভারতমাতাওলারা একবার তাদের খাওয়াবে কিন্তু রাত্তিরে কী খাবে তারা? আজকের পর কাল আছে, কালের পর পরশু তরশু এবং তারপরও অনেকগুলো দিন। এ বছর চাষের মরশুম শুরু হওয়া পর্যন্ত টিকে তো থাকতে হবে। সে জন্য টাকা দরকার। সে টাকাটা একমাত্র মিলিটারি সিং-এর কাছে গেলেই পাওয়ার সম্ভাবনা।

নাটোয়ার ফকিরার কানের কাছে মুখ এনে বলে, 'আও চাচা—'

দু'জনে পায়ে পায়ে হাইওয়ের একধারে চলে যায়। কিন্তু যেই তারা মিছিল থেকে বেরিয়ে নিচের কাঁকুরে ডাঙায় নামতে যাবে সেই সময় বাঘের মতো হাঁকরে ওঠে দুমরলাল, 'এ শালে ভূচ্চরের ছৌয়ারা, ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস? মিছিলে তিন কদম যেতে না যেতেই ভেগে পড়ার ধান্দা!' লোকটার চিলের নজর। তার চোখ এড়িয়ে বুঝিবা কিছুই হওয়ার জো নেই।

নাটোয়ার এবং ফকিরা ভয়ানক চমকে ওঠে। বুঝতে পারে নিজেদের অজান্তে মিছিলে পা দিয়ে মারাত্মক ফাঁদে আটকে গেছে। দুমরলালেরা না ছাড়লে এখান থেকে বেরুবার আর উপায় নেই। আজকের দিনটা পুরা বরবাদই হয়ে গেল। মিলিটারি সিং-এর বাড়িতে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

ফকিরা বহুদর্শী লোক। পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর বেঁচে থেকে এই দুনিয়ার অনেক কিছু দেখেছে সে। মানুষ সম্পর্কে তার বিপুল অভিজ্ঞতা। ফকিরা জানে, দুমরলালদের চটাতে নেই। শশব্যস্তে বলে, 'ভাগব কেন? অয়সা ধান্দাই নেই। মাঝখানে ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে, তাই সড়কের কিনার দিয়ে যাব, ভেবেছিলাম।'

একটা চোখ ছোটো করে দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশব্দে একটি চতুর হাসি ফুটিয়ে তোলে দুমরলাল। বুঝিয়ে দেয়, ফকিরাদের মতলবটা সে ধরে ফেলেছে। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, 'চুহা কাঁহিকা! কিনার দিয়ে যেতে হবে না, বীচমে (মাঝখানে) ঘুসে যা শালেরা।'

অগত্যা নিরুপায় হয়ে তা-ই করতে হয় ফকিরা এবং নাটোয়ারকে।

দুমরলাল এবার গলায় লহর তুলে ধিক্কার দিয়ে বলতে থাকে, 'ছিয়া ছিয়া ছিয়া! তারানাথজি তোদের ভালাই-এর জন্যে, ভারতবর্ষের ভালাই-এর জন্যে এত কষ্ট করে বেরিয়ে পড়েছেন, তোদের জন্যে ভোজন-উজন বন্ধ করে দিয়েছেন, রাতের পর রাত এক মিনিটকে লিয়ে ঘুমোন না, আর শালেরা—তোরা কিনা তাঁর মিছিলে দশ কদম হাঁটতে পারিস না! দেহ্ (শরীর) একেবারে মাখ্খন দিয়ে তৈরি! নিমকহারাম, বিশ্বাসঘাতী কাঁহিকা!'

দু'ধারে, সামনে এবং পেছনে মানুষের দেওয়াল। মাঝখান দিয়ে অসীম গ্লানিতে মাথা হেঁট করে হাঁটতে থাকে নাটোয়াররা। কিন্তু কিছুতেই ভেবে পায় না কবে কখন কীভাবে তারা তারানাথ মিশ্রর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? কেননা, জীবনে এই প্রথম তারা তারানাথজিকে দেখল। তাঁর সঙ্গে নেমকহারামির প্রশ্নই ওঠে না।

দুমরলাল কর্কশ কণ্ঠস্বরকে যতটা সম্ভব মোলায়েম করে ফের চোঙা মুখে তুলে দু'পাশের জনতার উদ্দেশে বলে যাচ্ছিল, 'আইয়ে আইয়ে, রথযাত্রামে সামিল হো যাইয়ে—' বলতে বলতে তার চোখে পড়ে, মিছিলের একধারে তুচ্ছ কোনো কারণে দু'টো লোক চেঁচামেচি ধাক্কাধাক্কি লাগিয়ে দিয়েছে। তৎক্ষণাৎ মুখ থেকে চোঙা নামিয়ে তাদের উদ্দেশে দুমরলাল চিৎকার করতে থাকে, 'এই জানবরেরা হল্লাগুল্লা বিলকুল বন্ধ্। নইলে গলার নলিয়া ছিঁড়ে ফেলব।'

মুহূর্তে হইচই থেমে যায়।

চলতে চলতে নাটোয়ার একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে, দুমরলাল মুখে চোঙা লাগিয়ে লোকজনকে ডাকাডাকির সময় 'আপনারা' বলছে কিন্তু আলাদাভাবে কারো সঙ্গে বলার সময় স্রেফ 'তুই'। কারণটা সে বুঝে উঠতে পারে না।

আরও কিছুক্ষণ 'আইয়ে আইয়ে' করার পর দুমরলাল জিপের সেই মাইকওলা লোকটিকে বলে, 'আমার হয়ে গেছে মহাদেওজি—'

মহাদেও এবার থেমে-যাওয়া ব্যান্ডপার্টির উদ্দেশে বলে, 'তোমরা ফের শুরু কবে দাও—'

নতুন উদ্যমে বাজনা আরম্ভ হয়ে যায়।

'বোল রাধা বোল, সঙ্গম হোগা কি নেহী—'

ভারতমাতা রথ এক সেকেন্ডের জন্য কোথাও থামে না। গতি অবশ্য খুবই কম।

হাঁটতে হাঁটতে আপশোশ হতে থাকে নাটোয়ারের। বলে, 'বহোত মুসিবতে ফেঁসে গেলাম চাচা। কেন যে জুলুসে ঢুকেছিলাম! এখন নিজের গালে জুতি মারতে ইচ্ছা করছে।'

ফকিরাও খুব সম্ভব একই কথা ভাবছিল। সরু গলাটা নেড়ে সে জানায়, তারও ইচ্ছা বিলকুল একই রকম।

নাটোয়ার বলে, 'কখন ছাড়া পাব, কে জানে।'

ফকিরা বলে, 'হাঁ—'

নাটোয়ার বলে, 'মহাদেওজি তখন বলছিল, পাঁচ পাঁচগো গাঁওয়ের পর একটা করে আধারশিলা বসাবেন তারানাথজি। পয়লা যে আধারশিলাটা বসাবেন, তারপর কি ছাড়া পাব?'

ফকিরা অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়ে। সে যা উত্তর দেয় তা অনেকটা এই ধরনের। আজ কখন তারানাথজিরা রথযাত্রা শুরু করেছেন, এখানে আসার আগে ক'টা গাঁ পেরিয়ে এসেছেন বা এখন পর্যন্ত একটাও শিলান্যাস করেছেন কিনা, এসব জানা দরকার। আরও জানতে হবে কোথায় কোথায় তাঁদের শিলান্যাসের কর্মসূচি রয়েছে। যদি একটার বদলে দু'টো বা তিনটে আধারশিলা বসানোর পরিকল্পনা তারানাথজিরা আজ করে থাকেন? এবং সেগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত যদি ফকিরাদের না ছাড়া হয়? আসলে কপাল ভালো হলে তাড়াতাড়িই মুক্তি পাওয়া যাবে। আর যদি তারা নেহাতই বদনসিব হয়, সেই অজানা দুর্ভোগের কথা ভাবতে সাহস হয় না ফকিরার।

কপাল কুঁচকে একটু চিন্তা করে নাটোয়ার। তারপর ফকিরাকে জিজ্ঞেস করে, 'দুমরলালজিসে পুছুঙ্গা?'

ফকিরা বলে, 'যদি গুস্‌সা হয়?'

'কথা বলে দেখি না।'

'দ্যাখ।'

সামনে বেশ কিছু লোকজন রয়েছে। তাদের ঠেলেঠুলে দুমরলালদের টাঙ্গার কাছে চলে আসে নাটোয়ার। তারপর বুকের ভেতর খানিকটা সাহস জড়ো করে বলে, 'দুমরলালজি, একটা কথা বলব—'

পোকামাকড়ের দিকে যেভাবে মানুষ তাকায়, অবিকল সেইভাবেই নাটোয়ারকে লক্ষ করে দুমরলাল। একটা দেহাতীর মুখে নিজের নাম শুনে সে যতটা অবাক তার চেয়ে ঢের বেশি বিরক্ত। দু-চার সেকেন্ড তাকিয়ে থেকেই নাটোয়ারকে চিনে ফেলে সে। কর্কশ গলায় বলে, 'আরে তু? নাম কী তোর? কৌন গাঁওকি রহেনাবালা?'

নিজের নাম এবং তেতরিয়া' গাঁয়ের কথা জানিয়ে দেয় নাটোয়ার।

দুমরলাল বলে, 'কী বলবি, বলে ফেল—'

অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে নাটোয়ার বলে, 'মালুম হচ্ছে আপনারা বহোত্ দূর থেকে আসছেন।'

'হাঁ, কেন?' দুমরলালের ভুরু কুঁচকে যায়।

ফকিরার মতো নাটোয়ারও বারো ঘাটের জল-খাওয়া প্রাণী। সে জানে কাকে কীভাবে পুজো চড়িয়ে তুষ্ট করতে হয়। হাতজোড় করে বলে, 'গুস্সা করবেন না তো?'

নাটোয়ারের বিনয়ে খানিকটা নরমই হয় দুমরলাল। বেশ উদারভাবেই বলে, 'এত্তে বকোয়াস না করে আসল কথাটা বল না ভূচ্চর—'

'আমাদের ভালাই-এর জন্যে এত্তে তখলিফ করে কোথা থেকে আসছেন, জানতে ইচ্ছে করছে।'

'সিসৌলির নাম শুনেছিস?'

'হাঁ হাঁ, বহোত ভারী টৌন।'

দুমরলাল পশ্চিম দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়। ধুধু দিগন্ত দেখাতে দেখাতে বলে, 'জানিস তা হলে। ও শহর হিঁয়াসে লগভগ পঁচাশ 'মিল' (মাইল) হোগা।' সে আরও জানায়, তারা সিসৌলিতে থাকে। তারানাথ মিশ্র সেখানকার সবচেয়ে 'সরগনা' অর্থাৎ মান্যগণ্য আদমী। এমনই শ্রদ্ধেয় এবং ধর্মাত্মা যে সিসৌলি শহরের তাবত মানুষ তাঁর নামে শির ঝুঁকায়। কাল সকালে তারা ভারতমাতা রথ নিয়ে বেরিয়েছে। এর মধ্যে বারোখানা গাঁ পাড়ি দিয়ে এসেছে। দু দু'টো শিলান্যাস করা হয়ে গেছে। একটা গাঁয়ে কাল রাত কাটিয়ে আজ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার বেরিয়ে পড়েছে। এখান থেকে ঘাটমপুরা, চৌহারি, বাজরিয়া ইত্যাদি গাঁ পেরিয়ে তারা যাবে নহরগঞ্জে।

দুমরলাল বলে, 'নহরগঞ্জে একগো আধারশিলা বসাবেন তারানাথজি।'

মনে মনে অঙ্ক কষে নেয় নাটোয়ার। যে গতিতে ভারতমাতা রথ চলেছে তাতে নহরগঞ্জে তাদের পৌঁছুতে বেলা হেলে যাবে। শিলান্যাসের আগেই কি দুমরলালরা সবাইকে 'ভোজন' করিয়ে দেবে? এ ব্যাপারে নাটোয়ার আদৌ নিশ্চিত নয়। যদি খাওয়ায়ও, আধারশিলা না বসানো হলে তাদের মুক্তি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত তারানাথ মিশ্রর রথযাত্রার সঙ্গে তাদের জুড়ে থাকতে হবে। কাজেই এ নিয়ে ভেবে ভেবে নিজেকে হয়রান করার আর দরকার বোধ করে না নাটোয়ার। তার মানসিক অবস্থা অনেকটা হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো।

জরুরি খবরটি জানা হয়ে গেছে নাটোয়ারের। হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় তার। সে জিজ্ঞেস করে, 'কিসের আধারশিলা বসাতে বসাতে চলেছেন তারানাথজি?'

দুমরলাল বলে, 'বহোত কিসিমকা। নহরগঞ্জে পৌঁছুলেই নিজের আঁখে সব দেখতে পাবি।'

এ বিষয়ে আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস হয় না নাটোয়ারের। খানিক ভেবেচিন্তে সে বলে, 'কেত্তে রোজ আপনাদের এই রথযাত্রা চলবে?'

দুমরলাল আচমকা ক্ষেপে ওঠে, 'শালে আমাদের কী রে? তোদের না?' তারপর যেন করুণা করেই বলে, 'কমসে কম বিশ রোজ চলবে। যা, ভাগ।' একটা দেহাতির সঙ্গে বকর বকর করে অনেকটা সময় নষ্ট করা হয়েছে। আর কথা বলার ইচ্ছে নেই দুমরলালের।

আরও একটা কথা নাটোয়ারের মাথায় এসেছিল। পবিত্র রথযাত্রার সামনে কেন ফিলমকা গানা বাজানো হচ্ছে কিন্তু এ প্রশ্নটা আর করা হয়ে ওঠে না। ভিড় ঠেলে ফকিরার কাছে ফিরে আসে নাটোয়ার, এবং দুমরলালের সঙ্গে যা যা কথাবার্তা হয়েছে সব তাকে জানিয়ে দেয়।

যদিও আকাশে ছন্নছাড়া মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, রোদের তেজও বেশ কম, তবু হাঁটতে খুব কষ্ট

হচ্ছিল ফকিরার। প্রায় টলতে টলতে পা ফেলছে সে। দুই হাত উলটে দিয়ে বলে, 'আর কিছু করার নেই রে নাটুয়া। যা হবার হোক, এখন হাঁটতে থাক।'

এরপর অনেকক্ষণ হাইওয়ের ডাইনে বা বাঁয়ে একটা গ্রামও চোখে পড়ে না। শুধুই উঁচুনিচু টিলার মাঝখানে ফাঁকা শস্যক্ষেত্র, মজা নহর, এলোমেলো দাঁড়িয়ে থাকা রুক্ষ চেহারার গাছপালা অথবা আগাছার ঝোপ।

গ্রাম বা মানুষজনদের দেখা না পাওয়া গেলেও ব্যান্ডপার্টি এক মিনিটের জন্যও বাজনা থামাচ্ছে না। একনাগাড়ে সেই সুরটা বাজিয়ে চলেছে। 'বোল রাধা বোল সঙ্গম হোগা কি নেহী—'

এদিকে মিছিলের লোকজনের মধ্যে 'বঢ়িয়া ভোজন'-এর ব্যাপারটা নিয়ে উত্তেজনা তুমুল হয়ে উঠেছে।

একজন গলা উঁচুতে তুলে বলে, 'জরুর চাপাটি, ভাজি, দহি আর পুদিনার আচার খাওয়াবে।'

আরেকজন স্বর আরও চড়িয়ে দেয়, 'আরে নেহী নেহী, শুখা চাপাটি নেহী, ঘিউ-চাপাটি, আচ্ছা সব্‌জি, অড়হড়কি ডাল, লাড্ডু খিলায়েঙ্গে।'

ভোজের তালিকা নিয়ে গোটা মিছিলের চারিদিকে প্রচুর মতভেদ দেখা দেয়। কারো ধারণা, ভারতমাতা রথ নিয়ে তারানাথজির মতো বড় আদমি যখন বেরিয়েছেন তখন অবশ্যই দামি ঘিয়ে ভাজা পুরী কিংবা বাদাম-পেস্তা দেওয়া পোলাও খাওয়ানো হবে। কারো বিশ্বাস তাদের পাতে বুঁদিয়া, গুলাবজামনু এবং প্যাঁড়া নিশ্চয়ই ঢেলে দেওয়া হবে।

অর্থাৎ গরিবের চাইতে গরিব এই হাভাতে মানুষগুলো আমৃত্যু যে সব সুস্বাদু খাবারের স্বপ্নে মশগুল হয়ে থাকে অথচ সে সব খাওয়া তো দূরের কথা, অনেকে চোখে পর্যন্ত দেখেনি, সাধ মিটিয়ে সেগুলোর কথা বলে যায়। তাদের বিশ্বাস, রথযাত্রার উদ্যোক্তারা নিশ্চয়ই তাদের আশা পূরণ করে দেবেন।

নাটোয়ার এবং ফকিরা এখন আর কথা বলছে না। চারপাশের হইচই শুনতে শুনতে চুপচাপ হেঁটে চলেছে।

হঠাৎ দূর থেকে অস্পষ্ট চিৎকার ভেসে আসে, 'রুখ যাও, রুখ যাও।'

রথাযাত্রা অবশ্য থামে না। তবে মিছিলে খাদ্যতালিকা নিয়ে যে উত্তেজনাটা চলছিল সেটা আপাতত স্থগিত রেখে সবাই এদিকে ওদিকে তাকাতে থাকে।

ফকিরা এবং নাটোয়ারও মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লক্ষ করছিল। হঠাৎ নাটোয়ারের চোখে পড়ে, পিছন দিকে প্রায় 'রশি' খানেক তফাতে হাইওয়ের ডান ধারের উঁচু একটা টিলার মাথা থেকে গড়ানে ঢাল বেয়ে একটা মেয়েমানুষ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুতে দৌড়ুতে নেমে আসছে। মাটিতে তার পা যেন পড়ছে না। সমানে সে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'রুখ যাও, রুখ যাও—'

মিছিলের প্রতিটি মানুষের চোখ দূরের ওই মেয়েমানুষটির দিকে। টাঙ্গায় বসে দুমবলালরাও তাকে দেখতে পেয়েছিল। দুমরলাল বলে, 'এ আওরত কৌন রে?'

কেউ উত্তর দেয় না। খুব সম্ভব মিছিলের লোকজন তাকে চেনে না।

ভারতমাতা রথ না থামলেও কিছুক্ষণের মধ্যে মেয়েমানুষটি কাছাকাছি চলে আসে। তার বয়স সাতাশ আটাশ। মাথাভর্তি তেলহীন রুক্ষ চুল। লম্বাটে মুখে দু-চারটে বসন্তের দাগ। বড় বড় টানা চোখে অত্যন্ত সতর্ক নজর। রং কালো। রোদে পুড়ে চামড়া কর্কশ। দেখামাত্র টের পাওয়া যায় মেয়েমানুষটির ওপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝাপটা গেছে। তবু হাতের মোটা মোটা হাড়, পায়ের শক্ত গোছ, ইত্যাদি বুঝিয়ে দেয়, জীবনের সবরকম বিরুদ্ধতার সঙ্গে যুঝবার মতো শক্তি এখনও তার অনেকখানি অটুট রয়েছে। সেই সঙ্গে ছিটেফোঁটা লাবণ্যও।

তার পরনে খাটো ময়লা সবুজ শাড়ি আর লাল জামা। দুই হাতে দস্তার ছিরিছাঁদহীন দুটো ভারী ভারী কাংনা, নাকে ঝুটো লাল পাথর বসানো নাকফুল ছাড়া সারা গায়ে ধাতুর আর কোনো চিহ্নই নেই।

মেয়েমানুষটি আরও কাছে আসতেই চমকে ওঠে নাটোয়ার। তার হাড়ের ভেতর দিয়ে যেন বিজরি চমকে যায়। মেয়েমানুষটি আর কেউ নয়—গোমতী।

চার বছর বাদে তারানাথ মিশ্রর রথযাত্রায় গোমতীর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে, এটা কে ভাবতে পেরেছিল! বহুদিনের জমানো প্রচণ্ড আক্রোশ নাটোয়ারের মাথার ভেতর একটা হিংস্র জানোয়ারকে যেন উসকে দিতে থাকে। নিজের অজান্তেই চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে তার। দাঁতে দাঁত চাপে নাটোয়ার। গোমতীকে খুন করার সেই পুরনো ইচ্ছাটা তাকে ক্রমশ পেয়ে বসতে থাকে। টের পায়, কপালের দু'পাশের রগগুলো সমানে লাফাচ্ছে আর সেগুলোর ভেতর দিয়ে আগুনের হলকার মতো কিছু ছুটে যাচ্ছে।

গোমতী ভিড়ের ভেতর নাটোয়ারকে লক্ষ করেনি। সে সোজা টাঙ্গাগুলোর কাছে চলে যায়। অনেকটা রাস্তা দৌড়ে আসার কারণে হাঁপাচ্ছিল। জোরে শ্বাস টানতে টানতে হাতজোড় করে দুমরলালদের উদ্দেশে বলে, 'ওধারের গাঁওগুলোতে শুনলাম রথের সঙ্গে গেলে দুফারে খাওয়ানো হবে।' সে বুঝতে পেরেছে, টাঙ্গা মাটাডোর বা মোটরে যারা রয়েছে তারাই রথযাত্রার আয়োজন করেছে। খেতে হলে এদেরই ধরতে হবে। সে যেদিক থেকে আসছে দুমরলালদের টাঙ্গাটা সেদিক থেকে সামনে পড়ে বলে গোমতী প্রথমে তাদেরই কাছে গেছে।

দুমরলাল বলে, 'হাঁ, খাওয়ানো হবে।' বঢ়িয়া ভোজনের ওপর সে আগের চেয়েও বেশি জোর দেয়।

'আমি আপনাদের সঙ্গে যাব।'

'ঠিক হ্যায়।' মিছিলের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দুমরলাল বলে,'ওদের সঙ্গে আয়।'

মুহূর্তে গোমতী ক্ষুধার্ত জনতার মধ্যে মিশে যায়।

নাটোয়ার গোমতীর দিক থেকে নজর সরায়নি। জ্বলন্ত চোখে পলকহীন সে তাকে দেখে যাচ্ছিল।

পাশ থেকে আবছা গলায় ফকিরা ডাকে, 'এ নাটুয়া—'

নাটোয়ার অন্যমনস্কের মতো সাড়া দেয়, 'হাঁ—'

ফকিরা তার শীর্ণ আঙুল গোমতীর দিকে বাড়িয়ে বলে, 'ও তোর সেই ঘরবালী না?'

'হাঁ।'

'কী যেন নাম ছিল?'

'গোমতী।'

ফকিরা নিজের মনে নিচু গলায় বলে যায়, 'চার সাল আগে ভেগে গিয়েছিল। আচানক এখানে এল কী করে?'

নাটোয়ার উত্তর দেয় না। শরীরের সব রক্ত তার চোখে গিয়ে জমা হয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে সে দু'টো যেন ফেটে যাবে।

তারানাথজির রথযাত্রা, চারপাশে অগুনতি মানুষের থিকথিকে ভিড়, ব্যান্ডপার্টির বাজনায় 'বোল রাধা বোল' ইত্যাদি সমস্ত কিছুই নাটোয়ারের সামনে থেকে যেন মুছে গেছে। উন্মত্তের মতো লোকজন সরিয়ে গোমতীর দিকে পা বাড়ায় সে।

ফকিরা নাটোয়ারের ওপর নজর রেখেছিল। চার বছর আগে এক বদমাশ হারামজাদের সঙ্গে ভেগে যাওয়া নিজের 'বিয়াহী আওরত'কে (বিবাহিত স্ত্রীকে) দেখামাত্র নাটোয়ারের কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সেটা আগেভাগেই আন্দাজ করে নিয়েছিল ফকিরা। দ্রুত হাত বাড়িয়ে নাটোয়ারের একটা হাত ধরে ফেলে সে। বলে, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'ভূচ্চরের ছৌরী ওই রেন্ডিটাকে খতম করতে।'

'শান্ত্ হো যা নাটুয়া। এখন শির গরম করিস না।'

'নেহী—' এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নেয় নাটোয়ার।

ফকিরা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তার অসুস্থ রুগ্ণ দেহের অবশিষ্ট শক্তিটুকু দিয়ে ফের নাটোয়ারকে ধরে ফেলে। 'পাগল হয়ে গেলি নাটুয়া! হোঁশমে আ যা, হোঁশমে আ যা।' সে বোঝাতে থাকে, এখানে

গোম্‌তীর গায়ে হাত দিলে তার ফলাফল হবে মারত্মক। মিছিলের জনতা তো বটেই, টাঙ্গা মোটর এবং জিপ থেকে নেমে তারনাথজির নিজস্ব বাহিনী নাটোয়ারকে মেরে একেবারে মাটিতে পুঁতে ফেলবে।

এবার খানিকটা কাজ হয়। ফকিরা যা বলেছে তা ষোলোআনার জায়গায় আঠার আনা ঠিক। রথযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটালে দুমরলালেরা তাকে ছেড়ে দেবে না। ওরা তো জানে না, নাটোয়ারের সঙ্গে গোম্‌তীর সম্পর্কটা কী আর ওই আওরতটা কতখানি বদ। গোম্‌তীর দিকে আর পা না বাড়ালেও মাথার ভেতর অসহ্য রাগ আগুনের চাকার মতো ঘুরতে থাকে। দাঁতে দাঁত ঘষে চাপা হিংস্র গলায় নাটোয়ার বলে, 'তুমি দেখে নিও চাচা, রেন্ডিটাকে আমি ছাড়ব না।' চার বছর ধরে যে প্রতিহিংসা এবং আক্রোশ সে পুষে রেখেছে তা না মেটানো পর্যন্ত তার শান্তি নেই।

ভারতমাতার রথ এক পলকের জন্যও থামে না। বৈশাখের উল্টোপাল্টা হাওয়ায় ব্যান্ডপার্টির মাতিয়ে-দেওয়া সুর ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে যায়, 'বোল রাধা বোল, সঙ্গম হোগা কি নেহী—'

তিন

অনেকক্ষণ চলার পর ফের একটা গ্রামের দেখা পাওয়া যায়। নাম ঘাটমপুরা।

গতকাল আর পরশু দুর্দান্ত পাবলিসিটির কারণে আগে থেকেই গেঁয়ো লোকজন এসে এখানে হাইওয়ের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। ভিড়ের ভেতর অনেকের হাতেই ফুল আর মালা দেখা যাচ্ছে, মেয়েদের কেউ কেউ শাঁখ নিয়ে এসেছে। ভারতমাতা রথকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এই বিশেষ আয়োজন। অবশ্য আগের গাঁ-টায় এই সব ফুল শাঁখটাখ দেখা যায়নি।

রথ কাছাকাছি এগিয়ে আসতেই শাঁখ বেজে ওঠে। যাদের হাতে ফুলটুল ছিল, তারানাথ মিশ্রর মাটাডোরে খুব ভক্তিভরে অঞ্জলি দেবার মতো করে সেগুলো ছুঁড়ে দেয়।

গ্রাম এলেই ভারতমাতা রথের গতি কমে যায়। ঘাটমপুরাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটে না।

ওদিকে মহাদেও-এর ইঙ্গিতে ব্যান্ড পার্টি ফিল্মের গান থামিয়ে দিয়েছিল। তার বদলে দুমরলালদের মুহুর্মুহু স্লোগানে চারিদিক কেঁপে ওঠে।

'ভারতমাতাকি--'

'জয়।'

'ভবিষ্য যাত্রা—'

'জিন্দাবাদ।'

'ভারতমাতাকে লাল তারানাথজি—'

'জিন্দাবাদ।'

'মহান ধরমকো—'

'রক্ষা কর।'

'মহান ভারতকা—'

'রক্ষা কর।'

স্লোগান থামিয়ে আগের বারের মতোই দুমরলাল রথযাত্রা এবং আধারশিলা প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্য জানিয়ে দেয়। তারপর বঢ়িয়া ভোজনের টোপ নাকের সামনে ঝুলিয়ে মিছিলের জন্য আরও কিছু লোকজন জুটিয়ে ফেলে।

রথের গতি আবার বেড়ে যায়।

এত স্লোগান, ফুল ছোড়া, শাঁখের আওয়াজ, কোনোদিকেই কিন্তু নজর নেই নাটোয়ারের। তার চোখ গোম্‌তীর ওপর স্থির হয়ে আছে।

গোমতী মিছিলের সামনের দিকে, দুমরলালদের টাঙ্গার কাছাকাছি রয়েছে। সে এখনও নাটোয়ারকে দেখতে পায়নি।

এধারে একটানা মাইল তিনেক হাঁটার জন্য ক্লান্তিতে হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে আসছিল ফকিরার। ধুঁকতে ধুঁকতে পা ফেলছে সে। মনে হচ্ছে আর বুঝি পারবে না, মুখ থুবড়ে ঘাড় গুঁজে পড়ে যাবে।

একসময় ফকিরা পাশ থেকে ফ্যাসফেসে, ক্ষীণ গলায় ডাকে, 'নাটুয়া—'

প্রথমটা শুনতে পায় না নাটোয়ার। বার-কয়েক ডাকাডাকির পর ফকিরা যখন তার কাঁধের ওপর হেলে পড়েছে সেই সময় চমকে উঠে ফকিরাকে ধরে ফেলে। ফকিরার ক্লান্ত, ধসে-পড়া চেহারা দেখে রীতিমতো ভয় পেয়ে যায় নাটোয়ার। গোমতীর কথা এখন আর মাথায় নেই তার। উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে চাচা?'

'আমার কোমরটা ভেঙে আসছে।'

'চল, দুমরলালজির কাছে তোমাকে নিয়ে যাই। তোমার বুরা হাল দেখলে জরুর কিরপা করে ছেড়ে দেবে। বলব, আমি তোমাকে গাঁয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। তা হলে আমাকেও আটকে রাখবে না।

ফকিরা আঁতকে ওঠে, 'নেহী নেহী, এতটা রাস্তা এলাম। দুফারের খানা না খেয়ে যাব না। এখন চলে গেলে কে আমাদের খেতে দেবে? তুই আমাকে ধরে ধরে নিয়ে চল।' আকাশের দিকে তাকিয়ে বেলাটা আন্দাজ করে ফের বলে, 'এখন আর মলটারজির হাউলিতে গিয়ে ফায়দা নেই।'

'হাঁ।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে নাটোয়ার।

চলতে চলতে নাটেয়ারের গায়ের ওপর শরীর এলিয়ে দেয় ফকিরা। যত রুগ্ণই হোক, একটা বয়স্ক মানুষের দেহের ভার নিজের দুই হাত এবং বুকের বাঁ পাশে নিয়ে হাঁটতে জিভ বেরিয়ে আসতে থাকে নাটোয়ারের। সেই ভোরবেলা দু'খানা বাসি লিট্টি আর খানিকটা সেদ্ধ রামদানা খেয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। তারপর এক মুহূর্তেও না থেমে মাইলের পর মাইল খোলা আকাশের তলা দিয়ে অনবরত হেঁটে চলেছে। খিদেয় পেটের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। তার ওপর মারাত্মক ক্লান্তি তো রয়েছেই।

ঘাটমপুরার পর চৌহারি, বাজরিয়া, তহশিলা ইত্যাদি গাঁ পেরিয়ে ভারতমাতা রথ একসময় বিরাট এক বাঁকের মাঝখানে এসে যায়। আকাশ-ভরা ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে, সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। বিকেল হতে আর বেশি দেরি নেই।

নাটোয়ার একটু লক্ষ করলে খানিক দূরে হাইওয়ের ডান পাশে একটা বেশ বড় গঞ্জমতো জায়গা দেখতে পেত। কিন্তু কোনোদিকেই তার খেয়াল নেই। নিজের হাত আর বুক ছিঁড়ে পড়লেও খুব যত্ন করে এমনভাবে ফকিরাকে আগলে আগলে নাটোয়ার নিয়ে চলেছে যাতে তার এতটুকু কষ্ট না হয়। কিন্তু নাটোয়ারের চোখ বরাবরই রয়েছে সেই বদ মেয়েমানুষ অর্থাৎ গোমতীর ওপর। নাটোয়ার তাকে ছাড়বে না।

গোমতী শিরদাঁড়া সিধে রেখে সামনে তাকিয়ে দুমরলালের টাঙ্গার পেছন পেছন হেঁটে যাচ্ছিল। হঠাৎ কী কারণে কে জানে সে একবার মুখ ফিরিয়ে তাকায় আর তখনই নাটোয়ারকে দেখতে পায় এবং দেখামাত্রই চিনে ফেলে। মুহূর্তে তার মুখ ভয়ে আতঙ্কে একেবারে রক্তশূন্য হয়ে যায়।

ওদিকে মাইকে তখন মহাদেওজির ভারী গলা ভেসে আসছে, 'ভাইয়ো আইর বহনো, হামলোগ নহরগঞ্জ পঁহুছ গয়ে।'

সঙ্গে সঙ্গে ভারতমাতা রথ-এর বিশাল কনভয় থেমে যায়।

চার

হাইওয়ের ডান পাশে নহরগঞ্জ মাঝারি ধরনের একটা শহর। শহরটার গা ঘেঁষে প্রচুর ধান চাল গেঁহু তিল তিসি ঘি চিনি ইত্যাদি নানা জিনিসের বিশাল বিশাল আড়ত। আছে কাঠের গুদাম, করাত কল, ইটভাটা, আটা চাকি এবং লেদ আর মোটর সারাইয়ের কারখানা। তা ছাড়া মিঠাই, জামাকাপড়, কড়ুয়া তেল থেকে শুরু করে যাবতীয় কিছুর সারি সারি দোকান। হাইওয়ে দিয়ে অজস্র ট্রাক বা বাস চলাচল করে বলে একটা বেশ বড় পেট্রল পাম্পও রয়েছে। বিজলিও এসে গেছে। চারপাশের বিশ পঞ্চাশটা গাঁয়ের মানুষজন তাদের নানা দরকারে এখানে ছুটে আসে।

গঞ্জটা হাইওয়ের গায়েই। জায়গাটা সারাক্ষণই গম গম করতে থাকে।

এই মুহূর্তে অগুনতি মানুষ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাটমপুরা, চৌহারি ইত্যাদি গাঁয়ে দু-চারজনকে ফুল বা শাঁখ হাতে দেখা গিয়েছিল। এখানে প্রায় সবার হাতেই ফুল মালা বা শাঁখ।

ভারতমাতা রথ-এর জন্য তারা বোধহয় অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে। রথটা থামতেই একেবারে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তারানাথ মিশ্রর ওপর চারিদিক থেকে পুষ্পবৃষ্টি শুরু হয়। সেই সঙ্গে ঘন ঘন শাঁখের আওয়াজ।

এরই মধ্যে মাইকে গমগমে গলা চড়িয়ে মহাদেও বলে, 'বোলো ভারতমাতাকি—'

চারপাশের অসংখ্য মানুষ গলা মিলিয়ে সাড়া দেয়, 'জয়—'

রথযাত্রার নানা কাজকর্মকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল তারানাথের লোকজনেরা। সেই অনুযায়ী স্লোগান দেবার কথা দুমরলালের। কিন্তু নহরগঞ্জে পৌঁছে এই দায়িত্বটা সে নিজের হাতেই তুলে নিয়েছে মহাদেও।

মহাদেও থামেনি, সে সমানে চেঁচিয়ে যায়, 'ভবিষ্য যাত্রা—'

'জিন্দাবাদ।'

'তারানাথ মিশ্রজি—'

'জিন্দাবাদ।'

স্লোগানে স্লোগানে বেশ খানিকক্ষণ জায়গাটাকে সরগরম করে রাখে মহাদেও। তারপর একটু থেমে কণ্ঠস্বর খানিকটা নামিয়ে মিছিলের লোকজনের উদ্দেশে বলতে থাকে, 'ভাইয়ো আউর বহনো, আপনারা অনেকটা রাস্তা হেঁটে এসে বিলকুল থকে গেছেন। এখন ওই শামিয়ানার তলায় গিয়ে আরাম করুন। পন্দ্র বিশ মিনিটের ভেতর তারানাথজির আধারশিলা বসানো হয়ে যাবে। তারপর আপনাদের ভোজন করানো হবে। হুড়োহুড়ি করবেন না। ধীরেসে পন্ডালের তলায় গিয়ে বসুন—' বলে খানিক দূরে একটা তেরপলের প্রকাণ্ড প্যান্ডেল দেখিয়ে দেয়।

এতটা হেঁটে আসার ধকলে জীবনশক্তি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ফকিরার। যদিও নাটোয়ার তাকে ধরে ধরে এনেছে তবু তার পা তো ছিল রাস্তার শক্ত, জমাট পীচের ওপর। পা ফেলে ফেলে তাকে নিজের শরীর খানিকটা টানতেও হয়েছে। নাটোয়ারের ওপর পুরোটা নির্ভর করতে হলে তার কাঁধে চড়তে হ'ত। সেটা তো আর সম্ভব ছিল না।

শেষ দিকটায় অসীম ক্লান্তিতে চোখ বুজে গিয়েছিল ফকিরার। চারপাশের হাঁকাহাঁকি আর হইচইতে ধীরে ধীরে তাকায় সে। ডাকে, 'নাটুয়া—'

নাটোয়ার গোম্‌তীর দিকে চোখ রেখেই সাড়া দেয়, 'হাঁ—'

'আর খাড়া থাকতে পারছি না রে, আমাকে কোথাও বসিয়ে দে।'

'সিরিফ বসবে কেন, তোমার শোয়ারও ব্যওস্থা করে দিচ্ছি। আরেকটু কষ্ট করে চল।'

ওধারে ভারতমাতা রথ থেকে তারানাথ মিশ্রকে সসম্মানে এবং বিপুল সমারোহ করে নামানো হয়েছে। তাঁর গলায় এত ফুলের মালা চড়ানো হয়েছে যে সারা শরীর প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে।

শুধু তারানাথ মিশ্রই নামেননি, ট্রাক টাঙ্গা এবং প্রাইভেট কার থেকে রথযাত্রার অন্য লোকজনেরাও নেমে পড়েছে। ট্রাকে যারা ছিল তারা সেই ঢাউস ঢাউস অগুনতি সিলভারের ডেকচি গামলা হাতা এবং পাঁজা পাঁজা শালপাতা নামিয়ে ধরাধরি করে প্যান্ডেলের দিকে চলে যায়। কয়েকজন আবার সিমেন্ট, বালির বস্তা, শ্বেত পাথরেব বড় বড় টুকরো, বেশ কিছু ইট, ইত্যাদি নিয়ে চলেছে।

অন্যদিকে তারানাথ মিশ্রকে সামনে রেখে হাতজোড় করে নহরগঞ্জের লোকজনেরা এবং রথযাত্রার সঙ্গে যারা মোটর আর জিপ টিপে এসেছিল তারা সবাই লাইন করে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে আগের সেই স্লোগানগুলো দিতে দিতে প্যাণ্ডেলের দিকে এগিয়ে যায়।

আর যে হাভাতেরা দল বেঁধে ভারতমাতা রথ-এর পেছনে বঢ়িয়া ভোজনের আশায় মাইলের পর মাইল হেঁটে এসেছে তারাও প্যাণ্ডেলের দিকে চলেছে। তবে অন্যদের মতো ভদ্র এবং শোভনভাবে নয়। ধাক্কাধাক্কি গুঁতোগুঁতি আর হল্লা করতে করতে তারা দৌড়ুচ্ছে। নিয়ম শৃঙ্খলার ব্যাপারগুলো তাদের ভাবনাচিন্তা এবং আচরণের মধ্যে একেবারেই খাপ খায় না। এদের ভয়, আগে না পৌঁছুতে পারলে ভালো ভালো খাদ্যবস্তুগুলো হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

ফকিরাকে জড়িয়ে ধরে দৌড়ুনো সম্ভব না, তবু যতটা জোরে পারা যাচ্ছে, নাটোয়ার পা চালাতে চেষ্টা করছে। তবে গোমতীকে এক পলকের জন্যও নজরের বাইরে যেতে দিচ্ছে না।

নাটোয়ারের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার পর গোমতী প্রচণ্ড ভয়ে কী করবে, প্রথমটা ভেবে উঠতে পারেনি। হয়ত সে পালিয়েই যেত কিন্তু অদৃশ্য এক ফাঁদে সে যেন আটকে গেছে। তা ছাড়া গোমতী খুবই ক্ষুধার্ত। স্রেফ পেটের জন্যই এই ভারতমাতা রথ-এর মিছিলে হাঁটতে শুরু করেছিল।

গোমতী জানে তার সম্পর্কে নাটোয়ারের মনোভাব কতটা হিংস্র এবং বিপজ্জনক। তবুও যে সে পালায়নি তার কারণ দু'টো। প্রথমত, এখান থেকে চলে গেলে এখন অন্য কোথাও খাবার জোটানোর সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয়ত, তার মাথায় তার নিজের মতো অন্য একটা অঙ্কও রয়েছে। ভয়ের মধ্যেও সে ভেবে নিয়েছে, নাটোয়ারের মনে যত রাগ আর আক্রোশই থাক না, রথযাত্রার এত সব লোকজনের সামনে সে তার কোনোরকম ক্ষতি অন্তত করতে পারবে না। তবু নাটোয়ারের ভয়ঙ্কর চাউনি তার বুকের ধকধকানি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। গল গল করে ঘামতে শুরু করেছিল সে। গোটা রাস্তাটা নায়োটারকে এড়ানোর জন্য মিছিলের অন্য লোকেদের আড়ালে আড়ালে থাকতে চেষ্টা করেছিল গোমতী কিন্তু নাটোয়ারের চোখে ধুলো দেওয়া যায়নি।

দলে দলে মিছিলের লোকজন প্যান্ডেলের দিকে দৌড়ুচ্ছে। গোমতী তাদের সঙ্গে বেমালুম মিশে যায়। হাইওয়ে থেকে নেমে বেশ কিছুক্ষণ নাটোয়ার তাকে চোখে চোখে রাখতে পেরেছিল কিন্তু একসময় গোমতীকে আর দেখা যায় না।

তবে কি আওরতটা শেষ পর্যন্ত পালিয়েই গেল? এত বছর বাদে প্রায় হাতের মুঠোতেই তাকে পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু স্রেফ ফাঁকি দিয়েই সে উধাও হয়েছে। রাগে, প্রতিহিংসায় এবং আপশোশে নাটোয়ারের মাথা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। মনে মনে অকথ্য গালাগাল দিয়ে ফকিরাকে সে বলে, 'চাচা, মনে হচ্ছে রেন্ডিটা ভেগে গেছে।'

ফকিরা বলে, 'নেহী। চার পাঁচ মিল হাঁটল, সে কি ভাগার জন্যে? জরুর না খেয়ে যাবে না। কোথাও না কোথাও ঠিক আছে। লেকেন—'

'কা?'

'যে আওরত চার সাল আগে তোকে ছেড়ে চলে গেছে তার কথা অত ভাবছিস কেন?'

নাটোয়ার উত্তর দেয় না। তার কপালের শিরাগুলো শুধু একটানা দপ দপ করতে থাকে।

ফকিরা অনেক কষ্টে দুই চোখের পাতা ওপরে তুলে নাটোয়ারের দিকে তাকায়। তারপর বলে 'কা রে, বিলকুল চুপ হয়ে আছিস যে?'

নাটোয়ার বলে, 'কী বলব?'

ফকিরা বলে, 'ও আওরত পুরা বরবাদ হয়ে গেছে। ওর চিন্তা মাথা থেকে বার করে দে। দুমরলালজির হাতে-পায়ে ধরে এখন খাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেল। ভুখে জান বেরিয়ে যাচ্ছে।'

নাটোয়ার নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলে, 'হাতে-পায়ে ধরে ফায়দা নেই। ওদের যখন মর্জি হবে তখন দেবে।'

ফকিরার জীর্ণ পাঁজর তোলপাড় করে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সে বলে, 'হাঁ, ওদের মর্জির ওপর কথা নেই।'

হাইওয়ে থেকে প্যাণ্ডেলটা মিনিট পাঁচেকের পথ। প্যান্ডেল আর কী, অনেকটা জায়গা জুড়ে লম্বা লম্বা বাঁশ পুতে সেগুলোর মাথায় রোদের তেজ ঠেকাবার জন্য তেরপল চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে আকাশে আজ মেঘের যা আনাগোনা তাতে প্যান্ডেল না বানালেও চলত। দু-একদিন আগে অবশ্য তেমন মেঘ টেঘ ছিল না। রথযাত্রাওয়ালারা তো হাত গুনতে জানে না। তারা কীভাবে টের পাবে, আজ অদৃশ্য দিগন্তের ওপার থেকে দলে দলে মেঘের টুকরোগুলো উত্তর বিহারের এই এলাকাটায় হানা দিতে শুরু করবে।

মাথার ওপর ছাউনির ব্যবস্থা হয়েছে ঠিকই কিন্তু নিচে এবড়ো খেবড়ো রুক্ষ কাঁকুরে মাটি। ওর ওপরেই কোথাও গাদাগাদি করে, কোথাও বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়েছে হাভাতের দল। ফকিরাকে নিয়ে নাটোয়ারও প্যান্ডেলের এক কোণে চলে আসে। এধার ওধার তাকিয়ে সে বুঝতে পারে মাটিতে ফকিবাকে শোয়ানো যাবে না। তা হলে তার হাড় বার-করা গায়ের কাঁকর ফুটে যাবে, অথচ খানিকক্ষণ শুয়ে নিতে পারলে ক্লান্তিটা অনেক কেটে যেত ফকিরার, তারপর পেটে কিছু পড়লে চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারত। আসলে চাঙ্গা হওয়াটা তার পক্ষে খুবই জরুরি। কেননা, এই নহরগঞ্জে থেমে গেলেই চলবে না, তাদের আরও কয়েক মাইল হেঁটে পৌঁছুতে হবে নমকিপুরায়। রথযাত্রায় জুটে গিয়ে এক বেলার 'ভোজন' হল সাময়িক ঠেকনা দেওয়া, তাদের আসল কামাইয়ের ব্যবস্থা তো মিলিটারি সিং-এর হাতে।

নাটোয়ার একটা মোটা বাঁশের খুঁটির গায়ে ফকিরাকে ঠেসান দিয়ে বসিয়ে দেয়। বলে, 'চাচা, তুমি থোড়া আরাম কর। আমি খানা-উনার খবর নিয়ে আসি।'

ফকিরার চোখ বুজে এসেছিল। নির্জীব গলায় সেই অবস্থাতেই বলে, 'ঝুট।'

নাটোয়ার চমকে ওঠে, 'কা ঝুট?'

'খানা-উনার খবর নিতে তুই থোড়াই যাচ্ছিস।'

'তা হলে কী করতে যাচ্ছি?'

'তোর পুরানো ঘরবলীকে খুঁজতে।'

হকচকিয়ে যায় নাটোয়ার। আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে ফকিরার দিকে তাকাতে পারছিল না সে। কোনোরকমে 'নেহী' বলতে বলতে সে প্যান্ডেলের অন্য দিকে চলে যায় এবং ঘুরে ঘুরে ভিড়ের ভেতর গোমতীকে খোঁজাখুঁজি করতে থাকে।

পাঁচ

হাইওয়ে থেকে চোখে পড়েনি কিন্তু প্যান্ডেলেব তলা থেকে বাঁয়ে তাকালে দেখা যায়, ডান পাশে লাল শালু আর মখমল দিয়ে বানানো ছোটো কিন্তু চমৎকার একটা চাঁদোয়াও রয়েছে। এতক্ষণ সেটা প্যান্ডেলের আড়ালে ঢাকা পড়ে ছিল।

নহরগঞ্জের লোকজন—বিশেষ করে পয়সাওয়ালা আড়তদার, বড় বড় ব্যাপারী, জমিমালিক আর নানা ধরনের কারখানাওয়ালা—সেই সঙ্গে রথযাত্রার উদ্যোক্তারা তারানাথ মিশ্রকে সোজা সেই চাঁদোয়ার তলায় নিয়ে গিয়ে একটা গদি-মোড়া মহা আরামদায়ক চেয়ারে বসায়। বেশ কয়েকজন হাতজোড় করে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে। এদের সঙ্গে দু'টি ঝকঝকে যুবক এবং একটি তরুণীকে দেখা যায়। যুবকদের পরনে দামি প্যান্ট আব শার্ট। মেয়েটিরও তাই। তিনজনেরই কাঁধে ক্যামেরা এবং হাতে বল পেন আর নোট বই। এরা রথযাত্রার কনভয়ে সেই মোটরটায় বসে ছিল। বোঝা যায়, এরা এ অঞ্চলের গাঁ, এমনকি টাউনের বাসিন্দা নয়। নিশ্চয়ই পাটনা বা কলকাতার মতো ভারী শহর থেকে এসেছে।

চাঁদোয়ার তলায় পুরো জায়গাটা মাটি কেটে সমান করে, ধুয়ে, নিকিয়ে, তকতকে করে রাখা হয়েছে। একধারে কাঠের নিচু টুলের ওপর রয়েছে একটা মাইক। ঠিক মাঝখানে খানিকটা চৌকো অংশ তামার চকচকে রড পুঁতে, সেগুলোর গায়ে তামারই তিন ফেরতা টান টান চেইন দিয়ে ঘেরা।

ট্রাক থেকে যারা সিমেন্ট বালি ইটটিট নামিয়ে নিয়ে এসেছিল তারা তাদের মালপত্র ঘেরা জায়গাটার পাশে রেখেছে। একজন কোত্থেকে যেন দু'টো পেল্লায় বালতি বোঝাই করে জল নিয়ে আসে।

তারানাথ মিশ্রর চেয়ারটার ডান পাশে তাঁর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল মহাদেও। তারানাথ তাকে ডেকে নিচু গলায় কিছু বলেন। মহাদেও মাথা কাত করে সায় দেয়। তারপর ভীষণ ব্যস্তভাবে মাইকের সামনে গিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, 'ভাইয়ো আউর বহনো, আমাদের পরম পূজ্য আদরণীয় শ্রীমান তারানাথ মিশ্রজি এখন আধারশিলা বসাবেন। তার আগে আপনাদের সামনে দো-চার বাত বলবেন। কৃপা করে আপনারা সবাই ছোটা পন্ডালের কাছে এসে দাঁড়ান, শুধ্ মনে তাঁর কথা শুনুন। আইয়ে, চলা আইয়ে—'

প্যান্ডেল এবং চাঁদোয়ার অনেকগুলো খুঁটিতে লম্বা মুখওলা লাউডস্পিকার বাঁধা রয়েছে। মুহূর্তে মহাদেও-এর কণ্ঠস্বর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

যে হাভাতের দল বড় প্যান্ডেল পা ছড়িয়ে বসে ছিল তারা তটস্থ হয়ে উঠে পড়ে এবং চাঁদোয়ার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়ায়।

এমনকি যে নাটোয়ার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে গোম্‌তীকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, সে-ও থমকে যায়। আপাতত খোঁজাখুঁজি স্থগিত রেখে পায়ে পায়ে চাঁদোয়ার কাছে চলে আসে। মহাদেও-এর ডাক অগ্রাহ্য করার সাহস বা স্পর্ধা কোনোটাই নেই তার।

সবাই এসেছে, শুধু একজন বাদে। সে ফকিরা। তার পক্ষে এখন একটা কদম বাড়ানোও অসম্ভব।

ওদিকে ঘোষণাটি করার পর মহাদেও মাইকের সামনে থেকে সরে যায় আর চেয়ার থেকে উঠে তারানাথ মিশ্র সোজা সেখানে গিয়ে দাঁড়ান। মাইকটা এক হাতে ধরে এভাবে শুরু করেন, 'ভাইয়ো আউর বহনো, আজ দেশকা বহুত ভারী দুর্দিন। যেদিকে তাকাবেন গরিবি, ভুখ, ভ্রষ্টাচার, মহাপাপ, স্বজনপোষণ! গরিব দিনের পর দিন আরও গরিব হচ্ছে, ভুখা আরও ভুখা। আপনারা যারা গাঁওয়ের মানুষ, পিছড়ে বর্গকা আদমি, তাদের জন্যে এই দেশে ভাবার কেউ নেই। লেকিন কেউ যদি না ভাবে, আপনাদের দিকে হাত বাড়িয়ে না দেয়, এই দেশ বিলকুল খতম হয়ে যাবে। এই দুখদ সময়ে আমি ঘরে বসে থাকতে পারিনি। ভেবেছি কিছু একটা করতে হবে, তাই এই ভারতমাতা রথ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি।'

তারানাথের ঘি-মাখন-চোঁয়ানো বিপুল শরীরের তুলনায় গলার স্বরটি ভীষণ সরু আর পাতলা ফিনফিনে। হঠাৎ শুনলে মনে হয় কোনো বাচ্চা কথা বলছে। তারানাথের দিকে তাকিয়ে তাঁর গলা শুনলে খুবই বেখাপ্পা লাগে।

ওধারে সেই তিন যুবক-যুবতী ক্যামেরা বার করে চটপট তারানাথের ফোটো তুলতে থাকে।

তারানাথ মিশ্র থামেননি, 'মহাদেওজির কাছে আপনারা আগেই শুনেছেন, আমি এবার এই এলাকা থেকে চুনাওতে নেমেছি। পয়সা আউর ক্ষমতার লালচ আমার নেই। আমি চাই আপনাদের ভালাই। আপনারা সুখে থাকবেন, দু'বেলা ভরপেট 'ভোজন' করতে পারবেন, আপনাদের ছেলেমেয়েরা সচমুচ শিক্ষা পেয়ে মানুষ হয়ে উঠবে—এ সব আমার স্বপ্ন। তবে স্বপ্ন দেখলেই তো হয় না, কাজ করে দেখাতে হয়। তাই ভালো ভালো কাজের জন্যে আমি আধারশিলা বসাতে বসাতে চলেছি। এই নহরগঞ্জে আমি একটা কলেজ বানিয়ে দেবো, যাতে আপনাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা উচ্চ শিক্ষা পেয়ে দেশকে রোশনিতে ভরে দেবে। চুনাও-এর আগে আগাম শিলান্যাস করে রাখছি। এ হল ভবিষ্য ভারতের আধারশিলা। লেকিন কলেজটা শেষ পর্যন্ত হবে কি না-হবে, সেটা বিলকুল আপনাদের ওপর নির্ভর করছে। আপনারা যদি ভোট দিয়ে আগলা চুনাওতে জিতিয়ে দেন, তবেই এটা সম্ভব। আমি আপনাদের ওপর পুরা ভরসা রাখছি।'

বক্তব্য শেষ করে তামার রড দিয়ে ঘেরা এই চৌকো জায়গাটার কাছে চলে আসেন তারানাথ। এর মধ্যে কখন যেন দু'টো লোক জলে বালি আর সিমেন্ট গুলে তা দিয়ে ইট গেঁথে সেখানে একটা বেদী বানিয়ে ফেলেছে। পাশেই রয়েছে একটা শ্বেতপাথরের বড় ফলক।

তারানাথ আসতেই একটা লোক পাথরের ফলকটা বেদির গায়ে খাড়া করে ধরে রাখে। দ্বিতীয় লোকটা লোহার কর্ণিকে গোলা সিমেন্ট বালি তুলে সসম্ভ্রমে তারানাথের হাতে দেয়। তারানাথ সেই সিমেন্ট-বালি ফলকের পেছনে এমনভাবে লাগিয়ে দিতে থাকেন যাতে সেটা বেদির গায়ে আটকে যায়।

মহাদেও ফের মাইকের কাছে গিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'সবাই বল ভারতমাতাকি—'

নহরগঞ্জের আকাশ বাতাস তোলপাড় করে জমিমালিক, আড়তদার থেকে শুরু করে ভুখা হাভাতেরা গলার সবটুকু শক্তি দিয়ে চেঁচায়, 'জয়।'

'তারানাথ মিশ্র—'

'জিন্দাবাদ।'

'ভবিষ্য যাত্রা—'

'জিন্দাবাদ।'

'আগলা চুনাওমে কৌন জিতেগা—'

'তারানাথ মিশ্র, তারানাথ মিশ্র।'

শিলান্যাসটি সুচারুভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর মহাদেও স্লোগান থামিয়ে এবার বলে, 'আজ ভারতমাতা রথ নহরগঞ্জে থেকে যাবে। কাল সকালে আবার রথযাত্রা শুরু হবে। ভাইয়ো আউর বহনো, আপনারা এবার বড় প্যান্ডেলে ফিরে যান। পাঁচ মিনিটের ভেতর আপনাদের 'ভোজন'-এর ব্যওস্থা হচ্ছে। আপনাদের কাছে এক নিবেদন, কাল সুবেহ সুবেহ এখানে এসে রথযাত্রায় শামিল হবেন। যে ক'দিন আধারশিলা বসানো হবে, রোজ দুফারে আপনাদের বঢ়িয়া 'ভোজন' করানো হবে। আপনাদের ওপর ভরসা আছে, রোজ আমাদের সঙ্গে শামিল হয়ে তারানাথজির আশা 'পুরণ' করবেন আর আপনাদের নিজেদের ভালাই-এর জন্যে রথযাত্রা সফল করবেন। বলুন 'ভারতমাতাকি—'

জয়ধ্বনি দিয়ে হাভাতেরা ফের বড় প্যান্ডেলে ফিরে আসে। তাদের সবার সঙ্গে নাটোয়ারও। সে সোজা গিয়ে ফকিরার পাশে বসে পড়ে। ফকিরার চোখমুখের চেহারা দেখে কিছু একটা আন্দাজ করে নেয় সে। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'মালুম হচ্ছে, তুমি আধারশিলা বসানো দেখতে যেতে পারনি।'

ফকিরা বলে, 'কী করে যাই? আমার হাল তো দেখছিস।'

উদ্বিগ্ন মুখে নাটেয়ার বলে, 'তুমি যে যাওনি, দুমরলালজিরা টের পেয়েছে?'

'টের পেলে কি আর এতক্ষণ জিন্দা থাকতাম!' ফকিরার মুখে ফিকে হাসি ফোটে।

একটু চুপচাপ।

তারপর ফকিরা চোখের কোণ দিয়ে নাটোয়ারকে লক্ষ করতে করতে ডাকে, 'এ নাটুয়া—'

'হাঁ।'

'যাকে খুঁজতে গিয়েছিলি তাকে পেলি?'

'নেহী. শালী উধাও হয়ে গেছে।'

ওদের কথাবার্তার মধ্যে দুমরলাল এবং আরও সাত-আটজন শালপাতার ঠোঙায় চারখানা করে শুকনো চাপাটি, ঠাণ্ডা খানিকটা ভাজি আর কয়েক দানা বুন্দিয়া সবার হাতে হাতে দিতে থাকে।

নাটোয়ার তার চাপাটি-টাপাটি বুঝে নিয়ে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ে। বলে, 'দুমরলালজি. সিরিফ চারগো! আউর দো চারগো দিজিয়ে না--'

চারপাশ থেকে আরও অনেকে তার সঙ্গে গলা মেলায়, 'দিজিয়ে না, দিজিয়ে না—'

দুমরলাল প্রথমে ভালো কথায় বোঝাতে চেষ্টা করে। মাথাপিছু চারখানা করে চাপাটিই বরাদ্দ করা হয়েছে। তার বেশি দেওয়া সম্ভব নয়। আসছে চুনাওতে তারানাথজি জিতলে এমন ভোজ খাওয়ানো হবে যে সাত রোজ আর কেউ বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না।

কবে চুনাও হবে, আর কবে তারানাথ মিশ্র সেই চুনাওতে জিতবেন, তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে? হাভাতেরা দূর স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত মাথা ঘামায় না, নগদ ব্যাপার নিয়েই তারা ব্যতিব্যস্ত। নাটোয়ার বলে, 'দুমরলালজি আপনি বলেছিলেন, বঢ়িয়া ভোজন করাবেন। লেকেন—' বলতে বলতে খুব সম্ভব ভয়েই থেমে যায়।

দুরমলাল এবার বেশ বিরক্তই হয়। তার কপাল এবং ভুরু কুঁচকে যায়। চোয়াল শক্ত করে নাটোয়ারের দিকে তাকিয়ে বলে, 'শালে, বঢ়িয়া ভোজন ছাড়া কী! নিজের ঘরে রোজ কী খাস? মালাই-পোলাও?'

বেজায় ঘাবড়ে যায় নাটোয়ার। ঢোক গিলে বলে, 'নেহী নেহী। তবে—'

'কী?'

'সাত আট 'মিল' পথ হেঁটে এলাম। পেটে আগ জ্বলছে দুমরলালজি। চারগো চাপাটিতে ভুখ মরবে না।'

'আরে ভুচ্চরকি ছৌয়া, আমাদের জন্যে কি হেঁটেছিস!' সিরেফ আপনা ভালাইকে লিয়ে ভারতমাতা রথ-এর সঙ্গে এসে কেত্তে বড় 'পুণ' করেছিস, জানিস? তার ওপর চার চারগো চাপাটি মুফত মিলে গেল। এখন আবার বাহানা কত—আরও চাই! শালেদের পেট তো নয়, পুরা এক একগো গুদাম।' গুদামের উপমা দিয়ে দুমরলাল বোধ হয় মনে মনে খানিকটা খুশিই হয়। সে ফের বলতে থাকে, 'যা পেয়েছিস শির ঝুঁকিয়ে খেয়ে যা।'

উৎকৃষ্ট ভোজনের লোভ দেখিয়ে এতটা রাস্তা হাঁটিয়ে আনার পর সামান্য ক'খানা চামড়ার মতো শক্ত চাপাটিতে পেটের একটি কোণও ভরবে না। পোলাও-মালাই না পাওয়া যাক, পেট ভরার মতো খাবারটা তো দেবে। তারা গরিবের চেয়েও গরিব। রথযাত্রাওয়ালাদের এরকম জঘন্য ধাপ্পাবাজিতে ক্ষোভে রাগে হঠাৎ মাথার ভেতর আগুন ধরে যায় নাটোয়ারের। খেপে উঠে সে কিছু বলতে যাচ্ছিল।

কিন্তু তার আগেই ফকিরা তার একটা হাত চেপে ধরে। খুব চাপা গলায় বলে, 'শান্ত্ হো যা নাটুয়া। মাথা গরম করিস না।' নাটোয়ার খেয়াল করেনি, দুমরলালের সঙ্গে কথাবার্তার সময় আগাগোড়া ফকিরা তার ওপর নজর রেখে যাচ্ছিল এবং মুখচোখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল।

নিজেকে খানিকটা সামলে নেয় নাটোয়ার। ফকিরা ঠিক সময়েই তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। কেননা সে বুঝতে পারে, এখন উত্তেজনার ঝোঁকে কিছু করে বসলে তার ফল হবে মারাত্মক। দুমরলালরা তার হাড়-মাংস আলাদা করে ফেলবে। ঘাড় গোঁজ করে অগত্যা খেতে শুরু করে নাটোয়ার। গোড়াতেই রথযাত্রাওয়ালা যদি সাফ সাফ জানিয়ে দিত, শুখা চাপাটি খাওয়াবে, তাদের আক্ষেপ থাকত না। কিন্তু বঢ়িয়া ভোজনের নামে ওরা এতগুলো গরিব মানুষের লোভটাকে উসকে দিয়েছে। তারা স্বপ্ন দেখেছিল দুনিয়ার সবচেয়ে সুস্বাদু, সবচেয়ে দুর্লভ খাদ্য তাদের দেওয়া হবে। তার বদলে এমন নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনায় এখন নাটোয়ারের চোখে জল এসে যায়।

নাটোয়ারের মনোভাব বুঝতে পারছিল ফকিরা। সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বলে, 'আমাদের নসিবই অ্যায়সা নাটুয়া। কী আর করা যাবে বল। যা মিলেছে তা-ই খা। ভুখা থাকার চেয়ে তবু পেটে কিছু পড়বে। না খেলে আর হাঁটতে পারবি না।'

ঘাড় গোঁজ করে নিঃশব্দে খাওয়া শুরু করে নাটোয়ার। ফকিরাও দুনিয়ার সবটুকু খিদে নিয়ে গোগ্রাসে চাপাটি খেতে থাকে।

বেলা আরও ঢলে পড়েছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে যে রোদটুকু চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসছে তার তেজও তেমন নেই। আরামদায়ক জলকণাহীন ফুরফুরে হাওয়া নহরগঞ্জের ওপর দিয়ে দূরে হাইওয়ের ওধারে ফাঁকা মাঠের দিকে হু হু বয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ কার ডাক কানে আসতে মুখ তোলে নাটোয়ার। দেখে সেই ঝকঝকে চেহারার তিন যুবক-যুবতী তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের একজনের হাতে একটা টেপ-রেকর্ডার, অন্য একজনের হাতে ক্যামেরা। শুধু যুবতীটির হাতে কিছু নেই। তার গলাই শুনতে পেয়েছিল নাটোয়ার।

তরুণী বলে, 'আপনার নাম?'

নাটোয়ার অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার মতো হতচ্ছাড়া চেহারার দেহাতিদের কাছে এইরকম দামি দামি পোশাক-পরা সুন্দর চেহারার ছেলেমেয়েরা এসে দাঁড়াবে, সে ভাবতেও পারেনি। সসম্ভ্রমে নাটোয়ার বলে, 'আপলোগ?'

তরুণীটি বলে, 'আমরা পত্রকার।'

পত্রকার ব্যাপারটা মাথায় ঢোকে না নাটোয়ারের। সে জিজ্ঞেস করে, 'পত্রকার মতলব?'

'খবরের কাগজ দেখেছেন তো?'

'হাঁ হাঁ, জরুর।'

'আমরা সেখানে কাজ করি।'

কতটা কী বুঝল নাটোয়ারই জানে। সে আস্তে মাথা কাত করে বলে, 'অব সমঝ গিয়া। আপ, কাঁহাকে রহনেবালে হ্যায়?'

তরুণী উত্তর দেয়, 'পাটনা।' নিজের দুই সঙ্গীকে দেখিয়ে বলে, 'এরা আমার বন্ধু। আমরা তিনজন তিন খবরের কাগজ থেকে এসেছি। আপনাদের সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই।'

বিমূঢ়ের মতো নাটোয়ার বলে, 'কহিয়ে—'

'আপনারা কবে থেকে ভারতমাতা রথ-এর সঙ্গে ঘুরছেন?'

'আজসে। তবে শুনেছি, অনেকে কাল থেকেই ঘুরছে।'

নাটোয়ার খেয়াল করেনি, একটি যুবক টেপ রেকর্ডার চালিয়ে তার কথাগুলো ধরে রাখছে।

তরুণী জিজ্ঞেস করে, 'এই ভারতমাতা রথ-এর সঙ্গে ঘুরতে কেমন লাগছে?'

'বঢ়িয়া ভোজন'-এর কথা বলে সামান্য ক'খানা শুকনো চাপাটি দেওয়ায় মেজাজ আগেই খারাপ হয়ে ছিল নাটোয়ারের। সে বলে, 'বহোত বহোত বুরা। 'মিল'-এর পর 'মিল' হাঁটতে কাব আর ভালো...'

কিন্তু কথাটা আর শেষ করতে পারে না নাটোয়ার। তার আগেই পাঁজরায় ফকিরার কুনইয়ের খোঁচা খায়। ইঙ্গিতটা পরিষ্কার। অচেনা লোকেদের কাছে এ জাতীয় কথা বলা ঠিক নয় সেটা তক্ষুনি বুঝতে পারে নাটোয়ার। কে বলতে পারে পাটনার এই পত্রকারদের মারফত রথযাত্রা সম্পর্কে তার অপ্রিয় কটু মতামত দুমরলালদের কানে গিয়ে উঠবে না? সেটা তার পক্ষে যথেষ্ট বিপজ্জনক। পলকে হুঁশিয়ার হয়ে নাটোয়ার বলে, 'নেহী নেহী, আচ্ছাই লাগতা হ্যায়। ভারতমাতা রথ-এর সঙ্গে যাওযাটা বহোত 'পুণ'কা কাম।'

তরুণীটির ঠোঁটে বাঁকা একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়। চোখ সামান্য কুঁচকে মজার গলায় সে বলে, 'স্রেফ' 'পুণ'-এর জন্যে এসেছেন, না খাওয়ার লোভে?'

এই ছোকরি পত্রকারকে ধোঁকা দেওয়ার কোনো উপায়ই নেই। শ্বাস-টানা গলায় নাটোয়ার বলে, 'নেহী নেহী—'

মেয়েটি এ প্রসঙ্গে আর কোনো প্রশ্ন করে না। একেবারে অন্য কথায় চলে যায়, 'তারানাথ মিশ্র, এই যে রথযাত্রায় বেরিয়েছেন তাতে আপনাদের কিছু লাভ হবে?'

একটু চিন্তা করে নাটোয়ার বলে, 'এত্তে বড়ে আদমি যখন রথ নিয়ে বেরিয়েছেন, জরুর ফায়দা হবে।'

তরুণীটি তার সঙ্গীদের দিকে ফিরে হাসে। ইংরেজিতে বলে, 'ইলিটারেট হলে কী হবে, ভেরি কেয়ারফুল অ্যান্ড ডিপ্লোম্যাটিক।'

দুই যুবক তরুণীর দিকে তাকিয়ে আস্তে মাথা কাত করে সায় দেয়, 'রাইট, রাইট।'

নাটোয়ারের কাছে এই সব ইংরেজির একটি বর্ণও বোধগম্য নয়। তবে এটুকু সে বোঝে, তারই সম্বন্ধে ওরা আলোচনা করছে।

তরুণী আবার নাটোয়ারের দিকে মুখ ফেরায়। প্রশ্ন করে, 'তারানাথজি বলেছেন, চুনাওতে জিতলে এখানে কলেজ করে দেবেন। তার জন্যে আধারশিলাও বসালেন।'

'হাঁ।'

'কলেজ হলে আপনাদের ভালো হবে?'

'হামনিলোগ নেহী জানতা। তব্—'

'তব্ কী?'

'রথবালারা যখন বলছে তখন' জরুর ভালাই হবে।'

'তারানাথজি কি জিতবেন?'

'কৌন জানে। তব্ এত্তে বড়ে আদমি যখন চুনোওতে নামতে যাচ্ছেন, মালুম হোতা জরুর জিতবেন।'

যে যুবকটির হাতে ক্যামেরা রয়েছে এবার সে নাটোয়ার এবং ফকিরার ফোটো তুলে নেয়। তারপর তিন পত্রকার নাটোয়ার আর ফকিরার সামনে থেকে অন্যদের কাছে চলে যায়। সবাইকে এই রথযাত্রা, আগামী নির্বাচন, সেই নির্বাচনে তারানাথ মিশ্রর জেতার সম্ভাবনা আছে কি না, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করে তাদের জবাবগুলো টেপ-এ তুলে নেয় এবং প্রতিটি দেহাতির ফোটো তোলে।

খেতে খেতে নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের ফোটোক খিঁচল কেন চাচা?'

'কৌন জানে!' ফকিরা এরপর যা বলে তা এইরকম। লোকে পঞ্ছী, পাহাড়, সমুন্দর, ময়ূর, হরিণ শের, সুন্দর সুন্দর মানুষ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তোলে। কিন্তু তাদেব মতো গা থেকে খই-ওড়া হতচ্ছাড়া চেহারার ভুখা আধন্যাংটো দেহাতিদের ছবি তুলে বড় টৌনের পত্রকারদের কী ফায়দা হবে, কে বলবে। নিশ্চয়ই ওই তিন পত্রিকার মাথায় কিছু গোলমাল রয়েছে। কতরকম 'আজীব' মানুষ যে দুনিয়ায় জন্মেছে।

'হাঁ—' আবছাভাবে উত্তর দিয়ে আস্তে ঘাড়টা কাত করে দেয় নাটোয়ার।

ওদিকে চাঁদোয়ার তলা থেকে মহাদেও-এর ভারী গমগমে গলা ভেসে আসে। 'ভাইয়ো আউর বহনো, আপনাদের যাদের যাদের ইচ্ছে, রাতটা এখানে প্যাণ্ডেলের তলায় থেকে যেতে পারেন। কাল ভোরসে ফির রথযাত্রা শুরু হবে। এখন আপনাদের বহোত দরকার। আজকের মতো কালও তারানাথজির আধারশিলা বসানোর পর বঢ়িয়া ভোজন করানো—'

মহাদেও-এর কথা শেষ হওয়ার আগে নাটোয়ারের বাঁ ধারের কয়েকটি দেহাতি চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, দশ 'মিল' গতরচূরণ হাঁটার পর চামড়ার মতো চারগো শুখা চাপাটি! আমরা আর এর ভেতর নেই। খেয়েই এখান থেকে ভেগে যাব, ইত্যাদি। কেউ কেউ আবার বলে, দশ 'মিল' হাঁটলে তবু তো একবেলার খাবার পাওয়া যাচ্ছে। এখান থেকে গেলে তা-ই বা আমাদের কে দিচ্ছে! রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেবো। যে ক'টা দিন রথ চলবে একটা বেলা খাদ্য তো মিলবে। তারপর দেখা যাবে।

নাটোয়ার এবং ফকিরা ভেগে পড়ার দলে। নাটোয়ার বলে, 'চাচা, খাওয়া হলেই নমকিপুরা রওনা হবে?'

আকাশের দিকে তাকিয়ে বেলাটা আন্দাজ করে নেয় ফকিরা। বলে, 'এতটা রাস্তা হেঁটে বহোত থকে গেছি। মনে হচ্ছে হাড্ডিউড্ডি ভেঙে চুর চুর হয়ে গেছে। আজ আর পারব না। কাল ভোরে অন্ধেরা থাকতে থাকতেই আমরা ভেগে পড়ব।'

'সেই ভালো।' বলতে বলতে হঠাৎ নাটোয়ারের চোখে পড়ে, ডান দিকে প্যাণ্ডেলের একেবারে শেষ মাথায় একটা খুঁটির আড়ালে বসে চাপাটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে গোম্‌তী। তার মানে সে পালিয়ে যায়নি। নাটোয়ার কিছুক্ষণ আগে যখন তাকে খোঁজাখুঁজি করছিল সেই সময় সে নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে ছিল। মুহূর্তে যে রাগ এবং আক্রোশটা চাপা পড়ে গিয়েছিল, সেটা মাথার ভেতরে নতুন করে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেয়। মুখ পাথরের মতো শক্ত হয়ে ওঠে তার। আবার যখন গোম্‌তীকে দেখা গেছে, লহমার জন্যেও তাকে চোখের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না।

গোম্‌তীও নাটোয়ারের ওপর নজর রেখেছিল। চোখের কোণ দিয়ে আড়ে আড়ে তার আগেকার মরদকে দেখতে দেখতে দ্রুত চাপাটি খেয়ে যাচ্ছিল সে।

নাটোয়ার আগের মতো তাড়াহুড়ো করে না। সে জানে, এত লোকজনের মধ্যে গোম্‌তীর গায়ে একটা আঁচড়ও কাটা যাবে না। সুযোগের জন্য তাকে ওত পেতে বসে থাকতে হবে। গোম্‌তীকে নির্জনে একা একা কোথাও পাওয়া দরকার।

এই সময় ব্যান্ডপার্টির বাজনা ফের ভেসে আসে। অনেকক্ষণ থেমে থাকার পর বাজনদারেরা নতুন উদ্যমে বাজাতে শুরু করে দিয়েছে। 'বোল রাধা বোল, সঙ্গম হোগা কি নেহী—' রথযাত্রায় যারা মিছিল করে এসেছিল তাদের 'ভোজন'-এর সময় দিলচস্‌প গান বাজিয়ে আনন্দ দেওয়া হচ্ছে।

ব্যান্ডপার্টিটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছে না, গোটা প্যান্ডেলের ধার দিয়ে, কখনও বা ভেতরে ঢুকে বাজাতে বাজাতে চলেছে। প্রাণের ভেতর 'লহর তোলা' গানটা নিয়ে আদৌ মাথাব্যাথা নেই নাটোয়ারের। সে পলকহীন সজাগ চোখে গোম্‌তীর ওপর লক্ষ রেখে যাচ্ছে। কিন্তু আচমকা ব্যান্ডপার্টিটা গোম্‌তীর এধারে এসে পড়ে এবং সে বাজনদারদের আড়ালে পড়ে যায়। এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না।

নাটোয়ার অস্থির হয়ে ওঠে। কখনও ঘাড় হেলিয়ে, কখনও তেরছা হয়ে বসে, কখনও বা হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে খানিকটা উঁচু হয়ে বাজনদারদের বাদ্যযন্ত্র বা পায়ের ফাঁক দিয়ে গোম্‌তীকে দেখতে চেষ্টা করে, কিন্তু বৃথাই।

এক মিনিটও নয়, তার অনেক আগেই ব্যাণ্ডপার্টি ডান দিকে চলে যায় কিন্তু গোম্‌তীর চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। বদ আওরতটা বাজনদারদের আড়ালে পড়ামাত্র উধাও হয়ে গেছে।

নাটোয়ারের খাওয়া শেষ হয়নি। তবু লাফিয়ে উঠে পড়ে সে, দৌড়ে সেই খুঁটিটার দিকে যায়, তারপর ডাইনে-বাঁয়ে, এমনকি ওধারে যেখানে মখমলের চাঁদোয়ার তলায় আধারশিলা বসানো হয়েছে, সেখানেও দেখে আসে। কিন্তু নেই নেই, কোথাও নেই গোম্‌তী, বেমালুম হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে আওরতটা।

রাগটা মাথার ভেতর দপ্‌ দপ্‌ করতে থাকে নাটোয়ারের। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড হতাশাও। ভূচ্চরের ছৌয়া আওরতটাকে বার বার হাতের কাছাকাছি পেয়েও শেষ পর্যন্ত ধরা যাচ্ছে না।

এলোমেলো পা ফেলে আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসে নাটোয়ার। শালপাতার থালায় এখনও দেড়খানা চাপাটি পড়ে আছে। সেদিকে নজর নেই তার। নিজের ভেতর গনগনে আগুনের অসহ্য জ্বালা নিয়ে জ্বলন্ত চোখে দূরে মাঠের দিকে তাকিয়ে সে বসে থাকে।

ফকিরা কিছু একটা আন্দাজ করে নিয়েছিল। সে জিজ্ঞেস করে, 'খেতে খেতে আচানক কোথায় গিয়েছিলি?'

চমকে মুখ ফেরায় নাটোয়ার। বলে, 'এই, ওদিকটা দেখে এলাম।'

'আমাকে কি আন্ধা মনে করিস নাটুয়া?'

'এমন কথা বলছ কেন চাচা?'

'খানিক আগে দেখলাম তোর পুরানা ঘরবালী ওই ওখানে বসে খাচ্ছিল।' বলে দূরের খুঁটিটা দেখিয়ে দেয় ফকিরা, 'তুই তো তাকে ধরার জন্যেই দৌড়ে গেলি।'

নাঃ, এই আধবুড়ো বীমারী ফকিরাকে এড়িয়ে কিছু করার উপায় নেই নাটোয়ারের। সে চুপ করে থাকে।

ফকিরা এবার বলে, 'তোকে তখনও বলেছি, এখনও বলছি, আওরতটাকে মাথা থেকে বার করে দে। পেটের ধান্দায় আমরা মরছি। বেফায়দা এই সব ঝামেলা জোটাচ্ছিস কেন?'

নাটোয়ার উত্তর দেয় না। মুখ ফিরিয়ে ফের মাঠের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

ফকিরা বুঝতে পারে নাটোয়ারের মাথা থেকে গোম্‌তীকে কোনোভাবেই বার করা যাবে না। হতাশভাবে সে একটু কাঁধ ঝাঁকায়। তারপর বলে, 'তোর চাপাটি তো পড়ে রইল। খেয়ে নে—'

অন্যমনস্কর মতো শালপাতার থালার দিকে হাত বাড়ায় নাটোয়ার।

ছয়

এখনও ভালো করে ভোর হয়নি। যেদিকে যতদূর চোখ যায়, ঝাপসা অন্ধকার। কাল সন্ধের পর আকাশে চাঁদ উঠেছিল। কখন সেটা ডুবে গেছে, কে জানে। চাঁদ না থাকলেও তারা আছে, চাঁদির ফুলের মতো আকাশ জুড়ে অগুনতি রুপোলি তারা।

কাছে এবং দূরে গাছের গুঁড়ির অদৃশ্য গর্তে বসে রাতজাগা কামারপাখিরা মাঝে মাঝে ভৌতিক আওয়াজ করে উঠছে। এ ছাড়া সমস্ত চরাচরে আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। গাঢ়, গভীর ঘুমের আরকে গোটা পৃথিবী এখন ডুবে আছে।

হঠাৎ তিন চারটে কামার পাখি একসঙ্গে গলা চড়িয়ে ডেকে ওঠায় ঘুম ভেঙে যায় নাটোয়ারের। চোখ মেলে প্রথমটা সে বুঝতে পারে না কোথায় শুয়ে আছে। পরক্ষণেই অবশ্য সব মনে পড়ে যায়। কাল রাতে তারা নহরগঞ্জের প্যান্ডেলেই শুয়ে পড়েছিল। বাঁয়ে তাকাতেই চোখ পড়ে, ফকিরা মড়ার মতো পড়ে আছে। তার দুই চোখ বোজা, খুব ধীরে শ্বাসপ্রশ্বাসের তালে তালে তার রোগা দুর্বল বুক ওঠা-নামা করছে।

কয়েক পলক ফকিরাকে লক্ষ করে নাটোয়ার। তারপর তার দুই চোখ বিশাল প্যান্ডেলটার নানা দিকে ঘুরতে থাকে। কাল বিকেলেই ভাজি চাপাটি আর বুন্দিয়ার 'বঢ়িয়া ভোজন' চুকিয়ে মিছিলের লোকজনেরা বেশির ভাগই চলে গেছে। যারা নেহাতই হাভাতের চাইতে হাভাতে, রাত পোহালে একদানা খাদ্য জোটানোর সম্ভাবনাও যাদের নেই তারাই শুধু এধারে ওধারে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। 'ভারতমাতা রথ' যে ক'দিন চলবে, একটা বেলার জন্য তো অন্তত তারা নিশ্চন্ত। কাল ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, দুমরলালজি, মহাদেওজির কাছে আর্জি জানাবে কৃপা করে তাদের যেন দু'বেলাই খাওয়ানো হয়। তাতে কাজ না হলে সোজা তারানাথজির পায়ে পড়ে যাবে। ভুখা গরিবদের কথা তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন। তাদের 'ভালাই'-এর জন্যই তো তিনি এত 'তখলিফ' করে রথযাত্রা শুরু করেছেন, আর তারাও এত তখলিফ করে তাঁর রথের পেছন পেছন মাইলের পর মাইল হেঁটে তাঁকে মদত দিচ্ছে।

অন্ধকার তেমন গাঢ় না থাকায় ঘুমন্ত লোকগুলোকে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে কিন্তু এদের ভেতর কোথাও গোম্‌তী নেই। নির্ঘাত সে পালিয়ে গেছে।

মুখ ফিরিয়ে ফকিরার দিকে তাকায় নাটোয়ার। তার গায়ে আস্ত ঠেলা দিয়ে ডাকে, 'চাচা, হো চাচা—'

ফকিরা এক ডাকেই ধড়মড় করে উঠে বসে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলে, 'কা রে, কা হুয়া?'

'ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। চল, বেরিয়ে পড়ি।'

'হাঁ, চল—'

দু'জনে খুব সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে প্যাণ্ডেলের বাইরে চলে আসে। আর তখনই দেখা যায়, ডান পাশে সেই মখমলের চাঁদোয়ার তলায় দুমরলালরা ঘুমোচ্ছে। তাদের শোওয়ার জন্য অবশ্য রাজকীয় ব্যস্থা। চওড়া ফিতের চৌপায়ার ওপর ফিনফিনে নেটের মশারি খাটানো রয়েছে। আর নাটোয়াররা কিনা স্রেফ মাটির ওপর শুয়ে হাতে মাথা রেখে সারাটা রাত কাটিয়ে দিল।

প্যান্ডেল এবং চাঁদোয়া পেছনে ফেলে একটু এগুতেই চোখে পড়ে, 'ভারতমাতা রথ'-এর পুরো কনভয়টা দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে টাঙ্গা থেকে ঘোড়াগুলোকে খুলে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। প্রাণীগুলোর ওপর রথযাত্রার প্রচণ্ড ধকল যাচ্ছে। সেগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে আর লেজ নেড়ে নেড়ে মশা তাড়াচ্ছে।

প্যান্ডেল, কনভয়, ঘোড়া, ইত্যাদি এক পাশে রেখে বাঁয়ে খানিকটা হাঁটলেই হাইওয়ে। সড়কটা এই নহরগঞ্জ থেকে সাপের মতো এঁকেবেঁকে দূরে মিলিয়ে গেছে।

হাইওয়ে ধরলে নমকিপুরায় যেতে কম করে মাইল আটেক হাঁটতে হবে। কিন্তু বাঁ দিকের মাঠে নেমে কোনাকুনি পা চালালে রাস্তা বেশ কিছু কমে যাবে। তবে মাঠ যেভাবে এবড়োখেবড়ো, ফুটিফাটা হয়ে আছে তাতে হাঁটতে বেশ কষ্ট হয়। অবশ্য এমন কষ্ট করার অভ্যাস নাটোয়ারদের আছে।

ওরা হাইওয়ে পেরিয়ে ওধারের মাঠ নেমে পড়ে।

অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। শেষ রাতের গা-জুড়ানো আরামদায়ক হাওয়ায় সর্বন গাছের সুবাস ভেসে আসছে। চারিদিকে, কাছে এবং দূরে, বিশাল বিশাল সব গাছ ডালপালা ছড়িয়ে কতকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে! সেগুলোর মাথা থেকে পাখিদের চেঁচামেচি আর ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ ভেসে আসছে। অর্থাৎ পাখিদের ঘুম ভাঙতে শুরু করেছে।

রোগে-ভোগা অসুস্থ শরীর টেনে টেনে কাল কয়েক মাইল হাঁটার ধকলটা মাত্র চারখানা শুকনো চাপাটি আর এক রাতের ঘুমে কাটিয়ে উঠতে পারেনি ফকিরা। এই ভোর রাত্তিরে কর্কশ উঁচুনিচু ফাটলে-ভরা মাঠের ওপর দিয়ে পা ফেলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তার। তা ছাড়া কাল বিকেল থেকেই সে টের পাচ্ছিল, ফের জ্বর আসছে। এখন তার গা বেশ গরম, মাথার ভেতরের রগগুলো যন্ত্রণায় টিপ টিপ করছে। কিন্তু এ সব কথা নাটোয়ারকে জানায় না সে। কোনোরকমে মিলিটারি সিং-এর কাছ থেকে ক'টা টাকা কামাই করে ঘরে ফিরে কমসে কম দিন সাতেক টান টান হয়ে শুয়ে থাকবে।

এই ভোরবেলায় অন্ধকার যখন দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে, দূর দিগন্তে খুব আবছা আলো ফুটতে শুরু করেছে, সমস্ত চরাচর জুড়ে যখন স্নিগ্ধ পবিত্রতা, গাছপালার মাথায় পাখিদের ডাকাডাকি, তখন সে সব দিকে নাটোয়ার বা ফকিরার নজর নেই। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে প্রকৃতির এই আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্যবলী দেখার মতো মন বা চোখ তাদের নেই। ফকিরার মতো নাটোয়ারও মিলিটারি সিং-এর কথাই ভাবছিল। কাল রথযাত্রার জন্য পারা যায়নি, আজ নিশ্চয়ই মিলিটারিজির সঙ্গে দেখা হবে। চলতে চলতে মনে মনে সময়ের হিসেব কষে নেয় নাটোয়ার। এখনও সকাল হয়নি। তার মানে নমকিপুরায় দুপুরের অনেক আগেই তারা পৌঁছে যাবে।

চলতে চলতে একটু উঁচুমতো জায়গায় ঠোকর লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল ফকিরা। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরে ফেলে নাটোয়ার। বলে, 'হুঁশিয়ারিসে পা ফেল চাচা।'

ফকিরা বলে, 'হাঁ, আন্ধেরাতে ঠিক দেখতে পাইনি, তাই ঠোক্কর লেগে বেসামাল হয়ে গেলাম।'

ফকিরাকে ছাড়েনি নাটোয়ার। তাকে দু'হাতে ধরে ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ হাতের তেলোতে তীব্র উত্তাপ টের পেয়ে চমকে ওঠে। বলে, 'কী চাচা, আবার কি জ্বরটা এল! তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে। বিলকুল আগ য্যায়সা—'

ফকিরা বলে, 'ও কিছু না! ফিকর নায় করনা।'

ফকিরা উড়িয়ে দিতে চাইলে কী হবে, নাটোয়ারের উদ্বেগ ভয়ানক বেড়ে যায়। এই 'বীমার' রুগ্‌ণ লোকটাকে টানাহ্যাঁচড়া করে নমকিপুরা পর্যন্ত জ্যান্ত নিয়ে যাওয়া যাবে কিনা, সে সম্বন্ধে তার মনে ঘোর সংশয় দেখা দেয়। তার আগেই হয়তো এই জনশূন্য মাঠের মাঝখানে তার প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। নাটোয়ার বলে, 'নমকিপুরা পর্যন্ত তুমি কি পয়দল যেতে পারবে চাচা?' ফকিরার বাড়ি থেকে তাকে নিয়ে আসার সময় এই প্রশ্নটা আরও একবার করেছিল সে।

ফকিরা বলে, 'পারব, পারব। আমাকে পারতেই হবে।'

'বেফায়দা জেদ কোরো না চাচা। এখনও বেশি দূর আমরা যাইনি। চল, নহরগঞ্জে ফিরে যাই। ওখানে জিরিয়ে নিও। তারপর লরীবালাদের হাতে-পায়ে ধরে তাদের গাড়িতে তুলে দেবো। ওরা জরুর তোমাকে তোমাদের গাঁও-এ পৌঁছে দেবে।'

ফকিরা এবার খেপে যায়। দুর্বল শরীরে গলায় স্বর যতটা চড়ানো যায়, চড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মতলব কী তোর? আমি, আমার জরু, বালবাচ্চা সবাই না খেয়ে মরি? মেহেরবানি করে তুই সিরিফ আমাকে ধরে নিয়ে চল।'

ফকিরা কেন এতটা জেদ ধরেছে তা তো আর নাটোয়ারের অজানা নয়। সে বলে, 'ঠিক হ্যায়, তোমার যা মর্জি—' ফকিরার কথামতো তাকে ধরে ধরে নিয়ে চলে নাটোয়ার।

একসময় দিগন্তের তলা থেকে সূর্য উঠে আসে। তবে কালকের মতো আজও আকাশ জুড়ে প্রচুর মেঘ রয়েছে। সে সবের ফাঁক দিয়ে সোনার লম্বা লম্বা ফলার মতো রোদ এসে পড়ছে মাঠঘাট গাছপালার ওপর। পরদেশি শুগার ঝাঁক উড়ে উড়ে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। আর চলেছে সিল্লি এবং মানিকপাখির দল। অনেক দূরে আবছা আবছা একটা পাহাড়ের রেঞ্জ আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হোঁচট খাওয়ার পর বেজায় কাবু হয়ে পড়েছিল ফকিরা। এখন অনেকটা সামলে উঠেছে। সে বলে, 'এবার আমাকে ছেড়ে দে নাটুয়া।'

নাটোয়ার বলে, 'ছেড়ে দিলে হেঁটে যেতে পারবে?'

'দেখি কোসিস করে। না পারলে তুই তো আছিসই।'

'ঠিক হ্যায়।'

দিনের আলো ফোটায় এখন সব কিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেখেশুনে ধীরে ধীরে পা ফেলছে ফকিরা।

ওরা এখন যেখানে এসে পড়েছে তার সামনের দিকে ট্যারাবাঁকা চেহারার অগুনতি সিসম আর পিপর গাছের জটলা।

ফকিরার পাশাপাশি চলতে চলতে হঠাৎ নাটোয়ারের চোখে পড়ে, একটা মেয়েমানুষ সিসম আর পিপর গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে দিয়ে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। তার মুখটা সামনের দিকে, তাই পেছন থেকে দেখা যাচ্ছে না। তবে ওভাবে পা ফেলে হাঁটার ভঙ্গিটা নাটোয়ারের খুব চেনা। তা ছাড়া সবুজ রঙের ওই শাড়ি আর লাল জামাটাও তার অচেনা নয়। কাল প্রায় সারাদিনই গোম্‌তীর গায়ে ওগুলো দেখা গেছে।

নাটোয়ারের চোখ ধারাল হয়ে ওঠে। মাথার ভেতর যে আক্রোশটা সাময়িক চাপা পড়ে গিয়েছিল, ফের সেটা দপ্ করে জ্বলে ওঠে। পরক্ষণে উন্মাদের মতো সে সিসম গাছগুলোর দিকে দৌড়ুতে থাকে।

ফকিরাও গোম্‌তীকে দেখতে পেয়েছিল। যদিও তার স্নায়ু দুর্বল, নতুন করে জ্বর আসায় মস্তিষ্কে ভাবার মতো শক্তি বিশেষ নেই, তবু নাটোয়ার তার বিশ্বাসঘাতিনী পুরোনো ঘরবালীকে ধরতে পারলে ফলাফল কী হতে পারে, মুহূর্তে আন্দাজ করে নেয়। ভয়ার্ত গলায় সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মাত্ যা নাটুয়া, মাত্ যা—'

গোঁয়ার, প্রতিহিংসাপরায়ণ নাটোয়ারের কানে কিছুই ঢোকে না। অন্ধ এক খ্যাপামি তার কাঁধে ভর করে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। ফকিরা বেঁচে থাকতে কিছুতেই চোখের সামনে হত্যাকাণ্ড ঘটতে দেবে না; বিশেষ করে নারীহত্যা। ভাঙাচোরা, বোখারে জীর্ণ শরীরে যেটুকু শক্তি এখনও তলানির মতো পড়ে রয়েছে তা জড়ো করে অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে গাছের সেই জটলাটার দিকে সে-ও তীরের মতো ছুটে যায়।

ওদিকে গোম্‌তীর কাছাকাছি চলে এসেছিল নাটোয়ার। পায়ের শব্দে চমকে পেছন ফিরতেই আতঙ্কে গোম্‌তীর মুখ একেবারে ছাইবর্ণ হয়ে যায়, চোখদু'টো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। কোনোরকমে একটা হাত ওপরে তুলে সে বলে, 'নেহী নেহী—'

মাথায় খুন চড়ে গিয়েছিল নাটোয়ারের। তার চোখ এখন টকটকে লাল, একজোড়া রক্তের ডেলার মধ্যে যেন দু'টো কালচে তারা ধক ধক করছে। তার গলার ভেতর থেকে জান্তব আওয়াজ বেরিয়ে আসতে থাকে, 'শালী, রেণ্ডি কাঁহিকা, কাল থেকে আমার আঁখে দশবার ধুলো দিয়েছিস। অব্ নেহী ছোড়ুঙ্গা। জরুর তুহারকা জান লে লুঙ্গা—' বলে হিংস্র বুনো শুয়োরের মতো সে গোম্‌তীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে, সেই সময় মেয়েমানুষটির মস্তিষ্কে কী এক প্রতিক্রিয়া ঘটে যায়। সে প্রায় লাফ

দিয়ে সটান নাটোয়ারের পায়ের ওপর পড়ে যায়। দুই হাতে তার দুই পা প্রবল শক্তিতে আঁকড়ে ধরে মাথা ঠুকে ঠুকে বলতে থাকে, 'হামনিকো মাফ কর, মাফ কর। বহোত বড়া পাপ কিয়া হামনি, বহোত কসুর হুয়া।'

ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে থ হয়ে যায় নাটোয়ার। সে ভেবেছিল, তাকে দেখামাত্র ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবার চেষ্টা করবে গোম্‌তী, কিন্তু এভাবে তার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়বে, তা কে জানত!

জ্বলন্ত চোখে দুশ্চরিত্র আওরতটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে নাটোয়ার, তারপর প্রচণ্ড শক্তিতে পা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করে কিন্তু এত জোরে মেয়েমানুষটা তার পা নিজের বুকের মধ্যে জাপটে ধরে রেখেছে যে কিছুতেই ছাড়ানো যায় না। অগত্যা ছাড়াবার জন্য গোম্‌তীর রুক্ষ জট-পাকানো চুলের গোছা ধরে যখন সে টানতে যাবে, হাঁপাতে হাঁপাতে ফকিরা এসে পড়ে। এতটা দৌড়ে আসার কারণে তার হাড়পাঁজরা-বার-করা শীর্ণ বুক তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে, চোখ আর জিভ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। তারই মধ্যে সে শ্বাস-টানা, তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করতে থাকে, 'আওরতের গায়ে হাত তুলিস না নাটুয়া। উসকো মাত্‌ মার, মাত্‌ মার—' বলতে বলতে নাটোয়ারের কোমর ধরে প্রাণপণে তাকে টানতে থাকে। গোম্‌তীকে বলে, 'ছোড় দে উসকা পাও, ছোড়্‌ ছোড়্‌—'

ফকিরা এসে পড়ায় খানিকটা কাজ হয়। গোম্‌তী অনেকখানি ভরসা পেয়ে যায়। নাটোয়ারের সঙ্গে শাদি হবার পর থেকেই সে ফকিরাকে চেনে। এমন সাদাশুধা ভালোমানুষ দুনিয়ায় ক্বচিৎ কখনও চোখে পড়ে। গোম্‌তী ব্যাকুলভাবে বলে, 'হামনিকা বচাও চাচা, বচাও—'

'ঠিক হ্যায়। তুই পা ছাড় আগে—'

ফকিরার কথায় হাতের বাঁধন আলগা করে দেয় গোম্‌তী। ভীত, সতর্ক ভঙ্গিতে নাটোয়ারের দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে উঠে বসে।

ফকিরা এসে পড়ায় নাটোয়ারের মাথায় সে রাগটা চড়ে গিয়েছিল সেটা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়। তবে গলার ভেতর থেকে সেই চাপা জান্তব আওয়াজটা বেরুতেই থাকে, 'শালী, ভূচ্চরকা ছৌরী—'

উত্তেজনায় ক্লান্তিতে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না ফকিরা। সে মাটির ওপর শুয়ে পড়ে জোরে জোরে শ্বাস টানতে থাকে। ফুসফুসের সঙ্গে বাইরের বাতাসের যোগাযোগ রাখতে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল।

ফকিরার ডান পাশে মুখ নিচু করে চুপচাপ বসে আছে গোম্‌তী। বাঁ ধারে তেরছা হয়ে বসেছে নাটোয়ার। আর মাঝে মাঝেই আরক্ত চোখে বিশ্বাসঘাতিনী পুরোনো স্ত্রীকে লক্ষ করছে। তার দৃষ্টিতে দুনিয়ার সবটুকু ঘৃণা রাগ এবং বিদ্বেষ। নেহাত ফকিরা চাচা এসে পড়েছিল, নইলে গলা টিপে আওরতটাকে শেষ করে ফেলত সে।

অনেকক্ষণ সাঁই সাঁই করে শ্বাস টানার পর কিছুটা সামলে নেয় ফকিরা একসময় হাতের ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসে। প্রথমে নাটোয়ারকে দেখে সে, তারপর মুখ ফিরিয়ে গোম্‌তীকে লক্ষ করে। বলে, 'একগো বাত পুছুঙ্গা বহু?' গোম্‌তীকে চার বছর আগে 'বহু' বলেই ডাকত সে, সেটা এখনও ভোলেনি।

প্রায় হাঁটুর কাছে থুতনি নামিয়ে রেখেছিল গোম্‌তী। আবছা গলায় সে বলে, 'কা?'

'তোর ওপর নাটুয়া কেন এত গুস্‌সা হয়ে আছে, জরুর জানিস--কা রে?'

গোম্‌তী উত্তর দেয় না।

ফকিরা ফের বলে, 'কী হল, জবাব দিচ্ছিস না কেন?'

গোম্‌তী আস্তে মাথা নাড়ে শুধু, অর্থাৎ জানে।

'বিয়াহী আওরত ভেগে গেলে কোন মরদের মাথার ঠিক থাকে বল? সব মরদেরই এটা ইজ্জৎকা সওয়াল।'

গোম্‌তী চুপ করে থাকে।

ফকিরা এবার জিজ্ঞেস করে, 'তুই আমার বেটি বরাবর, আমাকে চাচা বলিস। একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। চার সাল আগে নাটুয়াকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলি কেন?'

তৎক্ষণাৎ জবাব দেয় না গোমতী। তার মাথাটা মাটিতে মিশে যায় যেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে সে বলে, 'বড়ী শরমকি বাত চাচা। শুনে কী লাভ?'

'লাভ লুকসান আমি বুঝব। তুই বল--' বলে একটু থামে ফকিরা। কী ভেবে ফের শুরু করে, 'নাটুয়া তোর ওপর গুস্সা পুষে রেখেছে; রাগের মাথায় কবে কী যে করে বসবে! বহোত গাঁওয়ার। এখন আমি আছি। সব বলে নিজেদের ভেতর ফয়সলা করে নে।'

ফকিরার মতো শুভাকাঙ্ক্ষী হয় না। সে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। নাটোয়ার যেরকম বদমেজাজি এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ তাতে ফকিরার সামনেই বোঝাপড়াটা হয়ে যাওয়া ভালো। মুখ না তুলে জড়ানো গলায় সে যা বলে যায় তা এইরকম। চার সাল আগে তার কাঁধে নিশ্চয়ই শাঁখরেল চেপেছিল, নইলে একটা বদ লোক লোভ দেখাল, আর সে কিনা লালচে পড়ে 'আপনা মরদ' আর ঘর ছেড়ে তার পিছু পিছু চলে গেল ধানবাদ! লোকটা তাকে কত রঙিন স্বপ্নই না দেখিয়েছে! মোতির হার, চাঁদির কাংনা, সোনার করণফুল কিনে দেবে। দামি দামি জমাকালো শাড়ি আর জেবরে তাকে মুড়ে সিনেমা দেখাবে রোজ একটা করে, নৌটঙ্কি, সার্কাস দেখাবে। রেলের ডিব্বায় চড়িয়ে বেড়াতে নিয়ে যাবে ভারী ভারী সব টৌনে—পাটনা, টাটানগর, কলকাতা, বম্বাই। ওই সব শহর নাকি 'সিরিফ' স্বপ্ন দিয়ে তৈরি। সেখানে হাজার মজা, হাজার রংতামাসা। তখন গোমতীর বয়স কম। লোকটা তার চোখে ঘোর লাগিয়ে দিয়েছিল। কোনো কিছু তলিয়ে ভাবার বা বোঝার মতো বোধ বুদ্ধি তার ছিল না।

কিন্তু ধানবাদে মাস ছয়েক ফুর্তিফার্তা করার পর লোকটা একদিন গোমতীকে ফেলে উধাও হয়ে যায়। তারপর কী কষ্ট করে যে কহলগাঁও-এ তার মা-বাপের কাছে চলে এসেছে শুধু সে-ই জানে। মা-বাপ তাকে কিছুতেই ঘরে তুলবে না। তিন দিন না খেয়ে উঠোনে পড়ে ছিল। তারপর মা-বাপের ক্ষমা পায়। বহুবার গোমতী ভেবেছে নাটোয়ারের কাছে চলে যাবে, মহা পাপের জন্য 'মাফি মাঙবে', কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। দু'পা এগিয়ে সে দশ পা পিছিয়ে গেছে। কেননা গোমতী জানে তার মরদের মতো গোঁয়ার, রগচটা, হঠকারী আদমি দুনিয়ায় খুব বেশি জন্মায় না। হিংস্র পশুর মতো তার গোঁ এবং রাগ।

ফকিরা জিজ্ঞেস করে, 'সেই যে ধানবাদ থেকে এলি, তারপর থেকে কি বাপের ঘরেই আছিস?'

আস্তে মাথা নাড়ে গোমতী, 'হাঁ।'

'আর চুমৌনা (দ্বিতীয় বিয়ে) করিসনি?'

'নেহী।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ফকিরা কী ভেবে বলে, 'বাপ-মা ছাড়া আর কে কে আছে তোর?'

গোমতী বলে, 'মা দো সাল আগে মরে গেছে। ঘরে বাপ আর একটা ভাই ছাড়া কেউ নেই।'

'বাপ আর ভাই কাম-উম কী করে?'

'কুছ নেহী।'

'মতলব?'

'কী করে করবে? বাপের এক সাল ধরে বুখার। কী হয়েছে কে জানে, দিনরাত বিছানায় শুয়ে থাকে। অসপাতাল নিয়ে গিয়েছিলাম। ডাগদরসাব বুঝিয়ে দিল বেশিদিন বাঁচবে না। বড় জোর এক-দো মাহিনা। ছোটে ভাইটা নহরগঞ্জে মাল বইত। ভারী বস্তা তুলতে গিয়ে কোমরে চোট লেগে সে-ও বিছানায় পড়ে আছে। কবে খাড়া হয়ে আবার কামাই করতে পারবে, রামচন্দরজি জানে।'

ফকিরাকে রীতিমতো চিন্তিত দেখায়। গোমতীর দিকে ঝুঁকে বলে, 'তা হলে পেট চালাস কী করে?'

'যখন যা কাজ পাই তা-ই করে চালাই।' গোমতী বলতে থাকে, 'আমি ছাড়া আর কে চালাবে?'

আস্তে আস্তে সামনে-পেছনে মাথা নাড়ে ফকিরা। বলে, 'কাল তোকে বড় সড়কের ধারে উঁচা টিবি পার হয়ে আসতে দেখলাম। কোত্থেকে আসছিলি বহু?'

'কহলগাঁও-এ আমার বাপুর ঘর থেকে। চাল ডাল আঁটা গেঁহু, কুছ নেহী ঘরমে। দো রোজ না খেয়ে আছি আমরা তিন তিনগো আদমি। তাই দো-চার পাইসা কামাই-এর জন্যে বেরিয়ে

পড়েছিলাম। কিছু না নিয়ে ফিরলে বাপু আর ভাইটা বিলকুল ভুখা মরে যাবে।' বলে কিছুক্ষণ দম নিয়ে ফের শুরু করে গোম্‌তী, 'তারপর তো রথবালাদের জুলুসে তোমাদের সঙ্গে দেখাই হয়ে গেল।'

ফকিরা জিভের ডগায় চুক চুক শব্দ করে খুব আন্তরিক গলায় বলে, 'বড়ী দুখকা বাত।' আসলে গোম্‌তী যা বলে গেল তার সঙ্গে তাদের দুঃখকষ্ট এবং অনন্ত জীবনযুদ্ধের এতটুকু তফাত নেই। একই রকম উঞ্ছবৃত্তি করে তাকেও তিন-তিনটে মানুষের খাদ্য জোগাড় করতে হচ্ছে।

ফকিরার ডান পাশে বসে চুপচাপ গোম্‌তীর কথা শুনে যাচ্ছিল নাটোয়ার। খানিক আগের আক্রোশ এবং জান্তব রাগ এখন অনেক পড়ে গেছে। যে খুনটা মাথায় চড়ে গিয়েছিল সেটা নামতে শুরু করেছে। বিদ্বেষ এবং ঘৃণার বদলে গোম্‌তীর জন্য সে এক ধরনের সহানুভূতিই বোধ করতে থাকে। রাগের মাথায় মেয়েমানুষটাকে খুন করে ফেলার পর তার এই চার বছরের ভয়াবহ কষ্টদায়ক ইতিহাস জানতে পারলে আপশোশের শেষ থাকত না নাটোয়ারেব।

হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় ফকিরা জিজ্ঞেই করে, 'হাঁ রে বহু, কাল রথবালাদের চাপাটি উপাটি খাওয়ার পর তুই কোথায় পালিয়েছিলি?'

গোম্‌তী জানায়, সে পালিয়ে যায়নি, নাটোয়ারের ভয়ে প্যাণ্ডেলে না থেকে, আধারশিলা যেখানে বসানো হয়েছে সেই চাঁদোয়াটার ওধারে নহরগঞ্জ বাজারের একটা ফাঁকা চালার তলায় সন্ধের পর শুয়ে পড়েছিল। নাটোয়ারের মুখচোখ দেখে তার মনে হয়েছিল, ধরতে পারলে সে তাকে বেঁচে থাকতে দেবে না। তাই দিনের আলো ফোটার আগেই সে বেরিয়ে পড়েছিল। ভেবেছিল, কোনাকুনি মাঠের ওপর দিয়ে সামনের কোনো শহরে বা গঞ্জে চলে যাবে। নাটোয়ার যদি হাইওয়ে ধরে বরাবর হাঁটতে থাকে, তাকে আর দেখতে পাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাটোয়ারকে এড়ানো গেল না, গোম্‌তীকে ধরা পড়তেই হল।

এরপর বেশ খানিকক্ষণ কেউ কিছু বলে না। সিসম এবং পিপর গাছগুলোর মাথায় পাখিদের ডাক ছাড়া চারপাশে কোথাও এখন আর কোনো শব্দ নেই।

একসময় ফকিরা বলে, 'তুই পাইসা কামাইয়ের জন্যে বেরিয়েছিস, আমরাও তা-ই। আমরা এখন নমকিপুরায় যাব। ইচ্ছে হলে আমাদের সঙ্গে আসতে পারিস। ওখানে গিয়ে দ্যাখ কাম-ধান্দা যদি কিছু জুটে যায়।'

গোম্‌তীর মুখচোখ দেখে বোঝা যায়, এতে তার তেমন আপত্তি নেই। দু-দু'টো পুরুষ সঙ্গে থাকলে কাজকর্ম জোগাড় করতে কিছু সুবিধাও হতে পারে। কিন্তু নাটোয়ার সম্পর্কে তার সংশয় পুরোপুরি কাটেনি। চোখের কোণ দিয়ে তাকে দেখিয়ে ভয়ে ভয়ে, খুব নিচু গলায় গোম্‌তী ফকিরাকে বলে, 'লেকেন ও যদি—' কথা শেষ না করেই সে থেমে যায়।

তার মনোভাব চট করে বুঝে নেয় ফকিরা। সে বলে, 'নেহী নেহী, নাটুয়া কিছু করবে না।' নাটোয়ারের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেই করে, 'কা রে নাটুয়া, তোর গুস্‌সা পড়ল?'

নাটোয়ার গলার ভেতর আধফোটা আওয়াজ করে। খেপে যখন ওঠেনি তখন বোঝা যায়, রাগ অনেকটাই পড়ে গেছে।

ফকিরা ফের বলে, 'বহুকে মারবি না তো?'

চোখ কুঁচকে একবার গোম্‌তীকে দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় নাটোয়ার।

কিছুক্ষণ বাদে দেখা যায়, মাঠের ওপর তিনজন পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে নমকিপুরার দিকে চলেছে। মাঝখানে ফকিরা, তার ডাইনে নাটোয়ার এবং বাঁয়ে গোম্‌তী।

চলতে চলতে ফকিরাই যা দু-একটা কথা বলছিল। অন্য দু'জন একেবারে চুপ। মাঝে মাঝে ফকিরার রোগা কাঁধের ওপর দিয়ে গোম্‌তী আর নাটোয়ার পরস্পরের দিকে আড়ে আড়ে তাকায়। চোখাচোখি হলেই দ্রুত দু'জনেই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

সাত

নমকিপুরা ছোটোখাটো শহর। নর্থ বিহারের এ জাতীয় অন্য সব শহরে যেমন দেখা যায়, এখানে তেমনি টিন বা টালির চালের বাড়িঘরই বেশি। ফাঁকে ফাঁকে বেঢপ চেহারার একতলা দোতলা, এমনকি চারতলাও চোখে পড়বে। খোয়া-ওঠা ভাঙাচোরা রাস্তাগুলো আধ হাত পুরু ধুলোর নিচে ডুবে আছে। দু'ধারে কাঁচা নর্দমার ওপর দিন রাত লক্ষ কোটি মশা ভন ভন করছে। এখানে দু'পা হাঁটলেই একটা করে রামসীতা বা বজরঙ্গবলীর মন্দির। আর আছে বেখাপ্পা ধরনের দু'টো সিনেমা হল। যানবাহন বলতে মান্ধাতার আমলের বয়েল আর ভৈসা গাড়ি, আর আছে টাঙ্গা, অটো, সাইকেল রিকশা, ক্বচিৎ দু-চারটে মোটর। এখানে অজস্র দোকানপাট। তবে মাইকের দোকানগুলোর দাপট সবচেয়ে বেশি। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত নিষ্ঠাভরে সেগুলো হিন্দি সিনেমার রেকর্ড বাজিয়ে থাকে। এ শহরে অবশ্য একটা মিউনিসিপ্যালিটি আছে, বিজলিও এসে গেছে। ঘিঞ্জি শহরটার হট্টগোল আবর্জনা দুর্গন্ধ মশামাছি ধুলো, ইত্যাদি থেকে দূরে একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে তিন একর জায়গা জুড়ে মিলিটারি সিং-এর হাভেলি।

নমকিপুরায় ঢোকার দু'টো মুখ। মাঠ পেরিয়ে পেছন দিক দিয়ে যেমন শহরে ঢোকা যায় তেমনি উলটো দিক দিয়েও। যে হাইওয়ের ওপর দিয়ে তারানাথ মিশ্রর 'ভারতমাতা রথ' চলেছে, সেটাই ঘুরে ঘুরে নমকিপুরা টাউনের সামনে দিয়ে চলে গেছে। বেশির ভাগ মানুষ ওখান দিয়েই এ শহরে আসে।

জ্বরটা আগে থেকেই ছিল ফকিরার। নমকিপুরায় পৌঁছুবার মুখে সেটা হঠাৎ খুব বেড়ে যায়। গা এখন পুড়ে যাচ্ছে। চোখ দু'টো লাল। আলটাকরা পর্যন্ত জিভটা শুকিয়ে খরখরে হয়ে উঠেছে। জড়ানো গলায় ফকিরা বলে, 'আর পারছি না রে নাটুয়া, তোরা আমাকে ধর। নইলে পা ফেলতে পারব না।'

দু'পাশ থেকে নাটোয়ার এবং গোমতী ফকিরাকে ধরে ফেলে। নাটোয়ার উদ্বিগ্ন মুখে বলে, 'চল, ওখানে বসে একটু জিরিয়ে নেবে।' দূরে একটা ঝাঁকড়া-মাথা গাছের তলায় ঘন ছায়া দেখিয়ে দেয় সে।

ঘোর-লাগা আরক্ত চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে উতলা হয়ে পড়ে ফকিরা, 'নেহী নেহী, দুফার হয়ে আসছে। মলটারিজির সাথ আজ দেখা করতেই হবে। চল—'

দু'জনে ধরে ধরে ফকিরাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলে।

মিলিটারি সিং-এর হাভেলির সামনে বিশাল গেটটার কাছে রাইফেল আর গলায় টোটার মালা নিয়ে একটা বিপুল চেহারার ভোজপুবি দারোয়ান উঁচু টুলে বসে হাতের তেলোতে খৈনি ডলছিল। নাটোয়াদের দেখে তার দু'চোখ নেচে ওঠে। সে ওদের চেনে। বলে, 'আরে নাটুয়া উস্তাদ, ফকিরাচাচা, আচানক তোমরা এখানে?'

নাটোয়ার বলে, 'বড়ে সরকারের সাথ দেখা করব। কিরপা করে দর্শন করিয়ে দিন—'

নাটোয়ার এবং ফকিরার দিক থেকে দরোয়ানের নজর এবার গিয়ে পড়ে গোমতীর ওপর। চাপা লোভে তার চোখ চকচক করতে থাকে। গোমতীকে দেখতে দেখতেই সে জবাব দেয়, 'বড়ে সরকার তো নেই। কাল দিল্লি গেছেন।' তারপরেই গোমতী সম্পর্কে প্রচণ্ড কৌতূহলী হয়ে ওঠে, 'এ আওরত কৌন রে?'

মিলিটারি সিং নেই, শোনামাত্র নাটোয়ার একেবারে মুষড়ে পড়ে। এতটা রাস্তা অসুস্থ রোগগ্রস্ত ফকিরাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে আসাটা পুরোপুরি বরবাদ হয়ে গেল। তার মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে, নৈরাশ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যায় সে। গোমতীর আসল পরিচয়টা না দিয়ে রুদ্ধ গলায় বলে, 'ও আমাদের সাথ এসেছে। আচ্ছা দারবানজি, বড়ে সরকার কবে ফিরবেন?'

'কৌন জানে!'

নাটোয়ার উদ্বিগ্ন মুখে এবার জানতে চায়, মিলিটারি সিং-এর দু-চার দিনের ভেতর ফেরার সম্ভাবনা আছে কিনা।

নাটোয়ারের এ সব প্রশ্ন সম্পর্কে আদৌ কোনো আগ্রহ নেই দারোয়ানের। সে বলে, 'আওরতটার সঙ্গে তোদের কোথায় দেখা হল? কা নাম? কাঁহাকি রহনেবালী?'

দারোয়ানের কৌতূহল মেটানো আর হয় না। তার আগেই হাভেলির ভেতর থেকে মিলিটারি সিং-এর মুন্সি চতুরালালজি গেটের কাছে চলে আসে। হঠাৎ দেখলে তাঁকে সাধু ধর্মাত্মা গোছের কেউ মনে হয়। সুখে-থাকা গোলাকার চেহারা। স্থানীয় ঢংয়ে ধুতির কাছা পাকিয়ে পেছন দিকে গুঁজে দেওয়া, ওপরে গেরুয়া পাঞ্জাবি। কপাল জুড়ে চন্দনের 'রামসীতা' ছাপ। মোটা টিকিতে ফুল বাঁধা। দু' হাতের আঙুলে হিরে চুনি পান্না ইত্যাদি মিলিয়ে গোটা সাতেক আংটি। গলায় সোনার চেইনে কুলগুরুর ছবিওলা লকেট। পায়ে মোটা চামড়ার চপ্পল।

বাইরের এই খোলসটা প্রথম দেখলে ভক্তিতে যে কেউ গদগদ হয়ে উঠবে কিন্তু চতুরলালের মতো ধূর্ত ধড়িবাজ লোক দুনিয়ায় দু-চারটের বেশি সৃষ্টি হয়নি। তার পেটে হাজারটা জিলিপির পাঁচ। কখন কে কাকে পথে বসিয়ে দেবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। নিজের সম্বন্ধে এমন একটা ভীতিকর আবহওয়া সে তৈরি করে ফেলেছে যে সবাই তাকে ভয় পায়।

চতুরলাল বলে, 'কা রে নাটুয়া ফকিরা, বহোত রোজ বাদ তোদের দেখলাম।'

নাটোয়ার বলে, 'হাঁ মুন্সিজি—'

'তোদের তো বড়ে সরকার ডেকে পাঠাননি। তা হলে আমি জানতে পারতাম।' বলে মাথা নাড়তে থাকে চতুরলাল, 'বিনা ডাকে যে এলি, কোঈ জরুরত হ্যায়?'

এটা সত্যি, ডেকে না পাঠালে নাটোয়াররা নমকিপুরায় আসে না। এখানে আজ হানা দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য যে কিছু কামাই করে নিয়ে যাওয়া, সেটা গোপন রেখে নাটোয়ার বলে, 'ছে মাহিনা আগে বড়ে সরকারকে চাক্কুর খেল দেখিয়ে গেছি। ইচ্ছে হল আজ আবার দেখাই। লেকেন দারবানজি বলল, হুজৌর দিল্লি গেছেন।'

'হাঁ। দিল্লি থেকে বোম্বাই মাদ্রাজ কলকাত্তা হয়ে ফিরবেন। কমসে কম পুরা এক মাহিনা হুজৌরকে নমকিপুরায় পাওয়া যাবে না।'

মিলিটারি সিং-এর হাভেলির সামনে এসে ফকিরার হাত ছেড়ে দিয়েছিল নাটোয়ার। তবে গোমতী তাকে ধরেই আছে। জ্বরের তাড়সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুঁকছিল সে। গভীর হতাশায় ভেঙে পড়ে ফকিরা। কাঁপা গলায় বলে, 'হামনিলোগনকা বহোত বুরা নসিব। হুজৌর ফিরলে যেন ডাক পাই। সেলাম মুন্সিজি, চলি। চল রে নাটুয়া, চল বহু—'

শুকনো গলায় নাটোয়ারও বলে, 'নমস্তে মুন্সিজি—'

ফিরে যাওয়ার জন্য ওরা যখন পা বাড়িয়েছে সেই সময়, চতুরলালের মাথায় কিছু একটা মতলব খেলে যায়। সে বেশ ব্যস্তভাবেই বলে, 'এখন ফিরতে হবে না। এক কাম কর, তোরা পেছনের কোঠিতে চলে যা।'

মিলিটারি সিং-এর এই সুবিশাল হাভেলির পেছন দিক ফাঁকা মাঠের ধার ঘেঁষে আরেকটা মাঝারি মাপের দোতলা বাড়ি আছে। তাঁর হাজার রকমের শখ। শিকার খেলা, কালোয়াতি গানবাজনা, নাচ, নৌটঙ্কি—কোনো কিছুতেই মিলিটারিজির অরুচি নেই। নাটোয়ারের ছুরির খেলাও তাঁর খুবই পছন্দ। শিকার তো আর ঘরে বসে হয় না, সে জন্য জঙ্গলে যেতেই হয়। তবে অন্য শখগুলো মেটানোর জন্য পেছনের ওই বাড়িটা করিয়েছেন, সেখানে প্রায়ই জমজমাট আসর বসান মিলিটারি সিং। তখন বড় বড় 'আদমি'দের প্রচুর খাতিরদারি করে নিয়ে আসা হয়। শুধু এই শহরেরই না, ধানবাদ পাটনা টাটানগর, এমনকি সুদূর কলকাতা থেকেও মান্যগণ্য মেহমানরা আসেন। বাড়ির কমপাউন্ডে দামি দামি মোটরের লাইন লেগে যায়।

এই সব আসরে মিলিটারি সিং-এর স্থায়ী ম্যানেজার মুন্সি নৌকর ড্রাইভার দারোয়ান কোচোয়ান—কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হয় না। এই আসরগুলো শুধুমাত্র তাঁর এবং তাঁর বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য

সংরক্ষিত। মেহমানদের 'সেবা'র জন্য পাটনা থেকে কয়েক দিনের কড়ারে 'চুন চুনকে' (বাছাই করে) বয় বেয়ারা বাবুর্চি আনিয়ে নেন মিলিটারি সিং। তাঁর এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবদের খাদ্যাখাদ্যের বিচার নেই, জাতপাতের সওয়াল নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না।

'চাক্কুকা খেল' দেখানো ছাড়া পেছনের বাড়িতে নাটোয়ারদের ঢোকার প্রশ্নই নেই। মিলিটারি সিং-এর বিনা হুকুমে তবু কেন চতুরলাল ওখানে যেতে বলেছে, ভেবে পায় না নাটোয়ার। রীতিমতো অবাক হয়ে বলে, 'লেকেন—'

তার দ্বিধা এবং বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পারছিল চতুরলাল। বলে, 'আরে যা না, গাধ্‌ধে কাঁহিকা!'

এরপর আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস হয় না নাটোয়ারের। সে শুধু বলে, 'ঠিক হ্যায়, আপ্‌কো যো হুকুম—'

ফকিরা এবং গোমতীকে সঙ্গে করে পেছনের বাড়িটায় চলে যায় নাটোয়ার।

আট

বড়ো হাভেলি আর মাঝারি কোঠির মাঝখানে একটা উঁচু পাঁচিলের গায়ে দরজা বসানো রয়েছে। সেই দরজা দিয়ে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাতায়াত করা যায়। চতুরলাল সেদিক দিয়ে এসেছে আর নাটোয়াররা এসেছে বাইরের রাস্তা ঘুরে।

এ বাড়ির ছোটো গেটেও একটা দারোয়ান টোটা বন্দুক সমেত মোতায়েন রয়েছে। চতুরলাল এসে তাকে গেট খুলে দিতে বলে। মিলিটারি সিং-এর বাড়িঘর জমিজমা এবং প্রোপার্টির ব্যাপারে তাঁর পরেই যার সব চেয়ে বেশি দাপট, সে হল মুন্সি চতুরলাল। নাটোয়ারদের মতো দারোয়ানটা অবাক হলেও চতুরলালের হুকুম মুহূর্তে তামিল করে।

নাটোয়াররা ভেতরে ঢোকে। কী উদ্দেশ্যে তাদের এখানে আসতে বলা হয়েছে, বুঝতে না পেরে তারা খুবই অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

চতুরলাল বলে, 'আয় আমার সাথ।' তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে সে সোজা দোতলায় উঠে যায়।

দোতলায় মোটে দু'খানা ঘর আর অ্যাটাচড্ বাথরুম। এ ছাড়া বাকি অংশটা জুড়ে বিশাল হল্। হল্‌টা দামি কার্পেটে আগাগোড়া মোড়া। তার একধারে দু'ফিট পুরু গদির ওপর ধবধবে ফরাস পাতা। আরাম করার জন্য মখমলের ঢাকনা-দেওয়া প্রচুর তাকিয়ো ওটার ওপর ছড়ানো রয়েছে। এখানেই মিলিটারি সিং মাসে দু-চার বার আসর বসান।

হল্-এ ঢুকে বিমূঢ়ের মতো নাটোয়ার বলে, 'মুন্সিজি, আমাদের এখানে নিয়ে এলেন—'কথা শেষ না করেই থেমে যায়।

নাটোয়ার কী বলতে চায়, বুঝতে অসুবিধা হয় না চতুরলালের। সে আর কোনোরকম হেঁয়ালির মধ্যে তাদের রাখে না। বলে, 'পাঁচ সাত সাল তুই আর ফকিরা স্রিফ বড়ে সরকারকে 'চাক্কুকা খেল' দেখাচ্ছিস। আমরা বাদ পড়ে যাচ্ছি। আজ মওকা মিলেছে। খেলটা আমাদের দেখাবি। সেই জন্যেই এখানে ধরে নিয়ে এলাম।'

ভয়ে গলা শুকিয়ে গিয়েছিল নাটোয়ারের। সে বলে, 'লেকেন—'

'কী?'

'হুজৌর জানতে পারলে—'

নাটোয়ারকে থামিয়ে দিয়ে চতুরলাল বলে, 'তোরা যদি না বলিস জানতে পারবেন না। আর সরকারকে যদি খবরটা দিস—' একটা মারাত্মক ইঙ্গিত দিয়ে নিঃশব্দে হাসে সে।

চতুরলালের এই হাসিটা নাটোয়ারের শিড়দাঁড়ার ভেতর কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। সে জানে মিলিটারি সিং খেপে গেলে দুনিয়ায় এক সেকেন্ডও সে বেঁচে থাকতে পারবে না। এ দিকে চতুরলাল মুন্সি মিলিটারিজির চেয়ে কম বিপজ্জনক নয়। তার হুকুমমতো না চললে সে যে কতটা ক্ষতি করতে পারে,

ভাবতেও সাহস হয় না। মিলিটারি সিং তো ফিরবেন একমাস বাদে। কিন্তু এই মুহূর্তে চতুরলাল যদি অসন্তুষ্ট হয়, তাকে কে বাঁচাবে? দম-আটকানো গলায় নাটোয়ার বলে, 'নেহী নেহী, হুজৌরকে খবর দিয়ে আমাদের কা ফায়দা?'

'কথাটা মনে রাখিস।'

'রাখব মুন্সিজি।'

ওদিকে হল্-এ ঢুকে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না ফকিরা। টলতে টলতে একধারে সে বসে পড়ে। গোমতী তাকে ছাড়েনি, তার পিঠটা এক হাতে ঘিরে রেখে জড়সড় ভঙ্গিতে পাশাপাশি বসে।

চতুরলাল বুঝিবা খবর দিয়ে এসেছিল। এখন দেখা যায়, হল্-ঘরের চারটে দরজা দিয়ে মিলিটারি সিং-এর নৌকর বাহিনী, রসুইকর, কোচোয়ান, দারোয়ান, ড্রাইভার ইত্যাদি মিলিয়ে বিশ বাইশজন ভেতরে ঢুকে পড়েছে। চতুরলাল একদিক থেকে অতি মহান ব্যক্তি। মিলিটারি সিং-এর নৌকর চৌকররা তার মতোই 'চাক্কুকা খেল' কোনোদিনই চোখে দেখেনি, অথচ দেখার ইচ্ছাটা ষোল আনা। সুযোগ যখন একটা পাওয়া গেছে, এদের বঞ্চিত করে একা একা নিজে তা দেখার কথা সে ভাবতেও পারেনি। তা ছাড়া সবাইকে ডেকে আনার পেছনে তার সুচতুর চালও রয়েছে। নিজে সে যতই ক্ষমতাবান আর ক্ষতিকারক হোক না, মিলিটারি সিং-এর একজন দামি নৌকর ছাড়া কিছুই নয়। যারা ছুরির খেলা দেখতে পাবে না তাদের কে কখন হুজৌরের কাছে গোপনে লাগিয়ে দেবে তার তো কিছু ঠিক নেই। কাজেই আগেভাগে সবার জবান বন্ধ করাটা ভীষণ জরুরি।

চতুরলাল বলে, 'সবাই এসে পড়েছে। এবার তোর হাতের জাদু দেখা নাটুয়া।' বলে ফরাসে উঠে তিন-চারটে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে আধশোয়া ভঙ্গিতে বিপুল শরীর এলিয়ে দেয়—রাজকীয় চালে যেভাবে মিলিটারি সিং এবং তাঁর মেহমানরা দিয়ে থাকেন।

ড্রাইভার দারোয়ানদের অবশ্য ফরাসে ওঠার সাহস হয় না। তারা নিচে দেওয়ালের ধার ঘেঁষে লাইন দিয়ে বসে পড়ে। সবার চোখমুখ আগ্রহ এবং উত্তেজনায় ঝকমক করছে।

নাটোয়ার কাঁচুমাচু মুখে ঢোক গিলে বলে, 'লেকেন মুন্সিজি—'

চতুরলালের চোখ কুঁচকে যায়। জিজ্ঞেস করে, 'কী হল?'

নাটোয়ার জানায়, কাল শেষ বেলায় বথযাত্রাওয়ালারা মাত্র চারখানা শুকনো চাপাটি খাইয়েছে, তারপর থেকে এতটা বেলা পর্যন্ত এক দানা খাদ্যও জোটেনি। অসহ্য খিদেয় পেট জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে। মাথা খাড়া রেখে তারা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। শরীরের যা হাল তাতে পেটে কিছু না পড়লে তাদের পক্ষে ওই রকম খতারনাক মরণ-বাঁচনের খেলা দেখানো অসম্ভব।

চতুরলাল বলে, 'ঠিক হ্যায়।' তারপর দেওয়াল ঘেঁষে বসে-থাকা মিলিটারি সিং-এর রসুইকবকে ডেকে নিচু গলায় নাটোয়ারদের তিনজনের জন্য খাবার আনতে বলে।

পনের মিনিটের মধ্যে খাঁটি ভৈসা ঘি-মাখানো প্রচুর চাপাটি, কুঁদরু এবং আলু-পটলের তরকারি, মটর-পনির, অড়হরের ডাল, শুখা মরিচের আচার, বালুসাই এবং প্যাঁড়া এসে পড়ে।

নাটোয়ার এবং গোমতী গলা পর্যন্ত বোঝাই করে খায়। জ্বরের ঘোরে খেতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল ফকিরার কিন্তু এমন উৎকৃষ্ট ভোজন জীবনে আর পাওয়া যাবে কি না, চিন্তা করে সে-ও প্রায় গোগ্রাসে গিলতে থাকে। চতুরলালরা খাওয়ানো দাওয়ানোর ব্যাপারে রথযাত্রাওয়ালাদের মতো চামার নয়। ওদের মুঠি থেকে কিছু গলতেই চায় না। সেদিক থেকে চতুরলালদের মন এবং হাত দুই-ই দরাজ।

খাওয়া দাওয়া চুকে গেলে চতুরলাল জিজ্ঞেস করে, 'কা রে, আচ্ছা ভোজন হুয়া?'

ঢেকুর তুলে নাটোয়ার বলে, 'হাঁ, মুন্সিজি, বহোত আচ্ছা।' যে উদ্দেশ্যে এতদূরে এত কষ্ট করে ছুটে এসেছে, তার আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিল সে। এখন আবার নতুন করে সেটা তাকে চনমনে করে তোলে। চতুরলাল এত ভালো যখন খাইয়েছে, দু'হাত খুলে কি আর বকশিশ দেবে না? নাটোয়ারের ধারণা, নিশ্চয়ই দেবে। আগে-ভাগেই চতুরলালের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করতে শুরু করে নাটোয়ার। ভাবে, জীবনের সেরা খেলাটা আজ সে এদের দেখাবে।

চতুরলাল জিজ্ঞেস করে, 'পেট ভরেছে?'

'হাঁ, বহুত খেয়েছি। জী ভরকে খায়া হ্যায় মুন্সিজি।'

এ বাড়ির সব কিছু নাটোয়ারের মুখস্থ। তার চোখ বেঁধে দিলেও কোথায় কী আছে, ঠিক বার করে ফেলতে পারবে। প্রথমে হল্-এর লাগোয়া একটা ঘর থেকে কাঠের চওড়া বোর্ড এনে লোহার ফ্রেমে আটকে দেওয়ালের সমান্তরাল করে দাঁড় করিয়ে রাখে। তারপর নিয়ে আসে একটা প্রকাণ্ড স্টিলের বাক্স। বাক্সটার ভেতর রয়েছে গোটা বিশেক ধারাল ছুরি। সেগুলোর প্রত্যেকটার ফলা ন' ইঞ্চি লম্বা এবং মুখ খুব ছুঁচলো।

ছুরি বার করে কাঠের স্ট্যান্ডটা থেকে প্রায় পনের ফিট দূরে সেগুলো পর পর সাজিয়ে রাখে নাটোয়ার। তারপর চলে আসে ফকিরার কাছে।

জ্বরের তাড়সে এবং গলা পর্যন্ত ঠেসে খাওয়ার কারণে সোজা হয়ে বসে থাকতে পারছিল না ফকিরা। যদিও গোম্‌তী তাকে ধরে রেখেছে তবু তার ঘাড় ভেঙে মাথা হাঁটুর ওপর ঝুলে পড়েছে।

ফকিরাকে এভাবে দেখে খুব মায়া হচ্ছিল নাটোয়ারের। এই অবস্থায় তাকে বিপজ্জনক ছুরির খেলার ভেতর টেনে আনা ঠিক নয়। কিন্তু উপায়ও নেই। তাদের বেঁচে তো থাকতে হবে। দ্বিধান্বিতভাবে ডাকে, 'চাচা—'

ফকিরা মাথাটা সামান্য তুলে আরক্ত চোখে তাকায়। বলে, 'কা রে?'

'সব নিয়ে এসেছি। ওই দেখ—'

ফকিরা ঘোর ঘোর চোখে তাকায়। ছুরি, দেওয়ালের গায়ে কাঠের স্ট্যান্ড—সমস্ত কিছুই তার জন্য প্রস্তুত। সে আস্তে মাথা নাড়ে, 'হাঁ—'

খুব নরম গলায় নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি পারবে চাচা?'

'পারতেই হবে রে নাটুয়া।' হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে ফকিরা কিন্তু প্রথম বার পেরে ওঠে না, হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে। দু'তিন বারের চেষ্টায় নাটোয়ারের হাত ধরে শেষ পর্যন্ত সে খাড়া হতে পারে।

ধরে ধরে কাঠের স্ট্যান্ডটার দিকে ফকিরাকে নিয়ে যেতে যেতে নাটোয়ার বলে, 'খেলটা বন্ধই করে দিই চাচা—'

এবার বিরক্তই হয় ফকিরা। বলে, 'বললাম তো পারব। খেল বন্ধ হলে আমাদের চলবে?'

নাটোয়ার আর কিছু বলে না। কাঠের স্ট্যান্ডের কাছে এসে সেটার গায়ে ফকিরাকে দাঁড় করিয়ে দেয়, তার হাত দু'টো ঝুলিয়ে স্থির করে রাখতে বলে। অবশ্য এত সব বলার দরকার নেই। ছুরির খেলায় যাবতীয় প্রক্রিয়া ফকিরা জানে।

নাটোয়ার দু'পা পিছিয়ে তাকে লক্ষ করতে থাকে। মাথাটা অল্প অল্প কাঁপছে ফকিরার। এ এমন এক মরা-বাঁচার দুঃসাহসিক খেলা যে ফকিরা ডাইনে বাঁয়ে সামান্য এক আঙুলও যদি হেলে পড়ে সর্বনাশ হয়ে যাবে। নাটোয়ার ভেতরে ভেতরে ভীষণ ঘাবড়ে যায়। এমন 'সাথী' নিয়ে ছুরির খেলা অসম্ভব কিন্তু ফকিরা জেদ ধরেছে কোনোভাবেই খেলা বন্ধ করা চলবে না। সে বলে, 'চাচা, তোমার মাথা ডাইনে বাঁয়ে হিলছে। আমার বহোত ডর লাগছে।'

কাঁপা জড়ানো গলায় ফকিরা বলে, 'কিসের ডর রে?'

'আগর কুছ হো যায় তো—'

'আরে নেহী নেহী, আমি সিধা দাঁড়াচ্ছি। মাথা আর হিলবে না। তুই তোর জায়গায় গিয়ে চাক্কু ফেঁকতে থাক।'

'বহোত হোঁশিয়ার চাচা—'

'হাঁ হাঁ, হোঁশিয়ার। ফিকর মাত্ করনা।'

পনের ফিট দূরে যেখানে ছুরিগুলো সাজানো রয়েছে সেখানে গিয়ে একটা ছুরি তুলে নিয়ে চোখ বুজে নাটোয়ার বিড় বিড় করে বলতে থাকে, 'হো রামজি, হো কিষুণজি, চাচার যেন কিছু না হয়। তা হলে আমি দুনিয়ায় মুখ দেখাতে পারব না, সিরিফ গলায় রশি দিতে হবে।' রামজি কিষুণজির কাছে

আর্জি পেশ করে সে পুরা হল্-ঘরটা একবার দেখে নেয়। সবাই চুপচাপ রুদ্ধশ্বাসে তার আর ফকিরার দিকে তাকিয়ে আছে।

আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে নেয় নাটোয়ার। সামনের দিকে ঝুঁকে একটা ছুরি তুলে আঙুলের ডগা দিয়ে সেটার ছুঁচলো মুখটা পরখ করে নেয়। না, জংটং ধরেনি। তারপর হাতির দাঁতে তৈরি ছুরিটার বাঁটের মাঝখানটা দু'আঙুলে চেপে ধরে নিজেকে প্রস্তুত করে সোজা ফকিরার দিকে তাকায়। ছুরির এই খেলাটা দেখানোর সময় সে নিজের ভেতর এতই ডুবে যায় যে দুনিয়ার কোনোদিকেই তার নজর থাকে না। চারপাশের সমস্ত দৃশ্য শব্দ গন্ধ এবং মানুষজন তার সামনে থেকে একেবারেই মুছে যায়। শুধু বোর্ডের গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ফকিরার শরীরের কাঠামো ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পায় না।

এক মুসলমান ওস্তাদের কাছে এই 'চাক্কুকা খেল'টা শিখেছিল নাটোয়ার। ওস্তাদ তাকে পাখি পড়ানোর মতো করে উঠতে বসতে কানের কাছে অনবরত বলে যেত, নাটোয়াব যখন খেলা দেখাবে তখন মনের ভেতর অন্য কোনো চিন্তা যেন ঢুকতে না দেয়। শরীর আর মনকে পুরোপুরি একমুখি করে রাখতে হবে। দুনিয়া হেজেমজে জাহান্নামে যাক, নাটোয়ারের নজর শুধু থাকবে হাতের ছুরি আর তার লক্ষ্যবস্তুর দিকে। মহাভারত সিরিয়ালে অর্জুনকে লক্ষ্যভেদ করতে দেখেছিল সে। জলে মাছের ছায়া দেখে তীর দিয়ে সেটার চোখ বিঁধেছিল অর্জুন। ছুরির খেলাটা অনেকটা সেইরকম।

ছুরিসুদ্ধ ডান হাতটা খুব ধীরে ধীরে অনেকখানি ওপরে তোলে নাটোয়ার। তার সামনে থেকে ফকিরার শরীরের চারপাশে ঘিরে একটা সরু লাইন ছাড়া আর সব কিছুই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমনকি ফকিরাকেও এখন সে আর দেখতে পাচ্ছে না। ওই লাইনটার ওপর কুড়িটা ছুরি কয়েক ইঞ্চি পর পর তাকে বিঁধিয়ে যেতে হবে। অর্জুনের সেই মৎস্যচক্ষুর মতো ফকিরাকে ঘিরে কাল্পনিক রেখাটা হচ্ছে তার একমাত্র লক্ষ্য।

ছুরিটা যখন নাটোয়ার ছুড়তে যাবে, সেই সময় মেয়ে গলায় আতঙ্ক-ভরা শীর্ণ চিৎকার কানে আসে, 'রুখ যাও, রুখ যাও—'

নাটোয়ারের ঘোর পলকে কেটে যায়। চমকে উঠে সে দেখে গোম্‌তী ঘরের কোণ থেকে কখন যেন উঠে দাঁড়িয়েছে। সে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে; ভয়ে তার দুই চোখ বুঝিবা ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। গোম্‌তী আঙুল বাড়িয়ে ফকিরাকে দেখিয়ে দেয়।

দ্রুত মুখ ফেরাতেই নাটোয়ার দেখতে পায়, ফকিরার শরীর কাঠের স্ট্যান্ডের গা থেকে হেলে নিচে পড়ে যাচ্ছে। গোম্‌তী পাশ থেকে জানায়, ফকিরাকে হেলতে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

নাটোয়ার কিছুই শুনতে পায় না, উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়ে গিয়ে ফকিরা নিচে পড়ে যাওয়ার আগেই তাকে ধরে ফেলে।

ওধারে চতুরলাল থেকে শুরু করে রসুইকর দারোয়ান পর্যন্ত সবাই গভীর উৎকণ্ঠায় উঠে দাঁড়ায়। চতুরলাল শশব্যস্তে জিজ্ঞেস করে, 'কা হুয়া রে নাটুয়া, ফকিরাকো কা হুয়া?'

'চাচা বেহুঁশ হো গিয়া—' বলে খুব সন্তর্পণে কার্পেটের একধারে ফকিরাকে শুইয়ে দেয় নাটোয়ার।

প্রবল জেদ এবং ইচ্ছশক্তিতে ফকিরা কাঠের স্ট্যান্ডের গা ঘেঁষে ছুরির খেলার জন্য দাঁড়িয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দুর্বল শরীর আর নতুন করে আসা জ্বরের কারণে নিজেকে শেষ পর্যন্ত খাড়া রাখতে পারেনি; পুরোপুরি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

চতুরলাল একটা নৌকরের উদ্দেশে বলে, 'এ ঘেঁসুয়া, তুরন্ত পানি লেকে আ—'

ঘেঁসুয়া নামধারী নৌকরটি ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে এক বালতি জল নিয়ে ফিরে আসে।

জলের ঝাপটা দিতে হুঁশ ফিরে আসে ফকিরার। সে চোখ মেলে তাকায়। তাকে ঘিরে নাটোয়ার আর গোম্‌তীই শুধু নয়, দারোয়ান নৌকররাও দাঁড়িয়ে আছে। কখন তারা ফকিরার কাছে চলে এসেচিল, কেউ লক্ষ করেনি। সকলে এলেও চতুরলাল কিন্তু ফরাস থেকে নামেনি। সেখান থেকেই সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'কা রে, গাধ্‌ধেটা আঁখ মেলেছে?'

কে যেন উত্তর দেয়, 'হাঁ মুন্সিজি—'

খেলা শুরু হওয়ার মুখে আচমকা বাধা পড়ায় খুবই বিরক্ত হয়েছিল চতুরলাল। হারামজাদের ছৌয়াটা বেহুঁশ হওয়ার আর সময় পেল না! যাই হোক, তার জ্ঞান ফিরে আসায় খানিকটা আরাম বোধ করে চতুরলাল। বলে, 'তব্ তো ঠিক হ্যায়। খেল চালু করে দে—'

নাটোয়ার উত্তর দেয় না। ফকিরার মুখের ওপর ঝুঁকে সে বলে, 'এখন কেমন লাগছে চাচা?'

ফকিরা খানিকক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসতে বসতে বলে, 'মাথায় কেমন করে যে চক্কর লেগে গেল, বুঝতে পারিনি। চোখের সামনে সব কুছ আন্ধেরা হয়ে গিয়েছিল। এখন ঠিক আছি।'

গলা নামিয়ে নাটোয়ার বলে, 'মুন্সিজি তো খেল শুরু করার কথা বলছে।'

'হাঁ, শুনলাম।

'পারবে কী?'

তক্ষুনি উত্তর দেয় না ফকিরা। বেশ কিছুক্ষণ বাদে অনিশ্চিতভাবে বলে, 'দেখি কোসিস করে।'

নাটোয়ার লক্ষ করে, আগের মতো গোঁ বা আত্মবিশ্বাস কোনোটাই নেই ফকিরার। বেহুঁশ হওয়ার পর মনের দিক থেকে সে কমজোর হয়ে পড়েছে। নাটোয়ার বলে, 'কোসিস করে দরকার নেই।' বলে মুখ ফিরিয়ে চতুরলালের উদ্দেশে হাতজোড় করে বলে, 'মুন্সিজি, মাফি মাঙতা হুঁ। চাচার যা হাল, তাতে আপনাদের চাক্কুকা খেল দেখাতে পারব না।'

চতুরলাল ভেংচে ওঠে, 'দেখাতে পারব না! শালে ভূচ্চরের পাল, যা আভ্ভি খেল শুরু কর।'

অগত্যা ফকিরা আরও বারকয়েক হাতের ভর দিয়ে উঠে কাঠের স্ট্যান্ডটার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু সেখানে পৌঁছুবার আগেই হুড়মুড় করে পড়ে যায়।

নাটোয়ার মনস্থির করে ফেলে, ফকিরাকে নিয়ে আজ কিছুতেই বিপজ্জনক 'চাক্কুকা খেল'টা দেখাবে না। এতে যা হওয়ার হবে। সে হাত জোড় করেই ছিল। বলে, 'মুন্সিজি আপনি নিজের চোখেই সব দেখলেন। এরপরও যদি চাচাকে নিয়ে খেলি—'

এবার ধৈর্য হারিয়ে ফেলে চতুরলাল। রাগে উত্তেজনায় মাথার ভেতর রক্তবাহী শিরাগুলো যেন মুহূর্তে ছিঁড়ে যায় তার। একটা জমজমাট আসর শুরু হতে না হতেই এভাবে মাটি হয়ে যাবে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না সে। এমনিতে চতুরলাল খুবই শান্ত, কোনো কারণেই মাথা গরম করে না, মুখের চিরস্থায়ী স্বর্গীয় হাসিটি সর্বক্ষণ অটুট থাকে তার। কিন্তু এই মুহূর্তে স্বভাববিরুদ্ধ কাজটি করে বসে। চিৎকার করে বলে, 'কুত্তাগুলোকে এত্তে আচ্ছা 'ভোজন' করালাম। এখন বলে কি না, খেল দেখাতে পারবে না। যতক্ষণ না দেখাচ্ছিস, এখান থেকে এক কদমও তোদের বেরুতে দেওয়া হবে না। সমঝা শালা?'

নাটোয়ার উত্তর দেয় না, ভীত বিমর্ষ মুখে চতুরলালের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মেঝেতে কার্পেটের ওপর বসে ছিল ফকিরা। সে ডাকে, 'এ নাটুয়া—নাটুয়া—' নাটোয়ার তার দিকে মুখ ফেরাতে বলে, 'যা হওয়ার হোক, তুই আমাকে ধরে ধরে কাঠের পাটার গায়ে দাঁড় করিয়ে চাক্কু ফেঁকতে থাক।'

নাটোয়ার কিছু বলে না, ফকিরার দিকে হাতও বাড়িয়েও দেয় না।

আচমকা গোম্তী ওধার থেকে ভয়ে ভয়ে নাটোয়ারকে ডাকে, 'এ আদমি, থোড়া ইধার আও—'

ফকিরার মধ্যস্থতায় এবং পরামর্শেই গোম্তীর সঙ্গে মোটামুটি একটা বোঝাপড়া আগেই হয়ে গিয়েছিল। সে একরকম বুঝিয়ে দিয়েছে এই নষ্ট আওরতটার গায়ে হাত অন্তত তুলবে না। তাই বলে মন থেকে সবটুকু বিদ্বেষ আর ঘৃণা বেমালুম উবে গেছে, এমন ভাবার কারণ নেই। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গোম্তীর দিকে মুখ ফেরায় নাটোয়ার। কর্কশ গলায় বলে, 'কা?'

নাটোয়ারের মুখচোখের ভঙ্গি দেখে এবং তার গলার স্বর শুনে যথেষ্ট দমে যায় গোম্তী কিন্তু সাহস করে বলে, 'কাছে এসো, বলছি।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পায়ে পায়ে গোম্‌তীর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় নাটোয়ার। আগের স্বরেই জিজ্ঞেস করে, 'কী দরকার?'

গোম্‌তী ভীরু কলায় যা জানায় তা এইরকম। অসুস্থ রুগ্‌ণ ফকিরাকে কাঠের স্ট্যান্ডের গায়ে দাঁড় করানো উচিত হবে না। খেলা না দেখে মুন্সিজিরা যখন কিছুতেই তাদের মুক্তি দেবে না তখন ফকিরার বদলে তাকে নিয়েই 'চাক্কুকা খেল'টা দেখাক নাটোয়ার।

এই কারণে গোম্‌তী ডাকতে পারে, ভাবা যায়নি। নাটোয়ার চমকে ওঠে। বলে, 'কী বলছিস তুই জানিস? এ হল জিন্দগি আউর মৌতকা খেল।'

'জানি।' নাটোয়ারের চোখের দিকে তাকিয়ে গোম্‌তী বলে, 'চার সাল আগে তোমার কাছে এই খেল্‌টার কথা অনেক বার শুনেছি।'

নাটোয়ারের মনে পড়ে যায়, তার ক্ষণস্থায়ী বিবাহিত জীবনে গোম্‌তীর কাছে ছুরির খেলার খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে তাকে একেবারে চমৎকৃত করে দিয়েছিল। তার খেলা দেখে মিলিটারি সিং এবং সরগনা মেহমানরা কী ধরনের তারিফ করেছেন আর দু'হাত খুলে বকশিশ দিয়েছেন—এ সব শুনতে শুনতে চোখের পাতা পড়ত না গোম্‌তীর। নাটোয়ারের কথার ফাঁকে ফাঁকে মাথা ঈষৎ কাত করে গালে হাত রেখে সে শুধু বলত, 'হাঁ, অ্যায়সা!'

নাটোয়ার বলে, 'লেকেন তুই আওরত। এ সব পারবি না।'

'জরুর পারব। তুমি সিরিফ আমাকে একটু শিখিয়ে দাও।' গোম্‌তী বলতে থাকে, 'খেলটা দেখাতে পারলে যা পাব, তিনজনে ভাগাভাগি করে নেবো। পাইসার বহোত জরুরত।'

ফকিরা খানিক দূর থেকে সবই শুনেছিল। উদ্বেগের সুরে সে বলে, 'নেহী নেহী, বহুকে নিয়ে এই খতারনাক খেল দেখাস না নাটুয়া।'

গোম্‌তী ফকিরার কথা শুনতেই পায় না। নাটোয়ারকে বলে, 'আও হামনিকে সাথ—' বলে সোজা কাঠের স্ট্যান্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

নিজের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা, কিছুই নাটোয়ারের ওপর কাজ করছিল না। অদৃশ্য, প্রবল কোনো আকর্ষণে গোম্‌তী যেন তার দিকে ওকে টেনে নিয়ে যায়।

পেছন থেকে দম-আটকানো, কাতর গলায় ফকিরা সমানে গোঙানির মতো আওয়াজ করে বলে যায়, 'নেহী নেহী নেহী—'

নাটোয়ার গোম্‌তীর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। গোমতী তাকে শান্ত গলায় বলে, 'কীভাবে দাঁড়াতে হবে, বলে দাও।'

অবাক নাটোয়ার লক্ষ করে, আওরতটার চোখেমুখে বা গলার স্বরে ভয়ডর বা আতঙ্কের চিহ্নমাত্র নেই। বেঁচে থাকার জন্য যে কোনোরকম ঝুঁকি নিতে সে প্রস্তুত।

নাটোয়ার জবাব দেয় না, পলকহীন তাকিয়েই থাকে। আজ সকালেই এই মেয়েমানুষটাকে সে খুন করতে চেয়েছিল। একটু আগে তার সম্বন্ধে নাটোয়ারের মাথায় ঘৃণা আর বিদ্বেষ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। কিন্তু এখন তার মনোভাবটা পালটে যেতে শুরু করেছে। গোম্‌তীকে নিয়ে খেলা দেখালে সে-ই শুধু টাকা পাবে না, নাটোয়ার এবং ফকিরারও কয়েকটা দিন বাঁচার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। নিজের অজান্তে তার প্রতি খানিকটা কৃতজ্ঞতাই কি বোধ করতে থাকে নাটোয়ার?

গোম্‌তী তাড়া লাগায়, 'কী হল? বল—'

চমক ভেঙে যেন জেগে ওঠে নাটোয়ার। গোম্‌তীর দু'হাত ধরে কাঠের স্ট্যান্ডটার গায়ে তাকে একটা মূর্তির মতো দাঁড় করিয়ে দেয়। হাত দু'টো শরীরের দু'পাশে নামিয়ে স্থির করে রাখতে বলে। তারপর কয়েক পা পিছিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে নিজের মাথাটা হেলিয়ে গোম্‌তীকে ভালো করে লক্ষ করতে থাকে। যখন বোঝে দাঁড়ানোটা সঠিক হয়েছে তখন বলে, 'যেমন আছিস বিলকুল সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবি।'

গোম্‌তী বলে, 'ঠিক হ্যায়।' তার শরীর এক চুল নড়ে না। কথা বলার জন্য ঠোঁটদু'টো সামান্য ফাঁক হয় মাত্র।

'কোনোদিকে হিলবি না।'

'ঠিক হ্যায়।'

'হিললে জান চলে যেতে পারে। মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

'আমি যখন বলব আঁখ বন্ধ করে ফেলবি।'

'ঠিক হ্যায়।'

এত সব হুঁশিয়ারি দেওয়ার পরও হঠাৎ নাটোয়ার টের পায় তার বুকের ভেতরটা ভীষণ দুলছে। সে একজন দুর্ধর্ষ 'চাক্কুকা খেল'-এর জাদুকর। তার নিশানা এতই নির্ভুল যে টার্গেটে ছুরি ছোড়ার সময় হাত বিন্দুমাত্র কাঁপে না। পাকা ওস্তাদের কাছে তালিম নিয়ে সে এমনই তৈরি হয়ে গেছে যে আজ পর্যন্ত একবারের জন্যও তার ছুরি নিশানার বাইরে গিয়ে লাগেনি।

এতকাল যাদের নিয়ে নাটোয়ার ছুরির খেলা দেখিয়েছে তারা সবাই পুরুষ। গোড়ায় দু-এক বছর নির্দিষ্ট কেউ ছিল না। রামপেয়ার, দাসারি, ঘটেলু—এমনি যখন যাকে পাওয়া গেছে তাকে নিয়েই খেলা দেখিয়েছে সে। ইদানীং কয়েক বছর ফকিরা তার সঙ্গে স্থায়ীভাবে লেগে আছে। কিন্তু আজ এই প্রথম মেয়েমানুষ নিয়ে তাকে খেলা দেখাতে হবে। তার সেই মেয়েমানুষটা কিনা গোম্‌তী! যার জন্য চার সাল সে আক্রোশ পুষে রেখেছে তার জন্য বুকের ভেতর কাঁপুনি ধরে কেন?

একটা বদ আওরতের জন্য দুশ্চিন্তা করে এই মুহূর্তে নিজেকে হয়রান করা ঠিক নয়। মন শক্ত করে নেয় নাটোয়ার। আরও একবার গোম্‌তীকে সতর্ক করে দিয়ে খানিকটা নিস্পৃহ ভঙ্গিতে পনেরো ফিট দূরে আগের সেই জায়গাতে ফিরে যায়।

দর্শকরা ফের বসে পড়েছে। তারা এতদিন শুনে এসেছে, এই রক্ত-জমানো খেলাটা পুরুষরাই দেখিয়ে থাকে। কিন্তু ফকিরার জায়গায় গোম্‌তীকে দেখে তাদের উত্তেজনা এবং হৃৎপিণ্ডের ধকধকানি কয়েক গুণ বেড়ে যায়। চোখের পাতা টান করে তারা গোম্‌তীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

নাটোয়ারের কথামতো চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে গোম্‌তী। হাতদু'টো দু'ধারে মুঠো পাকিয়ে ঝুলছে। শরীর একেবারে স্থির। দেখে মনে হয়, তার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে।

একটা ছুরি তুলে নেয় নাটোয়ার। সেটার ফলা ঠোঁটের কাছে আলগোছে ঠেকিয়ে চোখ বুজে বিড় বিড় করে বলে, 'হো রামজি, হো কিষুণজি, তেরে কিরপা।' তারপর ওস্তাদের উদ্দেশে সেলাম জানিয়ে বলে, 'তেরে মেহেরবানি।' যখনই সে খেলা দেখায়, প্রতিটি ছুরি ছোড়ার আগে মনে মনে এভাবে রামজি আর কৃষুণজি এবং ওস্তাদের কৃপা চেয়ে নেয়। দুই দেবতা এবং ওস্তাদ যেন তার সহায় হয়, কোনোরকম দুর্ঘটনা যেন না ঘটে এবং তার সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে।

একসময় চোখ মেলে গোম্‌তীকে আরও একবার দেখে নেয় নাটোয়ার। সে টের পায় তার ওপর অদৃশ্য একটা শক্তি যেন ভর করছে। বুঝতে পারে, আর তার ভয় নেই।

ধীরে ধীরে ছুরিটা ওপরে তুলে নাটোয়ার ছুড়ে দেয়। সেটা বিজলি চমকের মতো ঝিলিক দিয়ে গোম্‌তীর মাথার চার আঙুল ওপরে গিয়ে গেঁথে যায়। তারপর একের পর এক ছুরি নাটোয়ারের হাত থেকে ছুটে গিয়ে গোম্‌তীর শরীরটাকে ঘিরে কাঠের বোর্ডের গায়ে গেঁথে যেতে থাকে।

কুড়ি নম্বর ছুরিটা ছোড়ার পর দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে নাটোয়ার। প্রচণ্ড ঘামতে শুরু করেছে সে। মুহূর্তে তার জামা এবং প্যান্ট ভিজে সপসপে হয়ে যায়। সারা শরীরের শিরাগুলো টান টান করে খেলা দেখিয়েছে সে, এখন সেগুলো আলগা হয়ে যাচ্ছে। নাটোয়ার টের পায়, যে অলৌকিক শক্তিটা তার ওপর ভর করেছিল সেটা তাকে ছেড়ে গেছে।

ওদিকে যারা দমবন্ধ করে খেলা দেখছিল, এতক্ষণে তাদের ফুসফুসের ভেতর থেকে আটকানো বাতাস বেরিয়ে আসে। তারা একসঙ্গে তারিফের সুরে হইচই বাধিয়ে দেয়। তবে সব আওয়াজ ছাপিয়ে চতুরলালের গলা কয়েক পর্দা উঁচুতে চড়ে, 'শাবাশ রে নাটুয়া, শাবাশ।'

খানিকটা ধাতস্থ হয়ে আস্তে আস্তে মুখ থেকে হাত সরায় নাটোয়ার। তারিফের কথাগুলো তার মাথায় বিশেষ ঢোকে না। এরকম বাহবা সে আগে বহু পেয়েছে।

হঠাৎ ডান পাশের দেওয়ালের কাছ থেকে ফকিরার গলা কানে আসে, 'আরে নাটুয়া, বহুটাকে তো দ্যাখ—'

চমকে সামনে তাকায় নাটোয়ার। কুড়িটা ছুরির মাঝখানে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে গোমতী। খেলা যে শেষ হয়ে গেছে, আওরতটা কি টের পায়নি? না কি ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছে? দৌড়ে সে গোমতীর কাছে চলে যায়। উদ্বিগ্ন মুখে ডাকে, 'এ গোমতী—গোমতী—'

চোখ মেলে তাকায় গোমতী। তাকে দেখে মনে হয় না, এতটুকু ভয় পেয়েছে। যেন কিছুই ঘটেনি, এমন একটা ভঙ্গিতে সে জিজ্ঞেস করে, 'খেল খতম হো চুকা?'

মেয়েমানুষটার দুর্জয় সাহসে অবাক হয়ে যায় নাটোয়ার। চার বছর আগে যে গোমতীকে সে চিনত সে ছিল ভীরু, দুর্বল। অন্তত এ জাতীয় দুঃসাহসী খেলায় তার এগিয়ে আসার কথা ভাবাই যেত না। চার বছরে গোমতী আগাগোড়া বদলে গেছে। হয়ত তার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর নানাভাবে ধাক্কা খেতে খেতে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য মরিয়া হয়েই গোমতীকে মনের জোর বাড়াতে হয়েছে। নইলে চারপাশের খতারনাক দুনিয়া তাকে শেষ করে দিত।

নাটোয়ার বলে, 'হাঁ।'

'আবার কি খেল দেখানো হবে?'

'নেহী।'

ছুরির ঘেরের ভেতর থেকে খুব সতর্কভাবে বেরিয়ে আসে গোমতী। তাকে আর কিছু বলে না নাটোয়ার। সবচেয়ে জরুরি কাজটা এখনও বাকি। দ্রুত বোর্ড থেকে ছুরিগুলো স্টিলের বাক্সে পুরে ফেলে সে। তারপর কাঠের স্ট্যান্ড সুদ্ধু বোর্ডটা এক হাতে, বাক্সটা আরেক হাতে ঝুলিয়ে পাশের ঘরে জায়গামতো রেখে ফের হল্-এ ফিরে আসে।

দারোয়ান নৌকররা এখনও চলে যায়নি। তারা তারিফের মাত্রাটা ক্রমশ বাড়িয়েই চলেছে। এমন চাক্কুর খেল পুরা দুনিয়ায় কেউ কখনও দেখেনি, এটা না দেখলে জীওনভর আপশোশ থেকে যেত, ইত্যাদি।

শুধু তারিফ শুনে তো পেট ভরে না। নাটোয়ার সোজা চতুরলালের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। চতুরলালও আরেক দফা বাহবার বান ডাকিয়ে দেয়। তারিফের তোড় একটু কমলে হাতজোড় করে নাটোয়ার বলে, 'এবার আমরা যাব মুন্সিজি—'

চতুরলাল বলে, 'যাবি? ঠিক হ্যায়। লেকেন একগো বাত। বড়ে সরকার ফিরবেন পুরা এক মাহিনা পরে। এর ভেতর আরেক বার এসে তোর খেলটা আমাদের দেখিয়ে যাস।'

'যাব মুন্সিজি। এবার তা হলে—'

'কী?'

'কিরপা করে আমাদের বকশিশটা যদি দ্যান—'

ঘাড়টা সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকিয়ে চতুরলাল জিজ্ঞেস করে, 'বখশিস? মতলব রুপাইয়া?'

ঢোক গিলে আস্তে মাথা নাড়ে, 'হাঁ।' বড়ে সরকার খেল দেখে আমাদের খুশি করে দিতেন।'

নাটোয়ারের অবিশ্বাস্য আবদারের কথা শুনে একেবারে থ বনে যায় চতুরলাল। অনেকক্ষণ সোজাসুজি তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আচমকা পটকা ফাটার মতো আওয়াজ করে সারা শরীর দুলিয়ে প্রবল তোড়ে হাসতে হাসতে নৌকর কোচোয়ানদের উদ্দেশে বলতে থাকে, 'শুন, শুন তোরা, খেল দেখিয়ে নাটুয়া শালে রুপাইয়া চাইছে!' রুপাইয়া কী রে, ভূচ্চরটাকে হিরা মোতি সোনা চাঁদি চাইতে বল—' বলতে বলতে ফের নাটোয়ারের দিকে মুখ ফেরায়, 'আরে শালে, এত আচ্ছা খিলালাম পিলালাম, তারপর্ পাইসা চাইছিস! যা ভাগ—' আঙুল দিয়ে দরজা দেখিয়ে দেয় সে।

মাথায় আগুন ধরে যায় নাটোয়ারের। এত কষ্ট করে, প্রায় একটা দুরূহ অভিযান চালিয়েই তারা এখানে এসে পৌঁছেছে। আর চতুরলালরা কিনা স্রেফ এক পেট খাইয়ে প্রায় মুফতে খেলাটা দেখে

নিল! কে ভাবতে পেরেছিল চতুরলাল মুন্সি তাঁকে এভাবে ধোঁকা দেবে! ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে একেবারে মরিয়া হয়ে ওঠে নাটোয়ার। হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো বলে, 'পাইসা আমাদের চাই-ই মুন্সিজি। তিন আদমির কমসে কম শও রুপাইয়া—'

চতুরলাল মুন্সির মুখের ওপর কেউ এরকম দাবি জানাতে পারে, সেটাই এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। সমস্ত হল্-ঘরটায় মুহূর্তে স্তব্ধতা নেমে আসে। পাক্কা একটি মিনিট পর শান্ত মুখে মসৃণ হাসি ফুটিয়ে নৌকর দারোয়ানদের হুকুম দেয়, 'ভুচ্চরগুলোকে কোঠিসে নিকাল দে—'

গলার শিরা ছিঁড়ে চেঁচিয়ে ওঠে নাটোয়ার, 'নেহী নেহী—'

কিন্তু তার কথায় কেউ কান দেয় না। যারা এতক্ষণ তার খেলার তারিফ করছিল তারাই এখন হিংস্র জন্তুর মতো চারিদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তিনটি মানুষকে টেনে হেঁচড়ে, ধাক্কা মারতে মারতে নিচে নামিয়ে আনে।

গোম্‌তী আর ফকিরা কোনোরকম বাধা দিচ্ছিল না কিন্তু নাটোয়ার এই প্রতারণা আদৌ মেনে নিতে পারে না। উন্মত্তের মতে আঁচড়ে, কামড়ে, এলোপাথাড়ি হাত-পা চালিয়ে নৌকর দারোয়ানদের একেবারে নাস্তানাবুদ করে দিতে থাকে। সেই সঙ্গে চিৎকার এবং অকথ্য গালাগালও করে যায়। নৌকরেরা মুখ বুজে আঁচড় কামড় হজম করছিল না, তারাও বেধড়ক মেরে নাটোয়ারের নাক মুখ ফাটিয়ে দিচ্ছে।

ফকিরা সমানে নৌকরদের উদ্দেশ্যে আর্জি জানিয়ে যাচ্ছে, 'মাত্ মারো নাটয়াকো, মাত্ মারো ভেইয়া।' নাটোয়ারকে বলছিল, 'হোঁশমে আ নাটুয়া, হোঁশমে আ—'

গোম্‌তীও সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে সেই একই কথা বলে যাচ্ছে, 'আদমিটাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। এত মারলে সিরিফ মরে যাবে।'

একা এতগুলো লোকের সঙ্গে একটানা লড়াই চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত নৌকর দারোয়ানরা তিনজনকে গেটের বাইরে খোয়ার রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

ফকিরা আর গোম্‌তী বাধা না দেওয়ায় তারা তেমন মার খায়নি, ফলে চোটটোট লেগেছে কম। কিন্তু নাটোয়ারের নাক মুখ থেকে রক্ত পড়ছে। ডান ভুরুর ওপরে এবং কণ্ঠার কাছে অনেকটা জায়গা ঢিবির মতো ফুলে উঠেছে। তা ছাড়া খোয়ার রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলার জন্য সারা গায়ে এখানে ওখানে চামড়া ছড়ে অনেকটা করে ছাল উঠে গেছে।

হাতের পেছন দিয়ে মুখের রক্ত মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ায় নাটোয়ার। আগুন-ঝরা চোখে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ক্ষোভে, রাগে, প্রবল আক্রোশে রাস্তায় বারকয়েক লাথি মারে, তারপর চতুরলালের উদ্দেশে এক নাগাড়ে অনেকগুলো খিস্তি আউড়ে তিনবার থুতু ছুড়ে দেয়, 'থুঃ, থুঃ, থুঃ—ঘৃণায় তার মুখ কুঁচকে বেঁকে যেতে থাকে।

রাস্তা থেকে গোম্‌তী আর ফকিরাও উঠে পড়েছিল। জ্বরটা তো রয়েছেই, তার ওপর নৌকরদের টানাটানি এবং ধাক্কায় ফকিরা আরও কাহিল হয়ে পড়েছে। কোনোরকমে টাল সামলাতে সামলাতে দাঁড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করছে সে। আর গোম্‌তী উৎকণ্ঠিতের মতো নাটোয়ারকে লক্ষ করছিল। তার কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'তোমার নাক থেকে ওঠ্ থেকে খুন বেরুচ্ছে।'

বার বার মুছে ফেলা সত্ত্বেও রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না নাটোয়ারের, চুঁইয়ে চুঁইয়ে ক্রমাগত খাপচা খাপচা দাড়ি গোঁফের ওপর গড়িয়ে পড়ছে। সে এতই উত্তেজিত যে শারীরিক কষ্ট টের পাচ্ছিল না। মুখ ফিরিয়ে গোমতীকে বলে, 'বেরোক।'

গোম্‌তী এবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'একটা জিনিস দেবো, তোমার নাকে আর ওঠে লাগাবে?'

নিরাসক্ত সুরে নাটোয়ার বলে, 'কেন?'

'তা হলে খুনটা বন্ধ হয়ে যাবে।'

নাটোয়ার চুপ করে থাকে। বোঝা যায়, তার আপত্তি নেই।

গোম্‌তী রাস্তার ধর থেকে কচি দুর্বা ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নাটোয়ারের ক্ষতের জায়গাগুলোতে পুরু করে লাগিয়ে দেয়।

বহুকাল বাদে মেয়েমানুষের ছোঁয়ায় নাটোয়ারের গায়ে সামান্য কাঁটা দিয়ে ওঠে। হোক নষ্ট আওরত, তবু গোম্‌তী তার এক কালের ঘরবালী তো ঠিকই। তার এই সেবাটুকু ভালোই লাগে।

একসময় নাটোয়ার বলে, 'চল এবার—' বলে চতুরলালদের উদ্দেশে আরও বারকয়েক থুতু ফেলে দু'পা পিছিয়ে ফকিকার একটা হাত ধরে এবং চোখের ইশারায় গোম্‌তীকে অন্য হাতটা ধরতে বলে। তারপর দু'জনে ফকিরাকে ধরাধরি করে বরাবর পশ্চিম দিকে হাঁটতে থাকে।

ফকিরা জিজ্ঞেস করে, 'পাইসা উইসা তো কিছুই মিলল না। এখন কোথায় যাবি নাটুয়া?'

নাটোয়ার জানায়, 'ধোঁকেবাজেরা আমাদের এভাবে ঠকাল! এক মিনিটও আর নমকিপুরায় থাকব না। আগে পাক্কীতে (হাইওয়েতে) তো যাই। যেতে যেতে ভেবে দেখি কোথায় যাওয়া যায়।'

'আউর কোঈ ভরসা নেহী নাটুয়া—'

'কিসের ভরসা?'

'পাইসার। দো-চারগো রুপাইয়া নিয়ে না গেলে কী যে হবে! বিবি বাচ্চাসুদ্ধু সিরিফ ভুখা মরে যাব।'

মিলিটারি সিং-এর বাড়িতেই যখন কিছু পাওয়া গেল না তখন আদৌ কোথাও কিছু জুটবে বলে মনে হয় না। ফকিরাকে আশা-ভরসা দেবার মতো কিছুই নেই। নাটোয়ার চুপ করে থাকে।

পেছন দিকের মাঠ পেরিয়ে নমকিপুরা টাউনে ঢুকেছিল নাটোয়ারেরা। এখন তারা হাঁটুভরা ধুলো মাড়িয়ে, মানুষজনের ভিড় ঠেলে, টাঙ্গা অটো সাইকেল-রিকশা ভৈসা আর বয়েল গাড়ির পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে চলেছে। হাইওয়েটা ওধারেই।

বিকেল হয়ে আসছে। কালকের মতোই আজও আকাশ জুড়ে এলোমেলো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। সূর্য মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে চলে যায়, আবার বেরিয়ে পড়ে।

একসময় তিনজন নমকিপুরা টাউন পেছনে রেখে হাইওয়েতে পৌঁছে যায়, আর তখনই সেই চেনা গানের সুরটা বাতাসে ভেসে আসতে থাকে, 'বোল রাধা বোল, সঙ্গম হোগা কি নেহী—'

নয়

চমকে নাটোয়াররা পেছন ফিরে যা দেখতে পায় সেটা তাদের খুবই পরিচিত দৃশ্য। দূরে হাইওয়ের একটা বাঁক ঘুরে হিন্দি গানের সুর বাজাতে বাজাতে প্রথমে আসছে সেই ব্যান্ড পার্টিটা, তার পর মহাদেওজির রথ, জিপ, জিপের পর তারানাথ মিশ্রর সুসজ্জিত মাটাডোর, তারপর পত্রকারদের মোটর, দুমরলালদের টাঙ্গা এবং সবার শেষে হাভাতে মানুষদের জুলুস। কাল যেমনটি দেখা গিয়েছিল হুবহু সেইভাবেই গাড়িটাড়িগুলো পর পর রেখে মিছিল বার করা হয়েছে।

গোম্‌তী বলে, 'ভারতমাতা রথ।'

ফকিরা বলে, 'হাঁ। এদিকে কোথাও আধারশিলা বসাতে আসছে।'

একদৃষ্টে তারানাথের রথটথের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছিল নাটোয়ার। সে বলে, 'একটা কাজ করলে কেমন হয় চাচা?'

ফকিরা জিজ্ঞেস করে, 'কা?'

নাটোয়ার জানায়, এই মুহূর্ত তাদের নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য তো নেই। কোথায় যাওয়া যায় যতক্ষণ সেটা ঠিক না হচ্ছে, ততক্ষণ 'ভারতমাতা রথ'-এর জুলুসের সঙ্গেই না হয় হাঁটা যাক।

'বেফায়দা হেঁটে কী হবে?'

'মতলব?'

ফকিরা খুবই সতর্ক এবং হিসেবি মানুষ। সে যা বলে তা এইরকম। দিন অনেকখানি হেলে গেছে, বিকেল হতে বেশি বাকি নেই। ভারতমাতাওয়ালারা নিশ্চয়ই এর ভেতর মিছিলের লোকজনকে 'দুফারের ভোজন' করিয়ে দিয়েছে। আজকের মতো খাওয়া-দাওয়াই যদি চুকে গিয়ে থাকে, অকারণে রথের পেছন দৌড়ে নিজেদের ক্লান্ত করে লাভ নেই।

সংশয়ের গলায় নাটোয়ার বলে, 'দুফারের ভোজনের পর আর কি ওরা জুলুস বার করে? কাল কিন্তু করেনি।'

অনিশ্চিতভাবে হাওয়ায় একটা হাত ঘুরিয়ে ফকিরা বলে, 'কৌন জানে?'

নাটোয়ার বলে, 'ওরা কাছে এলে পুছতাছ করে দেখি।'

'দ্যাখ।'

ব্যান্ড পার্টিতে সেই গানটার সুর বাজাতে বাজাতে 'ভারতমাতা রথ' এগিয়ে আসতে থাকে। 'বোল বাধা বোল, সঙ্গম হোগা কি নেহী—'

নাটোয়ার একদৃষ্টে রথওয়ালাদের জুলুসের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছিল। হঠাৎ কিছু মাথায় আসতে ফকিরাকে ডাকে, 'চাচা—'

ফকিরা আস্তে সাড়া দেয়, 'কী বলছিস?'

নাটোয়ার জানায়, বেলা হেলে গেছে। আজ আর কোথাও গিয়ে কামাই-এর সম্ভাবনা নেই। কিছুক্ষণ বাদে সন্ধে নেমে যাবে। রাতে তারা কোথায় থাকবে, ঠিক নেই। রথবালাদের সঙ্গে গেলে যদি খাবার না-ও মেলে, রাতটা অন্তত নিশ্চিন্তে কাটানো যাবে। নিশ্চয়ই ওদের জন্য কোনো টাউন বা গঞ্জে কালকের মতো শামিয়ানা খাটানো রয়েছে। রাতটা ওদের সঙ্গে কাটিয়ে কাল সকালে উঠে ভেবেচিন্তে কিছু একটা করা যাবে।

নাটোয়ার যা বলেছে, আপাতত তার চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কিছু হয় না। ফকিরা বলে, 'ঠিক হ্যায়।'

আগে নাটোয়াররা লক্ষ করেনি। হঠাৎ তাদের চোখে পড়ে নমকিপুরা টাউনের অগুনতি মানুষ দৌড়ুতে দৌড়ুতে হাইওয়ের দিকে আসছে। তাদের অনেকের হাতে শাঁখ, ঝুরো ফুল, ফুলের মালা। কাল নহরগঞ্জে এবং তার আগে আরও দু-একটা গাঁয়ে যা দেখা গিয়েছিল, হুবহু সেই দৃশ্য।

একসময় 'ভারতমাতা রথ' নাটোয়ারদের সামনে এসে থামে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যান্ড পার্টির বাজনা বন্ধ হয়ে যায়।

কালকের মতোই দুমরলালরা গলার শির ফুলিয়ে স্লোগান দিতে থাকে।

'ভারতমাতাকি—'

'জয়।'

'ভবিষ্য যাত্রা—'

'জিন্দাবাদ।'

'দেশপ্রেমী তারানাথ মিশ্র—'

'জিন্দাবাদ।'

এর মধ্যেই চারিদিকে শাঁখ বেজে ওঠে। তারানাথ মিশ্রর মাটাডোরে নমকিপুরার লোকজনেরা পরম ভক্তিভরে ফুল ছুড়তে থাকে; কেউ কেউ এগিয়ে তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দেয়।

ওদিকে স্লোগানে সমস্ত এলাকাটা সরগরম করে তোলার পর দুমরলাল প্রবল আবেগের গলায় রথযাত্রার মহৎ উদ্দেশ্য, গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে তারানাথজির আধারশিলা বসাতে বসাতে যাওয়ার কারণ, ইত্যাদি জানিয়ে দর্শকদের উদ্দেশে বলতে থাকে, 'আইয়ে আইয়ে, জুলুসমে সামিল হো যাইয়ে—' মিছিলে যোগ দিলে উৎকৃষ্ট 'ভোজন' যে করানো হবে, তার ওপর বিশেষভাবে জোর দেয় সে।

ভোজনের টোপটা ব্যর্থ হয় না। কাল যেমন দেখা গিয়েছিল, আজও তেমনি মিছিলের লেজের দিকটা মুহূর্তে পনেরো বিশ হাত বেড়ে যায়।

নাটোয়ার ফকিরার একটা হাত ধরে রেখেছিল। হাতটা ছেড়ে দিয়ে মিছিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে একটা মাঝবয়সী খয়াটে চেহারার গেঁয়ো লোককে জিজ্ঞেস করে, 'কখন থেকে তুমি জুলুসের সঙ্গে ঘুরছ?'

লোকটা বলে, 'সুবেসে।'

মনে মনে আন্দাজ করে নিয়ে নাটোয়ার বলে, 'তা হলে নহরগঞ্জ থেকে আসছ?'

'তুমি জানলে কী করে?'

'আমি কাল রথবালাদের সঙ্গে নহরগঞ্জে ছিলাম।'

ছিলই যদি, তা হলে কখন এই নমকিপুরায় এসে হাইওয়ের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করে না লোকটা। আসলে তা নিয়ে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

নাটোয়ার শুধোয়, 'তারানাথজি আজ ক'টা আধারশিলা বসিয়েছেন?'

লোকটা বলে, 'সিরিফ একগো।'

'আরও বসাবেন?'

'হাঁ। গয়ারপুরে আউর একগো বসিয়ে আজকের মতো কাম খতম। কাল সুবে ফের রথ বেরুবে।'

গয়ারপুর এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়, বড় জোর মাইল তিনেক। সন্ধের ঢের আগেই 'ভারতমাতা রথ' সেখানে পৌঁছে যাবে। কিন্তু গয়ারপুর নিয়ে আদৌ মাথাব্যথা নেই নাটোয়ারের। সে এবার আসল প্রসঙ্গে চলে আসে। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'আজ দুফারকা ভোজন কি হয়ে গেছে?'

লোকটা মাথা নাড়ে, 'নেহী ভেইয়া। রথবালারা বলেছে গয়ারপুরে আধারশিলা বসাবার পর খিলাবার ব্যাওস্থা করবে।'

এই অত্যন্ত জরুরি খবরটা নাটোয়ারকে চাঙ্গা তো করে তোলেই, সে যখন গিয়ে ফকিরাদের জানায় তাদের ক্লান্ত ধসে-পড়া হাত-পায়ে বিজলি চমকে যায়। রথযাত্রাওয়ালাদের দৌলতে অন্তত আরো একটা বেলার জন্য তারা নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

ফকিরা বলে, 'চল, জুলুসে ঢুকে যাই।'

ওরা মিছিলের শেষের দিকে যায় না, ধাক্কাধাক্কি করে সামনের দিকে ঢুকে দুমরলালদের টাঙ্গার পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়।

একসময় ব্যান্ড পার্টি 'বোল বাধা বোল—' সুর বাজিয়ে ফের চলতে শুরু করে। তার পেছনে একে একে মহাদেওজির জিপ, তারানাথজির মাটাডোর, তিন পত্রকারকে নিয়ে মোটর, ট্রাক, দুমরলালদের টাঙ্গা এবং সবার শেষে মিছিলও নমকিপুরা টাউনকে বাঁয়ে রেখে এগিয়ে যায়।

দুমরলাল টাঙ্গার ব্যাক সিটের মিছিলের দিকে মুখ করে বসে আছে। নাটোয়ারদের মুখে ওপর চোখ পড়তে তার ভুরু দু'টো নেচে ওঠে। সে ওদের চিনতে পেরেছে। বলে, 'কা রে ভূচ্চরেরা, কাল তোবা জুলুসে ছিলি না?'

নাটোয়ার বলে, 'হাঁ দুমরলালজি—'

'সুবে উঠে তোদের দেখতে পেলাম না। কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছিলি?'

লোকটার গিধের চোখ। জুলুসের এত লোকজনের মধ্যে তাদের গতিবিধি ঠিক লক্ষ করেছে।

নাটোয়ার অবশ্য নমকিপুরায় গিয়ে মিলিটারি সিং-এর বাড়িতে ছুরি খেলার কথাটা জানায় না। দুনিয়ার সবচেয়ে সরল ভোলাভালা মানুষটার মতো মুখ করে বলে, 'থোড়া কুছ জরুরত থা। তাই ওধারের একটা গাঁওয়ে গিয়েছিলাম।' বলে পশ্চিম দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়। সেদিকে গাঁ-টা কিছুই চোখে পড়ে না, শুধু ধুধু ফাঁকা মাঠ, মাঠের পর ঝাপসা পাহাড়ের রেঞ্জ। এই রেঞ্জটা বরাবর দিগন্তের গা ঘেঁষে পশ্চিম থেকে সোজা পুবে চলে গেছে।

দুমরলাল ভুরু কুঁচকে বলে, 'হারামজাদকা বেটোয়া, ধান্দাটা ভালই করেছিস।'

বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে নাটোয়ার।

দুমরলাল এবার বলে, 'সুবে থেকে 'ভারতমাতা রথ'-এর সঙ্গে হাঁটতে হল না। আরামসে এই বিকেলে দেড় দো ঘন্টা হেঁটে পুরা 'ভোজন' মিলে যাবে।'

তাদের কৌশলটা যে এভাবে দুমরলাল ধরে ফেলবে, নাটোয়ার ভাবতে পারেনি। গলার ভেতর হিক্কা তোলার মতো আওয়াজ করে সে বলে, 'নেহী, নেহী দুমরলালজি। সচ্, সচ্ বলছি, ওধারের গাঁওয়ে যাওয়াটা বহোত জরুরত ছিল। তাই—'

সেয়ানা উকিলদের মতো আর জেরাটেরা করে না দুমরলাল। শুধু বলে, 'এখন থেকে জুলুসের সঙ্গে পুরা টাইম না হাঁটলে ভোজন বন্ধ। সমঝা?'

'সমঝ গিয়া দুমরলালজি।'

দুমরলাল আর কিছু বলে না। নাটোয়ারদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে টাঙ্গায় তার ডাইনে যে দু'জন বসে ছিল তাদের দিকে ফিরে গল্প জুড়ে দেয়। নাটোয়ারদের উদ্বেগ অনেকটাই কেটে যায়।

উল্টোপাল্টা হাওয়ায় আকাশে যে ছন্নছাড়া মেঘের টুকরোগুলো এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছিল, কখন সেগুলো পশ্চিম দিকে জড়ো হতে শুরু করেছে, কে জানে। আকাশের যা গতিক তাতে আজই হয়ত সন্ধের দিকে বৃষ্টি নেমে যাবে। রোদে এখন আর ধার নেই। মরা সোনার মতো ম্যাড়মেড়ে আলো মাঠঘাট আর গাছপালার গায়ে লেগে আছে।

কিছুক্ষণ আগেও রঙিন কাগজের টুকরোর মতো মাথার ওপর অজস্র পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিল। এখন তারা বোধহয় ঝড়বৃষ্টির গন্ধ পেয়ে গেছে, তাই আকাশ ফাঁকা করে ঝাঁকে ঝাঁকে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যাচ্ছে।

এখন ঘাম দিয়ে ফকিরার জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে। ফলে আরও খানিকটা কাহিল হয়ে পড়েছে সে। দু'পাশ থেকে তার দু'হাত ধরে আগের মতোই হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে গোমতী এবং নাটোয়ার।

একসময় ফকিরা ডেকে ওঠে, 'নাটুয়া রে—'

নাটোয়ার ভাবছিল 'ভারতমাতা রথ'-এর পেছনে একবেলা খাওয়ার আশায় মাইলের পর মাইল হেঁটে যাওয়াটা কোনো ক্রমেই লাভজনক নয়। কিন্তু মিলিটারি রিং-এর হাভেলিতে ব্যর্থ অভিযানের পর টাকার জন্য আর কী করা যেতে পারে, সেটা তার মাথায় একেবারেই আসছিল না। ফকিরার ডাক কানে আসতেই চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়, বলে, 'কা চাচা?'

'মালুম হচ্ছে আমি আর বেশিদূর হাঁটতে পারব না। হাত-পা বিলকুল ভেঙে আসছে।'

ফকিরার দু'ধারে নাটোয়ার আর গোমতী বেশ ঘাবড়েই যায়। উদ্বিগ্ন মুখে নাটোয়ার বলে, 'তা হলে কি জুলুস থেকে বেরিয়ে যাব? সড়কের ধারে বসে জিরিয়ে নেবে?'

ফকিরা বলে, 'আকাশের হালচাল দেখছিস? বারীষ নামলে সিরিফ ভিজতে হবে। কাছাকাছি গাঁও নেই যে সাহারা মিলবে। তারানাথজিরা তো গয়ারপুরে যাচ্ছে?'

'হাঁ।'

'আমাকে গয়ারপুর পর্যন্ত টেনে টেনে নিয়ে চল। এখন জুলুস থেকে বেরিয়ে গেলে একবেলার খানাটা খোয়া যাবে।'

অশক্ত শরীরেও ফকিরার মস্তিষ্ক যে কাজ করে যাচ্ছে তা জেনে নাটোয়ার চমৎকৃত। 'উৎকৃষ্ট ভোজন'টি সে কোনোমতেই হাতছাড়া করতে রাজি নয়। ব্যস্তভাবে নাটোয়ার বলে, 'হাঁ হাঁ, ঠিক বাত।'

'জুলুসের সেই লোকটা তখন তোকে বলছিল, তারানাথজিরা আজকের রাতটা গয়ারপুরে থাকবেন। জরুর ওখানে শামিয়ানা উমিয়ানা খাটানো রয়েছে।'

'হোগা অ্যায়সা।'

'বারীসের ছিটা পড়লে ভিজতে হবে না।'

'হাঁ।'

'রাতটা আমরা ওখানেই কাটিয়ে দেবো। সুবে উঠে ট্রাকবালাদের হাতে পায়ে ধরে একটা গাড়িতে উঠব। ওরা আমাদের গাঁওয়ের নজদিগ পৌঁছুলে নেমে যাব।' বলে একটু থামে ফকিরা। জোরে জোরে শ্বাস টেনে ফের শুরু করে, 'তোরা কি আমার সঙ্গে ফিরে যাবি?'

নাটোয়ার জানায়, একবার যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়েই পড়েছে, খালি হাতে সে অন্তত কিছুতেই ফিরে যাচ্ছে না।

এবার ফকিরা গোম্‌তীকে জিজ্ঞেস করে, 'আর তুই?'
গোম্‌তীও একই উত্তর দেয়। টাকাপয়সা জোগাড় করতে না পারলে তার পক্ষেও ফেরা সম্ভব নয়।
ফকিরা নির্জীব স্বরে বলে, 'ঠিক হ্যায়। আমার বুখারটাই সব বরবাদ করে দিল।'

মাইলখানেক যাওয়ার পর পাশাপাশি দু'খানা গ্রাম পড়ল। 'ভারতমাতা রথ' সেখানে আসতে দেখা যায়, হাইওয়ের দু'ধারে সামান্য কিছু লোকজন ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভব ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় তেমন ভিড় হয়নি।

এত অল্প মানুষকে খুশি করার জন্য 'ভারতমাতা রথ'-এর গতি কমানোর মানে হয় না। তা ছাড়া উদ্যোক্তাদের মাথায় আসন্ন ঝড়বৃষ্টির ব্যাপারটা হয়ত কাজ করছে।

'বোল রাধা বোল—' সুর বাজাতে বাজাতে রথ এগিয়ে যায়। অবশ্য এর মধ্যে রাস্তার ধারের লোকেরা তারানাথজিকে ফুলটুল দিয়ে কৃতার্থ বোধ করে। আর মাহদেও-এর আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা এবং জনতার উদ্দেশে জুলুসে যোগ দেবার জন্য দুমরলালের আমন্ত্রণ জানানোটাও হয়ে যায়। বিশেষ করে উৎকৃষ্ট ভোজনের কথাটা বার বার জানিয়ে দিতে ভোলে না দুমরলাল।

বেলা থাকতে থাকতেই 'ভারতমাতা রথ' গয়ারপুর পৌঁছে যায়।

দশ

গয়ারপুর শহরও না, গ্রামও না। গ্রাম এবং শহরের মাঝামাঝি একটা জায়গা। নমকিপুরার মতো অত না হলেও প্রচুর লোকজন রাস্তার দু'ধারে ফুল মালা শাঁখ ইত্যাদি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানেও বড় প্যান্ডেলের পাশে ছোট জমকালো শামিয়ানা দেখা যাচ্ছে। আধারশিলা ওই শামিয়ানার তলায় প্রতিষ্ঠা করবেন তারানাথ মিশ্র।

যথারীতি 'বোল রাধা বোল—' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শাঁখ বাজিয়ে ফুলমালা দিয়ে গয়ারপুরের লোকেরা তারানাথজিকে অভ্যর্থনা জানায়। তারপর তাঁকে সসম্ভ্রমে নামিয়ে নিয়ে শামিয়ানার তলায় সিংহাসনের মতো একটি দামি আরামদায়ক প্রকাণ্ড চেয়ারে বসানো হয়।

নহরগঞ্জে যা যা হয়েছিল, একে একে এখানেও সে সব ঘটে যায়। রথযাত্রার উদ্দেশ্য জানিয়ে কাঁপা গলায় তারানাথজির আবেগময় বক্তৃতা, আগামী চুনাও অর্থাৎ নির্বাচনের জন্য ভোট প্রার্থনা, শিলান্যাস, ইত্যাদি। এখানকার শিলান্যাসটা করা হয়েছে একটা বড় হাসপাতালের জন্য। ভবিষ্যতে নির্বাচনে জিততে পারলে এই হাসপাতালটা হবে গয়ারপুর এবং আর আশেপাশের দশ-বারোটা গ্রামের জনগণকে তাঁর তরফে সামান্য উপহার।

শিলান্যাসের পর বড় প্যান্ডেলের তলায় মিছিলের লোকদের কাতার দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়। এবার শালপাতার ঠোঙায় তাদের খাবার দেওয়া হবে।

একধারে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে আছে ফকিরা, তার দু'পাশে গোম্‌তী আর নাটোয়ার।

হাঁটুর ভেতর থুতনি রেখে ফকিরা কিছু ভাবছিল। সে খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কা রে নাটুয়া, আমি তো কাল সুবে সুবে চলে যাব। তোরা কী করবি? জুলুসের সঙ্গে ঘুরবি?'

নাটোয়ার জোরে জোরে মাথা নাড়ে, 'নেহী, কভী নেহী চাচা। আন্ধেরা থাকতে থাকতে আমিও চলে যাব।' মুখ ঘুরিয়ে গোমতীকে দেখাতে দেখাতে বলে, 'ও আওরত কী করবে, আমি জানি না।'

গোম্‌তী সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'আমিও বেফায়দা জুলুসের সঙ্গে ঘুরব না।'

ফকিরা জিজ্ঞেস করে, 'তব্।'

'দেখি কী করা যায়। রাতটা তো কাটুক—'

একটু চুপচাপ।

তারপর গলার স্বর আরও খাদে ঢুকিয়ে ফকিরা বলে, 'একটা কথা ভাবছিলাম রে নাটুয়া—'

নাটোয়ার বলে, 'কা চাচা?'

'আজ দুমরলালজিরা যে খানাউনা দেবে, আজই ওটা খেয়ে ফেলব না।'

নাটোয়ার অবাক হয়ে যায়। বলে, 'কী করবে তা হলে?'

ফকিরা বলে, 'রেখে দেবো। কাল খানা জুটবে কিনা, জুটলে কখন জুটবে, কৌন জানে। হয়তো কিছু রেখে দেওয়া ভাল।'

কথাটা ঠিকই বলেছে ফকিরা। লোকটা সত্যিই দূরদর্শী। নাটোয়ার আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'হাঁ। লেকেন—'

'কী?'

'সবার সঙ্গে বসে না খেলে দুমরলালেরা গুস্‌সা করবে।'

'আরে বাবা, যতক্ষণ আমরা খাব, পুরা টেইম (টাইম) কি আর ওরা আমাদের ওপর নজর রাখতে পারবে? মওকা বুঝে চাপাটি উপাটি ঝোলায় সরিয়ে ফেলব।'

পরের দিনের জন্য খাবার মজুত করে রাখাটাই স্থির হয়। পাওয়ামাত্র খেয়ে ফেললে দুঃসময়ে চলবে কী করে?

একসময় খাবার এসে যায়। আজ খাদ্যবস্তুর ঘটা কিছু বেশি। দুমরলাল এবং তার সঙ্গীরা শালপাতার থালায় ছ'খানা করে চাপাটি, প্রচুর ভাজি, বুন্দিয়া এবং একটি করে বড় গুলাবজামুন সাজিয়ে সবার হাতে হাতে দিতে থাকে।

নাটোয়াররা খুবই খুশি। তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। ফকিরা ফিসফিসিয়ে বলে, 'না এলে ঠকে যেতাম রে নাটুয়া।'

নাটোয়ার তৎক্ষণাৎ সায় দেয়, 'হাঁ।'

এই সময় প্যান্ডেলের চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। স্বয়ং তারানাথ মিশ্র সবার খাওয়ার তদারকি করতে এসেছে। সারা মুখে বিগলিত স্বর্গীয় একটি হাসি ফুটিয়ে মধুর গলায় বলেন, 'তোমরা আপনা আমার আদমি। পেট ভরে ভোজন কর। আরও চাপাটি দরকার হলে চেয়ে নেবে।'

তারানাথ গোটা প্যান্ডেলময় ঘুরতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে সেই তিন পত্রকারও ঘুরছে। তাদের কেউ ক্যামেরা তাক করে ছবি তুলছে, সেই জুলুসের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে ছোটো খাতায় কী সব লিখে নিচ্ছে। আরেক জন তারানাথের গায়ের সঙ্গে লেগে থেকে সমানে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছে। তিনি জুলুসের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে হাসিমুখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন।

তারাানাথ যখন নাটোয়ারদের কাছাকাছি এসেছেন সেই সময় এক পত্রকার তাঁকে জিজ্ঞেস করে, 'একটা কথা জানার খুব ইচ্ছে হচ্ছে তারানাথজি—'

তারানাথ বলে, 'হাঁ হাঁ, বোলিয়ে—'

'এমন 'গম্ভীর' কারণে রথযাত্রা শুরু করেছেন। কিন্তু চটকদার হিন্দি ফিল্মের সুর বাজাতে বাজাতে চলেছেন কেন? কোঈ পেট্রিওটিক গানের মিউজিক বাজালে হ'ত না?' বলে পত্রকার তারানাথজির মুখের দিকে তাকায়।

তারানাথ মিশ্র মুখ টিপে চোখ কুঁচকে সামান্য হাসেন। ঘাড় হেলিয়ে হালকা গলায় বলেন, 'পত্রকারজি, আপনি তো বুদ্ধিমান আদমি, আপনিই আন্দাজ করুন না—'

'পারছি না।'

অত্যন্ত গোপন আর দামি খবর দেবার ভঙ্গিতে তারানাথ বলেন, 'ফিলমি গানার সুর না বাজালে লোক আসবে? পলটিকসের সঙেগ ফিলিম না মেলালে আজকাল জন-সংযোগটা পুরা হয় না। পিপলের সঙ্গে কনটাক্টের জন্যে ফিলিমটা বহুত জরুরি।'

পত্রকার কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, তারপর তারিফের গলায় হেসে হেসে বলে, 'ফাইন, ফাইন। তারানাথজি আপনাকে রুখতে পারবে না কেউ।'

'ধন্যবাদ।'

ওদিকে নাটোয়াররা বেশ কয়েক বার চাপাটি ভাজি চেয়ে নিয়েছে। প্রচুর খাবারদাবার পেয়ে যাওয়ায় খানিকটা তারা খেয়ে ফেলে, অনেকটাই কালকের জন্য থলেতে ভরে রাখে। দেখা যায়, শুধুমাত্র তারাই দূরদর্শী নয়, জুলুসের প্রায় সবাই তাদের মতো ধুরন্ধর। সবার চিন্তাভাবনা প্রায় একই খাতে বইছে। ওরাও ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে খাবারের বেশির ভাগটাই পরের দিনের জন্য জমিয়ে রাখে।

'ভোজন' মিটতে মিটতে সন্ধে নেমে যায়। দুমরলালেরা কয়েকটা হ্যাজাক জ্বেলে প্যাণ্ডেলে এবং শামিয়ানায় টাঙিয়ে দিতে দিতে জানিয়ে দেয়, পাক্কা এক ঘণ্টা এই আলো জ্বালিয়ে রাখা হবে। এর ভেতর যেন সবাই শোবার ব্যবস্থা করে ফেলে।

ঠিক ঘণ্টাখানেক বাদে হ্যাজাকগুলো নিভিয়ে ফেলা হল। অবশ্য ততক্ষণে সবাই প্যাণ্ডেলের চারিদিকে জায়গা করে নিয়ে শুয়ে পড়েছে। কেউ কেউ গল্পসল্প করছে। বেশির ভাগেরই চোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছে। সারাদিন মাইলের পর মাইল হেঁটে কতক্ষণ আর জেগে থাকা যায়!

এতক্ষণে আকাশে মেঘ আরও জমাট বেঁধেছে। থেকে থেকেই বিজলি চমকে যাচ্ছে। গুর গুর করে ভারী গম্ভীর ভয়ঙ্কর একটা আওয়াজ আকাশের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আয়োজনটা পুরোপুরিই হয়ে আছে। এখন যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নেমে যাবে।

প্যাণ্ডেলের একধারে নাটোয়াররা তিনজন শুয়ে পড়েছিল। ফকিরা মাঝখানে। তার ডাইনে নাটোয়ার, বাঁয়ে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে গোমতী। মাটিতে পিঠ ঠেকানোমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে ফকিরা। তবে নাটোয়ার এখনও জেগেই আছে। হ্যাজাকের আলো আটকাবার জন্য চোখের ওপর দুই হাত আড়াআড়ি রেখে দিয়েছে। গোমতী ঘুমিয়েছে কিনা সে জানে না।

কথামতো ঠিক এক ঘণ্টা পরেই হ্যাজাক নিভিয়ে দেয় দুমরলালেরা। মুহূর্তে চারিদিক অন্ধকারে ভরে যায়। অন্ধকারটা এতই গাঢ় যে পাঁচ হাত দূরে নজর চলে না।

সারা শরীরে অসীম ক্লান্তি, আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ, ঠান্ডা হাওয়া—এক ঘুমে রাত কাবার করে দেবার মতো সব উপকরণই মজুত, তবু ঘুম আসছে না নাটোয়ারের। টাকাপয়সার চিন্তাটা তার মাথায় সমানে ঘুরছে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ঘাটানিয়া টাউনের টহলরামজির কথা মনে পড়ে যায়। ঘাটানিয়া এখান থেকে মাইল পাঁচেক উত্তর-পুবে। টহলরাম ওই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ঠিকাদার। বারোমাসই গোটা উত্তর বিহার আর নেপাল জুড়ে তার কিছু না কিছু কাজ চলতেই থাকে। সড়ক বানানো, জঙ্গল কাটাই, কারখানার জন্য জমি দুরস্ত করা, পাথর দিয়ে নদীর বাঁধ তৈরি, ইত্যাদি হাজার রকমের কনট্রাক্ট নিয়ে থাকে সে। তার কাছে অনেক বার কাজ করেছে নাটোয়ার। লোকটার বিপুল চেহারার মধ্যে বিশাল একটি দিল রয়েছে। অন্য ঠিকাদারের চেয়ে সে ঢের বেশি মজুরি দিয়ে থাকে এবং কাজ শেষ হওয়ামাত্র পাই পাই হিসেব মিটিয়ে দেয়। অনেক সময় পরে কাজ করে দেবার জন্য আগাম টাকাও দিয়ে থাকে। বিশেষ করে নাটোয়ারের ওপর তার অগাধ আস্থা। টহলরাম জানে তাকে আগাম টাকা দিলে মার যাবে না।

নাটোয়ার ঠিক করে ফেলে কাল রাত থাকতে থাকতে এখান থেকে বেরিয়ে পড়বে। টহলরামজি যদি আপাতত কাজ না-ও দিতে পারে, পরে কাজ করে দেবার কড়ারে কিছু টাকা চেয়ে নেবে। আকাশে মেঘের যে সাজগোজ তাতে আজ থেকেই বৃষ্টি নামার সম্ভাবনা। আর বৃষ্টি মানেই চাষবাস। কিন্তু জমিতে লাঙল নামালেই জমি-মালিকেরা মজুরি দেবে না, তার জন্য দু-চারদিন সবুর করতে হবে। সেই ক'টা দিন পেট চালাতে হবে তো।

টহলরামের কথা মনে পড়তে দুশ্চিন্তা কেটে যায় নাটোয়ারের। বেশ আরামই বোধ করে সে। আগেই যদি তার কথা মাথায় আসত ভারতমাতা রথ-এর পেছন পেছন অকারণ এতটা হাঁটাহাঁটি করতে হ'ত না, নমকিপুরা থেকে মাঠ ভেঙে সোজা ঘাটানিয়ায় চলে যাওয়া যেত।

আস্তে আস্তে চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে চারিদিকে তাকায় নাটোয়ার। দূরে দূরে দু-একজনের চাপা ঘুমন্ত গলা শোনা যাচ্ছে। কী বলছে বোঝা যায় না। ওরা ছাড়া আর বোধ হয় কেউ জেগে নেই। ডান পাশ থেকে ফকিরার জোরে জোরে শ্বাসটানার আওয়াজ আসছে। কাত হয়ে

নাটোয়ার দেখতে পায়, ফকিরার সরু রোগা বুক হাপরের মতো ওঠানামা করছে। তার দু চোখ বোজা। ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে। গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে সে।

খানিকক্ষণ ফকিরাকে লক্ষ করে নাটোয়ার। একসময় তার ওপর দিয়ে নাটোয়ারের চোখ চলে যায় গোম্‌তীর দিকে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, ঘন অন্ধকারে মেয়েমানুষের শরীরের আবছা একটা কাঠামো শুধু পড়ে আছে।

গোম্‌তী পালিয়ে যাবার পর চারটে বছর নারীসঙ্গহীন নিরুৎসব জীবন কাটাচ্ছে নাটোয়ার। মেয়েমানুষ সম্পর্কে তার ঘৃণা আর বিদ্বেষ এমনই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে নতুন করে চুমৌনার কথা এর ভেতর সে কখনও ভাবেনি। তার একরোখা মন গোম্‌তীর বিশ্বাসঘাতকতার কারণে দুনিয়ার সব মেয়েমানুষ সম্পর্কেই বিরূপ হয়ে ছিল। কী আশ্চর্যভাবেই না চার বছর বাদে কাল ফের গোম্‌তীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। আর আজ এখন, এই মুহূর্তে মাত্র ছ' সাত হাত দূরে সে শুয়ে আছে।

একদিন এই মেয়েমানুষটি ছিল নাটোয়ারের একান্ত নিজস্ব। তার সম্বন্ধে ক্রমশ যে বিতৃষ্ণা আর রাগ সে পুষে রেখেছিল আজ সকালে ফকিরা তার ঝাঁঝ অনেকটাই কাটিয়ে দিয়েছে। গোম্‌তী যেমন তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তেমনি যে হারামজাদের ছৌরার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল সে-ও তাকে পথে বসিয়ে ভেগে গেছে। তারপর বাপের ঘরে ফিরে গিয়ে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য ক্রমাগত লড়াই-ই করে চলেছে। এর ভেতর সুখের মুখ সে কখনও দেখেনি। তার বরাতে শুধুই দুঃখ আর কষ্ট। সকালের মতোই গোম্‌তী সম্পর্কে এক ধরনের সহানুভূতি হতে থাকে নাটোয়ারের। তা-ই নয়, মেয়েমানুষটা বিলকুল নষ্ট হয়ে গেছে। সবার কাছেই সে ঘৃণ্য, নোংরা, তার ছায়া মাড়ানোও পাপ। তবু এই মুহূর্তে প্রবল আকর্ষণে চুম্বকের মতো নষ্ট আওরতটা তাকে যেন টানতে থাকে। চার বছর আগের গোম্‌তী আর নেই, তার শরীর অনেকটাই ক্ষয়ে গেছে। তবু এখনও যৌবনের যে তলানিটুকু শরীরে পড়ে রয়েছে, নাটোয়ারের মতো একটি পুরুষের বুকের ভেতরকার আগুনকে উসকে দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট, বিশেষ করে রাতের এই অন্ধকারে যখন আকাশজোড়া মেঘ আর বিজলিচমক দিয়ে সমস্ত চরাচর সৃষ্টিছাড়া দুর্যোগের জন্য দমবন্ধ করে অপেক্ষা করছে।

নাটোয়ার টের পায়, তার বুকের ভেতর সাঁ সাঁ করে খ্যাপা ঝড় বয়ে যাচ্ছে। নিজের অজান্তে হাতের ভর দিয়ে কোমর থেকে শরীরের ওপরের অংশটা একটানে অনেকখানি তুলে ফেলে ডাকে, 'এ গোম্‌তী— গোম্‌তী—' তার গলার স্বর চাপা এবং খসখসে, অদ্ভুত উত্তেজনায় কাঁপছে।

গোম্‌তী ঘুমোয়নি। এই ডাকটার জন্যই যেন রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ছিল। তক্ষুনি ফিসফিসিয়ে সাড়া দেয়, 'কা?'

'ঘুমিয়ে পড়েছি

'নেহী।'

'কায় রে?'

একটু চুপ করে থাকে গোম্‌তী। তারপর বলে, 'তুমি তো আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে—'

নাটোয়ার বলে, 'আমার মাথায় গুস্‌সা চড়ে গিয়েছিল, তা-ই। ও বাত ভুল যা। চলী আ ইধর—'

'নেহী।'

'আরে বাবা ডর নেহী, আমি তোকে মারব না। চলে আয়—'

গোম্‌তী আবার বলে, 'নেহী—'

নাটোয়ার অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, 'বার বার নেহী নেহী করছিস কেন?'

গোম্‌তী বলে, 'ডাঁয়া বাঁয়া সামনা পিছে এত্তে এত্তে আদমি—'

চারপাশের মানুষজন সম্পর্কে এতক্ষণ যেন খেয়াল ছিল না নাটোয়ারের। গোম্‌তীর না আসার কারণটা আন্দাজ করে নিয়ে সে বলে, 'সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।'

গোম্‌তী বলে, 'আন্ধেরাতে কে জেগে আছে, কে ঘুমিয়ে পড়েছে, বুঝব কী করে? কেউ দেখে ফেললে বড়ী শরমকি বাত। তা ছাড়া বহোত ঝামেলা হয়ে যাবে।'

গোমতী যা বলেছে তার ষোলো আনাই সঠিক। তাদের দু'জনকে অন্ধকারে একসঙ্গে কেউ দেখে ফেললে তার পরিণতি আদৌ সুখকর হবে না। দুমরলালেরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, মেরে একেবারে শেষ করে ফেলবে। এই ভ্রষ্টাচার কেউ সহ্য করবে না।

নাটোয়ার বুঝতে পারছিল, তার সমস্ত শরীর তাতানো লোহার পাতের মতো হয়ে উঠেছে। নাকমুখ দিয়ে গরম ঝাঁঝ বেরিয়ে আসছে। নিজেকে ধাতস্থ করতে সময় লাগে তার। একসময় বলে, 'ঠিক হ্যায়। চাচাকে ডিঙিয়ে এধারে আসতে হবে না। সিরিফ আরেকটু এগিয়ে আয়।'

শরীরটাকে হেঁচড়ে হেঁচড়ে খানিকটা এগোয় গোমতী। দু'জনের মাঝখানে ঘুমন্ত ফকিরা দুর্ভেদ্য দেওয়ালের মতো পড়ে থাকে।

নাটোয়ার চোখের পাতা টান করে তাকিয়ে ছিল। সে দেখতে পায়, জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মতো মানুষের একটা কাঠামো ফকিরার ওধারে এসে স্থির হয়ে গেছে। ইচ্ছা করলে ফকিরার ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে এখন গোমতীকে ছোঁয়াও যায়।

নাটোয়ার বলে, 'কাল ভোর হওয়ার আগেই আমি এখান থেকে চলে যাব।'

গোমতী যেন চমকেই ওঠে, 'কঁহা?'

'ঘাটানিয়া টৌনে।'

'সেখানে কী?'

'পাইসা কামাই করতে হবে না?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'তুই কী করবি?'

গোমতী বলে, 'গুসসা না করলে বলি—'

অসীম উদারতায় নাটোয়ার বলে, 'গুস্সা করব কেন? তুই বলে ফেল।'

'আমাকে তোমার সঙ্গে নেবে?'

'আমি ঠিকাদারের কাছে কাজ করব।'

'আমার কাজের একটা ব্যওস্থা করে দিতে পারবে না?'

'তা পারব। লেকেন—'

'কা?'

'ওরা সুবে থেকে সাম তক খাটায়—বিলকুল গতর-চূরণ খাটনি। পারবি?'

'পারব। পাইসার জন্যে আমি সব কিছু করতে পারি।'

'ঠিক হ্যায়। তা হলে আমার সঙ্গেই যাস।'

'হাঁ।'

'কেউ ওঠার আগেই উঠে পড়বি। আমার ঘুম যদি না ভাঙে, জাগিয়ে 'দিস।'

'দেবো। তুমি আগে উঠলে আমাকে ডেকো।'

এরপর কেউ আর কিছু বলে না। একসময় দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ে।

এগারো

অনেকক্ষণ ধরে কে যেন কাঁধের কাছে ঝাঁকুনি দিতে দিতে সমানে ডেকে যাচ্ছে। ঘুমের ঘোরে প্রথমটা বুঝে উঠতে পারছিল না নাটোয়ার। ঝাঁকুনিটা জোরালো হতে সে ধড়মড় করে উঠে বসে।

কাল রাতে মনে হয়েছিল, আকাশ ভেঙে হুড়মুড় করে বৃষ্টি নেমে আসবে কিন্তু দু-চার ফোঁটার বেশি পড়েনি। এত বড় মাপের আয়োজনটা প্রায় ব্যর্থ হয়ে গেছে।

অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। ভোর হ'তে আর বেশি দেরি নেই। ঘুমের চটকা কাটলে নাটোয়ার দেখতে পায়, ফকিরা তার পাশে বসে আছে। কিন্তু গোমতী ওধারে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। নাটোয়ারের

মনে পড়ে, গোম্‌তীকে কাল রাতে বলেছিল, যার আগে ঘুম ভাঙবে সে যেন অন্যকে জাগিয়ে দেয়। কিন্তু সে বা গোম্‌তী জেগে ওঠার আগেই ফকিরার ঘুম ভেঙে গেছে।

গোটা প্যাণ্ডেল জুড়ে দু' আড়াই শো লোকের একজনেরও ঘুম ভাঙেনি। কেউ হাত-পা ছাড়িয়ে, কেউ চিতপাত হয়ে, কেউ হাঁ করে, কেউ বা কুকুরের মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে চারিদিকে পড়ে আছে। তাদের নাকমুখ থেকে সরু মোটা ভোতা—নানা ধরনের আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

ফকিরা বলে, 'একটু পরেই আন্ধেরা কেটে যাবে। এখন বেরিয়ে পড়বি তো? দুমরলালেরা জেগে গেলে জরুর আটকে দেবে।'

'হাঁ হাঁ—' ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে নাটোয়ার। গোম্‌তীকে দেখিয়ে বলে, 'লেকেন ও আওরত—'

ফকিরা এবার ঠেলেঠুলে গোম্‌তীকে জাগিয়ে দেয়। তারপর তিনজন ক্ষিপ্র হাতে কালকের বাড়তি খাবার দাবার গুছিয়ে নিয়ে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়ে। হাইওয়েতে এসে তারা একরকম দৌড়েই সামনের দু'টো বাঁক ঘুরে একটা ঝাঁকড়া-মাথা পিপর গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। এখান থেকে তারানাথজিদের প্যাণ্ডেলটা আর দেখা যাচ্ছে না। দুমরলালরা তাদের দেখতে পাক, এটা কোনোমতেই কাম্য নয়।

নাটোয়ার বলে, 'এত ভোরে খুব বেশি টেরাক (ট্রাক) আসে না। লরীবালাদের জন্যে কতক্ষণ সড়কে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কে জানে।'

ফকিরা বলে, 'কাল তবিয়ত বহুত খারাপ লাগছিল। আজ ঠিক হয়ে গেছে। জ্বরটাও নেই। আমি তোদের সঙ্গে ঘাটানিয়া টৌনেই যাব রে নাটুয়া—'

নাটোয়ার এবং গোম্‌তী দু'জনেই চমকে ওঠে। নাটোয়ার বলে, 'ঘাটানিয়া টৌনে!'

'হাঁ।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে ফকিরা, 'কাল রাত্তিরে বহু আর তুই ঠিক করলি না, আজ সুবে সুবে উঠে ঘাটানিয়া যাবি।'

নাটোযার প্রচণ্ড অস্বস্তিবোধ করতে থাকে। কাল রাতে তারা ভেবেছিল ফকিরা ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সে জেগেই ছিল এবং তাদের ঘাটানিয়া যাবার কথা তার কানে গেছে। সে কী কারণে মাঝরাতে গোম্‌তীকে কাছে ডেকেছিল, নিশ্চয়ই ফকিরার অজানা নেই। চোখের কোণ দিয়ে সে একবার গোম্‌তীকে দেখে নেয়। আওরতটার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেছে।

নাটোয়ার ফকিরার মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না। চোখ নামিয়ে সে বলে, 'হাঁ।'

ফকিরা বলে, 'টহলরামজির কাছে আমিও দু-চারবার কাজ করেছি। আচ্ছা আদমি। দেখি যদি কিছু কামাইয়ের বন্দোবস্ত হয়ে যায়।'

'তোমার তবিয়তের যা হাল, বেশি খাটতে কি পাববে?'

'নেহী। কুছ ইডভান্স চেয়ে নেবো। পরে খেটে শোধ করে দেবো।'

'ঠিক হ্যায়, চল চাচা—'

ওরা বরাবর হাঁটতে শুরু করে।

এখান থেকে হাইওয়ে ধরে আধ মাইলের মতো যাবার পর ডান পাশে ফাঁকা মাঠ। মাঝে মাঝে দু-একটা গাঁ। তারপর ঘাটানিয়া টাউন।

জ্বর ছেড়ে যাওয়া, কাল দু'বেলা ভরপেট ভোজন এবং একটা রাত টানা ঘুমের পর আজ ফকিরা অনেকটা সুস্থ বোধ করছে। এখনও শরীর বেশ কাহিল, তবু তাকে ধরে ধরে নিয়ে যাবার দরকার হচ্ছে না।

ফকিরা বলে, 'উপরবালার মেহেরবানিতে মনে হচ্ছে, জ্বরটা আর আসবে না রে নাটুয়া।'

নাটোয়ার বলে, 'না এলেই ভালো।'

কাল যে মেঘগুলো জমাট বেঁধেছিল আজ তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আকাশ যদিও ঘোলাটে হয়ে আছে, তবু মেঘের ফাঁক দিয়ে একসময় রোদের ঝিলিক বেরিয়ে আসতে থাকে।

আধ মাইল হাঁটার পর নাটোয়াররা ডান দিকের মাঠে নামে। এখান থেকে আড়াআড়ি আরও মাইল তিনেক গেলে ঘাটানিয়া টাউন।

এদিকের মাঠটাঠ আদৌ সমতল নয়, যতদূর চোখ যায় ঢেউ-খেলানো। ঘাস বলতে বিশেষ কিছু নেই। এই অজন্মার বছরে যেটুকু ফসল ফলেছিল কবেই জমি-মালিকেরা তা কেটে নিয়ে খলিহানে (গোলায়) তুলে ফেলেছে। শস্যহীন, শূন্য খেত জুড়ে কিছু মেঠো ইঁদুর, গোসাপ আর গিরিগিটি রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। চাষের খেত বাদ দিলে যে সব জমি রয়েছে সেখানে শুধুই ট্যারাবাঁকা চেহারার সিসম আব কাঁটা ঝোপ। দূরে আকাশের গা ঘেঁষে ধোঁয়ার দৈত্যের মতো পাহাড়ের সেই রেঞ্জটা এখানেও হাজির।

হাইওয়ে থেকে নামার পর নাটোয়ারেরা যখন রশি দুই-এর মতো পেরিয়ে এসেছে সেই সময় কোত্থেকে যেন আকুল গলায় তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে আসে, 'কোঈ হ্যায়, মেরা বাপুকো বঁচাও—'

নাটোয়াররা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারা ভীষণ হকচকিয়ে গেছে। বিমূঢ়ের মতো তিনজনই এধারে ওধারে তাকাতে থাকে। কিন্তু সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে যতদূর চোখ যায়, বিশাল মাঠ একেবারেই জনশূন্য, ধুধু, কেউ কোথাও নেই।

নাটোয়ার নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়েই যেন বলে, 'কে ডাকছে?'

ফকিরা বলে, 'কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

গোম্‌তী বলে, 'মনে হচ্ছে, কমবয়সী কোনো ছৌয়ার গলা—'

তার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই দেখা যায়, ডান পাশে খানিক দূরে যে উঁচু ঝোপঝাড় রয়েছে তার আড়াল থেকে সত্যি সত্যিই একটা বারো তেরো বছরের ছেলে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়তে দৌড়তে তাদের কাছে চলে আসে। ছেলেটার চোখ টকটকে লাল, মাথায় খাড়া খাড়া রুক্ষ চুল, পরনের নোংরা জামা প্যান্টে চাপ চাপ রক্ত, সারা মুখে আতঙ্ক। মনে হয়, প্রচণ্ড ভয় তাকে যেন তাড়া করে নিয়ে এসেছে।

অনেকটা দৌড়ে আসার কারণে ভীষণ হাঁপাচ্ছিল ছেলেটা। উদ্বিগ্ন মুখে নাটোয়ারেরা তিনজন একই সঙ্গে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কে তুই? কী হয়েছে?'

'আমি—আমি—' বলতে বলতে তার ছোটো শরীর টলে যায়, হুড়মুড় করে ঘাড় গুঁজে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে।

ফকিরা চেঁচিয়ে ওঠে, 'বেহোঁশ হো গিয়া। নাটোয়ার জলদি পানি লেকে আ—'

ফকিরা ছেলেটার পাশে বসার আগেই, গোম্‌তী ক্ষিপ্র মোচড়ে তার শরীরটাকে বাঁকিয়ে পা ছড়িয়ে বসে ছেলেটার মাথা তার কোলের ওপর তুলে নেয়। ফকিরা তার পা বার বার মুড়ে, পরক্ষণে টান টান করে দিতে থাকে।

কাছেই একটা মজা নহর রয়েছে। এক দৌড়ে সেখান থেকে জল নিয়ে এসে ছেলেটার চোখেমুখে ছিটে দিতে থাকে নাটোয়ার। কিছুক্ষণ জল ছিটানো আর হাত-পা টানাটানির পর ছেলেটা আস্তে আস্তে চোখ মেলে। তার হুঁশ ফিরে এসেছে।

খানিকক্ষণ ঘোর-লাগা চোখে তিনটি অচেনা উৎকণ্ঠিত মুখ লক্ষ করে ছেলেটা, তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসে।

ফকিরা খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কে তুই? কী নাম? তোর গাঁয়ে এত খুন কেন?'

পুরোনো আতঙ্কটা আবার ছেলেটার চোখেমুখে ফিরে আসে। আচমকা দু'হাতে মুখ ঢেকে সে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতেই জড়ানো, ভাঙা ভাঙা গলায় সে যা বলে যায় তা এইরকম। তাদের গাঁও পরিন্দা এখান থেকে মাইল তিরিশেক দূরে, পাহাড়ের ওপারে। জাতে তারা দুসাদ। নাম তার লচ্ছু। বাপ আর সে ছাড়া দুনিয়ায় অন্য কেউ নেই তাদের। পরশু জমিজমা নিয়ে পরিন্দাতে ভীষণ গোলমাল হয়েছিল। বড় জমিমালিকের নিজস্ব বন্দুকবাজেরা সেখানে হানা দিয়ে তেরো চোদ্দজনকে খুন করে ফেলে, আগুন লাগিয়ে অচ্ছুতদের পুরা গাঁও জ্বালিয়ে দেয়। জখম যে কত হয়েছে তার হিসেব নেই। ছেলেটার বাপের পায়ে এবং পিঠে গুলি লেগেছিল। রক্তাক্ত বাপকে ধরে ধরে আর টেনে টেনে ঘাটানিয়ার হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য পরশু রাতে পরিন্দা থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে। বাপের রক্তে লচ্ছুর জামাপ্যান্ট মাখামাখি হয়ে গেছে।

কিন্তু বাপকে ঘাটানিয়ায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। দূরে ওই ঝোপঝাড়গুলোর ওধারে আসতেই সে একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যায়। লোকজন ডাকার জন্য অগত্যা উন্মাদের মতো বাপকে রেখে এধারে ছুটে আসতে আসতে নাটোয়ারদের দেখতে পায় লচ্ছু।

কথা শেষ করে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে ছেলেটা। বলে, 'তোমরা আমার সঙ্গে এসো। বঁচাও মেরে বাপুকো—' বলেই ঝোপঝাড়গুলোর দিকে দৌড়তে থাকে।

ফকিরা বলে, 'চল নাটুয়া, চল রে বহু—'

তিনজনে ছেলেটার পেছন পেছন দৌড়ে কাঁটাগাছের ঝাড়ের পেছনে আসতেই দেখতে পায়, মাঝবয়সী একটা লোক এবড়ো খেবড়ো মাটির ওপর পড়ে আছে। জামাকাপড় এবং শরীরের খোলা জায়গাগুলোতে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। চোখদু'টো আধ বোজা, হাত মুঠো পাকানো, রুক্ষ তেলহীন চুল ধুলোয় মাখামাখি। কাছাকাছি একটা সিসম গাছের মাথায় এসে দু'টো শকুন ঘাড় বাঁকিয়ে লচ্ছুর বাপকে দেখছে। কিছু একটা টের পেয়েছে তারা।

ফকিরা হাঁটু গেড়ে অনেকখানি ঝুঁকে লোকটাকে ডাকতে থাকে, 'এ আদমি—এ আদমি, আঁখ তো খুলো—'

লোকটার সাড়াশব্দ নেই। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফকিরার দুই চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। বেশ কিছুক্ষণ সে তাকে লক্ষ করে। তারপর আরও নুয়ে মুখটা তার বুকের কাছে নিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে টের পায়, লোকটার শ্বাসক্রিয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। সে চোখও খুলবে না, সাড়াও দেবে না।

আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে একবার ফকিরা লচ্ছুর দিকে তাকায়। লচ্ছু দমবন্ধ করে তার বাপকে লক্ষ করছে। রুদ্ধ গলায় সে জিজ্ঞেস করে, 'বাপু কথা বলছে না কেন?'

চোখের ইশারায় ফকিরা গোমতীকে কাছে ডাকে। খুব চাপা গলায় বলে, 'লচ্ছুকো সামালহো বহু—'

গোমতী জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে চাচা।' তার গলার স্বরে তীব্র উৎকণ্ঠা ফুটে বেরোয়।

'উস্‌কো মৌত হো গিয়া—'

যদিও নিচু গলায়, প্রায় ফিসফিসিয়ে কথাগুলো বলেছে ফকিরা, কিন্তু লচ্ছু ঠিক শুনে ফেলে। 'বাপু—উ-উ-উ—' বুক-ফাটানো চিৎকার করে সে বাপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুকে সমানে মুখ ঘষতে থাকে।

গোমতীর বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যেন চুরমার হয়ে যায়। চারটে বছর আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে সে। কত ঘাটের জল খেয়েছে তার ঠিক নেই। কত কী-ই না দেখেছে, তার প্রায় সবটাই খারাপ, জঘন্য, বিপজ্জনক। কিন্তু এমন মারাত্মক দৃশ্য আগে আর কখনও চোখে পড়েনি।

গোমতীর স্বভাবে কোমলতা বলতে কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। নানা অভিজ্ঞতা তাকে কর্কশ, হয়তো বা খানিকটা নিষ্ঠুরই করে তুলেছে। কিন্তু নিজের অজান্তে কখন যে তার দু'চোখ জলে ভরে গেছে, গোমতী টের পায়নি। হাত বাড়িয়ে লচ্ছুকে টানতে যাবে, হঠাৎ কী ভেবে ফকিরা হাত তুলে বাধা দেয়, 'ওকে আরেকটু কাঁদতে দে বহু—'

কেঁদে কেঁদে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে লচ্ছু। তার গলায় ভেতর থেকে এখন গোঙানির মতো কাতর আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

বন্দুকবাজদের গুলিতে অকালে মরে যাওয়া এক অচ্ছুৎ এবং তার শোকাচ্ছন্ন একমাত্র ছেলেকে ঘিরে বিহ্বলের মতো বসে থাকে গোমতী, নাটোয়ার এবং ফকিরা।

মাথার ওপর অসময়ের মেঘ ক্রমশ কেটে যাচ্ছে। বৈশাখের গনগনে রোদ যেন কাল থেকে কোনো একটা খাপের মধ্যে আটকানো ছিল, সেটা বেরিয়ে পড়তে শুরু করেছে।

সিসম গাছের মাথায় কখন যে আরও চার পাঁচটা শকুন এসে দল বাড়িয়েছে, কেউ লক্ষ করেনি।

একসময় ফকিরা গোমতীকে চোখের ইশারায় লচ্ছুকে দেখিয়ে দেয়। গোমতী লচ্ছুর কাঁধে হাত রেখে ধরা ধরা নরম গলায় বলে, 'আও বেটা, মেরা পাশ আও—'

লচ্ছু আসে না, বাপকে আরও জোরে সে আঁকড়ে ধরে। উন্মাদের মতো মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, 'নেহী—নেহী—নেহী—'

কোনোরকম সান্ত্বনার কথাই কানে ঢুকছে না লচ্ছুর। অধীর, শোকাকাতর ছেলেটা আচ্ছন্নের মতো মৃত বাপের দিকে তাকিয়ে অনবরত ফোঁপাতেই থাকে।

খানিক দূরে বসে ফকিরা আর নাটোয়ার লচ্ছু এবং তার বাপের সম্পর্কে কথা বলছিল। এদের এভাবে জনহীন ফাঁকা মাঠের মাঝখানে ফেলে চলে যাওয়া যায় না। ঘাটানিয়া টাউনে ঠিকাদার টহলরামজির কাছে যাবার কর্মসূচি এই মুহূর্তে বাতিল করে দিতে হয় নাটোয়ারদের।

নাটোয়ার চিন্তিতভাবে বলে, 'অব্ কা করোগে চাচা?'

ফকিরা জানায়, দু'টি কাজ করা যায়। এক, মৃতদেহ নিয়ে ঘাটানিয়া টাউনে গিয়ে সোজা পুলিশ চৌকিতে তারা তুলে পারে। এতে লচ্ছু এবং তার বাপের কোনো দায়িত্বই তাদের থাকবে না। দুই, তাদের কেউ গিয়ে পুলিশকে ডেকেও নিয়ে আসতে পারে। তবে এর মধ্যে খানিকটা সংশয়ও রয়েছে। খবর দিলেই যে একটা অচ্ছুতের মড়ার জন্য সব কাজ ফেলে পুলিশ দৌড়ে আসবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। তা ছাড়া এ সব হাঙ্গামার মধ্যে মাথা ঢোকালে কতক্ষণ আটকে থাকতে হবে, কে জানে।

নাটোয়ার বলে, 'আরও একটা কথা ভাবো চাচা—'

ফকিরা জিজ্ঞেস করে, 'কা?'

'পুলিশকে ভরোসা নেই। ওরা যদি আমাদেরই চালান করে দেয়—'

'ও শালেলোগ সব পারে। হয়তো বলবে, আমরাই খুন করেছি।'

'তা হলে?'

'দাঁড়া, আগে লচ্ছুকে জিজ্ঞেস করে দেখি।'

ফকিরা লচ্ছুর কাছে এগিয়ে এসে খুব কোমল গলায় বলে, 'দেখো বেটা, বহোত দুখকা বাত, তোমার বাপকে এভাবে মরতে হ'ল। লেকেন তাকে তো এমন করে ফেলে রাখা যায় না। কী করতে চাও, বল—'

রক্তাভ ঘোলাটে চোখে তাকায় লচ্ছু। কী উত্তর দেবে, ভেবে পায় না।

ফকিরা বুঝিয়ে দেয়, কারো মৃত্যু ঘটলে হয় কবর, নইলে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। লচ্ছুরা যখন হিন্দু তখন তাদের অন্তিম সংস্কার চিতা সাজিয়েই করতে হয়। লচ্ছু যদি বলে, সে ব্যবস্থা নাটোয়ার এবং গোমতী করে দেবে। দূরে থেকে তাকে সাহায্য করবে ফকিরা।

লচ্ছু বুঝতে পারছিল, এই লোকগুলো বড় ভালো। এদের দেখা না পাওয়া গেলে ফাঁকা মাঠে সে তার বাপুকে নিয়ে যে কী করত তা ভাবার মতো এখন মনের অবস্থা নয়। আস্তে করে মাথাটা সামান্য হেলিয়ে দেয় সে অর্থাৎ ফকিরারা যা করবে তাতে তার কোনোরকম আপত্তি নেই। কাজেই নাটোয়ার আর ফকিরা উঠে পড়ে। চারিদিকে প্রচুর সিসম আর পিপর গাছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তারা অজস্র শুকনো ডালপালা ভেঙে এনে মোটামুটি পরিষ্কার জায়গায় রাখে। এরপর নাটোয়ার চিতা সাজিয়ে ফেলে। ফকিরা মড়া ছোঁয় না, খানিক দূরে বসে থাকে। নাটোয়ার নহর থেকে জল এনে এনে মৃতদেহ ধুইয়ে চিতায় শুইয়ে দেয়। তারপর লচ্ছুকে ডাকে, 'আও, ইধর আও—' বাপের মুখাগ্নি করতে হবে লচ্ছুকে।

গোমতী লচ্ছুকে জড়িয়ে ধরে বসে ছিল। সেইভাবেই তাকে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'চল বেটা—'

অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে গোমতীর সঙ্গে গিয়ে বাপের মুখে আগুন দিয়ে আবার তার সঙ্গেই আগের জায়গায় ফিরে যায় লচ্ছু। গোমতী তাকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে।

শুকনো কাঠের চিতায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে নাটোয়ার। দাউ দাউ করে লকলকে হলকা আকাশের দিকে উঠতে থাকে। বাপের অন্তিম সংস্কার দেখতে দেখতে একেবারে ভেঙে পড়ে লচ্ছু। দু'চোখ বেয়ে স্রোতের মতো জল গড়িয়ে পড়ছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে একটানা জড়ানো স্বরে সে বলে যায়, 'বাপু—বাপু—বাপু—'

'রো মাত্, রো মাত্—' লচ্ছুর মাথায় বুকে কাঁধে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতে থাকে গোম্‌তী। তার মধ্যে যে ভারী কোমল, একান্ত মমতাময়ী একটি মা ছিল, নিজেই সে জানত না।

কান্না থামে না লচ্ছুর। সে বলে, 'বাপু হো, হামনিকা বাপু, কা হোগা হামনিকা?' হঠাৎ গোম্‌তীর হাত ছাড়িয়ে চিতার দিকে দৌড়ে যায়। গোম্‌তীও সতর্ক ছিল, ফের লচ্ছুকে ধরে দূরে সরিয়ে আনে। তাকে সবলে দু'হাতে ঘিরে রেখে বলে, 'বেটা, কারো মা-বাপ কি চিরকাল বেঁচে থাকে? ভাগোয়ানকা দুনিয়ায় একদিন না একদিন হর আদমির মৌত হয়।'

এ সব দার্শনিক কথাবার্তা বোঝার মতো বয়স হয়নি লচ্ছুর, সেই সময়ও এটা নয়। অবিরাম কাঁদতেই থাকে, 'বাপু—বাপু—বাপু—'

দু'টো দিন মেঘের তলায় চাপা থাকার পর বৈশাখের সূর্য আবার তার পুরোনো স্বভাব ফিরে পেয়েছে। রোদে এখন ছুরির ধার। আর নিচে চিতার আগুন। সব মিলিয়ে এই ফাঁকা মাঠের অনেকটা জায়গা জুড়ে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে।

তারপর সূর্য কখন মাথার ওপর উঠে এসেছিল আর কখন পশ্চিম আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে বেশ খানিকটা নেমে গেছে, কেউ লক্ষ করেনি।

বেলা পড়ে এসেছে। ঘণ্টা তিনেক আগেও চাকুর ফলার মতো রোদ মাঠঘাট আর গাছপালার মাথায় ঝলকাচ্ছিল। এখন সেই রোদের তেজ অনেক মরে এসেছে। হাওয়াও দ্রুত জুড়িয়ে যাচ্ছে।

এদিকে চিতার আগুন নিভে যাচ্ছে। লচ্ছুর বাপের শরীর ছাই হয়ে মাটিতে মিশে গেছে। তিরিশ মাইল দূরের এক অখ্যাত গাঁয়ের নগণ্য এক দুসাদ জমিমালিকের পোষা বন্দুকবাজদের গুলি খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে ঘাটানিয়া টাউনের হাসপাতালে যাচ্ছিল। সেখানে পৌঁছনো আর হয়ে ওঠে না। তার রক্তাক্ত শরীরটা নিয়ে শকুন আর গিধেরা ভোজসভা বসিয়ে দিতে পারত। এটুকুই সান্ত্বনা ততটা শোকাবহ পরিণতি অন্তত ঘটেনি।

চিতা নিভে যাবার পর সামনের নহর থেকে নাটোয়ার এবং গোম্‌তী লচ্ছুকে স্নান করিয়ে আনে। তবে জামাটামা রক্তে মাখামাখি হয়ে ছিল। লচ্ছুকে নিজের একটা শুকনো কাপড় পরিয়ে তার জামাপ্যান্ট ধুয়ে সিসম গাছের ডালে শুকোতে দেয় গোম্‌তী। তারপর নিজেও স্নান করে আসে। এর ভেতর নাটোয়ারও নহরের জলে নাহানা চুকিয়ে এসেছে।

সেই সকাল থেকে প্রচণ্ড ধকল গেছে। এতক্ষণ খাওয়ার কথা কারো খেয়াল ছিল না। এখন ক্লান্তিতে শরীর একেবারে ভেঙে আসছে। তা ছাড়া খিদেটাও পেটের ভেতর চাড়া দিয়ে উঠেছে।

চারজন মাঠের ওপর গা এলিয়ে বসে ছিল। কোনোরকম আশা নেই বুঝতে পেরে সামনের সিসম গাছটার মাথা থেকে সেই শকুনগুলো কখন উড়ে চলে গেছে, কে জানে।

নাটোয়ার বলে, 'বহোত ভুখ লগা চাচা। চোখে একেবারে অন্ধেরা দেখছি।'

ফকিরা বলে, 'হাঁ। এবার খেয়ে নেওয়া যাক।'

রথওয়ালারা কাল যে খাবারদাবার দিয়েছিল তার প্রায় সবটাই গোম্‌তীর ঝোলায় রেখে দিয়েছিল নাটোয়াররা। গোম্‌তী ঝোলা খুলে চাপাটি-টাপাটি বার করে সবাইকে ভাগ করে দেয়।

লচ্ছু কিছুতেই খাবে না। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'নেহী—নেহী—'

গোম্‌তী তাকে নিজের দিকে টেনে এনে বলে, 'খা বেটা—'

'নেহী—'

'না খেলে কি চলে?'

লচ্ছু দুই হাঁটুর ভেতর মাথা ঢুকিয়ে নাড়তে থাকে।'

ফকিরা বলে, 'খা লে বেটা। খতরনাক দুনিয়ার সঙ্গে বহোত লড়তে হবে। গায়ে তাকত না থাকলে চুর চুর হয়ে যাবি। দে বহু, ওকে খাইয়ে দে—'

গোম্‌তী সযত্নে চাপাটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে লচ্ছুকে খাইয়ে দিতে থাকে। লচ্ছু আর আপত্তি করে না।

খেতে খেতে ফকিরা ডাকে, 'এ লচ্ছু—'

লচ্ছু মুখ তুলে তার দিকে তাকায়।

ফকিরা বলে, 'গাঁওয়ে তো তুই আর তোর বাপু থাকতি। ওখানে তোদের আপনা আদমি আর কেউ নেই?'

'নেহী। এক চাচা থাকে ঝরিয়া। আমি তার ঠিকানা জানি না।'

'ও তো বহোত দূর। তার ওপর আবার ঠিকানা জানিস না। বহোত মুসিবতকা বাত।'

গোম্‌তীরা বেশ অবাক হয়েই দু'জনের সওয়াল-জবাব শুনছিল। ফকিরা এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লচ্ছুর আত্মীয়স্বজনের খবর কেন নিচ্ছে, তার বুঝতে পারছে না। নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'ওর রিস্তেদারদের দিয়ে কী হবে?'

ফকিরা বলে, 'গাধ্‌ধে কঁহাকা। আমরা তো আর এই মাঠে পড়ে থাকব না। লচ্ছুর একটা ব্যওস্থা না হলে কী করে ওকে ফেলে যাই?' লচ্ছুর দিকে ফিরে এবার জিজ্ঞেস করে, 'কাছাকাছি কোনো গাঁও কি টৌনে তোর আর কোনো রিস্তেদার নেই?'

লচ্ছু একটু চিন্তা করে জানায়, দশ-বিশ মাইলের ভেতর তার নিজের বলতে কেউ নেই। ঝরিয়ার চাচা ছাড়া এক মৌসি থাকে আরাতে, আরেক মৌসি ছাপরায়। খুব ছেলেবেলায় লচ্ছুর মা যখন বেঁচে ছিল, সে তার সঙ্গে বারকয়েক দুই মাসির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। মা মরে যাবার পর তাদের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই চুকেবুকে গেছে।' আরা বা ছাপরার কোন মহল্লায় মৌসিরা থাকে, লচ্ছু বলতে পারবে না।

ফকিরা, নাটোয়ার এবং গোম্‌তীকে খুবই চিন্তিত দেখায়। ফকিরা বলে, 'লচ্ছুকে নিয়ে কী করা যায় বল তো নাটুয়া? তুই কী বলিস বহু?'

এই প্রশ্নটার উত্তর নাটোয়ার বা গোম্‌তীর জানা নেই। তারা বিভ্রান্তের মতো তাকিয়ে থাকে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর কিছু ভাবতে ভাবতে ফকিরা বলে, 'এক কাজ করলে কেমন হয়?'

নাটোয়ার এবং গোম্‌তী উৎসুক মুখে বলে, 'কা চাচা?'

'এখন লচ্ছু আমাদের সঙ্গে চলুক। তারপর ভেবেচিন্তে একটা কিছু করা যাবে। মা-বাপ কেউ নেই বেচারার। কে দেখবে ওকে?' ফকিরার মধ্যে একটা খুবই স্পর্শকাতর, স্নেহপ্রবণ মন আছে। হাজার অভাব-অনটনেও সেটাকে সে নষ্ট হতে দেয়নি।

নিজেদের যা হাল, তার ওপর আরও একজনের দায়িত্ব নেবার কথা ভাবতে পারে না নাটোয়ারেরা। কিন্তু ফকিরাকে তারা যথেষ্ট সমীহ করে থাকে। বলে, 'ঠিক হ্যায়, তুমি যখন বলছ—'

কিছুক্ষণ পর খাওয়ার পালা চুকে যায়।

পশ্চিম আকাশে সূর্য আরও খানিকটা নিচে নেমে গেছে। এখন তার রং টকটকে লাল। রোদের চেহারাও আগের মতো নেই। মনে হয়, সারা আকাশের গায়ে কেউ যেন পিচকিরি দিয়ে রক্ত মাখিয়ে দিয়েছে। অনেক উঁচু দিয়ে আকাশের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে চলেছে পাখির ঝাঁক। এত নিচে, পৃথিবীর সমতল থেকে তাদের ছোটো ছোটো ফুটকির মতো মনে হয়। ওগুলো কী পাখি, কী তাদের নাম, কে জানে।

আশেপাশে কোথাও কোনো শব্দ নেই। স্তব্ধ, জনশূন্য, দিগন্তজোড়া মাঠের মাঝখানে চারটি মানুষ একটা নিভে-যাওয়া চিতার কাছাকাছি এখন চুপচাপ বসে আছে।

একসময় নাটোয়ার বলে, 'চাচা, এখানে বসে থেকে আর কী হবে? চল, উঠে পড়ি। এখন হাঁটা শুরু করলে সন্ধের পর পর ঘাটানিয়া পৌঁছে যাব।'

ফকিরার উঠবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। বরং সে শরীর ছড়িয়ে দিয়ে হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ে।'

নাটোয়ার বেশ অবাক হয়ে ফকিরার শোওয়ার ভঙ্গিটা লক্ষ করে। তারপর বলে, 'কী চাচা, তোমার মতবলটা কী? যেভাবে লম্বা হয়ে শুলে, ঘাটানিয়ায় যাবার ইচ্ছে নেই, মনে হচ্ছে।'

ফকিরা বলে, 'আজ সন্ধের পর গিয়ে ফায়দা নেই। একেবারে কাল সকালে উঠেই যাব।'

'রাতটা এই মাঠের মাঝখানে কাটাবে নাকি?'

এমন বিস্ময়কর কথা আগে কখনও যেন শোনেনি ফকিরা। বলে, 'এর আগে কখনও মাঠেঘাটে শুসনি—কা রে নাটুয়া?' কবে কোথায় নানা শহরে এবং গঞ্জে ঠিকাদারদের কাছে কাজ করতে গিয়ে খোলা আকাশের তলায়, নদীর ধারে, বাঁধের গায়ে কিংবা রুক্ষ পড়তি জমিতে শুয়ে থেকেছে তার লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে যায় সে। তা ছাড়া সমস্ত দিন তাদের ওপর দিয়ে যা গেল, তাতে টানা একখানা ঘুম দরকার। ক্লান্ত শরীরে ধুঁকে ধুঁকে গিয়ে কাজের কাজ কিছু হবে না। একেবারে কাল সকালে নতুন শক্তি সঞ্চয় করে তারা ঘাটানিয়ায় যাবে।

নাটোয়ার বলে, 'ঠিক হ্যায় চাচা।' বলে ঘাসের ওপর সেও শুয়ে পড়ে।

বারো

নাটোয়ারদের ঘুম যখন ভাঙে তখন আর অন্ধকার নেই। চারিদিকে ভোরের আলো ফুটে বেরিয়েছে।

এই একটা রাতের মধ্যে দু দু'টো ব্যাপার ঘটে গেছে। প্রথমত, কালকের দিনটা ছিল শুকনো খটখটে। আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। কোথাও একফোঁটা মেঘ চোখে পড়েনি। কিন্তু রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে, বহুরূপী আকাশটা ভোল পালটে ফেলেছে। কখন যে ফের উত্তর পশ্চিম দিকে মেঘ জমতে শুরু করেছিল, টের পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়ত, কাল দিনের বেলাটা বেশ ভালোই ছিল ফকিরা। কিন্তু রাতে ঘুমের মধ্যে ফের তার জ্বর এসেছে।

নাটোয়ার, গোম্‌তী আর লচ্ছু উঠে বসেছিল। কিন্তু ঘুম ভাঙলেও ফকিরা শুয়েই আছে। তার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল, মুখচোখ টসটস করছে, সারা গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা।

নাটোয়ার বলে, 'চাচা, আর দেরি কোরো না, উঠে পড়। আকাশে আজ আবার মেঘ জমেছে। ছিঁটা উটা পড়ার আগেই ঘাটানিয়া পৌঁছুতে হবে।'

'হাঁ—' আস্তে আস্তে উঠে বসে ফকিরা।

নাটোয়ার প্রথমটা খেয়াল করেনি, এবার তার নজর ফকিরার মুখের ওপর এসে স্থির হয়। সে বলে, 'কী হয়েছে, তোমার তবিয়ত আচ্ছা নেই?'

'আবার জ্বরটা এসেছে রে নাটুয়া। কী ঝামেলায় পড়লাম! এই শালের বুখার আমাকে ছাড়বে বলে মনে হয় না।'

'কী করে যে তুমি ঘাটানিয়া যাবে!'

ফকিরা সামান্য হাসে, বলে, 'যেতেই হবে। এই মাঠের ভেতর তো আর পড়ে থাকা যাবে না।'

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, চারটি মানুষ ফাঁকা প্রান্তরের ওপর দিয়ে বরাবর পুব দিকে এগিয়ে চলেছে। পেছনে সেই চিতাটা নিভে গেছে। উল্টোপাল্টা হাওয়ায় লচ্ছুর বাপের ভস্মীভূত শরীর ছাই হয়ে এখন চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

হাইওয়েটা এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। যে মাঠের ওপর দিয়ে তারা হাঁটছিল সেটা গিয়ে ঠেকেছে তারই গায়ে।

বড় সড়কের কাছাকাছি আসতে সেই চেনা সুরটা কোত্থেকে যেন ভেসে আসতে থাকে, 'বোল রাধা বোল সঙ্গম হোগা কি নেহী—'

চমকে নাটোয়াররা দেখতে পায়, দূরে রাস্তার বাঁক ঘুরে সামনে ব্যান্ড পার্টি আর পেছনে জুলুস নিয়ে ভারতমাতার রথ আসছে।

নতুন করে জ্বর আসার কারণে শরীর ভীষণ কাহিল লাগছিল ফকিরার। ভুরুর ওপর হাত রেখে রাস্তার বাঁকে একবার তাকায় সে। তারপর ব্যস্তভাবে বলে, 'নাটুয়া, জলদি জলদি সড়ক পার হয়ে

উধারে চল্। দুমরলাল দেখতে পেলে জান বিলকুল চৌপাট করে ছাড়বে। শালের চোখ মানুষের চোখ না—গিদ্ধড়ের চোখ।' রাস্তার ওপারেও মাঠ। সেই মাঠ ভেঙে মাইল দেড়েক গেলেই ঘাটানিয়া টাউন। ফকিরারা মাঠের রাস্তা ধরে সেখানে যাবে।

দুমরলালের চোখে পড়াটা যে মোটেই সুখকর হবে না, সেটা নাটোয়ার এবং গোম্‌তীও জানে। লচ্ছুকে সঙ্গে করে তারা দ্রুত হাইওয়ে পার হয়ে ওপারে চলে যায়। খানিকটা যাবার পর ফকিরার চোখের সামনে গোটা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়, টলতে টলতে সে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে।

এক লাফে নাটোয়ার ফকিরার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে তার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে ডাকতে থাকে, 'চাচা—চাচা—চাচা—'

লচ্ছু আর গোম্‌তীও ছুটে এসে ফকিরাকে ডাকাডাকি করতে থাকে। অনেকক্ষণ পর চোখ মেলে তাকায় ফকিরা। দুর্বল গলায় বলে, 'আমি আর পারব না রে নাটুয়া। তোদের ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ে ফায়দা নেই।'

ফকিরার জীবনশক্তি যে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তা আগেই টের পেয়েছিল নাটোয়াররা। শুধু মনের জোরে সে এতটা রাস্তা পাড়ি দিয়েছে। তবু নাটোয়ার বলে, 'সচমুচ পারবে না?'

'নেহী। যতক্ষণ পেরেছি হেঁটেছি, আর তাকত নেই।'

'লেকেন—'

'তুই তোর চাচী আর আমিনার কথা ভাবছিস তো?'

'হাঁ। দো-চারগো রুপাইয়া না নিয়ে গেলে—'

আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে ফকিরা বলে, 'উপরবালা দেখেছে, আমি চেষ্টা করেছি। লেকেন এরপর আর কিছু করার নেই। এখন তার মর্জি হলে বিবি আর বাচ্চাটা বাঁচবে। না হলে মৌত—' বলে বিষণ্ণ হাসে সে।

মুখ নিচু করে নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি ঘরে ফিরে যাবে?'

'হাঁ।'

'তা হলে চল হাইওয়েতে গিয়ে তোমাকে ট্রাকবালাদের গাড়িতে তুলে দিই।'

'থোড়া সবুর। আগে তারানাথজিদের রথ বেরিয়ে যাক।'

নাটোয়াররা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে হাইওয়ে বেশি দূরে নয়। তারানাথজিদের রথ বাঁক ঘুরে অনেক এগিয়ে এসেছে। নাটোয়ার বুঝতে পারে, হাইওয়ের ধারে গিয়ে এখন দাঁড়ালে দুমরলালদের চোখে পড়বার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই আপাতত এখান থেকে নাড়াচড়া না করাই ভালো।

একসময় ভারতমাতা রথ হিন্দি ফিল্মের সুর বাজাতে বাজাতে সামনে দিয়ে চলে যায়। তারপর ফকিরাকে ধরে হাইওয়েতে নিয়ে আসে নাটোয়ারেরা।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা দু'টো করে ট্রাক আসতে থাকে। রাস্তার মাঝখানে গিয়ে হাত তুলে তাদের থামায় নাটোয়াররা। কিন্তু ড্রাইভারেরা কেউ ফকিরাকে গাড়িতে তুলতে রাজি হয় না। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তারা হুমকে ওঠে, 'যা শালে, ভাগ—'

অগত্যা ধারে সরে গিয়ে লরিগুলোকে যাবার জায়গা করে দিতে হয়ে নাটোয়ারদের।

শেষ পর্যন্ত এক শিখ ট্রাকওলার কিঞ্চিৎ করুণাই হয়। এই সকাল বেলাতেই প্রচুর মদ গিলেছে সে, মুখ থেকে ভক ভক করে গন্ধ বেরুচ্ছে। চোখদু'টো ঢুলু ঢুলু এবং আরক্ত। জানালা দিয়ে মুখ বার করে জড়ানো গলায় সে বলে, 'ক্যা রে, টেরাক (ট্রাক) রুখ দিয়া কিঁউ?'

নাটোয়ার হাতজোড় করে আর্জিটি পেশ করে।

সব শুনে ফকিরার দিকে তাকিয়ে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করে, 'ক্যা চাচা, সচমুচ তুমহারা বুখার হুয়া তো? ধোঁকা দেনেসে লাথ মার কর টেরাকসে নিকাল দুঙ্গা—' নেশার সে এতই চুর, ফকিরা এখনও যে লরিতে ওঠেনি, সেটাই তার খেয়াল নেই।

'হাঁ হাঁ, জরুর বুখার—' একরকম টেনেহেঁচড়ে ফকিরাকে ড্রাইভারের কাছে নিয়ে আসে নাটোয়ার, 'দেখিয়ে দেখিয়ে, এর গা কেমন গরম হয়ে উঠেছে—বিলকুল আগ য্যায়সা।'

প্রচণ্ড মাতাল হলেও ড্রাইভার বুঝতে পারে, নাটোয়ারেরা মিথ্যে বলছে না। সে বলে, 'ঠিক হ্যায়, চাচাকে গাড়িতে তুলে দে—'

সযত্নে হাত ধরে ফকিরাকে ট্রাকে ওঠাতে ওঠাতে নাটোয়ার বলে, 'হোঁশিয়ার চাচা। গাড়ি থেকে নেমে আস্তে আস্তে ঘরে চলে যেও। দো-চার রোজ পর আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

'ঠিক হ্যায়।'

ফকিরাকে নিয়ে ট্রাক চলে যায়। বেঁচে থাকার জন্য যে বিপুল অভিযানে নাটোয়াররা বেরিয়ে পড়েছিল সেটা শেষ হবার আগেই তাদের এক প্রাচীন যোদ্ধাকে বিদায় নিতে হল।

বাঁকের মুখে যতক্ষণ না ট্রাকটা অদৃশ্য হয়, নাটোয়াররা বিষণ্ণ চোখে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মাঠের দিকে ফিরে আবার হাঁটতে শুরু করে।

দুপুরের ঢের আগেই ওরা তিনজন ঘাটানিয়া টাউনে পৌঁছে যায়।

তেরো

ঘাটানিয়া উত্তর বিহারের আর পাঁচটা মফস্বল শহরের মতোই। নোংরা, দুর্গন্ধে ভরা, ঘিঞ্জি, ধুলো এবং মশামাছিতে থিকথিকে। এই সব শহর যেন একই ছাঁচ থেকে ঢালাই হয়ে বেরিয়ে এসেছে।

ঘাটানিয়ার মাঝামাঝি জায়গায় ঠিকাদার টহলরাম সহায়ের পুরোনো ধাঁচের তেতলা বাড়ি। সামনের দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তার একদিকে বিশাল খাটালে কম করে বিশ তিরিশটা গরু এবং মোষ রয়েছে। সেখান থেকেই সর্বক্ষণ নতুন এবং বাসি গোবরের উৎকট গন্ধ উঠে আসে। আরেক দিকে অ্যাসবেস্টসের ছাউনির তলায় থাকে তিন চারটে জিপ আর লরি। এগুলো বারোমাস টহলরামের কারবারে খাটে। গাড়ির শেড আর খাটাল বাদ দিয়ে যে জায়গাটুকু রয়েছে সেখানে আট-দশটা চারপায়া পাতা । টহলরাম যখন ঘাটানিয়াতে থাকে, বর্ষাকাল আর গ্রীষ্মের দুপুরটা ছাড়া প্রায় সারদিনই এই চারপায়াগুলোর একটায় গা এলিয়ে রাখে। এটাই তার হেড অফিস। এখানে বসে বা শুয়ে সে তার ঠিকাদারি কারবার চালিয়ে যায়।

টহলরামের মুক্তাঙ্গন অফিসের পেছন দিকে মূল বাড়িটা। সেটার জবরদস্ত চেহারা। আগাগোড়া চুনসুরকির গাঁথনিতে ষাট ইঞ্চি পুরু দেওয়াল। বাড়ির তুলনায় দরজা জানালা ছোটো ছোটো। গোটা বাড়িটার দেওয়ালে পবনপুত্র হনুমানের নানা কীর্তির ছবি আঁকা রয়েছে। মোটা দাগের ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া সব চিত্রকর্ম। এখানকারই একজন সাইন বোর্ড লিখিয়েকে দিয়ে ওগুলো আঁকানো হয়েছে। এর চেয়ে উৎকৃষ্ট শিল্প তার কাছে আশা করা অন্যায়।

বাড়িটার আগাপাশতলা লক্ষ করলে বোঝা যাবে, টহলরাম রামভক্ত হনুমানজির একনিষ্ঠ সেবক।

ঘাটানিয়া শহরে ঢুকে কোনোদিকে তাকায় না নাটোয়ারেরা, সোজা টহলরামের বাড়ির কাছে চলে আসে। গোমতী আর লচ্ছুকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকে পড়ে নাটোয়ার।

টহলরাম উঁচু জাতের কায়স্থ হলেও জাতপাত নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। কেননা ঠিকাদারি কাজে যে সব মজুর দরকার তাদের বেশির ভাগই জল-অচল অচ্ছুৎ। ছুয়াছুতের কড়াকড়ি নিয়ে থাকলে তার চলে না। যে সব জায়গায় টহলরামের কাজ চলছে সেখানে তো বটেই, বাড়িতেও তারা যখন তখন ঢুকে পড়ে।

খাটালে ক'টা নৌকর গরু এবং মোষেদের জন্য জাবনা তৈরি করছিল, কেউ কেউ প্রাণীগুলোকে স্নান করিয়ে দিচ্ছিল। উল্টোদিকের শেডের তলায় একটা গাড়িও নেই, খুব সম্ভব কাজে বেরিয়ে গেছে।

চারপায়াগুলো ফাঁকা। টহলরাম সহায়কে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। এধারে ওধারে তাকাতে থাকে নাটোয়ার।

মূল বাড়িটার একতলার ঢাকা বারান্দার কোণে নিচু কাঠের ডেস্কের সামনে বসে মোটা রোকড় খাতায় ঘাড় গুঁজে কী যেন লিখছিল মদনলালজি। বয়স হলেও বেতের মতো পাতলা হিলহিলে চেহারা তার। পরনে ধুতির ওপর হাফ-হাতা ফতুয়া, নিকেলের গোল চশমা নাকের ডগায় ঝুলে রয়েছে।

মদনলাল টহলরাম সহায়ের ঠিকাদারি কারবারের যাবতীয় হিসেবপত্তর রেখে থাকে। যখনই আসা যাক, দেখা যাবে সে কলম বাগিয়ে ওই মোটা খাতার ওপর ঝুঁকে রয়েছে। মদনলাল নিজেকে বলে টহলরামজির 'মানিজার' অর্থাৎ ম্যানেজার। লোকটার দশজোড়া চোখ। হিসেব কষতে কষতেই সে নাটোয়ারকে দেখতে পেয়েছিল। মুখ না তুলেই বলে, 'কা রে নাটুয়া—তুই!' টহলরামজির কাছে যত মজুর কাজ করে তাদের প্রায় সবাইকেই চেনে সে। একবার যাকে দেখে, সহজে ভোলে না মদনলাল।

পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে যায় নাটোয়ার। হাতজোড় করে বলে, 'হাঁ মানিজারজি—'

আস্তে আস্তে এবার চোখ তোলে মদনলাল, 'আচানক? কী মনে করে?'

'অনেকদিন আসতে পারিনি। ভাবলাম একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করে যাই।'

'ভালোই করেছিস। কোনো দরকার আছে?'

'একটু চুপ করে থাকে নাটোয়ার। তারপর বলে, 'কাম ধান্দার জন্যে এসেছিলাম। বহোত রোজ আপনাদের কাছে কাজ করিনি। ভাবলাম যদি কিরপা করে কিছু দেন—'

মদনলাল বলে, 'তিন চার দিন আগে যদি আসতিস, একটা কাজ জরুর মিলত। লেকেন সব মজুব জোগাড় করে সাইটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন আর লোকের জরুরত নেই।' একটু থেমে বলে, 'মাঝে মধ্যে দেখা তো করে যাবি। কখন লোকের দরকার হয়ে যায়—'

'মাঝখানে ক'মাস খুব ভুগলাম, তাই আসতে পারিনি। এবার থেকে পন্দ্র বিশ রোজ পর পর এসে খবর নিয়ে যাব। লেকেন—'

'কা রে?'

খানিক ইতস্তত করে নাটোয়ার বলে, 'কিরপা করে আজ কিছু একটা ব্যওস্থা করে দিতেই হবে ম্যানিজারজি। আপনি ইচ্ছা করলেই হবে।'

মদনলাল বলে, 'নেহী নেহী, আমার ইচ্ছায় কিছু হবে না। তুই বরং এক কাজ কর—'

'কা?'

'সিধা যোগবানি চলে যা।'

'সেখানে কী?'

'সড়ক বানাবার ঠিকা নিয়েছি আমরা। টহলরামজি ওখানে কাজের তদারক করতে গেছেন। আজই গিয়ে ওঁকে ধর। তোকে ওঁর খুব পস্‌ন্দ। জরুর কিছু একটা হয়ে যাবে। হাঁ, আউর এক বাত, টহলরামজি ওখানে বেশিদিন থাকবেন না, কাল রাতে কি পরশু সুবে পালামৌ যাবেন। তার আগেই গিয়ে ধরা চাই।'

যোগবানি এখান থেকে একদিনের পথ। খানিকটা হেঁটে, খানিকটা ট্রেনে এবং খানিকটা বাসে যেতে হয়। যাবে যে, পকেটে ফুটো কড়িও নেই। তা ছাড়া সে একা নয়, সঙ্গে গোম্‌তী আর লচ্ছুও রয়েছে। এতগুলো লোকের ভাড়া জুটবে কোত্থেকে? তা ছাড়া যোগবানিতে গিয়ে পৌঁছুলেই যে টহলরামজির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এমন নিশ্চয়তা নেই। এদিকে ট্রেন বা বাসের মর্জির ওপর ভরসা রাখা যায় না। কখন আসে কখন যায় তার ঠিকঠিকানা নেই।'

মদনলাল নাটোয়ারকে লক্ষ করছিল। সে বলে, 'কী ভাবছিস নাটুয়া? যা বললাম তাই কর—'

নাটোয়ার কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'ম্যানিজারজি, এখন আমি যোগবানি যেতে পারছি না। আপনি যদি আরেকটু কিরপা করেন—'

'কী?'

নাটোয়ার জানায়, তার হাতে একটা পয়সাও নেই। যদি আগাম পঞ্চাশ ষাটটা টাকা মদনলাল দেয়, দু'চার মাসের মধ্যে গায়ে খেটে শোধ করে দেবে। সে একটা পয়সা মারবে না, তার জবানের ওপর মদনলালজি বিশ্বাস রাখতে পারে।

মদনলাল লোকটা ভালোই। সহৃদয়ভাবেই বলে, 'তোর ওপর আমার বিশ্বাস আছে নাটুয়া। তুই আগে তো কতবার নিয়ে গেছিস। লেকেন ছে আট মাহিনা হল, টহলরামজি আগাম রুপাইয়া দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।'

নাটোয়ার চমকে ওঠে, 'বহোত আশা করে এসেছিলাম মানিজারজি। হাত বিলকুল খালি। আপনি দয়া না করলে সিরিফ মরে যাব।'

'তোর হাল বুঝতে পারছি, লেকেন আমার হাত-পা বাঁধা। টহলরামজির হুকুম না পেলে কিছুই করতে পারব না।'

গভীর হতাশায় মনটা ভরে যায় নাটোয়ারের। সে বলে, 'তা হলে আর কী করব? যাই মানিজারজি—'

'ঠিক হ্যায়। আবার আসিস।' বলে ফের রোকড় খাতায় নাক গুঁজে দেয় মদনলাল।

অগত্যা রাস্তায় বেরিয়ে আসে নাটোয়ার।

বাইরে দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে গোমতী, তার পাশে লচ্ছু।

গোমতী জিজ্ঞেস করে, 'কিছু হল?'

মাথাটা ডাইনে থেকে বাঁয়ে বার দুই নাড়িয়ে বিমর্ষ মুখে নাটোয়ার বলে, 'কুছ নেহী। চল—'

ঘাটানিয়া শহরের খোয়া-ওঠা রাস্তার ওপর দিয়ে তিনটি মানুষ লক্ষহীনের মতো হাঁটতে থাকে। চলতে চলতে মদনলালের সঙ্গে তার যা যা কথা হয়েছে সব গোমতীকে জানিয়ে দেয় নাটোয়ার।

গোমতী জিজ্ঞেস করে, 'এখন তা হলে কী হবে?' তার চোখেমুখে ঘোর উৎকণ্ঠা ফুটে বেরোয়।

নাটোয়ারকে খুবই অস্থির দেখায়। সে বলে, 'বুঝতে পারছি না। বহোত ভরোসা ছিল টহলরামজির ওপর। কার মুহ্ দেখে যে এবার বেরিয়েছিলাম।'

'কপালটাই খারাপ।'

লচ্ছু কিছু বলে না। বাপকে হারানোর দুঃখে কাল এত কেঁদেছিল যে তার চোখমুখ এখনও ফুলে আছে। কী খাবে, কোথায় থাকবে, কে আশ্রয় দেবে—কাল এ সব নিয়ে ভাবার মতো মনের অবস্থা ছিল না তার। কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আজ সে বেশ চিন্তিত। নাটোয়ার এবং গোমতী যে কাজ আর খাদ্যের খোঁজে বেরিয়েছে তা জেনে গেছে লচ্ছু। যারা নিজেরাই পেটের দানা জোটাতে নাস্তানাবুদ হয়ে যাচ্ছে তাদের পক্ষে তার দায় কতদিন নেওয়া সম্ভব হবে, কে জানে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝে একবার নাটোয়ার, আরেক বার গোমতীকে দেখতে থাকে সে। এরা তাকে তাড়িয়ে দিলে কোথায় যাবে, কী করবে, ভাবতেও সাহস হয় না লচ্ছুর।

গোমতী জিজ্ঞেস করে, 'এখন কোথায় যাবে?'

নাটোয়ার জানায়, আপাতত যাওয়ার নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই। টহলরাম সহায়ের কোঠি থেকে বেরুবার পর প্রায় ভেঙেই পড়েছিল সে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তার আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে শুরু করেছে। সে বলে, 'হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। পাইসা কামাইয়ের একটা ব্যওস্থা করতেই হবে।'

'তার আগে—' বলতে বলতে থেমে যায় গোমতী।

'তার আগে কী?'

'কুছ খানা উনার বন্দোবস্ত না করলে—'

এই কথাটা নাটোয়ারের মাথাতেও আবছাভাবে কিছুক্ষণ ধরে ঘুরছে। কাল সেই বিকেলে লচ্ছুর বাপের চিতার কাছে বসে তারা শেষ খেয়েছিল। এখন দুপুর পেরুতে চলেছে, পেটের ভেতর আগুন জ্বলছে। ভাত হোক, চাপাটি হোক, ছাতু হোক, লিট্টি হোক—কিছু জোগাড় করতে না পারলে আর হাঁটা যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে নাটোয়ার। বলে, 'হাঁ, দেখি কী করা যায়—'

লচ্ছুকে দেখিয়ে গোম্‌তী বলে, 'ভুখে ছৌরাটার মুখ শুকিয়ে গেছে।'

'হাঁ।'

খাবারের ব্যবস্থা করবে কিন্তু কীভাবে কোত্থেকে—সেটাই মাথায় আসছে না নাটোয়ারের। চিন্তাগ্রস্তের মতো গোম্‌তীদের সঙ্গে নিয়ে সে হাঁটতে থাকে।

অনেকটা চলার পর হঠাৎ নাটোয়াররা শুনতে পায় কোথায় যেন মাইকে ভারী গলার মন্ত্রপাঠ হচ্ছে। পেটের চিন্তাতে তারা এমন মগ্ন হয়ে ছিল যে কোনোদিকে ভালো করে তাকায়নি। এখন নাটোয়ার দেখতে পায়, কাতারে কাতারে মানুষ তাদের পেছনে ফেলে লম্বা লম্বা পায়ে সামনের দিকে চলেছে। ঘাটানিয়া শহরের এই সব লোকজনের চোখেমুখে প্রচণ্ড ঔৎসুক্য এবং উত্তেজনা। চাঞ্চল্যকর কোনো ব্যাপার যেন তাদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

নাটোয়ার কিছুটা কৌতূহল বোধ করে। দু চার-জনকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করে করে জানতে পারা যায়, এখানকার নয়া মহল্লার মাঠে বিশাল যজ্ঞের আয়োজন হয়েছে। তাই দেখতে এত মানুষ দল বেঁধে চলেছে। কী কারণে এই যজ্ঞ? এ প্রশ্নের উত্তরটা অবশ্য কেউ দিতে পারে না।

একটা লোক বলে, 'আমাদের সঙ্গে চল না। গেলেই নিজের চোখে সব দেখতে পাবে।'

এবার সবচেয়ে জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা করে নাটোয়ার, 'ভেইয়া, তুমি কি জানো, ওখানে ভোজনের ব্যওস্থা আছে কিনা?'

লোকটা এমন উদ্ভট কথা আগে আর বোধহয় কখনও শোনেনি। নাটোয়ারকে একটি উৎকৃষ্ট উজবুক ঠাউরে নিয়ে বলে, 'আরে বাবা, এত্তে বড় পূজা যজ্ঞ হচ্ছে আর সেখানে ভোজন উজন হবে না—তাই কখনও হ'তে পারে? এত্তে এত্তে আদমি তা হলে যাচ্ছে কী জন্যে?'

নাটোয়াররা লোকটার সঙ্গ ছাড়ে না। অত মূল্যবান খবর যে দিয়েছে তাকে সহজে ছাড়া যায় না। তার গায়ে আঠার মতো জুড়ে থেকে নাটোয়াররা তিনজন জোরে জোরে পা চালাতে থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে নয়া মহল্লায় পৌঁছে একেবারে হাঁ হয়ে যায়।

এখানে বড় একটা মাঠে বিশাল মণ্ডপ বানিয়ে তার ভেতর যজ্ঞের আয়োজন চলছে। গেরুয়া-পরা আট-দশজন সাধু ইট-বাঁধানো বিরাট চৌকো যজ্ঞকুণ্ড ঘিরে বসে আছে। তাদের সবাই কপালে, গালে, গলায়, কানের লতিতে এবং বাহুমূলে রক্তচন্দনের তিলক।

সাধুদের পাশে চন্দনকাঠের পাহাড়, কয়েক টিন খাঁটি ঘি, ফুল, বেলপাতা এবং যজ্ঞের অন্যান্য উপকরণ। দু'জন সাধু আগুনে অনবরত লম্বা পেতলের কুশিতে করে ঘি ঢালছে, দু'জন সাজিয়ে দিচ্ছে কাঠ। বাকি ক'জন ভক্তিভরে একনাগাড়ে মাইকে মন্ত্রপাঠ করে চলেছে। তাদের গমগমে গম্ভীর কণ্ঠস্বর বহুদূর পর্যন্ত বায়ুস্তরে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

'ওঁ ভূর্ভবঃ স্বঃ....ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহা তিষ্ঠ ইহা সন্নি ধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু.....'

আরও পনেরো বিশজন সাধুকে ব্যস্তভাবে ছোটাছুটি করতে দেখা যাচ্ছে। যজ্ঞ ঘিরে অনেক কাজকর্ম থাকে। তারা সেসব তদারক করে বেড়াচ্ছে।

যজ্ঞকুণ্ডের পেছন দিকে মখমলে মোড়া উঁচু ফরাসের ওপর চোখ বুজে প্রায় সমাধিস্থ অবস্থায় পদ্মাসনে বসে আছেন বিপুল চেহারার একজন সন্ন্যাসী। সারা মুখ লম্বা পাকা দাড়িতে আচ্ছন্ন, মাথা থেকে বটের ঝুরির মতো মোটা জটা কোমর ছাপিয়ে নেমে এসেছে। এখানকার এই যজ্ঞের তিনিই যে মূল উদ্যোক্তা এবং অন্য সাধুরা তাঁর শিষ্য প্রশিষ্য সেটা দেখামাত্রই টের পাওয়া যায়।

মণ্ডপের সামনের দিকে চট পেতে ভক্তদের বসার ব্যবস্থা। ঘাটানিয়া টাউনের অগুনতি মানুষ সেখানে হাতজোড় করে বসে আছে। ভিড় এতই বেশি যে সবার বসার জায়গা হয়নি, বেশির ভাগই পেছন দিকে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে। পোড়া ঘি এবং চন্দনকাঠের গন্ধে বায়ুস্তর ম ম করছে। মাঝে মাঝে মন্ত্রপাঠ থামিয়ে একজন সাধু গম্ভীর গলায় ঘোষণা করছে, 'সারা ভারত জুড়ে আজ ভ্রষ্টাচার, অন্যায় আর মহাপাপ চলছে। ঘোর অধর্মে কলিকাল পূর্ণ। দেশকে রক্ষা করতে, মানুষকে ভ্রষ্টাচার আর পাপ থেকে মুক্ত করতে শ্রী শ্রী ভগবান বিশ্বানন্দজি মহারাজ এই যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। আপনারা দলে দলে যোগ দিয়ে এই শুদ্ধিযজ্ঞকে সার্থক করে তুলুন। ভগবান বিশ্বানন্দজি

মহারাজের আশীর্বাদ নিয়ে মনুষ্যজন্ম সার্থক করুন। যজ্ঞের কাজে আপনাদের সবাইকে দরকার। কে কী করবেন সে জন্য প্রাণানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা করুন।'

ভাসাভাসা ভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানের কারণটা শোনে নাটোয়ার। খুব সামান্যই বোঝে, বেশির ভাগই তার বোধগম্য হয় না। যজ্ঞ, বিশ্বানন্দ মহারাজের আশীর্বাদ এবং ভারতবর্ষের শুদ্ধি আব পাপমুক্তির চেয়ে চাপাটি বা ভাত তাদের কাছে অনেক বেশি জরুরি। এই মুহূর্তে প্রাণানন্দ মহারাজকে তাদের খুঁজে বার করতেই হবে। যজ্ঞের কাজকর্ম করলে মজুরি হিসেবে নিশ্চয়ই পয়সা বা খাবার কিছু একটা মিলবে।

কিন্তু এত সাধুসন্ন্যাসীর মধ্যে প্রাণানন্দ মহারাজ কোন জন, কে জানে। নাটোয়ার ভিড়ের লোকজনদের অনেককে জিজ্ঞেস করল, তারা প্রাণানন্দকে চেনে কিনা।

প্রত্যেকেই ঘাড় হেলিয়ে বলে, 'নেহী—'

একটি চালাক চতুর গোছের লোক জানায়, এই সাধু সন্ন্যাসীরা ঘাটানিয়া টাউনের বাসিন্দা নয়, দিন দুইয়েক হল, যজ্ঞ উপলক্ষে এখানে এসেছে। যজ্ঞ শেষ হলেই এখান থেকে চলে যাবে। সে আরও জানায়, ঘাটানিয়ার পয়সাওলা বড় বড় লোকেরা যাগযজ্ঞ এবং পুজোর যাবতীয় খরচ দিচ্ছে।

কাদের পয়সায় এই বিরাট ব্যাপার চলছে তা নিয়ে আদৌ মাথাব্যথা নেই নাটোয়ারের। শুধু প্রাণানন্দ মহারাজকে তার দরকার। সে জানতে চায়, প্রাণানন্দের খোঁজ কে দিতে পারে।

লোকটা বলে, 'আরে ভেইয়া, আমার কাছে পুছতাছ না করে এক সাধু মহারাজকে ধর না; সে ঠিক বলে দেবে।'

এই সামান্য ব্যাপারটা আগেই মাথায় আসা উচিত ছিল নাটোয়ারের। সে বলে, 'ঠিক বাত ভেইয়া।' বলে গোমতী আর লচ্ছুকে একধারে দাঁড়াতে বলে প্যান্ডেলের আরেক মাথায় এক যুবক সাধুর কাছে চলে আসে। হাতজোড় করে বলে, 'প্রাণানন্দ মহারাজজির সঙ্গে দেখা করব, লেকেন তাঁকে চিনি না—'

মণ্ডপের ওধারে চট দিয়ে অনেকটা জায়গা ঘিরে কিছু একটা হচ্ছে। সেখানে বেশ কিছু লোকজন ব্যস্তভাবে নানা ধরনের মালপত্র বয়ে নিয়ে আসছে। একটা চেয়ারে বসে ভারী চেহারার মাঝবয়সী এক সাধু হাত নেড়ে নেড়ে তাদের কী যেন বলে যাচ্ছে; দূর থেকে তার কথার একটি বর্ণও বোঝা যায় না।

যুবক সাধু আধবুড়ো সাধুকে দেখিয়ে 'উনি প্রাণানন্দজি' বলে চলে যায়। পায়ে পায়ে প্রাণানন্দের কাছে এগিয়ে আসে নাটোয়ার। হাতজোড় করেই ছিল সে। সসম্ভ্রমে ডাকে, 'মহারাজজি—'

প্রাণানন্দের চুল দাড়ি কাঁচায় পাকায় মেশানো, তবে জটা নেই। সারা মুখে গম্ভীর স্নেহময় হাসি মাখানো। নাটোয়ারের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কহো—'

কী উদ্দেশ্যে এসেছে সেটি জানিয়ে দেয় নাটোয়ার।

প্রাণানন্দের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, 'এই তো চাই। নিজের থেকে পবিত্র যজ্ঞের কাজ করতে এসেছ। বড় আনন্দের কথা। সবাই যদি তোমার মতো ধর্মাত্মা হ'ত, দুনিয়াটাই বদলে যেত। বেটা তোমার পরকাল বহোত আচ্ছা।'

সাধু মহারাজের এ জাতীয় ভালো ভালো কথায় নাটোয়ার খানিকটা অভিভূতই হয়ে পড়ে। তবে তার মাথাটা যথেষ্টই সাফ। পরকালের চাইতে ইহকাল সম্পর্কেই সে ঢের বেশি চিন্তিত। বলে, 'মহারাজজি, আমার সঙ্গে আরও দু'জন আছে—একগো আওরত আউর একগো লেড়কা। ওরাও কাজ করতে চায়।'

প্রাণানন্দ খুবই খুশি হন। বলেন, 'ঠিক হ্যায়। ওরা কোথায়?'

মণ্ডপের দিকে আঙুল বাড়িয়ে নাটোয়ার বলে, 'ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।'

'ওদের নিয়ে এসো—'

কথা বলতে বলতে সে টের পাচ্ছিল, কোত্থেকে যেন পুরী ভাজার গন্ধ আসছে। মণ্ডপের দিকে যেতে যেতে সে এক ঝলক দেখতে পায়, চটের ঘেরা জায়গায় বড় বড় কড়াইতে রসুইকরেরা কেউ পুরী ভাজছে, কেউ তরকারি চাপিয়ে লম্বা লম্বা হাতা দিয়ে নাড়ছে। এক পাশে চৌকো চৌকো কাঠের বারকোশে খাঁটি ঘিয়ে তৈরি গুলাবজামুন, বুন্দিয়া, বালুসাই আর কলাকন্দ থরে থরে সাজানো। দেখতে

দেখতে পেটের ভেতরকার খিদেটা চনচনিয়ে ওঠে। সম্ভাব্য একটি ভোজের স্বপ্নে তার ঝিমিয়ে পড়া শরীরে যেন বিজলি খেলে যেতে থাকে।

এক দৌড়ে গোম্‌তী এবং লচ্ছুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে নাটোয়ার। বলে, 'মহারাজজি, কিরপা করে এবার কাজ দিন।'

চটের অস্থায়ী রসুই ঘরের গায়ে লোহার বিরাট বিরাট দশ বারোটা জালা এবং চার পাঁচটা প্ল্যাস্টিকের বালতি রয়েছে। খানিক দূরে টাল দিয়ে রাখা হয়েছে মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি। দু'টো লোক বালতি করে দূরের টিউবওয়েল থেকে জল বয়ে এনে লোহার জালায় ঢেলে রাখছে। তিনটে লোক কুড়োল দিয়ে গাছের গুঁড়ি ফেড়ে ফেড়ে উনুনে জ্বালাবার জন্য লকড়ি বানাচ্ছে।

প্রাণানন্দ নাটোয়ারদের কাজ ভাগ করে দেয়। গোম্‌তী এবং লচ্ছু জল এনে চারটে জালা বোঝাই করবে; নাটোয়ার দু'টো কাঠের গুঁড়ি চিরবে।

একমুহূর্ত দেরি না করে কাজ শুরু করে দেয় নাটোয়াররা।

ঘন্টা দুই বাদে সূর্য যখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে, সেই সময় নাটোয়াররা প্রাণানন্দের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। জল টেনে আর কাঠ চিরে তিনজনের জিভ বেরিয়ে পড়েছে। ঘামে জামাকাপড় ভিজে সপসপে হয়ে গেছে।

নাটোয়ার বলে, 'কাম পুরা হো গিয়া মহারাজজি—'

প্রাণানন্দ ঘাড় ফিরিয়ে পরখ করে নেয়। সত্যিসত্যিই দু'টো বড় গাছের গুঁড়ি চেরাই হয়ে গেছে এবং চারটে জালাও ভরে ফেলা হয়েছে। খুবই সন্তুষ্ট হয়ে সে বলে, 'বহোত আচ্ছা। ভগোয়ান বিশ্বানন্দজিকে তোমাদের কথা বলব। জরুর তিনি তোমাদের আশীর্বাদ করবেন। অনেক খাটাখাটনি করেছ। যাও, মণ্ডপে গিয়ে যজ্ঞ দেখ—'

নাটোয়াররা তক্ষুনি চলে যায় না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রাণানন্দ তিনজনকে বারকয়েক লক্ষ করেন, তারপর বলেন, 'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ মহারাজজি, যদি গুস্‌সা না করেন—'

'না, না, গুস্‌সা করব কেন? যা বলতে চাও, বল—'

ঢোক গিলে নাটোয়ার বলে, 'আপকে কিরপাসে মজুরি মিল যায় তো, হামনিলোগ বঁচ যায়েগা—'

প্রাণানন্দের দুই চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, শিরদাঁড়া খাড়া করে সোজা হয়ে বসে সে। করাত চালানোর মতো কর্কশ গলায় বলে, 'কী বললে? মজুরি?'

স্নেহপ্রবণ যে লোকটার কণ্ঠস্বর থেকে এতক্ষণ মধু ঝরছিল, আচমকা সেটা এত দ্রুত বদলে যেতে দেখে চমকে ওঠে নাটোয়ার, রীতিমত ভয়ও পেয়ে যায়। দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বলে, 'আমরা বহোত গরিব আদমি—'

তার কথা যেন শুনতে পাচ্ছিল না প্রাণানন্দ। গলা চড়িয়ে সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, 'ভগোয়ানের কাজ করে পয়সা চাইছে! পাপী, ভ্রষ্টাচারী কাঁহিকা—'

নাটোয়ার এবার ভীষণ ঘাবড়ে যায়। বলে, 'মহারাজজি, কাল দুফার থেকে আমরা কিছু খাইনি। পইসা না পাই, কমসে কম ভাত চাপাটি যদি কিছু দেন—'

'আজ থেকে পুরা তিন রোজ এখানে যজ্ঞ হবে। চার দিনের দিন যে আসবে তাকেই 'ভোজন' করানো হবে। তখন চলে এসো, যত পার খেয়ে যেও। আভি ভাগো—'

আর কিছু বলতে সাহস হয় না নাটোয়ারের। খালি পেটে এতক্ষণ 'গতরচূরণ' খাটার পর সাধু মহারাজের কাছ থেকে যে পুরস্কারটি পাওয়া গেল তাতে মাথায় আগুন ধরে যায় তার। গোম্‌তীদের নিয়ে আর মণ্ডপের দিকে যায় না, রসুইঘরের পেছনে যে ফাঁকা জায়গাটা রয়েছে সেখানে গিয়ে বসে পড়ে। অসহ্য রাগে ক্ষোভে হিতাহিতজ্ঞানশূন্যের মতো গলার শির ছিঁড়ে চেঁচাতে থাকে, 'শালে সাধু মহারাজ! ধোঁকেবাজ, ভূচ্চর—' তার মুখ থেকে তোড়ে অকথ্য গালাগালি বেরিয়ে আসতে থাকে।

গোমতী সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে হাত নাড়তে নাড়তে বলে, 'গালি মাত্ দোঁ। ও লোগ শুনেগা তো হাল খারাপ কর দেগা—'

গোমতীর হুঁশিয়ারিতে খানিকটা কাজ হয়। নাটোয়ার বুঝতে পারে, সে যা করছে সেটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সাধুদের কানে গেলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাবে। ওদের শিষ্য এবং ভক্তরা খ্যাপা জানোয়ারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের একেবারে ছিঁড়ে ফেলবে। তবু ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে এভাবে বঞ্চিত হওয়ায় রাগ পড়ে না নাটোয়ারদের। কী চমৎকার চমৎকার কথা বলেই না প্রাণানন্দ তাদের খাটিয়ে নিল। নাটোয়ার গালাগাল বন্ধ করে না, গলার স্বরটা শুধু খানিক নামিয়ে দেয়।

অনেকক্ষণ চেঁচামেচির পর ক্লান্ত হয়েই একসময় চুপ করে যায় নাটোয়ার। তার জীবনীশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। নিজের ওপর এতকাল প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল নাটোয়ারের। কোনো কারণেই সে হতাশ হয়নি, ভেঙে পড়েনি, অসীম আত্মবিশ্বাসের জোরে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে চল্লিশটা বছর সে টিকে আছে কিন্তু গত দু'টো দিন নিষ্ফল ছোটাছুটির পর তার মনে হচ্ছে, আর বুঝিবা পেরে উঠবে না।

বেলা আরও খানিকটা হেলে গেছে। তবে রোদ প্রায় নেই বললেই হয়। সকালের দিকে যে মেঘগুলো আকাশ জুড়ে ঘোরাঘুরি করছিল, এখন সেগুলো জড়ো হয়ে পাথরের চাংড়ার মতো পশ্চিম দিকে ঝুলে আছে। যে সামান্য নির্জীব রোদটুকু এখনও দেখা যাচ্ছে, মেঘের কানাতের গায়ে তা আবছাভাবে আটকে গেছে।

কিছুক্ষণ আগেও ঝড়ো বাতাস বইছিল। হঠাৎ হাওয়াটা পড়ে গেছে। গোটা আবহাওয়ায় ভীষণ গুমোট। ভ্যাপসা গরমে গা যেন জ্বলে যায়।

গোমতী বলে, 'এখন তা হলে কী করবে?'

'আমি আর ভাবতে পারছি না।' বলে লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে নাটোয়ার। 'দ্যাখ তোরা কিছু করতে পারিস কিনা—'

এতক্ষণ দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি রেখে চুপচাপ বসে ছিল লচ্ছু। গোমতীদের কথায় তার কান ছিল বলে মনে হয় না। হঠাৎ সে ডাকে, 'চাচা—'

নাটোয়ার কৌতূহলশূন্য মুখে জিজ্ঞেস করে, 'কা রে?'

'ওই দেখ—'

'কা?'

'ওধারে তাকাও—' বলে লচ্ছু রসুই ঘরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

মাথাটা সামান্য তুলে নাটোয়ার আগের সুরেই বলে, 'দেখার কী আছে? ওখানে রসুই হচ্ছে।'

লচ্ছু জানায়, রসুই-এর খবর সে দিতে চায়নি, সেটা সবাই জানে। তার মাথায় একটি পরিকল্পনা আছে। চটের দেওয়ালের গা ঘেঁষে পুরী তরকারি গুলাবজামুন ইত্যাদি লোভনীয় খাবারগুলি কাঠের পরাতে সাজানো রয়েছে।

চটটা সামান্য তুললেই হাত বাড়িয়ে সেগুলোর নাগাল পাওয়া যাবে। কোমরে ক্ষিপ্র একটা মোচড় দিয়ে প্রায় লাফ মেরেই উঠে বসে নাটোয়ার। তার শরীরে নতুন করে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যাচ্ছে। লচ্ছুর পিঠে আদরের ভঙ্গিতে একটা চাপড় মেরে বলে, 'বহোত আচ্ছা—'

লচ্ছু বলে, 'চল, আস্তে আস্তে গিয়ে পুরী উরি নিয়ে আসি।'

কাল এই সময় ফাঁকা মাঠের মাঝখানে বাপের চিতার পাশে বসে একটানা কেঁদে যাচ্ছিল লচ্ছু। একদিনের মধ্যেই সে টের পেয়ে গেছে, পিতৃশোকের চেয়ে খাদ্য বস্তুটা অনেক বেশি জরুরি, তা সেটা গায়ে খেটে, চুরিচামারি করে, যেভাবেই হোক জোগাড় করতে হবে।

নাটোয়ার তীক্ষ্ণ চোখে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে, সব দিক দেখে নেয়। নাঃ, এধারে কেউ নেই। চারপাশ সুনসান। গোমতীর কাছ থেকে তার থলিটা চেয়ে নিয়ে তাকে এখানে বসে থাকতে বলে, লচ্ছুকে সঙ্গে করে কয়েক পা এগিয়ে যায়। তারপর হঠাৎ উবুড় হয়ে শুয়ে গিরগিটির মতো বুক টানতে টানতে রসুইঘরের পেছনে চটের দেওয়ালের কাছে এসে কিছুক্ষণ মড়ার মতো দমবন্ধ করে পড়ে থাকে।

এক সময় নাটোয়ার চাপা গলায় বাতাসের মতো ফিসফিসিয়ে বলে, 'লচ্ছু, তুই চটটা তুলে ধর। বেশি তুলবি না—হোঁশিয়ার—'

কথামতো খুব সন্তর্পণে চটটা আধ হাতের মতো তুলে ধরে লচ্ছু। যে ফোকরটা হয় নিমেষে দুই হাত ঢুকিয়ে দেয় নাটোয়ার। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো সে দু'টো বার বার ঢুকে প্রচুর পুরী তরকারি বালুসাই গুলাবজামুন কলাকন্দ বার করে এনে গোম্‌তীর সেই থলের ভেতর পুরে ফেলতে থাকে।

সমস্ত ব্যাপারটা নিখুঁত পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন হতে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ রসুইঘরের ভেতর কারো একজনের চোখে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড হইচই শুরু হয়ে যায়। 'চোর—চোর'

নাটোয়ারের মাথাটা সব সময়ই অত্যন্ত পরিষ্কার। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে এক হ্যাঁচকায় লচ্ছুকে টেনে তুলে দৌড়ুতে দৌড়ুতে গোম্‌তীর কাছে চলে আসে।

গোম্‌তীর চোখের পলকে ব্যাপারটা আঁচ করে আগেই উঠে পড়েছিল। নাটোয়ার বলে, 'দৌড় লাগা—ওই মাঠের দিকে—'

তিনটে মানুষ কাঁকরে-ভরা পড়তি জমির ওপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে থাকে। পেছন থেকে বহু মানুষের চিৎকার ভেসে আসছে।

দৌড়ুতে দৌড়ুতে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় নাটোয়ার। বিশাল জনতা লাঠি, বর্শা দা, হাতের কাছে যে যা পেয়েছে তা-ই নিয়ে ধাওয়া করে আসছে। নাটোয়ার দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'শালালোগ আ গিয়া। আউর জোরসে পা চালা—'

দিগন্ত-জোড়া মাঠের ওপর দিয়ে কাঁটা গাছ, ছোটখাটো ঢিলা, নহর ইত্যাদি পেরিয়ে নাটোয়াররা অন্ধের মতো ছুটতে থাকে। মাটিতে তাদের পায়ের পাতা পড়ছে না, তিনটে মানুষ হাওয়ায় যেন উড়ে চলেছে।

শোরগোলটা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। বোঝা যায়, ক্রুদ্ধ উত্তেজিত জনতা দৌড়ে তাদের সঙ্গে পেরে উঠছে না। প্রাণের ভয়ে যারা ছুটছে তাদের ধরা বড় সহজ নয়।

যাক, জানটা অন্তত বাঁচানো গেল। দুশ্চিন্তা যখন কিছুটা কেটে এসেছে সেই সময় হঠাৎ নতুন ঝঞ্ঝাট দেখা দেয়। সাঁ সাঁ করে মাথার ওপর দিয়ে, কানের পাশ দিয়ে পাথরের টুকরো তীরের মতো বেরিয়ে যেতে থাকে। অর্থাৎ কিনা লোকগুলো ধরতে না পেরে প্রচণ্ড আক্রোশে এখন ঢিল ছুড়ছে। নাটোয়ার ছোটা গতি বাড়িয়ে দিয়ে সঙ্গীদের উদ্দেশে বলে, 'আউর জোরসে—'

শরীরের শেষ শক্তিটুকু পায়ে জড়ো করে ওরা তিনজন এগিয়ে যায়।

ধীরে ধীরে পেছনের হট্টগোল ক্ষীণ হয়ে যেতে থাকে। কিন্তু তার আগেই নাটোয়ারের পিঠে আর গোম্‌তীর পায়ের গোছে দু'টো বড় মাপের পাথরের টুকরো এসে পড়েছে।

দিনটা আরও ঢলে পড়েছে। গাঢ় মেঘের ফাঁক দিয়ে ম্যাড়মেড়ে সূর্যের একটা কোণা শুধু চোখে পড়ে। রোদ আর নেই, চারিদিক দ্রুত ছায়াচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। আকাশের ভাবগতিক দেখে মনে হয়, আজ বৃষ্টি নামবেই।

এখন আর পেছনে হট্টগোল নেই। যারা লাঠি ডাণ্ডা নিয়ে তাড়া করে এসেছিল তাদেরও দেখা যাচ্ছে না। নাটোয়াররা হাতের বাইরে চলে যাবার পর জনতার মাথা থেকে আক্রোশটা নেমে গেছে।

নাটোয়াররা আপাতত যেখানে এসে পড়েছে, সেখানে সারি সারি ভাঙাচোরা অগুনতি চালাঘর। দেখেই বোঝা যায়, একদা এখানে জমজমাট হাট বসত, এখন পরিত্যক্ত।

নাটোয়ারের পিঠে এবং গোম্‌তীর পায়ে যেখানে পাথর লেগেছিল, এখন সেই জায়গাগুলি মারাত্মক টাটাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে প্রাণ বাঁচাতে যখন তারা দৌড়ুচ্ছে তখন অন্য কোনোদিকে নজর ছিল না। ভয় এবং দুশ্চিন্তামুক্ত হওয়ার পর যন্ত্রণাটা টের পাওয়া যাচ্ছে। নাটোয়ারের মনে হচ্ছে তার পিঠ এবং গোম্‌তীর মনে হচ্ছে তার পা যেন ছিঁড়ে পড়বে।

এতটা দৌড়ে আসার কারণে তিনজনেরই বুক হাপরের মতো ওঠানামা করছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে

গোমতী বলে, 'আমি আর এক কদমও চলতে পারব না।' বলেই প্রায় হুড়মুড় করে একটা চালার তলায় বসে পড়ে।

নাটোয়ার এবং লচ্ছুও জানায়, তাদের শরীরেও এক পা চলার মতো শক্তি অবশিষ্ট নেই। দু'জনে গোমতীর পাশে বসে বুক তোলপাড় করে জোরে জোরে শ্বাস টানতে থাকে।

খানিক ধাতস্থ হওয়ার পর নাটোয়ার বলে, 'শালে ভুচ্চরেরা এমন পাত্থর মেরেছে, মনে হচ্ছে, পিঠের হাড্ডি বিশ টুকরা হয়ে গেছে।'

গোমতী বলে, 'আমার পায়ের হাল দেখ—' বলে ডান পা'টা সামনের দিকে বাড়িয়ে শাড়ির নিচের অংশ অনেকখানি টেনে তোলে। সে বাড়িয়ে কিছু বলেনি, সত্যিই পায়ের গোছ পাথরের ঘায়ে থেঁতলে রীতিমতো ফুলে উঠেছে, চামড়া ফেটে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

তারা ঠিক করে ফেলে আজকের রাতটা এই নির্জন হাটের চালায় কাটিয়ে দেবে। এখান থেকে কোথায় কোন দিকে যাবে কাল সকালে উঠে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করবে। আজ পুরো রাত শুধু একটানা ঘুম।

প্রাণের ভয়ে দৌড়ুলেও খাবারের থলেটা ছাড়েনি নাটোয়ার, সারাক্ষণ বুকের ভেতর সেটা আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। থলেটা দামি দামি সুখাদ্যে বোঝাই। এত খাবার যে আজ খাওয়ার পরও যা বাড়তি থাকবে তাতে কালকের দিনটাও তিন বেলা ভালোভাবে চলে যাবে।

গোমতীও তার থালা লোটা আর শাড়িটাড়ি ফেলে আসেনি।

হাটের এই চালাগুলো থেকে খানিক দূরে একটা বিল চোখে পড়ে। অনেকক্ষণ জিরোবার পর দিনের আবছা আলো থাকতে থাকতেই তিনজনে সেখানে চলে যায়। হাতমুখ ধুয়ে গোমতী লোটায় ভরে জল নিয়ে আসে।

নাটোয়ারের পকেটে একটা দেশলাই আছে ঠিকই কিন্তু ওদের কারো কাছেই হেরিকেন বা ডিবিয়া নেই। কাজেই মেঘাচ্ছন্ন দিনের শেষ আলোটুকু থাকতে থাকতেই ওরা রাতের খাওয়া চুকিয়ে ফেলে।

যাদের হাতে একটা পয়সাও নেই, ভবিষ্যৎ যাদের কাছে একেবারেই অন্ধকার, শুধু কালকের দিনটার মতো খাদ্য যাদের মজুদ রয়েছে, তারপর কী খাবে জানা নেই, এদিকে দু'জনের পিঠ আর পা পাথরের ঘা লেগে ভালো রকমই জখম হয়েছে—এত কষ্ট এবং অনিশ্চয়তার ভেতরও সাধুদের ওপর বাটপাড়ি করতে পেরে তারা বেজায় খুশি। এই নিয়ে তিনজনে অনেকক্ষণ হাসাহাসি করে কাটিয়ে দেয়।

নাটোয়ার বলে, 'শালে ধোঁকেবাজদের আমরাও ধোঁকা দিয়েছি, না কী বলিস রে লচ্ছু? কা রে গোমতী?'

লচ্ছু এবং গোমতী হাসতে হাসতে বলে, 'জরুর, জরুর—'

একসময় সন্ধে নেমে যায়। আজ কী তিথি কে জানে। মেঘের কারণে গোলা আলকাতরার মতো চাপ চাপ অন্ধকারে সমস্ত চরাচর ঢাকা পড়ে গেছে।

খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে একটা চালার তলায় চিত হয়ে পড়েছে নাটোয়ার। অন্য এক চালায় গোমতী এবং লচ্ছু।

কালকের মতোই থেকে থেকে মেঘ ডাকছে। আকাশটাকে পুব-দক্ষিণে বা উত্তর-পশ্চিমে আড়াআড়ি ফেড়ে বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে। কাল দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছিল, আজ চারিদিক ভাসিয়ে দেবার মতো আয়োজন হয়েই আছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল নাটোয়ার। চাঁদ উঠেছে কিনা বোঝা যায় না। যতদূর চোখ যায়, একটা তারা পর্যন্ত কোথাও নেই। পিঠের অসহ্য টাটানি আর সারা শরীরের অসীম ক্লান্তিতে চোখ ক্রমশ বুজে আসতে থাকে নাটোয়ারের।

কখন যে গুমোট ভাবটা কেটে গিয়ে জোবালো হাওয়া বইতে শুরু করেছে, কে জানে। ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টিও নেমে গেছে।

নাটোয়ার গভীর ঘুমের আরকে ডুবে গিয়েছিল। হঠাৎ কার একটা হাত তার গলার ওপর এসে পড়ে। কানের কাছ মুখে এনে কেউ ফিসফিসিয়ে ডাকে, 'এ—এ আদমি—এ—' ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সে নাটোয়ারকে নাড়াও দিতে থাকে।

ঘুম ভেঙে যায় নাটোয়ারের। যে হাতটা তার গলার ওপর এসে পড়েছিল, এখন সেটা ফাঁসের মতো ক্রমশ তাকে জড়িয়ে ফেলছে। 'কৌন—কৌন—' বলতে বলতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করে নাটোয়ার কিন্তু পারে না। টের পায় দু'টি সুদৃঢ় অথচ নরম স্তন তার বুকে লেপটে গিয়ে যেন গলে গলে মিশে যাচ্ছে।

এবার একটা চাপা ধাতব শব্দের মতো গলা শুনতে পায় নাটোয়ার, 'মাত্ উঠো—হামনি গোম্‌তী—'

চার বছর ধরে নাটোয়ারের রক্তের ভেতর যে আগুন প্রায় নিভে এসেছে, কাল রাতে সেটা নতুন করে জ্বলে উঠেছিল কিন্তু প্যান্ডেলে ভারতমাতা রথ-এর জুলুসের প্রচুর লোকজন ছিল, তাই গোম্‌তী কাছে আসতে চায়নি, কিন্তু মেয়েমানুষটা আজ নিজের থেকেই বুকের ভেতর এসে ধরা দিয়েছে।

নাটোয়ার সাপটে গোম্‌তীকে বুকের ভেতর আরও ঘন করে জড়িয়ে নেয়। তারপর উন্মাদ আবেগে তার মুখে বুকে গলায় মুখ ঘষতে থাকে।

অসহ্য গভীর সুখে শ্বাস আটকে আসে গোম্‌তীর। তার শরীর ভীষণ কাঁপছিল। আস্তে আস্তে নাটোয়ারের ঠোঁটে, কানের লতিতে, থুতনি এবং নাকে কামড়ে বসাতে বসাতে সে বলে, 'আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে। তুমি কি আমাকে মেরে ফেলবে!'

'শালী কুত্তী, তুই তো আমাকে মেরে ফেলছিস!' নাটোয়ারের গলার ভেতর থেকে শীৎকারের মতো আওয়াজ বেরিয়ে আসতে থাকে।

'এখন তো খুব সুহাগ করছ। তুমি না আমাকে ঘিন (ঘৃণা) করতে?'

'ভুল যা—'

'তুমি না আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে?'

'ভুল যা—'

'ফকিরা চাচা না থাকলে সেদিন তো তুমি আমাকে মেরেই ফেলতে—'

'ভুল যা। এখন যত ফালতু বাত—'

আচমকা গোম্‌তী টের পায়, নাটোয়ারের দুই হাত তার জামাকাপড় টেনে ছিঁড়ে ফেলছে। চমকে উঠে তার হাত চেপে ধরে গোম্‌তী, 'কা করত হ্যায়? আমার সিরিফ দো কাপড়া! একটা ছিঁড়ে ফেললে—'

নাটোয়ারের গায়ে এবং কণ্ঠস্বরে অমানুষিক কিছু যেন ভর করেছে। সে বলে, 'এক কাপড়ার বদলে দশগো কিনে দেবো।' সে ভুলে যায় মাত্র একদিনের খাদ্য ছাড়া তার হাতে একটা পয়সাও নেই কিন্তু এটা এমন এক মুহূর্ত যখন কোনো ব্যাপারেই হিসেব থাকে না।

'নেহী নেহী, থোড়েসে সবুর—'

কিছুক্ষণ বাদে নাটোয়ার বুঝতে পারে উত্তপ্ত, ঝাঁঝালো এবং মারাত্মক একটি শরীরে—যার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা সুতো পর্যন্ত নেই—সে ক্রমশ প্রবল নেশাগ্রস্তের মতো ঢুকে যাচ্ছে।

এই সময় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। গোটা পৃথিবীকে রসাতলে পাঠাবার জন্য যে আয়োজনটা ক'দিন ধরেই চলছিল, আজ এই মুহূর্তে সেটা শুরু হয়ে যায়। বাইরে প্রকৃতি যখন খেপে উঠেছে সেই সময় এক পরিত্যক্ত হাটের চালায় একটি পুরুষ এবং একটি মেয়েমানুষ শরীরে জগতের আদিম দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে।

অনেকক্ষণ পর দেহ দু'টি আলগা হয়ে যায়। পরস্পরের কাছাকাছি শুয়ে নাটোয়ার এবং গোম্‌তী হাঁপাতে থাকে।

বাইরে জল ঝরেই যাচ্ছে। সেই সঙ্গে মেঘের একটানা গর্জন আর বিজলি চমক তো রয়েছেই।

চারিদিক থেকে বৃষ্টির ছাট আসছে। ফুটো চালা থেকে অনবরত জল ঝরছে। নাটোয়ার এবং গোম্‌তীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভিজে যাচ্ছে কিন্তু সে ব্যাপারে কারো হুঁশ নেই।

অনেকক্ষণ পর গোম্‌তী ফিসফিসিয়ে বলে, ‘আমি কী করব?’

বুঝতে না পেরে নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, ‘কী করবি, মতলব?’

‘একা একা আমার আর ভালো লাগে না—’ বলতে বলতে নাটোয়ারের বুকের কাছে মুখটা নিয়ে আসে গোম্‌তী।

নাটোয়ার চার বছর আগের সেই ব্যাপারটা পুরোপুরি ভুলে যায়নি। সে বলে, ‘যার সঙ্গে ভেগেছিলি, ওহী শালে ভুচ্চরের ছৌয়া গেল কোথায়?’

নাটোয়ারের খোঁচাটা এই মুহূর্তে গোম্‌তীকে খুবই কষ্ট দেয়। করুণ মিনতিপূর্ণ স্বরে সে বলে, ‘তোমাকে তো বলেছিই আমার কসুর হয়েছে, পাপ হয়েছে। ওসব বলে আমাকে আর দুখ দিও না।’

নাটোয়ার এ সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন করে না।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর গোম্‌তী ফের বলে, ‘বাপুর ঘরে আমার আর থাকতে ইচ্ছা করে না।’

নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, ‘কী করতে চাস তুই?’

‘তুম বাতা দো—’ গলার স্বর আরো চাপা শোনায় গোম্‌তীর।

তার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারছিল নাটোয়ার। একটা হারামজাদার ছৌরার সঙ্গে পালিয়ে যাবার স্মৃতি আদৌ সুখকর নয় গোম্‌তীর। বরং লজ্জায় গ্লানিতে সে যেন মরে আছে। চার বছর আগে যে বিশ্বাসঘাতকতা করে পালিয়ে গিয়েছিল, এখন সে সত্যিসত্যিই অনুতপ্ত। এমন একটি মেয়েমানুষকে নতুন করে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া যায় কিনা সেটাই যেন ভেবে উঠতে পারছে না নাটোয়ার। সে বলে, ‘তুই কি আমার কাছে যেতে চাস?’

গোম্‌তী উত্তর দেয় না। নাটোয়ারের বুকের ভেতর উন্মাদের মতো মুখ ঘষতে ঘষতে সে সমানে কাঁদতে থাকে।

কর্কশ হাত যতটা সম্ভব মোলায়েম করে গোম্‌তীর মাথা কপাল গাল গলা এবং স্তনের ওপর বুলোতে বুলোতে নাটোয়ার বলে, ‘রো মাত্‌, রো মাত্‌। কাঁদিস না গোম্‌তী—’

নাটোয়ার আবেগের তোড়ে পুরোপুরি ভেসে যায় না। সে বলে, ‘সোচ বিচার (ভেবেচিন্তে) করে দেখি। গাঁওবালাদের সাথ, ফকিরাচাচার সাথ কথা বলতে হবে। তারপর—’

গোম্‌তী অবুঝের মতো নাটোয়ারের বুকে মুখে গলায় মুখ ঘষতে ঘষতে বলে, ‘যত খুশি সোচ বিচার কোরো, যার সঙ্গে খুশি কথা বোলো—আমি তোমার কাছে যাবই—’

পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আকাশভাঙা প্রলয়ের মধ্যে অকালের বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে একসময় তারা ঘুমিয়ে পড়ে।

চোদ্দ

গোম্‌তীর ঘুম যখন ভাঙে তখনও অনেকটা রাত রয়েছে। তবে বৃষ্টি ধরে গেছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে ঘোলাটে একটু জ্যোৎস্না বেরিয়ে এসেছে। আবছা আলোয় সে দেখতে পায়, ঘাড় গুঁজে ঘুমোচ্ছে নাটোয়ার। তার সমস্ত শরীর একেবারে উদোম। পাশ থেকে নাটোয়ারের জামাপ্যান্ট তুলে নিয়ে তাকে ঢেকে দেয় গোম্‌তী। তারপরেই নিজের দিকে নজর যায় তার। শিয়রের কাছে তার শাড়ি আর জামা দলামোচড়া হয়ে পড়ে ছিল। দ্রুত সেগুলো পরে নেয় সে। এবং তখনই লচ্ছুর কথা মনে পড়ে যায়।

কাল সন্ধ্যায় খাওয়ার পর লচ্ছু আর সে একটা চালায় শুয়েছিল, আর এই চালাটায় নাটোয়ার। রাতে ঘোর দুর্যোগের মধ্যে যখন তাদের দু'টো শরীর একসঙ্গে মিশে যায় সেই সময় নিজেরা ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত কিছুই তাদের কাছে পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এখন লচ্ছুর কথা মনে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পাশের চালায় চলে, আসে গোম্‌তী। জলে ভিজে কুঁকড়ে, বুকের ভেতর হাঁটু গুঁজে

কুকুরের মতো শরীরটাকে দলা পাকিয়ে শুয়ে আছে ছেলেটা। কয়েক পলক তার দিকে তাকিয়ে থাকে গোম্‌তী। ছেলেটার মা নেই, জমিমালিকেরা তাদের গাঁও জ্বালিয়ে দিয়েছে, বন্দুকবাজদের গুলিতে তার বাপ মরেছে, দুনিয়ায় কেউ নেই তার। লচ্ছুর জন্য অপার মমতায় গোম্‌তীর বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যেতে থাকে। তাড়াতাড়ি ঝুঁকে শাড়ির আঁচল দিয়ে ছেলেটার মাথা এবং গা মুছে দেয়।

লচ্ছু যেখানে শুয়ে ছিল সেখানে চাল চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ছে। গোম্‌তী সযত্নে তাকে চালার যে জায়গাটা এখনও শুকনো রয়েছে সেখানে নিয়ে আসে এবং মা-পাখি যেভাবে তার বাচ্চাকে আগলে রাখে হুবহু সেইভাবেই লচ্ছুকে জড়িয়ে ধরে তার পাশে শুয়ে থাকে গোম্‌তী। তারপর ফের ঘুমিয়ে পড়ে।

গোম্‌তীর দ্বিতীয় দফার ঘুম যখন ভাঙে, বেশ বেলা হয়েছে এবং এর মধ্যেই জেগে গেছে লচ্ছু আর নাটোয়ার। তারা তার শিয়রের কাছে বসে কথা বলছিল।

হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসতে বসতে নাটোয়ারের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায় গোম্‌তীর। কাল রাতের কথা মনে পড়তে মুখ নামিয়ে লাজুক হাসে সে। পিঠময় ছড়ানো চুলগুলো একটা আলগা খোঁপায় গোছাতে গোছাতে বলে, 'বহোত দেরি হয়ে গেল উঠতে—'

নাটোয়ার বলে, 'লচ্ছু আর আমি কত বার তোকে ডেকেছি তার ঠিক নেই। বিলকুল আওরত কুম্ভকরণ—'

'কী করব, অ্যায়সা নিদ এসে গেল মাঝ রাতে—'

একটু চাপচাপ।

তারপর নাটোয়ার বলে, 'এখন কী করা যায় বল্ তো? আশমানের যা হাল তাতে বেরিয়ে পড়তে ভরসা হচ্ছে না।'

কাল মধ্যরাতে মেঘ কেটে গিয়ে তবু খানিকটা জ্যোৎস্না বেরিয়ে পড়েছিল, বৃষ্টিটাও ধরে গিয়েছিল। কিন্তু আজ আকাশের মতিগতি নতুন করে আবার ঘোরালো হয়ে উঠেছে। কোথাও রোদের ছিটেফোঁটা চোখে পড়ছে না। সূর্যটা উধাও। পাথরের চাংড়ার মতো চাপ চাপ কালো মেঘে সব কিছু ঢেকে আছে। যে কোনো মুহূর্তে আকাশ ভেঙে হুড়মুড় করে ফের তুমুল বৃষ্টি নেমে যেতে পারে।

গোম্‌তী সায় দিয়ে বলে, 'হাঁ, কিছুক্ষণ দেখি। মেঘ কেটে যদি সূরয বেরোয় তখন না হয় বেরুনো যাবে।'

'সেই ভালো। আজকের দিনটার জন্যে তো খানা উনার চিন্তা নেই।'

নাটোয়ার বলে, 'কাল খেয়েদেয়ে যা বেঁচেছিল, দ্যাখ সেগুলো ঠিক আছে কিনা—'

এই চালারই একধারে গোম্‌তীর থলেটা রয়েছে। ব্যস্তভাবে সেটা টেনে এনে খাবারগুলো বার করে রেখে নেয় সে। নাঃ, গরম কাল হলেও কাল একটানা বৃষ্টির জন্য বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল। কাজেই খাদ্যবস্তুগুলো নষ্ট হয়নি। গোম্‌তী সেই কথাটা জানিয়ে দেয়।

খানিকক্ষণ চিন্তা করে নাটোয়ার একসময় বলে, 'এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যাওয়া যায়? দু'দিন ধরে বেফায়দা ঘুরে মরছি। একগো পাইসাও কামাই করতে পারলাম না।'

গোম্‌তীকে বেশ চিন্তিত দেখায়। সে বলে, 'হাঁ, আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি একটা ফিকির বার ক'রো।

তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয় না নাটোয়ার। অনেকক্ষণ কী ভাবে সে, তারপর বলে, 'এখান থেকে মাইল চারেক পুবে গেলে ক'টা কাঠ চেরাইয়ের কারখানা আছে। জায়গাটার নাম বারদিয়া। ওখানে কয়েক বার আমি কাজ করে এসেছি। রামজি কিষুণজির কিরপা হলে বারদিয়ায় কিছু কামাই হয়ে যেতে পারে।'

এ ছাড়া চোখের সামনে পয়সা রোজগারের আর কোনো পথই দেখা যাচ্ছে না। মাথা হেলিয়ে গোম্‌তী বলে, 'ঠিক হ্যায়। লেকেন—'

'লেকেন কী?' গোম্‌তীর চোখের দিকে তাকায় নাটোয়ার।

গোম্‌তী সংশয়ের গলায় এবার বলে, 'আমাদের যা বরাত, ওখানে গিয়ে যদি কামকাজ না মেলে?'

এদিকটা তেমন ভেবে দেখেনি নাটোয়ার। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে চিন্তাগ্রস্তের মতো বলে, 'হাঁ, সে ভয়টা আছে।'

'তখন কী করবে?'

নাটোয়ার জানায়, তেমন দুর্ভাগ্য ঘটলে কী করণীয়, এই মুহূর্তে ভাবতে পারছে না, তবে বেঁচে থাকার জন্য কোনো না কোনো ধান্দা তো করতেই হবে।

গোম্‌তী ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, মুখে কিছু বলে না।

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যেতে নাটোয়ারের চোখে যেন ঝিলিক খেলে যায়। সে বলে, 'কাজ না মিললেও পন্দ্র বিশ রোজ না খেয়ে মরব না রে গোম্‌তী।'

'ও ক্যায়সা?' উৎসুক সুরে জানতে চায় গোম্‌তী।

'আরে বাবা, ওই রথবালারা আছে না—ওই যে ভারতমাতাজিকা রথ?'

'হাঁ হাঁ--'

'ওরা তো বড় পাক্কী ধরে আধারশিলা বসাতে বসাতে চলেছে।'

'ঠিক বাত।'

'কামাইয়ের ব্যাওস্থা না হলে ওদের জুলুসে ঢুকে পড়ব। কমসে কম পেটের দানা তো জুটে যাবে।'

শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে এটাই সাব্যস্ত হয় যদি কোনোভাবেই কাজকর্ম জোটানো সম্ভব না হয়, তারানাথজির রথযাত্রার মিছিলে ক্ষুধার্ত জনতার সঙ্গে তারাও হাঁটতে থাকবে এবং তার ফাঁকে ফাঁকে পালিয়ে গিয়ে কামাইয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাবে। অবশ্য দু'দিন ধরে তারা এটাই করে যাচ্ছিল। তবে এলোমেলোভাবে। এখন থেকে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে তাদের এগুতে হবে। সকাল এবং বিকেলে কাজের খোঁজে বেরুবে কিন্তু দুপুরে খাওয়ার সময় নিতান্ত নিরুপায় না হলে ভারতমাতা রথ-এর সঙ্গে তারা আঠার মতো জুড়ে থাকবে।

নাটোয়াররা ঠিক করে রেখেছিল, মেঘ ফাটিয়ে রোদ বেরুলে এই পরিত্যক্ত হাট থেকে বেরিয়ে পড়বে কিন্তু বেলা যত চড়ে, আকাশের চেহারা ততই ঘোরালো হয়ে উঠতে থাকে। কালো পাথরের মতো নিরেট মেঘে চারিদিক ছেয়ে গেছে। পশ্চিম দিগন্তকে আড়াআড়ি চিরে দিয়ে কড় কড় করে বাজ পড়ে, ঝলসে যায় উঁচু উঁচু আকাশ ছোঁয়া গাছের মাথা। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে।

সকাল থেকে যার জন্য এত তোড়জোড়, দুপুরের পর থেকেই আবার তা নতুন করে শুরু হয়ে যায়। লক্ষ কোটি সীসার ফলার মতো বৃষ্টি নেমে আসতে থাকে আকাশ থেকে।

নড়বড়ে ফুটোফাটা হাটের চালায় পরস্পরের কাছাকাছি ঘন হয়ে বসে কোনোরকমে মাথা বাঁচাতে চেষ্টা করে নাটোয়াররা কিন্তু জোরালো বৃষ্টির তোড় চারিদিক থেকে তাদের অনবরত ভিজিয়ে দিতে থাকে। এরই মধ্যে তারা দুপুরের খাওয়া চুকিয়ে ফেলে।

দুপুরের পর বিকেল, বিকেলের পর রাত নামে। কিন্তু জল ঝরার কামাই নেই। যে চালাটায় তিনজন বসে ছিল সেটা একসময় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। অগত্যা দৌড়ে অন্য একটা চালার তলায় চলে যেতে হয় নাটোয়ারদের। কিন্তু এই জনশূন্য পরিত্যক্ত হাটে একটা চালাও কি শক্তপোক্ত আর অক্ষত আছে? জোরালো বৃষ্টির ধাক্কা সামলে বেশিক্ষণ খাড়া থাকার ক্ষমতা কোনোটারই নেই। একটা চালা ধসে পড়লে নাটোয়ারেরা আরেকটা চালায় গিয়ে মাথা গোঁজে। সেটা চুরমার হলে যেটা এখনও খাড়া আছে তার তলায় চলে যায়। এইভাবে সমস্ত হাট জুড়ে তিনটি মানুষ অনবরত ছোটাছুটি করতে থাকে।

সন্ধের অনেক পর বৃষ্টির ছাটে ভিজে ভিজে নাটোয়ারদের শরীর যখন সিঁটিয়ে গেছে, ঠাণ্ডা জলো বাতাস তাদের সারা গায়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছে, সেই সময় বৃষ্টি থামে।

কোনো একটা চালাও আস্ত বা অটুট নেই। সবগুলিরই এক হাল। মাটি ভিজে এমনই থকথকে হয়ে গেছে যে শোওয়ার জো নেই। এরই মধ্যে যে চালাটি মোটামুটি ভালো অর্থাৎ ছাউনি দিয়ে জল কম পড়েছে সেখানে হাঁটুতে মাথা গুঁজে তিনটে মানুষ ঠায় ব'সে হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে রাতটা কাটিয়ে দেয়।

কাল সৃষ্টিছাড়া ঝড়বৃষ্টিতে পৃথিবী যে রসাতলে যেতে বসেছিল, আজ আকাশের দিকে তাকিয়ে কে তা বলবে। চিরকালের চেনা পরিষ্কার নীলাকাশ মাথার ওপর দিগন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। পরিত্যক্ত হাটে ধসে-পড়া অগুনতি চালা আর নানা গাছগাছালির ভাঙাচোরা ডালপালা ছাড়া কোথাও দুর্যোগের চিহ্নমাত্র নেই।

খানিক আগে সকাল হয়েছে। গলানো গিনির মতো ঝলমলে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত চরাচরের ওপর। কাল একটানা বৃষ্টির কারণে আবহাওয়া আজ বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। আরামদায়ক ঝিরঝিরে বাতাস বয়ে যাচ্ছে অদৃশ্য স্রোতের মতো।

মহাযজ্ঞের রসুইখানা থেকে যে সুখাদ্যগুলি নাটোয়াররা চুরি করে এনেছিল, কাল ভালোভাবেই তাতে চলে গেছে। আজ সকালের কথা মাথায় রেখে কয়েকখানা পুরী আর গোটা তিনেক কলাকন্দ রেখে দিয়েছিল গোম্‌তী। তিনজনে শেষ খাদ্যটুকু খেয়ে একসময় বেরিয়ে পড়ে।

এ অঞ্চলের মাটি বেশির ভাগই কাঁকুরে এবং কর্কশ। তাব সঙ্গে দানা দানা বালি মেশানো। প্রবল বৃষ্টিতেও তেমন কাদা টাদা জমেনি। তাই হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছিল না।

এদিকে আগে কখনও আসেনি নাটোয়ার। না এলেও জায়গাটা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা আছে। এখান থেকে ডান দিকে ঘুরে উত্তর-পশ্চিম কোণ বরাবর হাঁটতে থাকলে দুপুর নাগাদ তারা বারদিয়া পৌঁছুতে পারবে।

চলতে চলতে গোম্‌তী জিজ্ঞেস করে, 'একগো বাত পুছুঁ?'

নাটোয়ার বলে, 'একগো কায়? দশগো পুছ না—'

'কাঠ চিরাইয়ের কারখানায় গেলে কামাইয়ের বন্দোবস্ত্ হবে তো?'

'কালই তো বললাম, আমাদের যা বরাত, ভরোসা দিতে পারছি না। বারদিয়ায় গিয়ে তো দেখি।'

গোম্‌তীর বুক তোলপাড় করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। মনে পড়ে, এই কথাগুলো আগেও হয়েছে। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সে বলে, 'হাঁ, ঠিক বাত। ভাগ্যটাই বহোত বুরা, কোথাও কিছু জুটছে না।'

এরপর অনেকক্ষণ কেউ আর কিছু বলে না, চুপচাপ কাঁকুরে পড়তি ডাঙার ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকে।

মাইলখানেক চলার পর আচমকা দক্ষিণ দিক থেকে কার গলা যেন ভেসে আসে, 'হোই-হোই—হোই—'

নাটোয়াররা থমকে দাঁড়িয়ে এধারে ওধারে তাকাতেই অনেক দূরে, ফাঁকা নির্জন মাঠের মাঝখানে লোকটাকে দেখতে পায়। ওদিকে সবুজের ছিটেফোঁটাও নেই। না বড় গাছ, না ঝোপঝাড়। চারপাশ ন্যাড়া, রুক্ষ, জনশূন্য। লোকটা যেন পাতাল থেকে মাটি ফুড়ে ওখানে বেরিয়ে এসেছে। অবাক চোখে তিনজন তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিছুক্ষণের ভেতর লোকটা কাছাকাছি এসে পড়ে। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। একসময় স্বাস্থ্য টাস্থ্য তার ভালোই ছিল। এখন হাত-পায়ের মোটা মোটা হাড় ছাড়া বিশেষ কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। চুল উস্কুখুস্ক, তেলহীন। গালে খাপচা খাপচা দাড়ি। গায়ের রং পোড়া ঝামার মতো। পরনে ছেঁড়া জামা এবং হাফ প্যান্ট। কাঁধে একটা টাঙ্গি। মুখচোখ এবং শরীরের গড়ন বুঝিয়ে দেয়, লোকটা আদিবাসী। খুব সম্ভব অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে সে। কপালে ঘাড়ে তার প্রচুর ঘাম। জামাও ভিজে গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে। গলা থেকে কালো সুতোয় বাঁধা একটা দস্তার ক্রশ ঝুলছে। বোঝা যায় সে খ্রিস্টান।

নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'ডাকছিলে কেন? কিছু বলবে?'

লোকটা বলে, 'এদিকে কোনো টৌন আছে?'

বোঝা যায় সে এ অঞ্চলের মানুষ না। নাটোয়ার বলে, 'আছে। তবে ছোটে ছোটে টৌন। টৌনের খোঁজ করছ কেন?'

লোকটা এবার যা উত্তর দেয় তা এইরকম। সে আসছে সুদূর পশ্চিম থেকে কিছু কাজকর্ম এবং রোজগারের আশায়। ছ'সাত দিন ধরে সে সমানে হাঁটছে। পথে দু-চারটে ছোটোখাটো শহর আর গঞ্জ যে পড়েনি তা নয়। তবে সে সব জায়গায় গিয়ে বিশেষ সুবিধা হয়নি। তাই ক্রমাগত হেঁটে চলেছে সামনের দিকে, যদি কোথাও কামাইয়ের একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়।

কী আশ্চর্য, এই লোকটাও তাদের মতোই কাজ এবং খাদ্যের খোঁজে ভূ-পর্যটনে বেরিয়েছে! অবাক হয়ে তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে নাটোয়ার। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'কী নাম তোমার ভেইয়া?'

'বিলসন--বিলসন টোপনো।' লোকটা জানায়।

টোপনো যে ভাষায় কথা বলছে তা বুঝতে অসুবিধাহয় না। তবে সেটা উত্তর বিহারের এই অঞ্চলে চালু নয়। বলার ভঙ্গিতে অপরিচিত কিন্তু মিঠে একটু টান আছে। নাটোয়ার বলে, 'আমরা একটা গঞ্জে যাচ্ছি। ইচ্ছে হলে আমাদের সঙ্গে আসতে পারো।'

টোপনো উৎসাহিত হয়ে ওঠে, 'হাঁ, হাঁ, জরুর।'

'লেকেন—'

'কী?'

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, হেঁটে হেঁটে বহোত থকে গেছ। না জিরিয়ে আর কি হাঁটতে পারবে?'

'জরুর পারব। তোমাদের পেয়ে ভালোই হয়েছে। না হলে কীভাবে যে টৌন খুঁজে বার করতাম কৌন জানে!'

'তবে চল।'

ডান পাশ থেকে চাপা গলায় গোম্‌তী নাটোয়ারকে বলে, 'আমাদেরই কিছু জুটছে না। ওকে আবার সঙ্গে নিচ্ছ কেন?' নতুন এক ভাগীদার জুটে যাওয়ায় সে আদৌ খুশি নয়।

নাটোয়ার হাসে। বলে, 'আরে বাবা, যে যার বরাতে খায়। কামকাজ পাওয়া যাবে কিনা তার ঠিক নেই। চিন্তা নায় করনা—হাঁ।' বলে ফের টোপনোর দিকে তাকায়।

দুশ্চিন্তা কিন্তু কাটে না গোম্‌তীর। ঘোর বিদ্বেষের চোখে টোপনোকে একবার দেখে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

হাঁটতে হাঁটতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে টোপনোর কাছ থেকে অনেক খবর জেনে নেয় নাটোয়ার। ওদের গাঁ জঙ্গলের গা ঘেঁষে। জঙ্গলের কাঠ কেটে, ছোটোখাটো নানারকম জানোয়ার মেরে, ওই অঞ্চলের বড় জমিমালিকের খেতে জনার, আখ ইত্যাদি ফলিয়ে পুরুষ পরম্পরায় তারা জীবন কাটিয়ে আসছিল। কিন্তু জমিমালিকের মাথায় কী খেয়াল চেপেছে, জঙ্গল কেটে চাষের জমি বরবাদ করে ওখানে বড় কারখানা বসাবে। অরণ্যের আদিম বাসিন্দা অর্থাৎ টোপনোদের রুজি রোজগার বন্ধ হয়ে যাতে না যায় সে জন্য কারখানায় নৌকরি দেবে জমিমালিক। সেই অনুযায়ী জঙ্গল সাফ করে উঁচু পাঁচিল দিয়ে সীমানা ঘিরে ফেলা হল। কিন্তু কী জটিল কারণে, টোপনো অন্তত জানে না, কারখানার কাজই শুরু হয়নি। কবে হবে তার ঠিকঠিকানা নেই।

পুরনো জঙ্গল শেষ হয়ে গেছে, কারখানাও হল না, কাজেই ছ'মাস ধরে কামাইও বন্ধ টোপনোদের। ঘরে তার বাপ মা জরু ভাই এবং দুই ছেলেমেয়ে। কামাই করতে না পারলে এতগুলো পেট চলে কী করে? তারা জমিমালিকদের কাছে বার বার গেছে, আর্জি জানিয়েছে, তার হাতে পায়ে ধরে রোজগারের ব্যবস্থা করে দিতে বলেছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অগত্যা কিছুদিন নানারকম উঞ্ছবৃত্তি করে চলেছে। তারপর সপ্তাখানেক হল বাপ ভাই আর সে কাজ এবং পয়সার ধান্ধায় তিন দিকে বেরিয়ে পড়েছে। ঘরে রয়েছে জরু মা আর ছোটো ছেলেমেয়ে দু'টো।

সাত দিন ধরে টোপনো ঘুরছে। সামান্য দু-চার টাকার কাজ যে সে পাচ্ছে না তা নয় কিন্তু নিজের পেটের দানা জোটাতেই তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বেশ কিছু পয়সা হাতে না এলে সে ঘরে ফেরে কী করে?

নাটোয়ার আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। বিষণ্ণ হেসে সে বলে, 'তোমার আর আমাদের হাল একই ভেইয়া—'

বুঝতে না পেরে টোপনো জিজ্ঞেস করে, 'মতলব?'

নিজেদের ঘুরে বেড়াবার উদ্দেশ্যটা জানিয়ে দেয় নাটোয়ার।

টোপনো একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করে, 'সচ!'

নাটোয়ার বলে, 'আরে ভেইয়া, তোমাকে ঝুট বলে আমাদের ফায়দাটা কী?'

'আচ্ছাই হুয়া।' টোপনো বলতে থাকে, 'এখন থেকে একসাথ কোসিস করা যাবে।'

অসুস্থ বীমারী ফকিরাকে তাদের গাঁওয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিতে হয়েছে। তার জায়গায় নতুন এক সহযোদ্ধাকে পেয়ে যায় নাটোয়ারেরা।

কতক্ষণ চারটে মানুষ পাশাপাশি ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটেছিল, তাদের খেয়াল নেই। সূর্য এর মধ্যে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। কিছুক্ষণ বাদেই দুপুর হয়ে যাবে।

হঠাৎ দূর থেকে বিলাইতি বাজনার সেই চেনা সুরটা ভেসে আসতে থাকে, 'বোল রাধা বোল, সঙ্গম হোগা কি নেহী—'

সুরটা শুনেই নাটোয়ার বুঝতে পারে ভেঙে তারা যেখানে এসে পড়েছে সেখান থেকে পাকা সড়ক খুব বেশি দূরে নয়। ভারতমাতা রথ-এর শেষ গন্তব্য যেখানেই হোক, হাইওয়ে দিয়ে সেটাকে যেতেই হবে। আর ফসলের খেত বা পড়তি জমি পেরিয়ে নাটোয়াররা যেদিক দিয়েই যাক না, হাইওয়েটাকে কোনোভাবেই এড়ানো যাবে না। সড়কটা তাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে। এঁকে বেঁকে, ঘুরে ঘুরে মাঠ শহর এবং টিলার ওপর দিয়ে প্রায় পাশাপাশিই চলেছে।

ভারতমাতা রথ-এর সামনে ব্যান্ডপার্টিওলারা ফিল্মি গানের সুর বাজিয়ে যাওয়ায় বোঝা যায়, তারা হাইওয়ে থেকে কোথায়, কত দূরে রয়েছে।

নাটোয়ার চট করে ভেবে নেয়, বারদিয়ার করাতকলে গিয়ে কাজ জোগাড় করে মজুরি পেতে পেতে সন্ধে হয়ে যাবে। এমনও হতে পারে, কাজ হয়ত জুটলই না, কিংবা দু-একদিন অপেক্ষা করতে হল। রথবালাদের যখন হাতের কাছে পাওয়াই যাচ্ছে, দুপুরের খাওয়াটা বরং ওদের ওপর দিয়েই সেরে নেওয়া যাক। করাতকলে কাজ করে কখন পয়সা হাতে আসবে সেই অনিশ্চয়তার ওপর ভরসা করে থাকাটা নেহাতই বোকামি।

নাটোয়ার তার পরিকল্পনার কথা সঙ্গীদের জানিয়ে দেয়। সবারই এতে ষোল আনা সায় রয়েছে। আপাতত এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর হয় না। দুপুরের খাওয়া চুকিয়ে নিঃশব্দে ভরপেটে বারদিয়ায় যাওয়া যাবে।

খানিকটা এগুতেই হাইওয়েতে ভারতমাতা রথ-এর লম্বা মিছিল চোখে পড়ে।

নাটোয়ার সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলে, 'হোঁশিয়ার, কেউ জুলুসের সামনের দিকে যাবি না, পেছনে ভিড়ের ভেতর ঢুকে পড়বি।'

একটু অবাক হয়ে টোপনো জিজ্ঞেস করে, 'কেন?'

দু'দিন ধরে কীভাবে ভারতমাতা রথবালাদের, বিশেষ করে দুমরলালের সঙ্গে তারা লুকোচুরি খেলছে সেটা জানিয়ে দিয়ে নাটোয়ার বলে, 'দুমরলালজির নজরের বাইরে যত থাকা যায়, আমাদের পক্ষে ততই ভালো। সমঝা?'

টোপনো বেশ চালাক চতুর লোক। বলে, 'অব্ সমঝ গিয়া।'

ভারতমাতা রথ কাছাকাছি এসে গেলে নাটোয়াররা চুপিসারেপেছন দিক দিয়ে মিছিলের ভেতর ঢুকে যায়। আগে থেকে যারা রথ-এর সঙ্গে হেঁটে আসছিল তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে

পারা যায়, সামনে যে গঞ্জটা পড়বে তার নাম ছত্তরপুর। তারানাথজি সেখানে আধারশিলা বসাবেন। দুপুরের ভোজনটা ছত্তরপুরেই করানো হবে।

আধারশিলা বসানো বা শিলান্যাসের ব্যাপারে আদৌ মাথাব্যথা নেই নাটোয়ারের। দুপুরের খাবারটা তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর। মাত্র একটা মাইল হাঁটা এমন কিছু ব্যাপারই নয়। বলা যায়, একরকম বিনা পরিশ্রমেই বঢ়িয়া ভোজন জুটে যাবে।

এর আগে আধশরশিলা বসানোর উদ্দেশ্যে নানা জায়গায় ভারতমাতা রথ থামানো হলে যা যা ঘটছে, ছত্তরপুরেও হুবহু তা-ই ঘটে। সেই ফুল মালা শাঁখ ইত্যাদি নিয়ে কাতারে কাতারে মানুষের দাঁড়িয়ে থাকা, মহাদেওজির লম্বা বক্তৃতা, দুমরলালের স্লোগান—আনুষ্ঠানিক কোনো ব্যাপারেই বিন্দুমাত্র খুঁত থাকে না।

এখানেও বড় এবং ছোটো দু'টো প্যাণ্ডেল রয়েছে। ছোটো প্যাণ্ডেলটার নিচে যথারীতি মহা সমারোহে আধারশিলা বসিয়ে ফেলেন তারানাথ মিশ্র। এই ভিত্তি প্রস্তরটা স্থাপন করা হল একটি দুগ্ধ প্রকল্পের জন্য। এ অঞ্চলের মানুষ, বিশেষ করে শিশুরা যাতে খাঁটি উৎকৃষ্ট দুধ খেতে পারে সে জন্য ডেয়ারি করা হবে। অবশ্যই সে কারণে এ অঞ্চলের মানুষজনকে বিপুল ভোটে তারানাথজিকে জিতিয়ে লোকসভায় পাঠাতে হবে। নইলে আধারশিলা বসানোই সার।

শিলান্যাস অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হওয়ার পর বড় প্যাণ্ডেলে জুলুসের লোকজনকে খেতে বসিয়ে দেওয়া হয়।

নাটোযারেরর মনে আছে, প্রথম দিন খাওয়ার বেশ কষ্টই হয়েছিল। হাজার কাকুতি মিনতি করেও হারামাজাদা দুমরলালটার কাছ থেকে জুতোর চামড়ার মতো চারখানার বেশি চাপাটি আদায় করা যায়নি। কিন্তু তারপর থেকে স্বয়ং তারানাথজি 'ভোজন'-এর তদারকি করছেন। ফলে দুমরলালদের হাতও খুলে গেছে। শুখা চাপাটির জায়গায় এখন গরম ঘিউ-চাপাটি, দু-তিন রকমের তরকারি, আমের আচার, বুন্দিয়া, কলাকন্দ ইত্যাদি অজস্র পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে।

আজও দেখা গেল তারানাথ মিশ্র তিন পত্রকারকে সঙ্গে করে জনগণের 'ভোজন' দেখতে বেরিয়েছেন। ওঁরা রয়েছে প্যাণ্ডেলের এক মাথায়, আরেক মাথায় লাইন দিয়ে বসে আছে নাটোয়াররা। তাদের সামনে শালপাতার বড় বড় থালা। খাবার দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। তবে নাটোয়াররা এখনও পায়নি।

নাটোয়াররা যে লাইনে বসেছে তার সামনে দিয়ে আগে আগে আসছে দুমরলাল। তার পেছন পেছন বিশাল বিশাল বেতের চাঙারিতে চাপাটি ভাজি ইত্যাদি বোঝাই করে দুই হট্টাকট্টা চেহারায় পহেলবান। চাঙারি থেকে সুখাদ্যগুলি তুলে তুলে জনতার পাতে দিচ্ছে দুমরলাল। একসময় সে নাটোয়ারদের কাছে চলে আসে। চাপাটি দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। ভুরু কুঁচকে নাটোয়ারকে লক্ষ করতে করতে বলে, 'কা রে শালে, সুবে থেকে তোকে দেখিনি। কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছিলি? তোদের না হোঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম, জুলুসে পুরা না হাঁটলে 'ভোজন' বন্ধ—'

সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে প্রায় দমবন্ধ গলায় নাটোয়ার বলে, 'জুলুসে আমরা পুরা হেঁটেছি দুমরলালজি। পিছন দিকে ছিলাম বলে দেখতে পাননি।'

এবার একটু খটকা লাগে দুমরলালের। তার মনে হয়, দেহাতিটা হয়তো ঠিকই বলেছে। নিজের প্রতাপের ওপর অখণ্ড বিশ্বাস লোকটার। তার ধারণা, এই সব গেঁয়ো লোকেদের তার সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যে বলার সাহস নেই। আসলে বত্রিশ ঘাটের জল-খাওয়া চতুর নাটোয়ারকে তো সে চেনে না। কাঁচুমাচু মুখে সে নয়কে ছয়, দিনকে রাত করে দিতে পারে। তবু বাজিয়ে নেওয়ার জন্য নাটোয়ারের চোখে চোখ রেখে সে বলে, 'সচ্ বলছিস?'

'জরুর সচ্ দুমরলালজি। রামজি কিষুণজিকা কসম।'

'ঠিক হ্যায়।'

পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে দুমরলাল নাটোয়ার এবং তার দুই সঙ্গীর থালার প্রচুর চাপাটি ভাজি টাজি দিয়ে এগিয়ে যায়।

একটা বড় ধরনের ফাঁড়া কেটে যাওয়ায় বেশ আরাম বোধ করে নাটোয়ার। মুখ নামিয়ে মনে মনে হাসতে হাসতে সে খেতে শুরু করে। ভূচ্চর দুমরলালটাকে সে এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচে দিতে পারে।

আগে আগে যা করেছিল, এখানেও তা-ই করে নাটোয়ার আর গোম্‌তী। রাত এবং কাল সকালের কথা মাথায় রেখে দু তিনবার চাপাটি টাপাটি চেয়ে নিয়ে অনেকটা করে থলেতে পুরে ফেলে।

টোপনো এবং লচ্ছু রথযাত্রার মিছিলে নতুন ঢুকেছে। তারা নাটোয়ারদের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যায়। নাটোয়ার নিচু গলায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তারাও কয়েক বার চাপাটি ভাজি চেয়ে নিয়ে বাড়তি খাবারটা সরিয়ে ফেলে। তাদের যা অনিশ্চিত অবস্থা তাতে ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করে রাখা ভালো।

একসময় ঘুরতে ঘুরতে তারানাথজিরা নাটোয়ারদের কাছে চলে আসেন। সবার খাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিতে থাকেন তিনি। ফাঁকে ফাঁকে পত্রকারদের সঙ্গে কথাও বলে যাচ্ছেন।

'আচ্ছা, আমাদের স্লোগানগুলো কীরকম মনে হচ্ছে আপনাদের?'

'খুব মামুলি। এমন স্লোগান বহুকাল ধরে চলে আসছে।'

'শুনেছি আজকাল শহরে নয়া তরীকার স্লোগান চালু হয়েছে। আপনারা কি এ ব্যাপারে কিছু জনেন?'

এক পত্রকার মুখ টিপে মিচকে হেসে বলে, 'জানি। এক উন্মীদবারের লোকেরা কী স্লোগান দেয় জানেন?'

'কী?' উৎসুক সুরে জিজ্ঞেস করেন তারানাথ।

পত্রকার জানায় সেই উন্মীদবারের নাম অবোধনাথ। ওঁর চুনাও কর্মীরা এভাবে স্লোগান দিয়ে থাকে, 'যিতনা রোজ চাঁদ সূরয রহেগা, উতনা দিন অবোধনাথ তেরা নাম রহেগা', 'অবোধনাথকে ভোট দেনেসে ক্যা হোগা? দেশ বচেগা, গরিবি হটেগা,' ইত্যাদি।

শুনতে শুনতে মুখচোখ চকচক করতে থাকে তারানাথের। তিনি বলেন, 'এরকম জোবালো স্লোগান আমার দরকার। দয়া করে যদি লিখে দেন বড় ভালো হয়—'

পত্রকারটি বলে, 'আমি একজনেব ঠিকানা দিয়ে দেবো। লোকটা কবিতা লেখে আর চুনাও-এর সময় উন্মীদবারদের নয়া নয়া স্লোগান বানিয়ে সাপ্লাই দেয়। আমি যে স্লোগানগুলো বললাম, পিছলে চুনাওতে এসব ইস্তেমাল হয়ে গেছে। আপনি পাটনায় লোক পাঠিয়ে ওই কবিতা লিখনেবালার কাছ থেকে তাজা চমকদার স্লোগান লিখিয়ে আনুন। তবে—'

'তবে কী?'

'কীম্মৎ একটু বেশি পড়বে।'

'দামের জন্যে চিন্তা করবেন না। রথযাত্রা শেষ হলেই আমি পাটনায় লোক পাঠিয়ে দেবো। আজই ঠিকানাটা লিখে দেবেন।'

'ঠিক হ্যায়—'

কথা বলতে বলতে তারানাথরা দূরে চলে যান।

পনেরো

নাটোয়ারদের খাওয়া শেষ হ'তে হ'তে বেলা হেলে যায়। তারপর আর এক মুহূর্তও বসে না তারা। যাদের নিয়ে সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনা সেই দুমরলালকে ধারেকাছে দেখা যাচ্ছে না। এধার ওধার তাকিয়ে নাটোয়াররা চুপচাপ প্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়ে পড়ে।

কাছাকাছি বিরাট বিরাট চেহারার ক'টা পিপর গাছ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। নাটোয়ারেরা চট করে প্রথমে গাছগুলোর আড়ালে চলে যায়। সেখান থেকে বুঝতে চেষ্টা করে, কেউ তাদের লক্ষ করছে কিনা। কিন্তু না, জুলুসের লোকজনেরা গলা পর্যন্ত বোঝাই করে এখন টান টান শুয়ে পড়েছে, তাদের নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। দুমরলাল পত্রকার বা রথযাত্রার অন্য উদ্যোক্তাদেরও দেখা যাচ্ছে না। খুব সম্ভব খাটাখাটনির পর খেয়েদেয়ে তারা ছোটো প্যাণ্ডেলটায় গিয়ে এখন জিরোচ্ছে।

একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে নাটোয়ারেরা সোজা হাইওয়েতে গিয়ে ওঠে। বড় সড়ক পেরিয়ে ওধারের মাঠে নেমে তাদের বরাবর পশ্চিম দিকে হাঁটতে হবে। নাটোয়ারের ধারণা, সন্ধের আগে আগেই তারা বারদিয়া পৌঁছুতে পারবে। দু'বেলার মতো খাবার তাদের সঙ্গে রয়েছে। আজ কাজের ব্যবস্থা যদি না-ও হয়, কাল দুপুর পর্যন্ত তারা চালিয়ে নিতে পারবে। আর শোওয়ার জায়গা? অত বড় বারদিয়া গঞ্জে কোথাও না কোথাও রাতটা নিশ্চয়ই কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

মাঠে নেমে খানিকটা যেতে না যেতেই ফের আকাশের চেহারা পালটে যেতে থাকে। সকাল থেকে আজ ছিল চমৎকার ঝলমলে রোদ। কিন্তু কখন যে আকাশের কোণায় কোণায় ফের মেঘ জমতে শুরু করেছিল আগে কেউ লক্ষ করেনি।

এখনও যথেষ্ট বেলা রয়েছে। কিন্তু মেঘে রোদ অনেকটা ঢাকা পড়ে যাওয়ায় ঘন হয়ে ছায়া নামছে চরাচরের ওপর।

চলতে চলতে চোখের ওপর হাতের আড়াল দিয়ে একবার ওপরে তাকায় নাটোয়ার। চিন্তিতভাবে বলে, 'শালের আশমান বড়িয়া খেল্ দেখাচ্ছে তো।'

টোপনো বলে, 'হাঁ। মনে হচ্ছে কালকের মতো আজও বারিষ নেমে যাবে।'

'জোরসে পা চালাও—'

মাইল দেড়েক হাঁটার পর সমতল মাঠের সীমানায় উঁচুনিচু কিছু টিলার সামনে এসে পড়ে নাটোয়াররা। দূরে দিগন্তের গা ঘেঁষে আবার সেই পাহাড়ের রেঞ্জটা দেখা যাচ্ছে।

টোপনো যা আন্দাজ করেছিল সেটাই ঘটে যায়। এর মধ্যে আকাশের ছন্নছাড়া মেঘগুলো জমাট বেঁধে সূর্যটাকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলেছে। হাওয়ার জোর হঠাৎ ভীষণ বেড়ে যায় এবং ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করে।

নাটোয়ার এধারে ওধারে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে বলে, 'নজদিগ কোনো গাঁও টাও দেখছি না, হাটিয়া কি বাজার ভি নেহী। কোথায় যে মাথা গুঁজব! দৌড়ো—দৌড়ো—'

ছুটতে ছুটতে একটা বড় টিলার ঢাল বেয়ে ওরা যখন নিচে নামছে সেই সময় বহু মানুষের ভয়ার্ত চিৎকার কানে ভেসে আসে। এবার ডান দিকে, দূরে, একটা গাঁ দেখা যাচ্ছে। নাটোয়ারদের চোখে পড়ে বহু মানুষ সেখানে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি করছে।

নামতে নামতে থমকে দাঁড়িয়ে যায় নাটোয়ার। তার দেখাদেখি বাকি তিনজনও। নাটোয়ার বলে, 'কা হুয়া? লোকগুলো অত চেঁচাচ্ছে কেন?'

টোপনো বলে, 'কৌন জানে।'

'জরুর কিছু ঝামেলা হয়েছে। চল তো, দেখা যাক।'

গোমতী চিন্তিতভাবে বলে, 'কী দরকার পরের ঝঞ্ঝাটে মাথা ঢুকিয়ে? আমাদের নিজেদেরই ঝামেলার শেষ নেই।'

নাটোয়ার বোঝায়, তেমন গোলমাল দেখলে কোনোভাবেই তারা নিজেদের জড়াবে না। আসলে বৃষ্টির ব্যাপারটা তাদের সবার মাথায় রাখা দরকার। ওখানে যখন একটা গাঁ দেখা যাচ্ছে, মাথা গোঁজার আশ্রয় নিশ্চয়ই মিলবে। নইলে এই খোলা আকাশের নিচে বেঘোরে ভেজা ছাড়া উপায় নেই।

ঠিকই বলেছে নাটোয়ার। বৃষ্টিটা তেড়েফুঁড়ে নামার উপক্রম না করলে ওই গাঁ'টাকে এড়িয়ে গেলেও চলত কিন্তু এখন আর উপায় নেই।

টোপানো বলে, 'চল তা হলে—'

ওরা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে সেই লোকগুলোর কাছে চলে আসে। ছেলেবুড়ো বাচ্চাকাচ্চা পুরুষ মেয়েমানুষ মিলিয়ে বিশাল জনতা কপাল চাপড়ে, সমানে সমস্বরে চিৎকার করছে, 'হো রামজি, হো কিষুণজি—বচাও, বচাও হামনিলোগনকো—' তাদের চোখেমুখে মারাত্মক ভয় এবং আতঙ্ক।

চারপাশে নোংরা বালিশ, চিটচিটে ময়লা কাঁথা, অজস্র বাসন কোসন, টিনের বাক্স, জামাকাপড়ের বোঁচকা, চাল-ডাল, গেঁহু, হাল-লাঙল ইত্যাদি ছত্রাকার পড়ে আছে। আর আছে বেশ কিছু ছাগল গরু এবং বয়েল গাড়ি। বোঝা যায়, কোনো কারণে লোকগুলো যে যেমন পেরেছে নিজেদের পার্থিব সব সম্পত্তি টেনে এনে এখানে ডাঁই করে রেখেছে।

সবচেয়ে বেশি করে কপাল আর বুক চাপড়াচ্ছিল একটা আধবয়সী লোক। দেহাতি হলেও তার চেহারা এবং পোশাক আশাক বুঝিয়ে দিচ্ছে সে বেশ পয়সাওয়ালা। লোকটা একটানা চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'যে গাঁও বাঁচাতে পারবে তাকে শ'ও দো'শ পাঁচ শ, হাজার—যেত্তে রুপাইয়া চাইবে—দেবো। কোসিস করো তোমরা, কোসিস করো। হো গণাইয়া, হো মাখ্খন, হো ধারোয়া, তোমরা দাঁড়িয়ে থেকো না।'

এমন এক আবহওয়ার মধ্যে কেউ এসে পড়লে তার প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। উৎকণ্ঠিত নাটোয়ার জনতার উদ্দেশে বলে, 'কা হুয়া ভেইয়া?' কী হয়েছে তোমাদের?'

কেউ নাটোয়ারের কথার উত্তর দেয় না, এমনকি তার দিকে ফিরেও তাকায় না। বার কয়েক একই প্রশ্ন করার পর একটা রোগা চিমড়ে চেহারার লোক সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'ওই দেখ—'

আগে লক্ষ করেনি নাটোয়ার, এবার তার চোখে পড়ে অনেকটা দূরে, প্রায় এক শ' হাত উঁচুতে বিপুল এক জলাধার—খুব সম্ভব বিলই হবে। কম করে সিকি মাইল জায়গা জুড়ে সেটার বিস্তার।

নাটোয়াররা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে বিলটাকে বেড় দিয়ে পাথরের বাঁধ, সেটার উঁচু পার ডান পাশে ঘুরে উলটো দিকে চলে গেছে।

বিলের এ পাশটা দেখা গেলেও ও দিকটা চোখে পড়ে না। তবে সে ধার থেকে জনতার চিৎকার ছাপিয়ে তোড়ে জল পড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। এই আওয়াজটা অনেকক্ষণ ধরেই তাদের কানে আসছিল, তবে এখানকার মানুষজনের হাল এবং চারপাশের লণ্ডভণ্ড অবস্থা দেখে সেভাবে খেয়াল করেনি। এবার কান খাড়া করে বেশ খানিকক্ষণ শব্দটা শোনে নাটোয়ার, তারপর চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করে, 'কা ভেইয়া, ওধারের বাঁধ কি ভেঙে পড়েছে?'

রোগা লোকটা মাথা নেড়ে সন্ত্রস্ত সুরে বলে, 'হাঁ।' সে আরও জানায়, দূরে যে পাহাড়টা রয়েছে সেখান থেকে একটা ছোটো নদী এসে বিলে মিশেছে। সারা বছর নদীটা নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে। তবে বর্ষায় তার চেহারা বিলকুল পালটে যায়। পাহাডের মাথা থেকে প্রবল জলস্রোত টেনে এনে নদীটা বিলে ঢল নামিয়ে দেয়। তবে কোনো বারই বাঁধ উপচে এক ফোঁটা জল নিচে পড়ে না। কিন্তু এ বছর নিতান্ত অসময়ে, মাত্র একদিনের বৃষ্টিতে নদী খেপে গিয়ে বিলে এত জল টেনে এনেছে যে ওধারের বাঁধের দেওয়াল তার ধাক্কা সামলাতে পারেনি, আজ ভোবে সেটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে।

আসল গাঁ'টা বিলের ওধারে। এ পাশেও সামান্য কিছু বাড়িঘর রয়েছে। বাঁধ ভাঙার পর প্রাণ বাঁচাতে গাঁওবালারা এদিকে ছুটে এসেছে। মালপত্র বিশেষ কিছুই আনা সম্ভব হয়নি। ঘরবাড়ি এবং সারা জীবনের সঞ্চয়ের প্রায় সমস্তটাই ফেলে আসতে হয়েছে।

সবাই হা-হুতাশ আর গোঙানির মতো আওয়াজ করে একটানা কাঁদছিল। তার মধ্যে সেই লোকটা সমানে উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে যাচ্ছে। 'যেত্তে রুপাইয়া লাগে আমি দেবো। গাঁও বচাও—'

নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'ওই আদমিটা কে? মনে হচ্ছে বহোত পাইসাবালা?'

রোগা লোকটা আস্তে মাথা নাড়ে। বলে, 'হাঁ।' বিশদভাবে জানিয়ে দেয় ওই পয়সাওলা লোকটি অর্থাৎ মহাবীরজি এ অঞ্চলের সব চেয়ে বড় ব্যবসাদার। চারপাশের গ্রামগুলোতে যত ধান গম ডাল সর্ষে ফলে তার বেশির ভাগটাই সস্তায় কিনে বড় বড় গুদামে বোঝাই করে রাখে। তারপর বেমরশুমে দাম চড়লে সে সব বেচে দেয়। মহীবীরজিব যে কত পয়সা সে নিজেও জানে না। পঞ্চাশটা বয়েল গাড়ি আছে তার, গরু মোষ বকরি মিলিয়ে শ'খানেক প্রাণীর সে মালিক। বাড়িও সাত আটটা। তা ছাড়া প্রচণ্ড ক্ষমতাবানও লোকটা, গ্রাম-পঞ্চায়েতের মাথা। পুলিশের দারোগা থেকে শুরু করে বড় বড় সরকারি 'অফসরে'রা তাকে যথেষ্ট খাতিরদারি করে থাকে। এই এলাকায় তাকে বাদ দিয়ে কিছু হওয়ার উপায় নেই। তার কথাই শেষ কথা।

মহাবীরজি যে অমন আকুলভাবে চিৎকার করে যাচ্ছে তার কারণ একটাই। বিলের ওধারে তার কুড়িটা গুদাম ধান চাল গেঁহু ইত্যাদিতে বোঝাই হয়ে আছে। অজস্র টাকা লগ্নি করে গেল বছর ফসলের মরশুমে ওগুলো কিনে রেখেছিল সে কিন্তু এবার খরায় চড়া দামে বেচার আগেই বাঁধ ভেঙে সর্বনাশ ঘটে গেল। জলে ডুবে গিয়ে তার সব মজুদ ফসল বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে এতবড় ক্ষতি হ'তে দেখলে লোক পাগলের মতো চিৎকার তো করবেই।

গোম্‌তীরা পাশে দাঁড়িয়ে দু'জনের কথা শুনছিল। টোপনো চাপা গলায় নাটোয়ারকে খানিক দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, 'ভেইয়া, পাইসা কামানোর একটা বড় মওকা এসে গেছে!' তার গলার স্বরে রীতিমতো উত্তেজনা ফুটে বেরোয়।

বেশ অবাক হয়েই নাটোয়ার জিজ্ঞেই করে, 'কীরকম?'

মহাবীরকে দেখিয়ে টোপনো বলে, 'ও আদমি গাঁও বাঁচাতে পারলে বহোত রুপাইয়া দিতে চাইছে। আমরা একবার কোসিস করে দেখি না।'

'ক্যায়সে?'

'বাঁধটা যেখানে ভেঙেছে সেই জায়গাটা মেরামত করতে পারলে গাঁও বাঁচানো যায়।'

'তোমার মাথা বিলকুল খারাপ হয়ে গেছে।'

'আরে ভেইয়া, আগে তো দেখি বাঁধ কোথায় কতটা ভেঙেছে। যদি বুঝি মেরামত করা যাবে না তখন না হয় আশা ছেড়ে দেবো।'

নাটোয়ারের এবার মনে হয়, গোড়াতেই হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। একবার চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কী? সে বলে, 'ঠিক হ্যায়।'

টোপনো বলে, 'তার আগে মহাবীরজির সঙ্গে বাত পাক্কা করে নেওয়া দরকার। কাজ হয়ে যাওয়ার পর যদি পাইসা দিতে না চায়—'

বোঝা যায়, টোপনো তাদের মতোই বারো ঘাটের জল-খাওয়া দূরদর্শী মানুষ। কাজ করার পর ঠকে যাওয়ার প্রচুর খারাপ অভিজ্ঞতা তার রয়েছে। এমন হুঁশিয়ার লোকের সঙ্গে কাজ করে আনন্দ আছে। নাটোয়ার বলে, 'ঠিক বাত। চল, কথা বলে নিই।'

মহাবীরের সঙ্গে মুখে মুখে তাদের একটা চুক্তি হয়ে যায়। গ্রামের তাবত মানুষ তার সাক্ষী থাকে। মহাবীর সবার সামনে জানিয়ে দেয়, ভাঙা বাঁধ জোড়া লাগিয়ে গাঁও এবং তার গুদামগুলি বাঁচাতে পারলে তৎক্ষণাৎ নগদ একটি হাজার টাকা নাটোয়ারদের দেবে। ভাগোয়ান রামজি এবং কিষুণজির কসম, তার কথার এতটুকু নড়চড় হবে না। তবে হাজার চেষ্টা করেও যদি জলের তোড় আটকাতে না পারে একটা পয়সাও পাবে না নাটোয়ারেরা।

মহাবীরের শর্তের সঙ্গে নাটোয়ার ভেবেচিন্তে আরেকটু জুড়ে দেয়। বাঁধ মেরামতির কাজে দরকার হলে গাঁওবালাদেরও হাত লাগাতে হবে।

জনতা জানিয়ে দেয়, নাটোয়াররা যা করতে বলবে তাতেই তারা রাজি। টোপনো নাটোয়ারকে বলে, 'চল ভেইয়া, আগে বাঁধটা ভালো করে দেখি।' গোম্‌তী আর লচ্ছু সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। নাটোয়াররা নেয় না। আপাতত তাদের এখানে অপেক্ষা করতে বলে দু'জনে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

ঝির ঝির করে জল ঝরেই যাচ্ছে। আকাশের ভাবগতিক দেখে এখন মনে হয়, জোরালো বৃষ্টি না-ও হ'তে পারে। কেননা যে মেঘেরা জমাট বেঁধে ছিল, প্রবল হাওয়ায় আস্তে আস্তে সেগুলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিল বা হ্রদ, যাই বলা যাক, সেখানে পৌঁছুতে হলে টিলা বেয়ে ওপরে উঠতে হবে। কালকের প্রচণ্ড বৃষ্টিতে টিলার গা ভিজে পিছল হয়ে আছে। সন্তর্পণে, নরম কাদায় পায়ের আঙুল গেঁথে গেঁথে টোপনো আর নাটোয়ার ওপরে পৌঁছে যায়।

বিলটা কানায় কানায় না হলেও বারো আনার মতো ভর্তি। তার ওপর দূরের পাহাড়ী নদীটা বিপুল শক্তিতে জল টেনে এনে সেখানে অনবরত ঢেলে যাচ্ছে।

বিল ঘিরে যে পাথুরে বাঁধটা রয়েছে সেটা কতকাল আগের তৈরি কে জানে। খুব সম্ভব ওটার বয়স পঞ্চাশ ষাট বা তারও বেশি। জলের ধাক্কায় ডান পাশে, সেটা ভেঙে দুশ' হাতের মতো একটা ফোকর সৃষ্টি হয়ে গেছে। প্রচণ্ড গর্জনে সেখান দিয়ে ঢল নেমে নিচের গ্রামটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

গ্রামটা এখন প্রায় এক মানুষ অর্থাৎ সাড়ে তিন হাত জলের তলায়। নিচু ঘরগুলো আধাআধি ডুবে গেছে, নইলে ধসে পড়েছে। উঁচু বাড়িগুলোতেও প্রচুর জল ঢুকে গেছে।

পলকহীন তাকিয়ে তাকিয়ে কিছুক্ষণ নিচের দিকে নেমে-যাওয়া জলস্রোত লক্ষ করে নাটোয়ার, তার একটানা গজরানি শুনতে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বলে, 'নেহী সাকেগা ভেইয়া—'

টোপনো তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী পারবে না?'

বাঁধের ফোকরটা দেখিয়ে নাটোয়ার বলে, 'কতটা জায়গা ভেঙেছে, দেখেছ?'

'হাঁ, দেখেছি তো।'

'কত জোরে জল পড়ছে ভাবতে পার?'

'হাঁ, বহোত জোরে।'

'এই বাঁধ আমরা মেরামত করতে পারব?'

নাটোয়ার কোনো ব্যাপারেই হতাশ হয় না। তার যা জীবন তাতে এত বছর টিকে থাকাটাই একটা আশ্চর্য ঘটনা। অনন্ত আশা এবং অদম্য সাহস তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে টোপনো তার চেয়েও অনেক বেশি সাহসী আর আশাবাদী। সে বলে, 'তোমাকে তো আগেই বলেছি, কোসিস করতে হবে।'

বিমূঢ়ের মতো নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'কীভাবে?'

টোপনো যা উত্তর দেয় তাতে বোঝা যায়, বাঁধ মেরামতের পদ্ধতি সে জানে। বস্তায় করে প্রচুর বালি এবং পাথরের চাংড়া বাঁধের ভাঙা জায়গায় ফেলে ফেলে ওদিকটা বন্ধ করে দিতে হবে। ফোকর বুজিয়ে দিতে পারলে পুরোপুরি তলিয়ে যাবার হাত থেকে গাঁ'টাকে রক্ষা করা যাবে। এভাবে নাকি আগেও সে অনেক ভাঙা বাঁধ মেরামত করেছে।

টোপনো বলে, 'চল, গাঁওবালাদের বলি বস্তা বোঝাই করে করে বালি আর পাথর তুলে দিক।'

কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা নিজেদের মালপত্র যেটুকু বাঁচিয়ে এধারে আনতে পেরেছে তার মধ্যে দু-চারটের বেশি বস্তা পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এ অঞ্চলে বালিও নেই। তবে চারিদিকে নানা মাপের অজস্র পাথরের চাঁই ছড়িয়ে আছে।

এতক্ষণ অসহায় জনতা শুধুই হা-হুতাশ করছিল, নিরুপায় হয়েই তারা চরম সর্বনাশ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু গাঁ বাঁচানোর একটা পথ পেয়ে সবাই বিপুল উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাতে হাতে তারা পাথর ওপরে তুলে দিতে থাকে। তাদের সঙ্গে গোমতী আর লচ্ছুও হাত মেলায়।

বাঁধটা যেখানে ভেঙেছে তার কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে দুঃসাহসী টোপনো, তার ঠিক পেছনে নাটোয়ার। গাঁওবালারা টিলার নিচে থেকে ওপর পর্যন্ত পর পর দাঁড়িয়ে গেছে। পাথরের চাঁই একজনের হাত থেকে আরেক জনের হাত ঘুরে টোপনোর কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। সে সেগুলো বাঁধের ভাঙা জায়গায় ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে থাকে। কিন্তু জলের যা তোড় তাতে কত পাথর ফেলতে হবে, কে জানে।

গাঁয়ের লোকেরা অনবরত পাথরের চাঁই বয়ে আনছে আর সমানে বলে যাচ্ছে, 'হো রমাজি, হো কিষুণজি, তেরে কিরপা—'

ঘণ্টাখানেক পাথর ফেলার পরও বাঁধের ফোকর বোজার লক্ষণ নেই। এক শ' হাত নিচের গ্রামে সমানে জলস্রোত প্রবল গর্জনে পড়ে যাচ্ছে।

পেছন থেকে নাটোয়ার ক্লান্ত স্বরে অনিশ্চিতভাবে বলে 'ভেইয়া, যতই পাথর ঢালো কিছুই হবে না। পানির কী তাকত দেখেছ?'

আত্মবিশ্বাসে খানিকটা বোধ হয় চিড় ধরে গিয়েছিল টোপনোর। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সে বলে, 'হাঁ, বহোত তাকত। আরও কিছুক্ষণ পাথর ফেলে দেখি।'

কিন্তু আরও দশ বারোটা পাথরের চাঁই ফেলার পর মারাত্মক ব্যাপারটা ঘটে যায়। টোপনো যেখানে দাঁড়িয়ে আছে বাঁধের সেই অংশটার তলায় জল ঢুকে ঢুকে আগেই গাঁথনি আলগা হয়ে গিয়েছিল। আচমকা অনেকটা জায়গা ধসে যায় এবং প্রবল জলস্রোতে একশ' হাত নিচে ছিটকে পড়ে টোপনো। একবারই তার বুক-ফাটানো চিৎকার ভেসে আসে, 'বচাও, বচাও—' তারপর আর তাকে দেখা যায় না, ওপর থেকে ঢল তোড়ে নেমে যাচ্ছিল, তার ভেতর সে পলকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

চোখের সামনে এমন একটা ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে দেখতে সবার শ্বাস আটকে গিয়েছিল। গোটা এলাকা জুড়ে কিছুক্ষণের জন্য আলৌকিক স্তব্ধতা নেমে আসে। বাঁধভাঙা ঢলের হিংস্র গজরানিও যেন কেউ শুনতে পাচ্ছিল না।

তারপর একসময় হুলস্থূল শুরু হয়ে যায়। বিহ্বল ভয়ার্ত জনতা চিৎকার করতে থাকে।

'গির গিয়া রে, গির গয়া—'

'মর গিয়া, জরুর মর গিয়া—'

নাটোয়ার নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। আতঙ্কগ্রস্তের মতো সে দাঁড়িয়ে ছিল। গাঁওবালাদের চেঁচামেচিতে তার সারা শরীরে যেন তীব্র ঝাঁকুনি লাগে। বাঁধ থেকে নেমে টিলার ঢাল বেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে ডুবন্ত গ্রামের দিকে নেমে যায়। তার উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার, জল থেকে টোপনোকে উদ্ধার করে আনা।

গোম্‌তী ভীত সুরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মাত্‌ যাও, মাত্‌ যাও—'

একজন তো ভেসে গেছেই। আরেকজন যেভাবে সেখানে নেমে যাচ্ছে সেটাকে গ্রামের লোকজনের কাছে ভয়ঙ্কর হঠকারিতা বলে মনে হয়। গোম্‌তীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে তারাও নাটোয়ারকে এ ঝুঁকির ব্যাপারে বার বার হুঁশিয়ার দিতে থাকে।

কিন্তু নাটোয়ার ফিরেও তাকায় না। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে সে নেমেই যায়। অগত্যা লচ্ছুকে টিলার মাথায় দাঁড় করিয়ে রেখে গোম্‌তী নাটোয়ারের পেছন পেছন উতরাই বেয়ে নামতে থাকে। নাটোয়ারকে একা সে যেতে দিতে পারে না।

নিচে ডুবে-যাওয়া গ্রামে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। একসময় দেখা যায়, একটি পুরুষ আর একটি মেয়েমানুষ সেই স্রোতের ভেতর ডুব দিয়ে আতিপাঁতি করে টোপনোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোথাও নেই টোপনো। জলের টানে তার শরীর কোথায় কতদূরে ভেসে গেছে, কে জানে।

কিন্তু নাটোয়াররা যেন জেদই ধরেছে, যেভাবে, যেখান থেকে হোক, টোপনোকে খুঁজে বার করবেই। অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে একবার তারা স্রোতের ওপর ভেসে উঠেছে, পরক্ষণে তলিয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ দু'জনে দূরে, আরও দূরে চলে যেতে থাকে। এর মধ্যে নাটোয়ার এক আধবার গোম্‌তীকে ফিরে যেতে বলেছিল কিন্তু নাটোয়াকে ছেড়ে সে কিছুতেই যাবে না।

গাঁয়ের সমস্ত লোক বাঁধের পাশের উঁচু জায়গায় উঠে এসেছে। দুর্বোধ্য গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তারা সমানে কী বলে যাচ্ছে, দূর থেকে তা আদৌ বুঝতে পারে না নাটোয়াররা।

প্রায় ঘন্টা দুয়েক জল তোলপাড় করার পর 'রশি' খানেক দূরে টোপনোকে যখন পাওয়া যায়, সে আর বেঁচে নেই। ওপর থেকে খুব সম্ভব পাথরের ওপর ছিটকে পড়েছিল। তার ঘাড় একেবারেই ভেঙে গেছে, মাথা থেঁতলে ডান দিকটা চুরমার, ডান চোখটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

জলস্রোতের ভেতর দিয়ে কীভাবে যে টেনে টেনে নাটোয়ার আর গোম্‌তী টোপনোর মৃতদেহ টিলার ওপর নিয়ে আসে, তা শুধু তারাই জানে। বেহুঁশের মতো বেশ কিছুক্ষণ তারা টোপনোর কাছে পড়ে থাকে।

এদিকে জনতা নাটোয়ারদের কাছে দৌড়ে আসে। অচেনা ক'টি মানুষ আচমকা কোত্থেকে এসে প্রায় অযাচিতভাবেই তাদের গাঁ বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু ওদের একজন কী ভয়ঙ্করভাবেই না মারা গেল! টোপনোর শোচনীয় মৃত্যু গাঁওবালাদের অভিভূত করে ফেলে। সমস্ত এলাকাটা জুড়ে গভীর বিষাদ যেন অনড় হয়ে থাকে।

একসময় ধকল কিছুটা সামলে নিয়ে উঠে বসে গোম্‌তী আর নাটোয়ার। মাত্র একদিনের পরিচয় টোপনোর সঙ্গে। লোকটার মধ্যে এমন একটা আপন-করা ব্যাপার ছিল যাতে মনে হয়েছে সে তাদের বহুকালের চেনা। তা ছাড়া ঘরবাড়ি ছেড়ে একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ কাজের খোঁজে খাদ্যের খোঁজে তারা যে বেরিয়ে পড়েছিল সেই বিরামহীন অনন্তযাত্রায় টোপনো ছিল তাদের বিশ্বস্ত সঙ্গী। তার এমন শোকাবহ অভাবনীয় মৃত্যু গোম্‌তী এবং নাটোয়ারের বুকের ভেতরটা ভেঙেচুরে দুমড়ে মুচড়ে দিতে থাকে।

জনতার ভেতর থেকে সেই পয়সাওলা লোকটা অর্থাৎ মহাবীরজি ভারী গলায় নাটোয়ারকে জিজ্ঞেস করে, 'লোকটা যে এভাবে মারা যাবে, ভাবতে পারিনি। ও তোমাদের কেমন রিস্তেদার?'

নাটোয়ার আচ্ছন্নের মতো মাথা নাড়ে। বলে, 'কেউ না।'

'তা হলে?' একটু অবাক হয়েই তাকায় মহাবীর।

টোপনোর সঙ্গে কোথায় কীভাবে তাদের আলাপ হয়েছিল, জানিয়ে দেয় নাটোয়ার।

একটু চুপ করে থাকে মহাবীর। তারপর চিন্তিতভাবে বলে, 'বহোত মুসিবত। ওদের ঘর কোথায়?'

'জানি না।'

'সে কী!'

'টোপনো বলেছিল অনেক দূরে পশ্চিম দিকে ওদের ঘর। গাঁওয়ের নাম, তালুক—এসব কিছুই জানায়নি। আমিও জানতে চাইনি। সোচা থা, কা জরুরত? দো-চার রোজ একসাথ আছি, তারপর যে যার ঘরে ফিরে যাব। আর হয়তো দেখাই হবে না। তবে—'

'কা?'

'ওর মা বাপ জরু আর দু'টো বাচ্চা আছে।'

'বহোত আপসোসকা বাত। লেকেন ওদের কাছে মৌতের খবর কী করে দেওয়া যায়?'

ডাইনে-বাঁয়ে ধীরে ধীরে মাথা হেলিয়ে নাটোয়ার বলে, 'কোনো উপায় নেই মহাবীরজি।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

এবার মহাবীর যা বলে তা এই রকম। মড়া তো এভাবে ফেলে রাখা যায় না। টোপনোর অন্তিম সংস্কার অর্থাৎ শেষ কৃত্য করা দরকার। সে আরও যা বলে সেটা রীতিমত অস্বস্তিকর। এরকম দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর পুলিশকে জানানো উচিত। যদিও থানার লোকেরা তাকে খাতির করে কিন্তু মৌত বলে কথা! পুলিশকে সব সময় বিশ্বাস করা কাজের কথা নয়। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। জবাবদিহি করতে করতে জিভ বেরিয়ে যাবে। কে জানে, এই কারণে গাঁ-কে গাঁ ওরা ফাঁসিয়ে দেবে কিনা।

চট করে লচ্ছুর বাপের কথা মনে পড়ে যায় নাটোয়ারের। তার বিশ্বাস, পুলিশের এক শ' মাইলের ভেতর ঘেঁষাটা এমনিতেই বাঞ্ছনীয় নয়। তার ওপর অপঘাত বা দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। লচ্ছুর বাপের মতোই পুলিশের অগোচরে টোপনোর শেষ কাজটি চুকিয়ে ফেলা প্রয়োজন। নাটোয়ার সেই কথাটাই মহাবীরকে জানিয়ে দেয়।

সকাল থেকে ঝির ঝির করে যে ঘ্যানঘেনে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল সেটা থেমে গেছে। মহাবীর বলে, 'তা হলে চিতার ব্যবস্থা করে ফেলতে বলি।'

নাটোয়ার চমকে উঠে জানায়, টোপনো খ্রিস্টান। তার গলার ক্রসটা তার চোখে পড়েছে আগেই। টোপনোর অন্তিম সংস্কার করতে হবে ওর ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী।

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, গাঁয়ের লোকেরা ধরাধরি করে টোপনোর দেহ বাঁধের ওধারে নামিয়ে নিয়ে এসেছে।

মহাদেও-এর নির্দেশ অনুযায়ী কয়েকজন একটা কবর খুঁড়ে ফেলে। তারপর টোপনোকে তার ভেতর শুইয়ে মাটি চাপা দেওয়া হয়। সমস্ত গাঁয়ের লোক কবরের চারপাশে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে সসম্মানে এই পৃথিবী থেকে তাকে চিরকালের মতো বিদায় জানায়।

একধারে চুপচাপ হাঁটুতে থুতনি রেখে বসে ছিল গোমতী নাটোয়ার এবং লচ্ছু। গোমতী আর লচ্ছু সমানে কেঁদে যাচ্ছে। এমন যে নাটোয়ার—গোঁয়ার, একগুঁয়ে, জেদী—বেঁচে থাকার জন্য যাকে সারা দুনিয়া তোলপাড় করে বেড়াতে হয়, জীবনের নানা অভিজ্ঞতা যার মনকে প্রায় নিস্পৃহ এবং কঠোর করে তুলেছে তার চোখও জলে ভরে যেতে থাকে।

ষোলো

ভাঙা বাঁধের এধারে যে সামান্য ক'টি ঘর অটুট রয়েছে তার একটাতে কোনোরকমে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়ে নাটোয়াররা। এখান থেকে তারা সোজা বারদিয়ায় যাবে।

বেঁচে থাকার লড়াইয়ে নাটোয়ারের বহুকালের সহযোদ্ধা ফকিরাকে আগেই ট্রাকে তুলে ফেরত পাঠিয়ে দিতে হয়েছে। মাত্র একদিনের পরিচিত দ্বিতীয় সহযোদ্ধা টোপনোকে এক অখ্যাত গ্রামে মাটির নিচে রেখে যেতে হয়। টোপনোর শোকের উচ্ছ্বাস ইত্যাদি নিয়ে বসে থাকলে তাদের চলে না। একটা রাতের মধ্যেই টোপনোর মৃত্যুজনিত বিহ্বলতা কাটিয়ে ফেলেছে তারা।

শর্ত অনুযায়ী একটি পয়সাও দেয়নি মহাবীর। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে নাটোয়াররা কাল গাঁ বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল। হট্টাকট্টা চেহারার জলজ্যান্ত দুঃসাহসী একটা মানুষকে প্রাণও দিতে হয়েছে এই কারণে কিন্তু আসল কাজটা শেষ পর্যন্ত করা যায়নি। গাঁ'টাকে রক্ষা করতে না পারলেও নাটোয়ারদের চেষ্টায় কোনো ফাঁক ছিল না। টোপনো নেই, তাদেরও তো কিছু দিতে পারত মহাবীর। কিন্তু লোকটার বাজে আবেগ নেই। মানুষের জীবনের চেয়ে তার কাছে তার গুদামের ধান-চাল-গমের বস্তাগুলো ঢের বেশি মূল্যবান। সেগুলোই যখন বরবাদ হয়ে গেছে, সেই বিপুল ক্ষতির পর করুণার বশে নাটোয়ারদের কিছু মজুরি ধরে দেওয়াটা নেহাতই অপব্যয়, এবং মূর্খামিও। অকারণে দান-খয়রাত করার মধ্যে মহানুভবতা থাকতে পারে কিন্তু সেটা প্রশ্রয় দেবার কথা ভাবতেই পারে না মহাবীর।

টাকাপয়সা না দিলেও মহাবীর নাটোয়ারদের ভরপেট খাওয়া এবং রাতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

দুপুরের অনেক আগেই বারদিয়ায় পৌঁছে যায় নাটোয়াররা। বিশাল গঞ্জটার একধারে লড্ডুপ্রসাদ লালের বড় মাপের করাতকল। সোজা সেখানে চলে আসে তারা।

টানা উঁচু অ্যাসবেস্টসের শেডের তলায় পা দিতেই বুকের ভেতরটা ছাঁত করে ওঠে নাটোয়ারের।

যখনই আগে সে এখানে এসেছে, জায়গাটা সারাক্ষণ গম গম করত। শেডের একদিকে টাল দিয়ে রাখা থাকত বিরাট বিরাট গাছের গুঁড়ি। পঁচিশ তিরিশটা লোক ভোর থেকে অনেকটা রাত পর্যন্ত লম্বা লম্বা করাত দিয়ে সেগুলো চেরাই করত। লড্ডুপ্রসাদজির করাতকল মানেই হইচই, মজুরদের ছোটাছুটি, প্রচণ্ড ব্যস্ততা এবং কাঠ চেরাই-এর একটানা কর্কশ আওয়াজ।

কিন্তু আজ চারিদিক সুনসান। কোথাও কোনো শব্দ নেই। একটা মজুর বা এক টুকরো কাঠ পর্যন্ত চোখে পড়ছে না।

খানিকক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নাটোয়ার। লড্ডুপ্রসাদজি করাতকল বন্ধ করে দিল কিনা কে জানে।

গোম্‌তী একসময় বলে ওঠে, 'কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

চিন্তাগ্রস্তের মতো মাথা নাড়ে নাটোয়ার। বলে, 'হাঁ।'

'কী হয়েছে বল তো?'

'কৌন জানে।'

'কী করবে এখন?'

নাটোয়ার উত্তর দেয় না। আসলে করাতকলে কাজ পাওয়ার ব্যাপারে সে ষোলোআনা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু এখানে এসে যা দেখছে তাতে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেছে।

গোম্‌তী বলে, 'বেফায়দা দাঁড়িয়ে থাকে আর কী হবে?'

'হাঁ। এখান থেকে—' কথাটা শেষ করতে পারে না নাটোয়ার, হঠাৎ শেডের আরেক মাথা থেকে দুব্‌লা, পাতলা একটা ছোকরা এগিয়ে এসে বলে, 'কাকে খুঁজছ?'

ছোকরাটা নাটোয়ারকে চিনতে না পারলেও সে কিন্তু তাকে চিনে ফেলেছে। ছোকরা লড্ডুপরসাদজির খাস নোকর, নাম—ভালোরাম।

নাটোয়ার বলে, 'আমরা লড্ডুপ্রসাদজির সাথ দেখা করতে এসেছি।' আসার উদ্দেশ্যটিও সে জানিয়ে দেয়।

ভালোরাম মানুষ খারাপ না। সে দূরে শেডের শেষ প্রান্তে একটা ছোট ঘর দেখিয়ে বলে, 'লড্ডুজি ওখানে আছেন। তোমরা গিয়ে দেখা কর।'

ওই ঘরটা লড্ডুপ্রসাদের গদি। সেখানে বসেই সে এত বড় করাতকল চালায়।

এই জনশূন্য নিঝুম কারখানায় লড্ডুপ্রসাদ যে রয়েছে, এই খবরটা নাটোয়ারকে হঠাৎ চাঙ্গা করে তোলে। কৃতজ্ঞ চোখে একবার ভালোরামের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমরা চলেই যাচ্ছিলাম, তোমার জন্যে লড্ডুজির দর্শনটা পাওয়া যাবে।' বলে আর দাঁড়ায় না, লম্বা লম্বা পা ফেলে গদি-ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। গোম্‌তীরা তার পেছন পেছন প্রায় দৌড়ুতে থাকে।

লড্ডুপ্রসাদ এখনও পুরোনো চাল বজায় রেখে চলেছে। করাতকলের অফিস ঘরটার আধাআধি জুড়ে উঁচু গদি। গদির সামনের দিকে খানকয়েক চেয়ার পাতা। কাজের জন্য যারা আসে, ইচ্ছা করলে তারা গদিতেও বসতে পারে, নইলে চেয়ারে। ঘরটার একধারে তিন চারটে লোহার সিন্দুক এবং একটা ঢাউস কাঠের আলমারি। আলমারিটির কাচের পাল্লা দিয়ে দেখা যায়, প্রচুর হিসেবের খাতা ভেতরের তাকগুলোতে ডাঁই করে রাখা হয়েছে।

ডান দিকের দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে পেতলের তৈরি সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তি ফুল দিয়ে সাজানো। কুলুঙ্গিটার তলায় গোলা মেটে সিঁদুর দিয়ে ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া হরফে পাঁচ বার লেখা আছে 'শ্রী শ্রী গণেশায় নমঃ।' তার নিচে 'শুভ লাভ।'

লড্ডুপ্রসাদের বয়স চৌষট্টি পঁয়ষট্টি। নিরেট পেটানো চেহারা। লম্বাটে মুখ, গোল চোখে সতর্ক চাউনি। মাথায় কদম ছাঁট চুল, পেছন দিকে একগোছা টিকি। পরনে ধুতি আর হাফ-হাতা পাঞ্জাবি।

গদিতে বসে অলস ভঙ্গিতে হাতের তেলোয় খৈনি ডলতে ডলতে দু'টো লোকের সঙ্গে কথা বলছিল লড্ডুপ্রসাদ। নাটোয়ার দরজার সামনে এসে কোমর থেকে শরীরের ওপর দিকটা অনেকখানি ঝুঁকিয়ে হাতজোড় করে সসম্ভ্রমে বলে, 'নমস্তে সরকার—'

প্রচণ্ড স্মৃতিশক্তি লড্ডুপ্রসাদের। খৈনি ডলা এক মূহূর্তের জন্য স্থগিত রেখে সে চোখ কুঁচকে নাটোয়ারকে লক্ষ করে। তারপর বলে, 'আরে কৌন—নাটুয়া না?'

'হাঁ হুজৌর।'

'কামকাজের ধান্দায় নাকি?'

'হাঁ সরকার।'

'মিলবে।'

'লেকেন—' বলতে বলতে থেমে যায় নাটোয়ার।

তার কথায় স্পষ্ট একটা ইঙ্গিত ছিল, চট করে তা ধরে ফেলে লড্ডুপ্রসাদ। বলে, 'আরে বাবা, কারখানা তুলে দিইনি।' সমস্ত ব্যাপারটা বিশদভাবে বুঝিয়ে দেয় সে। তরাই অঞ্চলে অর্থাৎ যেখান থেকে চেরাইয়ের জন্য গাছের গুঁড়ি আনানো হয় সেখানে কী একটা কারণে কিছুদিন গোলমাল চলছিল তাই কাঠের জোগান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই করাতকল চালু রাখা সম্ভব ছিল না। তবে আজই খবর এসেছে তরাইয়ের ঝঞ্ঝাট থেমে গেছে। দু-চারদিনের মধ্যে আবার কাঠ আসতে শুরু করবে। তখন ফের কারখানার কাজ শুরু হবে। নাটোয়ার যেন চারদিন পর আসে, তখন নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

নাটোয়ার রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে ওঠে। তবে সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ নৈরাশ্যও বোধ করে। লড্ডুপ্রসাদজির কৃপায় কাজটা পাওয়া যাবে ঠিকই, তবে তার জন্য চার চারটে দিন অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু কী আর করা! এতগুলো দিন যখন কেটেছে তখন এই চারটে দিনও কোনোরকমে পার করে দেওয়া যাবে।

নাটোয়ারের হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায়। সে হাতজোড় করেই ছিল। বলে, 'একগো বাত হুজৌর—'

লড্ডুপ্রসাদ বলে, 'কী?'

'আমার সঙ্গে দু'জন আছে—এক লেড়কা আর এক আওরত। কিরপা করে যদি ওদেরও কামকাজের কিছু ব্যওস্থা হয়ে যায়—'

'চার রোজ পর এসো তো। তখন দেখা যাবে—'

এরপর আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। 'নমস্তে—' বলে গোম্‌তী আর লচ্ছুকে সঙ্গে করে করাতকলের বাইরে বেরিয়ে আসে নাটোয়ার। তারপর সামনের রাস্তা দিয়ে তিনজন হাঁটতে থাকে।

লড্ডুপ্রসাদের সঙ্গে নাটোয়ারের যে সব কথাবার্তা হয়েছে, পেছনে দাঁড়িয়ে সবই শুনেছিল গোম্‌তী। সে বলে, 'এখন কী করবে?' চার চার দিন—'

লড্ডুপ্রসাদের গদি-ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে মনে মনে একটা ছক কষে ফেলেছিল নাটোয়ার। সে বলে, 'আরে বাবা, অত চিন্তা করছিস কেন? তারানাথজিদের ভারতমাতা রথ আছে না? পেটের দানা ঠিকই জুটে যাবে। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। বড় সড়ক এখান থেকে বেশি দূরে না। চল ওখানে। জরুর রথবালাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।'

এই পরিকল্পনাটা অবশ্য অনেক আগেই ঠিক করা ছিল। পয়সা কামাইয়ের ফিকির বার করার ফাঁকে ফাঁকে দরকার হলে রথযাত্রার মিছিলে গিয়ে 'দুফারকা ভোজন'টা চুকিয়ে আসবে। যতদিন তারানাথজির রথ হাইওয়ে দিয়ে আধারশিলা বসাতে বসাতে যাবে ততদিন খাওয়ার দুশ্চিন্তাটা অন্তত তাদের নেই।

পরিকল্পনাটা মাথায় ছিল না গোম্‌তীর। নাটোয়ার মনে করিয়ে দেওয়ায় সে ভীষণ ব্যগ্র হয়ে পড়ে। বলে, 'বহোত ভুখ লেগেছে। তুরন্ত পা চালাও।'

জোরে জোরে হাঁটতে হাঁটতে নাটোয়ার বলে, 'পেটের চিন্তা নেই বলে আমাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে কিন্তু চলবে না। আগে যেমন কামকাজের ধান্দা চালিয়ে যাচ্ছিলাম তেমনি চালিয়ে যেতে হবে।'

দস্তুরমতো অবাক হয়ে যায় গোম্‌তী। বলে, 'কাজের ব্যওস্থা তো হয়েই গেছে। লড্ডুপ্রসাদজি চার রোজ পর আসতে বলল না?'

ভাবাবেগে ভেসে যাবার মানুষ নয় নাটোয়ার। লড্ডুপ্রসাদ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ঠিকই কিন্তু চারদিন পর কাজটা সত্যিসত্যিই পাওয়া যাবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। কেননা, কোনো কারণে গাছের গুঁড়ি আসতে যদি আরো দেরি হয়ে যায়? একমাত্র করাত কলের ওপর ভরসা করে থাকাটা ঠিক হবে না। এই কথাগুলো পরিষ্কার করে গোম্‌তীকে বুঝিয়ে দেয় নাটোয়ার।

গোম্‌তী বলে, 'তা হলে কী করতে চাও?'

নাটোয়ার বলে, 'এই চারদিন আমরা অন্য কাজেরও ধান্দা করব। সমঝি?'

একসময় হাঁটতে হাঁটতে নাটোয়াররা হাইওয়েতে পৌঁছে যায়। বরাত ভালোই বলতে হবে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিক থেকে সেই সুরটা বাজাতে বাজাতে ভারতমাতা রথ এসে পড়ে। 'বোল বাধা বোল, সঙ্গম হোগা কি নেহী—'

রথটা কাছাকাছি এলে নাটোয়াররা দুমরলালের নজর এড়িয়ে চুপিসারে মিছিলের পেছন দিকে মিশে যায়।

সতেরো

এরপর দু'টো দিন ছক অনুযায়ী রথযাত্রার মিছিলে কিছুক্ষণ হেঁটে, দুপুরের খাওয়াটি চুকিয়ে, নাটোয়াররা সুযোগ বুঝে সরে পড়েছে। তারপর কাজের খোঁজে আকাশপাতাল তোলপাড় করে ফেলেছে, কিন্তু কোথায় কিছু জোটাতে পারেনি।

এদিকে আধারশিলা বসানোর কামাই নেই। 'ভবিষ্য ভারত'-এর কথা ভেবে তারানাথজি এই দু'দিনে আরও সাত আটটা শিলান্যাস করেছেন। খবর নিয়ে জানা গেছে তাঁর রথযাত্রার কার্যক্রম এখনই শেষ হচ্ছে না, ভারতমাতা রথ ক'মসে কম আরও দিন দশেক হাইওয়ের ওপর দিয়ে নানা গ্রামগঞ্জ শহর বাজার ছুঁতে ছুঁতে এগিয়ে যাবে।

তৃতীয় দিন সকালে ভারতমাতাওয়ালাদের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নাটোয়াররা যেখানে এসে পৌঁছয় সেখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে ঢেউ খেলানো পাহাড়, আর তার ঢালে জঙ্গল। পাহাড়ের গা থেকে একটা নদী নেমে এসেছে, তবে সেটায় জল বেশি নেই। ছোট বড় অগুনতি পাথরের চাঁই এবং নুড়ির ভেতর দিয়ে তিরতিরে স্রোত বয়ে চলেছে। ক'দিন আগে যে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল তাতে এই নদীটায় ঢল নেমেছিল কিনা, কে জানে। নামলেও এখন তার চিহ্নমাত্র নেই।

নদীর যেদিকে পাহাড় এবং জঙ্গল, তার উল্টো দিকে কর্কশ কাঁকুরে ডাঙা, ফাঁকে ফাঁকে অবশ্য কিছু চাষের জমিও চোখে পড়ে। এ সবের ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু গাঁ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু চারপাশ একেবারে জনশূন্য, কোথাও মানুষজন দেখা যাচ্ছে না।

গাঁগুলোর সামনে দিয়ে যে কাঁকুরে রাস্তা চলে গেছে সেখানে একটা জিপ আর দু'টো গৈয়া গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থেকে খুলে বয়েলগুলোকে অবশ্য একধারে বেঁধে রাখা হয়েছে। প্রাণীগুলোর সামনে প্ল্যাস্টিকের বালতিতে খোল ভুসির সঙ্গে মাথা খড়ের কুচির জাবনা। তারা পরম সুখে সেগুলো চিবিয়ে চলেছে।

গাড়ি দু'টোর পাশে একটা বিশাল লোহার খাঁচা পড়ে আছে। ওটা কিসের খাঁচা, দেখামাত্র চিনে ফেলে নাটোয়ার। একদৃষ্টে সেটা দেখতে থাকে সে।

পাহাড় জঙ্গল আর নদীর এধারে নিঝুম আবহাওয়ার মধ্যে কেমন একটা চাপা থমথমে ভাব। সেটা ঠিক বোঝানো যায় না। কিন্তু নিজের অজান্তেই যেন এখানে দম বন্ধ হয়ে আসে।

গোটা পরিবেশটা নাটোয়ারদের সবার ঘাড়ের ওপর যেন চেপে বসেছে। ডান পাশ থেকে ফিস ফিস করে গোমতী বলে, 'কাঁহা লায়া? এ দিকটা চেনো?'

'নেহী।' লোহার খাঁচার দিকে চোখ রেখে নাটোয়ার আস্তে মাথা নাড়ে, 'কভি নেহী আয়া থা ইহাঁ।'

'রাস্তা ভুল করে এসে পড়েছ?'

'হাঁ, ওহি—'

এধারে ওধারে তাকিয়ে গোমতী আগের মতোই ফিস ফিস করে, চার পাঁচটা গাঁও রয়েছে, লেকেন একগো আদামিও চোখে পড়ছে না। গাঁও ছেড়ে সবাই চলে গেছে, মনে হচ্ছে।'

নাটোয়ার বয়েল জিপ ইত্যাদি দেখাতে দেখাতে বলে, 'সবাই চলে গেলে ওগুলো রয়েছে কী করে? জরুর কুছ গড়বড় হুয়া হোগা—' একটু থেমে বলে, 'ওই পিঁজরাটা দেখেছিস?'

'হাঁ।'

'কিসের পিঁজরা জানিস?'

গোম্‌তী খানিক ভেবে বলে, 'নেহী—তুমি জানো?'

নাটোয়ার বলে, 'হাঁ। সার্কাসবালারা ওই রকম 'পিঁজরায় শের আউর ভাল্লু রাখে। লেকেন—' একটু থেমে চিন্তিতভাবে ফের বলে, 'শের ভাল্লুর পিঁজরা এখানে কে নিয়ে এল?'

গোম্‌তী বলে, 'জরুর কুছ জরুরত পড়া হ্যায়—'

নাটোয়ার উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তাব আগেই হঠাৎ দূর থেকে চিৎকাব ভেসে আসে, 'এ ভেইয়া—ভেইয়া হো—'

নাটোয়াররা হকচকিয়ে যায়। যে গাঁগুলোকে নির্জন, পরিত্যক্ত মনে হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে সেখানেও মানুষজন আছে। এধারে ওধারে তাকাতে তাদের চোখে পড়ে বয়েল গাড়িগুলোর বাঁ পাশে যে গাঁ'টা রয়েছে সেখানকার একটা টালির ঘরের দাওয়া থেকে একটা আধবুড়ো লোক তাদের ডাকছে। চোখাচোখি হতে সে প্রবল বেগে হাত নাড়তে থাকে, 'তুরন্ত ইহাঁ চলা আও—'

লোকটার চোখেমুখে এবং গলার স্বরে এমন একটা আতঙ্কের ভাব রয়েছে যে নাটোয়াররা কিছু জিজ্ঞেস না করে একরকম দৌড়ে তার কাছে চলে যায়।

লোকটা বলে, 'তোমরা কারা?'

নিজেদের পরিষ্কার কোনো পরিচয় না দিয়ে নাটোয়ার জানায়, কাজের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে তারা এদিকে চলে এসেছে।

লোকটা বলে, 'এখানে এসে ভালো করোনি।'

'কেন বল তো?'

'রাস্তায় তোমাদের কেউ কিছু বলেনি?'

'নেহী।' নাটোয়ার জানায় এখান থেকে পাক্কা মাইলখানেক পেছনে তারা শেষ মানুষ দেখেছিল। তারপর জনমানুষের চেহারা তাদের চোখে পড়েনি। চারিদিক সুনসান, নির্জন। সে বলে, 'নদীর কিনারে এসে পয়লা তোমাকে দেখলাম।'

লোকটা বলে, 'তোমরা এখানে থেকে আভ্‌ভি চলে যাও। নদীর দিকে যেও না, যেদিক থেকে এসেছ সিধা সেদিকে যাবে।'

নাটোয়ারকে উৎকণ্ঠিত দেখায়। সে জিজ্ঞেস করে, 'চলে যেতে বলছ কেন? কী হয়েছে এখানে?'

'শের—শের নিকলা।'

অর্থাৎ বাঘ বেরিয়েছে। এবার লোকটার আতঙ্কের কারণ খানিকটা আন্দাজ করা যায়। কিন্তু যে মানুষ বত্রিশ ঘাটের জল খেয়েছে, ছুরির খেলা দেখাবার সময় যার হাত এতটুকু কাঁপে না এবং যে কিনা একজন দুর্ধর্ষ 'জঙ্গল হাঁকোয়া' (বিটার), বাঘের ভয়ে সেই নাটোয়ারের হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যাবে, তা হতেই পারে না। তা ছাড়া ভোর থেকে অনবরত হাঁটতে হাঁটতে ভীষণ ক্লান্তও হয়ে পড়েছে। সে বলে, 'চাচা, চলতে চলতে বিলকুল থকে গেছি। এখন আর হাঁটার তাকত নেই।'

লোকটার মন বেশ ভালো। সে বলে, 'তা হলে এক কাজ করো. আমার ঘরে এসে বোসো।'

'বাঁচালে চাচা—' লোকটার সঙ্গে তার ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে নাটোয়ারেরা। সামনের দরজাটা খোলাই থাকে।

ঘরের ভেতর দু'টো দড়ির চারপায়া পাতা রয়েছে। আর আছে টিনের পুরনো বাক্স, বোঁচকা বুঁচকি, গমের বস্তা এবং আরো হাজার রকমের মালপত্র।

লোকটা নাটোয়ারদের চৌপায়ায় বসিয়ে নিজেও বসে।

ঘরটার পেছন দিকেও একটা দরজা আছে। সেটা দিয়ে বাড়ির ভেতরের অংশটা চোখে পড়ে। ওধারেও দু-একটা ঘর রয়েছে। সেখান থেকে নানা বয়সের তিন চারটি মেয়েমানুষ এবং কিছু বাচ্চাকাচ্চা উঁকিঝুঁকি দিয়ে নাটোয়ারদের দেখতে থাকে।

বাঘের ব্যাপারটা প্রচণ্ড কৌতূহলী করে তুলে দিল নাটোয়ারকে। সে বলে, 'শেরের কথা কী বলছিলে যেন চাচা? ওটা কোত্থেকে বেরিয়ে এসেছে—ওই নদীর ওধারের জঙ্গল থেকে কি?'

লোকটা এবার বিশদভাবে যা জানায় তা এইরকম। তাদের এ অঞ্চলে বাঘ নেই, কস্মিনকালে ছিলও না। ওপারের জঙ্গলে সবই প্রায় নিরীহ প্রাণী—হরিণ, খরগোশ, শিয়ার। হিংস্র জানবরের মধ্যে রয়েছে দাঁতাল শুয়োর আর সাপ। দিনকয়েক আগে আচানক কোত্থেকে যেন একটা চিতা ছিটকে এখানে চলে এসেছে। প্রথম দিকে গরু ছাগল মেরে খেত। পরে নদীর ধারে এ গাঁয়ের ভৈরো দুসাদকে একলা পেয়ে তুলে নিয়ে যায়। মানুষের রক্তের স্বাদ পাওয়ার পর জানবরটা মারাত্মক হয়ে উঠেছে। এখন আর সে হরিণ বকরিটকরি খায় না, তার খাদ্য শুধুই মানুষ। গত কয়েক দিনে ছেলে-বুড়ো, পুরুষ-আওরত মিলিয়ে আটজন তার পেটে গেছে। জানবরটা আগে জঙ্গলেই বেশির ভাগ সময় থাকত, সন্ধের পর অন্ধকার নামলে মাঝে মধ্যে গাঁয়ে হানা দিত। এখন তার সাহস এবং লালচ এতই বেড়ে গেছে যে দিন নেই রাত নেই, সকাল নেই দুপুর নেই, যখন তখন আশেপাশের চার পাঁচখানা গাঁয়ে হানা দিচ্ছে এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র মানুষ তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

ফলে চারিদিকে আতঙ্ক এমনই ছড়িয়ে পড়েছে যে কেউই আর ঘর থেকে বেরুতে চায় না। গাঁয়ের 'পঞ্চ'-এর মুরুব্বি দশ মাইল দূরের শহরের কোতোয়ালিতে খবর দিয়ে এসেছিল। ওখানে এখন একটা সার্কাস পার্টি খেলা দেখাচ্ছে। কোতোয়ালি থেকে সার্কাসওলাদের এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বন্য আকাট বাঘকে পোষ মানিয়ে যারা ভেড়া বানিয়ে ফেলে তেমন দু'জন দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় দু'দিন ধরে এই গাঁয়ে এসে মুরুব্বি মঙ্গিলালের বাড়িতে উঠেছে। লোক দু'টো দুর্দান্ত এবং অসীম সাহসী, জানের পরোয়া করে না। সকাল হলেই খাবার দাবার নিয়ে তারা জঙ্গলে ঢুকে যায়। তাদের সঙ্গে একটা খাঁচা নিয়ে সার্কাসের আরও কিছু লোকজনও যায়। যদি কোনো কৌশলে বাঘটাকে খাঁচায় পোরা যায়। ওরা ফেরে সন্ধের আগে আগে। যাই হোক, চিতাটাকে এখনও তারা ধরতে পারেনি।

সবচেয়ে বিপদের কথা হল, সার্কাসওয়ালারা আজকের বিকেল পর্যন্তই এখানে আছে। চিতা ধরা পড়লে ভালোই, নইলে জঙ্গল থেকে ফিরেই তারা শহরে চলে যাবে। এখানে পড়ে থাকায় তাদের সার্কাসের ক্ষতি হচ্ছে। নেহাত কোতোয়ালির পুলিশ চটে যাবে তাই তাদের খুশি করতে দু'দিনের কড়ারে এতদূর এসেছে।

নাটোয়ার আঙুল বাড়িয়ে গরুর গাড়ি, জিপ ইত্যাদি দেখাতে দেখাতে বলে, 'ওগুলো সার্কাসবালাদের, তাই না?'

'একটা পিঁজরা নিয়ে ওরা তো জঙ্গলে ঢুকেছে। দুসরা খাঁচা দিয়ে কী হবে?'

লোকটা জানায়, সার্কাসওয়ালারা যে খাঁচাটা নিয়ে গেছে সেটা ছোটো। চিতাটাকে ধরতে পারলে সেটায় পুরে এই বড় খাঁচাটায় ঢুকিয়ে দেবে। আসলে জানোয়ারটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তার সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হবার জন্য ডবল খাঁচার ব্যবস্থা।

নাটোয়ার বলে, 'লেকেন চাচা, সার্কাসবালারা যদি চিতাটাকে ধরতে না পারে কী হবে?'

চিন্তাগ্রস্তের মতো লোকটা বলে, 'আমরা চার গাঁওয়ের হর আদমি তো দো রোজ সেটাই ভাবছি।'

লোকটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনে মনে চিতাটার ব্যাপারে একটা পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেছে নাটোয়ার। সে বলে, 'চাচা, আমি তোমাদের মদত করতে পারি।'

'তুমি!'

'হাঁ, আমি।'

কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো তাকয়ে থাকে লোকটা। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'কীভাবে মদত করবে?'

'নাটোয়ার বলে, 'আগে দেখি সার্কাসবালারা চিতাটাকে ধরতে পারে কিনা।'

'তা হলে তো ওদের না ফেরা পর্যন্ত থাকতে হয়।'

'যদি তোমরা থাকতে চাও আর আমরা মদতের জরুরত পড়ে—'

কী ভেবে লোকটা বলে, 'তোমরা বোসো, আমি আধা ঘণ্টার ভেতর ফিরে আসছি।'

লোকটা কিছুক্ষণের মধ্যে সাত আট জনকে জুটিয়ে নিয়ে আসে। তাদের সকলেরই বয়স ষাটের ওপবে। নাটোয়ারের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এদেব কারো নাম শিউপূজন, কারো টহলরাম, কারো ভজগোবিন, ইত্যাদি। সব চেয়ে বয়স্ক লোকটি হল মঙ্গিলাল; সে এই গাঁয়ের 'পঞ্চ'-এর মাথা।

মঙ্গিলাল বলে, 'সহদেও-য়ের কাছে শুনলাম তুমি নাকি চিতার ব্যাপারে আমাদের মদত করতে চাও?'

নাটোয়ার জানতে পারে যে লোকটা ঘরে এনে তাদের বসিয়েছে তার নাম সহদেও। সে বলে, 'হাঁ।'

'ক্যায়সে?'

'সার্কাসবালারা চিতাটাকে ধরতে না পারলে ওটাকে খতম করতে হবে।'

কিছুক্ষণ হাঁ হয়ে থাকে মঙ্গিলাল। তারপর বলে, 'কে খতম করবে?'

নাটোয়ার বলে, 'তোমরা গাওবালারা যদি সঙ্গে থাকো, আমিই চিতাটাকে শেষ করতে পারি।' বলতে বলতে চোখের তারা জ্বল জ্বল করতে থাকে তার।

'তুমি কি লাঠি দা কুড়ালি, এসব দিয়ে ওটাকে মারতে চাইছ?'

নাটোয়ার জানায়, দু চার শ' মানুষ একসঙ্গে জঙ্গলে হানা দিলে চিতাটাকে শেষ করে ফেলা অসম্ভব কিছু নয়। যেটা একান্ত প্রয়োজন তা হল সাহস।

মঙ্গিলাল এবং গাঁয়ের অন্য সব বয়স্ক লোকেরা সমস্বরে বলে, 'এত সাহস কারো কলিজায় নেই। আমাদের চার গাঁওয়ের একগো আদমিকেও তুমি সঙ্গে পাবে না। তব্ হাঁ—'

'কী?'

'তোমার যদি বন্দুক থাকত, দো-চারগো আদমি সঙ্গে যেত। ও শালে য্যায়সে খতারনাক জানবর, তাতে দা-কুড়ালির ওপর ভরসা করে কেউ জঙ্গলে ঢুকবে না।'

খানিক চিন্তা করে নাটোয়ার বলে, 'তোমাদের তা হলে বন্দুকবালা শিকারি দরকার?'

মঙ্গিলালরা জানায়, তেমন একজনকে পেলে তারা নিশ্চিন্ত হতে পারে। বন্দুকের গুলি ছাড়া অমন একটা বিপজ্জনক জন্তুকে কেউ শেষ করতে পারে, এমন বিশ্বাস তাদের নেই।

নাটোয়ার বলে, 'ঠিক হ্যায়, শিকারির ব্যওস্থা আমি করব। চিতাটাকে খতম করতে পারলে তোমরা আমাকে কী দেবে?'

'শিকারি তুমি পাচ্ছ কোথায়? কাঁহা মিলেগা?'

'তোমরা জানো না, আমি জঙ্গলহাঁকোয়া। অনেক শিকারির সঙ্গে আমি জঙ্গলে শের ভাল্লু মারতে গেছি। তোমরা বললে দশ বিশ শিকারি এখানে হাজির করে দিতে পারি।'

অচেনা এই লোকটা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য, মঙ্গিলালরা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। সংশয়ের চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মঙ্গিলাল বলে, 'সচ্?'

নাটোয়ার বলে, 'তোমাদের কাছে ঝুট বলে কিছু ফায়দা আছে?' বল আমার 'মজুরি কী দেবে?' কথা বলতে বলতে মনে মনে শিকারিদের একটা তালিকা করে ফেলেছে সে। মিলিটারি সিংকে এখন পাওয়া যাবে না, তিনি দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন। তিনি ছাড়া আছেন জগমোহনজি, সুরযলালজি, মথুরাপরসাদজি, সোহনলালজি, ইত্যাদি। এঁরা সবাই জবরদস্ত শিকারি। এঁদের সকলের সঙ্গেই জঙ্গলহাঁকোয়া হিসেবে কাজ করেছে নাটোয়ার। এঁরা যখন জঙ্গলে মাচা বানিয়ে তার ওপর বন্দুক তাক করে বসেছেন তখন প্রবল হল্লা করে, টিন পিটিয়ে, বনের হিংস্র জানোয়ারদের তাড়া করতে করতে তাঁদের বুলেটের পাল্লার ভেতর নিয়ে গেছে নাটোয়ার। অবশ্য সে একা নয়, এ ধরনের কাজে আরও কয়েক জন জঙ্গলহাঁকোয়া দরকার।

নাটোয়ার জানে, এই সব শিকারিদের ঘরে অঢেল টাকাপয়সা, সোনাচাঁদি। পয়সার লালচে এঁরা কেউ জানোয়ার মারেন না। শিকার খেলাটা এঁদের কাছে নেশার মতো। এখানকার চিতার খবর যাঁকেই দেওয়া হবে, তিনিই টোটা-বন্দুক নিয়ে দৌড়ে চলে আসবেন। জঙ্গলে টিন পেটানো আর হল্লা

করার জন্য গাঁওবালাদের কাছ থেকে যদি কিছু আদায় করা যায়, এঁরা তার থেকে ভাগ বসাতে যাবেন না। যা পাওয়া যাবে, সবটাই তাদের। নাটোয়ারকে এখন যা করতে হবে তা হল মঙ্গিলালদের ওপর চাপ দিয়ে যতটা টাকা বাড়িয়ে নেওয়া যায়।

মঙ্গিলাল ঘরের এক কোণে তার সঙ্গীদের নিয়ে চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নেয়। তারপর বলে, 'হামলোগন গরিব আদমি, শ'ও রুপাইয়ার বেশি দিতে পারব না।'

নাটোয়ার অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে খানিকক্ষণ চোখ গোল করে তাকিয়ে থাকে। তারপর গলার স্বর অনেকটা চড়িয়ে বলে, 'কা তাজ্জবকা বাত।'

'কীসের তাজ্জব?'

'তোমাদের চার গাঁওয়ে কেত্তে আদমি আছে চাচা?'

'কায়?'

'বলই না।'

মনে মনে হিসেব কষে মঙ্গিলাল বলে, 'হোগা কমসে কম দো ঢাই হাজার।'

'দো-ঢাই হাজার আদামির জানের কীম্মত শ'ও রুপাইয়া ধরলে চাচা?' নেহী নেহী, এ ঠিক নেহী। ওটা আরও বাড়িয়ে দাও।'

মঙ্গিলালরা আরও এক দফা পরামর্শ সেরে নিয়ে বলে, 'তোমাকে তো বললাম আমরা গরিব আদমি। পর পর দো সাল এখানে ভালো ফসল হয়নি। আমাদের হাল নিশ্চয়ই বুঝবে। ঠিক হ্যায়, দেড় শ' রুপাইয়া নিও।'

অনেক টানা হ্যাঁচড়ার পর শেষ পর্যন্ত দু শ' টাকায় রফা হয়। তার ওপর যত দিন না চিতাটাকে মারা যাচ্ছে তাদের তিন জনের তিন বেলা করে ভরপেট খাওয়াও দিতে হবে। সেই সঙ্গে আরও একটা শর্তও জুড়ে দেয় নাটোয়ার। দু-একজন জঙ্গলহাঁকোয়া দিয়ে কাজ হয় না। শিকারিকে নিয়ে আসার পর তার সঙ্গে এই চারখানা গাঁ থেকে কমসে কম দশ পনের জন সাহসী লোক দিতে হবে। তারা নাটোয়ারের সঙ্গে হইচই বাধিয়ে, টিন পিটিয়ে, বিপজ্জনক মানুষখেকো জানোয়ারটাকে শিকারির দিকে তাড়া করে নিয়ে যাবে।

অলিখিত চুক্তি হয়ে যাবার পরও নাটোয়ারের মনে একটা খটকা থেকে যায়। যে সার্কসওয়ালালা জঙ্গলে ঢুকেছে তারা যদি আজ চিতাটাকে ধরে ফেলে, গোটা চুক্তিটাই বরবাদ হয়ে যাবে। সে মনে মনে ব্যাকুলভাবে আর্জি জানাতে থাকে, হো রামজি, হো কিষুণজি, সার্কাসওয়ালারা যেন আজ জঙ্গল থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

কথাবার্তা পাকা করে মঙ্গিলালরা চলে যায়। সহদেও-ও বসে থাকে না, পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতর চলে যায়। আজ নাটোয়াররা দুপুরে তার বাড়িতে খাবে। তারই ব্যবস্থা করতে গেল। এরপর যতদিন চিতাটা মারা না পড়ছে, তারা পালা করে করে চার গাঁয়ের লোকেদের বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসবে। অবশ্য রাত কাটাবে সহদেওয়ের এই বাইরের ঘরখানায়। তবে সব কিছুই নির্ভর করছে সার্কাসওয়ালাদের নিষ্ফল অভিযানের ওপর।

সবাই চলে যাবার পর গোমতী চাপা গলায় বলে, 'আমার বহোত ডর লাগছে। ওই খতারনাক জানবারটাকে মারার খেয়াল ছাড়। চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই—' তার গলার স্বরে অজানা আশঙ্কা আর চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে বেরোয়।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে নাটোয়ার বলে, 'ডরপোক কাঁহিকা। আমি কেত্তে কেত্তে শিকারির সঙ্গে জঙ্গলহাঁকোয়ার কাজ করেছি জানিস? এর চেয়ে অনেক বেশি খতারনাক জানবার আমার দেখা আছে। কমসে কম তিশগো শের, শ'ও বরা তাড়িয়ে আমি শিকারবালাদের বন্দুকের নলের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। তবেই না ওরা জানবরগুলোকে মারতে পেরেছে।' কোথায় কবে কোন কোন জঙ্গলে গিয়ে কী কী হিংস্র জন্তু মারার ব্যাপারে শিকারিদের মদত দিয়েছে তার লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে যায় সে। সে বোঝাতে চায়, আসল কাজটা সে-ই করেছে; মাচার নিরাপদ উচ্চতায় বসে শিকারিরা শুধু বন্দুকের ট্রিগারই টিপেছে।

নাটোয়ারের সমস্ত বীবরসাত্মক কাহিনিও গোম্‌তীকে চাঙ্গা করে তুলতে পারে না। সে আগের মতোই ভয়ার্ত সুরে বলে, 'তবু বলছি, তুমি এ খেয়াল ছাড়ো।'

'দ্যাখ গোম্‌তী, সিরিফ এক রোজ, বেশি হলে দো রোজ—এর মধ্যে জানবরটাকে মারবই। তারপরই নগদ দো শ' রুপাইয়া।'

'অত লালচ আচ্ছা নেহী। চার রোজ পর করাতকলের কাজটা পাচ্ছি। যেত্তে রোজ ওটা না মিলছে, ভারতমাতা রথবালারা তো রয়েছেই। ভুখা মরতে হবে না আমাদের। চল, এখনই বেরিয়ে পড়ি। পুছতাছ করে বড় সড়কে গিয়ে পড়তে পারলে রথবালাদের জরুর পেয়ে যাব।'

'কভি নেহী। এই দো শ' রুপাইয়া আমার চাই।' জেদি গলায় বলে নাটোয়ার, 'করাতকলে গতরচূরণ খেটে এই টাকাটা পেতে কেত্তে রোজ লেগে যাবে, হিসেব করে দেখেছিস?'

'যেতে রোজ লাগুক—'

'আরে সোচ বুঝ করে দ্যাখ, ফকিরাচাচা খালি হাতে ঘরে ফিরেছে। দো শ' রুপাইয়া দো-এক রোজের ভেতর পেয়ে গেলে তার থেকে চাচাকে কিছু দেওয়া যাবে। করাতকলে কামাই করে যখন ফিরে যাব, ততদিন কি আর ওরা জিন্দা থাকবে?'

গোম্‌তী উত্তর দেয় না। নাটোয়ার ঠিকই বলেছে, ফকিরাকে কিছু টাকা দেওয়া উচিত এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ততই ভালো। তবু চিতাবাঘের দুশ্চিন্তাটা কিছুতেই কাটতে চায় না। প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা গোম্‌তীর বুকের ভেতর চেপে বসে থাকে।

আঠারো

রামজি এবং কিষুণজি বোধ হয় কয়েক কোটি মাইল দূরে বসে নাটোয়ারের আর্জিটা শুনতে পেয়েছিলেন। দুই দেবতা তৎক্ষণাৎ সেটা মঞ্জুর করে দেন।

সন্ধের আগে আগে সার্কাসওয়ালারা সত্যি সত্যিই ব্যর্থ হয়ে জঙ্গল থেকে ফিরে আসে। দু'দিন গোটা বনভূমির আধাআধি চষে ফেলেও জন্তুটাকে ওরা ধরতে পারেনি। বার কয়েক দূর থেকে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো তার কালো বুটিদার শরীর ঘন গাছপালা এবং লতাপাতার ভেতর দিয়ে লাফিয়ে চলে যেতে দেখা গেছে শুধু।

মঙ্গিলাল এবং চার গাঁয়ের বেশ কিছু লোকজন সার্কাসওয়ালাদের জন্য আগে থেকেই জিপ আর গরুর গাড়ি দু'টোর কাছে সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের সবার হাতেই লাঠি দা বা অন্য কোনো গেঁয়ো অস্ত্র। সাবধানের মার নেই। বলা যায় না, কখন কেত্থেকে হুট করে চিতাটা বেরিয়ে আসবে।

মঙ্গিলালদের পাশে ভিড়ের ভেতর নাটোয়ার গোম্‌তী আর লচ্ছুকেও দেখা যায়।

সার্কাসওয়ালারা মোট ছ' জন। যে দু'জন বাঘের খেলা দেখায় তাদের একজনের নাম জন, আরেক জন হল মহেশ। দুই খেলোয়াড়েরই জবরদস্ত, মজবুত চেহারা। সরু কোমর, লোহার পাটার মতো চওড়া বুক, শক্ত পেশিওয়ালা হাত-পা। মোটা গর্দান, মাথার চুল ছোটো ছোটো করে ছাঁটা। জনের একজোড়া চাড়া-দেওয়া গোঁফ রয়েছে, মহেশের মুখ নিখুঁত কামানো। দু'জনের হাতেই বাঘ-খেলানো হান্টার, কাঁধে বন্দুক। বন্দুকটা আত্মরক্ষার কারণে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জঙ্গলের ভেতর হিংস্র মানুষখেকো জানোয়ারের মতিগতি কেমন হবে, আগে থেকে আন্দাজ করা মুশকিল। তাই হাতিয়ার সঙ্গে রাখতেই হয়।

জন এবং মহেশের চার সঙ্গী একটা ছোট ফাঁকা লোহার খাঁচা বয়ে এনেছিল। তারা চটপট একটা বয়েল গাড়িতে খাঁচাটা তুলে ফেলে। সেই গরুগুলো এখনও জাবনা খেয়ে যাচ্ছে। তাদের বাঁধন খুলে গাড়ির সঙ্গে জুতে দেয়।

সহদেওয়ের কাছে সার্কাসওয়ালা বাঘের খেলোয়াড়দের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আগেই শুনেছিল নাটোয়ার। ফলে কে জন আর কে মহেশ, চিনতে অসুবিধা হয়নি।

হতাশ চোখে জঙ্গল থেকে নিয়ে আসা শূন্য খাঁচাটার দিকে এক পলক তাকিয়ে মঙ্গিলাল ভয়ে ভয়ে জন এবং মহেশকে জিজ্ঞেস করে, 'আজও কিছু হল না সাব?'

জন বলে 'নেহী'। ও শালে বহুত হারামি। দো রোজ জঙ্গল ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি, লেকেন আমাদের নজদিগ ঘেঁষছে না।'

মহেশ বলে, 'হুঁশিয়ার জানোয়ার। পুরা দো রোজ তোমাদের এখানে থেকে কোসিস করলাম; আর থাকা যাবে না। আজ, এখনই আমরা চলে যাচ্ছি। তোমাদের জন্যে কষ্ট হচ্ছে, লেকেন আমাদের আর কিছু করার নেই।'

জন বলে, 'আমরা না থাকায় টাউনে সার্কাস বন্ধ হয়ে আছে। বুঝতেই পারছ, পেটকা সওয়াল। ফিরে গিয়ে সার্কাস চালু হলে তবে তো কামাই হবে। আচ্ছা, চলতে হ্যায়।'

জন এবং মহেশ জিপের দিকে পা বাড়ায়।

হঠাৎ ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে নাটোয়ার। চার গাঁয়ের মুরুব্বিদের সঙ্গে আগেই চুক্তি হয়ে গেছে। সে মনে মনে ভেবে রেখেছিল, দশ মাইল দূরের যে শহরে অর্থাৎ প্রতাপপুরে সার্কাসওয়ালারা খেলা দেখাতে এসেছে, জন আর মহেশদের সঙ্গে সেখানে চলে যাবে। ওখানে শিকারি মথুবানাথ সহায় থাকেন। শিকারের গন্ধ পেলে তাঁকে আটকে রাখা অসম্ভব। যত কাজ থাক, সব ফেলে তিনি নাটোয়ারের সঙ্গে চলে আসবেন।

নাটোয়ার হাতজোড় করে বলে, 'সাব, একগো বাত—'

জন এবং মহেশ দাঁড়িয়ে পড়ে।

নাটোয়ার বলে, 'কিরপা করে আমাকে যদি আপনাদের সঙ্গে নেন—'

জন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, 'মতলব?'

নাটোয়ার জানায় সে প্রতাপপুরে যাবে, বয়েলগাড়িতে যদি একটা জায়গা পাওয়া যায় তার খুবই উপকার হয়। নইলে দশ দশ মাইল রাস্তা তাকে হেঁটে যেতে হবে।

জন আর কোনো প্রশ্ন করে না। বলে, 'ঠিক হ্যায়, একটা গাড়িতে উঠে পড়।' বলেই মহেশকে সঙ্গে করে জিপের দিকে যায়।

নাটোয়ার মঙ্গিলালদের কাছে গিয়ে বলে, 'চিন্তা নায় করনা চাচা, সব ঠিক হো যায়েগা। তোমাদের যা বলেছি তার ব্যওস্থা করেই ফিরে আসব।'গোম্‌তী আর লুচ্ছুকে বলে, 'তোরা এই গাঁওয়ে চাচাদের কাছে থেকে যা।'

গোম্‌তী রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করে, 'কবে ফিরবে?'

'কাল।'

'ঠিক তো?'

'হাঁ হাঁ, ঠিক। ঘাবড়াস না—'

'কেত্তে রোজ বাদ তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমাকে এখানে ফেলে পরতাপপুর থেকে ভেগে যাবে না তো?'

'আরে নেহী নেহী, রামজি কসম—'

ওদিকে বয়েল গাড়ি থেকে সার্কাসের অন্য লোকেরা তাড়া দিচ্ছিল, 'আরে ভাই, জলদি কর—'

'হাঁ হাঁ—' নাটোয়ার আর দাঁড়ায় না, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুতে গিয়ে লাফিয়ে পেছনের গাড়িটায় উঠে পড়ে।

মহেশদের জিপ আগেই ছেড়ে দিয়েছিল। চাকার কঁ্যাচর কোঁচর আওয়াজ তুলে এবার বয়েল গাড়ি দু'টো সামনের কাঁকুরে রাস্তাটার ওপর দিয়ে এগিয়ে যায়।

পশ্চিম আকাশে দিনের শেষ রক্তাভা ছড়িয়ে সূর্য এখন ডুবে যাচ্ছে। গাঁয়ের লোকজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ নাটোয়ারকে দেখা যায়, পলকহীন তাকিয়ে থাকে গোম্‌তী।

উনিশ

পরদিন দুপুরে চারখানা নিঝুম, সন্ত্রস্ত গাঁ-কে চমকে দিয়ে ছ'টা ভৈসা গাড়ি মিছিল করে নদীর এধারে সহদেও-এর বাড়ির উল্টো দিকের ফাঁকা জমিতে এসে থামে।

সহদেওদের গাঁ'টা সবার শেষে। গাড়ির মিছিলটা যখন আগের দিকের গাঁগুলোর ভেতর দিয়ে আসছিল তখন মাঝখানের একটা গাড়ি থেকে নাটোয়ার সামনে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল, 'আরে গাঁওবালা ভাইলোগন, ঘরসে নিকাল আও। দেখো কৌন আয়া হ্যায়—বহোত বড়ে শিকারি মথুরানাথজি। অব্ কোঈ ডর নেহী। সমঝ লো, ও শালে চিতা মর চুকা—'

তার চিৎকারে প্রায় সব বাড়ি থেকেই দু-চারজন করে বেরিয়ে পড়েছিল। বিরাট কৌতূহলী জনতা ভৈসা গাড়িগুলোর পেছন পেছন চলে এসেছে।

ছ'খানা মোষের গাড়িই অজস্র মালপত্র এবং লোকজনে বোঝাই। অনেকগুলো তাঁবু, নানা ধরনের বাসনকোসন, স্টোভ, বড় চুল্হা, চাল-ডাল-আটা-চিনি এবং কাঁচা আনাজের বস্তা, ঘি আর তেলের টিন, গদিওলা কুর্শি, তোষক, তাকিয়া, মশারি, পনেরো বিশটা মশাল, হ্যাজাক, মোটা মোটা পাটের দড়ি, প্রচুর তক্তা বাঁশ পেরেক দা লাঠি এবং অগুনতি ক্যানেস্তারা—সমস্ত মিলিয়ে এলাহি ব্যাপার। এত সব লটবহর এবং মানুষজনের মধ্যে সবার আগে যাঁর দিকে নজর চলে যায় তিনি একেবারে প্রথম গাড়িটার ছই-য়ের তলায় পুরু ফোমের গদির ওপর তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসে আছেন। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স কিন্তু এখনও লম্বা-চওড়া তাগড়াই চেহারা। শক্ত চোয়াল, হাত-পায়ের মোটা মোটা হাড়, ছড়ানো নাক, মাংসল কাঁধ আর তীক্ষ্ণ চোখ, মোমে-মাজা গোঁফ, ইত্যাদি এক পলকে বুঝিয়ে দেয়, ইনিই দুর্ধর্ষ শিকারি মথুরানাথ সহায়। তাঁর পরনে ব্রীচেস, পায়ে বুট। পাশে এক জোড়া ডবল ব্যারেল বন্দুক।

ওধারে হই হই করে অন্য গাড়ির লোকেরা মালপত্র নামাতে শুরু করেছে। ক'জন ক্ষিপ্র হাতে চটপট খুঁটি-টুঁটি পুঁতে তেরপলের তাঁবু খাটাতে শুরু করে। এদের সঙ্গে দু'জন রসুইকর এসেছিল। তাদের একজন স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দেয়, আরেক জন চুলহায় আগুন দিয়ে রান্নাবান্নার তোড়জোড় করতে থাকে। বোঝাই যাচ্ছে, বাঘটাকে না মারা পর্যন্ত মথুরানাথরা এখান থেকে নড়ছেন না। যতদিন দরকার এখানেই থেকে যাবেন।

খনিক দূরে মাঙ্গিলাল, সহদেও এবং চার গাঁয়ের পাঁচ ছ শ' লোক সবিস্ময়ে এবং মুগ্ধ চোখে বিপুল পরিপাটি আয়োজনটা লক্ষ করছিল। সব দেখেশুনে তাদের মনে হচ্ছিল, দুশ্চিন্তার আর কারণ নেই। চিতাটার মৃত্যু নিতান্তই ঘনিয়ে এসেছে। নাটোয়ার যে সত্যিসত্যিই কাজের লোক, শুধু লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দেয়নি, সেটা বোঝা যাচ্ছিল। মথুরানাথেব মতো শিকারিকে এত লোকলস্কর এবং সরঞ্জামসুদ্ধ যে টেনে আনতে পারে সে সামান্য আদমি নয়। চার গাঁয়ের মানুষেরা তার প্রতি এক ধরনের কৃতজ্ঞতাই বোধ করে।

নাটোয়ার গাড়ি থেকে আগেই নেমে পড়েছিল। মাঙ্গিলালদের ডেকে মথুরানাথের কাছে নিয়ে আসে সে। বলে, 'হুজৌরকে পরণাম কর।'

মাটি পর্যন্ত মাথা ঝুঁকিয়ে মঙ্গিলালরা বলে, 'নমস্তে সরকার।'

এরপর মঙ্গিলাল এবং চার গাঁয়ের মাতব্বরদের সঙ্গে মথুরানাথদের পরিচয় করিয়ে দেয় নাটোয়ার।

মথুরানাথ নাটোয়ারের কাছ থেকে আগেই খবর নিয়েছিলেন তবু গম্ভীর, ভারিক্কি গলায় চিতাটা সম্পর্কে মুরুব্বিদের কাছ থেকেও নানা খুঁটিনাটি জেনে নেন। জন্তুটা এখানে কতদিন আগে এসেছে, ক'টা মানুষ ক'টা বকরি ক'টা মোষ এবং ক'টা গরু মেরেছে, কখন কখন সেটা গাঁয়ে এসে হানা দেয়, ইত্যাদি।

চার গাঁয়ের প্রতিনিধি হিসেবে হাতজোড় করে বিনীতভাবে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যায় মঙ্গিলাল।

সব শোনার পর মথুরানাথ বলেন, 'আমার হাতে নাটোয়ার ছাড়া আর কোনো জঙ্গলহাঁকোয়া নেই। একটা লোক দিয়ে কাজ হবে না। তোমাদের চার গাঁ থেকে কমসে কম আরো দশ পনেরোটা জোয়ান ছোকরা দিতে হবে।'

মঙ্গিলাল তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয় না। সে বেশ দমেই গেছে। তার ধারণা হয়েছিল এত লোকজন যখন মথুরানাথ নিয়ে এসেছেন, চিতাটাকে মারার যাবতীয় বন্দোবস্ত তিনিই করবেন। কিন্তু এখন রীতিমতো ফ্যাসাদই দেখা দিল। ওইরকম একটা খতারনাক জানোয়ার তাড়া করার জন্য চার গাঁয়ের কেউ জঙ্গলে ঢুকতে চাইবে কিনা, সে সম্বন্ধে তার যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। অবশ্য কয়েকজন জঙ্গলহাঁকোয়ার দাবি আগেই জানিয়ে রেখেছিল নাটোয়ার। মঙ্গিলাল ভীরু গলায় বলে, 'সরকার, আমি গাঁওবালাদের সঙ্গে কথা বলে আপনাকে জানাচ্ছি।'

মথুরানাথ বলেন, 'যত ইচ্ছে কথা বল। লেকেন দশ পন্দ্র জঙ্গলহাঁকোয়া আমার চাই।'

মঙ্গিলাল নাটোয়ারকে একধারে ডেকে নিয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'মথুরানাথজির সঙ্গে এতে আদমি এসেছে। ওরা জঙ্গলে না গিয়ে কী করবে তা হলে? আমি তো ভেবেছিলাম—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে নাটোয়ার জানায়, প্রতাপপুর থেকে যাদের আনা হয়েছে তাদের কেউ রসুইকর, কেউ নৌকর, কেউ মথুরাজির হাত-পা টিপে দেয়। এদের মধ্যে একজনও জঙ্গলহাঁকোয়া নেই।

মঙ্গিলাল বলে, 'মথুরাজি এত্তে বড়ে শিকারি। জঙ্গলহাঁকোয়া ছাড়াই উনি চিতাটাকে জরুর মারতে পারবেন।'

মঙ্গিলালের অজ্ঞতায় বিশেষ অবাক হয় না নাটোয়ার। এরা যে শিকারের নিয়মকানুন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানে না, সেটা ধরে ফেলে সে, বলে, 'আরে চাচা, জানবরটাকে তাড়িয়ে বন্দুকের সামনে না নিয়ে গেলে উনি গোলি চালাবেন কী করে? আমি তো সঙ্গে থাকবই, ডরের কিছু নেই। তুমি দশ পন্দ্র আদমির ব্যওস্থা করে দাও।'

মঙ্গিলাল চিন্তিতভাবে বলে, 'ঠিক হ্যায়।' তারপর পায়ে পায়ে এবার সে খানিক দূরে যে জনতা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে চলে যায়। এবং মথুরানাথ তাদের কাছে কী চেয়েছেন সেটা জানিয়ে দিয়ে বলে, 'দেখো ভাই, উনি সাফ সাফ বলে দিয়েছেন জঙ্গলহাঁকোয়া ছাড়া চিতাটাকে মারতে পারবেন না। ওঁর জন্যে আমাদের এক পাইসা খরচা নেই। ক'গো আদমি না দিলে গুস্‌সা করে মথুরাজি যদি লৌটকে চলে যান, আমাদের সবাইকে এক এক করে ওই শালে জানবরের পেটে চলে যেতে হয়ে। সোচ বুঝ করে দেখ, এই আখরি মওকা ছেড়ে দেবে কিনা।' একটু থেমে ফের টানা বলে যায়, 'এ কাজে বহোত খতরা আছে জানি। তবে নাটোয়ার সঙ্গে থাকবে, তেমন কিছু হলে ও সামলাবে। ভেবে দেখ বাহারকা আদমি এসে আমাদের জন্যে ঝুঁকি নিচ্ছে, আর আমরা নিজেদের জন্যে নিজেরা এটুকু করব না?'

মঙ্গিলালের কথায় খানিকটা প্রতিক্রিয়া হয়। গাঁওবালারা নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে অনেকক্ষণ পরামর্শ সেরে নেয়। তারপর একজন দু'জন করে মোট পনেরো ষোলটি লোক মঙ্গিলালের কাছে এসে জানায়, তারা জঙ্গলে যেতে রাজি। আসলে শুধুমাত্র মঙ্গিলালের কথায় নয়, শিকারের ব্যাপারে মথুরানাথজির বিপুল আয়োজন দেখে তারা ভরসা পেয়েছে। তা ছাড়া নাটোয়ার সঙ্গে থাকবে। যদিও মাত্র একটা দিন তারা তাকে দেখেছে কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যেই তার চালচলন, কথাবার্তা, দুরন্ত সাহস এবং কর্মক্ষমতায় তারা মুগ্ধ। যার এক কথায় মথুরানাথের মতো দুর্ধর্ষ শিকারি এত সাজসরঞ্জাম নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর হাজির হয়েছেন সে তাদের মতো তুচ্ছ ঐরু-গৈরু-ভৈরু নয়। বোঝা গেছে, জঙ্গল শিকার এবং জন্তুজানোয়ারের মতিগতি সম্পর্কে তার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা প্রচুর। নাটোয়ার সঙ্গে থাকলে তেমন ভয়ের কারণ নেই।

মঙ্গিলাল লোকগুলোকে নিয়ে মথুরানাথের কাছে চলে আসে।

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করছিল, সেই ফাঁকে কখন যে সব চেয়ে বড় তাঁবুটা খাটানো হয়ে গেছে, টের পাওয়া যায়নি। মথুরানাথ মানুষটি বেশ সৌখিন। তাঁর এই তাঁবুর কানাত মখমল দিয়ে তৈরি। মাটিতে পাটের ম্যাট পেতে তার ওপর দামি পুরু কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁবুটা গদিমোড়া ইজিচেয়ার, ফোল্ডিং খাট, বেতের মোড়া, টেবল, রুপোর ফরসি ইত্যাদি দিয়ে সাজানো।

মথুরানাথ এখন ইজিচেয়ারে শরীরে এলিয়ে দিয়ে চা খাচ্ছেন। একটা নৌকর জ্বলন্ত কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে এসে ফরসির মাথায় সেটা বসিয়ে দেয়। দামি খুসবুদার তামাকের গন্ধে অনেকটা জায়গা জুড়ে বাতাস ম ম করতে থাকে।

খানিক দূরে আরও তিনটে তাঁবু খাটানোর কাজ চলছে। সেগুলো তুলনায় ছোটো, বাহারও কম।

মথুরানাথ একটা ছোটো নিচু টেবলে চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে ফরসির নলটা তুলে নিতে নিতে মঙ্গিলালদের দিকে তাকান। বলেন, 'কী ব্যাপার?'

মঙ্গিলালদের সঙ্গে সঙ্গে নাটোয়ারও এসেছিল। উত্তরটা সে-ই দেয়। সেই সাহসী পনেরো ষোলোটা লোককে দেখিয়ে বলে, 'হুজৌর, এরা জঙ্গলহাঁকোয়া হয়ে কাজ করতে রাজি হয়েছে।'

'ঠিক হ্যায়। দোপহরে খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে তোমরা চলে এস। জঙ্গলে গিয়ে মাচান বেঁধে আসতে হবে।'

হুকুম নিয়ে লোকগুলো চলে যায়।

দুপুরে সূর্য যখন মাথার ওপর থেকে পশ্চিম আকাশের ঢাল বেয়ে সামান্য নেমে গেছে, সেই সময় মথুরানাথজি নাটোয়ার এবং সেই পনেরো ষোলোটি আনকোরা জঙ্গলহাঁকোয়াকে নিয়ে জঙ্গলের দিকে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর হাতে রাইফেল। অন্যদের ভেতর কয়েকজন মাচা বাঁধার জন্য তক্তা কাঠ পেরেক দড়ি বাঁশ ইত্যাদি বয়ে নিয়ে চলেছে। বাকিদের হাতে দা লাঠি এবং বর্শা। চিতাটার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই সব হাতিয়ার সঙ্গে নিয়েছে তারা। জঙ্গলের ভেতর জানোয়ার বড়ো ভয়ঙ্কর, বিশেষ করে সেটা যদি মানুষখেকো চিতা হয়।

প্রথমে কেউ লক্ষ করেনি, তাদের পেছন পেছন গোম্‌তীও আসছিল। সবাই যখন বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের ওপর সাবধানে পা ফেলে ফেলে সেই পাহাড়ি নদীটা পেরুচ্ছে তখন আচমকা মথুরানাথজি তাকে দেখতে পান। ঘুরে দাঁড়িয়ে বেশ অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করেন, 'এ আওরত কৌন?'

বাকি সবাই ঘুরে দাঁড়ায়। নাটোয়ার কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে। গোম্‌তী আর লচ্ছুকে সে সহদেওদের কাছে থাকতে বলে এসেছিল। কিন্তু আওরতটা যে এভাবে তাদের পিছু নেবে ভাবতে পারা যায়নি। নাটোয়ার অবাক যতটা হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে বিরক্ত।

'কৌন হ্যায় ও? কিঁউ হামলোগকা পিছা কর রহী হ্যায়?' গমগমে কণ্ঠস্বরটাকে এবার আরও কয়েক পর্দা চড়িয় দেন মথুরাপ্রসাদ।

চমকে ওঠে নাটোয়ার। 'ও গোম্‌তী হ্যায় হুজৌর—' বলে পাথরের চাঁই টপকে টপকে গোম্‌তীর কাছে চলে যায়। তাকে জিজ্ঞেস করে, 'তুই এসেছিস কেন?'

'জঙ্গলে ওহী খতারনাক জানবরটা আছে।'

'ও শালে জঙ্গলে থাকবে না তো মানুষের মতো গাঁও ইয়া টৌনে থাকবে? যা, ফিরে যা—'

'নেহী।'

'কেন ঝামেলা করছিস। মথুরাজি বহোত গুস্‌সা করছেন।'

গোম্‌তী জানায়, নাটোয়ারকে ওইরকম একটা খতারনাক জন্তুর মুখে পাঠাতে পারবে না। সে-ও সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।

নাটোয়ার বোঝাতে চেষ্টা করে, অমন চিতা অনেক দেখেছে সে। জানোয়ারটা তার চামড়ায় একটা আঁচড় পর্যন্ত কাটতে পারবে না। তা ছাড়া এ জাতীয় মারাত্মক অভিযানে কোনো মেয়েমানুষের থাকা ঠিক হবে না। কিন্তু গোম্‌তী কোনো কথাই শুনতে চায় না।

প্রথমে বিরক্ত হয়েছিল নাটোয়ার কিন্তু তার প্রাণের জন্য গোম্‌তীর এই ব্যাকুলতাটুকু তাকে ভেতরে ভেতরে বেশ নাড়া দেয়। যে বদ, নষ্ট আওরত একদিন তাকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, যাকে নাটোয়ার প্রচণ্ড ঘৃণা করত এবং খুনও করতে চেয়েছিল, তবু তার প্রতি মেয়েমানুষটার এতটা টান রয়েছে, কে ভাবতে পেরেছিল! মনে মনে সে ঠিক করে ফেলে, যে যা-ই বলুক গোম্‌তীকে নিজের ঘরে নিয়ে যাবে।

নাটোয়ার আরেক দফা আওরতের জঙ্গলে যাবার বিপদ সম্পর্কে গোম্‌তীকে বোঝায় কিন্তু আগের সিদ্ধান্ত থেকে তাকে টলানো যায় না। নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত সে বলে, 'মরার যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন চল—'

মথুরানাথজিরা তাদের জন্য অপেক্ষা করেননি। নদী পেরিয়ে ওধারে ঢাল বেয়ে জঙ্গলের কাছাকাছি চলে গেছেন। নাটোয়াররা দৌড়ে গিয়ে তাঁদের ধরে ফেলে।

পায়ের আওয়াজে ঘাড় কাত করে একবার নাটোয়ারদের দেখেন মথুরাজি, তাবপর ফের সামনের দিকে তাকিয়ে চলতে চলতে বলেন, 'আওরতটা জঙ্গলে যাবে নাকি?'

নাটোয়ার ভয়ে ভয়ে বলে, 'হাঁ হুজৌর। ও আমাদের সঙ্গে জানবরটাকে তাড়া করবে।'

'বহুত সাহস দেখছি আওরতের।'

নাটোয়ার উত্তর দেয় না। মথুরানাথও আর কোনো প্রশ্ন করেন না।

একসময় সবাই জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

পাহাড়ের এ ধারে গাছপালা তেমন ঘন নয়। ট্যারাবাঁকা চেহারার কিছু সিসম, কেঁদ আর জারুল ছাড়া ছাড়া ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর ক্রমশ চাপ-বাঁধা জঙ্গল শুরু হয়েছে।

বিশাল বাহিনীটার সামনের দিকে এই অভিযানের নেতা মথুরানাথজি বন্দুক হাতে সতর্ক চোখে চারিদিকে লক্ষ করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর পেছনে এখানকার চার গাঁয়ের নতুন জঙ্গলহাঁকোয়ার দলটা। সবার শেষে নাটোয়ার আর গোম্‌তী।

নাটোয়ার চলতে চলতে সমানে চিৎকার করে চলেছে, 'হোঁশিয়ার, ভাই, হোঁশিয়ার। আমরা দুশমন জানবরের আস্তানায় ঢুকে পড়েছি। আগে পিছে ডাইনে বাঁয়ে উপর নিচে, সব দিকে নজর রাখ। হোঁশিয়া—য়া-য়া-র—'

নাটোয়ারের চিৎকারে এবং এতগুলো মানুষের পায়ের আওয়াজে নিঝুম বনভূমির স্তব্ধতা ভেঙে যায়। এখানকার আদি বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যেন। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে সর সর করে বুকে হেঁটে পালাতে থাকে সাপ এবং অদৃশ্য সরীসৃপের দল। বানরেরা লাফিয়ে লাফিয়ে গাছের পর গাছ পেরিয়ে উধাও হয়ে যায়। তাদের গোপন সংকেতে ঝাঁকে ঝাঁকে হরিণেরা গাছপালা লতাপাতার ফাঁক দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে দৌড়ে কোথায় মিলিয়ে যায়, কে জানে। উঁচু উঁচু গাছের মাথা থেকে অগুনতি পাখি পাখা ঝাপটিয়ে, কঁক কঁক আওয়াজ করতে করতে আকাশ জুড়ে উড়তে থাকে। কিন্তু যার জন্য এত বিপুল সমারোহ করে এই জঙ্গলে নাটোয়াররা হানা দিয়েছে সেই খতরনাক জানবার চিতাটাকে পলকের জন্যও কোথাও দেখা যায় না। এমনকি দূর থেকে তার গজরানিও ভেসে আসে না। ঘোর জঙ্গলের বাতাবরণে সে বুঝিবা বেবাক মিলিয়ে গেছে।

আজ অবশ্য চিতাটাকে মারার জন্য জঙ্গলে ঢোকা হয়নি। জঙ্গলহাঁকোয়াদের কোনো কাজই নেই বলতে গেলে। একটা জায়গা ঠিক করে, সেখানে গাছের ডালে মাচা বেঁধে, সন্ধের আগে আগেই সবাই ফিরে যাবে।

ঘণ্টা তিনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা ফাঁকামতো জায়গা পছন্দ হয় মথুরানাথজির। সেখানে একটা গাছের মোটা গুঁড়ি মাটি থেকে দশ হাত উঁচু পর্যন্ত সটান উঠে গেছে। তারপর গুঁড়িটার গা থেকে তিনটে ডাল প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বেরিয়েছে। মথুরানাথজি সেই তে-ডালার ওপর নাটোয়ারদের দিয়ে মাচা বাঁধিয়ে যখন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসেন, বেলা পড়ে এসেছে। রোদ নেই বললেই হয়। পাহাড় আর গাছপালার মাথায় ম্যাড়মেড়ে একটু আলো কোনোরকমে আটকে আছে।

কুড়ি

আগেই সহদেওদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল নাটোযারদের। রাতের খাওয়া চুকিয়ে বাইরের সেই ঘরটায় শুয়ে পড়েছে তারা তিনজন—গোম্‌তী লচ্ছু আর সে নিজে। গাঁয়ের লোকেরা ধরেই নিয়েছে গোম্‌তী তার বিয়াহী আওরত অর্থাৎ বিবাহিত বৈধ স্ত্রী। ব্যাপারটা ঠিকই কিন্তু এর মধ্যে যে কিঞ্চিৎ জটিলতা রয়েছে সেটা আর ভাঙেনি নাটোয়াররা। অন্যেরা যা বুঝেছে, বুঝুক। আপাতত তাদের যা সম্পর্ক সেটা নিজেদের মধ্যেই গোপন থাক। তা ছাড়া নাটোয়ার তো মনস্থিরই করে ফেলেছে, গোম্‌তীকে নিজের কাছে নিয়ে যাবে। নতুন করে ফের ঘর-সংসার শুরু করবে তারা। অবশ্য এর জন্য তার কিছু খরচ-খরচা আছে। নষ্ট, ভোগে-যাওয়া জরুকে সমাজে আরেক বার প্রতিষ্ঠা করার জরিমানা হিসেবে তেতরিয়া গাঁয়ের তাবত মানুষকে একদিন ভরপেট উৎকৃষ্ট ভোজন করিয়ে দিতে হবে। নইলে তাদের মুখ বন্ধ করা যাবে না। এতগুলো লোককে খাওয়াতে আড়াই তিন শ' টাকা দরকার। গোম্‌তীর সম্মানে দ্বিতীয় বার সংসারে প্রবেশ করার কারণে এই টাকাটা খরচ করতে সে পিছপা নয়। এখন যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছে সেটা শেষ করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিতাটাকে মেরে ফেলা একান্ত জরুরি।

আজ বিকেলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার পর মথুরানাথ তাঁর তাঁবুতে জঙ্গলহাঁকোয়াদের নিয়ে একটা সভা বসিয়েছিলেন। চার গাঁয়ের মানুষ বাইরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে তাঁর কথা শুনছিল। তিনি কাল থেকে শিকারে যাবার একটা ছক ঠিক করে দিয়েছেন। রোজ সকালে কিছু খেয়ে কাঁটায় কাঁটায় ন'টায় জঙ্গলহাঁকোয়াদের নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। ন'টা মানে ন'টাই। এক সেকেন্ড হেরফের করা চলবে না। জঙ্গলহাঁকোয়ারা আজ শুধু দা লাঠি বর্শা ইত্যাদি নিয়ে ঢুকেছিল, কাল এ সবের সঙ্গে নিতে হবে ক্যানেস্তারা আর সেগুলো বাজাবার জন্য মজবুত বেঁটে বেঁটে লোহার রড। সকালে জঙ্গলে ঢোকার পর বিকেলের আগে কেউ বেরুতে পারবে না। তাই সবাইকে সঙ্গে করে দুপুরের জন্য শুঘা খাবার নিয়ে যেতে হবে।

এখন কত রাত, কে জানে। সহদেও একটা লণ্ঠন দিয়ে গিয়েছিল। শোওয়ার পর সেটা নিভিয়ে দিয়েছে গোমতী। ঘরের ভেতরটা এই মুহূর্তে গাঢ় অন্ধকারে ভরে আছে। তবে পঞ্চাশ হাত তফাতে ওধারে কাঁকুরে জমিতে মথুরানাথজিদের চারটে তাঁবু ঘিরে অনেকগুলো মশাল জ্বলছে। সমস্ত রাত ওগুলো জ্বলবে। চিতাটা যদি রাতে কোনো কারণে এদিকে হানা দেয় সে জন্য মশালের বন্দোবস্ত। জঙ্গলের জানোয়ার আগুনকে ভয় পায়। অবশ্য মথুরানাথের দুই নৌকর পালা করে বন্দুক হাতে জেগে জেগে বাকি রাতটা পাহারা দেবে। ওরা বন্দুক চালাতে জানে।

লচ্ছুকে মাঝখানে রেখে গোম্‌তী আর নাটোয়ার তার দু'ধারে শুয়েছিল। নাটোয়ারের ঘুম আসেনি। কাল তাড়াতাড়ি উঠে নাহানা এবং খাওয়া চুকিয়ে জঙ্গলে যেতে হবে, চিতাটাকে মেরে ফেলা ভীষণ জরুরি, ইত্যাদি কোনো চিন্তাই তার মাথায় নেই। লচ্ছুর ওধারে একটা মেয়েমানুষের মারাত্মক শরীর তাকে চুম্বকের মতো টানছিল কিন্তু লচ্ছু কি ঘুমিয়েছে? সে আস্তে আস্তে ছেলেটার আরও কাছ চলে যায়। লচ্ছুর শ্বাস পড়ছে খুব ধীরে ধীরে। তার গায়ে হাত দিয়ে আস্তে নাড়া দিতে যাবে সেই সময় ওধার থেকে চাপা গলা শোনা যায়, 'এ লচ্ছু, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?'

নাটোয়ার তার হাতটা লচ্ছুর গায়েব ওপর রেখেছিল। অন্ধকারে আরেকটি হাত এসে পড়ে তার হাতের ওপর। অর্থাৎ কিনা গোম্‌তীও লচ্ছুকে নাড়া দিয়ে জানতে চেয়েছিল, ছেলেটা আদৌ ঘুমিয়েছে কিনা। গোম্‌তীর হাতটা নিজের বিশাল মুঠির ভেতর পুরে নিয়ে সে বলে, 'তুই ঘুমোসনি?'

গোম্‌তী তার কথার উত্তর না দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, 'তুমিও তো জেগে আছ।'

একটু চুপ করে থাকে নাটোয়ার। তারপর গলার স্বর আরও নামিয়ে দেয়, 'লচ্ছুটা ঘুমিয়ে পড়েছে, কি বলিস?'

'হাঁ।'

গোম্‌তীর হাতটা ধরাই ছিল। আস্তে টান দিয়ে নাটোয়ার বলে, 'ইধার আ—'

বিড়ালীর মতো সন্তর্পণে লচ্ছুর ওপর দিয়ে এ পাশে এসে নাটোয়ারের নাকে কুট করে কামড় বসিয়ে বলে, 'এই জন্যে বুঝি জেগে ছিলে?'

চার বছর পর এই তো সেদিন গোম্‌তীর সঙ্গে দেখা হল। আগে, সেই বিয়ে করে নিয়ে আসার পর মেয়েমানুষটা ছিল একেবারেই অন্যরকম—ঠাণ্ডা, উত্তাপহীন, ভ্যাদভেদে। রাতে মনে হ'ত, ভেজা গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। কিন্তু এই চার বছরে একেবারে পালটে গেছে আওরতটা। রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে পুরুষকে তাতিয়ে মজিয়ে খেপিয়ে দেবার মতো কত রকমের ঢংঢাং, জাদু আর তরীকাই না শিখেছে। 'শালী হারামি কাঁহিকা—' বলে চকিতে গোম্‌তীকে বুকের ওপর তুলে নিয়ে উন্মাদের মতো পিষে ফেলতে থাকে নাটোয়ার। মেয়েমানুষটার এই শরীর তার বহুদিনের চেনা কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে বড়ই অপরিচিত আর আশ্চর্য কুহকময়।

দু'টি দেহকে ঘিরে একসময় ঝড় থামে। পরিতৃপ্ত গোম্‌তী আব নাটোয়ার পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে অঢেল সুখে কখন গভীর ঘুমে ডুবে যায়, নিজেরাই জানে না।

পরদিন ঠিক ন'টায় মথুরানাথ তাঁর বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কালকের মতোই সবার আগে আগে বন্দুক হাতে তিনি চলেছেন, সবার পেছনে গোম্‌তী আর নাটোয়ার। চার গাঁওয়ের মানুষ নদীর এধারে দাঁড়িয়ে অভিযানকারীদের বিদায় জানায়।

পরিকল্পনা ছকাই ছিল। জঙ্গলে ঢুকে প্রথমে সেই তে-ডালার মাচায় মথুরানাথকে তুলে দিয়ে নাটোয়ার পনেরোটি জঙ্গলহাঁকোয়াকে নিয়ে কালকের মতোই চিতাটা সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিতে দিতে গাছপালা ঝোপঝাড় ঠেলে পুব দিকে প্রায় দু'রশির মতো চলে যায়। তারপর তাকে ধরে মোট ষোলো জনের বাহিনীটাকে এভাবে সাজিয়ে নেয়। বারো জন সামনের দিকে মুখ করে টিন পিটিয়ে হল্লা করতে করতে অদৃশ্য চিতাকে তাড়া করে মথুরানাথের দিকে নিয়ে যাবে। বাকি দু'জন পেছন দিকে মুখ করে সেই অবস্থাতেই সামনের সারির জঙ্গলহাঁকোয়াদের পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে পিছু হাঁটতে থাকবে। অন্য দু'জনের একজন থাকবে ডান দিকে, আরেক জন বাঁ দিকে। তারা ডাইনে বাঁয়ে চোখ রেখে মূল দলটার দু'পাশ থেকে সামনের লোকেদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এগুতে থাকবে। অর্থাৎ ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে, সব দিকেই নজরদারির ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে নাটোয়ার। আচমকা কোনো দিক থেকেই চিতাটা যাতে তাদের ওপর হানা দিতে না পারে সে জন্য এটা খুবই জরুরি।

একসময় পরিকল্পনা অনুযায়ী টিন পেটানো এবং হল্লা শুরু হয়ে যায়। বনভূমির আত্মা সেই আওয়াজে চমকে চমকে ওঠে। এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা যত সাপ সরীসৃপ খরগোশ হরিণ—সব ঊর্ধ্বশ্বাসে চারিদিকে পালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু চিতটার হদিস কোথাও পাওয়া যায় না।

দুপুরে সূর্য যখন খাড়া মাথার ওপরে, জঙ্গলহাঁকোয়ার দলটা মথুরানাথের মাচার কাছে এসে থামে।

সবাই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মথুরানাথ বলেন, 'তোমরা একটু জিরিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নাও। তাবপর আবার হাঁক শুরু করবে।'

খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রামের পর নতুন উদ্যমে কাজে লাগে জঙ্গলহাঁকোয়ারা। আগের বার তারা গিয়েছিল পুব দিকে, এবার দক্ষিণ দিক থেকে টিন পেটানো এবং 'শোর মচানো' শুরু হয়।

পর পর দু'দিন এই জঙ্গলে আসছে নাটোয়াররা। কিন্তু চিতাটার খোঁজ মেলেনি। আজ বিকেলের দিকে যখন তারা হই হই করতে করতে আরেক বার মথুরানাথের মাচার কাছাকাছি এসে পড়েছে সেই সময় অনেক দূর থেকে একবার মাত্র চিতাটার গজরানি ভেসে আসে। অর্থাৎ জানোয়ারটা এখানেই আছে। কিন্তু ওই গজরানি পর্যন্তই। তাকে চোখে দেখা যায় না।

পুব এবং দক্ষিণ, দু'দিক থেকে দু'বার জঙ্গল তোলপাড় করে ফেলতে বিকেল নেমে যায়। এরপর আর এখানে থাকা একেবারেই নিরাপদ নয়।

অগত্যা মথুরানাথ তাঁর বাহিনী নিয়ে ফিরে আসে।

এরপর আরও দু'দিন কেটে যায়। এর মধ্যে নাটোয়াররা জঙ্গলে গিয়ে উত্তর থেকে পশ্চিম থেকে এমনকি আরও একবার করে পুব এবং দক্ষিণ থেকেও টিন পিটিয়েছে, গলার শিরা ছিঁড়ে চেঁচিয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তবে চিতাটাকে কাছাকাছি এবং দূরে দু-চারবার চকিতের জন্য দেখেছে নাটোয়াররা। ঘন গাছপালার ভেতর তার গোল গোল কালো ছাপ মারা প্রকাণ্ড হলুদ শরীর বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝলকে উঠেই পলকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তবে চিতটার হুঙ্কার অনেক বারই এই দু'দিন কানে এসেছে নাটোয়ারদের।

জানোয়ারটা ভীষণ চতুর। দূর থেকে গজরায়, দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়, কিন্তু তাড়া খেয়ে কোনোমতেই মথুরানাথজির বন্দুকের দিকে যায় না।

তিন তিনটে দিন পার হয়ে গেল কিন্তু কিছুই করা যাচ্ছে না। একটা জানোয়ার মারতে আগে আর কখনও এত সময় লাগেনি নাটোয়ারের।

মথুরানাথ এবং নাটোয়ার খুবই অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড এক জেদ তাদের কাঁধে ভব করেছে যেন। যথেষ্ট সময় নষ্ট করা হয়েছে। যেভাবেই হোক, আর দু-একদিনের ভেতর জানোয়ারটাকে শেষ করে ফেলতেই হবে।

আজ চতুর্থ দিন।

আগের ক'দিনের মতোই ন'টায় বেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে নাটোয়াররা। মথুরানাথ যথারীতি তাঁর মাচায় উঠে বন্দুক তাক করে বসেছেন।

গেল তিন দিনে এমন কোনো দিক নেই যেখানে থেকে টিন পিটিয়ে জানোয়ারটাকে তাড়া করেনি নাটোয়াররা। শুধু একবার নয়, একই দিক থেকে দু'বার তিনবার করেও তারা এটা চালিয়ে গেছে।

আজ সকালে ফের পুব দিকেই যায় নাটোয়াররা। এবং দু রশি তফাতে গিয়ে আগের মতো ছক সাজিয়ে, টিন পিটিয়ে, হল্লা করতে করতে মথুরানাথজির মাচানের দিকে এগুতে থাকে। কিন্তু কয়েক কদম যেতে না যেতেই ডান পাশে খুব কাছে চিতাটার গজরানি শোনা যায়। একটু পরেই শব্দটা আসে বাঁ ধারে থেকে, তারপর ক্রমাগত ডাইনে বাঁয়ে এবং পেছন থেকেও জঙ্গলে অনুপ্রবেশকারীদের বার বার হানায় চিতাটা যে খুবই বিরক্ত আর ক্রুদ্ধ সেটা তার গর্জন শুনে বোঝা যায়। নাটোয়াররা যেমন তাকে খতম করার জন্য জেদ ধরেছে, জানোয়ারটাও কিছু একটা করার জন্য তেমনি আজ মরিয়া। অত সহজে সে তাদের ছেড়ে দেবে না।

নাটোয়ার জানোয়ারদের মতিগতি বোঝে। তাদের গজরানি, চলাফেরার ধরন দেখে টের পায়, ওদের মাথায় কখন কোন অভিসন্ধি ঘুরছে। চিতাটার হালচাল দেখে তার শিরা স্নায়ু টান টান হয়ে গেছে।

নাটোয়ার চাপা গলায় বলে, 'হোঁশিয়ার—সবাই হোঁশিয়ার। ও শালে জানবরের মাথায় আজ শয়তান চেপেছে। চারদিকে নজর রাখ—' হোঁশিয়ার—'

আনকোরা জঙ্গলহাঁকোয়ারা প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। সন্ত্রস্ত গলায় তারা বলে, 'কী হবে নাটোয়ার ভেইয়া—'

'কুছ নেহিঁ হোগা। ডরো মাত্, হাতিয়ার তৈয়ার রাখ। জোরসে টিনা পিটো—'

পরস্পরের গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে এগুচ্ছে দলটা। নাটোয়ার ভরসা দিলেও তাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত গোটা শরীর প্রচণ্ড কাঁপছে। তাদের টিনে ঠিকমতো রডের বাড়ি পড়ছে না। সবাই চিৎকার করতে চেষ্টা করছে কিন্তু গলা দিয়ে কারো আওয়াজ বেরুতে চায় না। ক্ষীণ গোঙানির মতো শব্দ হয় শুধু। মানুষখেকো খতারনাক জানোয়ারের কলিজায় ভয় ধরাবার পক্ষে এই দুর্বল আওয়াজ একেবারেই যথেষ্ট নয়।

ডাইনে বাঁয়ে, কখনও বা পেছনে, শুকনো পাতার ওপর চিতাটার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ঝোপঝাড় লতাপাতা এবং বিশাল বিশাল গাছের আড়ালে নিজেকে অদৃশ্য রেখে জঙ্গলহাঁকোয়াদের

সঙ্গে সঙ্গে চলেছে জানোয়ারটা। নাটোয়াররা থামলে চিতাটা থামছে। ওরা চলতে শুরু করলে সেটাও চলছে।

নাটোয়ার বার বার সাবধান করতে থাকে, 'হোঁশিয়ার ভাইলোগ, ও শালে ভুচ্চরের ছৌয়া হারামিটা আমাদের পিছা পড়েছে।'

জঙ্গলহাঁকোয়াদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ভয়ার্ত গলায় তারা বলে, 'হামলোগন মর গিয়া, বিলকুল মর গিয়া—'

নাটোয়ার ধমকে, চেঁচিয়ে, গালাগাল দিয়ে সঙ্গীদের তাতিয়ে তুলতে আর তাদের খোয়ানো সাহস ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে, 'শালে চুহার পাল, আপনা হিম্মতের ওপর ভরসা রাখ। এখন ডরালে, ওই হারামি পেয়ে বসবে। শোর মচাও—শোর মচাও—' বলে নিজেই জঙ্গলকে উথলপাথল করে চেঁচাতে থাকে, 'হো-ও-ও-ও—হো-ও-ও—' তার চিৎকার জঙ্গল এবং পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

এবার খানিকটা কাজ হয়। জঙ্গলহাঁকোয়ারা বুঝতে পারছে, ভয় কাটিয়ে উঠতে না পারলে এই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। দুশমন যেভাবে পেছনে লেগেছে, সাহস হারিয়ে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে। প্রাণ বাঁচাবার জন্য শেষ শক্তিটুকু জড়ো করে তারাও হল্লা জুড়ে দেয়, 'হো-ও-ও— হো-ও-ও-ও—'

খানিকটা যাওয়ার পর হঠাৎ জঙ্গলহাঁকোয়াদের খেয়াল হয়, চিতার পায়ের আওয়াজ আর পাওয়া যাচ্ছে না। যে দুশ্চিন্তা আর আতঙ্ক তাদের ওপর চেপে বসেছিল সেটা অনেকখানিই কেটে যায়।

অন্যদের ভরসা দিলে কী হবে, ভেতরে ভেতরে নাটোয়ারও কম ভয় পায়নি। চাপমুক্ত হয়ে এবার সে বলে, 'বাঁচা গেল, জানবারটা আমাদের পিছা পড় বন্ধ করে জরুর অন্য দিকে ভেগে গেছে। শালে হারামি সমঝ গিয়া, ইহাঁ সুবিস্তা নেহী হোগা। এক কদম বঢ়ানেসে জান চলা যায়েগা। অব্—'

কিন্তু তার কথা শেষ হয় না। আচমকা মাথার ওপর ফের হিংস্র, ক্রুদ্ধ গজরানি শোনা যায়। এবং কিছু বোঝার বা করার আগেই বিশাল চিতা গাছের একটা মোটা ডাল থেকে জঙ্গলহাঁকোয়াদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সবাই যখন ভেবেছিল, জানোয়ারটা তাদের পিছু নেওয়া ছেড়ে দিয়েছে তখন নিঃশব্দে কখন সেটা গাছে উঠে ওত পেতে বসে ছিল, টের পাওয়া যায়নি।

চিতার থাবায় চার পাঁচটি জঙ্গলহাঁকোয়া জখম হয়ে গিয়েছিল। তারা তো বটেই, বাকি সবাই আতঙ্কে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চিৎকাব করতে করতে দৌড়ুতে থাকে, 'মর গিয়া, মর গিয়া—'

পালাতে পারেনি শুধু দু'জন। নাটোয়ার এবং গোম্‌তী। চিতাটার ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়েছিল নাটোয়ার। জন্তুটা আক্রোশে বার কয়েক ল্যাজ আছড়ায়, দাঁত বার করে হুঙ্কার ছাড়ে, তারপর নাটোয়ারের ওপর লাফিয়ে পড়ে কাঁধের কাছে কামড় বসিয়ে দেয়।

নাটোয়ার কাতর গোঙানির মতো আওয়াজ করে ওঠে, 'বঁচাও হামনিকো, বঁচাও—'

কয়েক হাত দূরে বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে ছিল গোম্‌তী। কেউ যেন পেরেক ঠুকে পা দু'টো মাটিতে গেঁথে দিয়েছে। শ্বাসপ্রশ্বাস একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে তার। এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখেনি সে। কিন্তু নাটোয়ারের গোঙানি কানে আসতেই তার মধ্যে মারাত্মক এক প্রতিক্রিয়া ঘটে যায়। একটা লম্বা দা নিয়ে সে ক'দিন ধরে জঙ্গলে আসছে। হাতিয়ারটা হাতেই ছিল, সেটা উঁচিয়ে মুহূর্তে জানোয়ারটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং উন্মত্তের মতো সেটার ঘাড়ে কোমরে মাথায় এলোপাথাড়ি কোপ বসিয়ে যায়। গোম্‌তীর মাথায় খুন চড়ে গেছে।

এই জঙ্গলে তার ওপর কেউ যে এমন জবরদস্ত আক্রমণ চালাতে পারে, হয়ত ভাবতে পারেনি চিতাটা। তার গা দায়ের কোপে ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে। রক্তাক্ত, ক্ষিপ্ত জানোয়ার নাটোয়ারকে ছেড়ে দিয়ে মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ায় এবং গোম্‌তীর গলায় কামড় বসিয়ে এক ঝটকায় তাকে তুলে নিয়ে ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে উধাও হয়ে যায়। সামান্য একটু আওয়াজ করারও সময় পায় না গোম্‌তী, তার আগেই তার ঘাড় ভেঙে ঝুলে পড়ে।

চিতাটার কামড়ে নাটোয়ারের কাধের হাড় ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়ে এসে সারা গা ভেসে যাচ্ছে। যে অভিযানে তারা বেরিয়েছিল তার শেষ বিশ্বস্ত সহযোদ্ধাটিকে এক ভয়ঙ্কর জানোয়ার চোখের সামনে দিয়ে তুলে নিয়ে গেল। সম্পূর্ণ বেহুঁশ হয়ে যাবার আগে বিড় বিড় করে আবছা গলায় শুধু একবারই সে বলতে পারে, 'গোম্‌তীকা খতম কর দিয়া—'

একুশ

অন্য জঙ্গলহাঁকোয়ারা চিতার ভয়ে পালিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত মথুরানাথজিকে নাটোয়ারদের খবরটা দিয়েছিল। তিনি লাফ দিয়ে মাচা থেকে নেমে বলেছিলেন, 'চল, আমার সঙ্গে। নাটুয়াকে ওভাবে ফেলে রাখা যাবে না। দেখি যদি বাঁচাতে পারি। গোম্‌তীকেও খুঁজতে হবে। চল—'

কেউ যেতে চায়নি। কিন্তু বন্দুক উঁচিয়ে একরকম জোর করেই মথুরানাথ তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। গোম্‌তীকে কোথাও পাওয়া যায়নি। অগত্যা বেঁহুশ নাটোয়ারকে নিয়ে সহদেওদের গাঁয়ে ফিরে এসে মথুরানাথ বলেছিলেন, 'এখনই একে প্রতাপপুরের হাসপাতালে নিয়ে যাও—'

মথুরানাথের কোনো একটা ভৈসা গাড়িতে চাপিয়ে নাটোয়ারকে নিয়ে যাওয়া যেত কিন্তু গাড়ি সড়ক ছাড়া চলতে পারবে না, তাতে অনেক সময় লেগে যাবে। নাটোয়ারকে বাঁচাতে হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে পৌঁছুনো দরকার।

রাস্তা দিয়ে গেলে প্রতাপপুর পাক্কা দশ মাইল। তাবে মাঠঘাট খানাখন্দের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি মাইল দুই হাঁটলে নয়া হাটিয়ার বাজার পড়বে, সেখানে থেকে হাইওয়ে ধরে আর আড়াই মাইল গেলেই প্রতাপপুর টাউন। কজেই বাঁশের চালিতে করে নাটোয়ারকে শুইয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বেলা হেলে গেছে অনেকখানি। পশ্চিম আকাশের মাঝামাঝি জায়গায় রক্তাভ সূর্য স্থির দাঁড়িয়ে আছে। আজ মেঘের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশের তলা দিয়ে চারটে লোক বাঁশের চালি কাঁধে করে উর্ধ্বশ্বাসে হেঁটে চলেছে। চালির ওপর রক্তাক্ত বেহুঁশ নাটোয়ারের শরীর দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা।

তাদের পেছন পেছন পাগলের মতো ছুটে চলেছে লচ্ছু। সমানে কাঁদছে সে আর একটানা বলে চলেছে, 'নাটুয়াচাচা—নাটুয়াচাচা—' নাটোয়ারকে জঙ্গল থেকে নিয়ে আসার পর সেই যে লচ্ছুর কান্না শুরু হয়েছে, সেটা এখনও থামেনি। বন্দুকবাজদের গুলিতে বাপের অমন শোচনীয় মৃত্যুর পর নাটোয়াররাই তাকে কাছে টেনে নিয়েছিল। চিতা গোম্‌তীকে তুলে নিয়ে গেছে। সে নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। নাটোয়ারও বাঁচবে কিনা, কে জানে। পৃথিবীর শেষ আশ্রয়টুকুও বুঝি তার হারিয়ে গেল।

কখন নয়া হাটিয়ার বাজারের কাছে এসে লচ্ছু এবং চালিবাহকেরা হাইওয়েতে এসে উঠেছে এবং কখন গমগমে বাজারটা পেরিয়ে আরও অনেকদূর চলে গেছে, নিজেদেরই খেয়াল নেই।

এখন বড় সড়কের দু'ধারে যতদূর চোখ যায়, শুধুই ফাঁকা মাঠ। কেউ কোথাও নেই। নিঝুম চরাচর জুড়ে অগাধ শূন্যতা। চাপ-বাঁধা স্তব্ধতাকে ফুঁড়ে ফুঁড়ে মাঝে মাঝে লচ্ছুর ফোঁপানি আর ক্লান্ত ভাঙা গলার 'নাটুয়াচাচা—নাটুয়াচাচা—' ডাকটা ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই।

হঠাৎ দূর থেকে বিলাইতি বাজনার সেই মাতিয়ে-দেওয়া গানের সুরটা শুনতে পায় চার চালিবাহক এবং লচ্ছু। পরক্ষণেই তাদের চোখে পড়ে, তারানাথজির ভারমাতা রথ বিশাল মিছিল নিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে। 'ভবিষ্য' ভারতের জন্য অসংখ্য শিলান্যাস করা এখনও তাঁর বাকি।

রথ যত এগোয়, সেই সুরটা ততই আরও স্পষ্ট হতে থাকে, 'বোল রাধা বোল, সঙ্গম হোগা কি নেহী....'

জনগণ

অনেক দূরে পশ্চিম আকাশের গায়ে মাঝারি মাপের পাহাড়ের রেঞ্জটাকে উঁচুনিচু ঝাপসা ক'টা লাইনের মতো দেখায়। শেষ বেলার লাল টকটকে সূর্য সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো এখন তার মাথায় দাঁড়িয়ে। কিন্তু কতক্ষণ আর! খানিক পরেই সূর্যটা পাহাড়ের ওধারে নেমে যাবে। সমস্ত চরাচর জুড়ে ঝপ করে নেমে আসবে অন্ধকার।

বিকেল এবং সন্ধের মাঝামাঝি এই সময়টায় প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাস কামরায় জানালার ধার ঘেঁষে বসে আছেন অবিনাশ রাজদান। পিতৃদত্ত এই পারিবারিক নামটি কবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অর্জুনকুমার নামে সারা দেশ এখন তাঁকে চেনে। এই মুহূর্তে তাঁর চোখ রক্তাভ পশ্চিম দিগন্তে আটকানো। দূরমনস্কের মতো তিনি সূর্যাস্ত দেখছেন।

অর্জুনকুমারের মুখোমুখি সিটটায় বসে আছেন রোহিত পাণ্ডে। রোহিতের পাশে সঞ্জীব কাউল আর ফারুক কায়সার। এদের কথা পরে।

অর্জুনকুমাররা ছাড়া গোটা কম্পার্টমেন্টটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিছু চাষাভুসো ক্লাসের দেহাতি। মেয়েপুরুষ এবং কাচ্চাবাচ্চা মিলিয়ে পঁচিশ তিরিশ জন। পৃথিবীর কোনো কিছু সম্পর্কেই তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। কৌতূহলশূন্য চোখে দু-একবার অর্জুনকুমারদের দেখে তারা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আগে কস্মিনকালেও অর্জুনকুমারকে এরা দেখেছে বলে মনে হয় না। ভারতীয় সিনেমার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। থাকলে দেখামাত্র তাঁকে চিনে ফেলত।

এমন হতচ্ছাড়া চেহারার রেলের কামরা ভূ-ভারতে খুব বেশি দেখা যাবে না। চারিদিকে থুতু, কফ, পান আর খৈনির পিক, পোড়া বিড়ি, কলার খোসা, লিট্টি বা সমোসার টুকরো, কাগজের ঠোঙা, শালপাতা, পাউরুটির দলাপাকানো মোড়ক ইত্যাদি ছত্রাকার হয়ে আছে। এধার ওধার থেকে বাচ্চাদের পেচ্ছাপের গন্ধ উঠে আসছে।

কামরার মেঝে থেকে স্টিলের পাটাতন কবেই উধাও হয়ে গিয়েছিল। বেশির ভাগ সিট নেই। সিলিংয়ে হাঁ-মুখের বড় বড় গর্ত। কোনো একসময় হয়ত ওখানে ফ্যান এবং লাইট টাইট লাগানো ছিল। সে সব কবে কারা খুলে নিয়ে গেছে, কে জানে।

নর্থ বিহারের এই অঞ্চলে এখনও বিজলি আসেনি। মান্ধাতার বাপের আমল থেকে কয়লার ইঞ্জিন ঝুক ঝুক করে রেলের বগিগুলোকে এই লাইনে টেনে চলেছে। অর্জুনকুমারদের প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ইঞ্জিনও আবহমান কালের নিয়মে কালো ধোঁয়ায় বায়ুমণ্ডলকে বিষাক্ত করতে করতে এগিয়ে যায়।

উত্তর বিহারের এ জাতীয় ট্রেনে, জঘন্য নোংরা সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে অর্জুনকুমারের মতো ভি আই পি যে চড়তে পারেন এবং অসীম ধৈর্যে চুপচাপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েও দিতে পারেন, এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার হয়তো আর কখনও ঘটেনি। কেননা, সিনেমা ওয়ার্ল্ডের তিনি একজন 'মেগা স্টার'। ফিল্মি দুনিয়ার আশি বছরের ইতিহাসে অর্জুনকুমারের মতো এমন বিরাট এবং চোখ-ধাঁধানো তারকা আগে দেখা যায়নি। আগামী সেঞ্চুরিতেও দেখা যাবে কিনা, সে সম্পর্কে অনেকেরই যথেষ্ট সংশয়। ইত্যাকার নানা কারণে তাঁর নামের সঙ্গে ওই জমকালো বিশেষণটি ইদানীং অনবরত জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় সিনেমায় অন্য সবাই 'স্টার', অর্জুনকুমারই একমাত্র 'মেগা স্টার'।

সারা ইন্ডিয়াতে তো বটেই, মিডল-ইস্ট, ফার-ইস্ট, ক্যারিবিয়ান আইল্যান্ডস থেকে কানাডা, রাশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ থেকে ল্যাটিন আমেরিকা—গোটা পৃথিবী জুড়ে অর্জুনকুমারের কোটি কোটি ফ্যান। তাঁর নতুন ছবির জন্য পাঁচ মহাদেশের অগুনতি মানুষ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকে।

অর্জুনকুমারের বয়স চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। সাড়ে ছ' ফিটের মতো হাইট। টান টান, মেদশূন্য চেহারা। লম্বাটে মুখ, ধারালো নাক, ঈষৎ পুরু ঠোঁট। তাঁর থুতনি আর চোয়ালের গঠন বেশ দৃঢ়। মসৃণ ত্বকের তলা থেকে আশ্চর্য দ্যুতি যেন বেরিয়ে আসতে থাকে। তাঁর তাকানো, দাঁড়ানো, চলা এবং কথা

বলার স্টাইল—সমস্ত কিছুর মধ্যেই রয়েছে দারুণ এক ম্যাজিক। বিশেষ করে আর যা চোখে পড়ে তা হল তাঁর প্রবল আত্মবিশ্বাস এবং ব্যক্তিত্ব। সব মিলিয়ে দুর্দান্ত স্ক্রিন পার্সোনালিটি।

সিনেমার পর্দায় যে ঝকমকে, চোখ-ঝলসানো অর্জুনকুমারকে দেখা যায় তাঁর সঙ্গে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে বসে থাকা অর্জুনকুমারের আদৌ কোনো মিল নেই। এই মুহূর্তে তাঁর পরনে আধময়লা চুস্ত এবং পাঞ্জাবির ওপর কালো পাড়হীন শাল জড়ানো। শালটাও খুব পরিষ্কার নয়, বেশ কয়েকদিনের ব্যবহারে দলামোচড়া হয়ে আছে। মাথায় শেষ চিরুনি পড়েছিল হয়তো দিন দুই আগে। রুক্ষ, পারিপাট্যহীন চুল এলোমেলো হাওয়ায় উড়ছে। গালে সপ্তাহখানেকের জমানো দাড়ি। পায়ে বিনুনি-করা চামড়ার পালিশহীন পুরোনো চপ্পল।

তাঁর গলায় মোটা উলের কম্ফোর্টার এমন উঁচু করে জড়ানো যাতে দুই গালের বেশির ভাগটাই ঢাকা পড়েছে। বড় মাপের কালো গগলসের জন্য চোখ, ভুরু এবং চোখের নিচের অনেকটা অংশ দেখা যাচ্ছে না। মনে হতে পারে, এই মেক-আপে তিনি ফিল্মের কোনো দৃশ্যে অভিনয় করতে চলেছেন। আদতে এটা সিনেমার ব্যাপারই নয়। এভাবে তিনি নিজেকে গোপন রাখতে চান। লোকের চোখে ধরা পড়ে যাওয়াটা এখন তাঁর পক্ষে কোনো ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়।

পৃথিবীর সব চেয়ে আরামদায়ক এয়ারলাইনসের প্লেনে বা এয়ার-কন্ডিশনড লিমুজিনে চড়ার অভ্যাস যে চিত্রতারকার, যিনি সারাক্ষণ অপার্থিব স্বপ্নের জগতে ভেসে বেড়ান, শুটিং করতে আকছার উড়ে যান প্যারিস কি টোকিওতে, ছুটি কাটাতে যান সুইজারল্যান্ড কিংবা মিয়ামি বীচে অথবা লেস ভেগাসে, তিনিই যে নিতান্ত সাদামাঠা ময়লা পোশাকে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দুর্গন্ধওলা কদর্য কামরায় লুকিয়ে চুরিয়ে একজন মামুলি যাত্রী হতে পারেন, প্রেস মিডিয়া, টিভি বা রেডিওর লোকেরা ঘুণাক্ষরেও তা টের পায়নি। পেলে এতক্ষণে সারা দেশ তোলপাড় হয়ে যেত।

আসলে অর্জুনকুমার চলেছেন জনগণের সন্ধানে। উত্তর বিহারের অখ্যাত ক'টি গাঁয়ে যেখানে গরিবের চেয়েও গরিব, আনপড়, ভুখা মানুষেরা থাকে, বেশ কিছুদিন তাদের মধ্যে অজ্ঞাতবাস করবেন তিনি। এদের কাছাকাছি থেকে সত্যিকারের 'ইন্ডিয়ান মাস'কে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করবেন। সাধারণ মানুষজনের কাছে যেতে হলে এরকম ম্যাড়মেড়ে মেক-আপই দরকার বলে তাঁর ধারণা। নইলে তারা হকচকিয়ে যাবে। ফলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। এত ছোটাছুটিই তখন সার।

যে চিত্রতারকা চব্বিশ ঘণ্টা আর্ক ল্যাম্প, ক্যামেরা, চড়া টাইপের মেক-আপ, চামচাগিরি, প্রোডিউসারদের চাটুকারিতা, প্রেসের লোকজন, ফ্যানফেয়ার, পার্টি, হুইস্কির ঢালাও স্রোত, ইত্যাদি মিলিয়ে গ্ল্যামারের কেন্দ্রবিন্দুতে পনেরো কুড়ি বছর জাঁকিয়ে রয়েছেন, আচমকা সে সব ছেড়েছুড়ে ভারতবর্ষের অজ পাড়াগাঁয়ে কেন অতি সামান্য, অতি সাধারণ মানুষ দেখতে ছুটেছেন, গোড়াতেই তা স্পষ্ট করে জানানো দরকার।

অর্জুনকুমার যদিও ফিল্মি দুনিয়ার একমাত্র 'মেগা স্টার' তবু গত তিন চার বছরে তাঁর একটা ছবিও লাগেনি। বক্স অফিসে হিট না করলেও এটা মনে করার কারণ নেই যে অর্জুনকুমারের ভক্তদের সংখ্যা কমে গেছে। আসলে যে-ধরনের ছবিতে পনেরো কুড়ি বছর ধরে তিনি 'হীরো' হয়ে আসছেন সেগুলোর গল্প এবং চিত্রনাট্য প্রায় একই ছকে বাঁধা। সেই স্মাগলার, সেই মারদাঙ্গা, সেই রিভেঞ্জ, সেই ধাঁধিয়ে-দেওয়া অ্যাকশন, বন্দুকবাজি, ফাইট আর রেপ সিকোয়েন্স। ঘণ্টাতিনেক এই সব চলার পর দুরাত্মা খলনায়কের পতন এবং নায়ক-নায়িকার মিলন। এ ছাড়া অন্য একটি ছকও রয়েছে। পাহাড়ে পর্বতে, ছবির মতো সুন্দর শহরে বা গ্রামে, সমুদ্রের ধারে বা মরুভূমিতে নায়ক-নায়িকার চুটিয়ে প্রেম, জড়াজড়ি, পর্নো ধরনের রগরগে সেক্স, সেই সঙ্গে ভাঁড়ামো এবং মাতিয়ে-দেওয়া গানের ছড়াছড়ি। স্বপ্নবৎ অলীক এই সব প্রেমের ছবিতে নায়িকা এক লাইন গান গায় প্যারিসে আইফেল টাওয়ারের নীচে, পরের লাইনটি গেয়ে ওঠে সুইজারল্যান্ডের কোনো লেকের ধারে, তার পরের লাইনটি লন্ডনে টেমস নদীর পাড়ে। প্রতিটি ছবিতে হয় একই ধরনের অ্যাকশন, নতুবা একই ধরনের প্রেম দেখে-দেখে দর্শকের খুব সম্ভব অরুচি ধরে গেছে। অর্জুনকুমারের যে সব ফ্যান তাঁর ছবি দশ বার, পনেরো বার

করে দেখত, তারা এখন একবারের বেশি হল-এ ঢোকে না। তারা যে ঠিক কী চাইছে, বোঝা যাচ্ছে না।

কার একটা লেখায় অর্জুনকুমার পড়েছিলেন, দর্শক হচ্ছে 'হেডলেস মনস্টার'। এতকাল এই 'মস্তকহীন দানব' অযাচিতভাবে তাঁকে দু' হাতে ঢেলে দিয়েছে। এদেরই জন্য তাঁর এত প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি আর গ্ল্যামার। এরাই তাঁকে কুড়ি বছর ধরে 'মেগা স্টার' করে রেখেছে। কিন্তু সেই মনস্টার এখন মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছে। ড্রাগের নেশার মতো এ জাতীয় ছবির ঘোর তার কেটে যাচ্ছে। কীভাবে তাকে খুশি করা যায়, ভেবে পাচ্ছেন না অর্জুনকুমার। তিনি যেমন বিভ্রান্ত, তেমনি বিমূঢ় তাঁর প্রোডিউসার, ডিরেক্টর আর ডিস্ট্রিবিউটাররা।

ছবি না লাগায় প্রোডিউসার এবং ডিস্ট্রিবিউটারদের কয়েক কোটি টাকা স্রেফ জলে চলে গেছে। অর্জুনকুমারের অবশ্য একটা ঘষা পয়সাও ক্ষতি হয়নি। ফি ছবিতে ব্ল্যাক আর হোয়াইট মিলিয়ে চল্লিশ লাখ টাকা করে আগাম পেমেন্ট তিনি ঠিকই পেয়ে গেছেন।

টাকাপয়সার ব্যাপারে না হলেও ক্ষতিটা হয়েছে অন্য দিক থেকে। নিজের ছবি 'সুপার ডুপার' হিট দেখতেই তিনি অভ্যস্ত। দুর্ধর্ষ উল্কার গতিতে তিনি ক্রমশ আকাশ ছুঁতে যাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে একমাত্র 'স্কাই ইজ দা লিমিট'। কিন্তু আচমকা পরপর এতগুলো ধাক্কা তাঁর মধ্যে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটিয়ে দিয়েছে।

দর্শক কারো ছবি পরপর খারিজ করে দিতে চাইলে, স্বাভাবিক নিয়মে তার অভিনয় ছেড়ে দেওয়াই উচিত। জোর করে আঁকড়ে থাকার মানে হয় না। কিন্তু অর্জুনকুমারের মতো তারকা যিনি গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের মাঝখানে রয়েছেন, তাঁর পক্ষে সেখান থেকে সরে যাওয়া অসম্ভব। এ প্রায় বাঘের পিঠে চাপার মতো ব্যাপার; কিছুতেই নামা আর যায় না।

দেশ ও বিদেশের ব্যাঙ্কে স্বনামে এবং বেনামে অঢেল টাকা অর্জুনকুমারের, নানা শহরে ফ্ল্যাট আর বাংলো, মহারাষ্ট্রে ফার্ম হাউস, মানালিতে র‍্যাঞ্চ, ব্যাঙ্গালোরে স্টাড ফার্ম বা ঘোড়া প্রজননের কেন্দ্র, ডজনখানেক ফোরেন লিমুজিন, ইত্যাদি। কয়েকটি বড় কোম্পানির তিনি ডিরেক্টর, কালার টিভি তৈরির নিজস্ব একটা কারখানাও তাঁর আছে। ছবি যদি আর নাও করেন, তাঁর পরের তিরিশ জেনারেশন নবাবী স্টাইলে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে।

কিন্তু গ্ল্যামার নামক অদৃশ্য বাঘটির পিঠ থেকে কিছুতেই নামতে পারেননি অর্জুনকুমার। একের পর এক ছবি ফ্লপ করায় তাঁর মনে হচ্ছিল, মানুষকে জাদু করে রাখার ম্যাজিক তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। মাঝখানে হতাশায়, টেনশনে আর দুশ্চিন্তায় একটা মাঝারি ধরনের হার্ট-অ্যাটাক হয়ে গিয়েছিল অর্জুনকুমারের। খবরটা গোপন রাখা হয়েছে। পারিবারিক ডাক্তার, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং খুব ঘনিষ্ঠ দু-একজন বন্ধু ছাড়া এ ব্যাপারটা আর কেউ জানে না।

হার্ট-অ্যাটাকের ধাক্কা সামলে উঠলেও মানসিক চাপ এবং বিষাদ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না অর্জুনকুমার। কিন্তু কী ধরনের ছবি করলে গ্ল্যামারের সেন্টার স্টেজে এতকালের মর্যাদা নিয়ে টিকে থাকা যায় সেটা কিছুতেই মাথায় আসছিল না। তিনি যখন মানসিক দিক থেকে প্রায় চুরমার হয়ে যাচ্ছেন সেই সময় তাঁর সাংবাদিক বন্ধু রমেশ আদবানি একটা দারুণ পরামর্শ দিয়েছেন।

রমেশ বলেছেন, 'দেখ ভাই, তোমাদের ওই রিভেঞ্জ, ভেনডেটা, ফাইট, রেপ, অ্যাকশন ট্যাকশন আর চলবে না। এনাফ, এনাফ অফ ইট।'

অর্জুনকুমার বলেছেন, 'অ্যাকশনেরই শুধু না, প্রচুর রোমান্টিক ছবিও তো আমি করেছি। দেখ নি?'

'দেখেছি দু-একটা। টোটালি রাবিশ। এই সব ছবিতে যে হীরোর রোলগুলো করেছ তারা কোন দেশের মানুষ, কী তাদের আইডেনটিটি, বুঝতে পারি না। যা পোশাক পরেছ, যে ভাষায় কথা বলেছ, যেভাবে কোমর দুলিয়ে নাচা-গানা চালিয়েছ আর যে টাইপের কাণ্ডকারখানা ঘটিয়েছ—রীয়াল লাইফে এ সব দেখা যায়?'

অর্জুনকুমারের মুখের ওপর এ-জাতীয় কথা বলার দুঃসাহস ফিল্মি দুনিয়ার কোনো মানুষের নেই। প্রোডিউসার, ডিস্ট্রিবিউটার থেকে শুরু করে সামান্য ক্যানটিন বয় পর্যন্ত সবাই তাঁকে দেখামাত্র তটস্থ হয়ে থাকে। কেননা অর্জুনকুমারের নজরে পড়া মানেই কারো ভাগ্য খুলে যাওয়া। কোনো প্রোডিউসারের ছবিতে তাঁর সাইন্ করার অর্থ 'সুপার ডুপার' হিট; কোটি কোটি টাকা। এরকম বিশ্বাস এখনও রয়েছে সবার। অতএব অর্জুনকুমারের বিরুদ্ধে সামান্য একটা আঙুল তোলার স্পর্ধা কারো নেই। তাঁর সমস্ত কথায়, সমস্ত আচরণে এদের শর্তহীন সায়।

কিন্তু রমেশ আদবানি একেবারে আলাদা ধাতের মানুষ। তিনি অর্জুনকুমারের ছেলেবেলার বন্ধু। স্কুল-কলেজে তাঁরা একসঙ্গে পড়াশোনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটিতে আর যাওয়া হয়নি অর্জুনকুমারের। রমেশ অবশ্য গিয়েছিলেন। বরাবরই তিনি দুর্ধর্ষ ছাত্র। ইকনমিকসে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার পর গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ে রিসার্চ করতে বেশ কিছুদিন মধ্যপ্রদেশ আর বিহারের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এখন বোম্বাইয়ের একটা নাম-করা খবরের কাগজের জয়েন্ট এডিটর। বিয়ে-টিয়ে করেননি। লেখা, অর্থনীতি ছাড়াও নানা বিষয়ে পড়াশোনা, সেমিনার এবং দেশবিদেশে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো—এই নিয়ে তাঁর অত্যন্ত দ্রুত গতির জীবন। একটু খ্যাপাটে ধরনের মানুষ। শতকরা একশ' ভাগ সৎ, জেদী, ভয়লেশহীন। বাইরে থেকে সামান্য রুক্ষ মনে হলেও যথেষ্ট হৃদয়বান। কাউকে রেয়াত করেন না। যা সত্যি, সামনাসামনি চাঁছাছোলা ভাষায় বলে দেন। রেখে-ঢেকে, সোনালি তবকে মুড়ে মিথ্যে বলতে তিনি জানেন না।

অর্জুনকুমারের সঙ্গে সম্পর্কটা এখনও অটুট রয়েছে রমেশের। সততা এবং সাহসের জন্য তিনি রমেশকে শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন, আবার একটু ভয়ও পান।

অর্জুনকুমার বলেছেন, 'আমার তো ভাই আনরিয়াল নিয়েই কাজ। আমি হলাম ড্রিম মার্চেন্ট, সপনোকা সওদাগর। অ্যাকশনের ছবিই করি বা রোমান্টিক হিরোর রোলেই নামি, সব কিছুর মধ্যে একটা ড্রিমের ব্যাপার থাকে।' একটু থেমে আবার বলেছেন, 'আমার ছবি তোমার মতো মহা পণ্ডিতদের জন্যে নয়। রিকশাওলা টাঙ্গাওলা পানওলাদের জন্যে আমি স্বপ্ন ম্যানুফ্যাকচার করি।'

রমেশ বলেছেন, 'কিন্তু তোমার তৈরি স্বপ্ন তো রিকশাওলা টাঙ্গাওলারা আর নিচ্ছে না।'

অর্জুনকুমার উত্তর দেননি। রমেশের কথাগুলো রূঢ় হলেও কতটা সত্যি, গত তিন চার বছরের ফ্লপের লিস্ট দেখলেই টের পাওয়া যাবে। আস্তে আস্তে চিন্তাগ্রস্তের মতো তিনি শুধু মাথা নেড়েছেন।

রমেশ বন্ধুকে লক্ষ করতে করতে এবার বলেছেন, 'দর্শক তোমাদের দু'রকম ফর্মুলাই রিজেক্ট করছে। আর্টিস্ট হিসেবে যদি টিকে থাকতে চাও, এখন থেকে অন্য কিছু ভাবো। ফ্রেশ সাবজেক্ট, ফ্রেশ স্টাইল অফ অ্যাক্টিং। পুরোনো 'তরীকায়'য় আর দর্শক ধরে রাখতে পারবে না।'

এই কথাগুলো কিছুদিন ধরে অর্জুনকুমারও ভাবছিলেন। তিনি বলেছেন, 'কী করা যায়? আমি তো কিছুই চিন্তা করে পাচ্ছি না। তুমি নতুন কোনো আইডিয়া দিতে পার?'

রমেশ হেসে ফেলেছেন, 'আমি কি ক্রিয়েটিভ রাইটার যে আমার মাথায় নতুন আইডিয়া খেলবে? তবে তোমাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি।'

'কী?'

'এতকাল যে সব রাবিশ ছবি করছিলে সেগুলো মাথা থেকে বার করে ভারতবর্ষের রুটে চলে যাও। পীপল, অর্থাৎ জনগণের জীবন থেকে সাবজেক্ট তুলে এনে ছবি কর।'

বিমূঢ়ের মতো অর্জুনকুমার বলেছেন, 'পীপল! জনগণ! তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

রমেশ এবার যা বলেছেন তা এইরকম। দেশের নানা প্রান্তে যে কোটি কোটি গরিব, অক্ষরপরিচয়হীন, অখ্যাত মানুষ পড়ে আছে তারাই হচ্ছে সত্যিকারের জনগণ। তাদের বাদ দিলে ভারতবর্ষ বলে কিছু থাকে না। এদের জীবনের অজস্র সমস্যা—সামাজিক, ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক, অর্থনৈতিক। এ ছাড়া রয়েছে হাজার রকমের কুসংস্কার, জাতপাতের প্রবলেম, প্রাদেশিকতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। তৃণমূলে গিয়ে এদের সঙ্গে মিশে, এদের জীবনের বিভিন্ন দিক বেছে নিয়ে তার ওপর ছবি করলে সে সব ছবির মার নেই। এতদিন ঢিসুম ঢিসুম মার্কা মারদাঙ্গা আর রদ্দি আজগুবি প্রেমের ছবির

'মেগা স্টার' হয়ে আছেন অর্জুনকুমার, জনগণকে নিয়ে ছবি করলে তিনি মহান শিল্পী হয়ে উঠতে পারবেন।

কথাগুলো অর্জুনকুমারকে আমূল নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। তিনি জানেন, কিছু একবগ্গা তেজি ফিল্ম-মেকার সাধারণ মানুষের নানা সমস্যা নিয়ে ছবি করে দেশে এবং বিদেশে প্রচুর হইচই ফেলে দিয়েছে। কান, টোকিও, কার্লোভি ভ্যারি, তাসখন্দ, লন্ডন, রোম—এমনকি বহু জায়গার ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে অসংখ্য প্রাইজ ট্রাইজ নিয়ে এসেছে তারা। মেইন স্ট্রিম সিনেমা অর্থাৎ অর্জুনকুমাররা যা করে থাকেন, এরা সেগুলোকে পাত্তাই দেয় না। এই ছবি-করিয়েদের সম্পর্কে খবরের কাগজে পাতার পর পাতা লেখা হয়। টিভিতে এদের ছবি এবং ইন্টারভিউ অনবরত দেখানো হয়। দেশের মানুষ এদের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত।

কিন্তু অর্জুনকুমার এই ফিল্ম-মেকারদের মতো দেশের জনগণকে চেনেন না। জনগণ তাঁর কাছে একটা ঝাপসা আইডিয়া মাত্র। তিনি বিভ্রান্তের মতো বলেছেন, 'পীপল মানেই তো পভার্টি—দারিদ্র। অন্য ব্যাপার-স্যাপার নিশ্চয়ই আছে কিন্তু পভার্টিটাই আসল। এই মেটিরিয়াল দিয়ে ছবি করলে বক্স-অফিসে কি লাগবে?'

তখনও বক্স-অফিসটা মাথার ভেতর আটকে আছে অর্জুনকুমারের। রগড়ের গলায় রমেশ বলেছেন, 'ভারতবর্ষের দারিদ্র আর কুসংস্কারও সেলেবেল কমোডিটি। এর জন্য বিরাট ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট আছে। দু-একটা করেই দেখ না।' একটু ভেবে অর্জুনকুমারের চোখের দিকে তাকিয়ে ফের বলেছেন, 'না না, ওটা মজা করলাম। পীপল নিয়ে সত্যিকারের ইন্ডিয়ান ছবি কর। আমি বলছি, এতে তোমার ভালোই হবে।'

'কিন্তু—'

'কী হল? অসুবিধেটা কোথায়?'

'পীপলকে তো আমি সেভাবে জানি না। ছবি করব কেমন করে?'

'এক কাজ কর, একজন রাইটারকে নিয়ে সোজা সাধারণ মানুষজনের কাছে চলে যাও। তাদের মধ্যে কিছুদিন থাকো। রাইটার ঘুরে ঘুরে, দেখে, তার স্টোরি তৈরি করুক। তুমিও লোকজনের হাঁটা, কাপড় পরার ঢং, কথা বলার স্টাইল—সব লক্ষ করবে। পরে সেগুলো অ্যাক্টিংয়ের সময় কাজে লাগিও। খুব ন্যাচারাল অভিনয় চাই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেছেন অর্জুনকুমার। রমেশ যা বলেছেন তা করলে চমকপ্রদ একটা অভিজ্ঞতা হয়। তাঁর নতুন ছবিতে এই সব অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারলে দারুণ রেজাল্ট পাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু জনগণকে তো তিনি জানেনই না, দূর থেকে ইন্ডিয়ান মাসের আবছা কিছু মুখ তাঁর চোখে পড়েছে মাত্র। বিব্রতভাবে অর্জুনকুমার বলেছেন, 'পীপলের সঙ্গে তো মিশতে বলছ। কিন্তু কীভাবে?'

রমেশ বলেছেন, 'এই শহরের ফুটপাথে, ঝোপড়পট্টিতে, চাওলে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ থাকে।' বলতে বলতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গিয়েছিল তাঁর। কণ্ঠস্বর পাল্টে এবার দ্রুত বলে উঠেছেন, 'না না, এই সিটিতে হবে না। চারদিকে তোমার ছবির পোস্টার, আর হোর্ডিং। সিনেমা হলে তোমার পুরনো হিট ছবি চলছে অন্তত চার পাঁচটা। এখানে হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ের মাল্টিমিলিওনেয়ার থেকে শুরু করে ফুটপাথের ছিঁচকে পকেটমার পর্যন্ত সবাই তোমাকে চেনে। হুট করে যদি কোনো ঝোপড়পট্টি টট্টিতে ঢুকে পড়, ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং—'

উৎসুক চোখে তাকিয়েছেন অর্জুনকুমার, 'কী?'

'অনেক দূরে এমন কোনো গাঁয়ে চলে যাও যেখানে সিনেমা টিনেমা এখনও পৌঁছয়নি। ওখানে মাসখানেক থাকতে পারলে তোমার কাজ হয়ে যাবে।'

'সিনেমা যায়নি, এ রকম ভিলেজ কি ইন্ডিয়াতে আছে?'

'আছে, অনেক আছে। কুড়ি বছর ধরে নায়িকাদের জাপটে ধরে নেচেই গেলে শুধু, আর ঢিসুম ঢিসুম করে ভিলেন ঠ্যাঙালে। দেশের কোনো খবরই রাখলে না।'

রমেশের সূক্ষ্ম বিদ্রূপটা হাসিমুখেই মেনে নেন অর্জুনকুমার। হেসে হেসে বলেন, 'ধরে নিলাম ওই রকম গাঁ অনেক আছে। তুমি তো ইন্ডিয়ার নানা জায়গায় পায়ে হেঁটে ঘুরেছ। তোমার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী দু-একটা ভিলেজের হদিস দাও না।'

'ঠিক আছে, দেখি কী করা যায়। একটা কথা মনে রেখো, গাঁয়ে ফিল্মি হিরোর ড্রেসে হাজির হয়ো না। লোকজন ভড়কে যাবে। খুব সাধারণ জামাকাপড় পরে যেও।'

এই সময় মুনেশ্বর সিং রাজপুতের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় অর্জুনকুমারের। তিনি নর্থ বিহারের বিরাট জমি-মালিক। ল্যান্ডেড অ্যারিস্টোক্রাট বলতে যা বোঝায়, তা-ই। সিনেমা সম্পর্কে তাঁর দারুণ ঝোঁক। হিন্দি ফিল্মে কয়েক বছরে প্রচুর টাকা লাগিয়েছেন। ফিনান্সিয়ার হিসেবে বোম্বাইতে তাঁর প্রচুর খাতির। মুনেশ্বরের টাকায় অর্জুনকুমারের চার পাঁচটা ছবিও তৈরি হয়েছে। সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আলাপ এবং খানিকটা বন্ধুত্বও।

অজ গাঁয়ে থাকার কথা জানাতে মুনেশ্বর তৎক্ষণাৎ কথা দিয়েছিলেন, সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

ঠিক হয়েছিল, নর্থ বিহারের ধরমপুরায় গিয়ে থাকবেন অর্জুনকুমাররা। সেখানে কীভাবে যেতে হবে তার একটা রুট ম্যাপও এঁকে জলবৎ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মুনেশ্বর। অর্জুনকুমার যেদিন ধরমপুরা রেল স্টেশনে পৌঁছুবেন সেদিন তাঁর জন্য সেখানে অপেক্ষা করবেন তিনি। অর্জুনকুমারকে সোজা সেখান থেকে 'আপনা গরিবখানায়' নিয়ে যাবেন। দেশের সব চেয়ে বড় সুপারস্টার কৃপা করে তাঁর বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন, এর চেয়ে সৌভাগ্যের ব্যাপার আর কী হতে পারে।

ব্যবস্থা অনুযায়ী বাইরের কাউকে না জানিয়ে, নিঃশব্দে, রোহিত পাণ্ডে, সঞ্জীব কাউল আর ফারুক কায়সারকে নিয়ে পরশু বোম্বাই থেকে পাটনার ট্রেন ধরেছিলেন অর্জুনকুমার। স্ত্রী রাধিকা এবং দুই ছেলেমেয়ে বিবেক আর বনিতা প্রবল আপত্তি করেছিল। যাঁর একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে তাঁর পক্ষে অজানা গাঁয়ের কষ্টকর পরিবেশে গিয়ে থাকাটা মারাত্মক ঝুঁকির ব্যাপার এবং যথেষ্ট বিপজ্জনকও। কিন্তু কোনো কথাই শোনেননি তিনি।

পাটনা পর্যন্ত এয়ার-কন্ডিশনড কোচে এসেছেন অর্জুনকুমাররা। সেখান থেকে ফার্স্ট ক্লাসে হারবার্টগঞ্জ, হারবার্টগঞ্জ থেকে আজ সকাল ন'টায় এই প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা ধরেছেন। এ লাইনের ট্রেনে এয়ার-কন্ডিশনড বা ফার্স্ট ক্লাস কামরা থাকে না। সেকেন্ড ক্লাস ছাড়া গতি নেই।

পাটনা এবং হারবার্টগঞ্জে গাড়ি বদলানোর সময় প্ল্যাটফর্মের লোকজনের কাছে প্রায় ধরাই পড়ে যাচ্ছিলেন অর্জুনকুমার। উৎসুক চোখে তাঁকে দেখতে দেখতে হয়ত তারা শেষ পর্যন্ত ভেবে থাকবে, মেগা স্টার অর্জুনকুমারের মতো প্রায় এক চেহারার অন্য কেউ তাদের সামনে দিয়ে চলে গেল। আদতে অর্জুনকুমার যে এভাবে ট্রেনে চড়তে পারেন, এটা তাদের কাছে অভাবনীয় ঘটনা।

রেলের টাইমটেবলে যে সময় ছাপা আছে তাতে এই লোকাল ট্রেনটার বিকেল তিনটে নাগাদ ধরমপুরায় পৌঁছুনোর কথা। প্রায় পাঁচটা বাজতে চলেছে। বোঝা যায়, এ লাইনের ট্রেন টাইম টেবলের ধার ধারে না, নিজের মর্জিমাফিক আসে, যায়। আরও ক'ঘণ্টা লেট করে গাড়িটা ধরমপুরায় পৌঁছবে, কে জানে।

এতক্ষণ জানালার বাইরে তাকিয়ে সূর্যাস্ত দেখছিলেন অর্জুনকুমার। ক্রমশ সূর্যটা খুব আস্তে আস্তে পাহাড়ের ওধারে নেমে যাচ্ছে।

দিগন্ত থেকে চোখ নামিয়ে আনেন অর্জুনকুমার। এখন যেখান দিয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা চলেছে তার চারপাশে যতদূর দেখা যায়, ফাঁকা ধূসর মাঠ। অর্জুনকুমার খবর রাখেন না, এ বছর নর্থ বিহারের এই অঞ্চলে প্রচণ্ড খরা গেছে। ফলে সমস্ত জমিজমা ফেটে চৌচির হয়ে আছে। পুরো গরম কালটা উত্তপ্ত লু-বাতাস আগুনের হলকা ছুটিয়ে এখানকার মাঠঘাট গাছপালা, সব কিছু ঝলসে দিয়েছিল। বর্ষায় যা দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছে, কর্কশ মাটিকে চাষবাসের উপযুক্ত করে তোলার পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয়। এটা ঘোর অজন্মার বছর।

শস্যহীন রুক্ষ মাঠে মানুষজন চোখে পড়ে না। অনেক দূরে দূরে অস্পষ্ট দু-একটা গাঁ। অদৃশ্য বাতাস চিরে চিরে পরদেশি শুগার ঝাঁক মাঠের ওপর এলোমেলো উড়ছে।

মাঘ মাস শেষ হয়ে এল। তবু এখনও উত্তুরে হাওয়ায় হিমের লক্ষ কোটি সূক্ষ্ম দানা মিশে আছে। গায়ে লাগলে কাঁটা দেয়। কালো শালটা সারা গায়ে ঘন করে জড়িয়ে নিতে নিতে উড়ন্ত শুগা দেখছিলেন অর্জুনকুমার, হঠাৎ সামনের সিট থেকে রোহিতের গলা ভেসে আসে, 'অর্জুনজি—'

জানালার বাইরে থেকে চোখ ভেতরে নিয়ে আসেন অর্জুনকুমার। রোহিতের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কিছু বলবেন?' তাঁর গলার স্বর গম্ভীর, দানাওলা, তাতে আশ্চর্য মাদকতা মেশানো। হয়তো এটাকে এক ধরনের সেক্স অ্যাপিল বা যৌন আবেদন বলা যেতে পারে। অর্জুনকুমার যে মেগা স্টার তার বড় একটা কারণ এই কণ্ঠস্বর।

চবর চবর করে পান চিবুচ্ছিলেন রোহিত পাণ্ডে। চোখ নাচিয়ে জড়ানো গলায় বলেন, 'হাঁ জি—'

রোহিতের বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন। মাঝারি হাইটের গোলগাল, মাখন-মাখানো, চিকন চেহারা। তবে অর্জুনকুমারের মতো দিনকয়েক শেভ না করায়, চুলে চিরুনি না টানায় এবং লম্বা ট্রেন জার্নির কারণে তাঁর চোখেমুখে একটা কালচে ছোপ পড়েছে। পরনে অর্জুনকুমাবের মতোই সাধারণ পোশাক—ঢোলা পাজামা, পাঞ্জাবির ওপর মোটা খদ্দরের লং কোট। মাথায় কারুকাজ-হীন বেনারসি টুপি।

রোহিত পাণ্ডে হিন্দি ফিল্মের একজন দুর্ধর্ষ স্টোরি আর স্ক্রিন-প্লে রাইটার। এক্কেকটা গল্প এবং চিত্রনাট্যের জন্য তিনি যে দাম পান তা মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো। গত দশ বছরে বোম্বাইয়ের স্টুডিওগুলো থেকে যত অ্যাকশন-মার্কা সুপারহিট ছবি বেরিয়েছে তার কয়েকটা কাহিনি আর সিনারিও জোগান দিয়েছেন রোহিত। তাঁর লেখা এই সব ছবির প্রতিটিতেই অর্জুনকুমার হিরো। তিনি যে আজ মেগা স্টার তার জন্য রোহিতের জমজমাট কাহিনি আর দুর্দান্ত সব ডায়ালোগ অনেকটাই দায়ী। এই কারণে দু'জনের সম্পর্ক অত্যন্ত গাঢ় এবং গভীর। রোহিতের স্টোরি ছাড়া ইদানীং অর্জুনকুমার নতুন কোনো ছবিতে সাইন করেন না।

যে উদ্দেশ্যে অর্জুনকুমার অঢেল আরাম আর গ্ল্যামার পেছনে ফেলে এতদূর ছুটে এসেছেন, অবিকল সেই কারণে রোহিতকেও এখানে আসতে হয়েছে। জনগণকে নিয়ে যে ছবির কথা ভাবা হচ্ছে, তিনি তার গল্প লিখবেন। সাধারণ মানুষজনকে কাছ থেকে না দেখলে তাদের নিয়ে কাহিনি ছকবেন কী করে?

অর্জুনকুমার বলেন, 'চুপ করে গেলেন যে? কী বলবেন, বলুন।'

রোহিতের হাতে কারুকাজ-করা একটা সৌখিন পানের ডিবে রয়েছে। সেটা থেকে পানের খিলি আর লক্ষ্ণৌ-এর খুশবুদার জর্দা বের করে মুখে পুরে দেন। এই বস্তুদু'টি সারাক্ষণই চিবুচ্ছেন। ফলে যতক্ষণ জেগে থাকেন, তাঁর মুখ পানের রসে টই-টম্বুর। পিকটা গেলেনও না, আবার উথলে বেরিয়েও আসতে দেন না, আশ্চর্য কোনো কৌশলে মুখের ভেতরে আটকে রাখেন। অবশ্য মাঝে সাঝে দু-এক ফোঁটা বেরিয়ে এসে পাঞ্জাবির সামনের দিকটা চিত্রবিচিত্র করে ফেলে।

পানের রস যাতে না চলকে পড়ে, সে, জন্য নিচের ঠোঁট সামনের দিকে অনেকটা বাড়িয়ে রোহিত বলেন, 'মাস-কনট্যাক্টটা কেমন লাগছে অর্জুনজি?' বলে চোখের কোণ দিয়ে খানিক দূরে ধুসো কম্বল জড়ানো, মাথায় গামছা-বাঁধা, খই-ওড়া চেহারার দেহাতিদের দেখিয়ে দেন। সেই সঙ্গে চারিদিকের থুতু, কফ এবং আবর্জনাও।

প্যাসেঞ্জার ট্রেনটায় ওঠার পর রোহিত এই সব গেঁয়ো লোকজনকে নিয়ে প্রচুর মজা করেছেন। ধীরে ধীরে এক পলক তাদের দেখে নিয়ে অল্প হাসেন অর্জুনকুমার। বলেন, 'খারাপ কী।'

রোহিত কী বলতে যাচ্ছিলেন, এই সময় বেশ কাছাকাছিই দু'টি মেয়েমানুষ তাদের দুই বাচ্চাকে দাঁড় করিয়ে পেচ্ছাপ করাতে থাকে। পুরনো পেচ্ছাপের গন্ধ তো ছিলই, সেই সঙ্গে নতুন পেচ্ছাপের তীব্র দুর্গন্ধ উল্টোপাল্টা উত্তুরে হাওয়ায় ঝলকে ঝলকে ভেসে আসে।

নাকমুখ কুঁচকে অস্বাভাবিক দ্রুততায় পকেট থেকে রুমাল বার করে নাকে ঠেসে ধরেন রোহিত। বলেন, 'আর এই গন্ধটা?'

পেচ্ছাপের ঝাঁঝালো গন্ধ অর্জুনকুমারের নাকেও ঢুকেছিল। তাঁর পেটের ভেতরটা পাক দিয়ে ওঠে। তবে মুখ দেখে তাঁর প্রতিক্রিয়া বোঝার উপায় নেই। নাকের সামনে রুমাল রেখে সামান্য হাসেন শুধু, কোনো উত্তর দেন না।

হারবার্টগঞ্জে এই কামরাটায় উঠেই ভীষণ অসুস্থ বোধ করেছিলেন অর্জুনকুমার। একবার মনে হয়েছিল, তৎক্ষণাৎ নেমে বোম্বাইতে ফিরে যাবেন। এই নোংরা কম্পার্টমেন্টের জঘন্য দেহাতিরা যদি জনগণের প্রতিনিধি হয়, তা হলে তাদের আর আবিষ্কার করার দরকার নেই। জনগণ জনগণের জায়গায় থাক। তিনি বোম্বাইতে ফিরে ছবির জন্য নতুন ফর্মুলা বার করার চেষ্টা করবেন।

কিন্তু এই চিন্তাটা পরক্ষণে নাকচ করে দিয়েছেন অর্জুনকুমার। ফিরে গেলে যারা ব্যাপারটা জানে, হাসাহাসি করবে। বিশেষ করে রমেশ আদবানি চোখা চোখা বিদ্রূপে তাঁকে পাগল করে ছাড়বেন। তার চেয়েও বড় কথা, মানুষ হিসেবে তিনি মারাত্মক জেদি। কোনো কাজে হাত দিলে তার শেষ না দেখে ছাড়েন না। জনগণের সন্ধানে যাবার যে সিদ্ধান্ত তিনি করেছিলেন সেটাই শেষ পর্যন্ত এই লোকাল ট্রেনে তাঁকে বসিয়ে রেখেছে। কিন্তু কামরার ভেতর এভাবে পেচ্ছাপ করানোর দৃশ্য তাঁর কাছে একেবারেই অভাবনীয়।

রোহিত নাছোড়বান্দা। তিনি বলেন, 'কী হল, জনগণের বাচ্চাদের পেচ্ছাপটা সম্বন্ধে কিছু বলুন। দিস ইজ আ পার্ট অফ দা মাস কনট্যাক্ট!' আসলে বোম্বাইয়ের আরামদায়ক জীবন ছেড়ে গ্রামে অজ্ঞাতবাস করতে আসার ইচ্ছা আদৌ ছিল না তাঁর। অর্জুনকুমার একরকম জোর করেই ধরে এনেছেন। এতে মনে মনে খুবই বিরক্ত রোহিত। হারবার্টগঞ্জে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চড়ার পর থেকে মাঝে মাঝে এভাবেই তাঁর ভেতরকার ঝাঁঝটা বেরিয়ে আসছে।

অর্জুনকুমার এবারও চুপ। আগের মতোই শুধু একটু হাসেন।

রোহিত বলেন, 'ইটস আ হেল—নরক।'

নরকের চিত্রটা সম্পূর্ণ হতে তখনও কিঞ্চিৎ বাকি ছিল। দেহাতি মেয়েপুরুষেরা সবাই টিনের কৌটো থেকে লম্বা লম্বা বিড়ি বার করে ধরিয়ে নেয় এবং ফুঁকতে শুরু করে। পেচ্ছাপের সঙ্গে বিড়ির ধোঁয়ার কড়া গন্ধ মিলে মিশে কামরাময় ভেসে বেড়াতে থাকে।

রোহিতের মুখচোখ হিংস্র হয়ে ওঠে। চাপা গলায় তিনি গজ গজ করতে থাকেন, 'জানোয়ারগুলো কামরাটাকে আইকম্যানের গ্যাস চেম্বার বানিয়ে ফেললে!'

অর্জুনকুমার আগের মতোই জবাব দেন না। বিড়ির ধোঁয়া তাঁর কাছে অসহ্য। বুকের ভেতর চাপা কষ্ট হতে থাকে তাঁর। নিঃশব্দে রুমালটাকে নাকের ওপর জোরে চেপে ধরে ফের জানালার বাইরে তাকান।

বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে দেহাতিগুলোর মাথায় পোকা নড়ে ওঠে। তাদের সঙ্গে যে ঢোলক এবং করতাল টরতাল ছিল তা কে জানত! আচমকা সেগুলো টেনে বার করে চোখের পলকে তারা গানের আসর বসিয়ে দেয়।

'লপটি ঝপটি যাই, শ্যাম সুরনরকে
কর ধরি পাকড়ি মাঙ্গাই
আ, লালাজিকো নারী বনাই
ছিন লিও মূরলী পীতাম্বর,
সিরেসে চুনরি উড়াই...'

প্রথমে দু-একজন আস্তে আস্তে শুরু করেছিল। তারপর স্বর ক্রমশ চড়তে থাকে। এদের সঙ্গে একে একে বাকি মেয়ে-পুরুষেরা গলা মেলায়।

আর যা-ই থাক, কারো গলাতেই সুর বলে বস্তুটি নেই। সমস্তটাই বেতালা বেখাপ্পা কর্কশ চিৎকার। সেই সঙ্গে ঢোলকের বেপরোয়া কান-ফাটানো আওয়াজ, আর করতালের একটানা ঝমর ঝমর।

লোকাল ট্রেনের এই কামরায় হঠাৎ কেন কোরাসে দেহারিরা গান জুড়ে দিল, কে বলবে।

মাঝখানে যে হার্ট-অ্যাটাকটা হয়ে গিয়েছিল, তারপর থেকে অর্জুনকুমারের পক্ষে চড়া আওয়াজ অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাঁর স্নায়ু যেন ছিঁড়ে পড়তে থাকে। বুকের ভেতরকার কষ্টটা হঠাৎ কয়েক গুণ বেড়ে যায়।

এদিকে রোহিত দু'হাতে কান চেপে ধরে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'উই আর ফিনিশড। এতক্ষণ বদবু ছিল, তার সঙ্গে এখন সাউন্ড এফেক্ট জুড়ে দিয়েছে। হারামিরা স্রেফ আমাদের মেরে ফেলে দেবে।' ফিল্ম ওয়ার্ল্ডের এত বড় রাইটার হলেও রোহিতের মুখ ভীষণ আলগা, খিস্তিখেউড় কিছুই আটকায় না তাঁর জিভে।

রোহিত যেখানে বসে আছেন সেই বেঞ্চেই খানিকটা দূরে কোনাকুনি বসেছে ফারুক—ফারুক কায়সার। রোহিতের কথা সে শুনতে পাচ্ছিল না। এই ট্রেনটায় ওঠার পর থেকেই আগাগোড়া পলকহীন অর্জুনকুমারের দিকে তাকিয়ে আছে। ফারুক বুঝতে পারছে, দেহাতিদের গান-বাজনা অর্জুনকুমারকে মারাত্মক অসুস্থ করে ফেলছে। লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে সে তাদের কিছু বলতে যায় কিন্তু তার আগেই হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেন অর্জুনকুমার, ইঙ্গিতে বসতে বলেন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসে পড়তে হয় ফারুককে। কিছুটা উত্তেজিতভাবে সে বলে, 'লেকেন অর্জুনসাব, গাধ্‌ধেগুলো চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে আপনার শরীর খারাপ করে দিচ্ছে। ওদের থামানো দরকার।'

অর্জুনকুমার বলেন, 'আর একটু দ্যাখো।'

ফারুক বলে, 'লেকেন—'

আবার হাত তুলে তাকে থামান অর্জুনকুমার।

অর্জুনকুমারের সহনশীলতা ফারুককে বিচলিত করে তোলে। আসলে সে এখানে জনগণের সন্ধানে আসেনি, এ-ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। অর্জুনকুমারের জন্যই তার এতদূরে ছুটে আসা। তাঁর ভালোমন্দ কিছু একটা হয়ে গেলে সে বিপন্ন হবে যতটা, তার চেয়ে কষ্ট পাবে অনেক বেশি।

ফারুকের বয়স চল্লিশ বেয়াল্লিশ। হাইটও অর্জুনকুমারের মতোই। চাবুকের মতো ধাবাল চেহারা। পরনে জেল্লাহীন ম্যাড়মেড়ে পোশাক। অর্জুনকুমার সম্পর্কে তার উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তা যথেষ্ট আন্তরিক। দু'জনে যদিও প্রায় সমবয়সী তবু ফারুক তাঁকে নিজের আব্বাজানের মতো সম্মান দিয়ে থাকে। কেন না তিনি তার নতুন জন্মদাতা।

ফারুক একসময় ছিল বোম্বাই পোর্টের ছোটখাট স্মাগলার। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে কয়েক বার জেল টেলও খেটেছে। ফলে সে এমনই দাগী হয়ে যায় যে অন্য কেউ চোরাই চালান করলে পুলিশ প্রথমে এসে তাকেই টানাটানি করত। অগত্যা স্মাগলিংয়ের লাইন ছেড়ে না দিয়ে তার উপায় ছিল না।

বোম্বাই পোর্ট থেকে ফারুক চলে আসে ফিল্ম স্টুডিওতে। সেখানে ক্যানটিন 'বয়'-এর কাজ জুটিয়ে নেয়। এই কাজটা করতে করতে এক ফাইট মাস্টারের কাছে মারদাঙ্গার ট্রেনিং নিতে থাকে। ট্রেনিং শেষ হলে ক্যানটিন ছেড়ে এবার হিন্দি ছবির ভিলেনদের হয়ে হীরোদের সঙ্গে ফাইট শুরু করে দেয়। সে তখন ইন্ডাস্ট্রির জুনিয়র আর্টিস্ট।

এই সময় আচমকা এক ফাইট সিকোয়েন্সের দৃশ্যে ফারুক অর্জুনকুমারের নজরে পড়ে যায়। তার চমৎকার স্বাস্থ্য এবং লড়াইয়ের নানা কায়দা এবং কৌশল খুব ভালো লেগেছিল অর্জুনকুমারের। এরপর ফারুককে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। অ্যাকশনের দৃশ্যে তখন থেকে অর্জুনকুমার তাকে নিজের 'ডামি' করে নেন। অর্থাৎ আসলে লড়াইটা করবে ফারুক, কিন্তু দর্শক পর্দায় মুখ দেখবে অর্জুনকুমারের। দু-চারটে ছবি করার পর ফারুককে ফাইট মাস্টার করে দেন তিনি। বোম্বাই ফিল্মে ফাইট মাস্টার হওয়া মানে প্রচুর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, বিশাল ফ্ল্যাট, ফোরেন কার, ইত্যাদি।

ফারুক অকৃতজ্ঞ নয়। সে প্রতিদান দিতে জানে।

সব সফল মানুষেরই শত্রু থাকে। যার যত বেশি সাফল্য তার শত্রু তত প্রবল। অর্জুনকুমারেরও প্রচুর গুপ্ত শত্রু রয়েছে। সেই কারণে সারাক্ষণ সে তাঁকে আগলে আগলে রাখে। যদি কেউ তাঁর ক্ষতি করে দেয়, সেজন্য সকালে জুহুর বাংলো থেকে তিনি যখন বেরোন, ফারুক সঙ্গে সঙ্গে থাকে। রাত্তিরে

তাঁকে বাংলোতে পৌঁছে দেবার পর তার ছুটি। ফারুক তাঁর অতন্দ্র পাহারাদার। যতক্ষণ সে বেঁচে আছে অর্জুনকুমারের গায়ে কেউ আঁচড় কাটতে পারবে না।

ফারুক বলে, 'অর্জুনসাব মেরেকো লিয়ে ফেরেস্তা বরাবর। উনোনে মেরেকো নয়া জনম দিয়া।' ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির লোকজন অবশ্য আড়ালে বলাবলি করে, 'ফারুক মিঞা অর্জুনকুমারের পা-চাটা কুত্তা, হোল টাইম চামচা।' কেউ কেউ বলে, 'অর্জুনকুমারকা ব্ল্যাক ক্যাট। ও শালে মেগা স্টারের চামচাগিরি করে সব বাগিয়ে নিচ্ছে।'

যে যা-ই বলুক, ফারুকের ওপর অর্জুনকুমারের অগাধ বিশ্বাস এবং নির্ভরতা। শুধু তাঁরই না, তাঁর স্ত্রী রাধিকা এবং দুই ছেলেমেয়েরও। এখানে আসার সময় রাধিকা বার বার ফারুককে বলে দিয়েছেন, 'ফারুকভাই, আপনার ভাইসাহেবের দিকে নজর রাখবেন। ও কিন্তু কারো কথা শুনতে চায় না।' ফারুক ভরসা দিয়ে বলেছে, 'চিন্তা করবেন না ভাবীজি। আমি তো সঙ্গে থাকছি।'

এদিকে গানবাজনা আরও উদ্দাম হয়ে উঠেছে। ফারুক খুবই বিচলিত হয়ে পড়ে। ভয়ে ভয়ে ডাকে, 'অর্জুনসাব—'

অর্জুনকুমার মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকান।

ফারুক বলে, 'ওদের গানা-বাজানা বন্ধ করতে বলি?'

ফারুকের মনোভাব বুঝতে পারছিলেন অর্জুনকুমার। বলেন, 'না, থাক। এটা ওদের লাইফ স্টাইল। ডিসটার্ব করার দরকার নেই।' রোহিতের উদ্দেশে বলেন, 'পীপল নিয়ে যে স্টোরিটা লিখবেন তাতে এই গানবাজনার সিনটা ঢুকিয়ে দেওয়া যায় কি না, ভাববেন।' বলে মজা করে হাসেন।

এতক্ষণ একটি কথা বলেননি সঞ্জীব কাউল। রোহিত এবং ফারুকের মাঝখানে চুপচাপ বসে ছিলেন। হঠাৎ তিনি বলে ওঠেন, 'সানি, আমার কী মনে হচ্ছে জানো?'

সানি অর্জুনকুমারের ডাক নাম। মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন এবং স্কুল-কলেজের ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধু-বান্ধব ছাড়া এ নামটা কেউ জানে না।

সঞ্জীব রমেশ আদবানির মতো অর্জুনকুমারের ছেলেবেলার বন্ধু। দিল্লিতে একই রাস্তায় তাঁরা থাকতেন। একসঙ্গে স্কুল এবং কলেজে পড়েছেন। তারপর অর্জুনকুমার যখন বোম্বাইতে এসে ফিল্মকে কেরিয়ার হিসেবে বেছে নেন, তখনই দিল্লি থেকে সঞ্জীবকে নিয়ে আসেন। সঞ্জীব এখন তাঁর সেক্রেটারি, বিজনেস ম্যানেজার এবং ফারুকের মতোই সর্বক্ষণের সঙ্গী।

মাঝারি হাইটের স্বাস্থ্যবান সঞ্জীব সেক্রেটারি হিসেবে অতীব তুখোড়। অর্জুনকুমার যে মেগা স্টার হতে পেরেছেন তার পেছনে রয়েছে সঞ্জীবের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। মিডিয়ার লোকেদের হাতের মুঠোয় পুরে তাদের দিয়ে অর্জুনকুমারের বড় বড় অসংখ্য কালার ছবি ছাপিয়েছেন, যত রকম পাবলিসিটি দেওয়া সম্ভব, নিয়মিত দিয়ে গেছেন।

শুটিংয়ের জন্য প্রোডিউসারদের অর্জুনকুমারের ডেট দেওয়া, তাঁর পেমেন্ট বুঝে নেওয়া, ইনকাম ট্যাক্সের ফাইল ঠিক করে রাখা, অর্জুনকুমারের টাকাপয়সা সঠিক জায়গায় ইনভেস্ট করা, ইত্যাদি সমস্ত কিছুই কম্পিউটারের দক্ষতায় করে থাকেন সঞ্জীব। তাঁকে বাদ দিয়ে একটা পা ফেলার উপায় নেই অর্জুনকুমারের।

অন্য সবার মতোই সঞ্জীবের পরনে ময়লা পোশাক-আশাক। চুস্ত আর পাঞ্জাবির ওপর চাদর জড়ানো।

অর্জুনকুমার উৎসুক চোখে সঞ্জীবের দিকে তাকান। স্বল্পভাষী এই বন্ধুটির যে কোনো মতামতকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। বলেন, 'কী বলছ?'

সঞ্জীব বলেন, 'জনগণের যে কাণ্ডকারখানা দেখতে পাচ্ছি তাতে ধরমপুরায় গিয়ে, বোম্বাইতে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করাই বোধহয় ভালো।'

এখানে আসার ব্যাপারে সঞ্জীব কোনোরকম আপত্তিও করেননি, আবার উৎসাহও দেখাননি। চুপচাপ সব কিছু দেখে আর শুনে গেছেন। অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'এতদূর চলে আসার পর হঠাৎ এ কথা বলছ?'

'কারণ আগে এত কাছে থেকে পীপলকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। এই ক্লাসের লোকজনের সঙ্গে মাসখানেক থাকার যে প্ল্যান করেছ, তাতে রীতিমতো ভয় পাচ্ছি।

অর্জুনকুমার আবহাওয়াটাকে হালকা করে দেবার জন্য বলেন, 'ডোন্ট ওরি। এ সব খুব সামান্য ব্যাপার।

সঞ্জীব বলেন, 'ভুলে যেও না, মাস ছয়েক আগে তোমার কী হয়েছিল। তারপর রিস্ক নেওয়াটা—'

রোহিত শশব্যস্তে বলে ওঠেন, 'এটা আপনার মেগা স্টার বন্ধুকে ভালো করে বোঝান তো সঞ্জীবভাই।'

হেসে হেসে অর্জুনকুমার বলেন, 'রিস্ক যা নেবার তা তো আগেই নিয়ে ফেলেছি। নইলে এলাম কেন?'

সঞ্জীব বলেন, 'তখন কি জানতে ট্রেনের এই ডার্টি কম্পার্টমেন্টে এত বদবু আর এমন হল্লার মধ্যে সময় কাটাতে হবে?'

'তা অবশ্য জানতাম না।' আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে স্বীকার করেন অর্জুনকুমার।

'শুরুতেই এই!' সঞ্জীব বলেন, 'এরপর আরও কত ঝামেলা আর অসুবিধে হবে কে জানে! আরেকটা হার্ট অ্যাটাক বাধানোর সবরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট এখানে রয়েছে।'

'যা-ই থাক, আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি সেটা না করা পর্যন্ত বোম্বাই ফিরছি না। প্লিজ, এ ব্যাপারে আর কোনো কথা নয়।'

অর্জুনকুমারের কণ্ঠস্বরে এমন এক শান্ত গাম্ভীর্য আর দৃঢ়তা রয়েছে যে বাকি তিনজন হকচকিয়ে যান। আর কিছু বলতে তাঁদের সাহস হয় না। নানা বিষয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের মতামত আর বক্তব্য গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে যান অর্জুনকুমার, কিন্তু সিদ্ধান্ত যা নেবার নিজেই নিয়ে থাকেন। সেখান থেকে তাঁকে টলানো অসম্ভব।

লোকাল ট্রেন একের পর এক স্টেশন পেরিয়ে যায়। ক্বচিৎ দু-একটি যাত্রী ওঠে বা নামে।

এদিকে নাগাড়ে অনেকক্ষণ গাইবার পর দেহাতিরা হাঁপিয়ে পড়েছিল। গানবাজনার চড়া আওয়াজ এখন থেমে এসেছে।

অর্জুনকুমার গাইয়ে আর বাজিয়েদের লক্ষ করছিলেন। হঠাৎ তাদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা কী গান গাইছিলেন?'

দেহাতিরা চকিত হয়ে ঘুরে বসে। অর্জুনকুমারকে না চিনলেও তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা যে তাদের তুলনায় অনেক উঁচু স্তরের মানুষ, সেটা বুঝতে কারো অসুবিধা হয়নি। এঁরা যে তাদের সঙ্গে যেচে কথা বলতে পারেন, তা প্রায় অকল্পনীয়।

কেউ তাদের 'আপনি টাপনি' করে বলে না। অর্জুনকুমার যেভাবে তাদের সম্মান দিয়েছেন তাতে তারা যতখানি বিগলিত, ঠিক ততটাই আড়ষ্ট বোধ করে।

প্রাথমিক চমক কেটে যাবার পর মাথায় ঢাউস পাগড়ি-বাঁধা কম্বল-জড়ানো মধ্যবয়সী একটা লোক অর্জুনকুমারকে লক্ষ করতে করতে সসম্ভ্রমে বলে, 'হোলির গান, সরকার।' বোঝা যায়, সে দেহাতিদের গোটা দলটার মুরুব্বি গোছের কেউ হবে।

'হোলি কি এসে গেল?'

'হাঁ, সরকার। পন্দ্র রোজ বাদ হোলিকা তৌহার।'

একটু চিন্তা করে অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'আপনারা কতদূর যাবেন?'

লোকটা বলে, 'বারহৌলি গাঁও। আমরা সেখানে থাকি।'

'সেটা কোথায়? অনেক দূরে?'

'নেহী সরকার।' লোকটা বুঝিয়ে দেয়, সামনের দু'টো স্টেশনের পর তৃতীয় যে স্টেশনটি পড়বে সেটা হল ধমরপুরা। সেখান থেকে বারহৌলি মাইল তিনেকের পথ।

ধরমপুরার নাম শুনেই উৎসুক হয়ে ওঠেন অর্জুনকুমার। জিজ্ঞেস করেন, 'আপনারা কি ধরমপুরাতেই নামবেন?'

'হাঁ, সরকার।'

এদিকে দেহাতিদের সঙ্গে অর্জুনকুমারকে আলাপ জমাতে দেখে চোখ কুঁচকে মজাদার ভঙ্গি করেন রোহিত। ঠোঁটে মিচকে হাসি ফুটিয়ে, শরীরটা খানিক হেলিয়ে, চাপা গলায় সঞ্জীবকে বলেন, 'মেগা স্টারের রিয়াল জন-সংযোগ শুরু হল।'

কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলেন অর্জুনকুমার। দ্রুত মুখ ফিরিয়ে রোহিতের উদ্দেশে একটু হাসেন শুধু। কোনোরকম মন্তব্য না করে ধীরে ধীরে ফের দেহাতিদের দিকে তাকান। বলেন, 'ভালোই হল, আমরাও ধরমপুরা যাচ্ছি।'

রীতিমতো অবাকই হয়ে যায় মুরুব্বি এবং তার দলের বাকি লোকজন। তবে কী উদ্দেশ্যে অর্জুনকুমাররা ধরমপুরা চলেছেন সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করতে কারো সাহস হয় না।

অর্জুনকুমার এবার জিজ্ঞেস করেন, 'রাজপুত মুনেশ্বর সিংকে আপনারা চেনেন?'

নামটা শোনামাত্র মুরুব্বি এবং দলের প্রতিটি মেয়ে-পুরুষের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। যে দু-একজন খুব আস্তে এখন ঢোলক বাজিয়ে যাচ্ছে তাদের আঙুল মুহূর্তে থেমে যায়। মুরুব্বি বলে, 'মুনেশ্বরজি বহোত বড়ো আদমি। এত্তে বড়ে জমি-মালিক দুনিয়ামে আউর কোঈ নেহী হ্যায়।'

লোকটার দুনিয়া খুব সম্ভব ধরমপুরা, বারহৌলি এবং তার চারপাশে বিশ পঞ্চাশ মাইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর মুনেশ্বর সিং ছাড়া অন্য কোনো বড় জমিজমাওলা লোকও সে হয়তো দেখেনি। বেশ কৌতুকই বোধ করেন অর্জুনকুমার। বলেন, 'কত জমি আছে মুনেশ্বরজির?'

মুরুব্বি যে তথ্যটি জানায় তা মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো। ধরমপুরা থেকে পরের স্টেশন পরাবি পর্যন্ত মাইল পাঁচেক জুড়ে যত জমিজিরেত তার সবটাই মুনেশ্বর সিংয়ের খাস তালুক। তাঁর এলাকাতেই মুরুব্বিদের বারহৌলি গাঁ।

অর্জুনকুমার শুনেছেন, মুনেশ্বর সিং ল্যান্ডেড অ্যারিস্টোক্র্যাট। কিন্তু ভারতের মতো গরিব থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে তিনি পাঁচ মাইল জায়গা দখল করে আছেন, এটা ভাবা যায়নি।

মুরুব্বি এবার ভয়ে ভয়ে, অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বলে, 'সরকার যদি গুস্‌সা না করেন, একটা কথা বলব--'

অর্জুনকুমার ব্যস্তভাবে বলেন, 'নিশ্চয়ই বলবেন। গুস্‌সা করব কেন?'

'মুনেশ্বরজির সঙ্গে আপনাদের জান-পয়চান আছে?'

উত্তর দিতে গিয়ে সতর্ক হয়ে যান অর্জুনকুমার। যদি বলেন মুনেশ্বরের সঙ্গে পরিচয়ই শুধু না, তাঁরা তাঁর অতিথি হয়ে এখানে কিছুদিন থাকবেন, তা হলে লোকটার কৌতূহল মারাত্মক বেড়ে যাবে। তাঁরা কারা, কোত্থেকে কেন এই সৃষ্টিছাড়া দেহাতে এসেছেন, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন এরপর তার পক্ষে করে বসা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে আসার উদ্দেশ্য ঘুণাক্ষরে অচেনা কাউকে জানাতে চান না অর্জুনকুমার। কোনোরকম হইচই না বাধিয়ে খুব আলগোছে এ-অঞ্চলের মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করবেন তিনি। তারপর নতুন ছবির জন্য 'মেটিরিয়াল' জোগাড় করে নিঃশব্দে বোম্বাই ফিরে যাবেন।

অর্জুনকুমার বলেন, 'তেমন কিছু নয়, একবার আলাপ হয়েছিল। এই আর কী।'

সাদাসিধে সরল মানুষ হলেও মুরুব্বি লোকটা অর্জুনকুমারের কথাটা কতখানি বিশ্বাস করে, কে জানে। তবে সে আর কিছু জানতে চায় না।

এতক্ষণ লক্ষ করেননি অর্জুনকুমার, এবার তাঁর চোখে পড়ে, দেহাতিদের প্রচুর লটবহর কামরার চারিদিকে ডাঁই হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। টিনের বাক্স, চটের থলেতে ময়লা জামাকাপড়, ছেঁড়া কাঁথা, বালিশ, পুরনো ছেঁড়া কম্বল, লোহার চুলা, কেরোসিনের বোতল, লণ্ঠন, সিলভারের হাঁড়িকুড়ি, বর্তন ইত্যাদি হাজার রকমের মালপত্র। বড় বাক্সগুলো সিটের তলায় ঢোকানো।

অর্জুনকুমার বলেন, 'আপনারা দূরে কোথাও গিয়েছিলেন?'

'হাঁ, সরকার।' মুরুব্বি মাথা নেড়ে জানায়, আপাতত তারা হারবার্টগঞ্জ টাউন থেকে গাঁয়ে ফিরছে। ধরমপুরা বারহৌলি অঞ্চলে রাজপুত মুনেশ্বর সিংয়ের জমিতে তারা পুরুষানুক্রমে চাষবাস করে থাকে। কিন্তু এ বছর মারাত্মক খরায় চারিদিক জ্বলে যাওয়ায় এক দানা ধানও রোয়া যায়নি। চাষ নেই

তো রোজগারও বন্ধ। কামাই না করলে বালবাচ্চাসুদ্ধ ভুখা মরতে হবে। বড় ঠিকাদার চৌধারিলাল সহায় হারবার্টগঞ্জের ওদিকে লম্বা হাই-ওয়ে বানাচ্ছে। সেখানে মজুরের কাজ নিয়ে সেই জেঠ মাহিনায় অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসে চলে গিয়েছিল। আট মাস বাদে তারা যে গাঁয়ে ফিরে আসছে তার কারণ দু'টো—প্রথমটা হল, পনেরো দিন পর এ অঞ্চলের সব চেয়ে বড় তৌহার হোলি। হোলির সময়টা তারা গাঁয়ে কাটাতে চায়। দ্বিতীয় কারণটাও সামান্য নয়। হোলির পার্বণ কেটে গেলে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেবে।

কথা বলতে বলতে নিজের দলটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে পাঁচ সাত বছরের ছ'টা ছেলেমেয়েকে দেখিয়ে দেয় মুরুব্বি, ওই লছমির সঙ্গে রামনৌসেরার, দুখিয়ার সঙ্গে ভোলেনাথের আর ঝুরিয়ার সঙ্গে গণপতের শাদি হবে।'

অর্জুনকুমার চমকে ওঠেন, 'এই ছোটো বাচ্চাদের শাদি দেবেন আপনারা!'

অর্জুনকুমারকে অবাক হতে দেখে মজাই লাগে মুরুব্বির। সে হেসে হেসে, হাত নেড়ে বলতে থাকে, 'এরা তো বড়ে বড়ে বচ্চে। ছে, আট মাহিনা উমরের (ছ, আট মাস বয়সের) ছৌঁরা ছৌরীর (ছেলেমেয়ে) শাদি হয়ে যাচ্ছে কত!'

বলে কী লোকটা! এ কোন ভারতবর্ষে এসে পড়েছেন তাঁরা! সুদূর গ্রামের দিকে কিশোর কিশোরীদের বিয়ের কথা তিনি শুনেছেন, খবরের কাগজে এ জাতীয় দু-একটা ঘটনার রিপোর্টও তাঁর চোখে পড়েছে। কিন্তু যে ভারতবর্ষ আর ক'টা বছর বাদেই একুশ শতকে পা রাখবে, যে ভারতবর্ষ মহাকাশে রকেট পাঠাচ্ছে, সুপার কম্পিউটার আর ইলেকট্রনিকসের যুগে পৌঁছে গেছে সেখানে দুধের শিশুদের বিয়ে হয়, এমন বিস্ময়কর ব্যাপার আগে আর কখনও শোনেননি।

উলটো দিকের সিটে রোহিত, সঞ্জীব এবং ফারুকও একেবারে থ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ রোহিত ইংরেজিতে বলে ওঠেন, 'ইজ ইট ইন্ডিয়া!'

এই কথাটা কিছুক্ষণ আগেই ভেবেছেন অর্জুনকুমার। আস্তে মাথা নেড়ে বলেন, 'দিস ইজ ইন্ডিয়া।'

'বাস্টার্ডগুলোকে জেলে পোরা উচিত। ওদের বলে দিন, হাইলি বে-কানুনি কাজ করছে।' রোহিতকে ভীষণ উত্তেজিত দেখায়।

রোহিতের কথা না বুঝলেও তাঁর মুখচোখের উগ্র চেহারা দেখে ঘাবড়ে যায় মুরুব্বি এবং অন্য দেহাতিরা। মুরুব্বি ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কা হুয়া, ওহী সাবকা এত্তে গুস্সা হো গিয়া কায় (কেন)?'

'না না, ও কিছু নয়।' মুরুব্বিকে আশ্বস্ত করে অর্জুনকুমার রোহিতকে বলেন, 'আমরা কানুনের পাহারাদার হয়ে এখানে আসিনি। উই হ্যাভ কাম ওভার হীয়ার টু ডিসকভার ইন্ডিয়ান পীপল। এভাবে যদি নানা ব্যাপারে রি-অ্যাক্ট করতে থাকেন, আসল কাজটা কিন্তু গোলমাল হয়ে যাবে।'

রোহিত লজ্জা পেয়ে যান। বুঝতে পারেন, এভাবে উত্তেজিত হওয়াটা ঠিক নয়। মুখ নামিয়ে তিনি চুপচাপ বিব্রতভাবে বসে থাকেন।

বিয়ের ব্যাপারেই যে অর্জুনকুমারদের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়েছে, তা আন্দাজ করে মুরুব্বি বলে, 'সরকার, আমাদের মধ্যে বচ্চে বচ্চে ছৌরা-ছৌরীদের শাদির নিয়ম চালু আছে।' খানিক দূরে কপাল পর্যন্ত ঘোমটা-টানা মধ্যবয়সী এক দেহাতিনীকে দেখিয়ে বলে, 'ওহী হামনিকা ঘরবালী। আমার উমর যখন সাত সাল আর ওর উমর তিন মাহিনা, মায়ের কোলে শুয়ে দুধ খায়—তখন আমাদের শাদি হয়েছিল।'

অর্জুনকুমার মুরুব্বি এবং তার ঘরবালীকে পর্যায়ক্রমে দেখতে দেকতে সাত বছরের দুলহার সঙ্গে তিন মাসের দুলহনের বিয়ের সময়কার একটি কাল্পনিক ছবি ভাবতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তেমন কোনো দৃশ্য চোখের সামনে ফুটে ওঠে না।

হঠাৎ দেহাতিদের ভেতর থেকে একজন বলে ওঠে, 'ধরমপুরা আ গিয়া।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই দেহাতিদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তারা দ্রুত উঠে মালপত্র টানতে টানতে ওধারে দরজার দিকে নিয়ে যেতে থাকে।

কথায় কথায় অর্জুনকুমার খেয়াল করেননি, দেহাতিদের সঙ্গে আলাপ হবার পর কখন যেন মাঝের দু'টো স্টেশন পেরিয়ে এসেছেন। ট্রেনের স্পিড এখন কমে এসেছে। আধখানা বৃত্তের আকারে সেটা বিরাট বাঁক ঘুরে বিশাল সরীসৃপের মতো এগিয়ে চলেছে। জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দূরে একটা স্টেশন দেখতে পান তিনি। দলের লোকজনেরা উঠে গেলেও মুরুব্বি বসেই ছিল। সে অর্জুনকুমারকে বলে, 'নমস্তে সরকার। টিশন (স্টেশন) এসে গেল। আমাকে সামান গুছিয়ে নিতে হবে। উঠছি।'

মুখ ফিরিয়ে অর্জুনকুমার বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আচ্ছা, নমস্তে—' বলে ফারুকের দিকে তাকান, 'আমাদেরও নামতে হবে। লাগেজ দরজার কাছে এগিয়ে রাখলে তাড়াতাড়ি নামাতে সুবিধে হবে।'

ফারুক চটপট উঠে পড়ে। তাদের সঙ্গেও প্রচুর মালপত্র। স্যুটকেশ, বাস্কেট, নানা ধরনের ব্যাগ, ওয়াটার বটল, হট কেস, ফ্লাস্ক ইত্যাদি টানাটানি করে দরজার পাশে নিয়ে রাখতে থাকে সে। সঞ্জীব এবং রোহিতও তার সঙ্গে হাত মেলান।

দুই

লোকাল ট্রেনটা যখন ধরমপুরা স্টেশনে ঢুকছে, সেই সময় কামরায় দরজা খুলে এক হাতে হ্যান্ডেল ধরে চারিদিকে তাকাতে থাকেন অর্জুনকুমার। একটানা বিরক্তিকর ট্রেন জার্নির পর এখন তাঁদের সবচেয়ে যাঁকে বেশি প্রয়োজন তিনি মুনেশ্বর সিং। অর্জুনকুমারদের নিয়ে যাবার জন্য তাঁর এখানে অপেক্ষা করার কথা।

ধরমপুরা হাওড়া, ভিটি বা মাদ্রাজ সেন্ট্রাল নয়। রেলওয়ে টাইমটেবলের এক কোণে অখ্যাত, নগণ্য এই স্টেশন ক্ষুদে ক্ষুদে টাইপে কোনোরকমে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

সেভাবে জাহির করার মতো কিছুই নেই ধরমপুরায়। ধুধু মাঠের মধ্যিখানে লাল ইটের লম্বাটে বড়সড় একটা ঘর। সেটাই একসঙ্গে খুব সম্ভব স্টেশন মাস্টারের কেবিন এবং টিকেট কাউন্টার। পেছন দিকে অ্যাসবেস্টসের ছাউনি-দেওয়া ছোটো ছোটো তিনটে স্টাফ কোয়ার্টার।

প্ল্যাটফর্ম বলতে বিশেষ কিছু নেই। মাটি ফেলে রেল লাইনের দু' পাশে খানিকটা জায়গা উঁচু করে রাখা হয়েছে। বিনা টিকিটের প্যাসেঞ্জাররা যাতে চোখে ধুলো ছিটিয়ে পালাতে না পারে, সে জন্য প্লাটফর্মের ধার বরাবর একটা কাঁটাতারের মজবুত বেড়া লাগানো হয়েছিল। কাঁটাতার কবেই লোপাট হয়ে গেছে। ঘুণে-ধরা কাঠের ক'টা খুঁটি ভারতীয় রেলওয়েজের মহৎ সংকল্পের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

এই অতি তুচ্ছ স্টেশন এবং তার চারপাশের দৃশ্যাবলি সম্পর্কে এই মুহূর্তে আদৌ কোনো আগ্রহ নেই অর্জুনকুমারের। তিনি উৎসুক চোখে একটি পরিচিত মুখকেই শুধু খুঁজছেন।

প্ল্যাটফর্মে ভিড় টিড় নেই। এধারে ওধারে কিছু লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। এক কোণে ছেঁড়া চট আর পুরোনো তেরপলের ছাউনির তলায় 'চায়কা দুকান'। সেখানে ছোটোখাটো একটা জটলা। কিন্তু কোথাও মুনেশ্বর সিং রাজপুতকে দেখা যাচ্ছে না।

পেছন থেকে সঞ্জীব জিজ্ঞেস করেন, 'মুনেশ্বরজিকে দেখতে পাচ্ছ?'

'কই না।' প্ল্যাটফর্মের দিকে চোখ রেখে আস্তে সাড়া দেন অর্জুনকুমার।

'উনি কি স্টেশনে আসার কথা ভুলে গেলেন?' এবার রোহিতের গলা শোনা যায়।

অর্জুনকুমার বলেন, 'কী জানি, বুঝতে পারছি না।' তাঁর কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা ফুটে বেরোয়।

এদিকে ট্রেনটা জোরে শ্বাস টানার মতো আওয়াজ করতে করতে প্ল্যাটফর্মের গায়ে থেমে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের উলটোদিকের দরজাগুলো দিয়ে মুরুব্বি আর তার সাঙ্গোপাঙ্গ যে যার মালপত্র কাঁধে এবং মাথায় চাপিয়ে ঝপাঝপ নেমে পলকে উধাও হয়ে যায়।

অর্জুনকুমার কী করবেন যখন ভাবছেন সেই সময় হঠাৎ দেখা যায় উঁচুনিচু প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে হট্টাকট্টা চেহারার তিনটে লোক প্রতিটি কামরায় মুখ বাড়িয়ে শশব্যস্তে 'বোম্বাইসে মুনেশ্বরজিকা কোঈ মেহমান আয়া?' বলতে বলতে ছুটে আসছে। পেছনে এক মধ্যবয়সী, একটি তরুণী এবং কালো কোট-পরা রেলের একজন কর্মচারী।

অর্জুনকুমার বুঝতে পারেন, এরা তাঁদেরই খোঁজাখুঁজি করছে। ট্রেন থেকে দ্রুত নেমে বলেন, 'এই যে আমরা।'

ততক্ষণে মধ্যবয়সী তরুণী এবং রেলের লোকটিকে নিয়ে কাছে চলে এসেছেন। তাঁর বয়স পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন। সম্ভ্রান্ত, জবরদস্ত চেহারা। চমৎকার পেটানো স্বাস্থ্য। মাথায় ছোটো ছোটো করে ছাঁটা কাঁচাপাকা চুল, পেছন দিকে মোটা টিকির আগায় ফুল বাঁধা। কটা চোখ। চোয়াল এবং থুতনির শক্ত গঠন, মোমে-মাজা পাকানো গোঁফ এবং অসমান দাঁতের পাটি বুঝিয়ে দেয়, এই মানুষটির মধ্যে অনেকখানি নিষ্ঠুরতা লুকনো রয়েছে। খাপ থেকে একটানে ছুরি বার করে আনার মতো পলকে সেটা বেরিয়ে আসতে পারে।

তার পরনে দামি ধুতি আর সার্জের পাঞ্জাবির ওপর নকশা-পাড় শাল, পায়ে মোটা চামড়ার চকচকে পাম্প শু। দুই হাতের সাত আঙুলে নীলা হীরে গোমেদ পান্না ইত্যাদি পাথর বসানো সাতটা আংটি।

দেখামাত্র টের পাওয়া যায় লোকটি যেমন নির্মম তেমনি ধুরন্ধর।

নিভুলভাবেই তিনি অর্জুনকুমারকে শনাক্ত করতে পারেন। হাতজোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে, বশংবদ ভঙ্গিতে বলেন, 'আপ জরুর অর্জুনকুমারজি হোঙ্গে। নমস্তে—'

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে অর্জুনকুমার বলেন, 'হ্যাঁ। আপনি?'

'আমার নাম জগনাথ মিশ্র। আমি মুনেশ্বরজির লোকাল ম্যানেজার। আপনাকে একলা দেখছি, আরও তিনজনের তো আসার কথা ছিল। তাঁরা আসেননি?'

'এসেছেন। কম্পার্টমেন্টে আছেন।' বলে খোলা দরজা দিয়ে ফারুকদের দেখিয়ে দেন অর্জুনকুমার। তারপর বলেন, 'কিন্তু—'

অর্জুনকুমার এবার মুনেশ্বর সিং সম্পর্কেই যে জানতে চাইবেন তা বুঝতে পেরে সবিনয়ে জগনাথ বলেন, 'পরে কথা হবে। আগে বাকি সবাই নেমে আসুন, আপনাদের লাগেজ নামানো হোক।' সেই হট্টাকট্টা লোক তিনটেকে ভারিক্কি গলায় হুকুমের ভঙ্গিতে বলেন, 'কামরা থেকে সাহেবদের সামান বার করে এনে ঘোড়ার গাড়িতে নিয়ে যা।' রেলের লোকটিকে প্রায় একই সুরে বলেন, 'মাস্টার, তোমাদের ড্রাইভারকে গিয়ে বলে এসো, মুনেশ্বরজির মেহমানদের লাগেজ না নামানো পর্যন্ত ট্রেন যেন না ছেড়ে দেয়।'

'জি—' বলেই ধরমপুরার স্টেশন মাস্টার ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্রেনের ইঞ্জিনের দিকে দৌড় লাগায়।

জগনাথ মিশ্র এবং মুনেশ্বর সিংয়ের এ অঞ্চলে যে প্রচণ্ড দাপট, মুহূর্তে তা টের পাওয়া গেল। ইন্ডিয়ান রেলওয়েজের কর্মচারী হয়েও যেভাবে স্টেশন মাস্টার জগনাথের হুকুমমতো গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখতে ছুটল তাতে মনে হয়, এখানকার সবাই তাঁদের খাস তালুকের প্রজা।

রোহিতরা নেমে পড়েছিলেন। সেই লোক তিনটে অর্জুনকুমারদের সুটকেস টুটকেস নামিয়ে কাঁধে চাপিয়ে বা হাতে ঝুলিয়ে দূরে গেটের দিকে এগিয়ে যায়। তারপর ট্রেনটা ছাড়া পেয়ে ঝকঝক করতে করতে সামনের আরেকটা বাঁক ঘুরে খাড়া উত্তর দিকে ছুটতে থাকে।

জগনাথ এবার বলেন, 'মুনেশ্বরজির স্টেশনে এসে আপনাদের নিয়ে যাবার কথা ছিল কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আসতে পারেননি। মেহমানদারির দায়িত্বটা উনি আমাকেই দিয়েছেন। আসতে না পারার জন্যে ক্ষমা চেয়ে আপনাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন। এই যে—' বলতে বলতে পকেট থেকে একটা সাদা খাম বার করে অর্জুনকুমারকে দেন।

খাম খুলে দ্রুত মুনেশ্বর সিংয়ের চিঠিটা পড়ে ফেলেন অর্জুনকুমার। মুনেশ্বর লিখেছেন, বোম্বাইতে অর্জুনকুমারের সঙ্গে কথা হওয়ার পর তিনি সোজা পাটনায় চলে এসেছিলেন। দিনকয়েক আগে তাঁর

বুকের বাঁ দিকে অসহ্য যন্ত্রণা হতে থাকায় ডাক্তাররা তাঁকে জোর করে নার্সিং হোমে ভর্তি করে দিয়েছেন। সেই কারণে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে তাঁর পক্ষে অর্জুনকুমারের মতো বিশ্ববিখ্যাত 'মেগা স্টার'-এর 'সেবা' করা সম্ভব হল না। মেহমানদারির ভারটা অতএব ধরমপুরা অঞ্চলে তাঁর স্থানীয় ম্যানেজার জগনাথ মিশ্রকে দিতে হয়েছে। এজন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। জগনাথ অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তুখোড় এবং হুঁশিয়ার মানুষ। তিনি নিজে থাকলে যা হত, তার চেয়ে অনেক সুচারুভাবেই 'অতিথি সেবা' করতে পারবেন জগনাথ। যে উদ্দেশ্যে অর্জুনকুমার এতদূরে ছুটে এসেছেন, সে ব্যাপারেও তাঁর কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাবে।

মুনেশ্বর আরও জানিয়েছেন, একটু সুস্থ হলেই তিনি ধরমপুরায় এসে অর্জুনকুমারের সঙ্গে দেখা করবেন।

পড়া হয়ে গেলে চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে জগনাথের দিকে তাকান অর্জুনকুমার। মুনেশ্বর স্টেশনে না আসায় যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল সেটা কেটে গেছে। মানসিক চাপ থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। কিন্তু মুনেশ্বরের জন্য বেশ উদ্বেগই হতে থাকে তাঁর। বলেন, 'মুনেশ্বরজি বুকের পেইনের কথা লিখেছেন। সিরিয়াস কিছু নাকি?' হার্ট-অ্যাটাকের কথাটাই তাঁর মনে হয়েছিল, সেটা অবশ্য আর বললেন না।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছিলেন জগনাথ। এক পলক অর্জুনকুমারকে লক্ষ করে বলেন, 'নেহী, স্ট্রোক হয়নি। তবে হার্টে কিছু গড়বড় ধরা পড়েছে। দো-চার রোজের ভেতর সব ঠিক হয়ে যাবে।' হিন্দির সঙ্গে কিছু কিছু ইংরেজি জুড়ে কথা বলেন জগনাথ। তাঁর বলার ভঙ্গিতে স্থানীয় দেহাতি টান মেশানো।

একটু থেমে ফের শুরু করেন জগনাথ, 'আপনার ফ্রেন্ডদের সঙ্গে কিন্তু এখনও আমার পরিচয় হয়নি।'

অর্জুনকুমার ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, 'ও, তাই তো।' তিনি রোহিতদের সঙ্গে জগনাথের আলাপ করিয়ে দেন।

জগনাথ এবার বলেন, 'অব্ চলিয়ে। বোম্বাই থেকে ট্রেন জার্নি করতে করতে আসছেন। বহুত থকা গিয়া—বিলকুল টায়ার্ড। এখন আপনাদের পুরা রেস্ট দরকার।' বলে সামনের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় তাঁর। খানিক দূরে সেই তরুণীটি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে কাছে ডেকে বলেন, 'ওঁর কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। এ হচ্ছে আমার মেয়ে রেণুকা। আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে স্টেশনে চলে এসেছে।' মেয়ের দিকে ফিরে বলেন, 'অর্জুনজিকে নিশ্চয়ই নতুন করে চিনিয়ে দিতে হবে না। একটু আগে রোহিতজি সঞ্জীবজি আর ফারুক সাহেবের কথাও শুনেছিস।'

পরিচয় করিয়ে দেবার পর জগনাথ বলেন, 'রেণু পাটনার একটা কলেজে পড়ায় আর গরিব আনপড় আদমিদের জন্যে হিতকারী কী সব কাজ করে। ওরা বলে সোশাল ওয়ার্ক।' বলে মৃদু হাসেন। তাঁর চোখেমুখে আর বলার ভঙ্গিতে মেয়ে সম্পর্কে গর্বের ছাপ ফুটে বেরোয়।

রেণুকাকে সেভাবে আগে লক্ষ করেননি অর্জুনকুমাররা। দুর্দান্ত সুন্দরী বলতে যা বোঝায় রেণুকা ঠিক তা নন। কিন্তু তাঁর শাণিত চেহারার মধ্যে ছুরির ফলার মতো একটা ব্যাপার আছে যা মানুষকে ভেতরে ভেতরে চকিত করে তোলে। বয়স সাতাশ আটাশের বেশি হবে না। তরতরে ডিম্বাকৃতি মুখ, সটান মেদশূন্য শরীর, কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা ঈষৎ রুক্ষ চুল, ধারাল চিবুক, কিছুটা পুরু ঠোঁট, পাকা গমের মতো মসৃণ গায়ের রং, পুরু লেন্সের ওধারে দূরভেদী চোখ—সব কিছুর মধ্যে মিশে আছে বুদ্ধির ঝলক আর প্রখর ব্যক্তিত্ব। তাঁর পোশাক টোশাকে ছিমছাম রুচির ছাপ। শাড়িটি হালকা রঙের শিফন, ব্লাউজও একই কাপড়ের। বাঁ হাতে স্টিল ব্যান্ডে চৌকো ইলেকট্রনিক ঘড়ি। গয়নাটয়না কিছুই নেই। পায়ে বিনুনি-করা চামড়ার সাদা লেডিস স্লিপার।

ফিল্মি দুনিয়ায় প্রচুর গ্ল্যামার কুইন এবং স্বপ্নসুন্দরী দেখেছেন অর্জুনকুমার কিন্তু এমন ঝকঝকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তরুণী আগে আর দেখেছেন কি না মনে করতে পারেন না। পৃথিবীর হট্টগোল থেকে বহু দূরে ধুধু মাঠের মাঝখানে এই সৃষ্টিছাড়া স্টেশনে রেণুকার মতো একটি মেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে, বোম্বাইতে ট্রেনে চড়ার সময় কে তা ভাবতে পেরেছে!

অর্জুনকুমার যেখানেই যান, ঝাঁকে ঝাঁকে যুবতীরা তাঁকে ছেঁকে ধরে। পারলে কামড়ে খিমচে তাঁকে ছিঁড়ে ফেলে। তাদের চোখমুখ নিয়ে রমণের সময়কার উল্লাসের মতো কিছু ফেটে বেরোয়। গলার ভেতর থেকে চাপা শীৎকারের মতো আওয়াজ উঠে আসতে থাকে। তাঁর কাছে যে মেয়েরা ছুটে আসে তারা শতকরা একশ' ভাগই সেক্স-স্টার্ভড। তাঁকে ঘিরে প্রায় সারাক্ষণই হিস্টিরিয়ার ঘোর আর যৌনক্ষুধাতুর কুন্তীদের উন্মত্ত কার্নিভাল। কিন্তু রেণুকা এই সব মেয়েদের থেকে একেবারে আলাদা। সিনেমা ওয়ার্ল্ডের একমাত্র 'মেগা স্টার'কে তিন ফিট দূরত্বে পেয়েও তাঁর মধ্যে কোনোরকম মাতামাতি বা খ্যাপামি নেই।

রেণুকা বলেন, 'কষ্ট করে এখানে এসেছেন, তাই আপনাকে দেখার সুযোগ হল।' তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত, উচ্ছ্বাসহীন। বলার ভঙ্গি অত্যন্ত মার্জিত।

অর্জুনকুমার কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই রেণুকা ফের বলে ওঠেন, 'অবশ্য আপনার দু-একটা ফিল্ম আমি দেখেছি।'

তাঁর ছবিগুলো রেণুকার কেমন লেগেছে জানার জন্য হঠাৎ ভীষণ আগ্রহ বোধ করেন অর্জুনকুমার। যেন এই মেয়েটির ভালোমন্দ বলার ওপর তাঁর অনেক কিছু নির্ভর করছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে গিয়ে সঙ্কোচ বোধ করেন। বলেন, 'তাই বুঝি? এ তো আমার সৌভাগ্য।'

ছবিগুলো সম্পর্কে কোনোরকম মন্তব্য না করে রেণুকা বলেন, 'আপনার সঙ্গে একটা বিষয়ে আমি আলোচনা করতে চাই। শুনেছি আপনারা কিছুদিন এখানে থাকবেন। অনুগ্রহ করে একদিন আমাকে খানিকটা সময় দিতে হবে। ঘণ্টাখানেকের বেশি নেবো না।'

এই অত্যন্ত সুশিক্ষিতা, প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী তরুণীটি তাঁর সঙ্গে কোন ব্যাপারে কথা বলতে চান? প্রচণ্ড কৌতূহল সত্ত্বেও নিজেকে সংযত রাখেন অর্জুনকুমার। বলেন, 'নিশ্চয়ই। এক ঘণ্টা কেন, আপনার যতক্ষণ ইচ্ছে আলোচনা করবেন।'

'ধন্যবাদ। চলুন এবার যাওয়া যাক।'

সবাই প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে স্টেশনের গেটের দিকে এগিয়ে যায়।

এধারে ওধারে এবং চায়ের দোকানে যা দু-চারজন রয়েছে তারা তটস্থ ভাবে অর্জুনকুমারের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্টেশন মাস্টার ট্রেনের ইঞ্জিনটাকে বাড়তি কয়েক মিনিট আটকে রাখার পর ফিরে এসেছিল। সে সকলের পেছনে হাঁটতে থাকে।

অর্জুনকুমারের পাশাপাশি হাঁটছিলেন রোহিত। তাঁর কানের কাছে মুখ এনে চাপা রগড়ের গলায় বলেন, 'এতক্ষণে একটা রিয়াল হিরোইনের দেখা পাওয়া গেছে। এমন গড-ফরসেকেন জায়গায় অ্যায়সা ছোকরি রয়েছে, কে ভাবতে পেরেছিল! দিলমে স্রিফ বিজলি চমক গিয়া। মেগা স্টারজি, আপনার এখানকার অজ্ঞাতবাস আর আলুনি মনে হবে না।' মুখে সূক্ষ্ম, সুচতুর হাসি ফুটিয়ে রোহিত চোখ টেপেন।

রোহিতের ঠাট্টা রসিকতা ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর সঙ্গে সবসময় সেক্সের আঁশটে গন্ধ মেশানো থাকে। এগুলো যে অর্জুনকুমারের খারাপ লাগে তা নয়, বরং রীতিমতো মজাই পান। তিনি শুকদেব নন। যেখানে গ্ল্যামার কুইনরা তাঁকে দেখামাত্র গায়ের সঙ্গে সেঁটে যায় সেখানে অটল ব্রহ্মচারী হয়ে থাকা অসম্ভব। বেশ কয়েকজন নায়িকার সঙ্গে তাঁকে জড়িয়ে রঙিন ফিল্মি ম্যাগাজিনগুলো উপাদেয় স্ক্যান্ডাল ছেপে বছরের পর বছর সার্কুলেশন বাড়িয়ে চলেছে। এই চটকদার কেচ্ছাগুলোর সবটাই ম্যাগাজিনগুলোর নিজস্ব কারখানায় বানানো, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু রেণুকা সম্পর্কে রোহিতের এ জাতীয় তামাশায় খুবই বিরক্ত হন অর্জুনকুমার এবং অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। রোহিত সেক্সের রগরগে মশলা মিশিয়ে হেসে হেসে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, চকিতে তাঁর দিকে ঘুরে তাকান অর্জুনকুমার। তাঁর চোখে এমন কিছু রয়েছে যাতে চমকে ওঠেন রোহিত, তাঁর মুখ থেকে হাসিটা মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। ঠান্ডা, নিচু গলায় অর্জুনকুমার বলেন, 'এই প্রথম রেণুকাজিকে দেখলাম। আমার যেটুকু মনে হয়েছে, এই ইয়াং লেডি অন্যরকম মেটিরিয়ালে

তৈরি। আমরা এতদিন যে ছোকরিদের দেখেছি, তাদের সঙ্গে এর মিল নেই। নতুন জায়গায় এসেছেন। বী কেয়ারফুল।'

স্টেশনের নড়বড়ে জং-ধরা লোহার গেট পেরিয়ে বাইরে বেরুলেই কাচ্চী বা কাঁচা সড়ক। সেখানে পর পর তিনটে মাথা-খোলা ঝকঝকে ল্যান্ডো দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি গাড়ির সঙ্গে দুটো করে তেজী স্বাস্থ্যবান ঘোড়া জোতা। ঘোড়াগুলোর পা থেকে তেল চুঁইয়ে পড়ছে যেন। তাদের গায়ে পেতলের ঝকমকে সাজ। কোচোয়ানের সিটের পাশে উঁচু স্ট্যান্ডে চমৎকার বাতিদান।

নাইনটিন সেঞ্চুরির কলকাতার বাবুদের নিয়ে বছর দশেক আগে তৈরি একটা ছবিতে কাজ করেছিলেন অর্জুনকুমার। তখনও এই সময়ের মতো এত বেশি ভায়োলেন্স, সেক্সের ফিল্ম হ'ত না। মারদাঙ্গা ভেনডেটার ছবির পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন ভালো সামাজিক ছবিটবিও যথেষ্টই দেখা যেত।

উনিশ শতকের কলকাতাব ব্যাকগ্রাউন্ডে তৈরি সেই ছবিটা ছিল পিরিয়ড পিস। তাতে যে বাবুটির রোলে অর্জুনকুমার অভিনয় করেছিলেন তাকে এইরকম ঘোড়ায়-টানা ল্যান্ডোতে চড়তে হয়েছিল। এ জাতীয় গাড়ি ইদানীং অ্যান্টিক হয়ে গেছে। সিনেমার শুটিংয়ের সময় ক্বচিৎ কখনও দেখা যায়।

ল্যান্ডো যে এখনও ভারতবর্ষের এক প্রান্তে চালু আছে, এখানে না এলে কোনোদিনই জানা যেত না।

রোহিত বলে ওঠেন, 'কোন সেঞ্চুরিতে এসে পড়লাম অর্জুনজি?'

তাঁর কথায় সবাই হেসে ওঠেন।

রেণুকা বলেন, 'এখানে এইটিনথ আর নাইনটিনথ সেঞ্চুরির অনেক কিছুই পাবেন। মনে হবে, জায়গাটা দেড় দু'শ বছর আগের কোনো একটা সময়ে থেমে আছে।'

জগনাথ বলেন, 'আইয়ে, গাড়িতে ওঠা যাক।'

প্রতিটি গাড়িতে চারজনের বসাব ব্যবস্থা। প্রথম গাড়িটায় উঠে বসেন অর্জুনকুমার, রেণুকা আর জগনাথ। তার পরেরটায় রোহিত সঞ্জীব এবং ফারুক। তৃতীয় ল্যান্ডোতে মুনেশ্বরদের তিন নৌকর অর্জুনকুমারদের মালপত্র তুলে দিয়েছিল। তাদের সিটে বসার হুকুম নেই। তারা পেছনের স্ট্যান্ডে আর দু'ধারের পাদানিতে দাঁড়িয়ে যাবে। তিনটে গাড়িতেই ধবধবে উর্দি আর পাগড়ি-পরা তিন কোচোয়ান শিরদাঁড়া টান টান করে বসে আছে।

গাড়িতে বসেই জগনাথ কোচোয়ানকে বলেন, 'হাঁকাও—'

তিন ল্যান্ডো ছুটতে শুরু করে। মেটে রাস্তা হলেও বেশ মসৃণ, কোথাও বেখাপ্পা উঁচুনিচু নয়। ছয় ঘোড়ার চব্বিশটি পায়ের একটানা সতেজ আওয়াজ চারিদিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে।

রাস্তার ধারে চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে স্টেশন মাস্টার। ঘোড়ার গাড়িগুলো খানিকটা দূরে চলে গেলে ধীরে ধীরে সে স্টেশনের ভেতর ফিরে যায়।

এদিকে হুড-খোলা ল্যান্ডো থেকে চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন অর্জুনকুমার। ট্রেনের কামরা থেকে যা যা তাঁর চোখে পড়েছিল, এখানেও সেই একই দৃশ্যাবলী। আদিগন্ত শস্যহীন মাঠ। মানুষজন প্রায় নেই বললেই হয়। কাচ্চীতে ক্বচিৎ দু-একটি ভৈসা বা বয়েল গাড়ি চাকায় ক্যাঁচোর কোঁচর শব্দ করতে করতে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

উত্তুরে হাওয়ার তেজ আরও বেড়েছে। সাঁই সাঁই করে ধুধু ফসলের জমির ওপর দিয়ে সেটা উলটোপালটা ছুটে চলেছে। মাটির লক্ষ কোটি ছিদ্র দিয়ে উঠে আসছে পাতালের হিম।

সূর্যটাকে এখন আর দেখা যায় না। কালচে মলমলের মতো মিহি অন্ধকার সমস্ত চরাচরকে মুড়ে দিতে শুরু করেছে।

কিছুক্ষণ মাঠ টাঠ দেখার পর জগনাথের দিকে তাকান অর্জুনকুমার। জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা জগনাথজি, আমাদের সম্পর্কে মুনেশ্বরজির সঙ্গে আপনার কোনো কথা হয়েছে?'

জগনাথ বলেন, 'অনেক কথাই হয়েছে। আপনি কোন ব্যাপারটা জানতে চান বলুন।'

'আমরা এখানে কেন এসেছি, উনি আপনাকে জানিয়েছেন?'

'হাঁ। দেহাতিদের সঙ্গে মেলামেশা করবেন তো?'

আস্তে মাথা হেলিয়ে অর্জুনকুমার বলেন, 'যাতে ভালো করে মিশতে পারি, কথা বলতে পারি, তার ব্যবস্থা করেছেন?'

জগনাথ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলেন, 'কতগুলো জানবরের সঙ্গে আপনার মতো এত্তে বিগ স্টার কথা বলবেন তার জন্যে আবার আগে থেকে ব্যওস্থা করতে হবে নাকি! টিটরা পিটিয়ে লাথ মারতে মারতে শালেদের আপনার কাছে হাজির করে দেবো। আপনাকে চোখে দেখতে পেলে ওদের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে।'

এ-অঞ্চলের সাধারণ মানুষজন সম্পর্কে জগনাথের মনোভাবটা কী, মুহূর্তে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। একটা সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে চমকে ওঠেন অর্জুনকুমার, 'আমার কথা কাউকে জানিয়ে দিয়েছেন নাকি!'

নিজেকে সামলে নেন জগনাথ। বলেন, 'নেহী নেহী, এখনও কিছু জানাইনি। লেকিন আপ এত্তে বড়ে ফিলিম স্টার—'

জগনাথকে থামিয়ে দিয়ে শঙ্কিত মুখে অর্জুনকুমার বলেন, 'মুনেশ্বরজিকে বলে দিয়েছিলাম, আমার পরিচয় যেন গোপন রাখা হয়। জানাজানি হলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। তিনি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু জানাননি?'

'আমাকে একটা চিঠি লিখে আচ্ছাসে মেহমানদারি করতে হুকুম দিয়েছেন। আর লিখেছেন আপনি দেহাতিদের সঙ্গে কথা বললেন। এর বেশি আর তো কিছু লেখেননি।'

'দেখুন, আমি এখানে গোপনে থাকতে চাই। আর কাউকে আমাব কাছে আনার দরকাব নেই। আমি আর আমার বন্ধুরা যাতে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে পারি, এটুকু হলেই হবে।'

'ঠিক আছে, আপনি যেমন বলছেন তা-ই হবে।' বলতে বলতে থেমে যান জগনাথ। খানিক ভেবে নিয়ে বলেন, 'লেকিন অর্জুনজি, এর ভেতর থোড়াকুছ সমস্যা যে থেকে যাচ্ছে।'

জগনাথের চোখের দিকে তাকিয়ে চিন্তিতভাবে অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'কিসের সমস্যা?'

'গাঁওবালারা কেউ যদি আপনাকে চিনে ফেলে?'

'মুনেশ্বরজি বলেছিলেন এখানে সিনেমা টিনেমা আসেনি। তা হলে চিনবে কী করে?'

'আজকাল অনেকেই টাউনে যায়। তাদের কেউ যদি সেখানে আপনার ফিলিম দেখে থাকে?'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকান অর্জুনকুমার। বলেন, 'কোযাইট পসিবল। কিন্তু কী আর করা যাবে? এত দূর যখন এসেই পড়েছি, রিস্ক একটা নিতেই হবে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত।'

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় জগনাথ এবার গলার স্বর খানিকটা তুলে বলে ওঠেন, 'আরে, একটা ব্যাপার বিলকুল ভুলে গিয়েছিলাম। এবার হোলিতে এই পয়লা এখানে সিনেমা আসছে। শুনছি আপনার ফিলিম দেখানো হবে।'

অর্জুনকুমার বলেন, 'সিনেমা আসছে মানে?'

জগনাথ বুঝিয়ে দেন, ভ্রাম্যমাণ 'বায়োস্কোপ'ওলারা এখানে তাঁবু খাটিয়ে ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করবে। অর্জুনকুমারের ফিল্ম দিয়েই শুরু হবে এখানকার সিনেমা আর এমনই যোগাযোগ, স্বয়ং ফিল্মি দুনিয়ার পয়লা নম্বর স্টার এখন এখানে উপস্থিত থাকবেন। সেদিক থেকে ধরমপুরা অঞ্চলে এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা।

জগনাথ বলেন, 'সিনেমা দেখানো শুরু হলে আপনাকে কিন্তু সবাই বাতারাতি চিনে ফেলবে।'

অর্জুনকুমার ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট দমে যান। বলেন, 'ইট'স আ রিয়াল প্রবলেম। আচ্ছা—'

'বলুন।'

'ফিল্ম দেখানো শুরু হবে ঠিক কবে থেকে?'

'হোলির দিন সন্ধে থেকে।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে অর্জুনকুমার বলেন, 'তার আগেই কাজ সেরে আমাদের ফিরে যেতে হবে।'

এরপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। নির্জন ফসলের মাঠে একটানা অশ্বক্ষুরের শব্দ ছাড়া সমস্ত চরাচর জুড়ে আর কোনো আওয়াজ নেই।

একসময় স্বয়ংক্রিয় কোনো নিয়মে অর্জুনকুমারের চোখ এসে পড়ে রেণুকার ওপর। চার ফিট দূরত্বে তাঁর মতো মেগা স্টার বসে আছেন অথচ মেয়েটির কোনোরকম চাঞ্চল্য নেই। নিরাসক্ত মুখে রেণুকা দূরে ঝাপসা দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছেন।

রেণুকার সঙ্গে কথা বলার জন্য কে যেন ভেতরে ভেতরে অনবরত অর্জুনকুমারকে উসকে দিতে থাকে। কিন্তু যেচে শুরু করাটা ঠিক হবে কি না, বুঝে উঠতে পারেন না। তিনি যে মেগা স্টার, তাঁকে কাছে পেলে সবাই যে গদগদ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং হিস্টিরিয়ার ঘোরে অনবরত স্তুতি করে যায়—এই ব্যাপারগুলো কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না অর্জুনকুমার। শেষ পর্যন্ত দ্বিধা কাটিয়ে ডেকেই ফেলেন, 'রেণুকাজি—'

রেণুকা আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে তাকান।

অল্প হেসে অর্জুনকুমার বলেন, 'স্টেশনে তো ভালো করে আলাপই হল না।'

রেণুকাও সামান্য হাসেন, উত্তর দেন না।

অর্জুনকুমার বলেন, 'জগনাথজি তখন বলছিলেন, পাটনার একটা কলেজে আপনি পড়ান।'

রেণুকা বলেন, 'হ্যাঁ। পাটনা উইমেন্স কলেজে।'

'ওখানেই তো থাকতে হয়।'

'হ্যাঁ, কলেজ হোস্টেলে থাকি। লম্বা ছুটি পড়লে বাড়িতে ফিরে আসি।'

হঠাৎ কিছু মনে পড়তে অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'আপনাদের কলেজে হোলির ছুটি কি পড়ে গেছে?' তিনি কার কাছে যেন শুনেছিলেন সারা উত্তর ভারতে, বিশেষ করে এই এলাকায় হোলির সময় স্কুল কলেজ কিছুদিন বন্ধ থাকে।

অর্জুনকুমারের ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছিলেন রেণুকা। বলেন, 'না না, হোলির এখনও পনেরো দিন বাকি। ছুটি পড়তে দেরি আছে। আমাকে জরুরি একটা কাজে এখানে আসতে হয়েছে।'

এতক্ষণ চুপচাপ দু'জনের কথা শুনে যাচ্ছিলেন জগনাথ। হঠাৎ বলে ওঠেন, 'তখন বলছিলাম না, কলেজে পড়ানো ছাড়াও রেণু বহুত সোশাল ওয়ার্ক করে থাকে। সেই ব্যাপারে হোলির ছোটির আগে পরে কয়েকদিন জুড়ে এক মাহিনার ছুটি নিয়ে এসেছে।'

রেণুকা সম্পর্কে অর্জুনকুমারের ঔৎসুক্য হঠাৎ অনেক গুণ বেড়ে যায়। তিনি সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'কী ধরনের সোশাল ওয়ার্ক করতে এসেছেন রেণুকাজি?'

জগনাথ ভারিক্কি চালে হাত নাড়তে নাড়তে রেণুকার 'সমাজ সেবা' সম্পর্কে যা বলেন, এক কথায় তার নাম হুজুগ। কম বয়সে যখন প্রাণে অফুরন্ত উৎসাহ থাকে তখন নানারকম বাতিক চাড়া দিয়ে ওঠে। এটাও হুবহু তাই।

অর্জুনকুমারের মাথায় সমস্ত কিছু গুলিয়ে যায়। বিমূঢ়ের মতো বলেন, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। আসলে কাজটা কী?'

এবার রেণুকা যা বলেন তা এইরকম। তাঁদের এই ধরমপুরা অঞ্চলে চাইল্ড ম্যারেজ বা শিশু-বিবাহের হার খুবই বেশি। কিশোর-কিশারীদের তো বটেই, আবহমান কাল ধরে তিন চার বছরের ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে ছ'আট মাসের বাচ্চাদেরও আকছার বিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

বছরের অন্য সময়ে বিয়ে তো হয়ই, কিন্তু হোলির কয়েক দিন আগে থেকে দিন কয়েক পর পর্যন্ত হল আসল মরশুম। কিন্তু বাল্য-বিবাহটা ভীষণ খারাপ সিস্টেম। অল্প বয়সে বিয়ের ফলে খুব তাড়াতাড়ি এরা মা-বাপ হয়ে যাচ্ছে। এদের সন্তান কোনোক্রমেই সবল বা স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠতে পারে না। ভারতবর্ষকে এদের উপহার অগুনতি পঙ্গু, অসুস্থ, রুগ্‌ণ শিশু। অশক্ত, স্বাস্থ্যহীন মানুষ কি সুখী, সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তুলতে পারে? কখনোই না। এই কুপ্রথা যত দ্রুত সম্ভব বন্ধ করা দরকার।

রেণুকা বলেন, 'এই জঘন্য সিস্টেমের বিরুদ্ধে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে আন্দোলন করার জন্যে আমি ছুটি পড়ার আগেই এসেছি। আমার বন্ধুরা দু-চারদিনের মধ্যেই এসে পড়বে।' উদ্দীপনায় তাঁর চোখমুখ ঝকমক করতে থাকে।

অর্জুনকুমার চমকে ওঠেন। কিছুক্ষণ আগে যে দেহাতিরা তাঁদের সঙ্গে ধরমপুরায় নেমেছে তারাও তো বাচ্চাদের বিয়ে দেবার জন্য হারবার্টগঞ্জ থেকে চলে এসেছে। রেণুকা যখন গ্রামে গ্রামে ঘোরার কথা বলছেন তখন বারহৌলিতে গিয়ে নিশ্চয়ই এদের বাচ্চাদের বিয়ে আটকাবার চেষ্টা করবেন।

স্বপ্নবৎ গ্ল্যামারের চূড়ায় বসে থাকতে থাকতে কোনোদিন কি দেশের কথা ভেবেছেন অর্জুনকুমার? মানুষ হিসেবে তাঁর কোনো সামাজিক 'কমিটমেন্ট' থাকতে পারে, এসব চিন্তা তাঁর হাজার মাইলের ভেতর কখনো আসেনি। অথচ আগামী ভারতবর্ষ পঙ্গু হয়ে যাবে বলে রেণুকা ছুটে এসেছেন এখানে। এমন মেয়ে আগে আর কখনও দেখেননি অর্জুনকুমার। রেণুকা সম্পর্কে শ্রদ্ধা বিস্ময় এবং সম্ভ্রম মেশানো এক ধরনের আবেগ তাঁকে যেন আলোড়িত করতে থাকে। বলেন, 'আপনার অ্যাজিটেশন কবে শুরু হচ্ছে?'

রেণুকা বলেন, 'দু-একদিনের মধ্যে। কেন বলুন তো?'

'আন্দোলনটা দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছে।'

জগনাথ ওধার থেকে ব্যস্তভাবে বলে ওঠেন, 'নেহী নেহী অর্জুনজি, ওই সব রদ্দি হুজুগে আপনি যাবেন না। আপনার মতো এত্তে বড়ে আদমির এভাবে টাইম নষ্ট করার মানে হয় না। বিলকুল মিনিংলেস।'

অর্জুনকুমার হেসে হেসে বলেন, 'চাইল্ড ম্যারেজ আগে কখনও দেখিনি। চান্স যখন একটা পেয়ে গেছি, দেখাই যাক না। নতুন ধরনের এক্সপিরিয়েন্স তো হবে।'

অর্জুনকুমারের মতো মেগা স্টার এমন অতি তুচ্ছ বিষয়ে এতটা উৎসাহ দেখাবেন, ভাবা যায় না। জগনাথ যে আদৌ খুশি হন না, সেটা তাঁর মুখ দেখলে টের পাওয়া যেত। ঈষৎ গম্ভীর গলায় বলেন, 'ঠিক হ্যায়, আপহিকা মর্জি।'

অর্জুনকুমার রেণুকা সম্পর্কে যতটা আগ্রহী, তাঁর বাবুজি সম্বন্ধে তার সিকি ভাগও নন। জগনাথের দিকে না তাকিয়ে রেণুকাকে বলেন, 'অ্যাজিটেশনের খবরটা যেন আগেই পাই।'

রেণুকা বলেন, 'আচ্ছা।'

চারিদিক আরো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার গাঢ় হতে শুরু করেছে। গোটা আকাশ এই সন্ধেবেলাতেই তারায় তারায় ছয়লাপ।

এতক্ষণ দু-ধারে মাইলের পর মাইল মাঠ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনি। ল্যান্ডোটা কখন যে ফাঁকা টুটোফাটা শস্যক্ষেত্র পেছনে ফেলে গ্রামের ভেতর ঢুকে পড়েছে, অর্জুনকুমারের খেয়াল ছিল না।

গ্রাম আর কী, ছাড়া ছাড়া ভাবে খড় বা টালির চালের ঘরবাড়ি কোনোরকমে কোমর খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি ঘরে এখন লণ্ঠন জ্বলে উঠেছে। দূর থেকে সেগুলোকে জোনাকির মতো দেখায়। লোকজনও বেশ চোখে পড়ছে। স্পষ্টভাবে নয়, ছায়াবাজির খেলার মতো তাদের চলাফেরা, হাত-পা নাড়া। তাদের টুকরো-টাকরা কথাও দমকা বাতাসে ভেসে আসছে। বাড়িঘরের ফাঁকে ফাঁকে ঝোপঝাড়, মজা নহর, নহরের ওপর বাঁশের সাঁকো, এবং কী আশ্চর্য, সাঁকোর বাঁশে এই অন্ধকারেও দু-একটা মাছরাঙা চোখ টান করে জলের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। যদি মাছ টাছ দেখা যায়, সেই আশায়। এমন আশাবাদী, একগুঁয়ে পাখি আর হয় না।

জগনাথ বলেন, 'এই গাঁ-টার নাম ধুরুয়া।'

অর্জুনকুমার অন্যমনস্কর মতো উত্তর দেন, 'ও।'

ধুরুয়ার পর ফের টানা মাঠ, তারপর বেশ ক'টি গ্রাম পেরিয়ে আবার দু'ধারে ফাঁকা মাঠ। ডান দিকের মাঠটায় সাত-আটটা মশাল আর হ্যাজাক জ্বলছে। সেই আলোতে দেখা যায়, কাঠ এবং বাঁশের

প্রকাণ্ড ফ্রেম খাড়া করে একটা প্যান্ডেল তৈরির ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রচুর মানুষজন ঠুকঠাক আওয়াজ করে কী সব করছে।

অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'এখানে কী হচ্ছে?'

জগনাথ বলেন, 'আপনাকে সিনেমার কথা বলেছিলাম না? তার জন্যে তাঁবু বানাচ্ছে ওরা।'

তাঁবু তৈরির জায়গা এবং তারপর আরও দু-একটা গাঁ পেছনে ফেলে খানিকটা যাবার পর রাস্তাটা সমতল মাঠ থেকে ক্রমশ ওপরে উঠতে থাকে। দূরে আবছামতো বড় টিলা দেখা যায়। সেখানে দুর্গের মতো বিশাল একটা বাড়ি আলোয় ঝলমল করছে। আঠারো উনিশ শতকে ইংল্যান্ডের গ্রামাঞ্চলে অভিজাত নাইট বা ব্যারনদের এই রকম ক্যাসলের ছবি শুধু পুরনো বইয়ের পাতায় দেখা যায়।

অর্জুনকুমার অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন। নর্থ বিহারের এই সৃষ্টিছাড়া এলাকায় ইংল্যান্ডের একটি প্রাচীন ক্যাসল ছবির বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসে কীভাবে জাঁকিয়ে বসল, কে জানে। জিজ্ঞেস করেন, 'ওটা কিসের বাড়ি?'

জগনাথ বলেন, 'মুনেশ্বরজির কোঠি—'রাজপুত নিকেত'। গাঁয়ে এলে তিনি এখানে থাকেন। এখন আপনারা থাকবেন।'

এমন একটা মধ্যযুগীয় ক্যাসলে থাকার কথা ভাবলে রোমাঞ্চ হয়। অর্জুনকুমার বলেন, 'বাঃ ফাইন। একটা নতুন ধরনের এক্সপিরিয়েন্স হবে। আচ্ছা, বাড়িটা কতদিন আগে তৈরি হয়েছিল?'

এবার উত্তরটা দেন রেণুকা, 'প্রায় একশ বছর আগে।'

'তার মানে, নাইনটিনথ সেঞ্চুরির শেষের দিকে। এত দূরে এই গ্রামের ভেতর এরকম ব্রিটিশ আর্কিটেকচারের কথা কে ভেবেছিলেন?'

আস্তে মাথা নেড়ে, রেণুকা যা জানান তা এইরকম। রাজপুত মুনেশ্বর সিংয়ের ঠাকুরদা এবং বাবা দু'জনেই ছিলেন ঘোর ব্রিটিশভক্ত। ইংরেজের এমন খয়ের খাঁ সে আমলে খুব বেশি ছিল না। প্রভুভক্তির বখশিসও তাঁরা নগদ নগদ পেয়েছেন। দু'জনেরই 'রায় বাহাদুর' খেতাব জুটেছিল। 'আংরেজিয়ানা' ছাড়া তাঁরা অন্য কিছু বুঝতে চাইতেন না। সারাক্ষণ 'আংরেজি বোলি, আংরেজি চাল, আংরেজি রাহান সাহান।'

ইংরেজের স্মৃতি বংশ পরম্পরায় অক্ষয় করে রাখার জন্য একশ বছর আগে মুনেশ্বর সিংয়ের ঠাকুরদা চন্দ্রেশ্বর সিং মধ্যযুগের ব্রিটিশ জমিদারদের ক্যাসলের মডেলে ওই বাড়িটা তৈরি করাতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু শেষ হওয়ার আগে তাঁর মৃত্যু হয়। বাকি কাজটা অতীব নিষ্ঠায় সম্পূর্ণ করেন তস্য পুত্র মহেশ্বর সিং। ইংরেজ জমিদাররা ছিলেন তাঁদের কাছে 'আইডল'। মুনেশ্বর অবশ্য মুখে 'ব্রিটিশ ব্রিটিশ' করেন না, কেননা জমানা বদলে গেছে। তবে বাপ-দাদার মতো তিনিও ইংরেজদের প্রচণ্ড অনুরাগী। পূর্বপুরুষের পুরোনো চাল তিনি এতটুকু বদলাননি। লোকে পবিত্র স্মৃতিসৌধ যেভাবে সযত্নে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে, অবিকল সেইভাবেই এই বাড়িটাকে রেখেছেন মুনেশ্বর।

রেণুকা বলেন, 'অর্জুনজি, ওখানে পা দিলেই বুঝতে পারবেন হঠাৎ কোনো ম্যাজিকে ব্রিটিশ আমলে ঢুকে পড়েছেন। আসলে ব্যাপারটা কী জানেন—'

রেণুকার বলার ভঙ্গিটি এমন চমৎকার যে অর্জুনকুমারের কৌতূহল ক্রমশ বেড়েই যায়। গভীর আগ্রহে তিনি বলেন, 'কী?'

'স্বাধীন একটা কান্ট্রিতে এরকম পরাধীন মানুষ আর দ্বিতীয়টি দেখতে পাবেন না। তেতাল্লিশ বছর আগে যে কলোনিয়াল মাস্টাররা এ দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, মুনেশ্বর সিংয়ের কাছে এখনও তারা অলমাইটি ভগবান।'

রেণুকার পাশে বসে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলেন জগনাথ, বিব্রতভাবে তিনি বলেন, 'অ্যায়সা মাত কহো রেণু। ভুলে যেও না, মুনেশ্বরজির দয়ায় আমরা বেঁচে আছি। তোমাকে যে ভালো খাইয়ে, ভালো পরিয়ে, ফেমাস স্কুল-কলেজে পড়িয়ে মানুষ করতে পেরেছি—মুনেশ্বরজি পেছনে না দাঁড়ালে এ সব কিছুই হত না। মুনেশ্বরজি 'দেওতা য্যায়সা' আদমি।'

অর্জুনকুমার হকচকিয়ে যান। মুনেশ্বর সিং সম্পর্কে রেণুকা এবং জগনাথের ধারণা একেবারেই আলাদা। রেণুকা যেভাবে জগনাথের সামনে তাঁর মনিব সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করলেন তাতে তাঁর ভেতরকার চরিত্রটি পরিষ্কার হয়ে যায়। এমন দৃঢ়, তেজী এবং সম্ভবত আপসহীন মহিলা আগে আর দেখেননি অর্জুনকুমার।

উত্তেজনাশূন্য কঠিন গলায় রেণুকা বলেন, 'দেওতা সমান কাকে বলছ বাবুজি! মুনেশ্বরজি আমাদের দয়া করেছেন! কিন্তু তুমি তাঁর জন্যে কী করেছ, কখনও ভেবে দেখেছ!'

জগনাথের অস্বাচ্ছন্দ্য আরও বেড়ে যায়। তিনি এবার জানান, কেউ উপকার করলে তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে নেই।

রেণুকার শান্ত মুখমণ্ডলে চকিতের জন্য তীব্র অসন্তোষ ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়। ধারাল ফলার মতো শরীরের ফ্রেমটিতে কাঠিন্য নেমে আসে। গলার স্বর এতটুকু উঁচুতে না তুলে তিনি বলেন, 'এই কথাটা আগে অনেকবার বলেছ। কিন্তু বাবুজি, মুনেশ্বরজি আমাদের জন্যে যা করেছেন, কৃতজ্ঞতা হিসেবে তুমি তার হাজার গুণ ফিরিয়ে দিয়েছ। লোকটা তোমাকে কোন লেভেলে নামিয়ে দিয়েছে, একবার ভেবে দেখেছ?'

জবরদস্ত চেহারার জগনাথ একেবারে মিইয়ে যান। তো তো করে কিছু বলতে চেষ্টা করেন কিন্তু তা আদৌ বোধগম্য হয় না।

মুনেশ্বরকে নিয়ে মেয়ে এবং বাপের মধ্যে যে অনেক দিন ধরে ঠান্ডা লড়াই চলছে সেটা টের পেতে অসুবিধা হয় না অর্জুনকুমারের। কিন্তু আজই প্রথম তিনি ধরমপুরা এসেছেন। মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে জগনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছে। এরই ভেতর মুনেশ্বরকে ঘিরে তাঁরই সামনে রেণুকা আর জগনাথের মধ্যে যে অস্বস্তিকর কথাবার্তা চলছে তা কোনোভাবেই কাম্য নয়। আবহাওয়া ক্রমশ থমথমে হয়ে উঠছে। প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য অর্জুনকুমার বলেন, 'আচ্ছা জগনাথজি—'

জগনাথ মেয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অর্জুনকুমারের দিকে তাকান।

অর্জুনকুমার বলেন, 'আপনাদের এদিকে তো ইলেকট্রিসিটি আসেনি। কিন্তু মুনেশ্বরজির বাড়িতে এত আলো এল কী করে?'

'আপনারা আসবেন বলে ডায়নামো বসানো হয়েছে। নইলে আপনাদের তখলিফ হবে।'

অর্থাৎ অর্জুনকুমারদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামে যাতে কোনোরকম ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্য খুব সম্ভব সবরকম উপকরণ ওখানে মজুত করা হয়েছে।

টিলা বেয়ে ল্যান্ডো আরো খানিকটা চড়াইয়ে ওঠার পর উত্তুরে বাতাসে ডায়নেমোর ভটভটানি ভেসে আসতে থাকে।

পেছন ফিরে অর্জুনকুমার একবার দেখে নেন, অশ্বক্ষুরের একটানা আওয়াজ তুলে অন্য ঘোড়ার গাড়ি দু'টো কোনো অস্পষ্ট রহস্যময় গ্রহের অলীক শকটের মতো ছুটে আসছে।

তিন

টিলার মাথাটা গোল থালার মতো চ্যাপটা। প্রায় তিন একর জায়গা জুড়ে এখানে একটাই মোটে বাড়ি—'রাজপুত নিকেত'। গোটা বাড়িটাকে বেড় দিয়ে তিন ফিট চওড়া এবং পনেরো ফিট উঁচু কমপাউন্ড ওয়াল। সামনের দিকে প্রকাণ্ড লোহার গেট। সেখানে ঝকঝকে উর্দিপরা বিপুল আকারের দুই ভোজপুরি দারোয়ান গলায় টোটার মালা ঝুলিয়ে এবং কাঁধে বন্দুক রেখে শিরদাঁড়া টান করে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেয়।

তিনটি ল্যান্ডো চড়াই বেয়ে টিলার মাথায় উঠে আসতেই ধাতব আওয়াজ তুলে গেট খুলে যায়। একে একে গাড়িগুলো ভেতরে ঢুকে পড়ে।

বিরাট চত্বরের মাঝখানে তিন তলা ক্যাসল। সামনে ফুলের বাগান, টেনিস কোর্ট, ফাঁকে ফাঁকে পাথরের পরী। এ সবের পাশ দিয়ে লাল সুরকির পথ। পথটা গোল হয়ে ঘুরে বাড়িটার একতলার সিঁড়ির গায়ে গিয়ে ঠেকেছে। ক্যাসলের পেছন দিকে ফলের বাগান, ঘোড়া এবং গাড়ি রাখার শেড। এ ছাড়া কমপাউন্ড ওয়ালের গা ঘেঁষে নৌকর নৌকরনী কোচোয়ান এবং দারোয়ানদের জন্য লাল ইটের সারি সারি কোয়ার্টার্স।

ল্যান্ডো তিনটে কাতার দিয়ে একতলার চওড়া চওড়া সিঁড়ির পাশে এসে দাঁড়ায়।

সারা বাড়ি জুড়ে এই মুহূর্তে প্রচণ্ড চাঞ্চল্য এবং ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। নৌকর নৌকরনী এবং অন্যান্য কাজের লোকেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে ল্যান্ডো তিনটের কাছাকাছি এসে তটস্থ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ে। কখন কাকে দরকার হবে কে জানে।

সবার আগে গাড়ি থেকে নামেন জগনাথ। অর্জুনকুমারকে সবিনয়ে বলেন, 'আইয়ে আইয়ে, উতারকে আইয়ে। মোস্ট ওয়েলকাম।'

অর্জুনকুমার নেমে আসেন কিন্তু রেণুকা গাড়িতেই বসে থাকেন। অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি নামবেন না?'

রেণুকা বলেন, 'না। আমি সোজা বাড়ি চলে যাব।'

'আপনারা এ বাড়িতে থাকেন না?'

'না।' বলে রেণুকা জগনাথের দিকে তাকান, 'বাবুজি, আমি এই গাড়িতেই ফিরে যাই। তুমি মজিদভাইকে বলে দাও, আমাকে যেন কষ্ট করে পৌঁছে দেয়।'

রেণুকা চলে যান, এটাই হয়তো চাইছিলেন জগনাথ। কথায় কথায় মুনেশ্বর সিং সম্পর্কে আবার যে তিনি অপ্রীতিকর রূঢ় মন্তব্য করে বসবেন না, তার কোনো গ্যারান্টি নেই। জগনাথ প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েই বলে ওঠেন, 'হাঁ হাঁ। মজিদ তুমি বহেনজিকে আমাদের কোঠিতে নামিয়ে দিয়ে চলে এসো।'

'জী—' সুরকির পথটা ডান দিকে ঘুরে বাগান আর টেনিস কোর্টের পাশ দিয়ে ফের গেটে গিয়ে থেমেছে। মজিদ ঘোড়ার পিঠে আলতো করে চাবুক হাঁকাতেই তেজী জন্তু দু'টো আস্তে আস্তে দুলকি চালে সেদিকে হাঁটতে থাকে।

রেণুকাদের বাড়িটা কোথায়, জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থমকে যান অর্জুনকুমার। রেণুকা যদিও বলেছেন আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কিন্তু সেটা কবে, তা-ও জানা হয় না। অখ্যাত কলেজের এক সামান্য মাস্টারনী হিন্দি সিনেমার মেগা স্টারের মাথায় প্রথম দর্শনেই লাট্টু ঘুরিয়ে দিয়েছে এবং তিনি ঘাড় গুঁজে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েছেন, এটা কেউ টের পেলে মদের চাটের মতো হাজারটা চনচনে মশলাদার কেচ্ছা রটে যাবে। অতএব নিজের লাগাম নিজেকেই টানতে হয়।

এদিকে অসীম তৎপরতায় জগনাথ পেছনের গাড়িটার কাছে গিয়ে রোহিত, ফারুক এবং সঞ্জীবকে নামিয়ে নৌকরদের উদ্দেশে বলেন, 'তুরন্ত সাহাবলোগদের সামান তাঁদের কামরায় নিয়ে যাও।' তারপর মান্য অতিথিদের দিকে তাকান। ঘাড় ঝুঁকিয়ে সিঁড়ি দেখিয়ে বলেন, 'আইয়ে, আইয়ে—'

সিঁড়িগুলো শ্বেত পাথরের। দশটা সিঁড়ি ওঠার পর অনেকটা জায়গা জুড়ে চবুতর। এটাও চৌকো চৌকো শ্বেত পাথরে বাঁধানো।

চবুতর পেরিয়ে দামি বর্মা টিকের কারুকাজ-করা বিশাল দরজা। তারপর লাল কার্পেট-বিছানো চওড়া করিডর। করিডরের দু-ধারে বিশাল বিশাল দু'টো ড্রইং রুম। সেসব পেছনে ফেলে আরেকটু এগুতেই দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। এই সিঁড়িগুলো মজবুত কাঠের। ধারে ধারে ঝকঝকে পেতলের প্যানেল। পাশে যে নকশা-করা রেলিং রয়েছে, সেগুলোর মাথাতেও পেতলের সুদৃশ্য পাত বসানো। আর যেদিকেই তাকানো যাক, উঁচু উঁচু সিলিং থেকে ছোটো বড় মাঝারি, নানা আকারের ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। একদা ওগুলোর ভেতর মোম জ্বলত, এখন নানা রঙের বা শুধুই সাদা বাল্ব জ্বলছে।

তুখোড় গাইডের মতো আগে আগে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ঘাড় ফিরিয়ে জগনাথ বলেন, 'আমাদের এখানে লিফট নেই। আপনাদের বহুত তখলিফ হচ্ছে।'

কষ্ট অবশ্যই হচ্ছিল। কয়েক মাস আগে একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। তার ওপর প্রায় গোটা দু'দিন ধরে দু দু'বার ট্রেন পালটে, ল্যান্ডোয় চড়ে এতদূর এসেছেন। তারপর এই সিঁড়ি বাওয়া। বড় বড় মেট্রোপলিসে আজকাল যে হাই-রাইজ বাড়ি হচ্ছে সেগুলোর ফ্লোর খুবই নিচু। কিন্তু এই 'রাজপুত নিকেত'-এর একেকটা ফ্লোরের উচ্চতা শহরের মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংগুলোর ফ্লোরের হাইটের আড়াই তিন গুণ হবে। অর্জুনকুমারের শ্বাস টানতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'আমাদের কোন ফ্লোরে থাকার অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন?'

জগনাথ বলেন, 'দোতলায়।'

অর্জুনকুমার বলেন, 'ঠিক আছে। তিন তলা পর্যন্ত উঠতে হলে অসুবিধে হত।'

পেছনে আসতে আসতে যথেষ্ট উদ্বেগ বোধ করছিলেন রোহিতরা। রোহিত বলেন, 'আজ যা হবার হয়ে গেছে। কাল থেকে একতলায় থাকার ব্যবস্থা করবেন।'

জগনাথ বলেন, 'আপনাদের যেমন ইচ্ছে।'

অর্জুনকুমার সামান্য হেসে বলেন, 'তার দরকার নেই। আমরা দোতলাতেই থাকব।' আদতে স্ট্রোকের ব্যাপারটা মাথা থেকে বার করে দিতে চান তিনি। কিন্তু তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষীরা কিছুতেই তা ভুলতে দেবে না।

অর্জুনকুমারের কণ্ঠস্বরে এমন দৃঢ়তা রয়েছে যাতে দ্বিতীয় বার এ ব্যাপারে কারো আপত্তি জানাতে সাহস হয় না। শুধু ফারুক মিনমিনে গলায় একবার বলে, 'লেকেন, ভাবিজি বলে দিয়েছিলেন—'

অর্জুনকুমার কিছু না বলে পলকহীন একবার ফারুকের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নেন। বাকি কথা আর বলা হয় না ফারুকের।

দোতলায় পুব-দক্ষিণ কোণে সব চেয়ে বড় কামরাটায় থাকবেন অর্জুনকুমার। তাঁর ঘরের লাগোয়া পরপর তিনটে কামরায় অন্য তিন জনের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে।

প্রথমে অর্জুনকুমারকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কামরায় নিয়ে আসেন জগনাথ। অন্যরা তাঁর সঙ্গে আগে এখানেই ঢোকেন।

কামরাটা প্রায় ছ'শ স্কোয়ার ফিটের কাছাকাছি। কত যে ওয়ারড্রোব, সোফা, সেন্টার টেবল, আলমারি, ডিভান চারিদিকে সাজানো তার হিসেব নেই। প্রতিটি আসবাব ভারী ভারী মেহগনি কাঠের এবং সেগুলো পুরনো মডেলে তৈরি। আসবাবগুলোর গায়ে এমন পালিশ যে আয়নার মতো মুখ দেখা যায়।

দরজা-জানালা বিরাট বিরাট। প্রতি জানালায় দু'টো করে পাল্লা। একটা হল খড়খড়ি, অন্যটা রঙিন কাচের। দরজায় জানালায় দামি পর্দা। সিলিংয়ে পঙ্খের কাজ। সেখান থেকে চারকোণে চারটে মাঝারি ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। মাঝখানেরটা প্রকাণ্ড। ঝাড়লণ্ঠন ছাড়া গোটা ছয়েক নতুন ঝকঝকে বিজলি পাখাও মাথার ওপর দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া বিশাল দু'টো হাতে টানা পাখাও রয়েছে। গোড়া মেঝে জুড়ে ছ ইঞ্চি পুরু কার্পেট। একধারে অ্যাটাচড বাথ।

বেশ অবাক হয়েই টানা পাখা দেখিয়ে অর্জুনকুমার বলেন, 'বিজলি পাখা থাকতে ওগুলো কেন?'

জগনাথ জানান, অর্জুনকুমারদের জন্য দিন কয়েক আগে জেনারেটর আনা হয়েছে। এখানে এলে পুরোনো চাল, পুরোনো কেতা পছন্দ করেন মুনেশ্বর। পাখা টানার জন্য লোক বহাল করা আছে পুরুষ পরম্পরায়। অর্জুনকুমারদের মর্জি হলে টানা পাখার হাওয়াও খেতে পারেন, যদিও এই মাঘ মাসে তার দরকার নেই।

আর কিছু জিজ্ঞেস করেন না অর্জুনকুমার।

জগনাথ বলেন, 'আপনি এখানে খানিকক্ষণ রেস্ট নিন। আমি রোহিতজিদের কামরা দেখিয়ে দিয়ে আসি।'

রোহিতরা বলেন, তাঁরা আপাতত কিছুক্ষণ অর্জুনকুমারের কাছেই থাকবেন। পরে নিজের নিজের ঘরে যাবেন।

জগনাথ বলেন, 'কোঈ বাত নেহী।'

দরজার সামনে তিন চারটে নৌকর অর্জুনকুমারদের মালপত্র ঘাড়ে মাথায় চাপিয়ে দেখা দেয়।

জগনাথ বলেন, 'আপনাদের কার সামান কোনটা নৌকররা জানে না। আপনা আপনা কামরায় ওগুলো রেখে এসে এখানে আরাম করুন। আইয়ে—'

অর্জুনকুমারের সুটকেস, বাস্কেট ইত্যাদি এই কামরায় নামাবার ব্যবস্থা করে রোহিতদের সঙ্গে করে তাঁদেব জিনিসপত্র ওঁদের কামরাগুলোতে রেখে ফের তাঁদের সঙ্গে করে এই কামরায় ফিরে আসেন জগনাথ।

একটা ডিভানে গা এলিয়ে দিয়েছিলেন অর্জুনকুমার। নির্জনতা একেবারেই পছন্দ নয় তাঁর। চাটুকার চামচাদের নিয়ে সারাক্ষণ থাকতে থাকতে তাঁর অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। তিনি বলেন, 'বসুন, বসুন—'

রোহিতরা তাঁকে ঘিরে সোফায় বসে পড়েন।

জগনাথের এখন বসার সময় নয়। মেহমানদারির প্রচুর কাজ পড়ে আছে। তিনি বলেন, 'আপনারা নাহানা করবেন তো?'

সবাই একসঙ্গে বলেন, 'নিশ্চয়ই। আপনাদের এখানে লোকাল ট্রেনে আসার সময় এত ধুলোবালি আর কয়লার গুঁড়ো লেগেছে যে গা ঘিন ঘিন করছে।'

'আমি এখনই গরম পানির বাওস্থা করে দিচ্ছি।' জগনাথ দু'টো নৌকরকে ডেকে প্রতিটি ঘরের লাগোয়া বাথরুমে গরম জল দিতে বলেন। তারপর অর্জুনকুমারের দিকে তাকান, 'নাহানার আগে চা দিতে বলব?'

চা-এর কথায় চোখ গোল হয়ে যায় রোহিত এবং সঞ্জীবের। সূর্যাস্তের পর তাঁরা এ জাতীয় নিস্তেজ পানীয়ের কথা চিন্তাই করতে পারেন না। বোম্বাইতে থাকলে এই সময়টা পুরোদমে 'ড্রিঙ্ক সেসান' শুরু হয়ে যেত। এখানে রাম বা হুইস্কির ব্যবস্থা আছে কি না, কে জানে। অবশ্য তাঁরা সঙ্গে করে কয়েকটি বোতল নিয়ে এসেছেন। কিন্তু তা আর ক'দিন! দেখা যাচ্ছে, পুরো অজ্ঞাতবাসটা তাঁদের প্রায় ব্রহ্মচারী হয়ে কাটাতে হবে।

চোখের কোণ দিয়ে বোহিতদের লক্ষ করছিলেন অর্জুনকুমার। মুহূর্তে তাঁদের মনোভাবটা আঁচ করে নেন। রোহিতরা হয়তো জগনাথকে কিছু বলতেন কিন্তু তার আগেই তিনি বলে ওঠেন, 'ঠিক আছে, চা-ই আনতে বলুন। আর হ্যাঁ, আপনাদের যদি অসুবিধা না হয়, সাডে আটটায় ডিনার খেতে চাই। স্ট্রোক হবার পর তাঁর খাওয়া-দাওয়া চলাফেরা—সব কিছুই ধরা-বাঁধা নিয়মে চলছে। সকাল ছ'টায় ঘুম থেকে ওঠা, সাতটায় ব্রেকফাস্ট, সেই সঙ্গে চারটে ট্যাবলেট, সাড়ে আটটায় ম্যাসাজ। তারপর টুকিটাকি কাজ—প্রোডিউসার, ডাইরেক্টর বা মিডিয়ার লোকেদের সঙ্গে কথা বলা, বারোটায় লাঞ্চ, লাঞ্চের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম, বিকেল সাড়ে চারটেয় চা। সন্ধের পর মাঝে মধ্যে এক দেড় পেগ হুইস্কি। সাড়ে আটটায় ডিনার, তাবপর ফের চারটে ট্যাবলেট। সাড়ে ন'টায় ঘুমোতে যাওয়া।

স্ট্রোকের পর থেকে অর্জুনকুমার শুটিং বন্ধ রেখেছেন। আগে প্রচণ্ড ড্রিঙ্ক করতেন। লোকে বলত, 'হী ড্রিঙ্কস লাইক আ ফিশ'। হুইস্কিও এখন প্রায় বন্ধ। ইদানীং তাঁর ছক-কাটা, অতি সংযত জীবনযাপন।

জগনাথ বলেন, 'আমি সব জানি। মুনেশ্বরজি আপনার সম্বন্ধে সমস্ত কিছু জানিয়ে দিয়েছেন।' বলে চা-এর আয়োজন করতে শশব্যস্তে কামরা থেকে বেরিয়ে যান।

অর্জুনকুমার বোম্বাইতে তাঁর দৈনন্দিন রুটিনের কথা বলেছিলেন মুনেশ্বরকে। মুনেশ্বর তা ভুলে তো যানই নি, জগনাথকে পর্যন্ত জানিয়ে দিয়েছেন। পাটনার নার্সিং হোমে থেকেও তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রয়েছে মুনেশ্বরের। এ জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ করেন অর্জুনকুমার।

খানিকক্ষণ জিরোবার পর ফারুক উঠে পড়ে। বলে, 'অর্জুনসাব, আপনার জামাকাপড় গুছিয়ে রাখি।'

অর্জুনকুমার একটু হাসেন, উত্তর দেন না।

ফারুক বড় বড় সুটকেস খুলে পাঞ্জাবি, পাজামা, চুস্ত, পুলওভার, ইত্যাদি বার করে একটা ওয়ারড্রোবে সাজিয়ে রাখে। এবার দামি পোশাক, পারফিউম, জুতো—এসব কিছুই আনেননি অর্জুনকুমার। জনগণের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে, সাদামাঠা কাপড় চোপড়ই উপযুক্ত পোশাক।

চোখ-ধাঁধানো শার্ট ট্রাউজার্স না আনলেও প্রচুর ওষুধ এসেছে সঙ্গে। সেগুলো একটা দেওয়াল-আলমারিতে রেখে, নতুন শেভিং বক্স, আফটার-শেভ লোশন ইত্যাদি নিয়ে বাথরুমে চলে যায় ফারুক। ওগুলো সেখানে রেখে ফিরে আসে।

সঞ্জীব বলেন, 'বোম্বাইতে ট্রেনে ওঠার সময় ভেবেছিলাম, এখানে এসে মাঠেঘাটে পড়ে থাকতে হবে। এরকম ফাইভ-স্টার কমফোর্টের অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে, কে জানত!'

অর্জুনকুমার বলেন, 'একেবারে নাইনটিনথ সেঞ্চুরির 'রাজ' আমলে ঢুকে পড়েছি।'

রোহিত চোখ টিপে, মিচকে হেসে, ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে একটি মজাদার মুদ্রা ফুটিয়ে বলেন, 'রাজ তো বিলকুল ঠিক হ্যায়। লেকিন স্রিফ এক চিজ কমী পড়তা।'

বেশ অবাক হয়ে অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'কোন জিনিসটা কম?'

'হুইস্কি, রাম, জিন, ভোদকা—'

রোহিতকে থামিয়ে দিয়ে অর্জুনকুমার বলেন, 'চিন্তা করবেন না। মুনেশ্বরজি বিবেচক মানুষ, ভেরি ভেরি কনসিডারেট। সব দিকে তাঁর নজর আছে। তিনি জানেন, বোম্বাইয়ের ফিল্মি দুনিয়া থেকে টিটোটেলাররা এখানে আসছে না। নিশ্চয়ই ড্রিঙ্কসের ব্যবস্থা রেখেছেন।

রোহিত বলেন, 'দেখা যাক।'

একটা নৌকর বড় বড় ড্রামে করে বাথরুমে গরম জল রেখে যায়।

ফারুক ওধারে একটা সোফা থেকে বলে ওঠে, 'অর্জুনসাব, আজ কিন্তু আপনার ম্যাসাজ হয়নি। নাহানার আগে করব।' ক'বছর ধরে অর্জুনকুমারের ম্যাসাজটা করে আসছে সে।

আলস্য লাগছিল অর্জুনকুমারের। বলেন, 'আজ থাক। কাল সকালেই কোরো।'

একটু চুপচাপ।

তারপর হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় ধড়মড় করে খাড়া হয়ে বসেন রোহিত। মুখের সেই মিচকে হাসিটি আবার ফিরে এসেছে। তিনি বলেন, 'আসল খবরটাই তো নেওয়া হয়নি।'

অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'কী খবর?'

'রেণুকাজির সঙ্গে গাড়িতে আসতে আসতে কেমন জমল অর্জুনজি? অবশ্য ওল্ড বাগার জগনাথ মিশ্রটা পেহরাদার হয়ে কনস্টান্টলি আপনাদের সঙ্গেই ছিল। তবে আপনি হলেন মেগা স্টার, কড়োর কড়োর (কোটি কোটি) ছোকরির হার্ট-থ্রব। শালে বুড্ঢা যতই গার্ড দিক—'

রোহিতকে থামিয়ে দিয়ে অর্জুনকুমার ঠান্ডা কঠিন গলায় বলেন, 'প্লিজ স্টপ রোহিতজি। আপনাকে আগেও হুঁশিয়ার করে দিয়েছি। এখনও আবার বলছি, ডোন্ট ফরগেট শী ইজ আ ডিসেন্ট ইয়াং লেডি। ফিল্মের সেক্সি বিচদের মতো নয়।'

ধমক সত্ত্বেও রগড় করে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন রোহিত, জগনাথ কামরায় এসে ঢোকেন। তাঁর পেছন পেছন দুই যুবতী নৌকরনী চাকা-বসানো বেঁটে ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে চলে আসে। ট্রলির ওপর বড় বড় ট্রে-তে চায়ের সরঞ্জাম এবং প্রচুর খাবারদাবার।

জগনাথ হাতজোড় করে অনুরোধ করা সত্ত্বেও খাদ্যবস্তুগুলো ফিরিয়ে দেন অর্জুনকুমাররা। শুধু চা-এর লিকার, দুধ, চিনি ইত্যাদি নিজেরাই নামিয়ে নেন। খাবারের ট্রলি নিয়ে নৌকরনীরা ফিরে যায়।

জগনাথ খানিক দূরে অন্য একটা সোফায় বসতে বসতে বলেন, 'আপনারা কিছু খেলেন না, আমার খারাপ লাগছে।' তাঁকে ক্ষুণ্ণ দেখায়।

অর্জুনকুমার বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁর ক্ষোভ কাটিয়ে দেন। বলেন, 'সাড়ে আটটায় ডিনার খাব। এখন সোয়া সাতটা। কিছু খেলে ডিনারটা মাটি হয়ে যাবে।'

চা তৈরির দায়িত্ব নিয়েছিল ফারুক। সবাইকে দেবার পর একটি কাপ জগনাথের দিকে এগিয়ে দেয় সে।

জগনাথ হাতজোড় করে বলেন, 'মাফ কীজিয়ে ফারুকসাহেব, আমি চা খাই না।'

চা খায় না, এমন মানুষ ক্বচিৎ চোখে পড়ে। সেই বিরল প্রজাতির একজন এই জগনাথ। কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে কাপটা নামিয়ে রাখে ফারুক।

অর্জুনকুমারদের চা খাওয়া যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় জগনাথ বলেন, 'ডিনার কি ডাইনিং হল-এ গিয়ে খাবেন, না আপনাদের কামরায় কামরায় পাঠিয়ে দেবো!'

অর্জুনকুমার বলেন, 'আমার কামরাতেই পাঠাবেন। একসঙ্গে সবাই গল্প করতে করতে খাওয়া যাবে।'

'আচ্ছা।' বলে গলার স্বর হঠাৎ ঝপ করে নামিয়ে দেন জগনাথ, 'মুনেশ্বরজি, আপনাদের জন্যে আরও একটা ব্যওস্থা করেছেন।'

'কী ব্যবস্থা?'

'বিলাইতি আর ফরাসি শরাবের। সেটা কখন দেবো?'

চকিতে অর্জুনকুমারের চোখ রোহিতের দিকে চলে যায়। তিনি যেন বলতে চান মুনেশ্বর সিং কতটা বিবেচক, এবার বুঝুন।

রোহিতের মুখে বোকাটে ধরনের একটু হাসি ফোটে। তিনি বিব্রতভাবে ঘাড় চুলকোতে থাকেন।

আবার জগনাথের দিকে তাকান অর্জুনকুমার। বলেন, 'আমাকে আজ দিতে হবে না। রোহিতজিদের দরকার হলে তাঁদের কামরায় পাঠিয়ে দিতে পারেন।'

যাঁর জন্য এই বিপুল মেহমানদারির আয়োজন সেই অর্জুনকুমারই যখন চাইছেন না সেখানে অন্যদের ড্রিঙ্ক করাটা আদপেই ভাল দেখায় না। রোহিত হাত নাড়তে নাড়তে বলেন, 'না না না, আমাদেরও দরকার নেই। কাল দেখা যাবে।'

চা খাওয়ার পর ওয়ারড্রোব থেকে পাজামা পাঞ্জাবি শাল তোয়ালে ইত্যাদি বার করে বাথরুমে চলে যান অর্জুনকুমার। রোহিত ফারুক এবং সঞ্জীবও আর বসে থাকেন না, নিজেদের কামরায় স্নান করতে যান। শুধু একা জগনাথ অপেক্ষা করতে থাকেন। অর্জুনকুমারদের ডিনার খাওয়া হয়ে গেলে তবে তাঁর ছুটি।

মিনিট কুড়ি বাদে স্নান সেরে পোশাক বদলে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসেন অর্জুনকুমার। গালে সেই তিন চারদিনের দাড়ি জমেই আছে। আজও ইচ্ছা করেই শেভ করেননি। রুক্ষ, খাড়া খাড়া দাড়ি আর পরিপাট্যহীন চুলটুল থাকলে চেহারা থেকে শহুরে পালিশ এবং সোফিস্টিকেশন অনেকটাই মুছে ফেলা যায়। দেহাতিদের সঙ্গে মেলামেশার জন্য এটা খুবই জরুরি।

অর্জুনকুমার এগিয়ে এসে জগনাথের মুখোমুখি একটা সোফায় বসেন। বলেন, 'অনেকক্ষণ আপনাকে একা একা বসে থাকতে হল।'

'না না, ও কিছু না।' বলতে বলতে অর্জুনকুমারের দিকে ভালো করে চোখ পড়ায় বেশ অবাক হয়ে যান জগনাথ। তাঁর ধারণা ছিল ফিল্মস্টারবা সারাক্ষণ চোখ-ঝলসানো মেক-আপ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু অর্জুনকুমার তাঁর সব ভাবনা-চিন্তা ওলটপালট করে দিয়েছেন। ধরমপুরা স্টেশনে তিনি যখন নেমেছিলেন তাঁর পরনে ছিল খেলো, ময়লা চুস্ত-পাঞ্জাবি। এখনও প্রায় সেই পোশাকই—তবে ধবধবে, পরিষ্কার। ট্রেনে হয়ত অসুবিধা ছিল কিন্তু এখন কেন 'শেভ' করলেন না, কে জানে। একমুখ আলপিনের মতো দাড়ি জমিয়ে রাখলে আর যাই হোক, গ্ল্যামারের 'সত্যনাশ' হয়ে যায়। ইত্যাকার নানা চিন্তা জগনাথের মাথায় চাড়া দিয়ে উঠছিল। তবে মুখ ফুটে তিনি কিছুই জিজ্ঞেস করেন না।

অর্জুনকুমার বলেন, 'জগনাথজি, দরকারী কথাটা এবার সেরে নেওয়া যাক।'

জগনাথ বলেন, 'কী কথা?'

'আমরা কাল থেকেই কাজ শুরু করতে চাই।'

'দেহাতিদের কাছে যাবেন—এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'এত তাড়াহুড়ো কিসের? দো রোজ ট্রেনে ট্রেনে কাটিয়ে দিয়েছেন। হটরানিতে বহুত ধকল গেছে। ক' রোজ আরাম করুন। তারপর ও সব হবে।'

'না না, এমন কিছু ধকল হয়নি। আজ রাতটা ঘুমোতে পারলে শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে। বেশিদিন আমাদের এখানে থাকার উপায় নেই। কাল থেকেই গ্রামগুলোতে যেতে চাই।'

জগনাথ একটু ভেবে বলেন, 'আপনি যখন চাইছেন, তাই হবে।'

অর্জুনকুমার বলেন, 'কাল সকালেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। একজন লোক আমাদের সঙ্গে দেবেন, সে আমাদের গ্রামগুলোতে নিয়ে যাবে। আর মুনেশ্বরজির এই বাড়িটা টিলার মাথায়। নামার সময় অসুবিধে হবে না। কিন্তু এতটা উঁচুতে উঠতে খুবই কষ্ট হবে। একটা ঘোড়ার গাড়ি কি টিলার নিচে রাখা সম্ভব হবে? ফেরার সময় আমাদের যাতে তুলে আনতে পারে?'

জগনাথ বলেন, 'নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। লেকেন নিচে রাখার দরকার কী? আপনারা গাড়িতে করেই গাঁয়ে চলে যাবেন। কাজ চুকিয়ে গাড়িতেই ফিরে আসবেন।'

অর্জুনকুমার জানান, তাঁরা পায়ে হেঁটেই গ্রাম দেখতে চান। শারীরিক কারণে তাঁর চড়াই ভাঙা ঠিক নয়। তাই গাড়ির বন্দোবস্ত করতে বলেছেন। সমতল জমিতে হাঁটাচলা করতে তাঁর কষ্ট হবে না।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়, ঘোড়ার গাড়ি অর্জুনকুমারদের টিলার নিচে নামিয়ে দেবে এবং যতক্ষণ না গ্রাম দেখে তাঁরা ফিরছেন সেটা নিচেই মজুত থাকবে।

জগনাথ কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলেন, 'একটা কথা বলব অর্জুনজি?'

'নিশ্চয়ই।' অর্জুনকুমার সোজা জগনাথের মুখের দিকে তাকান।

'গাঁয়ে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে কথা বলে একেবারেই ভালো লাগবে না আপনার। লোকগুলো বিলকুল আনপড়, আন-কালচারড। আপনার সঙ্গে কী বিষয়ে কথা বলবে? দুনিয়ার কোনো খবর কি ওরা রাখে, না জানে?'

অর্জুনকুমার স্থির চোখে জগনাথকে দেখতে থাকেন।

জগনাথ থামেননি, 'গাঁওলোতে দেখারও কিছু নেই। স্রিফ গরিবি, ভুখ, মচ্ছড়, ধুলো, বীমারি, কুসমস্কার আউর অশিক্ষা।'

স্টেশন থেকে আসার সময় গ্রামের লোকজন সম্পর্কে খুব খারাপ মন্তব্য করেছিলেন জগনাথ। এখন আবার এ সব বলছেন। ভেবেছিলেন, এভাবে বার বার বললে অর্জুনকুমারের উৎসাহ নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু অর্জুনকুমার গোঁ ধরে বসে আছেন, এখানকার গ্রামগুলোতে যাবেনই। বলেন, 'আমি তো গরিবি, হাঙ্গার, সুপারস্টিশন—এ-সব দেখতেই এসেছি।'

দারিদ্র টারিদ্র যে এতটাই দর্শনীয় বস্তু এবং তা দেখার জন্য অর্জুনকুমারের মতো মেগা স্টার দু' হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে, প্রচণ্ড ধকল সয়ে এতদূরে যে ছুটে আসতে পারেন, এই ব্যাপারটা কিছুতেই মাথায় ঢুকতে চাইছে না জগনাথের। হাতদুটো উলটে দিয়ে তিনি কিছুটা হতাশভাবেই বলেন, 'কোঈ বাত নেহী।'

রোহিত, ফারুক আর সঞ্জীব অর্জুনকুমারের কামরায় এসে ঢোকেন। তিনজনেরই স্নান হয়ে গেছে। পরিচ্ছন্ন পোশাকে তাঁদের বেশ ফিটফাট দেখাচ্ছে। ভালো করে লক্ষ করলে বোঝা যাবে, তিন জনেরই চোখ আরক্ত এবং কিঞ্চিৎ ঢুলুঢুলু। অর্থাৎ জগনাথের 'শরাব' না নিলেও বোম্বাই থেকে যে হুইস্কির বোতলগুলি তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন তার একটির ঢাকনা খুলে কয়েক পেগ করে পাকস্থলীতে চালান করার পর এখানে এসেছেন।

দু-পলক রোহিতদের লক্ষ করেন জগনাথ। কিছু বলেন না। রোহিতরা কাছে এসে তাঁকে ঘিরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে পড়েন।

হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় বুক পকেট থেকে ঘড়ি বার করে একবার তাকিয়েই শশব্যস্তে উঠে পড়েন জগনাথ, 'আটটা বেজে পঁচিশ। খানা দিতে বলি?'

'বলুন।' অর্জুনকুমার আস্তে মাথা নাড়েন।

জগনাথ বেরিয়ে গেলে ধীরে ধীরে অর্জুনকুমারের চোখ রোহিতদের মুখের ওপর ঘোরাঘুরি করতে থাকে। তিনি বলেন, 'ড্রিঙ্ক সেসানটা কিরকম জমল?'

নিপাট ভালোমানুষের মতো মুখ করে রোহিত বলেন, 'জমল আর কই? স্নানের পর আধ ঘণ্টা টাইম পেলাম। তার ভেতর কতটা আর জমতে পারে? তা ছাড়া—'

'কী?'

'আপনি নেই। আসলী প্ল্যানেট না থাকলে স্যাটেলিটরা কতটা কী করতে পারে! কোনোরকমে গলায় ঢেলে যাওয়া আর কী! কোই মজা নেহী।'

'একটা দিন ড্রিঙ্কটা না হয় বাদই দিতেন।'

'কী যে বলেন অর্জুনজি! এতদিনের হ্যাবিট কি আচানক ছেড়ে দেওয়া যায়!'

'আমি তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছি।'

'আপনার মতো নিজের ওপর আমাদের কন্ট্রোল নেই। আমরা নেহাতই হ্যাবিটকা গুলাম।'

হাসতে হাসতে অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'ক' পেগ করে হল?'

রোহিত বলেন, 'পার হেড ওনলি ফোর পেগস। আধ ঘণ্টায় এর বেশি পারা গেল না।'

'বহুত আপসোসকি বাত। বারো চোদ্দ পেগ যারা চড়ায় তাদের ওনলি ফোর পেগস!'

অর্জুনকুমারের বলার ভঙ্গিতে রোহিতরা হাসতে থাকেন।

রোহিত এবার বলেন, 'এতক্ষণ ওল্ড ম্যানের সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল অর্জুনজি?'

অর্জুনকুমার বলেন, 'কাল গ্রামে যাবার প্রোগ্রামটা ঠিক করে নিচ্ছিলাম।'

'এক বাত পুছুঙ্গা?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'ওল্ড ম্যানের লেড়কিকে কি আমাদের সঙ্গে গাঁয়ে ঘোরার সময় পাওয়া যাবে? রেণুকাজি গাইড হলে এক্সপিডিশনটা বহুত দিলচস্প হয়ে উঠবে।' বলতে বলতে রোহিতের চোখেমুখে নষ্টামির হাসি ফুটে উঠতে থাকে।

লোকটার মাথায় সবসময় ফিচলেমি ঘুরছে। যতই ধমকাও, গালাগাল দাও, স্বভাব পালটায় না। তীব্র দৃষ্টিতে রোহিতের দিকে তাকান অর্জুনকুমার। বলেন, 'আবার!'

হাতজোড় করে রোহিত বলেন, 'স্রিফ মাজাক অর্জুনজি, জাস্ট ফান। এত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন?'

'কেন নিচ্ছি, আপনাকে আগেই জানিয়েছি। আশা করি, এটাই শেষ বার। এরপর আর এই ভুলটা করবেন না। সব ব্যাপারে মাজাক চলে না।'

রোহিত নিজের পক্ষে কিছু সাফাই গাইতে যাচ্ছিলেন, কার্পেটের ওপর রবারের চাকার মৃদু, মসৃণ আওয়াজে ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন সেই যুবতী নৌকরনী দু'টো ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে আসছে। ট্রলির মাথায় নানা আকারের দামি সেরামিকের বাসনে খাবারের স্তূপ। ওদের পেছনে পেছনে আসছেন জগনাথ।

কাছাকাছি এসে জগনাথের নির্দেশে, প্রায় যান্ত্রিক দক্ষতায় অর্জুনকুমারদের সামনে নিচু নিচু কয়েকটা টেবল টেনে এনে সেগুলোর ওপর ডিনার সাজতে থাকে নৌকরনী দু'টো।

অর্জুনকুমারের জন্য পাতলা গরম চাপাটি, সাদা ধবধবে ভাত, ডাল, প্রচুর স্যালাড, চিকেন সুপ, হালকা চিকেন কারি, প্রায় ঝাল-মশলাহীন মাছের একটা পদ, পাঁপড়, কাস্টার্ড এবং কলাকন্দ। অন্যদের জন্য পোলাও, চিকেন রোস্ট, পরটা ইত্যাদি।

অর্জুনকুমার বুঝতে পারেন, মুনেশ্বর তাঁর জন্য খাদ্যতালিকা তৈরি করে পাঠিয়েছেন জগনাথকে। মানুষটির প্রতি নতুন করে কৃতজ্ঞতায় তাঁর মনে ভরে যায়।

এদিকে ফারুক ওষুধের কেস থেকে চারটে ট্যাবলেট বার করে এনে অর্জুনকুমারের টেবলে রাখে। তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রটিকে চাঙ্গা এবং সক্রিয় রাখার জন্য এই ট্যাবলেটগুলো অত্যন্ত জরুরি।

খাবার সাজিয়ে দিয়ে নৌকরনীরা চলে যায়। খানিক দূরে একটা ডিভানে বসে জগনাথ বলেন, 'কৃপা করে শুরু করুন।'

সঞ্জীব বলেন, 'এ কী! আপনার খাবার কোথায়?'

হাতজোড় করে জগনাথ বলেন, 'ক্ষমা করবেন, আমার এ সব চলবে না। আমি বিশুধ্‌ শাকাহারী। কোঠিতে ফিরে গিয়ে খাব।'

খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে নৌকরনীরা আবার এসে এঁটো প্লেট ট্রেট তুলে নিয়ে যায়। একজন কয়েকটি ছোট প্লেটে তবকে-মোড়া পানের খিলি, মুখশুদ্ধির নানারকম খুশবুদার মশলা আর দামি ফোরেন সিগারেটের কয়েকটি প্যাকেট নিয়ে আসে।

জগনাথ ডিভান থেকে উঠে পড়েছিলেন। বলেন, 'আপনাদের জন্যে একজন করে নৌকরের ব্যওস্থা করেছি। ওরা বাত্তিরে বাইরের প্যাসেজে থাকবে। খাটের গায়ে কলিং বেল লাগানো আছে। জরুরত পড়লে বেল টিপবেন, ওরা চলে আসবে। এখন যদি হুকুম দেন তো আমার কোঠিতে ফিরতে পারি।'

অর্জুনকুমার বলেন, 'অবশ্যই যাবেন। আমাদের জন্যে সেই বিকেল থেকে আপনার প্রচুর ধকল গেল।'

'না না, এ তো আমার ডিউটি।' বলে হাসেন জগনাথ।

'আপনার বাড়ি এখান থেকে কত দূর?'

'নজদিগ। এই টিলাটার নিচে থেকে লগভগ দেড় মাইল। আচ্ছা নমস্তে—' বলতে বলতে দরজার দিকে এগিয়ে যান জগনাথ।

'নমস্তে—' সবাই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। অর্জুনকুমার বলেন, 'কাল সকালে আমরা গাঁয়ে যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে তার আগে দেখা হবে তো?'

'জরুর। আপনাদের ঘুম ভাঙার আগেই হাজির হয়ে যাব। আমি না এলে আপনাদের গাঁওয়ে যাবার বন্দোবস্ত হবে কী করে?'

দরজার কাছে তখনও পৌঁছননি জগনাথ, একটা হট্টাকট্টা চেহারার মাঝবয়সী লোক—পরনে ঢোলা পাতলুন আর শার্টের ওপর রোঁয়াওলা পুলওভার, পায়ে কাঁচা চামড়ার ভারী বুট, মাথার পেছনে টিকির গোছা—প্রায় দৌড়তে দৌড়তে দরজার ওধারের প্যাসেজে এসে দাঁড়ায়। তাকে ভীষণ উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

জগনাথ স্থির চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কী খবর ভাওনাথ?'

লোকটা, অর্থাৎ ভাওনাথ বলে, 'বহোত বুরা। ভূচ্চরের ছৌয়ারা মুনেশ্বরজির জমিনে আর কাজ করতে চাইছে না। অনেক বোঝালাম, লেকেন গিধের পাল ভালো কথা শুনতে রাজি না।'

জগনাথের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। তাঁর চোখের ভেতর থেকে এক ঝলক আগুন দপ করে বেরিয়ে এসেই দ্রুত মিলিয়ে যায়। চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে অর্জুনকুমারদের দেখে নেন তিনি। ভাওনাথ যে খবর নিয়ে এসেছে সে সম্বন্ধে মান্য অতিথিদের সামনে আলোচনা করতে চান না। বলেন, 'পরে তোমার সঙ্গে কথা বলছি।' বলে অর্জুনকুমারদের দিকে ফেরেন, 'চলি অর্জুনজি, রোহিতজি, ফারুক সাহেব, সঞ্জীবজি। আপনারা আরাম করুন।'

আজকের মতো চূড়ান্ত বিদায় নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যান জগনাথ। বলেন, 'আও ভাওনাথ—' দু'জনে সামনের প্যাসেজ ধরে বরাবর একতলার সিঁড়ির দিকে চলে যান।

অর্জুনকুমাররা ফের বসে পড়েন।

রোহিত বলেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো? ভাওনাথ নামের ওই লোকটা যেভাবে এক্সাইটেড হয়ে ছুটে এল আর জগনাথজির চোখে ফ্ল্যাশ দেখলাম—মনে হচ্ছে কিছু একটা গোলমাল হবে।'

অর্জুনকুমার বলেন, 'ইটস আ ভেরি সিম্পল কেস। কিছু আনউইলিং ফারমার মুনেশ্বর সিংয়ের জমিতে কাজ করতে চায় না। খুব সম্ভব জগনাথ তাদের টিট করবেন। এনিওয়ে ইট'স হিজ প্রবলেম। আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে।'

আরও কিছুক্ষণ এলোমেলো আড্ডা দিয়ে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টায় অর্জুনকুমার উঠে পড়লেন, 'এবার কিন্তু আমি শুয়ে পড়ব। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। গুড নাইট।' একটানা বহুদিন ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে থাকার জন্য ঠিক সাড়ে ন'টাতেই ঘুম এসে যায় তাঁর। তাছাড়া অন্য কারণও রয়েছে। ডিনারের সময় যে চারটি ট্যাবলেট তিনি খান তার একটা হল হালাকা ধরনের সিডেটিভ।

'গুড নাইট।' বাকি তিনজন যে যাঁর ঘরে চলে যান।

বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে ঘোড়ার পায়ের টগবগ আওয়াজ কানে আসে অর্জুনকুমারের। ডানদিকের বিরাট জোড়া জানালাটা খোলা রয়েছে। সেদিকে তাকাতেই চোখে পড়ে, ল্যান্ডোতে করে 'রাজপুত নিকেত' থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন জগনাথ মিশ্র। তাঁর পাশে বসে আছে ভাওনাথ।

চার

রুটিন অনুযায়ী ছ'টার আগেই ঘুম ভেঙে যায় অর্জুনকুমারের। চোখ মেলতেই হাতের কাছে নিচু টী-পয় টেবলে বেড-টী পেয়ে যান।

চা-এর কাপটি সবে শেষ হয়েছে, দরজার সামনে জগনাথকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

অর্জুনকুমার বেশ অবাকই হয়ে যান। জগনাথ মিশ্র নামে এই লোকটির মধ্যে তুখোড় কম্পিউটারের মতো কিছু একটা ব্যাপার আছে। কাল রাতে তিনি বলে গিয়েছিলেন, অর্জুনকুমারের ঘুম ভাঙার আগেই চলে আসবেন। হয়ত অন্ধকার থাকতে থাকতেই দেড় মাইল পেরিয়ে এখানে এসে তাঁদের জন্য চা-এর আয়োজন করেছেন।

জগনাথ অল্প হেসে বলেন, 'নমস্তে। কাল ভালো ঘুম হয়েছিল?'

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে অর্জুনকুমার বলেন, 'চমৎকার ঘুমিয়েছি।'

'আপনাদের গাঁয়ে যাবার সব ব্যওস্থা হয়ে গেছে। যদিও এই সকালবেলায় বেশ ঠান্ডা থাকে, রোদ চড়ে গেলে কিন্তু কষ্ট হবে। আমার মনে হয় ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়াই ভালো।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তবে ব্রেকফাস্টের আগে স্নানটা সেরে নেব।'

'আমি এখনই সবার কামরায় গরম পানি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ব্রেকফাস্ট কি যে যাঁর ঘরে করবেন?'

'না। যে ক'দিন আপনাদের এখানে আমরা আছি, ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার—সব আমার কামরায় একসঙ্গে বসে খাব।'

জগনাথ আর দাঁড়ান না, প্যাসেজের ওধারে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যান।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়।

অর্জুনকুমার একটা নৌকরকে দিয়ে রোহিতদের ডাকিয়ে এনে বলেন, 'ঘণ্টাখানেকের ভেতর আমাদের বেরুতে হবে। স্নান টান সেরে রেডি হয়ে আমার ঘরে চলে আসবেন। এখানে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়ব। কী পোশাকে গ্রামে যেতে হবে, আশা করি আপনাদের খেয়াল আছে।'

রোহিত বলেন, 'নিশ্চয়ই। প্রোলেটারিয়েট ইউনিফর্ম পরেই যাব।'

রোহিতের বলার ভঙ্গিতে অর্জুনকুমার হেসে ফেলেন। কোনো মন্তব্য না করে ফারুককে বলেন, 'ফারুকভাই কাল ম্যাসাজ হয়নি। আজ না করে দিলে মাসলগুলো স্টিফ হয়ে যাবে।'

ফারুক বলে, 'আপনি শুয়ে পড়ুন।'

রোহিতরা চলে যান। ফারুক মিনিট পনেরো অর্জুনকুমারের সমস্ত শরীর ডলাইমলাই করার পর নিজের কামরায় ফিরে যায়।

স্নানটান সেরে আধ ঘণ্টা বাদে বাথরুম থেকে বেরুতেই অর্জুনকুমার দেখতে পান রোহিতরা আধময়লা পাজামা-পাঞ্জাবির ওপর চাদর জড়িয়ে বসে আছেন। টেবলে টেবলে ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয়েছে।

জগনাথ এবং সেই দুই নৌকরনীকেও একধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

অর্জুনকুমার একটু হেসে বলেন, 'আপনারা কতক্ষণ?'

রোহিত বলেন, 'এই তো, মিনিট পাঁচেকও হয়নি, এসেছি।'

'যাক, তা হলে বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখিনি। নাউ, লেট আস স্টার্ট।'

খেতে খেতে কথাবার্তা খুব কমই হয়। অর্জুনকুমার শুধু সঞ্জীবকে বলেন, 'সঞ্জু ক্যামেরা আর টেপ রেকর্ডারটা সঙ্গে নিস। তেমন কিছু পাওয়া গেলে টেপ করে কী ছবি তুলে নেওয়া যাবে।'

একটা মাঝারি পলিথিনের ব্যাগ দেখিয়ে সঞ্জীব বলেন, 'অলরেডি নিয়েছি। এই যে এর ভেতর।'

অর্জুনকুমার বলেন, 'ফাইন।'

এদিকে ফারুকও একটা ব্যাগে ক'টা মিনারেল ওয়াটারের বোতল এবং অর্জুনকুমারের জন্য কিছু ওষুধ নিয়েছে। কখন কী দরকার হবে, কে জানে।

জগনাথের তদারকিতে মিনিট পনেরোর ভেতর ব্রেকফাস্ট পর্বটি চুকে যায়। তারপর চারজন তাঁর সঙ্গে কামরা থেকে বেরিয়ে কার্পেটে মোড়া কাঠের সিঁড়ি দিয়ে যখন নিচে নেমে আসেন, সাড়ে সাতটাও বাজেনি।

ক্যাসলের সামনের সুরকির রাস্তায় দু'টো ল্যান্ডো দাঁড়িয়ে ছিল। জগনাথ বলেন, 'উঠুন।'

অর্জুনকুমাররা চারজন এবং জগনাথ ভাগাভাগি করে উঠে বসতেই দুই ল্যান্ডো চলতে শুরু করে। 'রাজপুত নিকেত'-এর চৌহদ্দি ছাড়িয়ে টিলার তলায় এসে গাড়ি দু'টো থেমে যায়। সেখানে নিরেট চেহারার একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। বয়স চল্লিশ বেয়াল্লিশ। চৌকো মুখ, নাকের তলায় জমকালো গোঁফ, ভারী ঠোঁট। মাথায় পাগড়ির মতো করে গামছা জড়ানো। বিহারী ধাঁচে ধুতি পাকিয়ে পরেছে সে। তার ওপর লাল-সবুজে ডোরা-কাটা শার্ট এবং ঢলঢলে সোয়েটার, পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা।

গাড়ি থামতে সবাই নেমে পড়েছিলেন। জগনাথ লোকটার পরিচয় দিয়ে অর্জুনকুমারকে বলেন, 'এর নাম চৌধারি, বহুত চৌকস আদমি। চৌধারি আপনাদের গাইড, দেহাত দেখাতে নিয়ে যাবে।' অর্জুনকুমারদের নামটাম এবং আসল পরিচয় না জানিয়ে চৌধারিকে শুধু বলেন, 'এঁরা মুনেশ্বরজির মেহমান। যেভাবে এঁরা বলবেন ঠিক সেইভাবে গাঁ দেখিয়ে আনবে। কোনো তখলিফ যেন এঁদের না হয়। সমঝা?'

'সমঝ গিয়া মিশরজি—' ঘাড় অনেকখানি হেলিয়ে দেয় চৌধারি।

এবার অর্জুনকুমারের দিকে ঘুরে জগনাথ বলেন, 'সাড়ে বারোটায় তো আপনার লাঞ্চ টাইম।'

অর্জুনকুমার বলেন, 'হ্যাঁ। কেন?'

'তার আগে নিশ্চয়ই ফিরে আসছেন?'

'সেইরকমই ইচ্ছে।'

'এগারোটা থেকে এখানে গাড়ি হামেহাল মজুত থাকবে।'

'ধন্যবাদ। চলি।'

জগনাথ দাড়িয়ে থাকেন। চৌধারি অর্জুনকুমারদের সঙ্গে করে কাচ্চী ধরে এগিয়ে যায়।

এই মাঘের শেষেও ধরমপুরা অঞ্চলে জাঁকিয়ে হিম পড়ে। সূর্য উঠেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে কিন্তু দিগন্তের গায়ে পাতলা রেশমের মতো কুয়াশা এখনও আটকে আছে।

উত্তাপহীন নরম সোনালি রোদে চারিদিক ভরে যেতে শুরু করেছে। আজ উত্তুরে হাওয়ায় তেমন জোর নেই। ঝির ঝির করে অদৃশ্য স্রোতের মতো চরাচরের ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে চলেছে।

অর্জুনকুমার এভাবে পায়ে হেঁটে হতচ্ছাড়া গাঁ দেখতে যাবেন, ভূ-ভারতের কেউ কি তা ভাবতে পেরেছে! পারলে লক্ষ যুবতী তাঁর মাড়িয়ে যাবার জন্য তাদের কোমল বুকগুলি পেতে দিত। তার বদলে ধুলোবোঝাই রুক্ষ কাচ্চীর ওপর পা ফেলতে হচ্ছে অর্জুনকুমারকে।

খানিক যাবার পর চৌধারি বলে, 'সরকার, এখানে বহোত গাঁও রয়েছে। কমসে কম তিশ চাল্লিশগো। আপনাদের আগে নজদিগের গাঁওগুলোতে নিয়ে যাই। পরে দূরের গুলোতে যাব।'

অর্জুনকুমার বলেন, 'সেই ভালো। কাছের গাঁগুলো কোথায়?'

কাচ্চীর ডান দিকে আঙুল বাড়িয়ে চৌধারি বলে, 'ওই দিকে। সড়ক দিয়ে গেলে বহোত ঘুরতে হবে। লগভগ দো 'মিল' (মাইল) পথ। মাঠের ওপর দিয়ে যদি যান এক 'মিলে'র বেশি হাঁটতে হবে না। তবে মাঠের রাস্তা ভালো না। থোড়াকুছ তখলিফ হবে আপনাদের। কা করে?'

অর্জুনকুমার একটু ভেবে বলেন, 'অত ঘুরব কেন? আপনি মাঠ দিয়েই নিয়ে চলুন।'

'ঠিক হ্যায় সরকার। আইয়ে।'

কাঁচা সড়ক থেকে চৌধারির পেছন পেছন ফাঁকা জমিতে নেমে পড়েন অর্জুনকুমাররা।

চৌধারি সম্পর্কে প্রথম দিকে অস্বস্তিতে ছিলেন অর্জুনকুমার। জগনাথ তাঁদের পরিচয় দেননি, তবু লোকটা কি তাঁকে চিনতে পেরেছে? হাবভাব দেখে অবশ্য তা মনে হয় না। কোনোরকম কৌতূহলও সে দেখাচ্ছে না। হয়তো সিনেমা টিনেমার ব্যাপারে তাব আগ্রহ নেই। ক্রমে অস্বাচ্ছন্দ্য কেটে যেতে থাকে অর্জুনকুমারের।

ফুটিফাটা জমি আর এবড়ো খেবড়ো উঁচু আলপথের আনাচে কানাচে সবুজ ঘাস শিশিরে ভিজে আছে। চারিদিক জনশূন্য। মাঝে মাঝে দু-চারটে সোনালি গো-সাপ সন্দিগ্ধ চোখে অর্জুনকুমারদের দিকে তাকিয়ে পেট টানতে টানতে দৌড়ে দূরে চলে যায়। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে ঝাঁকে ঝাঁকে অজস্র পাখি।

এখন দ্রুত কুয়াশা কেটে গিয়ে চারিদিক পরিষ্কার আলোয় আরো ঝলমলিয়ে উঠেছে। প্রকৃতির এমন স্বদেশে, এত বিশাল মেঘমুক্ত আকাশের তলায় জীবনে আর কখনও হেঁটেছেন কিনা, অর্জুনকুমার মনে করতে পারেন না। হঠাৎ অদ্ভুত এক ছেলেমানুষি তাঁর ওপর ভর করে। কখনও সরু আলের ওপর দিয়ে, কখনও বা নিচে মাঠে নেমে তিনি যেন ছটফটে বালকের মতো উড়তে থাকেন।

এই বাধাবন্ধহীন আকাশ, সকালের নরম মায়াবী রোদ, অফুরন্ত শস্যক্ষেত্র—এসবের মধ্যে দারুণ এক ম্যাজিক রয়েছে। আর সেই ম্যাজিকটি অর্জুনকুমারের সঙ্গীদের ভেতরেও চারিয়ে যাচ্ছিল।

সঞ্জীব বলেন, 'মাঝে মাঝে এরকম নেচারের কাছে চলে আসাটা খুব দরকার। সিটিতে থেকে থেকে লাইফ একেবারে মেকানিক্যাল হয়ে গেছে। রোজ সেই এক ব্যাপার—প্রোডিউসারদের লাইন, স্টুডিও, শুটিং, ধান্দাবাজদের চামচাগিরি, সেক্সি বিচগুলোর কামড়া কামড়ি, পার্টি, হুল্লোড়— অ্যান্ড, অ্যান্ড র‍্যাটরেস ফর মানি অ্যান্ড গ্ল্যামার। এখানে এসে নার্ভ জুড়িয়ে যাচ্ছে।' একটানা এতগুলো কথা বলার পর একটু থেমে আবেগের গলায় ফের শুরু করেন, 'দা প্লেস ইজ সো সিরিন, সো পীসফুল—আহ্।'

রোহিত বলেন, 'অর্জুনজি, আপনি জোর করেছিলেন, তাই এখানে আসা হল। নইলে কান্ট্রিসাইডে এমন একখানা গ্র্যান্ড মর্নিং ওয়াক কোনোদিনই করা হত না। দারুণ ভালো লাগছে।' এই সব গ্রামাঞ্চল সম্পর্কে রোহিত কালই কী ধরনের মন্তব্য করেছিলেন, মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তা বেমালুম ভুলে গেছেন।

রোহিতদের কথায় কান ছিল না অর্জুনকুমারের। মাঠ আকাশ পাখিটাখি দেখতে দেখতে বার বার তাঁর চোখ গিয়ে পড়ছিল চৌধারির ওপর। নিঃশব্দে সবার আগে আগে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলেছে সে।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন অর্জুনকুমার। অনাবশ্যক একটি কথাও বলে না চৌধারি, এমনকি অকারণে তাঁদের দিকে ফিরেও তাকায় না। কোনো প্রশ্ন করলে শুধু তারই জবাব দেয়, তা-ও খুব

সংক্ষেপে। হঠাৎ লোকটার সঙ্গে আলাপ জমাবার ভীষণ ইচ্ছা হয় অর্জুনকুমারের। জনগণকে নিয়ে যে-ছবিটার পরিকল্পনা তাঁর মাথায় ঘুরছে, কে জানে, চৌধারি তার একটা চরিত্র হয়ে যাবে কিনা।

অর্জুনকুমার ডাকেন, 'চৌধারিজি—'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় চৌধারি। সসম্ভ্রমে বলে, 'জি, সরকার।'

'একটু আস্তে আস্তে হাঁটুন। আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়া যাক।'

'জি—'

চলার গতি কমিয়ে দেয় চৌধারি। অর্জুনকুমার কাছে এসে তার পাশাপাশি হাঁটতে থাকেন। অন্য তিনজন তাঁদের আট দশ ফিট পেছনে।

অর্জুনকুমার বলেন, 'আপনি কোথায় থাকেন?'

'মনচনিয়া গাঁওয়ে।'

'সেটা কতদূরে?'

'ধরমপুর টিশনের পুবে—লগভগ আধা 'মিল' পথ।'

একটু ভেবে অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'জগনাথজি যখন আমাদের সঙ্গে আপনাকে পাঠিয়েছেন তখন মনে হয়, আপনি ওঁদের কাছে কাজ করেন।'

চৌধারি বলে, 'হাঁ। আমি বড়ে সরকার মুনেশ্বরজির ভূমিসেনা।'

এমন কথা আগে কখনও শোনেননি অর্জুনকুমার। রীতিমতো অবাক হয়েই তিনি বলেন, 'ভূমিসেনাটা কী ব্যাপার?'

চৌধারি, ভাসা ভাসা দায়-সারা এমন উত্তর দেয় যে কিছুই বোঝা যায় না কিন্তু প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছিল অর্জুনকুমারের। তিনি তাকে ছাড়েন না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানারকম প্রশ্ন করে চৌধরীর কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত যা বার করা যায় তা এইরকম।

এ-অঞ্চলে মুনেশ্বরজির কত যে জমিজমা তার কোনো হিসেব নেই। চারপাশে পাঁচ সাত মাইল জুড়ে যে বিশাল ভূখণ্ড তার সবটাই তাঁর। (এই খবরটা আগেই পেয়েছিলেন অর্জুনকুমার।) এসব জমির বেশির ভাগ সহজ পথে তাঁর হাতে আসেনি। গরিব, আনপড় মানুষজনকে ঠকিয়ে, কখনো বা গায়েব জোরে, পুরুষ পরম্পরায় তাঁরা দখল করেছেন।

এতকাল মোটামুটি শান্তিতেই কাটছিল। কিন্তু ঝঞ্ঝাট বাধিয়েছে পলিটিক্যাল ঝান্ডাওলারা। ইদানীং মাঝে মাঝেই তারা এখানে এসে নিরীহ আধ-নাঙ্গা ভীরু মানুষগুলোকে উসকে দিয়ে যাচ্ছে। দেশের কানুন নাকি পালটে গেছে। মুনেশ্বর যে বিপুল পরিমাণ জমি নিজের দখলে রেখেছেন, কোনো একজন বা একটি পরিবারের পক্ষে তার হাজার ভাগের এক ভাগ রাখাও সম্ভব না। ঝান্ডাওলারা বোঝাচ্ছে, তোমাদের বাপ-দাদার কাছ থেকে মুনেশ্বররা যেসব ছিনিয়ে নিয়েছে সে-সব আদায় করে নাও। মুখের কথা খসালেই জমি ফেরত পাওয়া যাবে না। দিল্লিতে কানুন একটা তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু জমিমালিকরা তার পরোয়া করে না, বিশেষ করে এই বিহারে। মনে রাখতে হবে, পুলিশ, ছোটে-বড়ে সবকারি আমলা, 'এম্লে', এম.পি, কেউ তাদের পক্ষে একটা আঙুলও তুলবে না। গরিব ভুখা মানুষকে নিজের অধিকার কায়েম করতে হলে হাতিয়ার তুলে নিতেই হবে। সশস্ত্র লড়াই ছাড়া তার সামনে আর কোনো রাস্তা খোলা নেই।

ঝান্ডাওলারা আরও একটা মারাত্মক খবর দিয়ে গেছে। গোটা ভোজপুরে—আরায়, গয়ায়, মজঃফরপুরে, পালামৌতে এবং আরও বহু জায়গায় জমির জন্য রক্তাক্ত লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

এ অঞ্চল আপাতত শান্তই রয়েছে, তবু দূরদর্শী মুনেশ্বর এবং তাঁর স্থানীয় ম্যানেজার জগনাথ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বাছা বাছা কিছু লোক জোগাড় করে একটা বাহিনী তৈরি করেছেন। এরাই হল ভূমিসেনা। এরা তাঁর জমিজমার ব্যাপারে যাবতীয় স্বার্থ রক্ষা করে চলবে। সাবধানের মার নেই। পালামৌ ভোজপুরের আগুন যে কোনোদিন এখানেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

কথা শেষ করে চৌধারি বলে, 'আপনারা মুনেশ্বরজির মেহমান। সরগনা (মান্যগণ্য) আদমি। তাই বিশোয়াস করে কথাগুলো বললাম। এ-সব জানাজানি হলে আমার বিপদ হবে।'

অর্জুনকুমার বুঝতে পারেন, মুনেশ্বর তাঁদের প্রচুর খাতিরযত্ন করে নিজের বাড়িতে রেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কোনোভাবেই তাঁরা মুনেশ্বরের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করবেন না—এইরকম একটা ধারণা করে নিয়ে এতটা মুখ খুলেছে চৌধারি। নইলে তার গলা দিয়ে এ জাতীয় একটি কথাও বেরুত কিনা সন্দেহ।

অর্জুনকুমার চৌধারিকে ভরসা দেন, বিশ্বাসভঙ্গ করে কাউকে এ খবর দেবেন না। ক'দিনের জন্যই বা এসেছেন। বড় জোর সপ্তাহ দুয়েক। তারপর ফিরে যাবেন, বাকি জীবনে এখানে আর হয়তো আসা হবে না। যে মুনেশ্বরজি তাঁদের জন্য এত করেছেন তাঁর সম্বন্ধে ওই সব কথা চাউর করে কী লাভ? অকারণে বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটাতে চান না অর্জুনকুমাররা।

চৌধারি বলে, 'আপকা কিরপা (কৃপা)।'

একটু ভেবে অর্জুনকুমার এবার জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার মতো কত ভূমিসেনা আছে মুনেশ্বরজির?'

চৌধারি জানায়, 'হামনিলোগ চাল্লিশ আদমি হুজৌর।'

'এখানকার গাঁগুলোতে তো অনেক লোক।'

'হাঁ। হোগা দশ বিশ হাজার।'

'এত লোকের জন্যে মোটে চল্লিশ ভূমিসেনা? এতে—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যান অর্জুনকুমার।

ইঙ্গিতটা সঠিক ধরতে পারে চৌধারি। বলে, 'হুজৌর আমাদের চাল্লিশ আদমির চাল্লিশ বন্দুক আছে। হাতে একটা বন্দুক থাকলে হাজার আদমিকে কিসের পরোয়া?'

তাঁদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে রোহিতরা পেছন থেকে কখন যে খুব কাছে চলে এসেছিলেন, অর্জুনকুমার লক্ষ করেননি।

কাঁধের পাশ থেকে চাপা গলায় ইংরেজিতে রোহিত বলেন, 'ওহ্ গড, এ আমরা কোথায় চলে এসেছি। নাইনটিনথ সেঞ্চুরির ফিউডাল সিস্টেম দেখছি এখনও এখানে জাঁকিয়ে রয়েছে। আমাদের কাছে এটা হল নিউ ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া।'

মুখ ফিরিয়ে অর্জুনকুমার সামান্য হাসেন। বলেন, 'ডিসকভারির সবে তো শুরু। এনিওয়ে, মুনেশ্বরজির স্পেশাল কমান্ডোর এই লোকটাকে ভালো করে স্টাডি করবেন রোহিতজি। হী ইজ আ টেরিফিক 'রোগ'। মনে হচ্ছে, লোকটা আমাদের কাজে লেগে যাবে।'

উৎসুক মুখে রোহিত বলেন, 'অবশ্যই লাগবে। ভেরি ইন্টারেস্টিং, অ্যান্ড জবরদস্ত ক্যারেক্টার।'

চোখের কোণ দিয়ে অর্জুনকুমারদের লক্ষ করতে করতে তাঁদের কথা শুনছিল চৌধারি। ইংরেজি বুঝতে পারছিল না সে, তবে তাকে নিয়েই যে আলোচনাটা চলছে সেটা টের পাচ্ছিল। এ নিয়ে যথেষ্ট কৌতূহল থাকলেও চৌধারি কিন্তু মুখ বুজে চুপচাপ হেঁটে যায়, কিছুই জিজ্ঞেস করে না।

অর্জুনকুমার ডাকেন, 'চৌধারিজি, আপনি ভালো বন্দুক চালাতে পারেন, তাই না?'

এমন হাস্যকর প্রশ্ন আগে কেউ কখনও তাকে করেনি। কিন্তু মুনেশ্বরজির সম্মানিত অতিথিদের সামনে তো আর হাসা যায় না। সে শুধু তার বন্দুকবাজির দু-একটা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সবিনয়ে পেশ করে। সাধারণ জানোয়ার মারা তার কাছে জলভাত। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চৌধারি তিন বার তিনটে বাঘ মেরেছে। আকাশের উড়ন্ত পাখিকে যখন তখন গুলি করে নামিয়ে আনতে পারে, ইত্যাদি। এমনভাবে, এত সহজে কথাগুলো বলে যায় চৌধারি যে হত্যাই তার একমাত্র জীবনদর্শন। অর্জুনকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে সে কী ভাবে, কে জানে। আচমকা জামাকাপড়ের ভেতর থেকে এক টানে একটা বন্দুক বার করে বলে, 'আসমানে বহোত পঞ্ছী উড়ছে। হুকুম হো যায় তো গোলি মেরে দো-চারটা নামিয়ে আনি।'

অর্জুনকুমার ভয়ানক হকচকিয়ে যান। লোকটার সঙ্গে যে একটা বন্দুক ছিল, আগে ঘুণাক্ষরেও টের পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া চোখের সামনে অকারণ ক'টা নিরীহ প্রাণীর হত্যাকাণ্ড দেখার বিন্দুমাত্র আগ্রহ

নেই তাঁর। প্রায় চেঁচিয়েই ওঠেন অর্জুনকুমার, 'না না, পাখি মেরে দেখাতে হবে না। আপনার কথা আমরা তো অবিশ্বাস করিনি।'

বন্দুকটা আবার চৌধারির কাপড়-চোপড়ের তলায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা চৌধারিজি আপনার এই বন্দুকের নিশ্চয়ই লাইসেন্স আছে?'

সোজাসুজি উত্তর দেয় না চৌধারি। অনেকটা ঘুরিয়ে বলে, 'হুজৌর, লাইসিনের আশায় বসে থাকলে এ জীওনে আমাদের মতো আদমিদের হাতে আর বন্দুক উঠবে না।'

'তা হলে?'

অর্জুনকুমার কী জানতে চাইছেন, বুঝতে অসুবিধা হয় না চৌধারির। নিরাসক্ত মুখে সে বলে, 'হুজৌর, পাইসা ফেললে দুনিয়ায় না পাওয়া যায় কী? রাইফিল, পিস্তল, মিশিনগান—হর চিজ মিলতা হ্যায়।'

অর্জুনকুমারের মনে পড়ে কোথায় যেন পড়েছিলেন—খুব সম্ভব খবরের কাগজে—'গান রানিং'টা বিহারে কোনো ব্যাপারই না। নানা বর্ডার দিয়ে আকছার প্রচুর চোরাই অস্ত্রশস্ত্র এখানে ঢুকছে। সারা দেশে যত বে-আইনি বন্দুকের গোপন কারখানা আছে তার বেশির ভাগই বিহারে।

অর্জুনকুমার নতুন করে এ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করেন না।

আরও খানিকটা যাবার পর সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। এতক্ষণ একটানা ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে তাঁরা হাঁটছিলেন। এবার দৃশ্যাবলী অনেক বদলে গেছে। ডান দিকে মাঠটা শ পাঁচেক গজ যাবার পর শেষ। তারপর থেকে বিল শুরু। বিলটা এত বিশাল যে দিগন্ত পর্যন্ত জল ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। সকালের সোনালি রোদে বিলের লক্ষ কোটি ঢেউ ঝিকমিক করতে থাকে।

বিলের ধার ঘিরে প্রচুর গাছপালা, ঝোপঝাড় এবং বিরাট বিরাট সব বনস্পতি—অর্জুন, কেঁদ, পরাস ইত্যাদি। ওখানে হাজার হাজার পাখি উড়ছে। তাদের কিচির মিচির দূর থেকেও শুনতে পাচ্ছিলেন অর্জুনকুমাররা।

সবাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অর্জুনকুমার বলেন, 'ওয়ান্ডারফুল। এরকম একটা ম্যাজেস্টিক ভিসুয়াল আমাদের নেক্সট ছবিতে রাখতেই হবে। সঞ্জু, তুই একটা ছবি তুলে রাখ। নতুন ফিল্মের স্টোরি আর সিনারিও নিয়ে যখন রোহিতজির সঙ্গে পরে বসব, পাখি আর বিলের ছবিটা কাছে থাকলে এই জায়গাটার কথা মনে পড়ে যাবে।' রোহিতকে বলেন, 'রোহিতজি, এই বিল টিল নিয়ে একটা সিচুয়েশনের কথা ভাববেন কিন্তু। এমন—'

অর্জুনকুমারের কথা শেষ হয় না। হঠাৎ একটা দৃশ্য তাঁদের রীতিমতো চমকে দেয়। আগে কেউ লক্ষ করেননি, বিলের এধারে ফাঁকা ফসলের জমিতে অনেকগুলো প্রায় সমান মাপের ছোটো ছোটো ঝোপ গড়িয়ে রয়েছে। প্রতিটি ঝোপের মাথায় টিভি অ্যান্টেনার মতো কী যেন আটকানো।

হঠাৎ ঝোপগুলো নিঃশব্দে, খুব আস্তে আস্তে, খানিকটা করে এগিয়ে থেমে যাচ্ছে। তারপর আবার অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গিতে গুটি গুটি চলতে থাকে। বোঝা যায়, এইভাবে থেমে থেমে তারা বিলের দিকে চলেছে। কারো চোখের পাতা পড়ছিল না। এমন দৃশ্য একেবারেই অভাবনীয়। রোহিত বলেন, 'তাজ্জবকা বাত। এরকম ব্যাপার হোল লাইফে কখনও দেখিনি।'

চৌধারিও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। অর্জুনকুমার তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনাদের এখানকার গাছপালা চলতে পারে নাকি?'

চৌধাা অর্জুনকুমারদের মনোভাব বুঝতে পেরেছিল। বলে, 'নেহী সরকার।' চলন্ত ঝোপগুলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয় সে, 'ওরা সব চিড়িয়া ধরতে চলেছে।'

সমস্ত ব্যাপারটা আরও জট পাকিয়ে যায়। বিমূঢ়ের মতো অর্জুনকুমার বলেন, 'মানে?'

চৌধারি বুঝিয়ে দেয়। শীতের শুরুতে ওই বিলটায় ঝাঁকে ঝাঁকে 'বগেড়ি' পাখি এসে পড়ে। চৈত্র মাসের শেষাশেষি পর্যন্ত পাখিগুলো থেকে যায়।

বগেড়ির মাংস খুবই সুস্বাদু। এ-অঞ্চলের গরিব মানুষেরা ওদের ধরার জন্য অদ্ভুত কৌশল বার করেছে। সারা গায়ে গাছের ডালপালা এবং লতাপাতা বেঁধে নকল ঝোপ বানিয়ে তার ভেতর ওরা

লুকিয়ে থাকে। তার আগে বাঁশের সরু সরু কাঠির লম্বাটে মাচা বানিয়ে তার ওপর পাখি-ধরা জাল আটকে দেয়। জালে লাগানো থাকে ঘন আঠা। এই মাচাগুলো নিজের মাথার ওপরে তুলে ধরে (দূর থেকে এগুলোকে টিভি অ্যান্টেনার মতো মনে হয়েছে অর্জুনকুমারদের) সকালে এবং বিকেলে দু'বেলা মাঠে এসে বসে তারা। পাখিরা যাতে টের না পায় তাই থেমে থেমে, আস্তে আস্তে, বিলের দিকে যেতে থাকে। নকল ঝোপগুলিকে আসল ভেবে নিয়ে বগেড়িরা দেহাতিদের মাথায় আটকানো মাচায় এসে বসে এবং তৎক্ষণাৎ ফাঁদে আটকা পড়ে যায়।

এমন পদ্ধতিতে যে পাখি ধরা যায়, এখানে না এলে জানা যেত না। অর্জুনকুমারকে বেশ উত্তেজিত দেখায়। বলেন, 'দুর্দান্ত ক্যামোফ্লেজ। রোহিতজি আমাদের নেক্সট ছবিতে পাখি ধরার ব্যাপারটা কিন্তু 'মাস্ট'। ওটা রাখতেই হবে।' চৌধারিকে বলেন, 'আমরা ওই লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

চৌধারি বলে, 'জরুর। আইয়ে—'

চৌধারির সঙ্গে সবাই ডান দিকে এগিয়ে যান। কয়েক পা সবে গেছেন, ঝোপগুলো আচমকা বিলের দিকে এলোমেলো দৌড়তে থাকে।

চৌধারি চড়া গলায় হুমকে ওঠে, 'এই শালে লোগ, রুখ যা—রুখ যা—'

ঝোপগুলো দৌড় থামিয়ে ফের দাঁড়িয়ে পড়ে।

অর্জুনকুমাররা কাছাকাছি আসতেই একটা ঝোপের ডালপালা সরিয়ে এক মধ্যবয়সী দেহাতি মুখ বাড়ায়। তাকে সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে। হাতজোড় করে সে বলে, 'হামনিলোগকা কুছ কসুর হুয়া?'

চৌধারি মুখ খোলার আগেই অর্জুনকুমার খুব নরম গলায় বলে, 'না না, কোনো কসুর হয়নি। ভয় পেও না। তোমাদের সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। বেশিক্ষণ আটকে রাখব না।'

অর্জুনকুমারের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে একবার দেখে নেয় লোকটা। কোনো উত্তর দেয় না।

অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কোথায় থাকো?'

লোকটা জানায়, তারা আশেপাশের গ্রামগুলোর বাসিন্দা।

'রোজই তোমরা পাখি ধরতে এখানে আসো?'

'হাঁ সরকার। বগেড়ি ধরে নিয়ে না গেলে বালবাচ্চাসুদ্ধু না খেয়ে মরতে হবে।'

'তোমরা অন্য কাজটাজ কর না?' অর্জুনকুমার এই যে প্রশ্নটা করলেন সেটা অকারণে নয়। শুধু মরশুমি পাখির ওপর ভরসা করে তো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। তিনি জানতে চান, এই মানুষগুলোর পয়সা রোজগারে অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য উপায় আছে কিনা।

লোকটা এবার যা বলে তা এইরকম। তারা গাঁওবালারা বড়ে সরকার মুনেশ্বর সিংয়ের জমিতে পুরুষানুক্রমে কাজ করে আসছে। কিন্তু খরা বা বন্যার মতো মারাত্মক দুর্যোগ ঘটে গেলে চাষবাস একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। তখন তাদের কাজ থাকে না। কাজ নেই তো কামাইও নেই। এই সময়টা পাখি টাখি ধরে এবং নানারকম উঞ্ছবৃত্তি করে তাদের বেঁচে থাকতে হয়। দিনরাত তারা আর্জি জানায়, 'হো রামজি, হো কিষুণজি, পরের বছর যেন বান না ডাকে, খরায় সব কিছু যেন পুড়ে ঝুড়ে না যায়, আর মুনেশ্বরজির জমিনে যেন ফসল উপচে পড়ে।'

এই মানুষগুলোর জন্য গভীর সহানুভূতি বোধ করতে থাকেন অর্জুনকুমার। হঠাৎ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সেই দেহাতিগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। বলেন, 'তোমাদের এখান থেকে অনেকেই তো বড় বড় শহরে গিয়ে কাজ করছে। তোমরাও তো সেখানে গিয়ে পয়সা রোজগার করতে পারতে।'

লোকটা জানায়, সে শুনেছে এ বছরই কিছু লোক 'ভারী ভারী টৌনে' গিয়ে ঠিকাদারদের কাছে কাজ নিয়ে ভালো 'কামাই' করেছে কিন্তু কাদের ধরলে টৌনে কাজকর্ম পাওয়া যায় তা তারা জানে না। তা ছাড়া যেটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার, এ অঞ্চলের মানুষজনের বেশির ভাগই তাদের এলাকা ছেড়ে দূরে কোথাও যায়নি। অচেনা বড় শহর সম্পর্কে তাদের রীতিমতো ভয় রয়েছে। খরা হোক, বন্যা হোক, এখানেই মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে হয় তাদের।

লোকটা কথা বলছিল ঠিকই, কিন্তু বার বার তার চোখ চলে যাচ্ছিল বিলের দিকে। অর্জুনকুমারের কৌতূহল মেটানোর চাইতে পাখিদের কাছাকাছি পৌঁছুনোটা তাদের কাছে অনেক বেশি জরুরি।

লোকটার মনোভাব বুঝতে পারছিলেন অর্জুনকুমার। আর তাদের আটকে রাখা ঠিক হবে না। তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, 'যাও, বিলে গিয়ে পাখি ধর—' কিন্তু হঠাৎ পাশের ঝোপটার দিকে তাঁর চোখ চলে যায়। লতাপাতা সরিয়ে একটি সতেরো আঠারো বছরের মেয়ে অবাক বিস্ময়ে তাঁকেই দেখছে।

মাজা রং মেয়েটির। শালিকের চোখের মতো ঘন পালকে-ঘেরা টানা চোখ, মণি দু'টো কালো কুচকুচে। মুখখানা বেশ তরতরে। ঠোঁট ঈষৎ ভারী। তার মুখে নিষ্পাপ সারল্য মাখানো। নাকে রক্তবিন্দুর মতো লাল পাথর-বসানো চাঁদির নাকফুল, কানে চাঁদিরই ছোটো ছোটো দু'টি মাকড়ি। এ ছাড়া গলায় বা হাতে ধাতুর চিহ্নমাত্র নেই।

অর্জুনকুমার শুনেছেন, গাঁয়ের মেয়েরা ভীষণ লাজুক হয়। কিন্তু ঝোপের ভেতরকার এই যুবতী চোখাচোখি হওয়া সত্ত্বেও মুখ নামিয়ে নিচ্ছে না। সে পলকহীন তাকিয়ে থাকে।

অর্জুনকুমার ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট উৎসুক হয়ে ওঠেন। মেয়েটার ওভাবে তাকিয়ে থাকার কী কারণ হতে পারে? পায়ে পায়ে তার কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন, 'কী নাম তোমার?'

মেয়েটির এতটুকু সঙ্কোচ নেই। সে বলে, 'হাসিনা। সবাই ডাকে হাস্‌সু।' তার গলার আওয়াজ জড়তাহীন এবং মিষ্টি।

'বাহ্, সুন্দর নাম। কোন গাঁয়ে থাকো তোমরা?'

চৌধারিও অর্জুনকুমারের সঙ্গে চলে এসেছিল। পাশ থেকে সে জানায়, বিলের বাঁ দিকে যে মুসলমানদের গ্রামগুলো রয়েছে, হাসিনা সেখানে থাকে।

অর্জুনকুমার হাসিনাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরাও কি মুনেশ্বরজির জমিনে কাজ কর?'

'জি—' মাথাটা একদিকে সামান্য হেলিয়ে দেয় হাসিনা।

দেখা যাচ্ছে, এখানকার হিন্দু এবং মুসলমানদের প্রায় সবাই মুনেশ্বর সিংয়ের জমি চষে পেটের দানা জোগাড় করে। খরায় যখন মাঠঘাট শস্যক্ষেত্র জ্বলে খাক হয়ে যায় কিংবা বন্যায় ভেসে যায় সমস্ত চরাচর, তখন গরিবের চাইতে গরিব এই দুই ধর্মের মানুষজনকে পাখিটাখি ধরে এবং আরও পঞ্চাশ রকম কৌশলে বেঁচে থাকতে হয়। তাদের সুখদুঃখ, বাঁচা-মরা, সব কিছুই আবহমান কাল ধরে একসঙ্গে এক সুতোয় গাঁথা।

অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'ঘরে কে কে আছে তোমার?'

হাসিনা বলে, 'হামনি আউর হামনিকা—' বলে থেমে, মুখ নামিয়ে লাজুক হাসে।

অর্জুনকুমার বুঝতে পারেন স্বামী-স্ত্রী মিলিয়ে তাদের দু'জনের সংসার। হয়ত নতুন বিয়ে হয়েছে, তাই স্বামীর কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছে। জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার ঘরবালাও কি পাখি ধরতে এসেছে?'

'নেহী, সে জঙ্গলে সুথনি আনতে গেছে।'

'সুথনি কী?'

পাশ থেকে চৌধারি জানিয়ে দেয়, সুথনি এক ধরনের বুনো কন্দ। ঘরে চাল-গেঁহু না থাকলে গরিবেরা জঙ্গল থেকে এগুলো তুলে এনে পুড়িয়ে নুন মাখিয়ে খায়। অর্থাৎ কেউ ঘরে বসে নেই। হাসিনারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই সকাল হতে না হতে খাদ্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে।

অর্জুনকুমারের ডান ধারে ছিলেন রোহিত। তিনি তাঁকে বলেন, 'একজিসটেন্সের স্ট্রাগল কাকে বলে বুঝতে পারছেন? হোয়াট আ ক্রুড রিয়ালিটি! ফিরে গিয়ে সুথনির নামটা লিখে রাখবেন। আর কাল থেকে একটা নোট বই নিয়ে আসবেন। সব কিছু তো মনে করে রাখা যায় না।' বলে হাসিনার দিকে ফেরেন, 'একদিন তোমাদের গাঁয়ে চলে যাব।'

হাসিনা কথা বলছে ঠিকই কিন্তু অর্জুনকুমারের মুখের ওপর থেকে তার চোখ পলকের জন্যও সরছে না। অসীম বিস্ময় নিয়ে সে তাকিয়েই আছে। খুশিতে এবং আগ্রহে তার গভীর কালো চোখ দুটো চকচক করে। অর্জুনকুমারের কথা সে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। বলে, 'আয়েঙ্গে তো জরুর!' তার গলা অসহ্য আবেগে এবং উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

'নিশ্চয়ই।' অর্জুনকুমার সস্নেহে হাসেন।

'কবে আসবেন?'

'সেটা ঠিক বলতে পারছি না। এখন আমরা কিছুদিন এখানে আছি। ঘুরতে ঘুরতে একদিন ঠিক হাজির হয়ে যাব।'

হঠাৎ গলার স্বরটা ঝপ করে নামিয়ে হাসিনা ফিসফিসিয়ে বলে, 'সাহাব, আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি।'

অর্জুনকুমার ভয়ানক হকচকিয়ে যান। তা হলে কি এই গ্রাম্য যুবতীটির কাছে ধরা পড়ে গেছেন? দাড়ি না কামিয়ে, সাদামাঠা পোশাক পরে নিজের আইডেনটিটি মুছে ফেলার জন্য যে ছদ্মবেশ নিয়েছেন তা কি পুরোপুরি ব্যর্থ? তিনি উত্তর দেবার আগে পাশ থেকে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে ওঠে চৌধারি, 'নেহী, হুজৌরকে তুই চিনতে পারিসনি।'

চমকে চৌধারির মুখের দিকে তাকান অর্জুনকুমার। এত জোর দিয়ে সে কী করে বলতে পারছে, হাসিনা তাকে চিনতে পারেনি! তা হলে কি চৌধারিও তাঁর পরিচয় জানে? এবং এটা যাতে চারিদিকে চাউর হয়ে না যায় সেজন্য হাসিনাকে থামিয়ে দিতে চাইছে? কে জানে জগনাথের নির্দেশেই কিনা। কিন্তু পরক্ষণেই অর্জুনকুমারের মনে পড়ে যায়, চৌধারির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় তাঁর নাম টাম একবারও মুখে আনেননি জগনাথ। তবে কি গোপনে চৌধারিকে সব জানিয়ে দিয়েছিলেন? অথচ চৌধারির তাকানো, কথাবার্তা বা আচরণে ঘুণাক্ষরেও টের পাওয়া যায় না যে সে তাঁকে চেনে। চিনেও যদি নিরাসক্ত মুখে না চেনার ভান করে থাকতে পারে তা হলে বুঝতে হবে মুনেশ্বর সিংয়ের এই বন্দুকবাজটির মতো উঁচু স্তরের অভিনেতা ইন্ডিয়ার ফিল্মি দুনিয়াতেও খুব বেশি নেই।

হাসিনা ঢোক গিলে ভয়ে ভয়ে ফের বলে, 'লেকেন—'

চৌধারির চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। মুখটা এখন হিংস্র দেখাচ্ছে। গলা আরও চড়িয়ে সে হুঙ্কার ছাড়ে, 'বিলকুল চোপ। আমি বলছি হুজৌরকে তুই চিনতে পারিসনি—ব্যস। অব্ ভাগ যা শালী। হুজৌরের ব্যাপারে কোথাও, কারো কাছে গলার নালিয়া দিয়ে এতটুকু আওয়াজ বার করবি না। করলে জান চৌপট হয়ে যাবে। ভাগ ভাগ—'

মুখটা আতঙ্কে রক্তশূন্য হয়ে যায় হাসিনার। দ্রুত লতাপাতা টেনে দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেলে সে।

চৌধারি এবার অন্য ঝোপগুলোর উদ্দেশে বলে, 'যা শালেরা, যা—' ঝোপগুলো ফের বিলের দিকে দৌড়তে শুরু করে। অগুনতি ঝোপের কোনটার মধ্যে যে হাসিনা রয়েছে, এখন আর বোঝার উপায় নেই।

চৌধারি লোকটা যে কতখানি মারাত্মক, নতুন করে টের পেয়ে যান অর্জুনকুমার। সে তাঁকে চেনে কিনা, এ নিয়ে আর বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না।

চৌধারি গলার স্বর পালটে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলে, 'চলিয়ে হুজৌর, গাঁওয়ে যাওয়া যাক।'

অবাক হয়ে চৌধারিকে লক্ষ করছিলেন অর্জুনকুমার। কণ্ঠস্বরই সে বদলে ফেলেনি, একটু আগের হিংস্রতাও মুখের মসৃণ চামড়ার নিচে লুকিয়ে ফেলেছে। নম্র শান্ত বিনয়ী এই চৌধারিকে দেখে অর্জুনকুমারের বিস্ময় অনবরত বেড়েই যায়। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, চলুন।'

খানিকটা যাবার পর চৌধারি বলে, 'সরকার, একটা কথা বলব?'

তার বলার ধরনে এমন কিছু রয়েছে যাতে ভেতরে ভেতরে সতর্ক হয়ে যান অর্জুনকুমার। বলেন, 'কী?'

'কিরপা করে ওই কথাগুলো ওদের বলবেন না।'

'কোন কথাগুলো?'

'ওই যে গাঁও ছেড়ে ভারী টৌনে গিয়ে কাজ করার কথা।'

'কিন্তু এখানে তো কাজ নেই। শহরে না গেলে গাঁয়ের লোকেরা বাঁচবে কী করে?'

'আর তো একটা মাস। তারপরেই এখানে জমি চষা শুরু হয়ে যাবে। হর সাল খরাও হয় না, বাঁড়ও না।'

বিদ্যুৎচমকের মতো অর্জুনকুমারের মনে হয়, গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ যদি শহরে কাজ করতে চলে যায়, মুনেশ্বর সিংয়ের বিশাল ভূখণ্ড চষবে কে? গাঁয়ের লোকজনের সঙ্গে পাছে শহরে যাবার প্রসঙ্গ ওঠে, সেই জন্যই কি খবরদারি করতে জগনাথ চৌধারিকে তাঁদের সঙ্গে দিয়েছেন?'

অর্জুনকুমার বলেন, 'আপনার কথা আমার মনে থাকবে চৌধারিজি।'

কিছুক্ষণের মধ্যে প্রথম গ্রামটির কাছে পৌঁছে যান ওঁরা। বিলের দিক থেকে আসতে আসতে অর্জুনকুমার মনস্থির করে ফেলেছেন, চৌধারির মতো এক বন্দুকবাজকে সঙ্গে নিয়ে গাঁয়ের লোকজনের সঙ্গে কথা বলবেন না। চৌধারির আসল পরিচয়টা সবারই জানা। সে কাছে থাকলে কেউ পারতপক্ষে মুখ খুলতে চাইবে না। খুললেই আড়ষ্টভাবে দু-একটা মামুলি কথা বলে চুপ করে যাবে।

অর্জুনকুমার দাঁড়িয়ে পড়েন। অগত্যা বাকি সবাইকে থামতে হয়।

চৌধারি বলে, 'চলুন, গাঁওয়ের ভেতরে যাই।'

অর্জুনকুমার বলেন, 'আমার কিছু বলার আছে চৌধারিজি—'

'হাঁ হাঁ, বোলিয়ে—'

'গাঁওয়ের মুরুব্বিদের কারো একজনের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিন। তারপর আপনি চলে যান। আমরা কাজ সেরে পরে ফিরব।'

চৌধারি আঁতকে ওঠে, 'এ আপনি কী বলছেন সরকার! আপনাদের পেহারা (পাহারা) দেবার জন্যে জগনাথজি আমাকে সঙ্গে দিয়েছেন। আমি একলা ফিরে গেলে উনি গুস্‌সা করবেন।'

অর্জুনকুমার বলেন, 'করবেন না। আপনার চিন্তা নেই। যা বলার ফিরে গিয়ে আমি জগনাথজিকে বলব।'

কথাগুলো অর্জুনকুমার ধীরে ধীরে, কোনোরকম বাড়তি জোর না দিয়েই বলেছেন কিন্তু তাঁর বলার মধ্যে এমন এক প্রবল কর্তৃত্ব রয়েছে যা অমান্য করা যায় না। চৌধারি বলেন, 'লেকেন—'

'কী?'

'জগনাথজি বলে দিয়েছেন, আপনাকে চিনে ফেললে অসুবিধে হবে।'

'চেনার কোনো কারণ নেই। আর তেমন যদি হয়ই তখন দেখা যাবে। আরেকটা কথা—'

কোনো প্রশ্ন না করে তাকিয়ে থাকে চৌধারি।

অর্জুনকুমার বলেন, 'এখানে আসার আগে মুনেশ্বরজির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, ইচ্ছেমতো আমরা গাঁয়ে ঘুরে বেড়াব। দরকার হলে আপনারা সাহায্য করবেন।'

যত বড় বন্দুকবাজই হোক, চৌধারি তার মনিব মুনেশ্বরজির এই মান্য অতিথির পরিচয় ভালো করেই জানে। আর আপত্তি করতে সাহস হয় না। সে শুধু অসহায়ভাবে বলে, 'আপকা যো মর্জি! তব্ একগো বাত—'

অর্জুনকুমার সামান্য বিরক্ত হন। বলেন, 'কী?'

সামনের গ্রামটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে চৌধারি বলে, 'হুজৌর এই গাঁওটার নাম ভারহাটিয়া। এর ডাইনা বগলের (ডান পাশের) গাঁওগুলোতে কিরপা করে যাবেন না।'

'কেন?'

'ওগুলোতে অনেক খতারনাক আদমি রয়েছে।'

কী ধরনের খতারনাক অর্থাৎ বিপজ্জনক লোকজন ওই সব গ্রামে থাকতে পারে, অর্জুনকুমার ভেবে পান না। তিনি বলেন, 'আপনার হুঁশিয়ারি মনে রাখতে চেষ্টা করব।'

চৌধারি এবার গাঁয়ে ঢোকার মুখটায় গিয়ে জোরে জোরে ডাকতে থাকে, 'এ ঝুগ্গিলাল—ঝুগ্গিলাল হো—'

বারকতক ডাকাডাকির পর একটা পাকানো চেহারার লোক প্রায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে চৌধারির সামনে এসে দাঁড়ায়। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। মাথায় একটা চুলও কাঁচা নেই। নাকের তলায় ধবধবে ঝোপড়া গোঁফ। চোখ ঘোলাটে। পরনে ময়লা চিটচিটে ঠেটি ধুতি আর তালি-মারা জামার ওপর পোকায়-কাটা ধুসো কম্বল। মাথায় আলগাভাবে গামছা বাঁধা।

হাতজোড় করে সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে ঝুগ্নিলাল বলে, 'আপ ইতনা সবেরে সবেরে চৌধারিজি! হামলোগকা কুছ কসুর হুয়া?'

অর্জুনকুমারের মনে পড়ে পাখি-মারা সেই আধবুড়ো দেহাতিটাও এই একই কথা বলেছিল। চৌধারি, হয়ত বা জগনাথের লোকজন সম্পর্কে এদের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক রয়েছে।

ভরসা দিয়ে চৌধারি ঝুগ্নিলালকে বলে, 'আরে নেহী, ঘাবড়ানা মাত।' খানিক দূরে অর্জুনকুমারদের দেখিয়ে বলে, 'এঁরা বড়ে সরকারের মেহমান। তোমাদের গাঁও দেখতে এসেছেন। ভেতরে নিয়ে যাও।'

তটস্থ হয়ে অর্জুনকুমারদের কাছে ছুটে যায় ঝুগ্নিলাল। মাথাটা মাটির কাছাকাছি ঝুঁকিয়ে বলে, 'নমস্তে হুজৌর। কা সৌভাগ হামলোগকা! কিরপা করকে আইয়ে—'

চৌধারি ঝুগ্নিলালের পরিচয় দেয়। সে ভারহাটিয়া গাঁওয়ের 'পঞ্চ'-এর মাথা। তাকে এখানকার সবাই মান্য করে। তার কথায় গাঁওবালারা ওঠে, বসে। অর্জুনকুমার এর কাছ থেকে সবরকম সাহায্য পাবেন।

ঝুগ্নিলালকে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে অর্জুনকুমার বলেন, 'এমন একজনকে পেয়ে আমার খুব উপকার হল। চলুন ঝুগ্নিলালজি—'

চৌধারি দাঁড়িয়ে থাকে। ঝুগ্নিলালের সঙ্গে অর্জুনকুমাররা ভারহাটিয়া গাঁয়ের দিকে এগিয়ে যান।

কিন্তু দু' চার পা গিয়েই হঠাৎ থেমে যায় ঝুগ্নিলাল। হাত জোড় করেই ছিল সে। ভীরু গলায় বলে, 'রাগ না করলে একটা কথা বলব?'

'রাগ করব কেন? আপনি বলুন—'

'আমরা অচ্ছুৎ। দুনিয়ার সব থেকে নীচা জাত—'

অর্জুনকুমার চমকে ওঠেন। বিমূঢ়ের মতো জিজ্ঞেস করেন, 'তাতে কী হয়েছে?'

ঝুগ্নিলাল জানায়, বামহন ক্ষত্রিয় এবং কায়াথদের পক্ষে তাদের ছায়া মাড়ানোও পাপ। তাদের ছুঁলে 'উঁচা' জাতের লোকেদের দশ বার 'নাহানা' সেরে শরীর শুদ্ধ করতে হয়।

অর্জুনকুমার শুনেছেন, গোটা নর্দার্ন ইন্ডিয়ায়, বিশেষ করে বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে জাতপাতের ব্যাপারটা মারাত্মক। বোঝা যায়, আবহমান কাল বামহন-কায়াথদের পায়ের তলায় থেকে থেকে ঝুগ্নিলালের মতো মানুষেরা ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স অর্থাৎ হীনম্মন্যতায় ভুগছে। পুরুষ পরম্পরায় তাদের রক্তের মধ্যে সংস্কারের মতো এটা মিশে আছে। এই ভাইরাস থেকে ঝুগ্নিলালদের বুঝিবা মুক্তি নেই।

ঝুগ্নিলাল এবার বলে, 'হুজৌর, আপনারা যখন বড়ে সরকারের মেহমান, জরুর বামহন-কায়াথ-ক্ষত্রিয় হোঙ্গে। আমাদের অচ্ছুৎ-টোলিতে যাবেন কিনা, কিরপা করে ফির একবার ভেবে দেখুন।'

ঝুগ্নিলাল এবং তার ক্লাসের লোকজনের জন্য খুবই দুঃখ হয় অর্জুনকুমারের। সহৃদয় ভঙ্গিতে তিনি বলেন, 'নতুন করে ভাবার দরকার নেই। আমরা ছুয়াছুত জাতপাত মানি না। চলুন—'

এমন অবিশ্বাস্য কথা সারা জীবনে ক্বচিৎ কখনো শুনেছে ঝুগ্নিলাল। বিমূঢ়ের মতো অর্জুনকুমারকে দেখতে দেখতে সে বলে, 'সচমুচ?'

খুব আন্তরিকভাবে হেসে অর্জুনকুমার বলেন, 'হ্যাঁ, সত্যি।'

তবু সংশয় পুরোপরি কাটে না ঝুগ্নিলালের। সে বলে, 'আইয়ে—'

আবার সবাই চলতে শুরু করেন।

পেছন থেকে চৌধারি কড়া গলায় ঝুগ্নিলালকে হুঁশিয়ার করে দেয়, 'হুজৌরকা সামুনমে জ্যাদা বকোয়াস (বকর বকর) নায় করনা—সমঝা?'

ঝুপ্পিলাল ভয়ে বয়ে বলে, 'নেহী করেগা চৌধারিজি—'

'হুজৌররা যা জানতে চাইবেন সিরিফ তার জবাব দেবে। ঠিক হ্যায়?'

'হাঁ চৌধারিজি।'

গাঁয়ের ভেতর ঢুকে ঝুপ্পিলাল বলে, 'আমাদের গাঁওয়ে বামহন-কায়াথ, কি বড়ে বড়ে আদমিরা আসে না। আপনারাই পয়লা এলেন।'

অর্জুনকুমার সামান্য হাসেন।

চলতে চলতে সবাই চারিদিকে তাকাচ্ছিলেন। ভারহাটিয়া গ্রামটা একেবারে ছিরিছাঁদহীন। এটার গড়ে ওঠার পেছনে আদৌ কোনো পরিকল্পনা নেই। যে যেখানে পেরেছে ইচ্ছামতো ঘর তুলে নিয়েছে। যেদিকে চোখ ফেরানো যাক, মাটি বাঁশ বা খেলো কাঠের অগুনতি ভাঙাচোরা কোমর-বাঁকা বাড়ি। সেগুলোর মাথায় ফুটিফাটা পুরনো টিন বা টালির চাল। দূর থেকে দেখলে ইতিহাসের আদিযুগের ধ্বংসস্তূপ মনে হয়।

মাঝে মাঝে খয়াটে ফাটা পাথরে বাঁধানো ইঁদারা। দু-একটা হাজামজা পুকুরও চোখে পড়ছে, সেগুলোতে এক ফোঁটা জলও নেই। তবে প্রচুর গাছপালা চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পরাস, কড়াইয়া, সিমার, কেঁদ এবং বিশাল ছাতার মতো ঝাড়ালো রেন-ট্রি। এ সব গাছের একটারও নাম জানেন না অর্জুনকুমার। আর যা চোখে পড়ে তা হল দু-চারটে কঙ্কালসার গরু এবং বকরি।

মনুষ্যজাতির কোন ক্লাসটি ভারহাটিয়া গাঁয়ের বাসিন্দা, তারা অর্থনৈতিক কোন লেভেলে পড়ে আছে, এখানে পা দেওয়ামাত্র টের পাওয়া যায়।

সমস্ত গাঁ'টা এত বেলাতেও প্রায় নিঝুম। লোকজন বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। কিছু রোগা রোগা, আধ ন্যাংটা ছেলেমেয়ে অর্জুনকুমারের পিছু নিয়েছে। জোয়ান বয়সের মেয়ে বা পুরুষ একেবারেই চোখে পড়ে না। তবে প্রতি ঘরের দাওয়ায়, জানালায় বা রাস্তায় মাঝবয়সী পুরুষ এবং মেয়েমানুষ আর প্রচুর বুড়োবুড়ি দেখা যাচ্ছে। প্রায় সবাই অসুস্থ আর রুগ্ণ। কেউ কেউ খক খক কেশে চলেছে। গোটা গ্রামটা বাচ্চাকাচ্চা আর অশক্ত বয়স্ক মানুষদের কলোনি কিনা কে জানে।

আশ্চর্য ব্যাপার, এক ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া চট বিছিয়ে এই সৃষ্টিছাড়া গাঁয়ে কিছু বয়স্ক মেয়ে পুরুষ গান গাইছে। কথাগুলো পরিষ্কার বুঝতে না পারলেও সুরটা অর্জুনকুমারের চেনা। প্রায় এই সুরেই লোকাল ট্রেনের কামরায় সেই দেহাতিদের গাইতে শুনেছেন। তিনি বলেন, 'হোলির গান—তাই না ঝুপ্পিলালজি?'

'হাঁ সরকার।' পাশাপাশি চলতে চলতে ঝুপ্পিলাল জানায়, ক'দিন পরেই তাদের এ অঞ্চলের সব চেয়ে বড় তৌহার হোলি আসছে। ফাগ ছড়াবার সঙ্গে সেদিন গানবাজনাও তো হবে। হোলিকে মহা সমারোহে 'স্বাগত' জানাবার জন্য আগে থেকেই ঢোল টোল নামিয়ে গানের সুরগুলি ঝালিয়ে রাখা হচ্ছে।

অর্জুনকুমার ভাবেন, সোসাইটির একেবারে নিচের তলায় পড়ে আছে বলেই হয়তো এই মানুষগুলোর সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগটা অত্যন্ত প্রবল। তিনি শুনেছেন যে যত গরিব, ধর্ম এবং দৈবের প্রতি তার তত ঝোঁক এবং টান।

অর্জুনকুমার নিজেও হিন্দু কিন্তু সে শুধু নামেই। কবে কখন কোন উৎসব আসে, কখন শেষ হয় তার খোঁজও রাখেন না তিনি। হিন্দুধর্মের আচার, অনুষ্ঠান বা অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই। তিনি মেট্রোপলিসের বাসিন্দা এক ঘোর উদাসীন নন-প্র্যাকটিসিং হিন্দু।

অর্জুনকুমারদের দেখে যে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাদের চোখে অনন্ত বিস্ময়, ভয় এবং সংশয়।

মিনিট কয়েক হাঁটার পর মোটামুটি একটা ফাঁকা জায়গায় অর্জুনকুমারদের নিয়ে আসে ঝুপ্পিলাল। এখানে অনেকগুলো বিরাট বিরাট ঝাঁকড়া গাছের জটলা। সেগুলোর তলায় দড়ির নড়বড়ে চারপায়া পড়ে আছে। খুব সম্ভব জায়গাটা গাঁয়ের লোকেদের 'গপসপ' করা বা আড্ডা দেবার 'রাঁদেভু'।

ঝুগ্নিলাল বরাবর হাতজোড় করে এতটা রাস্তা এসেছে। চারপায়াগুলো দেখিয়ে বলে, 'অনেকক্ষণ হাঁটতে হয়েছে। জরুর থকে গেছেন। কিরপা করে এখানে বসে আরাম করুন।'

অর্জুনকুমার একসঙ্গে এতটা পথ কখনও হেঁটেছেন কিনা, মনে করতে পারেন না। ভারতবর্ষের গ্রাম দেখার জন্য প্রাণে যত অদম্য উৎসাহই থাক না, তিনি বেশ ক্লান্তিই বোধ করছিলেন। একটা চৌপায়ায় তিনি বসে পড়েন, বাকি সবাই অন্য চৌপায়ায় শরীর এলিয়ে দেন।

যে বাচ্চাকাচ্চারা পিছু পিছু আসছিল, খানিকটা দূরে তারা দাঁড়িয়ে পড়ে।

ঝুগ্নিলাল শশব্যস্তে গাছতলা থেকে গ্রামের লোকজনকে ডাকাডাকি করতে থাকে, 'তুমলোগ সব ইঁহা তুরন্ত আ যাও—'

চারিদিক থেকে মাঝবয়সী পুরুষ, মেয়েমানুষ আর বুড়োবুড়িরা গাছতলায় চলে আসে। পুরুষেরা অর্জুনকুমারদের সামনে মাটিতে বসে পড়ে আর মেয়েমানুষেরা বড় ঘোমটা টেনে দূরে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকে। কেন, কোন উদ্দেশ্যে এই সব 'সরগনা আদমি (মান্যগণ্য লোক) আচমকা তাদের গাঁয়ে এসে হাজির হলেন, সেটা জানার জন্য তাদের অসীম কৌতূহল।

যে বুড়োধুড়োরা মাটিতে বসে ছিল, ঝুগ্নিলালও তাদের পাশে গিয়ে বসে।

অর্জুনকুমার খুব বিব্রত বোধ করছিলেন। বলেন, 'নিচে কেন, আপনারা উঠে আমাদের পাশে বসুন।'

বুড়োরা এবং ঝুগ্নিলাল জিভ কেটে, কানে হাত দিয়ে এবং প্রবল বেগে হাত আর মাথা ঝাঁকিয়ে জানায়, অর্জুনকুমারদের সঙ্গে চারপায়ায় বসাটা তাদের পক্ষে ঘোর অপরাধ, মাটিতেই তাদের আসল জায়গা।

সেই আজন্মের হীনম্মন্যতা। অর্জুনকুমার বোঝান, তাঁদের সঙ্গে একই উচ্চতায় বসলে কোনোরকম অন্যায় হয় না। কিন্তু ঝুগ্নিলালরা নিচেই বসে থাকে। কিছুতেই তাদের ওপরে তোলা যায় না।

অগত্যা হাল ছেড়ে দিতে হয় অর্জুনকুমারকে। বলেন, 'আপনাদের গাঁয়ে এলাম। সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন ঝুগ্নিলালজি।'

ঝুগ্নিলাল বুড়োটুড়োদের উদ্দেশে বলে, 'এঁরা হলেন বড়ে সরকারের মেহমান। কিরপা করে আমাদের গাঁও দেখতে এসেছেন।'

সবাই সসম্ভ্রমে হাতজোড় করে, 'নমস্তে হুজৌর।'

একটা বুড়ো খুক খুক করে অনবরত কাশছিল। খুব সম্ভব তার বেজায় শ্লেষ্মার ধাত। সে বলে, 'কা সৌভাগ হামলোগনকা। লেকেন, ঝুগ্নি ভেইয়া আমরা যে অচ্ছুৎ, হুজৌরদের জানিয়েছ?'

'হাঁ হাঁ, জরুর।' ঝুগ্নিলাল বলতে থাকে, 'হুজৌররা বলেছেন জাতপাত মানেন না।'

পৃথিবীতে এমন মানুষও যে থাকতে পারে, ভারহাটিয়া গাঁয়ের বাসিন্দারা আগে জানত না। তারা একেবারে হাঁ হয়ে যায়। ঝুগ্নিলালের কাছে শোনার পরও পুরোপুরি বিশ্বাস হতে চায় না। পরক্ষণে তাদের খেয়াল হয়, জাতপাত মানলে এঁরা কখনই তাদের গাঁয়ের ধুলো মাড়াতে আসতেন না।

এবার চারপাশের লোকজনের পরিচয় দেয় ঝুগ্নিলাল, 'এ হল ভৈরুলাল, ও গৈবীনাথ, ও রামধনিয়া, ও রামপেয়ার, ও ভালরাম—'

দেখা যাচ্ছে এখানে নামের ব্যাপারে রামের ছড়াছড়ি। অর্জুনকুমার বলেন, 'আপনাদের গাঁয়ে আসতে পেরে ভালো লাগছে।'

ভালরাম যার নাম, সেই বুড়োটি বলে ওঠে, 'আমাদের গাঁওয়ে দেখার কিছু নেই হুজৌর—সিরিফ বুখার আউর ভুখ।'

ঠিক এইরকম কথাই জগনাথের মুখে কাল শুনেছেন অর্জুনকুমার। তিনি বলতে যাচ্ছিলেন চিরস্থায়ী দারিদ্রের সন্ধানেই তাঁদের এতদূরে ছুটে আসা, কিন্তু তার আগে রোহিত বলে ওঠেন, 'আচ্ছা ঝুগ্নিলালজি—'

'বোলিয়ে সরকার।'

'আপনাদের গাঁয়ে কোন কোন জাতের লোক আছে?'

অর্জুনকুমার বুঝতে পারেন, গ্রাম সম্পর্কে ডিটেলে জেনে নিতে চাইছেন রোহিত। নতুন ছবির কাহিনি তৈরি করতে হলে খুঁটিনাটি সব কিছু দরকার। রিয়ালিটি নিয়ে ছবি করার সমস্যা প্রচুর। ভুলটুল থেকে গেলে রেহাই নেই, দর্শক এবং সমালোচকেরা তুলোধোনা করে ছাড়বে। এ জাতীয় ছবির জন্য রিসার্চ ওয়ার্কটা অত্যন্ত জরুরি।

ঝুগ্নিলাল বলে, 'ধাঙড়, তাতমা, দুসাদ আর কোয়েরি।'

রোহিত বলেন, 'শুনেছি, এ গাঁয়ের সবাই মুনেশ্বরজির জমিনে কাজ করে।'

ঝুগ্নিলাল জানায়, সকলে নয়, শক্তসমর্থ পুরুষ আর মেয়েরাই শুধু কাজ করে। বুড়োধুড়োরা বাতিলের দলে। তাদের কে আর কাজ দেবে? শরীরে তাকত না থাকলে জমি চষা অসম্ভব। মুখ দেখে কেউ কি আর মজুরি দেয়?

রোহিত জিজ্ঞেস করেন, 'আপনাদের নিজেদের জমিন নেই?'

'নেহী, এক 'ধুর' ভি নেহী।'

'কোনোদিনই কি আপনাদের জমিনটমিন ছিল না?'

'ছিল হুজৌর। লেকেন—' বলতে গিয়ে হঠাৎ কিছু মনে পড়তে থেমে যায় ঝুগ্নিলাল।

রোহিত বলেন, 'লেকেন কী?'

'কিরপা করকে মাত পুছিয়েগা।'

রোহিতরা চৌধারির কাছে শুনেছিলেন, মুনেশ্বররা পুরুষানুক্রমে চারপাশের গরিব অচ্ছুৎদের জমিজমা কেড়েকুড়ে নিয়ে নিজেদের দখলের সীমা বাড়িয়েছেন। নিজেদের শস্যক্ষেত্রেই এখন তাদের ক্ষেতমজুর হয়ে পেটের জন্য খাটতে হচ্ছে। জমিন খোয়াবার জন্য তাদের প্রতিক্রিয়া কী, মুনেশ্বর সম্পর্কে তাদের মনোভাব কেমন, বা পলিটিক্যাল ঝাণ্ডাওলারা তাদের আদৌ নাড়া দিতে পেরেছে কিনা, এ সব জানতে ইচ্ছা করে রোহিতের। এই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলে ছবির কাহিনিতে টান টান ড্রামা তৈরি করা যাবে। তিনি বলেন, 'শুনেছি মুনেশ্বরজিরা আপনাদের বাপ-দাদার কাছ থেকে নাকি জমিন ছিনিয়ে নিয়েছিলেন?'

মারাত্মক ঘাবড়ে যায় সবাই। তারা বুঝতে পারে না, মুনেশ্বর সিংয়ের মেহমানরা এমন বিপজ্জনক প্রশ্ন করছেন কেন? এঁরা তাদের ফাঁদে ফেলতে চাইছেন না তো? যদি তারা মুনেশ্বর সম্পর্কে খারাপ কিছু বলে সে সব হয়ত বড়ে সরকারকে জানিয়ে দেবেন। ভয়ে ঝুগ্নিলালের গলা শুকিয়ে যায়। কোনোরকম ঢোক গিলে সে বলে, 'কিরপা করকে মাত পুছিয়েগা।'

'আপনারা কি জানেন, সরকার কানুন বানিয়ে জমিদারি বন্ধ করে দিয়েছে? আজকাল কেউ আর ইচ্ছামতো বেশি জমিন রাখতে পারে না?'

এক বুড়ো, যার নাম রামপেয়ার, বলে, 'শুনা হ্যায়। মাঝে মাঝে ঝান্ডাবালারা এসে বলে যায়—'

তাকে শেষ করতে দেয় না ঝুগ্নিলাল। রুদ্ধশ্বাসে চেঁচিয়ে ওঠে, 'চুপ হো যা রামপেয়ার, বিলকুল মুহ্ বন্ধ্।'

এই মুহূর্তে ভারহাটিয়া গাঁয়ের ধারেকাছে মুনেশ্বর সিং বা তাঁর বন্দুকবাজদের কেউ নেই। তবু এখানকার আবহাওয়ায় মিশে আছে অদৃশ্য চাপা ভয়। মুনেশ্বরের লোকেরা এই গ্রামাঞ্চলে একটা ফিয়ার সাইকোসিস তৈরি করে দিতে পেরেছে। সর্বক্ষণ গাঁয়ের মানুষদের ওপর সেটা প্রচণ্ড চাপ দিয়ে যাচ্ছে।

অর্জুনকুমার চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। ঝুগ্নিলালদের অস্বস্তি আর ভীতির কারণটা তিনি বুঝতে পারছিলেন। কিছুক্ষণ অগে চৌধারির হুঁশিয়ারি তাঁর মনে পড়ে যায়। রোহিতের কানের কাছে মুখ এনে ইংরেজিতে বলেন, 'ওদের এমন প্রশ্ন করবেন না যাতে ভড়কে যায়। উই আর জাস্ট অবজারভারস। শুধু দেখে আর শুনে যাব। গাঁওবালাদের জন্যে আমাদের কোনো কমিটমেন্ট নেই। কোনোভাবেই আমাদের এখানে ইনভলভড হওয়া চলবে না। আমরা এখানে রেভোলিউশন ঘটাতে আসিনি। ছবির

জন্যে মেটিরিয়াল জোগাড় হলেই গুড বাই টু দিস গড-ফোরসেকেন প্লট অফ ল্যান্ড। আরেকটা কথা ভুলবেন না, আমরা মুনেশ্বর সিংয়ের গেস্ট। তিনি যদি জানতে পারেন, আমরা তাঁর ফারমারদের খোঁচাচ্ছি, কী ভাববেন আমাদের সম্বন্ধে? কাজেই হ্যান্ডল এভরিথিং উইদ কেয়ার।'

রোহিত অল্প হাসেন। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলেন, 'রাইট। কিন্তু আমাদের হোস্ট এই লোকগুলোকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছেন, একবার ভাবুন। হরিবল!'

'ভেবেছি। কিন্তু আমরা ফিল্ম-মেকার। নট অ্যাজিটেটরস অর রেভোলিউশনারিজ।'

রোহিত আবার ঝুগ্নিলালের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'মুনেশ্বরজির জমিনে আপনাদের কী ধরনের কাজ করতে হয়?'

এই প্রশ্নটা তেমন অস্বস্তিকর নয়। ঝুগ্নিলালের মানসিক চাপ অনেকটা হালকা হয়ে যায়। সে বলে, 'জমিন চষি, ফসল রুই, ধান কী গম পাকলে কেটে মুনেশ্বরজির খামার বাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।' সে আরও জানায়, বারো মাসই জমিতে একটা না একটা ফসল ফলেই। ধান গেঁহু ছাড়াও আছে আখ তিল তিসি সর্ষে মুগ মসুর অড়হর কলাই, এমনি বহু রকমের শস্য। খরা বা বন্যা না হলে গোটা বছরই তাদের কাজ থাকে।

'জমিনে কাজের জন্যে কীরকম মজুরি পাওয়া যায়?'

'হর আদমি হর রোজ ছে রুপাইয়া আউর আধাকিলো গেঁহু।'

প্রায় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে রোহিতের মুখ অর্জুনকুমারের দিকে ঘুরে যায়। ইংরেজিতে বলল, 'ইনহিউম্যান! বোম্বাইতে স্টুডিওর একটা ক্যানটিন বয় কত টাকা ডেইলি ওয়েজ পায়? সেই তুলনায় এরা—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে অর্জুনকুমার বলেন, 'এইভাবেই মুনেশ্বরজি টিলার মাথায় ওইরকম একটা ক্যাসল মেনটেইন করতে পারেন, হিন্দি ফিল্মে লাখ লাখ টাকা ইনভেস্ট করতে পারেন। এনিওয়ে আমাদের শুধু দেখে আর শুনে যাওয়া। কোনোভাবেই রি-অ্যাক্ট করা চলবে না।'

রোহিত ঝুগ্নিলালকে বলেন, 'এ বছর খরায় আপনাদের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তো?'

বিমর্ষ মুখে ঝুগ্নিলাল বলে, 'বহোত কষ্ট সরকার। এই গাঁওয়ের লোক একমাস ভাত চোখে দ্যাখেনি।'

'এই বিপদের সময় মুনেশ্বরজি আপনাদের দ্যাখেন না?' দ্যাখেন যে না সেটা আগেই টের পেয়ে গেছেন রোহিতরা। তবু প্রশ্নটা করেন।

ঝুগ্নিলাল সরাসরি উত্তর দেয় না। কিছুক্ষণ ভেবে বলে, 'কাম নেহী তো কামাই ভি নেহী।'

'এই দুঃসময়ে তো মুনেশ্বরজির সাহায্য করা দরকার। এতকাল আপনারা ওঁর জমিনে প্রাণ দিয়ে খেটে এসেছেন। এখন—'

রোহিতকে থামিয়ে দিয়ে ফের সতর্ক করে দেন অর্জুনকুমার, 'আবার কিন্তু এমব্যারাসিং ব্যাপার টেনে আনছেন।'

রোহিত বলেন, 'আই অ্যাম স্যরি। আর এ ভুল হবে না।'

সঞ্জীব এতক্ষণ একটি কথাও বলেননি, শুধু চারপাশের জনতাকে লক্ষ করছিলেন। এবার হঠাৎ বলে ওঠেন, 'আপনাদের এখানে বেশি বয়সের লোকজন আর বাচ্চাকাচ্চা দেখছি। এ গাঁয়ে কি জোয়ান ছেলেমেয়ে নেই?'

এই ব্যাপারটা অর্জুনকুমারেরও মনে হয়েছিল কিন্তু নানা কথায় জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলেন। তিনিও একই প্রশ্ন করেন।

ঝুগ্নিলাল জানায়, গাঁয়ের শক্তসমর্থ পুরুষ এবং আওরতের বেশির ভাগই বগেড়ি ধরতে বিলে গেছে, কেউ কেউ গেছে বিলের ওধারের জঙ্গলে।

বিলে এবং জঙ্গলে কী উদ্দেশ্যে ভারহাটিয়ার জোয়ান মেয়ে-পুরুষদের যেতে হয়েছে, অর্জুনকুমার জানেন। চৌধারি আর পাখি-মারাদের সঙ্গে কথা বলে তা জানা গেছে। হাসিনা এক ধরনের কন্দের

নাম বলেছিল, সেটা ভুলে যাননি অর্জুনকুমার। জিজ্ঞেস করেন, 'জঙ্গলে কি ওরা সুথনি আনতে গেছে?'

রীতিমতো অবাক হয়ে যায় ঝুগ্গিলাল। বলে, 'হুজৌর, আপনারা কি সুথনি চেনেন!'

'চোখে দেখিনি, শুধু নামটাই শুনেছি।'

'সিরিফ সুথনিই না, সেই সঙ্গে রামদানা আর মিট্টির নিচের আলুও আনতে গেছে।'

মাটির তলার আলু না হয় বোঝা গেল, কিন্তু রামদানার নাম কখনো শোনেননি অর্জুনকুমার। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে ঝুগ্গিলাল বলে, রামদানা এক জাতের বুনো শস্য, ঘোর দুর্দিনে এই খেয়েই তাদের মতো গরিব হাভাতেদের কোনোরকমে বেঁচে থাকতে হয়।

অর্জুনকুমার বলেন, 'আপনাদের গাঁয়ের ছেলেদের বলবেন, আমাদের একদিন যেন জঙ্গলে নিয়ে যায়।'

ঝুগ্গিলাল দু'হাত নেড়ে বলে, 'নেহী নেহী সরকার, ওখানে যাবেন না। বহোত তখলিফ হবে। জঙ্গলে সাপ আছে, বরা আছে, খতারনাক পোকামাকড় আছে।'

অর্জুনকুমার ভাবেন, তাঁদের নতুন ছবিতে জঙ্গলটা হয়তো দারুণ কাজে লেগে যাবে। কাজেই ওটা দেখা খুব জরুরি। তিনি প্রায় জেদের সুরে বলেন, 'তখলিফ হবে না। আর সাপ টাপের কথা বলছেন তো? আমরা হুঁশিয়ার থাকব।'

ঝুগ্গিলাল বুঝতে পারছিল, কোনো আপত্তিই শুনবেন না অর্জুনকুমার। বলে, 'আপহিকা মর্জি।'

'ছেলেরা কখন জঙ্গলে যায়?'

'ভোরে, সূরয ওঠার সাথ সাথ।'

'আমরা তার আগেই চলে আসব।'

এদিকে সূর্য পুব আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। রোদের তেজ বেশ বেড়ে গেছে। এখন গায়ে গরম চাদর টাদর রাখা যায় না। শালটা খুলে ফারুকের হাতে দিতে দিতে অর্জুনকুমার বলেন, 'ঝুগ্গিলালজি, অনেকক্ষণ আপনার সঙ্গে গল্প করা গেল। এবার যাওয়া যাক।'

ঝুগ্গিলাল বিষণ্ণ মুখে বলে, 'আপনারা এই পয়লা আমাদের গাঁওয়ে এলেন। ভালো করে খাতিরদারি করতে পারলাম না। খরা গেল। আমাদের মতো আদমিদের ঘরে এমন কিছু থাকে না যা আপনাদের সেবাকে লিয়ে কাজে লাগবে। তা ছাড়া আমরা অচ্ছুৎ।'

অর্জুনকুমার বলেন, 'আমাদের খাওয়াতে চান তো? কিন্তু খানিকক্ষণ আগেই খেয়ে বেরিয়েছি। এখন আর খেতে পারব না। আর বার বার নিজেদের অচ্ছুৎ বলছেন কেন? এতে আমাদের খুব খারাপ লাগছে। আপনাদের তো বলেছিই আমরা ছুয়াছুত মানি না।'

ঝুগ্গিলাল চুপ করে থাকে।

অর্জুনকুমার বুঝতে পারেন, তাঁরা কিছু না খেলে ঝুগ্গিলাল শান্তি পাবে না। তার হয়ত ধারণা, এই কারণে তাদের মেহমানদারিতে ত্রুটি থেকে যাবে। ছুয়াছুত না মানার কথা বলায় হয়ত খাওয়াবার কথা ভাবতে সাহস হয়েছে ঝুগ্গিলালের। অথচ এদের এক কুচি খাবার খেলে এদের কাউকে একবেলা না খেয়ে থাকতে হবে। তা ছাড়া মুখে যত মহানুভবতাই দেখান, এদেব তৈরি খাদ্য কোনোদিনই খেতে পারবেন না। বলেন, 'ঠিক আছে, জঙ্গল দেখার জন্যে আরেক দিন তো আমরা আসছিই, তখন চা খেয়ে যাব। এখন তেষ্টা পাচ্ছে, একটু জল নিয়ে আসুন।' এই ব্যাপারটার মধ্যে সূক্ষ্ম চাতুরি মেশানো রয়েছে। অচ্ছুৎদের হাতের জল খেয়ে মহত্ত্ব যেমন দেখানো হবে, সেই সঙ্গে ওদের তৈরি খাদ্যবস্তু এড়ানো যাবে। জলটা কোনোরকমে চোখকান বুজে গিলে ফেলা যায়, কিন্তু অন্য কিছু একেবারেই না।

বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াটি সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে যায়। ঝুগ্গিলালের মুখ খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে। সে তৎক্ষণাৎ উঠে ক'টি বুড়োবুড়িকে ডেকে নিয়ে প্রায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে ডান পাশের ঘরগুলোর দিকে চলে যায়।

এদিকে অর্জুনকুমারের সঙ্গীরা সবাই আঁতকে উঠেছেন। তাঁদের ধারণা, ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের জলে জীবাণু থিক থিক করছে। এ জল খেলে মৃত্যু না হোক, মারাত্মক ধরনের রোগ অনিবার্য।

বাঁ দিকের একটা চৌপায়া থেকে উদ্বিগ্ন মুখে চাপা গলায় ফারুক বলে ওঠে, 'আপনি কি সচমুচ ওদের দেওয়া পানি খাবেন?'

শান্ত গলায় অর্জুনকুমার বলেন, 'খাব বলেই তো আনতে বললাম।'

সকালে রেবুবার সময় ফারুক যে ব্যাগটায় মিনারেল ওয়াটারের ক'টা বোতল পুরে নিয়েছিল, সেটা তার পাশেই রয়েছে। সে দ্রুত একটা বোতল বার করতে করতে বলে, 'আপনি এটা থেকে খান।'

'না।' আস্তে হাত নাড়েন অর্জুনকুমার।

চিন্তিতভাবে ফারুক বলে 'লেকিন—'

তার মনোভাবটা বুঝতে পারছিলেন অর্জুনকুমার। বলেন, 'এখানকার জল খেয়ে হাজার হাজার মানুষ বেঁচে আছে। আমি মারা পড়ব না।'

ফারুক বলে, 'ওরা ইমিউন হয়ে গেছে। আপনার তো অভ্যেস নেই। খুব বিপদ হয়ে যাবে।'

'কিছুই হবে না।'

সঞ্জীব বন্ধুকে লক্ষ করছিলেন। বলেন, 'তেষ্টা তোর পায়নি। ওদের খুশি করতে চাস, তাই না?'

অর্জুনকুমার উত্তর দেন না।

সঞ্জীব একটু ভেবে বলেন, 'এটা বোধ হয় তোর ডিপ্লোমেটিক চাল। পরে ছবি করার জন্যে এখানে আসতে হতে পারে। তাই এদের হাতে রাখতে চাইছিস?'

এত সব ভাবেননি অর্জুনকুমার। তিনি মৃদু হাসেন শুধু।

ঝুগ্গিলাল এবং তিন বুড়োর হাতে ঝকঝকে লোটাভর্তি জল। ভগবান রামজি বা কিষুণজিকে যেভাবে পুজো চড়ানা হয় অবিকল সেইভাবে লোটাগুলো অর্জুনকুমারদের দিকে বাড়িয়ে ঝুগ্গিলালরা বলে, 'লিজিয়ে হুজৌর।'

সঞ্জীবরা সবিনয়ে প্রায় হাতজোড় করে জানিয়ে দেন, তাঁদের তেষ্টা পায়নি।

এক পলক তাঁদের লক্ষ করার পর ঝুগ্গিলালের হাত থেকে লোটাটা নেন অর্জুনকুমার।

বিস্ফারিত চোখে রোহিতরা অর্জুনকুমারকে দেখছিলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় বলাবলি করেন, 'কী ব্যাপার, নর্থ বিহারের গাঁয়ে একদিন ঘুরে মেগা স্টারের হৃদয়ের পরিবর্তন হয়ে গেল নাকি?'

এক চুমুকে জলটুকু খেয়ে লোটা ফিরিয়ে দিতে দিতে অর্জুনকুমার বলেন, 'কী, এবার বিশ্বাস হল তো, আমরা ছুয়াছুত মানি না?'

সামনের জনতা অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। ঝুগ্গিলাল কিছুক্ষণ বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর পেছন ফিরে ডাকতে থাকে, 'ভৈরোকা মাঈ, ইধরি আ—'

একটি বুড়ি ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে। সারা শরীরে ময়লা তালি-মারা শাড়িতে ঢাকা। এই বয়সেও তার ভীষণ লজ্জা। লম্বা ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তার নাকের খানিকটা, তোবড়ানো গাল, দুই চোখ আর কপালে মেটে সিঁদুরের একটা বড় গোলাকার দাগ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। তার রোগা শীর্ণ হাতে দু'টি পাকা পেঁপে।

ঝুগ্গিলাল পরিচয় করিয়ে দেয়, 'আমার ঘরবালী।' তারপর স্ত্রীকে বলে, 'ভৈরোকা মাঈ, পপিতা দু'টো হুজৌরকে দে।'

ঝুগ্গিলালের মতোই পুজো চড়াবার ভঙ্গিতে পেঁপে বাড়িয়ে দেয় ভৈরোকা মাঈ।

অর্জুনকুমার চমকে ওঠেন, 'এ-সব কী!'

'সিরিফ পানি খেয়ে যাবেন হুজৌর, এ হয় না।'

শুধু জল খাইয়ে তৃপ্ত নয় ঝুগ্গিলাল। কিন্তু গরিবের চাইতেও গরিব এই মানুষগুলো যখন রামদানা সুথনি ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে, তাদের খাবার থেকে একটি দানাও নেওয়া অপরাধ। কুণ্ঠিতভাবে অর্জুনকুমার বলেন, 'দয়া করে এ সব দেবেন না। আমি নিতে পারব না।'

ঝুগ্গিলাল বলে, 'না নিলে আমাদের বহোত দুখ হবে। মনে করব, আমরা গরিব ভুখা বলে

আপনারা নিলেন না।' একটু থেমে বলে, 'রামজি কসম, পাইসা দিয়ে এই পপিতা কিনিনি। আমাদের গাছে ফলেছে। পেয়ারসে দেতা হ্যায়।'

ঝুন্নিলালের চোখেমুখে এবং গলার স্বরে এমন আকুলতা রয়েছে যে নিজের অজান্তেই হাত বাড়িয়ে দেন অর্জুনকুমার। যদিও তিনি জানেন এই পেঁপে দু'টো থাকলে একটা বেলা ওদের ভালোভাবেই চলে যেত।

ফল নিয়ে যখন অর্জুনকুমারা উঠতে যাবেন, সেই সময় ঝুন ঝুন করে ঘুঙুরের আওয়াজ ভেসে আসে। দেখা যায়, দূর থেকে একটা ষোল সতেরো বছরের ছেলে ছুটতে ছুটতে আসছে। রোগা সিড়িঙ্গে চেহারা। চামড়া থেকে খই উড়ছে। মাথাভর্তি রুক্ষ জটপাকানো চুল। পরনে রংবেরং-এর তালি-মারা ফুল প্যান্ট আর জামা। জুতো নেই। পায়ে পুরনো ঘুঙুর বাঁধা।

কাছে এসে অর্জুনকুমারদেব দেখিয়ে ঝুন্নিলালের কানে কানে ছেলেটা কিছু বলে। মন দিয়ে শোনার পর ঝুন্নিলাল অর্জুনকুমারের দিকে তাকায়, 'হুজৌর এই ছৌরাটার নাম বালুয়া। ও একজন ভালো নাটুয়া।'

অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'নাটুয়া কী?'

'এই যারা নাচা গানা করে তাদের আমরা নাটুয়া বলি। কার কাছে যেন বালুয়া শুনেছে হুজৌররা এ গাঁওয়ে এসেছেন। তাই দৌড়তে দৌড়তে আসছে।'

'ও আমাদের কাছে কী চায়?'

ঝুন্নিলাল এবার জানায়, ছেলেটা ভীষণ দুঃখী। বাপ-মা কেউ নেই ওর। ছোটবেলা থেকেই চমৎকার নাচতে গাইতে পারত। অভিনয়ের ক্ষমতাও রয়েছে। কম বয়সে নওটঙ্কীর দলে ঢুকেছিল, ছিলও কয়েক বছর। তারপর দলটা ভেঙে যাওয়ায় ইদানীং গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে নেচে গেয়ে যা দু-চার পয়সা পাচ্ছিল তাই দিয়ে পেট চালাত। কিন্তু এই খরার বছরে কে ওর নাচ দেখবে আর কেই বা গান শুনবে! নাচগানের আসর বসাবার মতো শৌখিনতা এই দুঃসময়ে কারো নেই। বড়ই কষ্টে আছে বালুয়া। হুজৌররা বড়ে আদমি। বালুয়া আশা করে এসেছে, তাঁদের খুশি করে দিয়ে কিছু বকশিশ পাবে।

নওটঙ্কী ব্যাপারটা জানেন অর্জুনকুমার। চড়া সুরের গান বাজনা নাচের সঙ্গে এতে থাকে পৌরাণিক বা মোটা দাগের সামাজিক কোনো নাটক। দু-একটা ফিল্মে উত্তর ভারতের এই ফোক-আর্ট অর্থাৎ লোকশিল্পটির কিছু নমুনা তিনি দেখেছেন।

রোহিত পাশ থেকে হালকা গলায় বলেন, 'পীপলস আর্টিস্ট অর্জুনজি, ছোকরা আপনার পরিচয় জানতে পারলে একেবারে জোঁকের মতো গায়ের সঙ্গে জুড়ে যাবে।'

বালুয়া সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করছিলেন অর্জুনকুমার। রোহিতের মজাটা ভালোই লাগে তাঁর। একটু হেসে বালুয়াকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কী নাচ নাচতে পার?'

বালুয়া গেঁয়ো নাটুয়া হলে কী হবে, খুবই চটপটে। কোনোরকম আড়ষ্টতা নেই তার। খুব সহজ গলায় বলে, 'নওটঙ্কীর সবরকম নাচ আর গান পারি। তা ছাড়া—'

'কী?'

'আমি অর্জুনকুমারের মতো নাচতে গাইতে পারি।'

চারজনই চমকে ওঠেন। সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'কোন অর্জুনকুমার?'

বালুয়া বলে, 'সিনেমাকা বহোত বড়ে হীরো। আপলোগন জানতা নেহী?'

অর্জুনকুমার একেবারে হাঁ হয়ে যান। এই সব হতচ্ছাড়া গাঁয়ে যেখানে এখন পর্যন্ত সিনেমা পৌঁছয়নি। (অবশ্য সবেমাত্র ভবঘুরে বায়োস্কোপওলারা ফিল্ম দেখাবার জন্যে তাঁবু খাটাচ্ছে) সেখানকার এক গেঁয়ো নাটুয়া ছোকরা তাঁর নাম জানল কী করে? তাঁর মতো করে নাচতে ও গাইতে শিখলই বা কেমন করে?

আগে ছিল আগ্রহ, তার সঙ্গে এবার মিশল সীমাহীন বিস্ময়। অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি অর্জুনকুমারকে চেনো?'

বালুয়া বলে, 'নেহীঁ সরকার।'

'তবে তাঁর মতো নাচতে গাইতে শিখলে কী করে?'

বালুয়া এবার একটা অদ্ভুত খবর দেয়। ক'বছর আগে সে যে নওটঙ্কীর দলে ছিল তার মালিক এবং ট্রেনার গণেশ্বর লাল কাটিহার কি পূর্ণিয়া গিয়ে প্রচুর হিন্দী সিনেমা দেখত; অর্জুনকুমারের ছবি এলে তাকে ঠেকিয়ে রাখা যেত না। গণেশ্বরই নওটঙ্কীতে হিন্দি ছবির হীরোদের (অর্জুনকুমারেরই বেশি) কোমর দুলিয়ে নাচ এবং গান আর আমোদ দেবার নতুন তরীকা তৈরি করেছিল। গণেশ্বরের কাছ থেকে এ সব শিখেছে বালুয়া।

ফোক-আর্টিস্টরা হিন্দি সিনেমার রং ঢং কীভাবে নকল করছে, তা জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন অর্জুনকুমার। বলেন, 'অর্জুনকুমারের মতো নেচে আর গেয়ে দেখাও তো।'

বাকি সবাই অবাক হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু বালুয়াকে নিয়ে এতটা মাতামাতি তাঁদের পছন্দ হচ্ছিল না। ফারুকের তো খুবই খারাপ লাগছিল। অর্জুনকুমারের ধাতটা সে ভালো করেই জানে। স্ট্রোক হয়ে যাবার পর থেকে তিনি যথেষ্ট সতর্ক হয়ে গেছেন, ডাক্তার যেভাবে প্রতিদিনের রুটিন তৈরি করে দিয়েছেন ঠিক সেইভাবেই চলেন। কিন্তু হঠাৎ কোনো কিছু নিয়ে মেতে উঠলে সময়ের জ্ঞান থাকে না, তখন তাঁকে রুটিনের কথা মনে করিয়ে দিতে হয়। বালুয়াকে দিয়ে একবার নাচগান শুরু করালে কখন আসর ভাঙবে, কে জানে। অগত্যা দ্রুত ঘড়ি দেখে অর্জুনকুমারের চারপায়ায় এসে বসে ফারুক। ফিস ফিস গলায় বলে, 'পৌনে বারোটা বাজে। সাড়ে বারোটায় কিন্তু আপনার লাঞ্চ—'

অর্জুনকুমার হকচকিয়ে যান। স্বাস্থ্যের কারণেই নিয়মানুবর্তী হওয়া একান্ত জরুরি। তবু বলেন, 'একটা নাচ আর একটা গানের জন্যে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না।'

এর আগে বার বার নানা ব্যাপারে ফারুককে থামিয়ে দিয়েছেন অর্জুনকুমার। এবার সে মরিয়া হয়েই বলে, 'না। নাচ গান এখন থাক। আপনাকে ভীষণ টায়ার্ড দেখাচ্ছে।'

ফারুকের কথায় অর্জুনকুমারের মনে হয়, সত্যিই ক্লান্তি লাগছে। সেই সকাল থেকে পায়ে হেঁটে প্রচুর ঘোরাঘুরি করেছেন, নানা লোকের সঙ্গে অজস্র কথা বলেছেন। বহুকাল একনাগাড়ে এত হাঁটেননি তিনি, এত কথাও বলেননি। তাঁর মনে হয়, এখন নাচ-গানের আসর বসানোটা ঠিক হবে না। চৌপায়া থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে অর্জুনকুমার বালুয়াকে বলেন, 'মুনেশ্বরজির কোঠি চেনো? ওই যে টিলার মাথায়—'

বালুয়া জানায়, মুনেশ্বরজির হাভেলি চেনে না, দুনিয়ায় এমন মানুষ নেই। অর্জুনকুমার বলেন, 'আমরা ওখানে কিছুদিন থাকব। তুমি একদিন চলে এসো। তখন তোমার নাচটাচ দেখা যাবে।' সঞ্জীবকে ডেকে বলেন, 'ছোকরাকে একশ টাকা দিয়ে দে।'

সঞ্জীবের বাস্তববুদ্ধি অনেক প্রখর। তিনি জানেন, বালুয়াকে অর্জুনকুমারের কথামতো অত টাকা দিলে ভারহাটিয়া গাঁয়ে হুলস্থূল বেঁধে যাবে। তিনি পকেট থেকে একটা টাকা বার করে দেন।

মাত্র একটা টাকা দেবার কারণটা হঠাৎ যেন বুঝতে পারেন অর্জুনকুমার। রোহিতের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসেন। তারপর ঝুগ্গিলালের কাছ থেকে আরেক বার বিদায় নিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে থাকেন।

ভারহাটিয়া গাঁয়ের জনতা ঝুগ্গিলালের সঙ্গে মান্য অতিথিদের বাইরের রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে। তাদের পেছন পেছন নাটুয়া বালুয়াও চলে এসেছে। টাকা পেয়ে সে খুশিই হয়েছে কিন্তু নিজের বাহাদুরি দেখাতে না পেরে কিছুটা হতাশই হয়। হাজার রোক, সে একজন আর্টিস্ট তো।

ঝুগ্গিলালরা গাঁয়ের মুখ পর্যন্ত এসে থেমে যায়। অর্জুনকুমাররা মাঠের ওপর দিয়ে মুনেশ্বর সিংয়ের 'রাজপুত নিকেত'-এর দিকে এগিয়ে যান।

সূর্য প্রায় খাড়া মাথার ওপরে উঠে এসেছে। সকালে যে ঠান্ডাটা ছিল, এখন তার ছিটেফোঁটাও নেই। রোদে যেন ছুরির ধার, সেদিকে তাকানো যায় না। উলটোপালটা গরম বাতাস বয়ে চলেছে ফাঁকা শস্যক্ষেত্রের ওপর দিয়ে। কয়েক ঘণ্টার ভেতর আবহাওয়ার এতটা পরিবর্তন যেন ভাবা যায় না।

অদম্য উৎসাহ নিয়ে সকালে তেজী যুবকের মতোই অর্জুনকুমার ভারতবর্ষ আবিষ্কার করতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এখন কিন্তু পা ফেলতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে। বুঝতে পারছেন প্রথম দিনই এতটা ধকল নেওয়া তাঁর উচিত হয়নি। কিন্তু শারীরিক কষ্টের কথা রোহিতদের বলা যাবে না। বললে ওঁরা ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়বেন। এমনিতেই সর্বক্ষণ ওঁরা তাঁর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন, যতক্ষণ সম্ভব ওঁদের উৎকণ্ঠা এবং দুশ্চিন্তা বাড়াবেন না অর্জুনকুমার। ধীরে ধীরে সতর্কভাবে তিনি হাঁটতে থাকেন।

খানিকটা যাবার পর হঠাৎ পেছন থেকে ঘুঙুরের শব্দ এবং ডাক ভেসে আসে, 'হুজৌর—হুজৌর—'

সবাই দাঁড়িয়ে পড়েন। মুখ ফেরাতেই দেখা যায়, ভারহাটিয়া গাঁয়েব দিক থেকে বালুয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আসছে।

কাছে আসতেই অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'কী হয়েছে বালুয়া?'

বালুয়া জিজ্ঞেস করে, 'একদিন তো যেতে বললেন। লেকেন কবে যাব?'

'তোমার যেদিন ইচ্ছে।'

'কখন গেলে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে?'

'বিকেলে এসো।'

'একগো বাত হুজৌর—' বলে কাঁচুমাচু হয়ে হাত কচলাতে থাকে বালুয়া।

চড়া রোদে বেশ কষ্ট হচ্ছিল অর্জুনকুমাবের। একটু অসহিষ্ণুভাবেই তিনি বলেন, 'আবার কী কথা?'

কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন লক্ষ করে না বালুয়া। সে বলে, 'বিশ রোজ ভাত খাইনি হুজৌর। কবে খেতে পাব, রামচন্দজি জানে, যেদিন আপনাদের ওখানে যাব, ভাত খেতে দেবেন। পাইসা চাই না।'

কিছুক্ষণ আগে ঝুগ্গিলালের মুখে অর্জুনকুমার শুনেছিলেন, 'ভারহাটিয়া গাঁয়ের লোকেরা অনেকদিন ভাত চোখে দেখেনি। গাঢ় সহানুভূতির গলায় অর্জুনকুমার বলেন, 'ঠিক আছে, পেট ভরে ভাত খেয়ে যেও।

'আপকা কিরপা হুজৌর।' বলে যেভাবে এসেছিল ঠিক সেই ভাবেই দৌড়তে দৌড়তে ভারহাটিয়ার দিকে ফিরে যায় বালুয়া।

অর্জুনকুমাররা আবার চলতে শুরু করেন। 'রাজপুত নিকেত-এর দিকে যেতে যেতে বার বার তাঁর মনে হয় এ কোন ভারতবর্ষে এসে পড়েছেন, যেখানে মানুষ কুড়ি পঁচিশ দিনের মধ্যে একবারও ভাত খেতে পায় না! মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায় তাঁর।

পাঁচ

মাঠ পেরিয়ে কিছুক্ষণের ভেতর কাচ্চীতে এসে ওঠেন অর্জুনকুমাররা। আর খানিকটা গেলেই 'রাজপুত নিকেত'।

হঠাৎ দেখা যায়, দশ বারোটি যুবক—তাদের রুক্ষ চুলদাড়ি, শক্ত চোয়াল, চেহারায় অযত্নের ছাপ, পরনে ময়লা শার্ট আর টাউজার্স, পায়ে চপ্পল বা কেডস—আকাশে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুড়ে স্লোগান দিতে দিতে পশ্চিম দিকে চলেছে।

'মুনেশ্বর সিংকে ক্ষেত পর—
কাম মাত্ কর, মাত্ কর।
মুনেশ্বর সিংকি বন্দুকে—
তুমলোগো পর তনী হ্যায়।

বন্দুকসে মাত্ ডরো—
মাত্ ডরো।
আপনি জমিন
ছিন লো, ছিন লো।'

সবাই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। অর্জুনকুমার বলেন, 'খুব সম্ভব চৌধারি পলিটিক্যাল পার্টির এই সব ওয়ার্কারদের কথা বলেছিল। আমাদের ছবির জন্যে এদের সম্বন্ধে জানা দরকার। আমার মনে হয়, দে আর গোয়িং টু প্লে আ ভাইটাল রোল হিয়ার।'

সঞ্জীব সন্দিগ্ধভাবে বলেন, 'তুমি এদের সঙ্গে এখনই কথা বলতে চাও নাকি?'

অর্জুনকুমার থতমত খেয়ে যান। অপ্রতিভ হেসে বলেন, 'না, মানে—'

'তুমি নিজেই বলেছ আমরা এখানে কোনোভাবেই ইনভলভড হব না। তা ছাড়া এরা পলিটিক্যাল ওয়ার্কার। পলিটিকস মানেই এক্সাইটমেন্ট, টেনশন। এই দু'টো ব্যাপারই তোমার পক্ষে মারাত্মক। ডাক্তাররা তোমাকে সারাক্ষণ উত্তেজনা আর টেনশন থেকে হাজার মাইল দূরে থাকতে বলেছেন।'

'আমার মনে আছে। তবে এদের সম্পর্কে ইনফরমেশন নেওয়া দরকার। ভেবে দেখ, স্বাধীনতার এতগুলো বছর বাদেও এখানে ফিউডাল সিস্টেম শেকড় গেড়ে রয়েছে। তার মধ্যে এই পলিটিক্যাল ওয়ার্কাররা আগুন ছড়াতে চাইছে। তুমি দেখো, আজ হোক কাল হোক এখানে এক্সপ্লোশন ঘটবেই। ছবিতে এটা তুলে ধরতে পারলে একটা দুর্দান্ত ব্যাপার হবে। সে জন্যে ওদের সম্বন্ধে ইনফরমেশন জোগাড় করা দরকার।'

'ইনফরমেশন নানা সোর্স থেকে জোগাড় করা যাবে। ভুলে যেও না, এদের দেখে মনে হচ্ছে কনসাস, শিক্ষিত ছেলে।'

'ডাইরেক্টলি যোগাযোগ করলে তোমাকে ঠিক চিনে ফেলবে। সেটা একেবারেই ডিজায়ারেবল নয়। এখন চল—'

চিনে ফেলার সমস্যাটা অবশ্য আছেই। তবু অর্জুনকুমারের মনে হয়. ওদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারলে বোধ হয় ভালো হত। কিন্তু সঞ্জীবদের জন্য তা সম্ভব নয়। অন্যমনস্কর মতো অর্জুনকুমার বলেন, 'চল।'

টিলার তলায় আসতেই দেখা গেল, ওপরে নিয়ে যাবার জন্য একটা ল্যান্ডো দাঁড়িয়ে আছে। অর্জুনকুমাররা উঠে বসতেই কোচোয়ান গাড়ি হাঁকিয়ে দেয়। তেজীয়ান ঘোড়া ল্যান্ডোটাকে টেনে টেনে টিলার মাথায় তুলতে থাকে।

'রাজপুত নিকেত'-এর ভেতরে আসতেই দেখা যায়, একটা নতুন মডেলের ঝকঝকে মোটরের ব্যাক সিটে সুপুরুষ চেহারার মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক বসে আছেন। গায়ের রং টকটকে। মুখে চমৎকার করে ছাঁটা মেহেদি-লাগানো দাড়ি, চোখে সুর্মার টান। পরনে ধবধবে চুস্ত আর দামি শেরওয়ানি, মাথায় কারুকাজ-করা লখনৌ-এর টুপি।

ভদ্রলোক দূরে টিলার নিচের ফাঁকা শস্যক্ষেত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছিলেন। ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজে অন্যমনস্কর মতো একবার অর্জুনকুমারদের ল্যান্ডোটার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নেন।

সকালের দিকটা ঠান্ডায় ঠান্ডায় চমৎকার লাগছিল। কিন্তু চড়া রোদে খোলা আকাশের তলা দিয়ে এতটা পথ হেঁটে এসে এখন শরীর বেশ খারাপ লাগছে। বুকের ভেতর সামান্য চাপ টের পাচ্ছেন অর্জুনকুমার, মাথাটাও অল্প অল্প টলছে। ব্লাড প্রেসারের কিছু গোলমাল হল কিনা, কে জানে।

অর্জুনকুমার মনে মনে ঠিক করে ফেলেন, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর টানা একটি ঘুম লাগাবেন। তারপরও যদি অস্বস্তি না কাটে, বেশি করে প্রেসারের ওষুধ খেতে হবে। শ্বাসকষ্ট, বুকে বা মাথায় চাপ কিংবা প্রেসারে গোলমাল, ইত্যাদি নানা অবস্থার কথা আন্দাজ করে ওষুধের দীর্ঘ তালিকা তৈরি করে

দিয়েছেন ডাক্তাররা। শরীর কতটা খারাপ হলে কী ডোজে ওষুধ খেতে হবে, সব কিছু এই তালিকায় রয়েছে।

ল্যান্ডো থেকে নেমে আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে আসেন অর্জুনকুমার। তাঁর পেছনে রোহিতরা।

সিঁড়ির সামনের লম্বা করিডরে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন জগনাথ। অর্জুনকুমারদের দেখে দৌড়ে আসেন। বলেন, 'আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। সাড়ে বারোটায় আপনার দুপহরকা ভোজন। এখন বারোটা বেজে বাইশ। জানতাম দো-চার মিনিটের ভেতর ফিরে আসবেন।'

অর্জুনকুমার লক্ষ করেন, জগনাথ কথা বলছেন ঠিকই কিন্তু তাঁকে ভীষণ আনমনা দেখাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে কিছু একটা চলছে তাঁর, সেই কারণে চোখেমুখে দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগের ছাপ ফুটে বেরিয়েছে।

অর্জুনকুমার জগনাথকে দেখতে দেখতে বেশ অবাকই হন। সকালেও তো তাঁকে স্বাভাবিক দেখে গেছেন। হঠাৎ কী এমন ঘটল যাতে এমন অস্থির হয়ে পড়েছেন? বলেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'ক্ষমা করবেন, আজ লাঞ্চের সময় আপনাদের সেবাকে লিয়ে কাছে থাকতে পারব না। নিচে গাড়িতে রমজান সাহেব বসে আছেন। ওঁর সঙ্গে এখনই সাদাতপুরায় যেতে হবে। আপনারা ফিরছিলেন না বলে ছটফট করছিলাম। না বলে তো যাওয়া যায় না।'

মেহমানদারির মতো বিরাট দায়িত্ব ফেলে জগনাথকে যখন যেতে হচ্ছে তখন ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। নিজের পক্ষে যা অপ্রয়োজনীয় এমন কোনো বিষয়ে কৌতূহল নেই অর্জুনকুমারের। কিন্তু নিজের অজান্তেই তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, 'রমজান সাহেব কে?'

জগনাথ জানান, মুনেশ্বর সিংয়ের মতোই তিনি এ অঞ্চলের আরেক জন ল্যান্ডেড অ্যারিস্টোক্র্যাট। মুনেশ্বরদের জমির সীমানা পুব দিকে যেখানে শেষ হয়েছে, তারপর থেকে তাঁর জমি শুরু। ওঁদের ওই এলাকাটার নাম সাদাতপুরা। অবশ্য মুনেশ্বরদের মতো এত ক্ষেতখামার রমজান সাহেবের নেই। তবে তিনি একজন পলিটিক্যাল লিডার। ভেরি রেসপেক্টেড পার্সন। লাস্ট দু'বারের বিধানমণ্ডলের চুনাওতে উম্মীদার ছিলেন। অল্প ভোটের জন্য হেরে গেছেন।

অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'চুনাওয়ের ব্যাপারেই কি রমজান সাহেবের সঙ্গে যাচ্ছেন?'

'সেটা তো আছেই। তাছাড়া আরো নানারকম প্রবলেম আছে। আপনি হয়তো শুনেছেন, আমাদের এখানকার কিছু লোক মুনেশ্বরজির জমিনে কাজ করতে চাইছে না, তেমনি সাদাতপুরার কিছু লাকও ঠিক করেছে, রমজান সাহেবের জমি চষবে না। তা ছাড়া একটা পলিটিক্যাল পার্টির ছোকরারা ঝামেলা করছে। আমাদের দু'তরফেরই এক সমস্যা।' জগনাথ ব্যস্তভাবে বলতে থাকেন, 'হুকুম করুন, আমি বেরিয়ে পড়ি। রমজান সাহেবকে অনেকক্ষণ গাড়িতে বসিয়ে রেখেছি। নৌকর নৌকরনীদের আপনাদের ভোজনের ব্যাপারে সব বলা আছে। কোনোরকম অসুবিধা হবে না।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘুরে আসুন। আপনাকে আর আটকাব না।'

সিঁড়ি দিয়ে ঝড়ের গতিতে নামতে নামতে মুখ ফিরিয়ে জগনাথ বলেন, 'গাঁও ভ্রমণ কেমন হল, সাদাতপুরা থেকে ফিরে এসে সব শুনব।'

একটা হাত সামান্য উঁচুতে তুলে অর্জুনকুমার বলেন, 'ঠিক আছে।'

জগনাথ নিচে নেমে যান। আর অর্জুনকুমার তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নিজের নিজের কামরায় চলে আসেন। তাঁর মন অজানা শঙ্কায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সকালে বেরিয়ে তিনি যা দেখেছেন তাতে মনে হয়েছে, ভূগোলের হট্টগোল থেকে বহুদূরের এই ভূখণ্ডে মারাত্মক কিছু একটা ঘটবে। জগনাথের সঙ্গে কথা বলে তাঁর উৎকণ্ঠা এবং আশঙ্কা অনেক গুণ বেড়ে যায়।

ছয়

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ঘণ্টাতিনেক টানা ঘুমোবার পর সবটুকু ক্লান্তি কেটে যায় অর্জুনকুমারের। শরীর বেশ হালকা আর ঝরঝরে লাগে। বুকের কষ্ট বা রক্তচাপ নিয়ে যে টেনশন হয়েছিল, সেটা আর নেই।

দিনটা দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। যেদিকে যতদূর চোখ যায়, ফাঁকা ফসলের মাঠ, উঁচু উঁচু গাছপালা, সব কিছুর ওপর বাসি হলুদের মতো ম্যাড়মেড়ে মরা রোদ কুঁকড়ে পড়ে আছে। দুপুরে এই রোদটাই যে চারিদিকে আগুন ছড়িয়ে দিনের উত্তাপ কয়েক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়িয়ে দিয়েছিল, এখন তার চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই। বহুদূরে আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে দিগন্তে নেমেছে সেই জায়গাটাকে একটা ঝাপসা নীলচে লাইনের মতো দেখায়। সেখানে এর মধ্যেই কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। আবছা সিলুয়েট ছবির মতো দিগন্তের মাথায় ক'টা পাখি ডানা মেলে অনড় দাঁড়িয়ে আছে।

অর্জুনকুমারের কামরায় বিকেলের চায়ের আসর বসেছিল। এ-বেলা ওঁরা আর বেরুবেন না। কারো কোনো তাড়া নেই। সবাই ঢিলেঢালা মেজাজে আছেন।

চায়ে হালকা চুমুক দিয়ে অর্জুনকুমার বলেন, 'আজকের দিনটা বেশ ইভেন্টফুল, না কি বলেন?'

রোহিত বলেন, 'ইভেন্টফুল তো বটেই। সেই সঙ্গে নানা রকমের মানুষও দেখা গেল।'

'আমাদের নতুন এক্সপিরিয়েন্স প্রতিদিনের তারিখ দিয়ে ডিটেলে লিখে রাখবেন। আপনি তো ছবিও আঁকতে পারেন। যে লোকগুলোর চেহারায় পিকিউলিয়ারিটি আছে তাদের স্কেচ যদি নোটবুকের মার্জিনে করে রাখেন খুব ভালো হয়। ছবিতে এই সব ক্যারেক্টার এলে, মেক-আপের সময় কাজে লাগবে।'

সঞ্জীব বলেন, 'আমি তো অনেক ছবি তুলে নিয়েছি। আবার স্কেচের কী দরকার?'

অর্জুনকুমার বলেন, 'ছবিও থাক, স্কেচও থাক। ক্যামেরা তার অবজেক্টের ট্রু কপি করে রাখে, আর্টিস্টের অ্যাঙ্গলটা অন্যরকম।'

রোহিত জানান, দুপুরে খাওয়ার পর এক মিনিটও ঘুমোননি, আজকের যাবতীয় অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখে রেখেছেন। তবে স্কেচ করা হয়নি। রাত্তিরে করে রাখবেন।'

অর্জুনকুমার বলেন, 'সান ডাউনের পর থেকে আপনার যা হাল হবে তাতে কি স্কেচ আঁকার অবস্থায় থাকবেন?'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছিলেন রোহিত। শশব্যস্তে বলে ওঠেন, 'আরে না না, হাল ঠিকই থাকবে। আপনি তো জানেন, দশ পেগ পর্যন্ত আমি স্টেডি থাকি। আজ আট পেগের পর ফুল স্টপ। ও কে বস?'

রোহিতের বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলেন অর্জুনকুমার। তিনি কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ সঞ্জীব প্রায় চেঁচিয়েই ওঠেন, 'রেণুকাজি আসছেন মনে হচ্ছে!' পরক্ষণে স্বরটা আরও উঁচুতে ওঠে, 'তাঁর সঙ্গে নাটুয়া ছোকরাটাকেও দেখতে পাচ্ছি—দ্যাট নওটঙ্কী কলাকার।'

কামরার বাকি তিন জোড়া চোখ তৎক্ষণাৎ 'রাজপুত নিকেত'-এর সামনের দিকে চলে যায়। সত্যিই রেণুকা বালুয়াকে সঙ্গে করে লোহার গেট পেরিয়ে এ বাড়ির দিকে আসছেন।

রোহিত রেণুকা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করে কিন্তু সে সব শুনতে পান না অর্জুনকুমার। মেয়েরা তাঁর কাছে কৌতূহল বা আকর্ষণের বস্তুই নয়। তাঁর বুকে সিনেমার স্বপ্নসুন্দরী আর গ্লামার কুইনদের বক্ষঃস্পন্দন মিশে আছে। একসময় নারীর শরীর তিনি এতটাই ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন যে এ ব্যাপারে তাঁর প্রায় মোহমুক্তি ঘটে গেছে। নরম টিসুতে তৈরি মেয়েদের দেহ তাঁর মধ্যে আজকাল কোনোরকম চাঞ্চল্যই জাগায় না। কিন্তু কারণ নেই, রেণুকাকে দেখামাত্র আজ তাঁর হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে অদৃশ্য ঢেউয়ের মতো কিছু বয়ে যায়।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না, রেণুকা এবং বালুয়া দোতলায় উঠে এসে দরজার সামনে দাঁড়ায়।

রেণুকাকে দেখে উঠে পড়েছিলেন সবাই। ক'পা এগিয়ে এসে অর্জুনকুমার সসম্ভ্রমে বলেন, 'বসুন—'

রেণুকা বসার পর বাকি সবাই বসেন।

রেণুকা বলেন, 'আপনাকে বলেছিলাম, একদিন আসব। আজই চলে এলাম।'

'মেনি মেনি থ্যাঙ্কস।'

অর্জুনকুমার কথা বলছেন ঠিকই কিন্তু তাঁর চোখ রেণুকার ওপর স্থির হয়ে আছে। তাঁর চুল উষ্কখুষ্ক, রুক্ষ। জামা-কাপড়ের ভাঁজ নষ্ট হয়ে গেছে। মুখে রোদে-পোড়া কালচে ছাপ। চোখ বসে গেছে। দেখামাত্র টের পাওয়া যায়, রেণুকা ভীষণ ক্লান্ত, তাঁর স্নান খাওয়া-টাওয়া হয়নি।

অর্জুনকুমার বলেন, 'আপনাকে এগ্‌জস্টেড দেখাচ্ছে।'

রেণুকা ক্লান্ত হাসেন, 'এই সামান্য। সকালে উঠে গাঁগুলোতে একটু ঘোরাঘুরি করছিলাম। তাই—'

অর্জুনকুমার সামনের দিকে ঝুঁকে গভীর গলায় বলেন, 'সোশাল ওয়ার্ক?'

রেণুকা মৃদু হাসেন।

অর্জুনকুমার বলেন, 'এখনও বাড়ি ফেরা হয়নি নিশ্চয়ই?'

'না। এবার ফিরব। ভাবলাম তার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।'

অর্জুনকুমারের ইঙ্গিতে ফারুক একটা নৌকরকে দিয়ে প্রচুর খাবার দাবার এবং চা আনিয়ে দেয়।

রেণুকা বলেন, 'এত খাবার দিয়ে কী হবে? আপনার কি ধারণা, আমি সারাদিন কিছু খাইনি?'

'কী খেয়েছেন?'

'গাঁয়ের লোকেরা আমাকে লিট্টি খাইয়েছে।'

'লিট্টিটা কী জিনিস?'

রেণুকা বুঝিয়ে দেন। আটার ডেলা দিয়ে খোল তৈরি করে তার ভেতর সেদ্ধ আনাজের পুর দিয়ে উনুনে পুড়িয়ে লিট্টি বানাতে হয়।

অর্জুনকুমার বলেন, 'বুঝেছি, প্রচুর খাইয়েছে গাঁয়ের লোকেরা। তবু এগুলো খেতে হবে।' টেবলের ওপর সুস্বাদু খাদ্যবস্তুগুলো দেখিয়ে দেন তিনি।

রেণুকা হাসেন, 'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন একটু খাচ্ছি। তবে বালুয়াকে কিছু খেতে দিলে ভালো হয়।'

'অবশ্যই।' অর্জুনকুমারের হঠাৎ কী মনে পড়ে যায়। যে-নৌকর খাবার নিয়ে এসেছিল সে এক ধারে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। বালুয়াকে দেখিয়ে তিনি নৌকরটাকে বলেন, 'ওই ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে পেট ভরে ভাত টাত খাইয়ে দাও।'

'জি সরকার—' নৌকর বালুয়াকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায়।

অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'এই ছেলেটাকে আপনি কোথায় পেলেন?'

'গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছিলাম। কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। এখানে আসছি জেনে ও আসতে চাইল। বলল এ-বাড়িতে এলে নাকি ভাত খেতে পাবে। তাই নিয়ে এলাম।'

বালুয়া কোনো একদিন বিকেলে আসবে বলেছিল কিন্তু আজই সে এসে হাজির হবে, ভাবা যায়নি। অর্জুনকুমার বলেন, 'এনে ভালোই করেছেন।'

খাবারের একটা প্লেট তুলে রেণুকা বলেন, 'আমি একাই খাব নাকি? আপনারাও নিন।'

সবাই জানান, তাঁরা এইমাত্র খেয়েছেন। তবে রেণুকাকে সঙ্গ দেবার জন্য আরেক বার চা খেতে পারেন।

রেণুকা ক্ষিপ্র হাতে চা তৈরি করতে থাকেন।

ফারুক বিব্রতভাবে বলে, 'আপনি কেন? আমি করে দিচ্ছি।'

'ওই একই কথা।' সবার হাতে চায়ের কাপ দিয়ে একটা বালুসাই তুলে নেন রেণুকা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর দ্বিধান্বিতভাবে অর্জুনকুমার বলেন, 'কাল স্টেশন থেকে আসতে আসতে বলেছিলেন, আমার সঙ্গে কী যেন আলোচনা করবেন।'

রেণুকা বলেন, 'হ্যাঁ। সেই জন্যেই তো আসতে হল। আমি আপনার কিছু ছবি দেখেছি।'

কালও ছবি দেখার কথা বলেছিলেন রেণুকা কিন্তু সেগুলো তাঁর কেমন লেগেছে, প্রচণ্ড আগ্রহ সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ হয়েছে অর্জুনকুমারের। আজও কোনো প্রশ্ন না করে তিনি রেণুকার মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

রেণুকা বলেন, 'আপনার ওই ছবিগুলো আটার ট্র্যাশ।'

অর্জুনকুমারের মতো মেগা স্টারের মুখের ওপর এভাবে কেউ বলতে পারে, ভাবা যায় না। রোহিতরা একেবারে হকচকিয়ে যান। সমস্ত কামরাটায় কিছুক্ষণের জন্য নিরেট স্তব্ধতা নেমে আসে।

অর্জুনকুমারের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ মাথায় প্রবল রক্তচাপ টের পান তিনি, ঘাড়ের কাছটা চিন চিন করতে থাকে। এখনই দ্বিতীয় স্ট্রোকটা হয়ে যাবে কিনা কে জানে।

তাঁর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে করতে রেণুকা নির্বিকার বলে যান, 'আপনাদের হয়তো খারাপ লাগছে কিন্তু দিস ইজ ট্রু। অর্জুনজি, আপনারা এ দেশের রুচি, কালচার ধ্বংস করে দিচ্ছেন।'

তাঁদের ছবি সম্পর্কে কাগজে কড়া রিভিউ বেরোয়। ফিল্ম ক্রিটিকরা নির্দয় চাবুক চালাবার মতো তাঁদের বিরুদ্ধে কলম চালায়। যে ফর্মুলায় তাঁরা ছবি করেন তার সঙ্গে রিয়ালিটির সম্পর্ক নেই। এগুলো একেবারেই অসার, অর্থহীন, স্রেফ আবর্জনা, ইত্যাদি। কিন্তু রেণুকার মতো এমন মারাত্মক অভিযোগ কেউ কখনও করেছে কিনা, অর্জুনকুমার মনে করতে পারেন না। বিমূঢ়ের মতো তিনি বলেন, 'আমরা দেশের রুচি, কালচার ধ্বংস করে দিচ্ছি!'

'অবশ্যই।'

'কীভাবে বলুন তো?'

'তার একটা নমুনা এখনই দেখাতে পারি।'

'কী রকম?'

দরজার বাইরে আঙুল বাড়িয়ে রেণুকা বলেন, 'ওই ছেলেটির সঙ্গে তো আজ আপনাদের ভারহাটিয়ায় আলাপ হয়েছে।'

কখন যে ভাত খেয়ে এসে বালুয়া ফের ওখানে বসেছে, অর্জুনকুমার লক্ষ করেননি। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ।'

'বালুয়া আপনার পরিচয় জানে না। আমিও ওকে কিছু জানাইনি। শুনেছেন নিশ্চয়ই ও একজন ফোক-আর্টিস্ট?'

'শুনেছি।'

'ওর পারফরম্যান্স দেখতে পেরেছেন কি?'

'না। দুপুরে আমরা যখন ফিরে আসছি তখন ওর সঙ্গে দেখা হল। তখন আর —'

অর্জুনকুমারের কথা শেষ হবার আগেই রেণুকা বলেন, 'বালুয়াকে ডাকছি। আপনারা ওর পারফরম্যান্স দেখুন। প্লিজ, কোনো কমেন্ট করবেন না।'

হাতের ইশারায় বালুয়াকে ডেকে এনে রেণুকা বলেন, 'তুই তো অর্জুনকুমারের মতো নাচতে গাইতে পারিস। এই সাহেবদের বলেছিলি দেখাবি। এঁরা তোকে অনেক খাইয়েছেন। এবার নেচে টেচে দেখা।'

'হাঁ জরুর।' বালুয়া তৎক্ষণাৎ কামরার মাঝখানে গিয়ে কোমরে হাত রেখে দাঁড়ায়। অর্জুনকুমাররা আজ তাকে যা খাইয়েছেন, এমন চমৎকার ভাত মাছ সবজি ডাল মাংস এবং মিঠাই তার চোদ্দপুরুষে কেউ কখনও খাওয়া দূরে থাক, চোখে পর্যন্ত দেখেনি। তার ধারণা হয়েছে, মুনেশ্বরজির মেহমান এই সরগনা আদমিদের খুশি করে দিতে পারলে রোজই এরকম বঢ়িয়া ভোজন জুটবে। মনে মনে তার ছোট্ট কালাকার জীবনের সেরা নাচগানের জন্য তৈরি হয়ে নেয় বালুয়া। এর সঙ্গে তাঁর বাঁচা-মরা যেন

জড়িয়ে আছে, এমন মরিয়া ভঙ্গিতে সে একসময় সারা শরীর ঝাঁকিয়ে, হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে এবং চোখ মারতে মারতে নাচ শুরু করে। সেই সঙ্গে গান।

'আই লাভ ইউ—লাভ, লাভ, লাভ—
এ মেরা দিলকা রানী
মেরা আখোঁকা রোশনি
তু পেয়ার করোগি—না?
এ মেরা জান।
মেরা জান, মেরা জান, মেরা জান
নেহী করোগি তো নেহী ছোড়েগা
এ মেরা জান
মেরা মেরা মেরা মেরা জান—
আই লাভ ইউ—লাভ, লাভ, লাভ—'

গানের সুরটার মধ্যে প্রচণ্ড রকমের অশ্লীল মাদকতা রয়েছে, যা মানুষের ভেতরকার লুকনো যৌন উত্তেজনাকে উসকে দিয়ে দিয়ে আরও গনগনে করে তোলে।

নাচটাও গানের মতোই। আদ্যন্ত তীব্র, উত্তপ্ত সেক্স ছাড়া এর মধ্যে আর কিছুই নেই।

গোড়ায় বুক পেট আর কোমর ঝাঁকাচ্ছিল বালুয়া। সুরে যত ঝাঁঝ বাড়ছে, নাচও ততই উদ্দাম হয়ে উঠতে থাকে। এখন শরীরে ঝড় তুলে কখনও লাফিয়ে তিন ফিট উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। পরক্ষণে মাটিতে শুয়ে উলটেপালটে কোমর দুলিয়ে পা কাঁপিয়ে ফের উঠে পড়ছে।

অর্জুনকুমাররা একেবারে থ বনে গিয়েছিলেন। তাঁদের কারো চোখে পাতা পড়ছে না। যদিও প্রচুর গোলমাল আছে তবু ছোকরা অর্জুনকুমারের ছবি টবি না দেখেও শুধুমাত্র নওটঙ্কী দলের মালিকের কাছে শিখে বেশ খানিকটা নকল করতে পেরেছে।

সঞ্জীব নিচু গলায় বলেন, 'মেরা দুশমন' ফিল্মে কলেজের সামনে হিরোইনকে দেখে তুই যেমন নাচতে নাচতে গেয়েছিলি, সেই সিকোয়েন্সটা বালুয়া ইমিটেট করেছে। বাহাদুর ছোকরা।'

আস্তে মাথা নাড়েন অর্জুনকুমার। চোখের সামনে নিজের নকল দেখে আমোদ লাগছিল তাঁর।

রোহিত রগড়ের গলায় বলেন, 'ছোকরা বোম্বাই গেলে আপনাকে ঝামেলায় ফেলে দেবে।'

অর্জুনকুমার হেসে হেসে উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, আচমকা রেণুকা প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'থাম বালুয়া।'

কামরার মাঝখানে যে দুরন্ত ঘূর্ণিঝড় চলছিল, তা মুহূর্তে থমকে যায়।

একনাগাড়ে এতক্ষণ নেচে গেয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বালুয়া এখন হাঁপাচ্ছে।

রেণুকা বলেন, 'তুই এবার চলে যা। কাল সকালে আমাদের বাড়ি চলে আসিস।'

'আসব।' বলে হাতজোড় করে অর্জুনকুমারদের 'নমস্তে' জানিয়ে বালুয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রেণুকা সোজাসুজি অর্জুনকুমারের দিকে তাকান, 'বালুয়া যা দেখাল সেটা আপনারই অবদান। ইওর কন্ট্রিবিউশন টু ইন্ডিয়ান সিনেমা অ্যান্ড ইন্ডিয়ান পীপল। নিজের কীর্তি নতুন করে দেখতে কেমন লাগল?'

রেণুকার বলার ভঙ্গিতে যে চাপা বিদ্রূপ রয়েছে সেটা টের পাওয়া যায়। অর্জুনকুমার হকচকিয়ে যান। দুপুরে বালুয়াকে 'রাজপুত নিকেত'-এ আসতে বলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, ছোকরা তাঁর নকল করে কীরকম নাচেটাচে, সে-সব দেখে খানিকটা মজা করা। কিন্তু রেণুকা বালুয়াকে সঙ্গে করে এনে সব গোলমাল করে দিয়েছেন।

রেণুকা আবার বলেন, 'এরকম জঘন্য ডার্টি অবসিন জিনিস আপনারা হোল কান্ট্রিতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এর ফল কতটা মারাত্মক হচ্ছে, ভাবতে পারেন?' তাঁর স্বর উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

রোহিত বলেন, 'এগুলোকে এত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন? দিজ আর সিম্পল এন্টারটেনমেন্ট-ফুড ফর দা কমন পীপল।'

রেণুকা বলেন, 'এর নাম এন্টারটেনমেন্ট! এগুলো ভাইরাস। সোসাইটিকে আপনারা নষ্ট করে দিচ্ছেন।'

আবহাওয়াটাকে হালকা করার জন্য সঞ্জীব বলেন, 'সিনেমার এত ক্ষমতা আছে বলে আমার মনে হয় না।'

'কতটা ক্ষমতা রয়েছে তার নমুনা তো নিজের চোখেই দেখলেন। ওই যে ছেলেটা বালুয়া—ও নওটঙ্কির একজন গুণী আর্টিস্ট। আগে রামায়ণ, মহাভারতের নানা কাহিনি নেচে গেয়ে গাঁয়ের লোকেদের শোনাত। কখনও সোশাল প্রবলেম নিয়ে মজার মজার গান বেঁধে গাইত। এখন আপনাদের ফিল্মের নকল করে লোককে দেখায়। আপনাদের জন্যে রুট থেকে ওরা সরে যাচ্ছে!'

রোহিত বলেন, 'রুরাল কলাকারদের আমাদের এন্টারটেনমেন্টের স্টাইল নকল না করলেই হয়।'

রেণুকা বলেন, 'জানেন না, উত্তেজক অশ্লীল ব্যাপারের দিকে লোকের ঝোঁক থাকে বেশি? মানতেই হবে, চটকদার এন্টারটেনমেন্টের একটা তরীকা আপনারা তৈরি করতে পেরেছেন। নেশার মতো এর প্রচণ্ড অ্যাট্রাকশন রয়েছে। গাঁয়ের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ফোক আর্টিস্টরা পর্যন্ত তার ফাঁদে পড়ে যাচ্ছে।'

অর্জুনকুমার চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। এবার বলেন, 'কিন্তু রেণুকাজি, এখানে সিনেমা হল টল নেই, লোকে আমাদের ফিল্ম দেখে কী করে?'

রেণুকা জানান, এখানে সিনেমা হল না থাকলেও তিরিশ চল্লিশ মাইলের ভেতর দু-চারটে ছোটোখাটো শহর রয়েছে। গাঁয়ের কেউ কেউ, সংখ্যায় খুবই কম, ক্বচিৎ কখনও কখনও কাজেকর্মে সেখানে গেলে সিনেমা টিনেমা দেখে। তাদের সঙ্গেই ভাইরাস গাঁয়ে ঢুকে পড়ে।

বালুয়ার কথা মনে পড়ে যায় অর্জুনকুমারের। যে নওটঙ্কীর দলে সে গাইত টাইত তার মালিক শহর থেকে হিন্দি ছবি দেখে এসে বাছা বাছা কিছু সেনসেশনাল ব্যাপার বালুয়াদের শিখিয়ে আসরে নামিয়ে দিত।

রেণুকা বলেন, 'এ সব আলোচনা থাক। একটা বিষয়ে আমার কাল থেকে খুব জানতে ইচ্ছে করছে।'

'কী বিষয়ে?'

'আপনাদের সম্বন্ধে শুনেছি, বোম্বাই থেকে কোথাও বেরুলে প্যারিস টোকিও নিউইয়র্ক কি হনুলুলু ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না। হঠাৎ এত কষ্ট করে ভারতবর্ষের গাঁ দেখতে এলেন কেন?'

ভেতরে ভেতরে সতর্ক হয়ে যান অর্জুনকুমার। বুঝতে পারেন, এতক্ষণে আসল প্রসঙ্গে চলে এসেছেন রেণুকা। হেসে হেসে বলেন, 'বা রে, নিজের দেশ দেখতে ইচ্ছে করে না! এর মধ্যে কষ্ট কীসের?'

'নো-নো-নো—' আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন রেণুকা, 'আপনাদের মতো গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের মানুষেরা শুধু শখ করে দেশ দেখার জন্যে এরকম ম্যাড়মেড়ে জায়গায় এসে পড়ে থাকে না।'

এই সোশাল ওয়ার্কার অধ্যাপিকাটি যে অসাধারণ বুদ্ধিমতী, আগেই টের পেয়েছিলেন অর্জুনকুমার। শুধুমাত্র দেশ দেখার কথা বলে এঁকে বিশ্বাস করানো যাবে না। তিনি বলেন, 'তা হলে কী জন্যে এসেছি বলে আপনার মনে হয়?'

'আমার ধারণা, ইন্ডিয়ার ভিলেজ নিয়ে আপনারা ছবি করতে চান। তার মেটিরিয়াল জোগাড় করতে এখানে এসেছেন।'

অর্জুনকুমার উত্তর দেন না।

রেণুকা থামেননি, 'ইন্ডিয়ান পভার্টি, সুপারস্টিশন-এর বিশাল এক্সপোর্ট মার্কেট রয়েছে। ফোরেনাররা এ সব পেলে লুফে নেবে। কিন্তু আপনার কাছে আমার বিশেষ একটা অনুরোধ আছে, সেটা জানাতেই আজ এসেছি।'

'কী অনুরোধ?'

'দয়া করে ভারতবর্ষের অভাব, দারিদ্র, কুসংস্কার-টুসংস্কার নিয়ে ব্যবসা করবেন না। নো কমার্শিয়ালাইজেশন প্লিজ।'

অর্জুনকুমার চমকে ওঠেন। ধরমপুরা অঞ্চলে আসার আগে তাঁর সাংবাদিক বন্ধু রমেশ আদবানি যা বলেছিলেন, তার একেবারে উলটোটা বলছেন রেণুকা। রমেশ বলেছিলেন, ফোরেন দর্শক ফোবেন এক্সপোর্ট মার্কেট মাথায় রেখে ভারতীয় দারিদ্র টারিদ্র এমন চতুরভাবে কাজে লাগাতে হবে যার দু'টো উদ্দেশ্য। এক, বাণিজ্য। দুই, ইন্টারন্যাশনাল হাততালি এবং নানা ফেস্টিভ্যাল থেকে প্রাইজ ইত্যাদি বাগানো। কিন্তু কমার্শিয়ালাইজেশনের ব্যাপার একেবারেই মাথা থেকে বার করে দিতে বলছেন রেণুকা।

অর্জুনকুমার আদ্যোপান্ত কমার্শিয়াল ওয়ার্ল্ডের মানুষ। বাণিজ্য আর গ্ল্যামার ছাড়া অন্য কিছু বোঝেন না। বিমূঢ়ের মতো বলেন, 'গ্রাম নিয়ে ছবি করলে প্রভার্টি টভার্টি তো আসবেই।'

রেণুকা বলেন, 'নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু এগুলো দিয়ে ব্যবসার জন্য আনরিয়ল ইলিউশন তৈরি করবেন না।'

অর্জুনকুমার বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকেন।

রেণুকা বলেন, 'আপনি দেশের মোস্ট পপুলার ফিল্ম স্টার। আপনাকে দেখার জন্যে মানুষ পাগল। দেশের গরিব শিক্ষাদীক্ষাহীন মানুষ—যাদের বলা হয় ভাস্ট সাইলেন্ট মেজোরিটি—তারা স্বাধীনতার চল্লিশ বছর বাদেও গাঁয়ে গাঁয়ে কোন লেভেলে পড়ে আছে, আপনার পরের ফিল্মে তার রিয়াল পিকচার তুলে ধরে সবাইকে দেখান। সবাই জানুক, ভারতবর্ষের বেশির ভাগ মানুষ কীভাবে জীবন কাটাচ্ছে।'

অর্জুনকুমার এমন কথা আগে কখনও শোনেননি। রেণুকার বলার ভঙ্গি এতই আন্তরিক যে তাঁকে আমূল নাড়া দিয়ে যায়। বলেন, 'আপনি তো জানেন, আমরা ড্রিম মার্চেন্ট, স্বপ্ন বিক্রি করে থাকি। ইলিউশন তৈরি করাই আমাদের কাজ।'

'সোসাইটি সম্পর্কে আপনাদের কি কোনোরকম কমিটমেন্ট নেই?'

অর্জুনকুমার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, 'আপনি আর আপনার বন্ধুরা গাঁয়ে গাঁয়ে সোশাল ওয়ার্ক করেন। এদের কথা আপনারাও তো দেশের মানুষকে জানাতে পারেন।'

'চেষ্টা তো করি। শহরে সেমিনার করি, খবরের কাগজে রিপোর্ট পাঠাই, মিটিং অর্গানাইজ করি। কিন্তু আমাদের ক্ষমতা আর কতটুকু! আপনার ট্রিমেন্ডাস পপুলারিটি, হাতে রয়েছে অডিও-ভিসুয়াল মিডিয়ার মতো মোস্ট পাওয়ারফুল ওয়েপন। আপনি এক মাসে যা পারবেন, আমাদের পক্ষে, হাজার বছরেও তা সম্ভব নয়।'

অর্জুনকুমার দূরমনস্কর মতো কিছু ভাবেন। তারপর বলেন, 'আপনার কথা আমার মনে থাকবে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর রেণুকা বলেন, 'আপনারা তো আজ গাঁ দেখতে বেরিয়েছিলেন।'

অর্জুনকুমার বলেন, 'হ্যাঁ।'

'কেমন দেখলেন?'

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যা যা দেখেছেন, সমস্ত বলে যান অর্জুনকুমার।

রেণুকা বলেন, 'একদিনের পক্ষে যথেষ্ট। অবজারভেশনও ভালো। যেখানে নজর পড়া দরকার, ঠিক পড়েছে। আরও দেখুন অর্জুনজি। এখানে লাইফের নানা লেভেল রয়েছে—সোশাল, পলিটিক্যাল, ইকোনমিক। সেগুলো ঠিক-ঠিক যদি ছবিতে ধরতে পারেন, সেটা মাস্টারপিস হয়ে উঠবে।'

নিজের মধ্যে এক ধরনের উদ্দীপনা অনুভব করেন অর্জুনকুমার। এতকাল তো মারদাঙ্গা ভেনডেটা কিংবা রগরগে সেক্স-মেশানো অলীক প্রেমের ছবিতে বন্দুক চালিয়ে, ঢিসুম ঢিসুম করে বা নেচে গেয়ে হুল্লোড় বাধিয়ে এসেছেন। এবার না হয় একটা অন্য স্টাইলের ফিল্ম করা যাক। তিনি বলেন, 'আমরা হঠাৎ এখানে চলে এসেছি। একটা আর্জি জানাবো?'

উৎসুক মুখে রেণুকা বলেন, 'কীসের আর্জি?'

'গ্রামকে ভালো করে চেনার জন্যে আপনাকে কি গাইড হিসেবে পেতে পারি?'

রেণুকা হেসে ফেলেন, 'ঠিক আছে।'

'কাল থেকে?'

'না। আমার তিন চারদিন অন্য কাজ আছে। তার পর হতে পারে।'

'অনেক ধন্যবাদ। তা হলে এই ক'দিন আমরা নিজেদের মতো করে ঘুরে দেখি।'

'বেশ তো।'

কথায় কথায় কখন সূর্য ডুবে গেছে, কারো লক্ষ ছিল না। উত্তর বিহারের এই সৃষ্টিছাড়া ভূখণ্ডের ওপর পাতলা অন্ধকার নামতে শুরু করেছে।

এর মধ্যে নিচে কোথাও ডায়নেমো চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার জোরাল আওয়াজ উত্তুরে বাতাসের কাঁধে চেপে চারিদিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে। ডায়নেমো চলার সঙ্গে সঙ্গে 'রাজপুত নিকেত' আলোয় ভরে যায়। অর্জুনকুমারের কামরায় মাথার ওপর জ্বলে ওঠে সবগুলো ঝাড়বাতি।

রেণুকা বলেন, 'এবার চলি। আপনাদের অনেকটা সময় নষ্ট করে গেলাম।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান। দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে কী ভেবে হঠাৎ থেমে যান, 'আচ্ছা, এতক্ষণ রইলাম, বাবুজিকে তো দেখছি না। তাঁর তো সারাক্ষণ আপনাদের সঙ্গে থেকে মেহমানদারি করার কথা।'

অর্জুনকুমার বলেন, 'উনি দুপুরে সাদাতপুরায় গেছেন।'

'সাদাতপুরা!' রেণুকা চমকে ওঠেন, 'আপনি ঠিক জানেন?'

'হ্যাঁ, জগনাথজি তো তাই বললেন। রমজান সাহেব নামে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গেই গেছেন।'

'রমজান সাহেব নিজে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

এরপর রেণুকা এতই স্তম্ভিত হয়ে যান যে কী বলবেন ভেবে পান না। অনেকক্ষণ পর তাঁর মুখ থেকে শুধু একটি শব্দই বেরোয়, 'স্ট্রেঞ্জ!'

সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'স্ট্রেঞ্জ কেন?'

রেণুকা যা উত্তর দেন তা এইরকম। রমজান সাহেব মুনেশ্বরজির মতো ল্যান্ডেড অ্যারিস্টোক্র্যাট এবং প্রতিবেশী হলেও দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা বরাবরই খারাপ। তার একটা বড় কারণ রমজান সাহেব রাজনীতি করেন, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর ইচ্ছা এই অঞ্চল থেকে এম. এল. এ হয়ে বিধানমণ্ডলে যান। পর পর ক'বার নির্বাচনে উম্মীদবার হয়েছেন কিন্তু একবারও জেতা সম্ভব হয়নি। তাঁর ইচ্ছাপূরণে একমাত্র পথের কাঁটা মুনেশ্বর সিং। কেননা, তাঁর কনিস্টিটিউয়েন্সির একটা বড় অংশ পড়েছে মুনেশ্বরজির এলাকায়। আর সেখানে রয়েছে প্রচুর মাইনোরিটি ভোট। তার একটি ভোটও পান না রমজান সাহেব। তাঁর ধারণা মুনেশ্বরই চাপ তৈরি করে ভয় দেখিয়ে তাঁকে ওদের ভোট দিতে দেন না। ফলে এ অঞ্চলের দুই প্রবল পরাক্রান্ত ল্যান্ডেড অ্যারিস্টোক্র্যাটের মুখ দেখাদেখি বন্ধ। সেই রমজান সাহেব যে এভাবে 'রাজপুত নিকেত'-এ ছুটে আসতে পারেন এবং মুনেশ্বরের সবচেয়ে অনুগত, সব চেয়ে বিশ্বাসী লেফটেনান্ট জগনাথ যে তাঁর সঙ্গে সাদাতপুরায় যেতে পারেন, এর চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা খুব বেশি ঘটে না।

এখানে আসার আগে দারিদ্র কুসংস্কার আর ভুখের কথাই ভেবেছিলেন অর্জুনকুমার। কিন্তু কে জানত ব্যাপারটা আরও জটিল। পভার্টি হাঙ্গার টাঙ্গারের সঙ্গে মিশে আছে ভোটের রাজনীতি, কমুনালিজম, এমনি আরও অনেক কিছু। এই সবের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত কোনো সম্পর্ক নেই, তবু অদ্ভুত এক টেনশন তাঁকে যেন পেয়ে বসে।

রেণুকা বলেন, 'বাবুজি কেন সাদাতপুরায় গেলেন, আপনারা কি জানেন?'

'না।'

'ঠিক আছে। আমি চললাম। বাবুজি ফিরে এলে দয়া করে তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।'

'আচ্ছা।'

দোতলার সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত, রেণুকাকে এগিয়ে দিতে যান সবাই। একতলায় আজ আর নামবেন না অর্জুনকুমার। তা হলে আবার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হবে। একদিনে দু'বার এতগুলো সিঁড়ি বাওয়া তাঁর বারণ।

রেণুকা চলে গেলে অর্জুনকুমাররা ঘরে ফিরে আসেন।

রোহিত বলেন, 'শেষ পর্যন্ত রেণুকাজিকে গাইড করে নিলেন!'

অর্জুনকুমার বলেন, 'আপনি তো তাই চাইছিলেন।'

রোহিত বলেন, 'কিন্তু তখন কি জানতাম ম্যাডাম এমন দুর্দান্ত আইডিয়ালিস্ট। আমার ভয় হচ্ছে, এঁর পাল্লায় ভালো করে পড়লে আমাদের মেগা স্টারটি না সোশাল রিফর্মার হয়ে যান। দ্যাট উড বী আ গ্রেট লস্ টু ইন্ডিয়ান কমার্শিয়াল সিনেমা।'

অর্জুনকুমার হাসতে থাকেন, 'দেখা যাক।'

সাত

পরদিন সকালে স্নান সেরে অর্জুনকুমাররা যখন ব্রেকফাস্ট করছেন, সেই সময় জগনাথ এলেন। কাল দুপুরে রমজান সাহেবের সঙ্গে সেই যে সাদাতপুরায় গিয়েছিলেন, তারপর এই তাঁকে দেখা গেল।

কাঁচুমাচু মুখে হাতজোড় করে জগনাথ বারংবার ক্ষমা চেয়ে বলেন, 'কাল সাদাতপুরা থেকে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। অত রাতে আপনারা জরুর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তাই আর বিরক্ত করতে আসিনি। সোজা আপনা কোঠিতে চলে গিয়েছিলাম।'

সাদাতপুরায় অত রাত পর্যন্ত রমজান সাহেবের সঙ্গে কী আলোচনা হল, জানার অপার কৌতূহল অর্জুনকুমারের, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করেন না। শুধু বলেন, 'সোজা বাড়ি গিয়ে ভালোই করেছেন।'

'কাল আমি ছিলাম না। নিশ্চয়ই আপনাদের অসুবিধা হয়েছে?'

'একেবারেই না। আপনার লোকেদের মেহমানদারিতে কোনোরকম ত্রুটি হয়নি। তারা যথেষ্ট যত্ন করেছে।'

জগনাথ খুশি হন। বলেন, 'আজও গাঁও দেখতে যাবেন নিশ্চয়ই?'

অর্জুনকুমার বলেন, 'আপনাকে তো আগেই জানিয়ে দিয়েছি, যে ক'দিন আছি রোজ যাব।'

কিছু বলতে গিয়েও থেমে যান জগনাথ। একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'ঠিক আছে।'

দ্রুত ব্রেকফাস্ট সেরে খানিকক্ষণ পর ল্যান্ডো করে অর্জুনকুমাররা টিলার নিচে চলে আসেন। জগনাথও সঙ্গে এসেছেন। নিচে কালকের মতোই চৌধারি অপেক্ষা করছিল।

অর্জুনকুমার বলেন, 'জগনাথজি, আমাদের সঙ্গে চৌধারিজির যাবার দরকার নেই। আমরা নিজেরাই যেভাবে পারি, ঘুরে-ঘুরে দেখি।'

জগনাথ হকচকিয়ে যান, 'লেকিন অর্জুনজি, আপনার সিকিউরিটির জন্যে ওকে সঙ্গে দিতে চাই। কাল ওকে আপনাদের সঙ্গে ভারহাটিয়া গাঁওয়ে নিয়ে যাননি। এটা ঠিক নয়।'

কোনটা সঠিক আর কোনটা ভ্রান্ত, আজ পর্যন্ত কেউ অর্জুনকুমারকে এভাবে এত সোজাসুজি বলেনি। তিনি যে ফিল্ম দুনিয়ার একমাত্র মেগাস্টার, তিনি যা বলবেন যা করবেন, সেটাই যে পৃথিবীতে শেষ কথা, এতকাল এই নিয়েই অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর দম্ভে কোথায় যেন ধাক্কা লাগে।

অর্জুনকুমার বুঝতে পারছিলেন, কাল গ্রাম দেখতে গিয়ে যা যা ঘটেছে, চৌধারি সব জানিয়ে দিয়েছে জগনাথকে। তিনি বলেন, 'জগনাথজি, একজন বন্দুকবাজ সঙ্গে থাকলে খুব অসুবিধা হয়। লোক তার সামনে কথা বলতে ভয় পায়। আমার সিকিউরিটির জন্যে চিন্তা করবেন না। নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার আছে।' তাঁর চোখেমুখে কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা এবং ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে।

জগনাথ কী উত্তর দেবেন, ভেবে পান না। কিছুক্ষণ বাদে বলেন, 'অর্জুনজি, আপনি এখানকার হালচাল জানেন না। সব গাঁও ভারহাটিয়ার মতো ভালো নয়। কয়েকটা খতারনাক ভিলেজ আছে। পলিটিক্যাল পার্টির বজ্জাতেরা সেখানে ঝঞ্ঝাট পাকাবার চেষ্টা করছে। আপনি ওই সব জায়গায় গেলে ঝামেলায় পড়ে যাবেন।'

'আমরা এখানে পলিটিকস করতে আসিনি। অকারণে ঝামেলায় পড়তে যাব কেন? আপনি চিন্তা করবেন না।'

জগনাথ তবু কী বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে অর্জুনকুমার বলেন, 'রোদ উঠে গেছে অনেকক্ষণ। আর দেরি করা যাবে না। আমরা চলি।'

জগনাথকে আর কিছু বলার সময় না দিয়ে অর্জুনকুমারেরা মাঠের দিকে চলে যান। ওঁরা খানিকটা যাবার পর জগনাথ চৌধারিকে বলেন, 'উনলোগোকা পিছা মাত্ ছোড়ো।' অর্থাৎ অর্জুনকুমাররা যেখানে যাবেন ছায়ার মতো তাঁদের পিছু নেবে চৌধারি।

চৌধারি বলে, 'জি—'

'তুমি যে পিছু নিয়েছ, ওঁরা যেন টের না পান।'

'জি—'

মাঠে নেমে অর্জুনকুমার বলেন, 'আজ কোন দিকে যাওয়া যায় বলুন তো রোহিতজি—'

রোহিত বলেন, 'যেদিকে সিনেমার তাঁবু খাটানো হচ্ছে সে দিকটা বাদ দিয়ে যেখানে ইচ্ছে চলুন। ওখানে ফিল্মওলাদের লোকজন থাকলে আপনাকে চিনে ফেলতে পারে।'

'আমরা এখানকার কিছুই চিনি না। কাল ভারহাটিয়ায় গিয়েছিলাম, চলুন আজ তার উলটো দিকের গাঁওগুলোতে যাওয়া যাক।'

ভারহাটিয়ার বিপরীত দিকে আধ মাইলের ভেতর পর পর দু'টো গ্রাম—নাথপুরা এবং বিষুণগঞ্জ। ভারহাটিয়ার সঙ্গে নাথপুরা বিষুণগঞ্জের তফাত নেই বললেই হয়। একই ধরনের ঘরবাড়ি, একই ধরনের মানুষজন। সেই দারিদ্র, সেই ভুখ, সেই অসহায়তা। এবং এত সবের মধ্যেও ভারহাটিয়ার মতো দুই গ্রামেই বড় তৌহার হোলির জন্য গান-বাজনার তালিম চলছে।

'মুনেশ্বর সিংয়ের মেহমান'—এইরকম পরিচয় দিয়ে দুই গাঁয়ের লোকজনের সঙ্গে আলাপ করেন অর্জুনকুমাররা। কিন্তু ভারহাটিয়ার ঝুন্নিলালদের সঙ্গে কথা বলে গ্রাম সম্পর্কে যে-সব খবর জানা গিয়েছিল, বিষুণগঞ্জে বা নাথপুরায় তার থেকে বেশি কিছু পাওয়া যায় না।

দু'টো গ্রাম ঘুরতে খুব বেশি সময় লাগে না। দুপুর হতে এখনও ঘণ্টা দুয়েক বাকি। অর্জুনকুমার ঠিক করে ফেলেন, আরও এক আধটা গ্রাম দেখে 'রাজপুত নিকেত'-এ ফিরবেন।

নাথপুরা বিষুণগঞ্জের পর অনেকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর একটা পুরোনো মন্দির ডাইনে রেখে বাঁ দিকে আরেকটা গ্রাম।

অর্জুনকুমার বলেন, 'চল ফারুকভাই, ওই গাঁটা দেখে আসি।'

গাঁয়ের কাছাকাছি আসতেই একটি তেইশ চব্বিশ বছরের যুবক প্রায় মাটি ফুঁড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে অর্জুনকুমারদের কাছে এসে হাঁপাতে থাকে। উত্তেজনা, বিস্ময়, খুশি—নানা মানসিক প্রতিক্রিয়া একাকার হয়ে তার চোখেমুখে ক্রমাগত ফুটে উঠতে থাকে। কাঁপা গলায় সে বলে, 'আপ!' তার কপালে দানা দানা ঘাম ফুটে উঠেছে, চোখে পাতা পড়ছে না।

ছেলেটির পরনে ময়লা পায়জামা এবং সবুজ শার্টের ওপর রোঁয়াওলা সস্তা উলের হাতকাটা সোয়েটার।

মুখ দেখেই অর্জুনকুমার টের পেয়ে যান, সে তাঁকে চিনতে পেরেছে। বলেন, 'তুমি কে?'

'খলিল হুজৌর।'

'কোথায় থাকো?'

ডান দিকে কোনাকুনি আঙুল বাড়িয়ে খলিল বলে, 'ওই গাঁওয়ে।'

অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'কী নাম তোমাদের গাঁওয়ের?'

'সমশেরগঞ্জ হুজৌর।'

হাসিনার মুখ মনে পড়ে যায় অর্জুনকুমারের। সমশেরগঞ্জের নাম চৌধারির কাছে কালই শুনেছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে চব্বিশ ঘন্টার ভেতর সেখানে চলে আসবেন, কে জানতো!

খলিল পলকহীন তাকিয়ে ছিল। তার মুখ দেখে মনে হয়, একটা অবিশ্বাস্য অলীক স্বপ্ন হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে। সে এবার বলে, 'আমার বিবির কাছে আপনার কথা শুনেছি জনাব।' তার গলার স্বরই শুধু না, সমস্ত শরীরটাই অসহ্য কাঁপছে।

অর্জুনকুমার চমকে ওঠেন, 'কে তোমার বিবি?'

'হাস্‌সু—হাসিনা। কাল বগেড়ি ধরতে বিলে গিয়েছিল। তখন আপনার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে।' খলিল বলতে থাকে, 'আপনি হাস্‌সুকে বলেছিলেন, আমাদের গাঁওযে আসবেন। আইয়ে—'

দ্বিধান্বিতের মতো অর্জুনকুমার বলেন, 'কিন্তু—'

তাঁর মনোভাব খানিকটা যেন আন্দাজ করতে পারছিল খলিল। সে গলা আরও নামিয়ে বলে, 'চৌধারিজি হোঁশিয়ার করে দিয়েছে। হাস্‌সু আর আমি কাউকে আপনার কথা বলিনি হুজৌর। চিন্তা নায় করনা। আইয়ে—'

তবু সংশয় কাটে না অর্জুনকুমারের। হাসিনা এবং খলিল যখন তাঁকে চিনে ফেলেছে তখন সমশেরগঞ্জের আর কেউ কি চিনবে না? তাঁকে চিনে ফেললে তুলকালাম শুরু হয়ে যাবে।

খলিল বোধহয় থট-রিডার। মুখ দেখে মনের কথা পড়ে ফেলতে পারে। ভরসা দিয়ে বলে, 'হুজৌর, আমাদের গাঁওয়ের লোক সিনেমা দেখে না। আপনাকে কেউ চিনতে পারবে না।' একটু থেমে বলে, 'আমি শুনেছি, আপনাকে চিনে ফেললে লোকেরা পাগলের মতো ঝামেলা বাধায়।'

অর্জুনকুমার জানতে চান, গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে লোকজনের কাছে তাঁদের কী পরিচয় দেবে খলিল?

খলিল কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে, 'বলব আপনি বড়ে সরকার মুনেশ্বরজির মেহমান। দোস্তদেব নিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছেন। ঠিক হ্যায়?'

গ্রামে থাকলেও খলিল যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অর্জুনকুমার বুঝতে পারেন। সে সঙ্গে থাকলে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। একটু হেসে বলেন, 'আচ্ছা চল।'

অত্যন্ত মূল্যবান সম্পত্তির মতো অর্জুনকুমারকে আগলে আগলে সমশেরগঞ্জের দিকে এগিয়ে যায় খলিল।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'কাল তুমি জঙ্গলে গিয়েছিলে। আজ যাওনি?'

'সুবে সুবে গিয়ে জলদি ফিরে এসেছি।'

'হাস্‌সু?'

'বগেড়ি ধরতে বিলে গিয়েছিল। সে-ও ফিরে এসেছে। একটা বগেড়িও ধরতে পারেনি।'

'বগেড়ি না ধরেই চলে এল যে?'

খলিল যা উত্তর দেয় তাতে অভিভূত হয়ে যান অর্জুনকুমার। তিনি যদি এসে ফিরে যান সে জন্য ভোর হতে না হতেই তারা স্বামী-স্ত্রী ঠিক করেছে বিলে-জঙ্গলে গিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে ফিরে আসবে। এতে কিছু পাওয়া যাক বা না যাক।

অর্জুনকুমার বলেন, 'আমি যদি না আসতাম?'

'ঠিক আসতেন হুজৌর।' একটা ছবির নাম করে খলিল জানায় সেই ছবিটায় অর্জুনকুমার হিরোইনকে কথা দিয়েছিলেন, যেমন করে পারেন, যতদিন লাগুক, তার সঙ্গে তিনি দেখা করবেন। দু-চার দিন নয়, পাঁচ-সাত মাসও না, দীর্ঘ দশ বছর বাদে নায়িকার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। কাজেই হাসিনাকে কথা তিনি যখন দিয়েছেন, তার খেলাপ করবেন না, সমশেরগঞ্জে আসবেনই, এ-বিশ্বাস খলিলদের ছিল।

অর্জুনকুমার অবাক হয়ে যান। সিনেমার বানানো অলীক কাহিনির নায়ক আর তাঁকে খলিলরা এক করে ফেলেছে। পর্দায় তারা যা দেখেছে সেটাই তারা অভ্রান্ত ধরে নিয়েছে। অর্থাৎ সিনেমার হিরো আর সিনেমার বাইরের অর্জুনকুমার যে আলাদা মানুষ, এটা তারা ভাবতেই পারে না।

রোহিত অর্জুনকুমারের কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলেন, 'ফিল্মে কী দুর্দান্ত ইলিউশন তৈরি করেছেন, একবার ভেবে দেখুন অর্জুনজি। এর ফাঁদ থেকে বোধ হয় বেরুতে পারবেন না। ফিল্মে আপনি যে সব কাণ্ডকারখানা করেছেন, তার বাইরে খলিলরা আর কিছু ভাবতে পারে না।'

অর্জুনকুমার অল্প হাসেন শুধু।

খলিল বলে, 'হুজৌর, একটা আর্জি আছে।'

'গাঁওযের ভেতরে নিয়ে যাবার আগে আপনাকে একবার আমার ঘরে নিয়ে যাব। হাস্‌সু খুব খুশি হবে।'

'তোমার ঘর গাঁয়ের বাইরে নাকি?'

'না মালিক।' খলিল বুঝিয়ে দেয়, তার ঘরটা দক্ষিণ দিকের শেষ মাথায়। মাঠ ভেঙে গেলে কেউ দেখতে পাবে না। গাঁয়ে একবার ঢুকলে অর্জুনকুমাররা লোকজনের চোখে পড়ে যাবেন। যদিও তাঁকে কেউ চেনে না, তবু নতুন মানুষ সম্পর্কে সবার কৌতূহল থাকেই। গাঁওবালারা জোঁকের মতো তাঁদের গায়ে লেগে থাকবে। ভিড়ের ভেতর থেকে তখন তাঁকে আলাদা করে কিছুতেই নিয়ে যাওয়া যাবে না। বার বার তো অর্জুনকুমার এখানে আসবেন না, এই সুযোগ নষ্ট হলে এ জীবনে তাঁকে তার গরিবখানায় নিয়ে যাবার সাধ কোনোদিনই পূর্ণ হবে না। বড়ই আপসোস থেকে যাবে তাদের।

খলিল বলে, 'আপনি গেলে খোয়াব হাতে পেয়ে যাবে হাস্‌সু। এমন খুশি জিন্দগিতে আর কখনও হবে বলে মনে হয় না। যাবেন তো হুজৌর?' তার গলার স্বরে, চোখেমুখে আকুলতা ফুটে বেরোয়।

অর্জুনকুমার বলেন, 'আমি কি একলাই যাব?'

খলিল বিব্রতভাবে বলে, 'হাঁ।'

রোহিতদের দেখিয়ে অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'আর এঁরা?'

কাছেই ক'টা ডালপালাওলা সিমার গাছের জটলা। গাছগুলো দেখিয়ে কাঁচুমাচু মুখে খলিল বলে, 'মেহেরবানি করে মালিকরা যদি এখানে একটু দাঁড়ান—'

'ঠিক আছে।'

রোহিতরা চকিত হয়ে ওঠেন। ফারুক কাছে এসে চাপা উদ্বেগের গলায় বলে, 'সচমুচ আপনি একা যাবেন?'

অর্জুনকুমার হাসেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বুঝিয়ে দেন, খলিলদের এত আগ্রহ এত আকুলতা উপেক্ষার বস্তু নয়।

'আমি বরং আপনার সঙ্গে যাই। ওদের ঘর পর্যন্ত যাব না, দূরে দাঁড়িয়ে থাকব।'

'দরকার নেই। আমি মানুষ চিনি। আমার কোনো ক্ষতি হবে না।'

অর্জুনকুমারের গলায় সেই কর্তৃত্বের সুর যা চারপাশের সবাইকে থামিয়ে দেয়। রোহিতদের সিমার গাছগুলোর নিচে দাঁড়াতে বলে তিনি খলিলের সঙ্গে চলে যান।

খলিলদের ঘরটা গাঁ থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্নই বলা যায়। সেটার পর অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। তারপর থেকে অন্য সব বাড়িঘরের ঠাস বুনট ভাবটা শুরু হয়েছে। সমশেরগঞ্জ যেন খলিলদের খানিকটা দূরে সরিয়ে রেখেছে।

খলিলদের ঘরটা মাটির, মাথায় পুরনো ফুটিফাটা টিনের চাল। সামনের দিকে বড় দাওয়া, দাওয়ার ওপর নিচু ঢালু ছাউনি।

অর্জুনকুমারকে সঙ্গে করে খলিল যখন তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়, হাসিনা ঘরের দাওয়ায় বসে একটা কানা ভাঙা সিলভারের থালায় চালের খুদ বাছছে।

খলিল নিচু কাঁপা গলায় বলে, 'হাস্‌সু, দ্যাখ, কাকে নিয়ে এসেছি।'

মুখ তুলতেই হাসিনার সমস্ত শরীরে বিজলির মতো কিছু খেলে যায়। দুর্লভ অলীক স্বপ্নের একটি টুকরো তার দু'হাত দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে।

হতবাক হাসিনা কিছুক্ষণ বিহ্বলের মতো তাকিয়ে থাকে। অজান্তে তার গলা দিয়ে বিস্ময় এবং উল্লাস মেশানো চাপা শব্দ বেরিয়ে আসে। তারপর যেন হিস্টিরিয়ার ঘোরে প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে, 'আপ সচমুচ আয়া!'

অর্জুনকুমার সস্নেহে হাসেন, 'সচমুচই এসেছি।'

প্রথমটা কী করবে ভেবে পায় না হাসিনা। তার হৃৎপিণ্ড তোলপাড় করে ঝড় বইতে থাকে। তারই মধ্যে উর্ধ্বশ্বাসে ঘরে গিয়ে ক'টা চট আর নিজের একমাত্র পরিষ্কার রঙিন শাড়িটা নিয়ে আসে। চটগুলো বিছিয়ে তার ওপর যত্ন করে শাড়িটি পেতে দিয়ে বলে, 'বৈঠিয়ে সরকার।' খলিলকে জিজ্ঞেস করে, 'হুজৌরকে কোথায় পেলে?'

বসতে বসতে উত্তরটা অর্জুনকুমারই দেন। কোথায় খলিলের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে এবং কেন প্রথমে গ্রামের ভেতর না নিয়ে গিয়ে খলিল তাঁকে এখানে নিয়ে এসেছে—সব জানিয়ে বলেন, 'তোমাদের কাছে আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে। তবে বেশিক্ষণ কিন্তু থাকতে পারব না। আমার বন্ধুরা মাঠে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছেন।'

খলিল দাওয়ায় উঠে এসে খানিক দূরে বসেছে, হাসিনা কিন্তু বসেনি, একটা খুঁটিতে শরীরের ভার রেখে চকচকে চোখে অর্জুনকুমারের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা কী জবাব দেবে, ভেবে পায় না।

আকাশের দুর্লভ তারার মতো অর্জুনকুমার নামে এই মেগা স্টারটি চিরদিন হাসিনাদের নাগালের বাইরেই ছিলেন! নেহাত কোনো রহস্যময় দৈব যোগাযোগে তিনি আজ তাদের দাওয়ায় এসে বসেছেন। নানা উপাদেয় বিষয়ে কথার পর কথা বলে এমন একজন মহামান্য বিখ্যাত মেহমানের মনোরঞ্জন কীভাবে করতে হয়, সে সব তরীকা দুই গ্রাম্য যুবক যুবতী জানে না। এই পৃথিবীর কতটুকুই বা তারা দেখেছে! খুব সম্ভব সামান্য অক্ষর পরিচয়টুকুও তাদের নেই। কোন বিষয়েই বা তারা কথা বলবে?

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর অর্জুনকুমারের হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায়। আস্তে আস্তে বলেন, 'আচ্ছা হাসসু, তোমাদের এখানে তো এখনও সিনেমা আসেনি। আমার ছবি কোথায় দেখলে?'

হাসিনা জানায়, পূর্ণিয়া টাউনের কাছে এক গাঁয়ে তার এক ফুফু থাকে। এই খরার বছরে অবশ্য সম্ভব হয়নি, তবে এর আগের আগের বছরে ফুফুর কাছে দু-চারদিন থেকে এসেছে। ফেরার পথে পূর্ণিয়ায় অর্জুনকুমারের ছবি দেখেছে তারা।

অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'আমার কোন কোন ছবি দেখেছ?'

মুখস্ত বলার মতো এক দমে পাঁচটা ছবির নাম আউড়ে যায়, তারপর ফের ঘরে ঢুকে অনেকগুলো সিনেমা পোস্টার, রঙিন হ্যান্ডবিল আর ফিল্মের বুকলেট নিয়ে বেরিয়ে আসে। সেগুলোর প্রতিটি অর্জুনকুমারের নানা ভঙ্গির ছবিতে ছবিতে ছয়লাপ। তবে সবগুলোতেই তাঁর হাতে রয়েছে পিস্তল অথবা বন্দুক। হ্যান্ডবিল, পোস্টার টোস্টার অর্জুনকুমারের হাতে দিয়ে হাসিনা বলে, 'আপনার ছবি দেখতে গিয়ে এগুলো আমরা জোগাড় করে এনেছি।'

সমস্ত দেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ ফ্যান অর্জুনকুমারের। কিন্তু হাসিনাদের মতো এমন দারুণ ভক্ত আগে আর কখনও দেখেননি। পোস্টার টোস্টারগুলো শুধু তারা জোগাড়ই করেনি, অমূল্য মোহরের মতো সেগুলোকে যত্ন করে রেখে দিয়েছে। অদ্ভুত এক আবেগ তাঁর বুকের ভেতরকার অদৃশ্য কোনো স্তরে নাড়া দিতে থাকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'কেমন লেগেছে ওই ছবিগুলো?'

উচ্ছ্বসিত গলায় হাসিনা জবাব দেয়, 'বহোত আচ্ছা।'

খলিল বলে, 'আপনার জবাব নেই।'

অর্জুনকুমারের মনে পড়ে, রেণুকা এই সব ছবি সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আটার ট্র্যাশ।' তিনি ভাবেন, রেণুকাদের জন্য নয়, ভারতীয় জনগণের জন্য অতীব 'রোচক' খাদ্য তাঁরা তৈরি করতে পেরেছেন।

কী নিয়ে কথা বলবে, গোড়ায় ঠিক করতে পারছিল না হাসিনারা। ছবির প্রসঙ্গ উঠতে তাদের আর থামানো যায় না।

হাসিনার চোখ উদ্দীপনায় বড় হয়ে যায়। সে বলে, 'ফরিস্তা' ছবিতে তিন চার শ দুশমনকে একা মেরে শেষ করে দিয়েছেন। দেখতে দেখতে আমার দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।'

খলিল বলে, ''ফরিস্তা' ছোড় ইয়ার। 'আখরি লড়াই'-এর কথাটা বল। লড়াই কাকে বলে হুজৌর ওই ছবিটায় দেখিয়ে দিয়েছেন। একসাথ হাজারো বদমাশ তাঁর হাতে শায়েস্তা হয়ে গেছে।'

হাসিনা মনে করিয়ে দেয়, 'কেন, তার চেয়ে জবরদস্ত লড়াই আছে 'খুনকা বদলা খুন' ফিলামটায়। দো হাজার হারামজাদকা ছৌয়াকে খতম করে দিয়েছেন হুজৌর। লড়াইকা কা রং ঢং! দুনিয়ামে অ্যায়সা লড়াই আর কেউ লড়েনি। কা তাকত হুজৌরকা!'

হাসিনারা যে ছবিগুলো দেখেছে তার সবই রিভেঞ্জ আর ভেনডেটার। প্রথম ফ্রেম থেকে শেষ ফ্রেম পর্যন্ত শুধুই মারদাঙ্গা এবং বন্দুকবাজি। প্রতিটি ছবিতেই অর্জুনকুমার দুশ, পাঁচশ, হাজার, দু হাজার দুশমনের সঙ্গে একা যুদ্ধ করে তাদের শেষ করে দিয়েছেন। আর সেটাকে হাসিনারা সত্যি বলে ধরে নিয়েছে। এই সিনেমাটিক ইলিউশন যে তাঁকে লক্ষ কোটি দর্শকের কাছে সুপারম্যান বানিয়ে দিয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অর্জুনকুমারকে নিয়ে তুমুল তর্কাতর্কি চলে। এ যদি কোনো এক ছবির বিশেষ কোনো দৃশ্যে অর্জুনকুমারের বীরত্বের কথা বলে, ও অন্য এক ছবির আরেকটি দৃশ্যের আরও চমকপ্রদ বীরত্বের নমুনা তুলে ধরে।

খানিকক্ষণ চেঁচামেচির পর হাসিনা অর্জুনকুমারকে বলে, 'আপনি এত এত সব দুশমনের সঙ্গে কী করে লড়লেন? চোট টোট লাগেনি?'

ভেনডেটার ছবিতে ফাইট সিকোয়েন্সগুলো কীভাবে তৈরি হয়, তাঁর ডামি হয়ে কারা লড়ে, সে-সব জানিয়ে অর্জুনকুমার এদের ইলিউশন আর ভাঙাতে চান না। তা হলে তার 'সুপারম্যান' ইমেজের অনেকটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি শুধু নিঃশব্দে হাসতে থাকেন।

হাসিনা ব্যাকুলভাবে বলে, 'বলুন না, আপনার চোট লাগে না তো? আমার অ্যায়সা ডর লাগে কী বলব! মনে হয়, এই বুঝি আপনার সিনায় গোলি ঢুকে গেল, এই বুঝি মাথায় লাঠি পড়ল!'

হাসিনার উদ্বেগ এবং ব্যাকুলতাটুকু বড় ভালো লাগে অর্জুনকুমারের। সিনেমা দেখে তাঁর জন্য এমন বিচলিত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, এমন সরল অকপট মানুষ আগে আর কখনও দেখেননি অর্জুনকুমার। তিনি হেসে হেসে বলেন, 'সিনেমার হিরোদের গায়ে কখনও চোট লাগে না। তারা মার খায় না, স্রেফ এক তরফা পিটিয়ে যায়।'

তাঁর বলার মধ্যে সূক্ষ্ম যে মজাটা রয়েছে, হাসিনারা তা কতটা ধরতে পারে তারাই জানে। দু'জনেই একসঙ্গে বলে ওঠে, 'আপনি অ্যাসয়া ফিলাম আরো বানাবেন হুজৌর। আপনার ছবি দেখতে দেখতে দিলকা ধড়কন বন্ধ হয়ে যায়।'

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে, উঠে পড়েন অর্জুনকুমার, 'আর থাকতে পারব না। এবার যেতে হবে।'

হাসিনা জিজ্ঞেস করে, 'আর কি কখনও দেখা হবে না?' সে জানে অর্জুনকুমার যে আজ তাদের ঘরের দাওয়ায় এসে বসেছেন, এমন দুর্লভ মুহূর্ত জীবনে আর কোনোদিন আসবে না। তবু অসীম দুরাশায় প্রশ্নটা করে বসেছে সে।

অর্জুনকুমার ভাবেন, জনগণকে নিয়ে ছবি করার যে পরিকল্পনাটা তাঁদের রয়েছে সেই কারণে এখানে আসতেই হবে। লোকেশনে শুটিংয়ের জন্য এই অঞ্চলে এক দেড় মাসও থাকতে হতে পারে। বলেন, 'হবে। আবার আমি তোমাদের এখানে আসব। তখন বেশ কিছুদিন থাকার ইচ্ছে আছে।'

হাসিনা এবং খলিলের মুখ উত্তেজনায় এবং খুশিতে ঝকমক করতে থাকে। হাসিনা জিজ্ঞেস করে, 'আবার কবে আসবেন?' গভীর আগ্রহে আর আবেগে তার গলা কাঁপতে থাকে।

অর্জুনকুমার একটু ভেবে বলেন, 'সেটা এখনই বলতে পারছি না। তবে মাস ছয়েকের ভেতর নিশ্চয়ই আসব।'

কথা বলতে বলতে যে পথ দিয়ে এসেছিলেন, সেটা ধরে হাঁটতে থাকেন অর্জুনকুমার। খলিলরা সঙ্গে সঙ্গে আছে।

অন্য সব গ্রামের লোকেরা যেভাবে বলেছে অবিকল সেইভাবে বিমর্ষ মুখে হাসিনা বলে, 'আমরা বহোত গরিব। কিছুই খাওয়াতে পারলাম না। এর পর যখন আসবেন—'

স্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে খলিল ধমকে ওঠে, 'কী খাওয়াবি তখন—ঘাটো না লিট্টি?' কয়েকটা ছবির নাম করে বলে, 'হুজৌর কেত্তে বড়ে আমির আদমি জানিস না? ওই ফিলামগুলোতে দেখিসনি কেত্তে বড়ে বড়ে হোটেলে হুজৌর ক্যায়সা ক্যায়সা খানা খায়!'

অর্জুনকুমার সান্ত্বনা দেবার সুরে হাসিনাকে বলেন, 'মন খারাপ কোরো না হাস্‌সু। পরের বার এসে তোমাদের এখানে চা খেয়ে যাব।'

হাসিনার মুখ ঝলমলিয়ে ওঠে, 'আপনি কথা দিলেন কিন্তু।'

'দিলাম তো। আর তুমি দেখেছ, কথা দিলে আমি কথা রাখি।'

'জি।'

অর্জুনকুমার এবার বলেন, 'আমি যে তোমাদের কাছে এসেছিলাম, কাউকে বোলো না।'

হাসিনা এবং খলিল একসঙ্গে বলে, 'নেহী নেহী। কাউকে বলব না।' আজকের এই বিস্ময়কর ঘটনাটি তারা মূল্যবান রত্নের মতো স্মৃতির ভেতর ধরে রাখবে।

'জবান দিলে কিন্তু—'

'হাঁ। আমাদের গলার নলিয়া দিয়ে এ কথা বেরুবে না।'

বাইরের মাঠের কাছে এসে 'সালাম' জানিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে হাসিনা। খলিল অর্জুনকুমারের সঙ্গে সিমার গাছের ছায়ায় যেখানে রোহিতরা অপেক্ষা করছেন সেদিকে হাঁটতে থাকে।

হাসিনাদের ঘরে যাবার সময় লক্ষ করেননি অর্জুনকুমার, এবার মন্দিরটা তাঁর চোখে পড়ে। এখান থেকে ওটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাঁচ সাতটি লোক মন্দিরটাকে ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করছে।

অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'ওটা কীসের মন্দির?'

খলিল জানায়, 'বিষুণজির।'

'অনেক দিনের পুরোনো মনে হচ্ছে।'

'হাঁ। আমার দাদার (ঠাকুরদা) মুখে শুনেছি লগভগ শও সাল আগে ওটা বানানো হয়েছিল।'

সেই পুরোনো প্রশ্নটা আবার অর্জুনকুমারের মাথায় ফিরে আসে। মুসলমানদের গাঁয়ের এত কাছে ওই মন্দিরটা কে তৈরি করল? অবশ্য এ নিয়ে তিনি কিছু জিজ্ঞেস করেন না। বলেন, 'মন্দিরটা সাফ টাফ করছে দেখছি।'

'হাঁ, ক'দিন পর হোলি। ওই সময় চারদিকের গাঁও থেকে লোকেরা ঢোলক বাজিয়ে গাইতে গাইতে মন্দিরে ফাগুয়া খেলতে আসবে। ওখানে ভারী মেলা বসবে। তাই সাফাই করছে।' খলিল হোলির সময় মন্দিরের চারপাশটা যে জমকালো উৎসবের চেহারা নেয়, হাজার হাজার মানুষের হইচইতে গমগম করে ওঠে, তার একটা ছবি অর্জুনকুমারের চোখের সামনে তুলে ধরতে থাকে।

অর্জুনকুমার দূরমনস্কর মতো অন্য কিছু ভাবছিলেন। মন্দিরে দু'দিক থেকে যাওয়া যায়। ডান পাশের গাঁগুলো থেকে যারা ফাগুয়া খেলতে আসবে তাদের সমস্যা নেই, ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে সোজা চলে যেতে পারবে। কিন্তু বাঁ দিকের গাঁগুলো থেকে মন্দিরে যেতে হলে সমশেরগঞ্জের ভেতর দিয়ে যাওয়া ছাড়া পথ নেই।

আজকাল দেশের আবহাওয়া ভীষণ গোলমেলে হয়ে উঠেছে। কাগজে প্রায়ই কমিউনাল রায়টের খবর বেরোয়। ফান্ডামেন্টালিস্টরা ভারতবর্ষের দু'টি বড় সম্প্রদায়কে ক্রমাগত উসকে যাচ্ছে। ফলে কারণে অকারণে দাঙ্গা লেগেই আছে। দেশভাগের চল্লিশ বছর বাদেও রোজই ধর্মের নামে অন্ধ বিদ্বেষে শুধুই হত্যা, রক্তক্ষয় আর হানাহানি।

উত্তর বিহারের গ্রামাঞ্চলে নির্লিপ্ত একজন দর্শক হিসেবে মানুষজন দেখতে এসেছেন অর্জুনকুমার।

তবু প্রশ্নটা করবেন কি করবেন না, ভাবতে ভাবতে দ্বিধান্বিতভাবে বাঁ দিকে আঙুল বাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত করেও ফেলেন, 'ওধারের গাঁগুলো থেকে হোলির সময় লোকেরা কীভাবে মন্দিরে যায়?'

আপাত সহজ প্রশ্নটার মধ্যে তীক্ষ্ণ যে ইঙ্গিতটা রয়েছে, খলিল তা বুঝতে পারে না। সরল মুখে সে বলে, 'কেন, আমাদের গাঁওয়ের ভেতর দিয়ে। কেউ কেউ দো-তিন 'মিল' ঘুরে জমিনের ওপর দিয়েও যায়।' একটু থেমে বলে, 'আমার বচপন থেকে দেখছি, হর সাল ওরা এভাবে যাচ্ছে।'

অর্জুনকুমার ভেতরে ভেতরে আরাম বোধ করেন। চাপা টেনশন হচ্ছিল তাঁর, সেটা কেটে যায়। আর যেখানেই হোক, ফান্ডামেন্টালিস্টরা এখানে এখনো বিষ ছড়াতে পারেনি।

সিমার গাছগুলোর তলায় এসে মজার গলায় অর্জুনকুমার বলেন, 'এই দেখুন, একেবারে অক্ষত দেহে ফিরে এসেছি।' একটু ভেবে গাঢ় আবেগের গলায় বলেন, 'খলিল আর হাস্‌নু বড় ভালো।'

রোহিত বলেন, 'অনেক দেরি করেছেন কিন্তু। আমাদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছিলেন।'

'কী করব, ওদের সঙ্গে গল্প করতে এত ভালো লাগছিল যে উঠতে পারছিলাম না।'

'যাক, এখন আমাদের প্রোগ্রাম কী? 'রাজপুত নিকেত'-এ ফিরে যাব তো?'

মুসলমানদের গাঁ আগে দেখা হয়নি। জনগণ নিয়ে ছবি করলে মুসলমানদের বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। সুখে-দুঃখে তারা আবহমান কাল পাশাপাশি বাস করে আসছে। তাঁর ছবিতে মুসলমানদের একটা বড় ভূমিকা রাখতেই হবে। কাজেই সমশেরগঞ্জের এত কাছাকাছি এসে ফিরে যাওয়া যায় না। খলিল এবং হাসিনার সঙ্গে আলাপ হলেও গাঁয়ের অন্য সব মানুষের সঙ্গে কথা বলা দরকার। অর্জুনকুমার বলেন, 'না। আগে খলিলদের গাঁ'টা দেখে যাই।'

ঘড়ি দেখে রোহিত বলেন, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে কিন্তু। এগারোটা দশ।'

'বেশিক্ষণ এখানে থাকব না।' বলে খলিলের দিকে ফেরেন অর্জুনকুমার, 'চল, তোমাদের গাঁওবালাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে।'

খলিল মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, 'আইয়ে—' বলে পা বাড়িয়ে দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যে অর্জুনকুমাররা খলিলের সঙ্গে গ্রামের ভেতর চলে আসেন।

আগে যে গ্রামগুলোতে তাঁরা গেছেন তার সঙ্গে সমশেরগঞ্জের আকৃতিগত তফাত নেই বললেই হয়। ভগ্নস্তূপের মতো বাড়িঘর যেখানে সেখানে কোনোরকমে কোমর খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে গরিবি আর ভুখের চিরস্থায়ী ছাপ। লোকজন যা চোখে পড়ছে তাদের বেশির ভাগই রুগ্‌ণ, কমজোর। তবে পোশাক টোশাক আলাদা। হিন্দু পুরুষদের পরনে ধুতি চোখে পড়েছে, মাথায় গামছা বা খাটো কাপড় জড়ানো। আর মেয়েদের পরনে শাড়ি। এখানে পুরুষরা পরছে পায়জামা বা লুঙ্গি, মাথায় কাপড়ের তেলচিটে সস্তা টুপি, মেয়েরা পরেছে সালোয়ার-কামিজ টামিজ। আগের গাঁগুলোতে কিছু গরু মোষ বকরি চোখে পড়েছে। এখানে পোষমানা এই প্রাণীগুলো তো রয়েছেই, তবে বেশি করে যা দেখা যায় তা হল মুরগি। গণ্ডা গণ্ডা মুরগি আর তাদের অজস্র ছানাপোনা মাটি থেকে পোকামাকড় খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

অর্জুনকুমারদের দেখে যে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে। সমশেরগঞ্জে পর্দার কড়াকড়ি নেই। নানা বয়সের মেয়েরা তাঁদের অবাক চোখে দেখতে থাকে।

অবিকল অন্য সব গাঁয়ের মতোই সমশেরগঞ্জের মাঝখানে গোটাকয়েক চারপায়া পাতা রয়েছে। সেই গ্রামীণ রেঁদেভু। সেখানে এসে খলিল হইচই বাধিয়ে ডাকতে থাকে, 'এ ওসমান চাচা, ও রহিম চাচা, এ বিলায়েত চাচা, এ রুস্তম ভেইয়া—জলদি জলদি আ যাও হিঁয়া, বহোত জলদি—'

ডাকাডাকিতে চারপাশ থেকে বয়স্ক কিছু লোক গাছতলায় চলে আসে। নানা বয়সের অন্য সব মেয়েপুরুষ এবং বাচ্চাকাচ্চা পায়ে পায়ে এগিয়ে অসে খানিকটা দূরে ভিড় করে দাঁড়ায়।

এ অঞ্চলে আসার পর অর্জুনকুমার একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন, প্রতি গাঁয়েই একজন করে মুরুব্বি গোছের বর্ষীয়ান লোক থাকে। বাকি সবাই তাকে মান্য করে, তার কথাই এদের কাছে শেষ

কথা। সমশেরগঞ্জের সেই মানুষটি হল বিলায়েত মিয়াঁ। বয়স আশির কাছাকাছি। শরীর ভেঙেচুরে তেউড়ে গেছে। মাথায় ধবধবে চুল, মুখে ধবধবে দাড়ি। তাকে ফকির দরবেশের মতো দেখায়।

অর্জুনকুমাররা বড়ে সরকার মুনেশ্বরজির সম্মানিত মেহমান এবং তাঁরা ভারী শহর থেকে গ্রাম দেখতে এসেছেন, এভাবে পরিচয় দিয়ে বিলায়েত মিয়াঁ এবং অন্য কয়েকজন বয়স্ক লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয় খলিল।

মুনেশ্বরের নাম শুনে সবাই তটস্থ হয়ে ওঠে। প্রচুর সালাম টালাম জানিয়ে বিলাযেত মিয়াঁ বলে, 'আপনারা মেহেরবানি করে আমাদের গাঁওয়ে এসেছেন। আমরা বহোত খুশনসিব।'

অর্জুনকুমার বিব্রতভাবে বলেন, 'এভাবে বলে আমাদের লজ্জা দেবেন না। আপনাদের কাছে যে আসতে পেরেছি, সেটা আমাদেরই সৌভাগ্য।'

বিলায়েতদের সঙ্গে কথা বলে নতুন খবর বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। আগেই জানা গিয়েছিল, সমশেরগঞ্জের লোকেরা মুনেশ্বর সিংয়ের জমিতে কাজ করে পেট চালায়। তাদের ভাগ্য এবং হিন্দু গাঁওবালাদের ভাগ্য হুবহু এক।

একসময় সবাইকে নমস্কার জানিয়ে অর্জুনকুমাররা বিদায় নেন। সমশেরগঞ্জের বাসিন্দারা তাঁদের মাঠ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যায়। খলিল তাঁদের গায়ের সঙ্গে প্রায় লেপটেই রয়েছে। ভিড়ের ভেতর চকিতে একবার হাসিনাকেও দেখতে পান অর্জুনকুমার।

এখন সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে। মাঠের ওপব দিয়ে 'রাজপুত নিকেত'-এর দিকে চলতে চলতে হঠাৎ দূরে চৌধারিকে দেখতে পান অর্জুনকুমাররা। তাঁদের দেখেই চৌধারি লম্বা লম্বা পা ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্যদিকে হাঁটতে হাঁটতে দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে।

সঞ্জীব অর্জুনকুমারকে বলেন, 'কী ব্যাপার, তুই না বলা সত্ত্বেও চৌধারি আমাদের পিছু নিয়েছে, মনে হয়। যেভাবে ও পালিয়ে গেল, সেটা খুব সাসপিসাস, তাই না?'

অর্জুনকুমার বলেন, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। দেখা যাক দু-একদিন।' তাঁর মন সংশয়ে ঘোলাটে হয়ে থাকে।

আট

দিন দুই কেটে যায়।

এর মধ্যে আরও কয়েকটা গ্রামে ঘুরেছেন অর্জুনকুমাররা। নতুন মেটিরিয়াল যেটুকু পাওয়া গেছে তা হল ছট পরব সম্পর্কে নানা খুঁটিনাটি তথ্য এবং তার আচার, আর এই পরবকে জড়িয়ে অজস্র গান। এ ছাড়া মানুষের জন্ম এবং মৃত্যুর পর কী কী নিয়ম কীভাবে পালন করতে হয়, সে সবও রোহিত তাঁর নোটবুকে টুকে নিয়েছেন। যে সব মেয়ে বা পুরুষের চেহারা আলাদাভাবে চোখে পড়ার মতো তাদের স্কেচও করে রেখেছেন তিনি।

এ ক'দিন অর্জুনকুমার গ্রামে যে ঘোরাঘুরি করলেন, কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। সেই পলিটিক্যাল পার্টির ছেলেদেরও আর দেখা যায়নি। আরেকটা ব্যাপার, যেখানে সিনেমাওলারা তাঁবু খাটাচ্ছে, সেদিকটা মাড়াননি তাঁরা।

গ্রামে আসা-যাওয়ার সময় হঠাৎ হঠাৎ দূরে চৌধারিকে বারকয়েক দেখতে পেয়েছেন অর্জুনকুমাররা। টের পেয়েছেন লোকটা লেজুড়ের মতো তাঁদের সঙ্গে জুড়ে আছে। চৌধারি কেন তাঁদের ওপর নজরদারি করছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। তাঁদের নিরাপত্তার কারণেই কী?

এ ক'দিন টাটকা খবরের কাগজের মুখ দেখেননি তাঁরা। ইচ্ছা করেই ট্রানজিস্টর সঙ্গে আনেননি। এখানে টি ভি'ও নেই। গোটা সিভিলাইজেশন থেকে বহু দূরে এক স্বপ্নচেনা গ্রহে যেন চলে এসেছেন তাঁরা।

তবে পাটনা থেকে মুনেশ্বর সিং কাল একজনকে দিয়ে একটা চিঠি আর ক'দিনের বাসি খবরের কাগজ পাঠিয়েছেন। চিঠিটায় নতুন করে ক্ষমা চেয়ে লিখেছেন, ডাক্তারদের হুকুমে আরও কিছুদিন তাঁকে নার্সিং হোমে কয়েদি হয়ে থাকতে হবে। ছাড়া পেয়েই ধরমপুরায় চলে আসবেন। পুরোনো খবরের কাগজ পাঠানোর যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্রথম পাতায় বড় টাইপের হেডিং আর অর্জুনকুমারের ছবি দিয়ে একটা চাঞ্চল্যকর খবর ছাপা হয়েছে। ইন্ডিয়ান সিনেমার মেগা স্টারকে পাওয়া যাচ্ছে না। পাঁচদিন আগে বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে তাঁকে ওয়েস্টার্ন রেলের লোকেরা শেষ দেখেছিল। তারপর থেকে তিনি নিখোঁজ। রেডিও, টিভি এবং খবরের কাগজ, অর্থাৎ মিডিয়ার লোকেরা হন্যে হয়ে তাঁর খোঁজে চারিদিকে ছোটাছুটি করছে কিন্তু তাঁর হদিস মেলেনি। আরও জানা গেছে, অর্জুনকুমার যেদিন অদৃশ্য হন সেদিন থেকে হিন্দি সিনেমার বিখ্যাত গল্প লেখক এবং চিত্রনাট্যকার রোহিত পাণ্ডে, অর্জুনকুমারের সেক্রেটারি সঞ্জীব কাউল আর ফাইট মাস্টার ফারুক কায়সারকেও পাওয়া যাচ্ছে না। এই চারজনের বাড়িতে বহুবার যোগাযোগ করেও কোনো কাজ হয়নি। এঁদের স্ত্রী এবং পরিবারের লোকজন মুখ একেবারে বন্ধ করে রেখেছেন। অর্জুনকুমারদের সম্পর্কে কিছু জানাতে তাঁরা নারাজ।

অনুমান করা হচ্ছে, অর্জুনকুমাররা চারজন বিশেষ উদ্দেশ্যে কোনো অজানা, দুর্গম অঞ্চলে অজ্ঞাতবাস করছেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত এর কারণ জানার উপায় নেই। মিডিয়ার লোকেরা উদভ্রান্তের মতো এঁদের সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে।

যে তারিখে খবরটা বেরিয়েছিল তারপর দিনকয়েক পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি তো বটেই, সারা দেশ নিশ্চয়ই তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে।

উত্তর বিহারের এই গ্রামাঞ্চলে বসে সারা দেশের প্রতিক্রিয়া খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছেন অর্জুনকুমার। তাঁর খবর জানার জন্য রেডিও, টিভি, পুলিশ বা খবরের কাগজের অফিসে অনবরত ফোন আসছে।

অর্জুনকুমার জানেন, যেভাবে তাঁর খোঁজ চলছে, হয়তো একদিন ধরা পড়ে যাবেন, তবু যতদিন নিজেকে আড়ালে রেখে যত তাড়াতাড়ি এখানকার কাজ শেষ করে ফেলা যায়। মনে মনে স্থিরই করে ফেলেছেন, এখান থেকে বোম্বাই ফিরে প্রেস কনফারেন্স করে অজ্ঞাতবাসের কারণ জানিয়ে দেবেন।

এখানে এসে সময় যে তাঁর খুব একটা খারাপ কাটছে তা নয়। এভাবে নিজের আইডেনটিটি গোপন রেখে লোকজনের সঙ্গে মেশার মধ্যে মজা আছে। তা ছাড়া নানা মানুষের কথা বলা, হাঁটা, তাকানো ইত্যাদি খুঁটিয়ে লক্ষ করছেন। এখানকার অভিজ্ঞতা নতুন ছবিতে কীভাবে কাজে লাগাবেন তাই নিয়ে নিজে তো ভাবছেনই, রোহিতদের সঙ্গেও আলোচনা করছেন।

দিনের বেলাটা ঘোরাঘুরি আর নতুন ছবির ছক তৈরি করে কেটে যায়। কিন্তু রাত্তিরে সিডেটিভ নেবার পরও বেশ কিছুক্ষণ ঘুম আসে না। সেই সময়টা ভীষণ একা লাগে। বার বার স্ত্রী রাধিকা এবং দুই ছেলেমেয়ে বিবেক আর বনিতার মুখ চোখের সামনে অদৃশ্য কোনো টিভি পর্দায় ফুটে ওঠে। তখন খুব খারাপ লাগে তাঁর। ফিল্মি দুনিয়ার মেগা স্টার হলেও অর্জুনকুমারের মধ্যে একটি গৃহকোণলোভী সংসারী মানুষ রয়েছে যে চোখ-ধাঁধানো গ্ল্যামারের বাইরে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য স্ত্রী আর সন্তানদের কাছে আশ্রয় পেতে চায়।

আজ সকালে ব্রেকফাস্টের পর জগনাথ ল্যান্ডোতে করে অর্জুনকুমারদের টিলার নিচে নামিয়ে দিয়ে আসেন।

অর্জুনকুমার সেই যে 'না' বলে দিয়েছিলেন তারপর থেকে চৌধারি আর এখানে অপেক্ষা করে না। নিশ্চয়ই দূরে মাঠেঘাটে কোথাও তাঁদের জন্য ওত পেতে থাকে। তাঁরা বেরুলেই আড়ালে আড়ালে থেকে পিছু নেয়।

অন্যদিনের মতো কাচ্চীতে নেমে অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'আজ কোন দিকে যাওয়া যায়?'

পশ্চিম দিকটা তাঁদের কাছে একেবারেই নিষিদ্ধ, কেননা ওখানে সিনেমার তাঁবু খাটানো হচ্ছে।

রোহিত বলেন, 'উত্তর দিকের গাঁগুলোতে যাওয়া হয়নি। চলুন ওখানে যাওয়া যাক।'

কিন্তু উত্তরে যাওয়া হয় না। একটা খয়াটে চেহারার রোগাপটকা গেঁয়ো ছোকরা দৌড়তে দৌড়তে অর্জুনকুমারদের কাছে এসে পড়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করে, 'আপলোগন জরুর বড়ে সরকারকা মেহমান হোগা।'

বেশ অবাকই হন অর্জুনকুমার। বলেন, 'কী করে বুঝলে?'

ছোকরা জানায়, বহেনজি তাকে বলে দিয়েছেন, চারজন বহোত ভালো চেহারার 'টৌনে'র লোককে একসঙ্গে দেখলে বুঝতে হবে তাঁরা মুনেশ্বরজির অতিথি।

ছোকরা যে যথেষ্ট চালাকচতুর, টের পাওয়া যাচ্ছিল। অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'আমরা শহরের লোক, কী করে টের পেলে?'

ছেলেটা বলে, গাঁওবালা আর টৌনবালাদের মধ্যে অনেক তফাত। টৌনবালাদের চালচলন, কথাবার্তার ঢং, পোশাক—কোনো কিছুই গাঁওবালাদের সঙ্গে মেলে না।

গ্রামের ছেলে হলেও তার অবজারভেশন বেশ ভালো। অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'বহেনজির কথা বলছিলে। তিনি কে?'

'মিশরজির বিটিয়া।'

'রেণুকাজির কথা বলছ?'

'হাঁ হুজৌর।'

গভীর আগ্রহে অর্জুনকুমার বলেন, 'তিনি কি আমাদের কাছে তোমাকে পাঠিয়েছেন?'

'হাঁ।' ছোকরা মাথাটা ডান দিকে অনেকখানি হেলিয়ে দেয়, 'বহেনজি আপনাদের সিধা বারহৌলি গাঁওয়ে চলে যেতে বলেছেন।'

বারহৌলি নামটা খুবই চেনা চেনা। কোথায় শুনেছেন, ভাবতে গিয়ে লোকাল ট্রেনের সেই দেহাতিদের কথা মনে পড়ে য়ায় অর্জুনকুমারের। তাদের গাঁয়ের নামই বারহৌলি। জিজ্ঞেস করেন, 'বারহৌলিতে যেতে বলেছেন কেন, তুমি জানো?'

'নেহী। তুরন্ত চলা যাইয়ে।'

'রেণুকাজি বারহৌলি গাঁয়ে আছেন?'

'নেহী; বহেনজি আপনা কোঠিমে হ্যায়।'

রেণুকা নিজেদের বাড়িতে থেকে কেন তাঁদের বারহৌলিতে যেতে বলেছেন, কে জানে! অর্জুনকুমারের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা জট পাকিয়ে যায়। তিনি বলেন, 'বেণুকাজি কি বারহৌলি গাঁয়ে যাবেন?'

'ছোকরা বলে, 'কা জানে? অব্ তুবন্ত চলা যাইয়ে।'

একটু চিন্তা করে অর্জুনকুমার বলেন, 'তুমি আমাদের সঙ্গে চল। আমরা এখানকার রাস্তাঘাট কিছুই চিনি না।'

'আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারব না। আমাকে এখন বালুয়াকে খুঁজে বার করে বহেনজির কাছে নিয়ে যেতে হবে।'

'কোন বালুয়া? ওই নাটুয়া?'

'হাঁ।' বলে ডান ধারের মাঠের দিকে পা বাড়িয়ে দেয় ছোকরা।

অর্জুনকুমার ব্যস্তভাবে বলেন, 'আরে যেয়ো না। বাহহৌলি গাঁ'টা কোন দিকে, সেটা অন্তত বলে দিয়ে যাও।'

দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আঙুল বাড়িয়ে ছোকরা বলে, 'জমিনের ওপর দিয়ে সিধা ওইদিকে চলে যান।' বলেই দৌড় লাগায়।

পেছন থেকে অর্জুনকুমার গলার স্বর সামান্য উঁচুতে তুলে বলেন, 'তোমার নামটাই তো জানালে না।'

ছুটতে ছুটতে ছোকরা চেঁচিয়ে জবাব দেয়, 'লচ্ছু হুজৌর—'

লচ্ছু অনেকটা দূরে চলে যাবার পর সঞ্জীব জিজ্ঞেস করেন, 'সত্যিই কি তুই বারহৌলি যাবি?'

অর্জুনকুমার বলেন, 'হ্যাঁ। নইলে ডিরেকশনটা জেনে নিলাম কেন?'

'কিন্তু জায়গাটা কত দূরে কে জানে।'

অর্জুনকুমারের মনে হচ্ছিল, রেণুকা যখন যেতে বলেছেন নিশ্চয়ই জরুরি কোনো ব্যাপার আছে তিনি বলেন, 'যত দূরে হোক, যেতে হবে।'

মাঠ পেরিয়ে, দু-একটা লোকের কাছে পথের হদিস জেনে নিয়ে অর্জুনকুমাররা যখন বারহৌলি গাঁয়ে পৌঁছন, বেশ খানিকটা বেলা হয়েছে। কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদের তেজ চড়তে শুরু করেছে।

দূর থেকে হল্লার মতো একটা আওয়াজ ভেসে আসছিল। কাছাকাছি আসতে বোঝা যায়, গাঁয়ের নানা দিক থেকে বহু মেয়েমানুষ বেপরোয়া ঢোল পিটিয়ে সুরে এবং বেসুরে বেখাপ্পা শব্দ করে গান গাইছে। প্রথমটা অর্জুনকুমার ভেবেছিলেন হোলির গান। কিন্তু ভালো করে শোনার পর বুঝতে পারেন সুরটা অন্য ধরনের, গানের কথা যদিও ঠিক ধরা যাচ্ছে না।

গাঁয়ের ভেতর ঢুকবেন কি ঢুকবেন না, অর্জুনকুমাররা যখন ভাবছেন, সেই সময় একটা আধবুড়ো লোক কোত্থেকে যেন এগিয়ে এসে বলে, 'হুজৌর আপলোগন হিঁয়া!' তার চোখেমুখে এবং গলার স্বরে বিস্ময়। সে অর্জুনকুমারদের চিনতে পেরেছে।

লোকাল ট্রেনের কামরায় লোকটাকে দেহাতিদের ভিড়ে দেখেছেন বলে মনে হয় অর্জুনকুমারের। যাক, একে পেয়ে গ্রামে ঢোকাটা অনেক সহজ হয়ে গেল। বলেন, 'তোমাদের গাঁ দেখতে এলাম।'

সসম্ভ্রমে লোকটা বলে, 'আইয়ে সরকার।' অর্জুনকুমারদের সঙ্গে নিয়ে ভেতরে এসে সে চিৎকার করে ডাকতে থাকে, 'শিউনাথ ভেইয়া, এ শিউনাথ ভেইয়া—'

এর আগে যে গ্রামগুলো অর্জুনকুমাররা দেখেছেন বারহৌলি তেমনই ছিরিছাঁদহীন। যেখানে সেখানে যেমন খুশি গাদাগাদি করে ঘর তোলা হয়েছে। তবে অন্য সব গ্রামের মতো সেগুলো ধ্বংসস্তূপ নয়। এখানে প্রতিটি ঘরের মাথায় ঝকঝকে নতুন টিনের বা টালির চাল। লোকজনও রোগা, খয়াটে আর মরকুটে নয়। প্রায় সবারই স্বাস্থ্যটাস্থ্য মোটামুটি ভালো। বোঝাই যায়, এরা দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায়।

অর্জুনকুমারের মনে পড়ে, এ গাঁয়ের লোকজন লোকাল ট্রেনে আসার সময় জানিয়েছিল, হারবার্টগঞ্জে ঠিকাদারের কাছে কাজ করে। নিশ্চয়ই নিয়মিত মজুরি পায় তারা, অন্য গাঁয়ের বাসিন্দাদের মতো তাদের খাওয়া-পরার সমস্যা তেমন নেই।

লোকটার সঙ্গে যেতে যেতে টের পাওয়া যায় গোটা বারহৌলি গাঁ জুড়ে প্রচণ্ড ব্যস্ততা চলছে। বুড়োবুড়ি থেকে বাচ্চাকাচ্চা, কেউ আর স্থির হয়ে বসে নেই, চারিদিকে ছোটাছুটি করছে। আর যা বেশি করে চোখে পড়ছে তা এইরকম। খানিকটা পর পরই মাথার ওপর মোটা কাপড়ের ছাউনি দিয়ে তার তলায় চট পেতে কিশোরী যুবতী এবং প্রৌঢ়ারা থোকায় থোকায় ঢোলক নিয়ে বসেছে! দূর থেকে এদেরই গানের সঙ্গে ঢোল পেটানোর আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন অর্জুনকুমাররা।

শুধু গানবাজনাই নয়, বহু বাড়ির দেওয়ালে সিঁদুর চন্দন আর হলুদের মাঙ্গলিক চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। সমস্ত গ্রামটায় যেন উৎসবের সাজ।

অন্য গাঁয়ের বাসিন্দাদের মতোই বারহৌলিবাসীরা অবাক চোখে অর্জুনকুমারদের লক্ষ করতে থাকে। তবে মেয়েরা গান একেবারে থামায় না, গলাটা অনেকখানি নামিয়ে দেয় শুধু।

আধবুড়ো লোকটা সমানে ডাকাডাকি করছিল। শেষ পর্যন্ত একটা ঘর থেকে ঢাউস পাগড়ি মাথায় শিউনাথ বেরিয়ে আসে। দেখামাত্র চিনে ফেলেন অর্জুনকুমার; লোকাল ট্রেনে এই লোকটাই ছিল দেহাতিদের মুরুব্বি।

শিউনাথও তাঁদের চিনে ফেলেছে। হাতজোড় করে শশব্যস্তে বলে, 'নমস্তে, নমস্তে। আইয়ে, বৈঠিয়ে—' তার ঘরের সামনে একটা গানবাজনার আসর বসেছে। লোকজন ডেকে, হইচই বাধিয়ে

আসরটার পাশে কাপড়ের একটা চাঁদোয়া খাটিয়ে ফেলে শিউনাথ, তারপর কোত্থেকে খানচারেক হাতল-ভাঙা নড়বড়ে চেয়ার জুটিয়ে এনে অর্জুনকুমারদের বসিয়ে বলে, 'আপনাদের মতো বড়ে আদমি কোনোদিন এই গাঁওয়ে আসবেন, ভাবতে পারিনি হুজৌর।'

এই কথাটা এর আগে অর্জুনকুমার কতবার শুনেছেন তার হিসেব নেই। তিনি সামান্য হাসেন শুধু।

শিউনাথ বলে, 'আপনারা এখানে কোথায় উঠেছেন?'

এই প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না অর্জুনকুমার। ভেতরে ভেতরে কিছুটা থতিয়ে যান। একটু চিন্তা করে বলেন, 'মুনেশ্বরজির কোঠিতে উঠেছি।'

শিউনাথ বলে, 'টিরেনে যে বলেছিলেন মুনেশ্বরজির সঙ্গে আপনাদের তেমন জান-পয়চান নেই।'

লোকটার স্মৃতিশক্তি এতটা প্রখর না হলেই ভালো হত। তার প্রশ্নটা খুবই স্পষ্ট। যাঁর সঙ্গে যৎসামান্য পরিচয়, তাঁর কোঠিতে তাঁরা উঠলেন কী করে?' অর্জুনকুমার বলেন, 'আলাপ হবার পর বলেছিলাম, আমরা এখানে এসে দিনকয়েক থাকতে চাই। মুনেশ্বরজি দয়া করে থাকতে দিয়েছেন।'

শিউনাথ এ ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন করে না। শুধু বলে, 'বড়ে শুভ্দিনে আপনারা এসেছেন হুজৌর। কিরপা করে ছৌরা ছৌরীগুলোকে আশীর্বাদ করে যাবেন।'

অর্জুনকুমার উৎসুক মুখে জানতে চান, 'কীসের শুভ্দিন, কীসের আশীর্বাদ শিউনাথজি?'

'আপনাকে সেদিন শাদির কথা বলেছিলাম না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বাচ্চাদের শাদি হবে বলেছিলেন।'

'আজ আমার দামাদের তিলক।' শিউনাথ জানায় কিছুক্ষণ পর জামাইয়ের বাড়ি এখান থেকে উপহারের জিনিসপত্র যাবে। তার তিন দিন বাদে শাদি।

বিদ্যুৎচমকের মতো রেণুকার মুখটা মনে পড়ে যায় অর্জুনকুমারের। তিনি কথা দিয়েছিলেন, চাইল্ড ম্যারেজ বা শিশু বিবাহের বিরুদ্ধে যেদিন গাঁয়ে গাঁয়ে আন্দোলন করতে যাবেন সেদিন অর্জুনকুমারও তাঁর সঙ্গে থাকবেন। সেই জন্যই হয়ত লচ্ছুকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে এখানে আসতে বলেছেন। কিন্তু আন্দোলনে যিনি নেতৃত্ব দেবেন তাঁরই তো দেখা নেই। তিনি কি আসবেন না? অর্জুনকুমারের মনে সামান্য সংশয় উঁকি দিয়েই মিলিয়ে যায়। নিশ্চয়ই রেণুকা আসবেন এবং খুব তাড়াতাড়িই এসে পড়বেন।

অর্জুনকুমার বলেন, 'অনেক জায়গায় গানবাজনা হচ্ছে। ঘরে ঘরে চন্দন সিঁদুর-টিঁদুরের চিহ্ন দেখলাম। ওই সব জায়গায় কী হচ্ছে?'

শিউনাথ বুঝিয়ে দেয়, এ গাঁয়ের বহু বাড়িতেই বিয়ের আয়োজন চলছে। আজ কোথাও হবে তিলক, কোথাও উবটান (গায়ে হলুদ), কোথাও সগুন দেনা (শাদির কথা বার্তা পাকা করা) ইত্যাদি। আসল শাদিটা হবে দিনকয়েক বাদে। অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'কতগুলো শাদি হচ্ছে এ-বছর?'

ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করে শিউনাথ। তারপর বলে, 'হোগা তিশ চাল্লিশগো।'

'এই ত্রিশ-চল্লিশজনের সবাই কম বয়সের বাচ্চা?'

একমুখ হাসে শিউনাথ। বলে, 'হুজৌর আমাদের লেড়কা লেড়কীদের উমর দশ সাল পার হবার আগেই শাদি হয়ে যায়।' বলে পাশের গানবাজনার আসরটার দিকে ফিরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'কা রে, তোদের গলার আওয়াজ এত্তে কমজোর হয়ে গেল কেন? জোরসে গা—'

ঢোলকের চড়া আওয়াজ এবং গানের নামে গলা-ফাটানো চেঁচানিতে বারহৌলি গাঁ ফের সরগরম হয়ে উঠতে থাকে।

অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'এরা কীসের গান গাইছে শিউনাথজি?'

'শাদির গীত।'

রোহিত এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। এবার বলেন, 'শিউনাথজি, যারা গাইছে তাদের কাউকে ডাকুন, গানটা লিখে নেব।' তাঁর মাথায় নতুন ছবির চিন্তাটা রয়েছে। একটা বিয়ে যদি তাতে লাগানো যায়, এই গানটা দরকার হবে।

জিভ কেটে, কানে হাত দিয়ে, সঙ্কোচে প্রায় কুঁকড়ে গিয়ে শিউনাথ বলে, 'এ সব দেহাতি আনপড়দের গীত, আপনাদের মতো লিখিপড়ী বড়ে আদমিদের ভালো লাগবে না।'

'লাগবে লাগবে, ডাকুন কাউকে।'

একান্ত নিরুপায় হয়েই একটি কিশোরীকে ডাকে শিউনাথ। সে জড়সড় হয়ে কাছে এসে দাঁড়ায়। শিউনাথ তাকে বলে, 'যা গাইছিলি হুজৌরদের কাছে বল।'

মেয়েটা মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে গানের পদগুলি বলে যায়।

'তিত্তির হৌলে হৌলে বোল
তিত্তির ধীরে ধীরে বোল
সমধী ভেড়োয়া, বহীন বেচাইছে
কোঈ নাই লৈ ছৈ মোল
        তিত্তির হৌলে হৌলে বোল
বেটিকা ফুফা, কমর কসাইছে
হামি লেবাই মোল
ছিনারিয়াকে হামি লেবাই মোল
        তিত্তির হৌলে হৌলে বোল—'

পুরো গানের কথাগুলো বলা হয়ে গেলে মেয়েটা দৌড়ে আসরে ফিরে যায়। রোহিতের লেখা হয়ে গিয়েছিল, তিনি নোটবই বন্ধ করেন।

শিউনাথ মাথা নামিয়ে বিব্রতভাবে জানায়, এই গানটা ঠিক এখন গাওয়া হয় না, বিয়ের দিন ছেলের পক্ষের বরাতীরা এসে যখন খেতে বসবে তখন পাত্রীর বাড়ির মেয়েরা গাইবে। এখনই তার তালিম দিয়ে রাখা হচ্ছে। তবে বড়ী শরমকি বাত, গানটার মধ্যে অনেক অশ্লীল কথা আছে, সেগুলো হুজৌরদের কাছে বলতে হল।

গানের কথাগুলোর মধ্যে দারুণ একটা ঝঙ্কার আছে। অর্জুনকুমার ভাবেন, এটাকে পরের ছবিতে ব্যবহার করতে হবে। বলেন, 'লজ্জার কিছু নেই। গান গানই।'

এই সময় একটি অল্পবয়সী বউ—তার কপালে এবং সিঁথিতে মেটে সিঁদুর, হাতে চাঁদির কাংনা, কানে ঝুটো পাথর-বসানো করণ ফুল—এসে শিউনাথকে বলে, 'চাচা, দুলহার ঘরে শাদির জিনিস পাঠাতে হবে। চাচী তোমাকে ডাকছে।'

'ঠিক হ্যায়। তুই যা, আমি আসছি।'

'তুরন্ত আওগে—' বলে মেয়েটি চলে যায়।

শিউনাথ হাতজোড় করে অর্জুনকুমারদের জানায়, দুলহার বাড়ি বিয়ের উপহার পাঠাবার আগে কিছু অনুষ্ঠান আছে। হুজৌরদের হুকুম হলে সে কাজটা সেরে আসতে পারে। তবে এর মধ্যে হুজৌররা যেন চলে না যান। এখানে যখন এসেই পড়েছেন, দুলহনকে আশীর্বাদ করে যেতেই হবে।

যতক্ষণ না রেণুকা আসছেন, অর্জুনকুমারদের এই গাঁয়ে থাকতে হবে। রোহিত বলেন, 'আমরা আছি। আপনি কাজ সেরে আসুন।' পরক্ষণে ভাবেন, অনুষ্ঠানটা ছবির কারণে ডিটেলে জানা দরকার। বলেন, 'আপনারা কীভাবে দুলহার বাড়িতে শাদির জিনিস পাঠান, আমরা দেখতে চাই।'

রোহিতদের মতো 'সরগনা আদমি'রা তাদের মতো নগণ্য দেহাতিদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী, এতেই বিগলিত হয়ে যায় শিউনাথ। কৃতার্থ ভঙ্গিতে বলে, 'জরুর সরকার। আপনারা এখানে বসেই সব দেখতে পাবেন।' দশ হাত দূরে তার নিজের ঘরের দাওয়াটা দেখিয়ে সে জানায়, অনুষ্ঠানটা ওখানে হবে, কাজেই দেখতে অসুবিধা হবে না।

শিউনাথ চলে যাবার পর ঘড়ি দেখে অর্জুনকুমার বলেন, 'সাড়ে ন'টা বাজতে চলল, এখনো তো রেণুকাজি এলেন না?' ভেতরে ভেতরে তিনি কিছুটা অস্থিরতা বোধ করতে থাকেন।

একটু চুপচাপ।

তারপর অর্জুনকুমার সঞ্জীবকে বলেন, 'সঞ্জু, তুই ফারুকভাইকে নিয়ে গাঁ'টা ঘুরে দ্যাখ। চারদিকে পাল্লা দিয়ে বিয়ের গান চলছে। আমরা যা পেয়েছি তার থেকে বেটার গান-টান পেলে টেপ করে নিবি। আর যত পারিস ছবি তুলবি।'

সঞ্জীব বলেন, 'গাঁয়ের কাউকে সঙ্গে না নিয়ে ছবি-টবি তুলতে গেলে লোকজন ঝামেলা করবে না তো?'

অর্জুনকুমার বলেন, 'আরে না না। সবাই দেখেছে শিউনাথ আমাদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলেছে। খোদ মুরুব্বি যখন এতটা খাতির করেছে তখন অন্যেরা তার দশ গুণ করবে। যা।'

ফারুক এবং সঞ্জীব ক্যামেরা ট্যামেরা নিয়ে গাঁয়ের আরেকটু ভেতর দিকে চলে যান।

অর্জুনকুমার এবার রোহিতকে বলেন, 'বাচ্চাদের এই গণবিবাহটা দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। একটা সিচুয়েশন তৈরি করে গানের আসর-টাসরসুদ্ধ সবটা ছবিতে ধরতে পারলে দুর্দান্ত ভিসুয়াল এফেক্ট হবে। তাই না?'

রোহিত বলেন, 'নিশ্চয়ই।'

সামনের দিকে হঠাৎ হইচই শুরু হয়ে যাওয়ায় মুখ ফিরিয়ে তাকান অর্জুনকুমাররা। একটি বছর সাত-আটেকের মেয়েকে কয়েকটি যুবতী এবং প্রৌঢ়া শিউনাথের ঘরের ভেতর থেকে ধরে ধরে বাইরের বারান্দায় এনে রং-করা কাঠের আসনে বসায়। মেয়েটির পরনে কাচ-বসানো চড়া রংয়ের শাড়ি এবং জামা। লালচে চুলে জবজবে করে এতটাই তেল মাখানো হয়েছে যে গাল আর কপাল বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। চোখে ধ্যাবড়া করে কাজল টানা। তার সারা মুখে, হাতে এবং শরীরের অন্য সব খোলা জায়গায় প্রচুর হলদে ছোপ। বোঝাই যায়, হলুদ মাখিয়ে তাকে স্নান করানো হয়েছে।

এর মধ্যে একটি প্রৌঢ়া ঝকঝকে পেতলের থালায় হলুদ-মাখা আতপ চাল, দূর্বা ইত্যাদি সাজিয়ে এনে মেয়েটি সামনে রাখে। কয়েকটি যুবতী বউ কলাপাতায় করে নিয়ে আসে নানারকম মিষ্টি, ছোট ধুতি, রঙিন জামা, জুতো, পাঁচ রকমের ফল, এমনি অনেক জিনিস। এগুলোও মেয়ের সামনে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা হয়।

এদিকে যারা চাঁদোয়ার তলায় আসর বসিয়েছিল, দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে বিয়ের কনেকে ঘিরে দাঁড়ায়।

শিউনাথ বারান্দার একধারে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠানটা তদারক করছিল। এবার সে অর্জুনকুমারদের কাছে চলে আসে। বলে, 'হুজৌর, এখন চুমানা শুরু হবে।'

'চুমানা কী?' রোহিত জানতে চান।

'আশীর্বাদ। আপনারা কিরপা করে যদি আমার মেয়ে সাজিয়াকে চুমানা করতে আসেন—' এই পর্যন্ত বলে থেমে যায় শিউনাথ।

অর্জুনকুমার পাশে বসে অনুষ্ঠানটা লক্ষ করছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যায়, চাইল্ড ম্যারেজে একেবারেই সায় নেই রেণুকার। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতেই তিনি যে কোনো মুহূর্তে এখানে চলে আসবেন। এসে যদি দেখেন, অর্জুনকুমার সাত-আট বছরের বিয়ের কনেকে আশীর্বাদ করছেন, সেটা খুব অস্বস্তিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। শিউনাথও দুঃখ না পায়, আর হঠাৎ দেখে ফেলে রেণুকাও অসন্তুষ্ট না হন—এই দু'দিক মাথায় রেখে অর্জুনকুমার বলেন, 'ওই মেয়েদের ভিড়ে যাব না। এখান থেকেই মনে মনে আশীর্বাদ করছি।' পকেট থেকে এক শ টাকার একটা নোট বার করে শিউনাথের হাতে দিয়ে বলতে থাকেন, 'এটা আপনার মেয়েকে দেবেন।'

শিউনাথ এতেই কৃতার্থ হয়ে যায়। সে বারান্দায় গিয়ে চুমানা করার জন্য আর পীড়াপীড়ি করেন না। বলে, 'ঠিক হ্যায় সরকার, আপনাদের তখলিফ করে যেতে হবে না।'

ওদিকে চুমানা শুরু হয়ে যায়। একটা থুনথুনে বুড়ি এসে পেতলের থালা থেকে হলুদ-মাখা আতপ চাল, ধান এবং দূর্বা তুলে নিয়ে সাজিয়ার হাঁটুতে এবং মাথায় ঠেকিয়ে পাশে ফেলে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে যে মেয়েমানুষগুলো সাজিয়াকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল, গেয়ে ওঠে :

সোনাকে ডালিয়ামে লালে লাল ধান হে
চুমানে বাহার ভেলি দাদী আপন হে
যেতে চুমাইহ দাদী
ওতে আশিস হে
জিয়াথিন দুলহা দুলহিন
লাখো বরিষ হে।

বুড়ির পর একে একে আরও অনেকে সাজিয়াকে আশীর্বাদ করতে থাকে। সেই সঙ্গে একটানা বিরামহীন গানও চলে।

শুনে শুনে গানটা নোট বুকে টুকে নেন রোহিত।

পাশে দাঁড়িয়ে উসখুস করছিল শিউনাথ। তারও চুমানা করতে হবে।

শিউনাথকে লক্ষ করছিলেন অর্জুনকুমার। বলেন, 'আমাদের কাছে আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। আপনি মেয়ের কাছে যান।'

ছাড়া পেয়ে খুবই খুশি হয় শিউনাথ। কৃতজ্ঞ সুরে বলে, 'দশ মিনটের (মিনিটের) ভেতর ফিরে আসছি।'

'তাড়াহুড়ো করতে হবে না। কাজ শেষ হলে আসবেন।'

শিউনাথ চলে যাচ্ছিল, রোহিত সাজিয়ার সামনে কলাপাতায় সাজানো ধুতি জামাটামা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'ওগুলো তো ছেলেদের পোশাক। মেয়ের চুমানার সময় এ সব দিয়ে কী হবে?'

শিউনাথ জানায়, ওগুলো দুলহার বা বরের সাজ। চুমানা অনুষ্ঠানের পর এই নতুন জামাকাপড় দুলহনকে দিয়ে ছুঁইয়ে ছেলের বাড়ি পাঠানো হবে।

তার কথা শেষ হতে না হতেই দূরে তুমুল চেঁচামেচি শোনা যায়। বাঁ দিক থেকে অনেকগুলো লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে শিউনাথের কাছে চলে আসে। তাদের চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ।

শিউনাথ জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে?'

'বহেনজি আয়ী হ্যায় শিউচাচা।' লোকগুলো সমস্বরে বলে ওঠে।

যারা খবর নিয়ে এসেছে তাদের উৎকণ্ঠা মুহূর্তে শিউনাথের ভেতর চারিয়ে যায়। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'বহেনজি কোথায়?'

লোকগুলো জানায়, যাদের যাদের বাড়িতে শাদির আয়োজন চলছে তাদের তাদের সঙ্গে কথা বলছেন বহেনজি।

'সঙ্গে কে আছে?'

'নাটুয়া ছৌরা বালুয়া।'

'আর কেউ আসেনি?'

'নেহী।'

শিউনাথদের কথাবার্তা থেকে অর্জুনকুমার এবং রোহিত বুঝতে পারেন এদের বহেনজি অর্থাৎ রেণুকা বালুয়াকে নিয়ে এসে পড়েছেন। মেরুদণ্ডের ভেতর এক ধরনের উত্তেজনা বোধ করেন তাঁরা। নিজেদের অজান্তে দু'জনে উঠে দাঁড়ান।

একটা লোক ভয়ে ভয়ে চাপা গলায় শিউনাথকে জিজ্ঞেস করে, 'বহেনজি লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কম উমরের ছৌরাছৌরীদের যেন আমরা শাদি না দিই। এখন কী হবে?'

বোঝা যাচ্ছে শিশু-বিবাহ বন্ধের জন্য আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন রেণুকা কিন্তু বারহৌলিবাসীরা সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি। তারা ভেবেছিল এটা শুধু কথার কথা। কিন্তু সত্যিই রেণুকা যে এখানে চলে আসবেন, তা ছিল একেবারেই অকল্পনীয়। ফলে গাঁয়ের লোকেরা বেশ ঘাবড়েই গেছে। রেণুকা প্রবল শক্তিমান জগনাথ মিশ্রের মেয়ে, তাদের ভীতির কারণ হয়তো এটাই।

শিউনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কী মনে হল, বহেনজির গুস্‌সা হয়েছে?'

লোকটা বলে, 'বুঝতে পারছি না। বহেনজিকে দেখেই তোমার কাছে দৌড়ে এলাম।'

শিউনাথ আর কোনো প্রশ্ন করে না। তাকে বেশ উৎকণ্ঠিত দেখায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে বালুয়াকে সঙ্গে করে রেণুকা শিউনাথদের কাছে চলে আসেন। অর্জুনকুমারকে দেখে সামান্য হাসেন। জিজ্ঞেস করেন, 'খবর পেয়েছি আপনারা এসে গেছেন। অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি তো?'

অর্জুনকুমার বলেন, 'না তেমন কিছু না। এই ঘণ্টাখানেক।'

রেণুকার আসার খবর পেয়ে গোটা গ্রামটায় চাপা উদ্বেগ এবং অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়েছিল। চারিদিকে যে গানবাজনা চলছিল, সব থেমে গেছে।

শিউনাথের ঘরের বারান্দায় যেখানে চুমানা অনুষ্ঠান চলছে, সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে রেণুকা বলেন, 'চলুন শিউনাথজি, ওখানে যাওয়া যাক।' অর্জুনকুমার এবং রোহিতকেও সঙ্গে আসতে বলেন।

বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে রেণুকা প্রশ্ন করেন, 'আপনার ওই মেয়ে সাজিয়ার বিয়ে তো দিচ্ছেন, ওর বয়েস কত?'

শিউনাথ রুদ্ধশ্বাসে উত্তর দেয়, 'হোগা সাত আট বরিষ, বহেনজি।'

বোঝা যায়, বারহৌলি গাঁয়ের সবাইকেই চেনেন রেণুকা, তাদের নাম টামও জানেন। জিজ্ঞেস করেন, 'কার সঙ্গে বিয়েটা হচ্ছে?'

শিউনাথ জানায় 'এই গাঁয়েরই গন্নালালের ছেলে মাধোর সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা হয়েছে।'

কপাল কুঁচকে যায় রেণুকার। একটু চিন্তা করে বলেন, 'আরে মাধো তো খুব ছোটো। গত বছর যখন এখানে এসেছিলাম, ও তো মায়ের কোলে চড়ে ঘুরছে। কত বয়েস হবে? খুব বেশি হলে দুই আড়াই।'

শিউনাথ আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দেয়, 'হাঁ, অয়সাই হোগা, বহেনজি।'

'দুলহা ছোটো, দুলহন বড়—এ কীরকম বিয়ে?'

শিউনাথ ভয়ে বয়ে বলে, 'বহেনজি তো সবই জানেন, আমাদের অচ্ছুৎদের ভেতর এমন শাদি হয়ে আসছে। আমার বাপুজি, দাদাজি, দাদাজিকা বাপু, উসকা বাপু, উসকা বাপুকা বাপু—'

লম্বা একটা তালিকা পেশ করতে যাচ্ছিল শিউনাথ। হাত তুলে তাকে থামিয়ে রেণুকা বলেন, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

বিয়ের ব্যাপারে যেখানে যত অনুষ্ঠান হচ্ছিল—তিলক, চুমানা বা সগুন দেনা—সব জায়গায় হানা দেন রেণুকা। তাঁর সঙ্গে শিউনাথ এবং অর্জুনকুমাররাও যান। চলতে চলতে সঞ্জীব আর ফারুকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তাঁরাও রেণুকাদের সঙ্গে হাঁটতে থাকেন। এ গাঁয়ের নানা বয়সের বেশ কিছু মানুষজন আর বাচ্চাকাচ্চা জুটে গিয়েছিল। তারাও পেছনে পেছনে চলেছে। সব মিলিয়ে লম্বা প্রশেসান।

বাড়ি বাড়ি ঘুরে যে খবরটুকু পাওয়া গেল তাতে দেখা যায়, বেশির ভাগ জায়গাতেই বরের চেয়ে কনে বড়। কোথাও কোথাও ছ আট মাসের ছেলের সঙ্গে আট দশ বছরের মেয়ের বিয়ে ঠিক করা হয়েছে।

যত দেখছিলেন, বিস্ময় ততই বাড়ছিল অর্জুনকুমারের। আট মাসের ছেলে মা অথবা বাপের কোলে চড়ে দশ বছরের মেয়ের কপালে সিঁদুর চড়াচ্ছে, ফিল্মে এই চমকপ্রদ দৃশ্যটা দেখালে তার এফেক্ট কী হবে, সেটা ভেবে বিস্ময়ের সঙ্গে আমোদও বোধ করতে থাকেন তিনি। এরই মধ্যে একটা কথা ভেবে অবাক হচ্ছিলেন অর্জুনকুমার—কেন এই সব সৃষ্টিছাড়া বিয়ের তোড়জোড় দেখেও প্রোটেস্ট করছেন না রেণুকা! তাঁর তো এই জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করার কথা ছিল। এমনকি এ সম্পর্কে টুঁ শব্দটা পর্যন্ত করেননি।

এদিকে বাড়ি বাড়ি সার্ভে শেষ হলে রেণুকা গাঁয়ের লোকজনদের ডেকে একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে আসেন। জনতাকে চুপচাপ শান্তভাবে দাঁড়াতে বলে রেণুকা বালুয়াকে সঙ্গে করে পনেরো কুড়ি ফিট তফাতে চলে যান। বলেন, 'বালুয়া আপনাদের একটা নওটঙ্কির গান শোনাবে। বেশ মন দিয়ে শুনুন।'

চাইল্ড ম্যারেজের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ভয়ে সমস্ত বারহৌলি গাঁ যখন তটস্থ হয়ে আছে সেই সময় এমন অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের জন্য কেউ বোধহয় তৈরি ছিল না। যাই হোক, অস্বাভাবিক চাপে সবার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এবার তারা সহজভাবে শ্বাস টানতে পারছে। মুখচোখ দেখে টের পাওয়া যায়, তাদের ভয় কেটে যাচ্ছে।

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন বেজায় খুশিতে বলে ওঠে, 'পুরা এক সাল নওটঙ্কি শুনিনি বহেনজি। আপনার কিরপায় শুনতে পাব। গানটা মজেদার হবে তো?'

'শুনে আপনারাই বিচার করবেন।' বলে বালুয়ার দিকে ফেরেন রেণুকা, 'বালুয়া, আরম্ভ কর।'

বালুয়া তৎক্ষণাৎ গান এবং নাচ শুরু করে।

বনোয়ারী হো, হামারাকে লরীকা ভাতার
লরীকা ভাতার লেকে সুতালি ওসারোয়া।
খোলে কে তো চোলি বন্ধ, খোলে না কেওয়ার।
বনোয়ারী হো, জরি গৈলে এড়ি সে কপার।

হাঁটু ভাঁজ করে, কোমর বাঁকিয়ে চুরিয়ে এবং দুই হাত মাথার ওপর পেখমের মতো তুলে নাচতে থাকে বালুয়া। সেই সঙ্গে গলায় ঢেউ তুলে তুলে, কখনও স্বরটাকে ভেঙে দিয়ে, চোখ মটকে মটকে এমনভাবে গেয়ে চলে, যাতে সামনের ভিড়টার ভেতর হাসির লহর খেলে যেতে থাকে। মেয়েরা মুখে কাপড় গুঁজে হাসতে হাসতে একজন আরেক জনের গায়ে গড়িয়ে পড়ে। পুরুষেরা গলা ফাটিয়ে হাসছে। বাচ্চাকাচ্চারা পর্যন্ত বয়স্কদের দেখে কিছুই না বুঝে হেসে হেসে লুটিয়ে পড়ছে।

বালুয়ার দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা নড়ছিল না অর্জুনকুমারের। জনগণের মনোরঞ্জনের এমন খাঁটি দিশি জিনিস আগে আর কখনও দেখেছেন কিনা মনে পড়ে না তাঁর। ছোকরা সত্যিই তুখোড় কলাকার।

রোহিত কানের কাছে এনে ফিসফিসিয়ে বলেন, 'একেবারে সয়েলের জিনিস। আমরা বিলকুল ইন্ডিয়ার রুটে চলে এসেছি অর্জুনজি। আমাদের ফিল্মে এই গানটা লাগিয়ে দেব। দারুণ।'

ওধারে সঞ্জীব ক্যামেরা তাক করে পটাপট বালুয়ার ছবি তুলে যাচ্ছিলেন। আর ফারুক টেপ রেকর্ডার চালিয়ে তার গানটা ধরে রাখছিল।

বালুয়ার নাচ আরো উদ্দাম হয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে গানের সুরও।

বনোয়ারী হো, হামারাকে লরীকা ভাতার
সুতে কে ত শিরোয়া সুতে লা গোড় তারি
বনোয়ারী হো, জরি গৈলে এড়ি সে কপার।
রহড়িমে শুনি কে সিয়ারা কা বোলিয়া
বনোয়ারী হো, রোয়ে লাগলে হামার লরীকা ভাতার
আঙ্গনা সে সাস আইলি, দুয়ারা সে বহিনা
বনোয়ারী হো, কে মারল বাবুয়া হামার—

গানের প্রথম দিকটা কিছু কিছু বুঝলেও শেষের অংশটা দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিল অর্জুনকুমারের। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সমানে হাসছিল শিউনাথ। হাসির দাপটে তার শরীরটা একবার সামনে ঝুঁকে পড়ছিল, পরক্ষণে পেছন দিকে বেঁকে যাচ্ছিল।

অর্জুনকুমার ডাকেন, 'শিউনাথজি—'

হাসির তোড় কমে আসে। সোজা দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে শিউনাথ বলে, 'কহিয়ে হুজৌর—'

'বালুয়া যে গানটা গাইছে ওটার পুরো মানে কী?'

কানে হাত দিয়ে জিভ কেটে শিউনাথ বলে, 'ও আমি বলতে পারব না হুজৌর। বহোত শরমকা বাত।'

শিউনাথ কিছুতেই বলবে না, অর্জুনকুমারও ছাড়বেন না। শেষ পর্যন্ত অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সলজ্জ জড়ানো গলায় শিউনাথ যা বলে তা এইরকম।

'তের চোদ্দ বছরের প্রায়-যুবতী একটি মেয়ের সঙ্গে ছ' সাত বছরের একটি ছোটো ছেলের বিয়ে হয়েছে। শাদির রাতে স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি শুয়েছে কিন্তু বাচ্চা স্বামীর নারীদেহ সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। এদিকে কামার্ত যুবতী স্ত্রী তার জামাকাপড় খুলে ফেলেছে, কিন্তু কোথায় তার স্বামী? সে মাথার দিকে পা আর পায়ের দিকে মাথা করে শুয়ে আছে।'

'আক্ষেপ করে স্ত্রী ভগবানের কাছে বিলাপ করছে, হে বনোয়ারী বাচ্চা ভাতার অর্থাৎ স্বামীর হাতে পড়ে আমার কী দশা হয়েছে দেখ। পা থেকে কপাল পর্যন্ত হু হু আগুন জ্বলছে কিন্তু সে আগুন নেভাবার ক্ষমতা নেই স্বামীর।'

'হঠাৎ মাঝরাতে কোনো কোনো দিন অড়হরের ক্ষেত থেকে শিয়াল ডেকে ওঠে, তাই শুনে ভয়ে আমার বাচ্চা ভাতার চেঁচিয়ে ওঠে। সঙ্গে উঠোনের দু'ধারের দুই ঘর থেকে ভাতারের মা এবং বোন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসে। বাচ্চা স্বামীর ভয় ভাঙাতে শাশুড়ি এবং ননদ বলতে থাকে, কী হয়েছে আমার বাবুয়ার, কে মেরেছে আমার বাবুয়াকে ইত্যাদি।'

'হে বনোয়ারী, সবই তো হল কিন্তু বাচ্চা ভাতারকে গলায় ঝুলিয়ে আমার সর্বাঙ্গ যে জ্বলে যায়...'

অর্জুনকুমার মুগ্ধ হয়ে যান। বাল্যবিবাহ নিয়ে এমন চমৎকার স্যাটায়ার ভাবা যায় না। হাসাতে হাসাতে এবং মজা করতে করতে নওটঙ্কির ছড়াকার দুর্দান্ত লক্ষ্যভেদটি করেছেন। আর বালুয়া সেটা যেমন গেয়েছে, তেমনি তার সঙ্গে মজাদার অঙ্গভঙ্গি করে নেচেও যাচ্ছে।

এদিকে যখন গান এবং নাচ একটা চড়া তালের মাথায় এসে উঠেছে সেই সময় আচমকা হাত তুলে বালুয়াকে থামিয়ে দেন রেণুকা।

সামনের জনতা হুল্লোড় করে হাসছিল। নাচগান বন্ধ হওয়ায় তারাও থমকে যায়।

রেণুকা সবার মুখের ওপর দিয়ে চোখদু'টি ধীরে ধীরে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়ে নিয়ে যান। তারপর বলেন, 'বালুয়ার নাচাগানা কেমন লাগল?'

হেসে হেসে, মাথা হেলিয়ে জনতা জানায়, 'বহোত মজেদার বহেনজি।'

খুব শান্ত গলায় রেণুকা বলেন, 'বহোত মজেদার, তাই না?'

'হাঁ বহেনজি—' জনগণের মাথা আরো অনেকখানি হেলে যায়।

'আপনারা যেভাবে কম বয়েসের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিচ্ছেন তার ফলটা এই রকমই হয়। সে যাক, গৈরুকে দিয়ে আপনাদের খবর পাঠিয়েছিলাম, বাচ্চাদের বিয়ে দেবেন না। খবরটা তো আপনারা পেয়েছেন।'

জনতা অনিবার্য একটা ইঙ্গিত পেয়ে যায়। বয়স্ক পুরুষ এবং মেয়েমানুষদের মুখ থেকে পলকে হাসি মুছে গিয়ে ভয় আর দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে বেরোয়। বারহৌলি গাঁয়ের প্রতিনিধি হিসেবে বারকয়েক ঢোক গিলে শিউনাথ বলে, 'হাঁ বহেনজি।'

'তবু বাচ্চাদের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন?'

শিউনাথ বাল্যবিবাহের সপক্ষে যুক্তিটা এইভাবে খাড়া করে। এ জাতীয় বিয়ের পত্তন তাদের হাত দিয়ে নতুন করে হচ্ছে না। তার বাপ, ঠাকুরদা, তস্য বাপ, তস্য বাপের বাপ, অর্থাৎ আবহমান কাল ধরে এই প্রথা চালু রয়েছে। বহেনজি যদিও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, কিন্তু তার গুরুত্ব কতটা তারা ভাবতে পারেনি। বহেনজি যেন তাদের কসুর মাপ করে দেন।

অর্জুনকুমার স্নায়ু টান টান করে শুনে যাচ্ছিলেন। মনে পড়ছে ধরমপুরায় আসার সময় ট্রেনের কামরায় শিউনাথ বাচ্চাদের বিয়ের ব্যাপারে ঠিক এই কথাই বলেছিল।

রেণুকা বলেন, 'আমার মাপ করার ব্যাপার নয়। আপনারা কি জানেন বাচ্চাদের বিয়ে দেওয়াটা বে-কানুনি?'

শিউনাথ এবং তার পাশের সব লোকজন চমকে ওঠে। সে বলে, 'নেহী বহেনজি।'

'মেয়ের বয়েস আঠারো আর ছেলের বয়েস একুশ হলে তবেই বিয়ে দেওয়া চলে। এর কম বয়েসের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিলে স্রেফ জেল। পুলিশকে খবর দিলে এখনই এসে আপনাদের কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে।'

জনতার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে যায়। শিউনাথ এবং আরও কয়েকজন হাতজোড় করে রেণুকার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। বহেনজি আমরা কিছু জানতাম না। আমাদের বাঁচান। লেকেন এহী সাল শাদি তো রুখে দেওয়া যাবে না। তিলক, সগুন দেনা, চুমানা—সব হয়ে গেছে। এখন বন্ধ হলে দুলহা দুলহনের পক্ষে সেটা হবে ঘোর অমঙ্গল। এই বছরটা যেন বহেনজি পুলিশকে খবর না দেন। সিরিফ এই সালটা। এর পর বহেনজি যা বলবেন তারা তাই মেনে নেবে।

রেণুকা কপাল কুঁচকে কিছু চিন্তা করেন। তারপর বলেন, 'মনে থাকবে কথাটা?'

'থাকবে বহেনজি।'

'ফের যদি এমন হয়, আমি নিজে গিয়ে পুলিশ ডেকে আনব।' বলে রেণুকা অর্জুনকুমারের দিকে ফেরেন, 'আমি এবার যাব। আপনারাও নিশ্চয়ই ফিরবেন।'

'হ্যাঁ। চলুন, যাওয়া যাক।'

ফিরে যেতে যেতে অর্জুনকুমার রেণুকাকে বলেন, 'আমি তো দুর্ধর্ষ একটা অ্যাজিটেশনের জন্যে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ওয়েট করছিলাম। আপনি কিন্তু কিছুই করলেন না, চাইল্ড ম্যারেজটাই মেনে নিলেন। একেবারে অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স।'

রেণুকা আস্তে আস্তে বলেন, 'মেনে নিলাম কোথায়? ওদের এই বছরটার জন্যে শুধু ছেড়ে দিলাম। ইচ্ছে করলে পুলিশ এনে তুলকালাম কাণ্ড বাধানো যেত। আসলে ব্যাপারটা কী জানেন, চাইল্ড ম্যারেজটা ওদের কাছে অন্যায় কিছু নয়। জোর করে এটা ভাঙতে গেলে রেজিসটান্স তৈরি হয়ে যাবে। এ বছর বিয়ের ব্যাপারে ওরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, তাই আর বাধা দিলাম না। বহুকালের এই ব্যাড সিস্টেম ভাঙতে গেলে ধৈর্যের দরকার। বার বার এসে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে, কখনও বা ভয়টয় দেখিয়ে এটা পার্মানেন্টলি বন্ধ করতে হবে।'

রেণুকা সম্পর্কে অর্জুনকুমারের শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে যায়। পুরোনো সব প্রথা বা সংস্কার যার প্রাচীন শিকড় জেনারেশনের পর জেনারেশন মানুষের রক্তের ভেতরে ছড়িয়ে গেছে সেগুলো অবিবেচকের মতো একটানে উপড়ে ফেলতে গেলে দারুণ উত্তেজক নাটক তৈরি হয় বটে কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া বেশির ভাগ সময় খুব খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। এর জন্য ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা প্রয়োজন। জোর জবরদস্তিতে সব কাজ হয় না।

রেণুকা বলেন, 'হিউম্যান এলিমেন্ট খুব ডেলিকেট ব্যাপার। তাকে মেকানিক্যালি ট্রিট করতে নেই। হৃদয় দিয়ে তাকে বুঝতে হয়।'

মজার গলায় অর্জুনকুমার বলেন, 'হ্যান্ডল উইদ কেয়ার, তাই না?'

'কারেক্ট।' রেণুকা হাসেন।

একটু ভেবে অর্জুনকুমার বলেন, 'আপনার পাটনার বন্ধুরা এলেন না? শুনেছিলাম আপনারা একসঙ্গে এখানকার কুসংস্কার, খারাপ প্রথা-ট্রথার বিরুদ্ধে অ্যাজিসেশন করবেন?'

'কী জানি, বুঝতে পারছি না, কেন ওরা এল না! হয়তো অন্য কোনো ব্যাপারে আটকে গেছে। যে কোনো দিন এসে পড়বে। ওদের যথেষ্ট দায়িত্ববোধ রয়েছে। এগেইনস্ট সুপারস্টিশন—ওরা লড়াই করবেই।'

'তা হলে এই মুহূর্তে আপনি অল অ্যালোন। লোন ফাইটার।'

'অ্যালোন? একরকম তাই।' চোখের কোণ দিয়ে অর্জুনকুমারকে দেখতে দেখতে খানিকটা হালকা গলায় রেণুকা বলেন, 'একা লড়াই করতে হয় না, যদি আপনারা একটু ইনভলভড হন। এটা তো কারো একার বা দু-চারজনের কাজ না, প্রতিটি শিক্ষিত কনসাস মানুষের কাজ।'

অর্জুনকুমার চমকে ওঠেন। ইনভলভমেন্ট? অসম্ভব। জনগণের সন্ধানে এলেও কোনোভাবেই তাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা তাঁর নেই। কাছাকাছি এলেও তিনি বহুদূরের এক স্বপ্নবৎ জগতের মেগা স্টার। অদৃশ্য বায়ুস্তরে ভাসমান থেকে তিনি শুধু নিরাসক্ত দর্শকের মতো দেখে যাবেন।

অর্জুনকুমার উত্তর দেন না। রেণুকাও আর কিছু বলেন না।

শিউনাথ এবং আরও কয়েকটি বয়স্ক লোক প্রায় হাতজোড় করেই রেণুকাদের পেছন পেছন হাঁটছিল। রেণুকা যে পুলিশ এনে আজই তাদের জেলে ঢোকাবার বন্দোবস্ত করেননি, এতেই তারা কৃতার্থ হয়ে যায়।

গ্রামের গা ঘেঁষেই কাচ্চী। এই রাস্তাটা বরাবর 'রাজপুত নিকেত'-এর দিকে চলে গেছে। কাচ্চীতে এসে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় শিউনাথের। পেছন থেকে দৌড়ে রেণুকার সামনে গিয়ে বলে, 'বহেনজি, আমাদের বহোত ভারী বিপদ। আপনি বাঁচান।'

রেণুকা একেবারে হকচকিয়ে যান। বলেন, 'কী হয়েছে?'

শিউনাথ জানায় পরশু রাতে চৌধারি এসে তাদের শাসিয়ে গেছে, কেউ যেন হারবার্টগঞ্জে গিয়ে ঠিকাদারের কাজ না করে, হোলির তৌহারটা কাটলেই হাল-বয়েল নিয়ে মুনেশ্বরজির জমিতে নেমে পড়ে। কিন্তু জগনাথজি মাথা পিছু যা মজুরি দেন তার দ্বিগুণেরও বেশি পাওয়া যায় ঠিকাদারদের কাছে। এত বড় লোকসান তারা মেনে নেয় কী করে? কিন্তু চৌধারির মুখের ওপর তা বলা সম্ভব হয়নি। নেহাত গাঁ সুদ্ধ এতগলো বাচ্চার শাদির আয়োজন করা হয়ে গেছে তাই আমোদআহ্লাদের ব্যাপারটা চলছে, নইলে ভেতরে ভেতরে সবাই ভয়ানক ঘাবড়ে গেছে। কী করবে তারা ভেবে উঠতে পারছিল না, হঠাৎ রেণুকা এসে পড়ায় বিজলি চমকের মতো খানিকটা আশা দেখা দিয়েছে।

বহেনজি যথেষ্ট দয়ালু, নইলে বেকানুনি কাজের জন্য নিশ্চয়ই পুলিশ ডেকে আনতেন। সেই ভরসাতেই তাঁর কাছে শিউনাথরা আর্জি জানায়, বহেনজি তাঁর বাবুজি জগনাথজিকে একটু বোঝান, তিনি যেন চৌধারিকে আর তাদের গাঁয়ে না পাঠান এবং তারা যাতে হারবার্টগঞ্জে গিয়ে ঠিকাদারদের কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেন।

রেণুকা চমকে ওঠেন। তিনি গ্রামে এবার এসেছিলেন বাল্যবিবাহের মতো কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে। কিন্তু শিউনাথরা তাঁকে আরও জটিল কিছুর দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'চৌধারি কে?'

শিউনাথ বলে, 'মুনেশ্বরজিকা ভূমিসেনা। বড়ো বন্দুকবাজ। বহোত খতারনাক।'

ক্রিয়াপদহীন তিনটি সংক্ষিপ্ত বাক্যেই চৌধারির চরিত্রটি পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় শিউনাথ। রেণুকা চিন্তিতভাবে বলেন, 'আমি বাবুজির সঙ্গে কথা বলব। দেখি কী করতে পারি। এখন চলি।'

'কবে আপনার সঙ্গে দেখা করব বহেনজি?'

'আপনাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে টিয়ে হয়ে যাক, তারপর।'

শিউনাথদের কাছে বিদায় নিয়ে রেণুকারা এগিয়ে যান।

এখন ভরদুপুর। সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে। অর্জুনকুমার চোখের ওপর হাতের আড়াল দিয়ে একবার আকাশের দিকে তাকান। রোজ বারোটার ভেতর 'রাজপুত-নিকেত'-এ পৌঁছে যান তাঁরা। আজ অনেক দেরি হয়ে যাবে। ডাক্তাররা তাঁর দৈনন্দিন চলাফেরা খাওয়াদাওয়ার যে চার্ট তৈরি করে দিয়েছেন আজই প্রথম সেটা মেনে চলা সম্ভব হবে না। লাঞ্চ খাওয়ার সময় সাড়ে বারোটায়। আজ খেতে খেতে দু'টো আড়াইটা বাজবে। এই নিয়ে ফারুকরা খুবই ঝঞ্ঝাট করবে, কিন্তু কী আর করা যাবে।

খানিকটা হাঁটার পর রেণুকা যেন আপন মনেই বলেন, 'আরও দু-একটা গাঁয়ে গিয়ে শুনেছি চৌধারি তাদের অন্য কোথাও গিয়ে কাজ করতে বারণ করেছে। নিজেরা মজুরিও কম দেবে, আবার অন্য কারো কাজও করতে দেবে না, এটা ঠিক না। দিস ইজ ভেরি ব্যাড। এ ব্যাপারে কিছু একটা করা দরকার।'

অর্জুনকুমারও নানা গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে এরকম একটা আভাস যে পেয়েছেন তা আর বলেন না। জিজ্ঞেস করেন, 'কী করতে চান?'

'বাবুজিকে বলব শুধু মুনেশ্বরজির স্বার্থটা না দেখে গরিব লোকগুলোর কথা একটু ভাবুন।'

'যদি ভাবতে রাজি না হন?'

'দ্যাটস আ প্রবলেম। রাজি যে হবেন না, এ ব্যাপারে আমি হান্ড্রেড পারসেন্ট সিওর। এমন লয়াল বশংবদ এমপ্লয়ি খুব কমই দেখা যায়। তবু কিছু একটা করতে তো হবে।'

যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করছিলেন অর্জুনকুমার। বলেন, 'যা করবেন, আমি যেন জানতে পারি।'

'পারবেন।'

'ঘণ্টাখানেক বাদে 'রাজপুত নিকেত'-এর উঁচু টিলাটার তলায় এসে অর্জুনকুমার বলেন, 'এখান থেকে নিশ্চয়ই সোজা বাড়ি ফিরে যাবেন?'

রেণুকা বলেন, 'হ্যাঁ।'

কিছুটা ইতস্তত করে অর্জুনকুমার এবার বলেন, 'বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে আরও চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে যাবে। খুব টায়ার্ড হয়ে আছেন। এখন আর এতটা রাস্তা না গিয়ে আমাদের সঙ্গে যদি লাঞ্চ করেন, খুব খুশি হব।'

'ধন্যবাদ। আমি না গেলে মা না খেয়ে বসে থাকবেন। আমাকে ক্ষমা করুন।'

'ঠিক আছে। কবে আবার দেখা হচ্ছে?'

'আপনারাও গাঁয়ে ঘুরছেন, আমিও ঘুরছি। কাল পরশু তরশু—যে কোনোদিন, যে কোনো সময় দেখা হতে পারে।'

কিছুক্ষণ অর্জুনকুমার বলেন, 'সেভাবে নয়। আপনি কথা দিয়েছেন, আমাদের গাইড হবেন। রোজ সকাল থেকেই আমরা একসঙ্গে ঘুরতে চাই।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে রেণুকা বলেন, 'তা হলে এক কাজ করা যাবে। আমি রোজ সকালে এখানে এসে অপেক্ষা করব। আপনারা 'রাজপুত নিকেত' থেকে নিচে নেমে এলে একসঙ্গে গাঁয়ে যাওয়া যাবে।'

'ঠিক আছে। অনেক ধন্যবাদ।'

রেণুকা আর দাঁড়ান না, দুপুরের গনগনে সূর্য মাথায় নিয়ে সামনের কাচ্চী ধরে চলে যান। আব অর্জুনকুমাররা আস্তে আস্তে ডান দিকে এগিয়ে গিয়ে কড়াইয়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকা ল্যান্ডোতে উঠে বসেন।

নয়

পরদিন সকালে ম্যাসাজ স্নান এবং ব্রেকফাস্ট চুকিয়ে ফারুক আর রোহিতের সঙ্গে ল্যান্ডোয় চেপে টিলার নিচে নেমে আসতেই অর্জুনকুমারের চোখে পড়ে কাচ্চীতে দাঁড়িয়ে আছেন রেণুকা।

আজ সঞ্জীব গ্রাম দেখতে যাবেন না। অর্জুনকুমারের ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারে প্রচুর গোলমেলে কাগজপত্র সঙ্গে করে এনেছেন। সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নোট তৈরি করা দরকার। বোম্বাইতে ফিরেই নোটগুলো নিয়ে আয়কর দপ্তরে ছুটতে হবে।

সঞ্জীব না এলেও জগনাথ মিশ্র যথারীতি অর্জুনকুমারদের সঙ্গে নিচে নেমেছেন। রেণুকাকে দেখে মোটা রোমশ ভুরু দু'টো সামান্য কুঁচকে মজার গলায় বলেন, 'রেণু, আজ থেকে তুই বুঝি অর্জুনজিদের গাইড হচ্ছিস!'

রেণুকা বলেন, 'কাল রাতেই তো তোমাকে জানিয়েছি।'

'ভালো। যত পারিস এখানকার গাঁওবালাদের কুসমস্কার আর বচ্চে ছৌরাছৌরীদের শাদি উদি দেখা। এ সব চিজ ওঁরা বোম্বাইতে তো দেখতে পান না।'

'চাইল্ড ম্যারেজ ট্যারেজ ওঁরা কিছু কিছু দেখেছেন। সেই সঙ্গে আরও অনেক ব্যাপার জানতে পারছেন।'

স্থির চোখে মেয়েকে লক্ষ করতে করতে সতর্কভাবে জগনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'আর কী কী?'

রেণুকা বলেন, 'এই যে তোমার ভূমিসেনারা গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে শাসিয়ে আসছে, কেউ যেন হারবার্টগঞ্জে ঠিকাদারদের কাছে বা অন্য কোথাও কাজ করতে চলে না যায়। জবরদস্তি করে তোমার বন্দুকবাজেরা তাদের দিয়ে মুনেশ্বরজির জমিন চাষ করাতে চাইছে।'

জগনাথ ভীষণ হকচকিয়ে যান। তবে কোনো উত্তর দেন না।

রেণুকা আবার বলেন, 'এটা ঠিক না বাবুজি। কাল রাত্তিরে তোমাকে বলেছি, গবিব লোকগুলো সম্পর্কে কিছু একটু ভাবো। বন্দুকবাজদের শাসানিতে ওরা খুব ভয় পেয়েছে।'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন না জগনাথ। কিছুক্ষণ বাদে চিন্তাগ্রস্তের মতো বলেন, 'তোব কথা আমার মনে আছে। হোলির তৌহারটা কাটুক। তারপর দেখা যাক কী করা যায়।' অর্জুনকুমারের দিকে তাকিয়ে মুখচোখ থেকে দুশ্চিন্তা এবং টেনশনের ছাপটা মুছে, গলার স্বর পালটে দিয়ে, হেসে হেসে বলেন, 'অর্জুনজি, আপনি ইন্ডিয়ার টপমোস্ট কলাকার। যত পারেন চাইল্ড ম্যারেজ ট্যারেজ দেখুন, লেকেন অন্য কোনো ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়বেন না।'

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, জগনাথ চান, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চৌধারিরা যে ভয়ের আবহাওয়া তৈরি করছে, সে ব্যাপারে যেন কোনোভাবেই অর্জুনকুমার মাথা না ঘামান। আগে এমন স্পষ্ট করে এ সব কথা কখনও বলেননি তিনি।

অর্জুনকুমার কিছু বলেন না, শুধু স্থির চোখে জগনাথকে লক্ষ করতে থাকেন।

জগনাথ বিব্রতভাবে, অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে আবার বলে ওঠেন, 'আপনি এত্তে বড়ে আদমি যে এখানকার বাজে ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করা ঠিক না। দো-চারদিনের জন্যে এসেছেন, এখানকার পলিটিকসে জড়িয়ে পড়লে বেফায়দা শরীর খারাপ হবে। তার রিঅ্যাকশনটা ইন্ডিয়ার ফিল্মি দুনিয়ার পক্ষে বিলকুল ডিজাসট্রাস। হে—হে—' বলে গলার ভেতর শব্দ করে হাসেন।

তাঁর শরীর এবং ভারতীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে হঠাৎ কেন জগনাথ এতটা ভাবিত তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। অর্জুনকুমার শুধু একটু হাসেন।

রেণুকা বলেন, 'বেলা বেড়ে যাচ্ছে। আর কিন্তু দাঁড়াতে পারব না।'

জগনাথ ব্যস্তভাবে বলেন, 'হাঁ হাঁ, তোরা এবার যা।'

সেই যে অর্জুনকুমার রেণুকার সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে শুরু করেছিলেন, তারপর কয়েকটা দিন কেটে গেছে। সঞ্জীব অবশ্য তাঁদের সঙ্গে আজকাল বেরোন না। ইনকাম ট্যাক্সের পেপার টেপাব নিয়ে তিনি একেবারে গলা পর্যন্ত ডুবে আছেন। তিনি না এলেও ফারুক আর রোহিত তাঁর সঙ্গেই সারাক্ষণই ক্যামেরা এবং টেপ রেকর্ডার নিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন। তেমন কিছু চোখে পড়লে বা কানে এলে ছবি তুলে নিচ্ছেন বা টেপ করে রাখছেন।

এর মধ্যে যে গ্রামগুলোতে তাঁরা গেছেন সেই সব জায়গায় নতুন অভিজ্ঞতা কিছু হয়নি। কোথাও কোথাও এ বছরের খরার কারণে প্রচণ্ড দারিদ্র, রামদানা, সুথনি বা বগেড়ির মাংস খেয়ে কোনো রকমে দেহাতিদের টিকে থাকা, ইত্যাদি। যে সব গ্রামের মানুষ ঠিকাদারদের কাছে বা অন্য কোনো কাজে শহরে গিয়েছিল তাদের অবশ্য না খেয়ে থাকার ব্যাপারটা নেই। তবে সবগুলো গ্রামেই ভূমিসেনারা মাঝে মাঝেই হানা দিয়েছে। গোটা অঞ্চলটাকে অদৃশ্য এক ভয় লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘিরে ধরতে শুরু করেছে।

এরই ভেতর গাঁয়ে গাঁয়ে চাইল্ড ম্যারেজ আর হোলির তোড়জোড় চলছে। যেখানে হোলির দিন বড় মেলা বসবে সেই বিষুণজির মন্দিরটার মেরামতি শেষ হয়ে গেছে, এখন রং করার কাজ চলছে। খবর নিয়ে অর্জুনকুমাররা জেনেছেন, এর জন্য ফি বছর যা খরচ হয় তা দিয়ে থাকেন মুনেশ্বর সিং। এবার নাকি দারুণ ঘটা করা হবে হোলির দিন। সে জন্য অন্য সব বছরের তুলনায় অনেক বেশি টাকা দিচ্ছেন মুনেশ্বর। অবশ্য সমস্তটাই খরচ হচ্ছে জগনাথের হাত দিয়ে। বিষুণজির মন্দির ঘিরে বাঁশ এবং তেরপল দিয়ে প্রচুর ছোটো ছোটো চালা তৈরি করা হচ্ছে। তৌহারের দিন দুই আগে শহর থেকে দোকানদারেরা এসে ওগুলোতে তাদের পসরা সাজিয়ে বসবে।

গ্রামের দিকে যেতে যেতে দূর থেকে আরও দু'টো ব্যাপার চোখে পড়েছে অর্জুনকুমারের। সিনেমাওলাদের সেই তাঁবুটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ওখানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এখন কাজ চলছে। সন্ধের পর থেকে ওখানে দুনিয়া কাঁপিয়ে ডায়নামো চলতে থাকে। এখন ট্রায়াল চলছে। তাঁবু এবং তার চারপাশের 'জায়গাটা আলোয় আলোয় ভরে যায়। সিনেমাটা চালু হবে হোলির দিন সন্ধেবেলায়। অর্জুনকুমার ভেবেছেন, তার আগেই এখান থেকে চলে যেতে পারলে ভালো হয়।

দ্বিতীয়ত, আর যা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে তা হল সেই পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্টদের চাপা আন্দোলন। এদের মুভমেন্টটা সরাসরি নিজের চোখে দেখেননি অর্জুনকুমার। তবে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে মানুষজনের টুকরো টাকরা কথায় তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ক্বচিৎ কখনও এদের দূরে স্লোগান দিয়ে যেতে দেখেছেন। অর্জুনকুমারের কেমন একটা ধারণা হয়েছে, আজ হোক, কাল হোক বা এক বছর পরেই হোক, ভারতবর্ষের উজ্জ্বল মানচিত্রের উলটোদিকে এই সংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকারেডুবে-থাকা শান্ত ভূখণ্ডে বিস্ফোরণ ঘটবেই।

এই ক'দিনে আরও একটা ব্যাপার অর্জুনকুমার লক্ষ করেছেন। রমজান সাহেব বার তিনেক 'রাজপুত নিকেত'-এ এসেছেন। তাঁর আসার সময়টা অদ্ভুত। কোনো বার অর্জুনকুমার যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন তখন তাঁর ঝকঝকে নতুন মডেলের গাড়ি ভেতরে ঢুকছে। আবার যখন তিনি ভেতরে ঢুকছেন, রমজান সাহেব বেরিয়ে যাচ্ছেন। আশ্চর্য, তাঁর সঙ্গে একবারও আলাপ করিয়ে দেননি জগনাথ। এটা ইচ্ছাকৃত কিনা কে জানে।

যাই হোক, এভাবে গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ অর্জুনকুমারের মনে হতে থাকে, সেই কত কাল ধরে, হয়ত পাঁচ দশ পনেরো বছর কিংবা তারও আগে থেকে রেণুকা পথপ্রদর্শক হয়ে তাঁকে এক অচেনা রহস্যময় পৃথিবীর অন্তঃপুরে নিয়ে চলেছেন। এককে সময় বোম্বাইয়ের সেই চোখ ধাঁধানো গ্ল্যামারের জীবনটা তাঁর কাছ ঝাপসা হয়ে যায়। কোনোদিন কি তিনি সেখানে থাকতেন? রাধিকা, বনিতা এবং বিবেক—এদের সঙ্গে তাঁর কি কখনও কোনো সম্পর্ক ছিল? এককালের প্রিয় মুখগুলি প্রতিদিন দূরে, আরও দূরে সরে যাচ্ছে। স্টুডিওতে আর্ক ল্যাম্পের তীব্র আলো, ফাইভ-স্টার হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হল-এ দুর্দান্ত জমকালো সব পার্টিতে হুইস্কির ফোয়ারা কিংবা নতুন ছবির প্রিমিয়ারে হিস্টিরিয়ার ঘোরে ফ্যানদের উন্মত্ততা—এ সব কোনোদিন কি সত্যি ছিল? নাকি অলীক স্বপ্নের ঘোরে এ সব ঘটে গেছে?

একদিন সকালে নরম মায়াবী রোদ যখন চরাচরের ওপর ছড়িয়ে আছে সেই সময় সীমাহীন আকাশের তলা দিয়ে রেণুকার পাশাপাশি হেঁটে একটা গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন অর্জুনকুমার। হঠাৎ ওঁদের চোখে পড়ে, বাঁশের চালিতে একটা মাঝবয়সী লোককে শুইয়ে চারজন দেহাতী কাঁধে করে নিয়ে চলেছে। তাদের পেছনে আরও দশ বারোটি পুরুষ এবং তিন-চারটি মেয়েমানুষ।

যাকে চালিতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার গলা পর্যন্ত ময়লা চাদরে ঢাকা, চোখ দু'টো বোজা। দেখেই টের পাওয়া যায় সে বেহুঁশ। মাঝে মাঝে তার গলার ভেতর থেকে কাতর গোঙানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

চালি-বাহক এবং যে দেহাতিরা পেছন পেছন আসছে তাদের চোখেমুখে ভয় আর দুশ্চিন্তার ছাপ। কেউ একটি কথাও বলছিল না, নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছিল। তবে মেয়েরা মুখে কাপড় দিয়ে সমানে কাঁদছে আর চাপা নিচু গলায় বিলাপের সুর তুলে একটানা কিছু বলে যাচ্ছে।

রেণুকা লোকগুলোকে চেনেন। ডাকেন, 'এ শিউপূজন, ভৈরু, টিকালাল—চালিতে কে শুয়ে আছে?'

বিচিত্র শোভাযাত্রাটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভৈরু যার নাম, সে বলে, 'আমাদের গাঁওয়ের বিষুণচাচা।'

'কী হয়েছে বিষুণের?'

'ভারী বুখার। কাল থেকে বেহুঁশ হয়ে আছে। হাথানিয়াগঞ্জের অসপাতাল নিয়ে যাচ্ছি।'

'সে তো অনেক দূর। কম করে পনেরো ষোল মাইল। ট্রেনে যাচ্ছ তো?'

'নেহী বহেনজি। পয়দল চলা যায়েগা। এত্তে আদমিকা টিকিসটা (টিকিটের) পাইসা কাঁহা মিলেগা?'

মেয়েদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে রেণুকা জিজ্ঞেস করেন, 'ওরা কাঁদছে কেন?'

ভৈরু জানায়, ওই মেয়েমানুষগুলো হল বিষুণের মা, বোন এবং জেনানা। তাদের বিশ্বাস হাসপাতালে গেলে কেউ ফিরে আসে না। এটাই বিষুণের অন্তিম যাত্রা। যে অনিবার্য শোক একদিন, দু'দিন বাদে করতেই হবে, আজই তা শুরু করে দিয়েছে তারা।

'ঠিক আছে, তোমরা যাও।'

'নমস্তে বহেনজি—'

দেহাতিরা মাঠের ওপর দিয়ে কোনাকুনি উত্তর দিকে এগিয়ে যায়। মেয়েমানুষগুলোর করুণ বিলাপ বাতাসে বিষাদ ছড়িয়ে দিতে থাকে।

ভৈরুদের সঙ্গে কথা বলার জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন রেণুকারা। আবার তাঁরা হাঁটতে শুরু করেন।

কেউ অসুস্থ হলে এভাবে চালিতে চাপিয়ে কাঁধে করে পনেরো মাইল দূরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়, এমন দৃশ্য আগে আর কখনও দেখেননি অর্জুনকুমার। তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান।

রেণুকা চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ অর্জুনকুমারের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি তিন চার দিন আমার সঙ্গে গাঁয়ে ঘুরছেন। তার আগে কয়েকদিন নিজেরাই ঘুরে দেখেছেন। একটা হেলথ্ সেন্টারও কি আপনাদের চোখে পড়েছে?'

এদিকটা আগে মাথায় আসেনি অর্জুনকুমারের। তাঁর সামনে শুধু একানকার পভার্টি আর কুসংস্কারের অন্ধকার চিত্রটাই ছিল। বিষুণকে চালিতে চেপে হাসপাতালে যেতে দেখে এবং রেণুকার প্রশ্নটা শুনে তাঁর মধ্যে কোথায় যেন ধাক্কা লাগে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলেন, 'না, পড়েনি।'

'কোনো স্কুল টুল দেখেছেন?'

'যতদূর মনে পড়ছে, একটা গাঁয়ে ভাঙা ঘরের গায়ে প্রাইমারি স্কুলের সাইন বোর্ড যেন দেখেছিলাম।'

রেণুকা বলেন, 'এখানে সবসুদ্ধ ত্রিশ বত্রিশটা গ্রাম। এতগুলো গাঁয়ে তিনটে মাত্র প্রাইমারি স্কুল। সেগুলোর যা হাল, থাকা না-থাকা, দুই সমান। চেয়ার নেই, বেঞ্চ নেই, মাস্টার নেই, আর যা সব চেয়ে ভাইটাল সেই ছাত্রও নেই।'

একটু চুপচাপ।

তারপর রেণুকা ফের শুরু করেন, 'এতগুলো ফাইভ ইয়ার প্ল্যান পার হয়ে গেল, সোশাল ওয়েলফেয়ার আর রুরাল ডেভলাপমেন্টের এত এত সব প্রোজেক্ট তৈরি হচ্ছে চল্লিশ বছর ধরে কিন্তু এখানকার মানুষদের লেভেলে তার কোনো ছাপ নেই। এখনও অসুখ বিসুখ হলে এ অঞ্চলের মানুষকে কীভাবে হাসপাতালে যেতে হয়, একবার ভাবুন।'

অর্জুনকুমার হাঁটছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর চোখ ছিল রেণুকার দিকে। পলকহীন তিনি তাকিয়েই আছেন। হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় বলে ওঠেন, 'আশ্চর্য!'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু রয়েছে যাতে চমকে ওঠেন রেণুকা। বলেন, 'মানে!'

'যদি কিছু মনে না করেন, বলতে পারি।'

'হ্যাঁ, বলুন। মনে করব না।'

'আপনি জানিয়েছিলেন কুসংস্কার আর চাইল্ড ম্যারেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে এসেছেন। কিন্তু তার আগে বড় রকমের অ্যাজিটেশন করা উচিত ছিল অশিক্ষার বিরুদ্ধে, পভার্টির বিরুদ্ধে, মুনেশ্বরজিদের এক্সপ্লয়টেশনের বিরুদ্ধে আর সরকারি উদাসীনতার বিরুদ্ধে। চল্লিশ বছরে একটা হেলথ সেন্টার হয়নি, তিনটে প্রাইমারি স্কুলের একটাও চালু নেই—ভাবা যায়! পেট ভরে খেতে পেলে, লেখাপড়া শিখতে পারলে আর স্বাস্থ্যটি ভালো থাকলে ওসব কুসংস্কার টংস্কার আপসেই বিদায় নেবে।'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলার পর হঠাৎ থমকে যান অর্জুনকুমার। রীতিমতো অবাকই হয়ে গেছেন তিনি। এখানে তিনি এসেছিলেন একজন নিরাসক্ত অবজারভার হিসেবে। যাই শুনুন, যাই দেখুন, তাঁর কোনো প্রতিক্রিয়া থাকবে না—এই চিন্তাটা সারাক্ষণ মাথায় রাখতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু নিজের অজান্তে এ কী বলে ফেললেন! কোনো ফায়ার ব্র্যান্ড পলিটিক্যাল লিডার বা তুখোড় সোশাল ওয়ার্কার অলৌকিক কোনো ম্যাজিকে তাঁর ভেতর ঢুকে তাঁকে দিয়ে দারুণ এক বক্তৃতা করিয়ে নিল। তবে কি চারিদিকের এত দারিদ্র, এত হতাশা, অশিক্ষা, কুসংস্কার তাঁকে আর উদাসীন থাকতে দিচ্ছে না? এই ব্যাপারগুলো তাঁর মধ্যে চারিয়ে গিয়ে নিরাসক্তির ভিতটাকে ধীরে ধীরে আলগা করে দিতে শুরু করেছে?

রেণুকা বিব্রত হয়ে পড়েন। বলেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, অ্যাজিটেশন শুরু করা উচিত ছিল অশিক্ষা, এক্সপ্লয়টেশন আর গভর্নমেন্ট অ্যাপাথির বিরুদ্ধে, আর সেটা অনেক আগে থেকেই। কিন্তু ব্যাপারটা কী জানেন—'

'কী?'

রেণুকা যা উত্তর দেন তা এইরকম। সেই স্কুল থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পাটনাতে থেকেই পড়াশোনা করেছেন। কলেজের চাকরি নেবার পরও সেখানেই থাকতে হচ্ছে। পড়াশোনা আর পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে ফি বছরই বেশ কয়েক বার এখানে এসেছেন। তিনি জাতপাত বা ছুঁয়াছুত মানেন না। চারপাশের আনপড় অচ্ছুৎদের গাঁয়ে বরাবরই ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু এক্সপ্লয়টেশন ইত্যাদি ব্যাপারে আন্দোলনের কথা তাঁর মাথায় তখন আসেনি। পরে যখন সোশাল ওয়ার্ক শুরু করেন তখন তাঁদের কাজকর্ম পাটনা সিটির মধ্যেই আটকে ছিল। ওখানকার মেয়েদের জন্য বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মেয়েদের জন্য অনেক কিছু করেছেন। এ বছরই প্রথম তাঁদের গ্রামের দিকে নজর পড়েছে এবং কাজটা তাঁরা শুরু করতে চেয়েছিলেন এই ধরমপুরা অঞ্চলটাকে ঘিরে। গ্রামে আসার সময় রেণুকার মাথায় শুধু কুসংস্কার আর বাল্য বিবাহটাই ছিল। অন্য কিছু ভাবেননি। কিন্তু এখানে ঘুরতে ঘুরতে আরও জরুরি, আরও প্রবল কিছু সমস্যার দিকে তাঁর চোখ পড়েছে।

রেণুকা বলেন, 'আপনি যা বললেন, আমিও ক'দিন ধরে তা-ই ভাবছি। এটাই এখন আমার টপ প্রায়োরিটি। এ ব্যাপারে অবশ্য প্রথম আমাকে বলেছে রঘুবীর—রঘুবীর সহায়।'

অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'রঘুবীর কে?'

'একজন পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট। আপনি তাকে চিনবেন না। আমরা একসঙ্গে পড়তাম, সিক্সথ ইয়ারে উঠে পড়া ছেড়ে দেয়। দারুণ ফায়ার ব্র্যান্ড টাইপের ছেলে।' রঘুবীরের কথা বলতে বলতে রেণুকার চোখের ভেতর থেকে চাপা দ্যুতি ফুটে বেরোয়, 'আমার জীবনে এমন ডেডিকেটেড ছেলে আগে আর কখনও দেখিনি।'

আস্তে আস্তে অর্জুনকুমারের মসৃণ কপালে ক'টি ভাঁজ পড়ে। তক্ষুনি তিনি কোনো উত্তর দেন না। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলেন, 'একটা কথা বলব?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'আমি দূর থেকে কয়েকটি ইয়াং ম্যানকে তিন চার দিন স্লোগান দিয়ে যেতে দেখেছি। এদের ভেতর খুব সম্ভব আপনার বন্ধুটি আছেন, তাই না?'

হিন্দি ছবির মেগা স্টারটি যে যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং তাঁর চোখকান যে রীতিমতো খোলা তা বুঝতে অসুবিধা হয় না রেণুকার। একটু অবাক হয়েই বলেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু ধরলেন কী করে?'

অর্জুনকুমার উত্তর দেন না, সামান্য হাসেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর রেণুকা দূরমনস্কর মতো বলেন, 'গাঁয়ের এই লোকগুলোর জন্যে কিছু একটা করা দরকার।'

তাঁর বলার ভেতর এমন এক আন্তরিকতা রয়েছে যা অর্জুনকুমারের অস্তিত্বের কোনো অদৃশ্য গভীর স্তরে নাড়া দিয়ে য়ায়। তিনি বলেন, 'ঠিক। মানুষকে এই লেভেলে পড়ে থাকতে দেওয়া যায় না।'

সেই যে রেণুকার সঙ্গে গ্রামে ঘোরাঘুরি শুরু করেছিলেন অর্জুনকুমার, সেটা একেবারে নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। সকাল হলেই তিনি চনমন করতে থাকেন, কতক্ষণে স্নানটান সেরে টিলার নিচে নামবেন।

খোলা আকাশের তলায় ঝকমকে রোদের ভেতর দিয়ে রেণুকার সঙ্গে কাঁচা গেঁয়ো রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তাঁর গায়ের রং পুড়ে তামাটে হয়ে যাচ্ছে। একটানা ঘোরাঘুরির পরে দুপুরে অর্জুনকুমার যখন 'রাজপুত নিকেত'-এ ফিরে আসেন, তাঁর কপালে এক মিলিমিটার ধুলোর স্তর জমে থাকে। যে অর্জুনকুমার ত্বককে মসৃণ এবং দ্যুতিময় রাখার জন্য দামি ফোরেন স্কিন টনিক গায়ে মাখতেন কিংবা চুলকে সজীব আর চকচকে রাখতে হেয়ার টনিক, তিনি যেন অন্য কেউ। এখনকার এই অর্জুনকুমারের ধুলোমাখা রুক্ষ চুল অযত্নে কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে।

পায়ে হেঁটে এত ঘোরাঘুরির অভ্যাস কস্মিন কালেও ছিল না তাঁর। যখন দুপুরে ফিরে আসেন, খুবই ক্লান্তি বোধ করেন। শরীর মাঝে মাঝে বেশ খারাপ লাগে। ভাবেন, দু-একদিন বেরুবেন না কিন্তু পরদিন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তা আর মনে থাকে না। অলৌকিক কোনো ম্যাজিসিয়ানের মতো রেণুকা তাঁকে 'রাজপুত নিকেত' থেকে বার করে নিয়ে যান।

সেদিন একটা গ্রামের দিকে যেতে যেতে মারাত্মক এক দৃশ্য তাঁদের চোখে পড়ে।

কোনাকুনি ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে একটি কুড়ি বাইশ বছরের মেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো প্রাণের ভয়ে দৌড়ে আসছিল। তার পেছনে তাড়া করে আসছে পঞ্চাশ ষাট জনের এক হিংস্র জনতা। তারা মেয়েটিকে লক্ষ করে সমানে ঢিল ছুড়ছে আর জান্তব চিৎকার করছে, 'ভূচ্চরকা ছৌরীকো মার মারকে খতম কর দে—'

ক্রমশ মেয়েটা এবং জনতার মাঝখানের দূরত্ব কমে আসছে। মেয়েটা মুখে ফেনা তুলে আতঙ্কে বুক ফাটিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'বঁচাও, বঁচাও—'

লোকগুলোকে দেখে বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটাকে শেষ না করে ছাড়বে না। এমন দৃশ্য আগে আর কখনও দেখেননি অর্জুনকুমার। বিভ্রান্তের মতো তিনি, রোহিত এবং ফারুক দাঁড়িয়ে পড়েন। কী করবেন, কী করা উচিত, ভেবে উঠতে পারছেন না।

রেণুকা কিন্তু থামেননি। দুর্জয় সাহসে মাঠের ওপর দিয়ে সেই মারমুখি জনতার দিকে দু'হাত তুলে ছুটতে ছুটতে গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করতে থাকেন, 'রুখ যাও, রুখ যাও—'

হঠাৎ অর্জুনকুমার টের পান, তাঁর মধ্যেও প্রচণ্ড তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। নিজের অজান্তে ঊর্ধ্বশ্বাসে তিনিও রেণুকার পেছনে দৌড়তে থাকেন।

ফারুক এবং রোহিত ভয় পেয়ে যান। এমন উত্তেজনা অর্জুনকুমারের পক্ষে মারাত্মক। যেভাবে তিনি ছুটছেন, আরেকটা স্ট্রোক হয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। এই হতচ্ছাড়া এলাকায় তেমন কিছু ঘটে গেলে কোথায় পাওয়া যাবে হার্ট স্পেশালিস্ট আর নার্সিং হোম! এখান থেকে পাটনা হয়ে প্লেনে বোম্বাই পৌঁছুতে কম করে দু'দিন। তার ভেতর কী ঘটতে পারে, ভাবতেও সাহস হয় না রোহিতদের। অগত্যা অর্জুনকুমারকে ঠেকানোর জন্য রোহিতরাও ছুটতে থাকেন। তাঁরা রুদ্ধশ্বাসে পেছন থেকে ডাকতে থাকেন, 'অর্জুনজি, থামুন থামুন। ওভাবে দৌড়বেন না।'

কিন্তু কারো কথাই শুনতে পান না অর্জুনকুমার। ছুটতে ছুটতে তিনি রেণুকাকে ধরে ফেলেন।

ততক্ষণে সেই মেয়েটি তাঁদের কাছে চলে এসেছে। আতঙ্কে তার সমস্ত শরীর ভয়ানক কাঁপছে, চোখদু'টো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। ভয়ার্ত জড়ানো গলায় সে শুধু বলতে পারে, 'বঁচাইয়ে—'

টলে পড়ে যাচ্ছিল মেয়েটা, তাকে ধরে ফেলেন রেণুকা। বলেন, 'ভয় নেই, আমরা আছি। কেউ তোমার কিছু করতে পারবে না।'

উত্তেজিত ক্রুদ্ধ জনতা রেণুকাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। রেণুকাকে তারা চেনে, তিনিও ওদের প্রায় সবাইকে চেনেন। শিকার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় লোকগুলো খুশি হয়নি। কিন্তু জগনাথ মিশ্রের মেয়ে যাকে ভরসা দিয়েছে তার গায়ে আঁচড় কাটার সাহস তাদের নেই। নিরুপায় আক্রোশে তারা প্রায় পঁচিশ তিরিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে ফুঁসতে থাকে।

রেণুকা জনতার দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় ডাকেন, 'এখানে এসো।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন প্রবল কর্তৃত্ব আর দৃঢ়তা রয়েছে যে একজন দু'জন করে সবাই পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়ায়।

রেণুকা এবার ধমকে ওঠেন, 'এতগুলো পুরুষমানুষ তোমরা, এই মেয়েটাকে পাথর মারতে মারতে তাড়া করেছ কেন? বজ্জাত, কাওয়ারের দল! সবাইকে কোমরে দড়ি দিয়ে যাতে পুলিশ থানায় টানতে টানতে নিয়ে যায় তার ব্যবস্থা করছি।'

জনতা থানা-পুলিশের হুমকিতে ভীষণ ঘাবড়ে যায়। একটা বয়স্ক লোক, তার নাম ভানোয়ার, সেই মেয়েটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে ভয়ে ভয়ে বলে, 'ওহী কুঁদরী—ওহী কুঁদরী—'

রেণুকা জিজ্ঞেস করেন, 'কী করেছে কুঁদরী? কী কসুর ওর যে ঢিল মেরে খুন করতে যাচ্ছিলে?'

ভানোয়ার নিজেকে খানিকটা ধাতস্থ করে নিতে নিতে বলে, 'ওহী চুহী একগো শাঁখরেল। ওর জন্যে আমাদের গাঁও পুরা খতম হয়ে যাবে বহেনজি—'

রেণুকার কপাল কুঁচকে যায়। বলেন, 'কী রকম?'

ভানোয়ার এবার যা জানায় তা এইরকম। কুঁদরীর সঙ্গে তাদের গাঁওয়ের ভালরামের বিয়ে হয়েছিল কয়েক মাস আগে। তারপরই এই অঞ্চল ভয়াবহ খরায় ছারখার হয়ে যায়। খরার পর একে একে মানুষ মরতে থাকে। কুঁদরী তার মরদ, শ্বশুর, শাশুড়িকে তো আগেই খেয়েছে, এখন গাঁওয়ে মড়ক শুরু হয়ে গেছে। যেভাবে লোক মরছে, কিছুদিনের ভেতর গাঁও একেবারে উজাড় হয়ে যাবে। সবার ধারণা, কুঁদরীর মতো অপয়া মেয়ে গাঁওয়ে বহু হয়ে আসার জন্যই তাদের এই দুর্গতি। তাকে অনেক বার গাঁ ছেড়ে যেতে বলা হয়েছে, অনেকবার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোনো কথাই শোনেনি। কুঁদরী তার সসুরাল ছেড়ে যাবে না, ওখানেই মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। অগত্যা নিরুপায় হয়ে তাকে গাঁ থেকে বার করে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। পাথর টাথর না ছুড়লে সে গাঁ ছাড়ত না।

রেণুকা বলেন, 'যেভাবে ঢিল ছুড়ছিলে কুঁদরী তো মরে যেতে পারত।'

ভানোয়ার মাথা নেড়ে স্বীকার করে, 'হো সাকতা।'

এরপর রেণুকা বোঝাতে শুরু করেন, কুঁদরীর শ্বশুর স্বামী বা গাঁয়ের লোক যে মারা গেছে তার জন্য সে কোনোভাবেই দায়ী হতে পারে না। অসুখ বিসুখ বা অন্য কারণে তাদের মৃত্যু ঘটে থাকবে। কুঁদরীর প্রতি অবিচার না করে সহানুভূতি দেখানোই উচিত। বোঝানো সোঝানোর পরও কাজ হয় না। ভানোয়াররা অটল থাকে। তাদের বিশ্বাস, অপয়া কুঁদরী গ্রামে থাকলে সর্বনাশের যেটুকু বাকি আছে সেটুকুও ঘটে যাবে।

অগত্যা রেণুকা অর্জুনকুমারের দিকে ফিরে নিচু গলায় ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করেন, 'মেয়েটাকে নিয়ে কী করা যায় বলুন তো?' তাঁকে যথেষ্ট চিন্তিত দেখায়।

স্তম্ভিত অর্জুনকুমার চুপচাপ সব শুনে যাচ্ছিলেন। এমন ব্যাপার ঘটতে পারে, তাঁর কাছে একেবারেই অভাবনীয়। চোখের সামনে একটা মারাত্মক দুঃস্বপ্ন ঘটে যেতে দেখছেন যেন। বলেন, 'ওই গ্রামে ওর পক্ষে থাকা সেফ নয়। প্রতিটি মানুষ হোস্টাইল হয়ে গেছে।'

'হুঁ। ওখানে থাকলে ওর মৃত্যু ঠেকানো যাবে না। আমরা তো পাহারা দেবার জন্য ওদের গাঁয়ে গিয়ে চিরকাল থাকতে পারব না।'

'আমার মনে হয় মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই ভালো।'

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ ভেবে রেণুকা ভানোয়ারদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমরা গাঁয়ে ফিরে যাও।'

ভানোয়ার কুঁদরীকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আর ওহী ছোকরি?'

'ওর জন্যে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না।'

রেণুকা বলা সত্ত্বেও দুর্ভাবনা কাটে না ভানোয়ারের। সংশয়ের গলায় সে জানতে চায়, 'বহেনজি, কুঁদরী কি গাঁওয়ে ফিরবে?'

রেণুকার মুখ কঠোর দেখায়। দূরের গাঁয়ের দিকে সোজা আঙুল বাড়িয়ে তিনি ধারাল গলায় বলেন, 'যাও—'

ভানোয়ারের আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। পোকার মতো কুঁকড়ে গিয়ে গ্রামে ফিরে যেতে যেতে ভীরু চোখে পেছন ফিরে রেণুকাদের দিকে দু-একবার তাকায় শুধু।

রেণুকা এবার কুঁদরীকে বলেন, 'এসো আমাদের সঙ্গে।'

কুঁদরীর কোনো প্রশ্ন নেই। অবধারিত মৃত্যুর মুখ থেকে যাঁরা তাকে বাঁচিয়েছেন তাঁরা যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই সে যাবে। ঘোরের মধ্যে রেণুকাদের পেছন পেছন কুঁদরী হাঁটতে থাকে।

অর্জুনকুমার বলেন, 'ওকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছেন?'

রেণুকা বলেন, 'বুঝতে পারছি না। ভেবে দেখি।' একটু থেমে বলেন, 'আজ কিন্তু আর আপনাকে গাঁ দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি না। কুঁদরীর একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

অর্জুনকুমার বলেন, 'সার্টেনলি। গাঁ দেখার চেয়ে ওটা অনেক বেশি জরুরি।'

রেণুকা উত্তর দেন না।

অর্জুনকুমাব বলেন, 'কুসংস্কারের কথা কিছু পড়েছি, কিছু শুনেছিও। কিন্তু তার চেহারা যে এতটা সাঙ্ঘাতিক, এখানে না এলে জানতে পারতাম না।'

রেণুকা এবারও চুপ, নিঃশব্দে মৃদু হাসেন শুধু।

অর্জুনকুমার আর কিছু বলেন না।

রেণুকা কুঁদরীর কথা ভাবতে ভাবতে দূরমনস্কর মতো হাঁটছিলেন। হঠাৎ বলে ওঠেন, 'একটা উপকার করবেন?'

'কী?' উৎসুক চোখে সঙ্গিনীর দিকে তাকান অর্জুনকুমার।

'আমার মা ভীষণ গোঁড়া, সুপারস্টিসাস আর কুঁদরী আনটাচেবল। ওকে আচমকা বাড়ি নিয়ে গেলে দারুণ গোলমাল বেধে যাবে। আপনি যদি 'রাজপুত নিকেত'-এ ক'টা দিন ওর থাকার ব্যবস্থা করে দেন, খুব ভালো হয়। হোলির পর আমি যখন পাটনা যাব, ওকে সঙ্গে নেব। ওখানে কোনো মহিলা সমিতির ওয়ার্ক শপে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে।'

''রাজপুত নিকেত'-এ কোথায় থাকবে মেয়েটা?'

'নিচে কমপাউন্ডের ভেতর অনেক সার্ভেন্টস কোয়ার্টার্স ফাঁকা পড়ে আছে। তাব একটা ঘরে থাকতে পারবে।'

'ঠিক আছে। আপনার বাবুজিকে এ ব্যাপারে রিকোয়েস্ট করলে, মনে হয়, আপত্তি করবেন না।'

রেণুকা হাসেন। হালকা মজার গলায় বলেন, 'আপনার মতো মেগা স্টারের রিকোয়েস্ট রাখবে না, এমন কেউ হোল ইন্ডিয়ায় আছে নাকি?'

অর্জুনকুমার বিব্রত মুখে বলেন, 'কী যে বলেন রেণুকাজি! আমি একজন সামান্য কলাকার।'

আরও কিছুক্ষণ চলার পর রোহিত কানের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে বলেন, 'অর্জুনজি তখন আপনার ওভাবে দৌড়ে যাওয়া উচিত হয়নি। ইট কুড বী ডেঞ্জারাস। ডোন্ট ফরগেট য়ু আর আ হার্ট পেশেন্ট। আপনার কিছু হলে আমাদের কেউ ক্ষমা করবে না।'

একটু বিব্রতভাবে অর্জুনকুমার বলেন, 'না না, আই অ্যাম পারফেক্টলি অল রাইট। আমার কিছু হবে না।'

'আপনার কিছু না হোক, চিরকাল আপনি সুস্থ থাকুন—এটাই আমরা চাই। কিন্তু যেভাবে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছেন তাতে সুস্থ থাকার গ্যারান্টি কি দিতে পারেন?'

অর্জুনকুমার বুঝতে পারেন, রোহিতের এই উদ্বেগটুকু যথেষ্টই আন্তরিক। এটা ঠিক, তাঁর সুস্থ থাকার সঙ্গে ওঁদের স্বার্থ জড়িয়ে আছে। তবু এই রোহিত, ফারুক বা সঞ্জীব তাঁকে সত্যি সত্যিই ভালোবাসেন। উত্তর না দিয়ে তিনি একটু হাসেন শুধু।

রোহিত বলেন. 'তা ছাড়া—'

হাঁটতে হাঁটতে অর্জুনকুমার বিখ্যাত কাহিনিকারটির দিকে তাকান, জিজ্ঞেস করেন, 'তা ছাড়া কী?'

'আপনি কিন্তু আর অ্যালুফ থাকতে পারছেন না অর্জুনজি।' রোহিত বলতে থাকেন, 'আপনার নানারকম রি-আকশন বুঝিয়ে দিচ্ছে, এখানকার ব্যাপারে আপনি ক্রমশ ইনভলভড হয়ে পড়ছেন।'

অর্জুনকুমার অস্বস্তি বোধ করেন। ধীরে ধীরে বলেন, 'কী করব, মেয়েটাকে তো আর রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে যাওয়া যায় না। ক'দিনই বা থাকবে? শুনলেন তো, হোলির পরই রেণুকাজি ওকে পাটনা নিয়ে যাবেন।'

'রাজপুত নিকেত'-এ ফিরে জগনাথকে কুঁদরীর সম্পর্কে অনুরোধ করলে তিনি কতটা খুশি হন মুখচোখ দেখে বোঝা যায় না, তবে রাজি হন। সেই সঙ্গে সবিনয়ে বলেন, 'অর্জুনজি ওকে এনেছেন, ঠিক আছে। কিন্তু আর কাউকে দয়া করে আনবেন না। এখানকার হর আদমির এরকম হাজারো প্রবলেম রয়েছে। সবাইকে সাহারা দিলে 'রাজপুত নিকেত' বিলকুল ধরমশালা হয়ে যাবে।'

দশ

কুঁদরীকে নিয়ে আসার পর দিন দুই কেটে যায়। এই দু'দিনে অর্জুনকুমারের দৈনন্দিন রুটিনে কোনোরকম হেরফের ঘটেনি। একই পদ্ধতিতে সকাল দুপুর বিকেল রাত্তির কেটে যাচ্ছে।

আজ রেণুকার সঙ্গে দু-তিনটে গ্রাম দেখার পর ফিরতে বেলা হেলে যায়, রোদের গনগনে আঁচ জুড়িয়ে আসতে থাকে।

একটানা এতটা ঘোরাঘুরি আগে আর করেননি অর্জুনকুমার। তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছিল। বুকের ভেতর বেশ একটা অস্বস্তি, ঘাড়ের কাছটা চিন চিন করছে। তিনি টের পাচ্ছেন, রক্তচাপটা হঠাৎ বেড়ে গেছে।

ক'দিন আগে শরীর বেশ খারাপ হয়েছিল অর্জুনকুমারের। কিন্তু আজকের কষ্টটা তার থেকে অনেক বেশি। একটা ই সি জি করিয়ে নিতে পারলে ভালো হত। কিন্তু এখানে তার কোনো ব্যবস্থা নেই। ঘুণাক্ষরে যদি বুকের চাপটার কথা রোহিতেরা জানতে পারেন তাঁকে টেনে হিঁচড়ে বোম্বাই নিয়ে যাবেন। অর্জুনকুমার মনে মনে ঠিক করে ফেলেন. 'রাজপুত নিকেত'-এ ফিরেই প্রেসার আর হার্টের ট্যাবলেট খেয়ে নেবেন। তেমন বুঝলে দু-একদিন গ্রামে গ্রামে ঘোরাঘুরিটা বন্ধ রাখবেন।

অর্জুনকুমার আর রেণুকার আট দশ গজ পেছনে ছিলেন রোহিত এবং ফারুক। তাঁদের খুবই উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছে। চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে তাঁরা কথা বলছিলেন।

ফারুক বলে, 'অর্জুনজি ভীষণ অনিয়ম করছেন। কারো কথা শুনছেন না। ভাবছি, হারবার্টগঞ্জে গিয়ে রাধিকা ভাবীজিকে টেলিগ্রাম করব, উনি যেন চলে আসেন। হঠাৎ কিছু হয়ে গেলে আপশোশের শেষ থাকবে না।'

রোহিত বলেন, 'ঠিক বলেছেন ফারুকভাই। আর দেরি করাটা খুব রিস্কি হয়ে যাবে। একটা কিছু বাহানা করে কাল কী পরশু অর্জুনজির সঙ্গে ভিলেজে না গিয়ে হারবার্টগঞ্জে চলে যান।'

'তাই যাব।'

'অর্জুনজি যেন কোনোভাবেই টের না পান। সেদিন রেলের টাইম-টেবল দেখছিলাম। ধরমপুরা থেকে একটা ট্রেন সকালে ছাড়ে, ওটা ধরতে পারলে বিকেলের ভেতর ফিরতে পারবেন। অবশ্য লাঞ্চ টাইমে আপনাকে দেখতে না পেলে অর্জুনজি চিন্তা করবেন। আমরা কিছু একটা বলে দেবো।'

'ফিরে এসে আমিও এমন জুতসই জবাব দেবো, অর্জুনজি সন্দেহ করতে পারবেন না।'

ওদিকে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে চোখের কোণ দিয়ে অর্জুনকুমারকে বারকয়েক লক্ষ করেন রেণুকা। কিছু বলতে চান, অথচ বলতে পারছেন না। অনেকক্ষণ পর দ্বিধান্বিতভাবে নিচু গলায় ডাকেন, 'অর্জুনজি—'

অন্যমনস্কর মতো হাঁটছিলেন অর্জুনকুমার। মুখটা ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ।' বলে চুপ করে যান রেণুকা। এখনও বুঝিবা তিনি মনস্থির করে উঠতে পারছেন না।

উদ্‌গ্রীব অর্জুনকুমার স্নায়ু টান টান করে অপেক্ষা করতে থাকেন।

কিছুক্ষণ ভেবে মনে মনে বক্তব্যটা গুছিয়ে নিয়ে রেণুকা বলেন, 'আপনার সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন একটা ইঙ্গিত রয়েছে অর্জুনকুমারকে যা সতর্ক করে দেয়। ব্যগ্র গলায় তিনি বলেন, 'কী কথা?'

রেণুকা জিজ্ঞেস করেন, 'রাতে আপনি ক'টায় ডিনার খান?'

এরকম একটা প্রশ্ন আশা করেননি অর্জুনকুমার। কিছুটা বিমূঢ়ের মতো বলেন, 'সাড়ে আটটায়।'

রেণুকা বলেন, 'আজ রাতে ডিনারের পর খানিকটা সময় দিতে হবে।'

অর্জুনকুমার ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করেন। কেননা, ডিনার খেয়ে তিনি বেশিক্ষণ দেরি করেন না, সাড়ে ন'টার মধ্যেই শুয়ে পড়েন। মনে যা-ই থাক, হেসে হেসে হালকা গলায় বলেন, 'খানিকটা কেন, যতক্ষণ ইচ্ছে সময় নিতে পারেন। যতদিন এখানে আছি, আমার সমস্ত সময় আপনার জন্যে সংরক্ষিত।'

রেণুকাও হাসেন। তারপর বলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ। এবার কাজের কথাটা শুনুন—'

'বলুন।'

'রোজ সকালে আপনার জন্যে যেখানে দাঁড়াই, আজ রাত দশটায় সেখানে অপেক্ষা কবব। দয়া করে আপনাকে ওখানে আসতে হবে। একা আসবেন, সঙ্গে কাউকে আনা চলবে না। আর এই ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে। ইট'স আ টপ সিক্রেট। প্লিজ না বলবেন না।'

অর্জুনকুমার চকিত হয়ে ওঠেন। স্ট্রোকের ধাক্কা সামলে উঠে ছ'মাস ধরে যে কঠোর নিয়ম এবং শৃঙ্খলার মধ্যে তাঁকে জীবনযাপন করতে হচ্ছে এখানে আসার পর তার ছোটোখাটো দু-একটা ব্যতিক্রম ঘটলেও কোনোদিনই 'রাজপুত নিকেত' থেকে একবারের বেশি বাইরে বেরোননি। দোতলা থেকে নিচে নেমে আবার উঁচু সিঁড়ি ভাঙার ঝুঁকি নিতে তাঁর সাহস হয় না। আজ দশটায় সবার চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে গেলেও ফিরে এসে ফের তাঁকে সিঁড়ি বাইতে হবে। একদিনে দু দু'বার খাড়া সিঁড়ি বাওয়ার পরিশ্রম এবং ধকল তাঁর হার্টের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। দিনের বেলা কখনো সখনো অনিয়ম হলেও রাত্তিরটা কড়া নিয়ম মেনেই চলেন অর্জুনকুমার।

শারীরিক দিক বাদ দিলেও আরও দু'টো ব্যাপার তাঁকে উৎকণ্ঠিত করে তোলে। প্রথমত, দশটায় বেরুলে কখন ফিরতে পারবেন, কে জানে। দ্বিতীয়ত, কী উদ্দেশ্যে রেণুকা তাঁকে অত রাতে একা দেখা করতে বলছেন? গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের একমাত্র মেগা স্টার তিনি, তাঁকে পাবার জন্য হাজার হাজার সেক্সি যুবতী একেবারে উন্মাদ হয়ে আছে। তিনি যদি একটা আঙুল তুলে সামান্য ইশারা করেন, পঙ্গপালের মতো ভাদ্র মাসের এই কুত্তীরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু রেণুকাকে কখনও ওদের মতো ভাবেননি অর্জুনকুমার। তার কাছে রেণুকার অন্য ইমেজ, সোশাল ওয়ার্কার, অধ্যাপিকা এই মেয়েটিকে তিনি ধরমপুরা স্টেশনে দেখার পর থেকে শ্রদ্ধা করে আসছেন। তবে কি বাইরের দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ব, সুরুচি এবং সংযম—এ সব তাঁর ছদ্মবেশ? তবে কি রেণুকার মধ্যেও যৌনতাড়িত, অতি সাধারণ এবং মোহগ্রস্ত একটি মেয়ে রয়েছে? অর্জুনকুমারকে হাতের কাছে পেয়ে সে হয়তো ছেড়ে দিতে রাজি নয়।

একটু আগে অর্জুনকুমার যা ভাবছিলেন তা খানিকটা ঘুরিয়ে ভদ্রতার পালিশ লাগিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে।'

রেণুকার দূরভেদী চোখ বোধহয় বুকের গভীর তলদেশ পর্যন্ত দেখতে পায়। তিনি বলেন, 'এত রাতে কেন আপনাকে একা দেখা করতে বলছি, এটাই জানতে চাইছেন তো?'

অর্জুনকুমার হকচকিয়ে যান, 'হ্যাঁ, মানে—' একটু থেমে আবার বলেন, 'আপনি হয়তো শুনেছেন, আমার একটা হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকা বারণ।'

'শুনেছি। কিন্তু আজ আপনাকে আসতেই হবে। উচিত নয়, তবু ধরুন আপনার ওপর কিছুটা জোরই করছি।'

রেণুকা যে ধরনের মেয়ে, অন্তত এতদিন তাঁকে যেভাবে দেখে আসছেন অর্জুনকুমার, তাঁর মুখে এ জাতীয় কথা মানায় না। এটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। কিছুক্ষণ ভাবেন অর্জুনকুমার। তারপর বলেন, 'আপনার সঙ্গে কি আমাকে কোথাও যেতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'খুব কাছেই। একটা গাঁয়ে যাব আমরা।'

'কখন ফিরতে পারব?'

'ঘণ্টা দেড় দুই লাগবে। বারোটার ভেতর ফিরতে পারবেন, আশা করি।'

অর্জুনকুমার বলেন, 'আমার আরও কিছু জানার আছে।'

রেণুকা বলেন, 'বেশ তো।'

'অত রাতে কোন গাঁয়ে আর কী কারণে নিয়ে যেতে চাইছেন?'

'সেটা এখন বলছি না। আগে থেকে জানাজানি হয়ে গেলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। তবে এটুকু বলতে পারি, ভারতবর্ষের গ্রামকে ভালো করে বুঝতে হলে আজ রাতে আপনাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে।' বলে একটু থেমেই পরক্ষণে রেণুকা শুরু করে দেন, 'আপনি গাঁ নিয়ে যে রিয়ালিস্টিক ছবির কথা ভেবেছেন, আজ না গেলে তা কিছুতেই ঠিকমতো করতে পারবেন না, অনেক খুঁত থেকে যাবে।'

অর্জুনকুমার সঙ্কোচে কুঁকড়ে যান। কিছুক্ষণ আগে রেণুকা সম্পর্কে কী জঘন্য সব কথাই না ভেবেছিলেন। আসলে পারভার্টেড সেক্সি ছুকরিদের দেখে দেখে তাঁর চিন্তার পদ্ধতিটাই নোংরা হয়ে গেছে। রেণুকার মুখের দিকে তিনি তাকাতে পারছিলেন না।

রেণুকা এবার বলে ওঠেন, 'তা ছাড়া—'

অর্জুনকুমার বলেন, 'কী?'

'আজ আপনার এমন কিছু অভিজ্ঞতা হবে যাতে গাঁ সম্বন্ধে ধ্যানধারণা বদলেও যেতে পারে।'

'রাজপুত নিকেত'-এ ফিরে আসার পর দারুণ অস্থিরতার মধ্যে সময় কেটে যাচ্ছে অর্জুনকুমারের। দেরিতে ফেরার কারণে লাঞ্চটাও দেরিতে হয়েছে। তবে ডিনার খেয়েছেন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায়।

ডিনারের পর কিছুক্ষণ তাঁর ঘরে রোহিতরা রোজ আড্ডা দেন। আজ তাঁদের বসতে দেননি। রোহিতরা যে যাঁর ঘরে ফিরে গেছেন।

তারপর থেকে চুপচাপ একটা সোফায় বসে আছেন অর্জুনকুমার। যদিও দশটায় রেণুকার সঙ্গে গাঁয়ে যাবেন বলে রাজি হয়েছিলেন কিন্তু এই মুহূর্তে ভেবে উঠতে পারছেন না, যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা। প্রচণ্ড টেনশন তাঁর মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে।

রাত এর মধ্যেই নিঝুম হয়ে গেছে। 'রাজপুত নিকেত'-এর আলোগুলি একে একে নিভে যেতে শুরু করেছে। চারিদিকে কোন পাতাল থেকে উঠে আসছে ঝিঁঝিদের একটানা বিলাপ। কোথায় কোন দূরের গ্রামে থেকে থেকে কুকুর ডেকে উঠছে।

একসময় কোনো যান্ত্রিক নিয়মে অর্জুনকুমারের চোখ সামনের ওয়াল ক্লকটার দিকে চলে যায়। দশটা বাজতে বারো। আচমকা এতক্ষণের দ্বিধান্বিত ভাবটা কাটিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ান। তারপর আলো নিভিয়ে অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে বাইরের প্যাসেজে বেরিয়ে আসেন। প্যাসেজের শেষ মাথায় সঞ্জীবের

ঘরে আলো জ্বলছে। খোলা দরজা দিয়ে ওঁদের তিনজনকেই দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ ওখানে আজ ডিনারের পরবর্তী আসরটি জমেছে।

সঞ্জীবদের অস্পষ্ট জড়ানো কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। কয়েক বোতল হুইস্কি নিশ্চয়ই এর ভেতর শেষ হয়ে গেছে। মদ্য নামক বস্তুটি সম্পর্কে ওঁদের এমনই তীব্র মোহ যে, দিন বা রাতের কোনো সময়েই এ ব্যাপারে আপত্তি থাকে না। সকাল দুপুর মধ্যরাত—যখন ইচ্ছা এঁরা ড্রিংক সেসান বসিয়ে দিতে পারেন।

প্যাসেজটা অন্ধকার। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য যে নৌকরটি অর্জুনকুমারেব সেবার উদ্দেশ্যে মজুত থাকে, একধারে পড়ে পড়ে সে ঘুমোচ্ছে।

সঞ্জীবদের দিকে চোখ রেখে অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গিতে পা টিপে টিপে সিঁড়িব মুখে চলে আসেন অর্জুনকুমার। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চারিদিক ভালো করে দেখে নেন। নাঃ, কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যান।

একতলাতেও কাউকে চোখে পড়ে না। এ বাড়িটা ন'টা সাড়ে ন'টার ভেতর ঘুমিয়ে পড়ে। সেটা একদিক থেকে অর্জুনকুমারের পক্ষে বাঁচোয়া। নিঃশব্দে তিনি বাগানে নেমে যান কিন্তু নির্বিঘ্নে এতটা যাবার পর গেটের সামনে এসে থমকে যেতে হয়। গেটের গা ঘেঁষে যে কাঠের ছাউনিটা রয়েছে সেটার ভেতর থেকে দারোয়ানের গম্ভীর বাজখাঁই গলা ভেসে আসে, 'কৌন রে? এত্তে রাতমে?' বলতে বলতে সে বেরিয়ে এল। তার গলায় টোটার মালা, হাতে রাইফেল।

অর্জুনকুমার হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জানতেন না, সারা রাত শিরদাঁড়া টান করে দারোয়ানেরা পালা করে 'রাজপুত নিকেত' পাহারা দেয়। তিনি আস্তে করে বলেন, 'আমি।'

গেটের কাছে খুব বেশি আলো টালো না থাকলেও দারোয়ান অর্জুনকুমারকে চিনে ফেলে। রীতিমতো অবাক হয়েই বলে, 'আপ! কঁহা যাতে হ্যায় হুজৌর?'

অর্জুনকুমার মনে মনে ঠিক করে ফেলেন, পাহারাদারটির মুখ বন্ধ করতে হবে। নইলে এত রাতে তাঁর বাইরে বেরুবার খবর সে সবাইকে জানিয়ে দেবে। পকেট থেকে একশ টাকার একটা নোট বার করে তাকে দিতে দিতে অর্জুনকুমার বলেন, 'জরুরি কাজে আমাকে বেরুতে হচ্ছে। ঘণ্টাখানেক ঘণ্টা দেড়েকের ভেতর ফিরে আসব। এ কথা কাউকে বলবেন না।'

একশ টাকার মহিমা আছে। একসঙ্গে এতগুলো টাকা কেউ কখনও দারোয়ানটাকে বখশিস দেয়নি। গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে প্রথমে ফৌজি কায়দায় লম্বা স্যালুট লাগায় সে। তারপর পরম যত্নে দ্রুত নোটটা পকেটে পুরে জিভ কেটে বলে, 'নেহী নেহী, হরগিজ নেহী। আমার গলার নলিয়া কেটে ফেললেও এ ব্যাপারে একটা আওয়াজ বেরুবে না। লেকেন সরকার—'

'কী?'

গলা নামিয়ে দারোয়ান বলে, 'আপনার মতো এত্তে বড়ে ফিলামকা হিরো একা একা বেরুচ্ছেন। যদি বিপদ হয়ে যায়?' তাকে উৎকণ্ঠিত দেখায়।

অর্জুনকুমার চমকে ওঠেন। বেশ কয়েকদিন এখানে আছেন। 'রাজপুত নিকেত'-এর নৌকর নৌকরনী থেকে শুরু করে মালি-দারোয়ান পর্যন্ত কেউ হাবেভাবে টের পেতে দেয়নি—তারা তাঁর আসল পরিচয়টা জানে। কিন্তু দারোয়ানের কথায় বোঝা যাচ্ছে গোড়া থেকেই ওরা তাঁকে চিনত। হয়ত জগনাথের কড়া হুকুমে না চেনার ভান করে থাকত। এখন নিজের অজান্তে বেফাঁস বলে ফেলেছে। দেখা যাচ্ছে, রমেশ আদবানি ঠিক বলেননি, সিনেমা উত্তর বিহারের এই দুনিয়াছাড়া এলাকাতেও চোরা বানের মতো ঢুকে পড়েছে। অর্জুনকুমার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, 'না না, কিচ্ছু হবে না। চিন্তা নেই। গেটটা খুলে দিন।'

দারোয়ান গেট খুলে দিতে দিতে বিপন্ন মুখে বলে, 'সরকার, আপনি যতক্ষণ না ফিরছেন, আমাব বুকের তড়পনা বন্ধ হয়ে থাকবে।'

অর্জুনকুমার একটু হাসেন শুধু। তারপর গেট পেরিয়ে টিলার নিচে আসতেই দেখতে পান, সঠিক জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছেন রেণুকা। কাছাকাছি আসতে রেণুকা বলেন, 'চলুন—'

নিঃশব্দে দু'জনে পাশাপাশি চলতে থাকেন। অনিবার্য নিয়তির মতো রেণুকা তাঁকে কোথায় নিয়ে চলেছেন, জানার জন্য অসহ্য কৌতূহল হচ্ছিল অর্জুনকুমারের। কিন্তু তিনি জানেন, এ সম্পর্কে কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দেবেন না রেণুকা, দুপুরেও দেননি।

মিনিট পঁচিশেক হাঁটার পর উত্তর-পশ্চিম দিকে যে গ্রামটিতে রেণুকা অর্জুনকুমারকে নিয়ে যান, আগে আর সেখানে তিনি আসেননি। জায়গাটার নাম ধামতালোয়া।

রাত ঝিম ঝিম করছে। গোটা গাঁ অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। এই মুহূর্তে কামারপাখি আর ঝিঁঝিরা ছাড়া ভারতবর্ষের এই প্রান্তে বুঝিবা আর কেউ জেগে নেই।

কথাটা ঠিক নয়, ধামতালোয়ার বাইরের দিকে একটা বড় আকারের ধসে-পড়া পরিত্যক্ত চালায় তিন চারটে কালি-পড়া লণ্ঠন জ্বলছে আর সেগুলোকে ঘিরে কয়েকটি যুবক বসে আছে, তদের সামনে বেশ কিছু দেহাতি। সব মিলিয়ে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন।

যুবকদের মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি, মাথায় এলোমেলো জট-পাকানো চুল। শক্ত চোয়াল তাদের, পরনে নোংরা জিনস বা মোটা কাপড়ের ট্রাউজার্স। তাদের চেহারা দেখে টের পাওয়া যায়, বহুদিন ঘোর অনিয়মের মধ্যে কাটছে, কোনো কোনো দিন ভালো করে খাওয়া জোটে না। তা সত্ত্বেও তাদের চোখেমুখে এক ধরনের দৃঢ়তা ফুটে আছে।

একজনও কথা বলছে না। সবাই নিঃশব্দে কারো জন্য প্রতীক্ষা করছে।

রেণুকার সঙ্গে অর্জুনকুমার চালায় এসে ঢুকতেই দারুণ চাঞ্চল্য দেখা যায়। সেই যুবকেরা এবং দেহাতির দলটা দ্রুত উঠে দাঁড়ায়।

এই জনতার মধ্যে সবচেয়ে ঝকঝকে এবং ধারাল চেহারা যার, হাতজোড় করে সে বলে, 'নমস্কার। আসুন, আসুন। আপনার জন্যে আমরা ওয়েট করছি।' একধারে একটা নিচু চারপায়া রয়েছে। সেটা দেখিয়ে বলে, 'অনুগ্রহ করে আপনারা ওখানে বসুন।'

যুবকটি যে অত্যন্ত ভদ্র, তার মার্জিত কথা বলার ধরনে বোঝা যায়।

এখানে চারপায়া শুধু একটাই। নিচে অবশ্য চট বিছানো আছে। অর্থাৎ অর্জুনকুমার এবং হয়তো রেণুকার জন্য চারপায়াটা সংরক্ষিত। বাকি সবাই চটের ওপর বসবে।

বিব্রতভাবে অর্জুনকুমার বলেন, 'আমি নিচেই বসছি।'

'না না, তা হয় না।' যুবকটি বলে, 'আপনি আমাদের গেস্ট, প্লিজ বসুন। রেণু, তুমিও বোসো।'

একরকম জোরজার করেই যুবকটি অর্জুনকুমার আর রেণুকাকে চারপায়ায় বসায়। তারপর নিজেরা মাটির মেঝেতে চটের ওপর বসে।

উঁচুতে বসে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলেন অর্জুনকুমার। লণ্ঠনের ধোঁয়াটে আলোয় দেখা যায়, সবাই পলকহীন তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

যুবকটি বলে, 'রেণু কি আমার পরিচয় আপনাকে দিয়েছে?'

অর্জুনকুমার বলেন, 'না। তবে দু-তিন দিন আগে রঘুবীর সিং নামে একজনের সম্বন্ধে বলেছিলেন। আমার ধারণা এখন আমি তাঁর সঙ্গেই কথা বলছি।'

যুবকটি হেসে হেসে বলে, 'কারেক্ট। আমি একজন ইউনিভার্সিটির ড্রপ-আউট, কিছুদিন হল পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট।'

অর্জুনকুমারও হাসেন। হালকা গলায় বলেন, 'রেণুকাজির কাছে শুনেছি আপনি ল্যান্ডেড অ্যারিসটোক্র্যাট ফ্যামিলির ছেলে। পীপলের জন্যে নিজেকে ডেডিকেট করেছেন। দ্যাটস আ গ্রেট থিং। মানুষের জন্যে কিছু করতে পারাটা বিরাট ব্যাপার।'

রঘুবীর উত্তর দেয় না। কিছুক্ষণ বাদে অন্যমনস্কর মতো বলে, 'কিছুই এখন পর্যন্ত করে উঠতে পারিনি। এই অঞ্চলের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চেষ্টা করছি শুধু। বাট ইট'স ভেরি, ভেরি ডিফিকাল্ট।'

'ডিফিকাল্ট কেন?'

'কত রকম ভেস্টেড ইন্টারেস্ট শত শত বছর ধরে এখানে শেকড় গেড়ে আছে, তার ঠিক নেই। সেই সব শেকড় উপড়ে ফেলা কি দু-এক বছরে সম্ভব, না বিশ পঞ্চাশ জনের কাজ?' একটু থেমে আবার রঘুবীর বলে, 'তবু কোনো একটা জায়গা থেকে কাউকে শুরু তো করতে হবে। সেই শুরুটা করতে পেরেছি। তার বেশি কিছু নয়।'

একটু চুপচাপ।

তারপর অর্জুনকুমার বলেন, 'রেণুকাজি আপনার নাম না করে এখানে আমাকে ধরে নিয়ে এসেছেন। আমার ধারণা, আপনি আমাকে কিছু বলতে চান।'

রঘুবীর বলে, 'হ্যাঁ।'

কিছু না বলে উন্মুখ তাকিয়ে থাকেন অর্জুনকুমার।

রঘুবীর বলে, 'কীভাবে আরম্ভ করব, বুঝতে পারছি না।' ভুরু কুঁচকে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে কী ভেবে নেয় সে। তারপর বলে, 'শুনেছি, ব্যাকওয়ার্ড রুরাল ইন্ডিয়া সম্পর্কে অন-দা-স্পট স্টাডির জন্যে আপনি ক'দিন ধরে এখানকার গাঁগুলোতে ঘুরছেন। নিজের চোখেও দু-একদিন দেখেছি। এখানকার অভিজ্ঞতা দিয়ে একটা রিয়ালিস্টিক ছবি করার নাকি আপনার ইচ্ছে। ভুখা নিরক্ষর এক্সপ্লয়টেড ভারতবর্ষকে সিনেমার পর্দায় যদি দেখাতে পারেন, দারুণ একটা কাজ হয়। ইট উইল বী আ রিয়াল সারভিস টু দা নেশন। গাঁয়ের কোন্ ব্যাপারগুলো আপনাকে বেশি করে নাড়া দিয়েছে?'

অর্জুনকুমার চরম দারিদ্র, কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ, নিরক্ষরতা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে বলেন।

রঘুবীর একটু হতাশভাবেই যেন বলে ওঠে, 'ব্যস, এটুকুই শুধু? আপনার চোখে আর কিছু পড়ল না?'

অর্জুনকুমার বলেন, 'আর কী পড়বে?'

করাতের মতো শাণিত গলায় রঘুবীর বলে, 'এক্সপ্লয়টেশান। শোষণ—শোষণ—'

লণ্ঠনের আলোয় রঘুবীরকে ইস্পাতের ফলার মতো দেখায়। অর্জুনকুমার তার দিকে তাকিয়ে চকিত হয়ে ওঠেন।

রঘুবীর এবার বলে, 'আপনি তো মুনেশ্বর সিংয়ের প্যালেসে আছেন। গাঁয়ের লোকেরা কীভাবে কোথায় ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে, তাও নিজের চোখে দেখছেন। দু'টোর মধ্যে তফাত কতটা? একটা নর্থ পোল হলে আরেকটা নিশ্চয়ই সাউথ পোল। ফোর জেনারেশানস মুনেশ্বর সিংরা এখানকার লোকেদের রক্ত শুষে রাজা-মহারাজার স্টাইলে জীবন কাটাচ্ছে। বাট হোয়াট ইজ দা প্লাইট অভ দা পীপল? হরিবল।'

রঘুবীর কথাগুলোর মধ্যে অনিবার্য একটা সংকেত রয়েছে। অর্জুনকুমারের স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে যায়। তিনি কোনো উত্তর দেন না।

রঘুবীরের ওপর হঠাৎ প্রচণ্ড অস্থিরতা যেন ভর করে। জোরে হাত নাড়তে নাড়তে সে বলে, 'এই ইনহিউম্যান সিস্টেম চলতে পারে না। এটা বন্ধ করতেই হবে।'

মুনেশ্বরের প্রসঙ্গ আসায় অস্বস্তি বোধ করছিলেন অর্জুনকুমার। মুনেশ্বর যত বড় অত্যাচারী আর এক্সপ্লয়টারই হন না, তিনি তাঁর অতিথি। যিনি অর্জুনকুমারের জন্য এত অঢেল আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, হুট করে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলতে অসুবিধা হয়।

রঘুবীর থামেনি, 'আপনি কি জানেন, এখানকার যত জমিটমি দেখছেন তার বেশির ভাগটাই মুনেশ্বর সিংরা সাধারণ গরিব মানুষদের কাছ থেকে নানা পদ্ধতিতে ছিনিয়ে নিয়েছে?

এ খবরটা আগেই পেয়েছিলেন অর্জুনকুমার। আবছা গলায় বলেন, 'হ্যাঁ, সেদিন কে যেন বলেছিল। বোধ হয় রেণুকাজিই—'

'আমরা এই সব ল্যান্ড রিয়াল মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিতে চাই। কিন্তু সহজে তো দেওয়া যাবে না। মুনেশ্বরদের টাকা আছে। পুলিশ, অ্যাডমিনিস্ট্রেশান, পলিটিক্যাল পার্টি—সব ওরা কিনে রেখেছে।

তা ছাড়া ওদের বন্দুক আছে, ভূমিসেনা আছে। মুনেশ্বরদের এগেনস্টে না লড়ে এক 'ধুর' জমিও আদায় করা যাবে না।' কথাগুলো বলতে বলতে রঘুবীর চোখ চক চক করতে থাকে।

নিজের অজান্তেই অর্জুনকুমার বলে ফেলেন, 'আপনারা কি আর্মস নিয়ে লড়াইয়ের কথা ভাবছেন?'

'বন্দুকের সঙ্গে খালি হাতে লড়া যায় কি?' রঘুবীর হাসতে থাকে।

এই শান্ত, উত্তেজনাহীন গ্রামাঞ্চলে বন্দুকের লড়াই শুরু হলে, এখানকার চেহারাটা কেমন ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে ভাবতে চেষ্টা করেন অর্জুনকুমার। পরক্ষণে চিন্তাটাকে মাথা থেকে বার করে দিয়ে বলেন, 'একটা ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না।'

'কী?'

'আপনারা এত রাতে কেন আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন?'

'আপনার ছবিতে শুধু পভার্টি, সুপারস্টিশান বা চাইল্ড ম্যারেজ ট্যারেজ থাক—এ টুকুই চাই না। ইন্ডিয়ার গ্রামগুলোতে সশস্ত্র লড়াইয়ের প্রিপারেশান চলছে, ছবিতে এটা থাকা খুব জরুরি। যেভাবে হোক সোশাল প্যাটার্ন আমরা পালটে দিতে চাই।'

এমন ফায়ার ব্রান্ড টাইপের তেজী যুবক আগে আর কখনও দেখেননি অর্জুনকুমার। অর্থবান, ল্যান্ডেড অ্যারিস্টোক্রাট বংশের ছেলে হয়েও নিজেকে কাদের জন্য সঁপে দিয়েছে, ভাবতে গিয়ে তিনি অবাক হয়ে যান। আদর্শবাদ, সততা, মূল্যবোধ এবং বহুজনহিতায় স্বার্থত্যাগ—এই ব্যপারগুলোকে ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে যখন স্বাধীন ভারতবর্ষের বাউন্ডারি পার করে দেওয়া হচ্ছে সেই সময় রঘুবীরের মতো যুবককে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না।

রঘুবীর বলে যাচ্ছিল, 'আপনার মতো মেগা স্টারের ছবিতে জমির জন্যে আর্মড লড়াইয়ের দৃশ্য থাকলে তার ইমপর্টান্স যে কতটা হবে, বলে বোঝাতে পারব না। লক্ষ লক্ষ মানুষ তা দেখবে, গ্রাম সম্পর্কে সচেতন হবে। আমি চাই, বহুদূরের গাঁগুলো সম্বন্ধে শহরের মানুষের অ্যাওয়ারনেস বাড়ুক। আপনাকে আমরা এভাবে কাজে লাগাতে চাই।'

রঘুবীরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেক কাল আগে খবরের কাগজে পড়া 'ভূদান যজ্ঞ'-এর কিছু কিছু ঘটনা হঠাৎ মনে পড়ে যায় অর্জুনকুমারের। মানুষ হিসেবে তিনি স্থিতাবস্থায় বিশ্বাসী। যা চলছে যেভাবে চলছে তেমনটি ঠিক সেভাবেই চলুক, তিনি তা-ই চান। এখানে সশস্ত্র আন্দোলন হলে গাঁয়ের অতি নিরীহ অতি শান্ত মানুষজন চৌধারিদের বন্দুকের সামনে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে? রক্তে ভেসে যাবে এখানকার মাঠঘাট, শস্যক্ষেত্র। তার চেয়ে অন্য একটা পদ্ধতি যখন হাতের কাছেই আছে সেটা কাজে লাগাতে পারলে উত্তেজনা, টেনশন, রক্তপাত হয়ত বন্ধ হবে।

অর্জুনকুমার বলেন, 'অন্যভাবেও তো জমিজমা ফেরত পাওয়া যেতে পারে।'

'কীভাবে?'

'এখানকার মানুষেরা যদি মুনেশ্বরজির কাছে অ্যাপিল করে, আমার মনে হয় উনি সিমপ্যাথেটিক্যালি বিবেচনা করবেন।'

স্থির চোখে অর্জুনকুমারকে দেখতে দেকতে রঘুবীর বলে, 'ভূদান যজ্ঞের একটা হুজুগ একসময় উঠেছিল। সেটা বোধহয় আপনি ভুলতে পারেননি।'

থতমত খেয়ে যান অর্জুনকুমার, 'না, মানে—'

'দেখুন অর্জুনজি, বেশ কয়েক বছর আগে বিনোবা ভাবে ভূদান যজ্ঞের মেসেজ নিয়ে এই এলাকা দিয়ে ঘুরে গিয়েছিলেন। খুব ধুমধাম হয়েছিল। বহু বড় জমিমালিক তাঁর সঙ্গে মাইলের পর মাইল হেঁটে পদযাত্রা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিট রেজাল্ট কী হয়েছে জানেন?'

'আমি তো এখানে থাকি না, জানব কী করে?'

'রাইট। রেজাল্টটা হয়েছিল এইরকম। কেউ এক ইঞ্চি চাষের জমি ল্যান্ডলেসদের হাতে তুলে দেয়নি। দু-চারজন যা দিয়েছিল তা হল কাঁকুরে ব্যারেন ল্যান্ড, সেখানে ক্যাকটাসও গজায় না। ভূদান যজ্ঞ একটা মিনিংলেস অবাস্তব কনসেপ্ট। চিতা বাঘেদের হৃদয় এত সহজে বদলানো যায় না।'

এসব খবর জানতেন না অর্জুনকুমার। ভেতরে ভেতরে খানিকটা দমে গেলেও বলেন, 'মুনেশ্বরজি মানুষ হিসেবে চমৎকার। আমার মনে হয় গাঁয়ের লোকেরা ওঁকে যদি ধরতে পারে, একটা কিছু ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।'

নিঝুম রাতের স্তব্ধতা চুরমার করে জোরে জোরে হাসতে থাকে রঘুবীর। হাসির তোড়ে তার শরীর বেঁকেচুরে যায়।

হতভম্ব অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'কী হল, হাসছেন যে!'

হাসি থামিয়ে রঘুবীর বলে, 'এমন একটা মজার কথায় হাসব না! অর্জুনজি, আপনি যে মুনেশ্বর সিংকে চেনেন আর এখানকার লোকজন যে মুনেশ্বর সিংকে চেনে, তাঁরা একেবারে আলাদা। সে যাক, এখানকার মানুষদের হয়ে একটা কাজ করবেন?'

'আমি! কী কাজ?'

'আপনার বন্ধুটিকে বোঝানোর দায়িত্ব নিন।'

অর্জুনকুমার চমকে ওঠেন। বিপন্ন মুখে বলেন, 'দেখুন, আমি মাত্র কয়েক দিনের জন্যে এখানে এসেছি। খুব তাড়াতাড়িই চলে যাব। তাই—'

রঘুবীরের মুখ শক্ত হয়ে ওঠে, 'তাই ইনভলভড হতে চান না, এই তো?'

'মানে—' বলেই থেমে যান অর্জুনকুমার।

'দেখুন অর্জুনজি, মানুষের জন্যে দেশের জন্যে কখনও কিছু করেছেন বলে শুনিনি। কোনো সোশাল কমিটমেন্ট আপনার নেই। অথচ এই দেশে বাস করেন। থার্ড ক্লাস ছবি করে লক্ষ লক্ষ টাকা, গ্ল্যামার, চামচা—এসবের ভেতর ডুবে আছেন। মুনেশ্বর সিং আপনার অনুরোধ যে রাখবেন না সে সম্পর্কে আমি সেন্ট পার্সেন্ট নিশ্চিত। তবু আপনার মনে ভূদানের ব্যাপারে যে ইলিউশানটুকু রয়েছে তার একটা টেস্ট হয়ে যাক।'

অর্জুনকুমার দিশেহারা হয়ে যান। মুনেশ্বরকে ভূদানের মহিমা বোঝাতে গেলে তিনি কি আদৌ খুশি হবেন? ঠিক বোঝা যায় না। কিছুক্ষণ দ্বিধান্বিতের মতো বসে থাকেন তিনি। তারপরেই তাঁর মধ্যে দ্রুত কিছু একটা ঘটে যায়, সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ফেলেন। বলেন, 'ঠিক আছে, মুনেশ্বরজিকে বলব।'

'যদি কিছু করতে পারেন, বুঝব আমাদের থিয়োরি ভুল।'

অর্জুনকুমার মৃদু হাসেন।

রঘুবীর বলে, 'শুনেছি, আপনার শরীর ভালো যাচ্ছে না। তবু কষ্ট করে এত রাতে এখানে এসেছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ। আপনাকে আর আটকে রাখব না। চলুন, খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি।' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, 'যা বোঝাবার মুনেশ্বরজিকে তা তো বোঝাবেনই, সেই সঙ্গে আরেকটা কথাও বলবেন।'

অর্জুনকুমারও উঠে পড়েছিলেন। বলেন, 'কী?'

'গ্রামে যে পীপলকে দেখছেন এরা হল দেশের সাইলেন্ট মেজোরিটি। এরা যেদিন নিজেদের রাইট সম্পর্কে সচেতন হবে সেদিন সব কিছু তোলপাড় হয়ে যাবে।'

'সাইলেন্ট মেজোরিটি!' কথাটা খুব ভালো লাগে অর্জুনকুমারের। নতুন ছবিতে এটা রাখতেই হবে। বলেন, 'নিশ্চয়ই বলব।'

অন্য সবাইকে চালায় থাকতে বলে একটু পর রেণুকা আর অর্জুনকুমারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রঘুবীর।

আর কয়েক দিন পরেই হোলি। পূর্ণিমা পক্ষের চাঁদ আকাশের মাঝখানে স্থির হয়ে আছে। ঝকঝকে পরিষ্কার জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে চরাচরের ওপর দিয়ে। যতদূর চোখ যায়, সব কিছুই অপার্থিব স্বপ্নের মতো।

ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে 'রাজপুত নিকেত'-এর দিকে হাঁটতে হাঁটতে রঘুবীর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'অর্জুনজি, আপনি রমজান সাহেবকে চেনেন?'

এতক্ষণ অনেক কথা হয়েছে কিন্তু রমজান সাহেবের নাম একবারও ওঠেনি। বেশ অবাকই হন অর্জুনকুমার।

বলেন, 'পরিচয় হয়নি। তবে 'রাজপুত নিকেত'-এ দু-তিন বার দেখেছি। কেন বলুন তো?'

রঘুবীর বলে, 'না, এমনি।' তারপর হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। বেশ খানিকক্ষণ বাদে আবার বলে, 'এখানে খুব শিগগিরই কিছু একটা গোলমাল হবে বলে মনে হচ্ছে। এই ধরুন হোলি কি তার আগের দিন।'

রেণুকা এবং অর্জুনকুমার চমকে ওঠেন। প্রায় একই সঙ্গে বলে ওঠেন, 'কিসের গোলমাল?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

রেণুকা বলেন, 'যদি জানতে পারো, খবরটা দিও।'

রঘুবীর জোর দিয়ে বলে, 'অবশ্যই।'

এরপর বিশেষ কথা হয় না। অনেকটা পথ সঙ্গে সঙ্গে এসে একসময় ফিরে যায় রঘুবীর। আরো খানিক বাদে 'রাজপুত নিকেত'-এর তলায় এসে রেণুকা বিদায় নেন।

রঘুবীরের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে ছিলেন অর্জুনকুমার। তাই কোনো দিকে খেয়াল ছিল না। এখন টিলা বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বুকের ভেতর প্রবল চাপ অনুভব করতে থাকেন. সেই সঙ্গে দারুণ শ্বাসকষ্ট। তিনি স্থির করে ফেলেন, কাল আর গাঁ দেখতে বেরুবেন না। পুরো দিনটা সম্পূর্ণ বিশ্রাম।

এগারো

অভ্যাসমতো পরদিন ভোরে ঘুম ভেঙে যায় অর্জুনকুমারের। নৌকর চা দিয়ে গিয়েছিল। আলতো করে চুমুক দিতে দিতে কালকের কথা ভাবছিলেন তিনি। সত্যিই কি নিঝুম মধ্যরাতে রেণুকার সঙ্গে সেই চালা ঘরটিতে গিয়েছিলেন? না কি সেটা অবিশ্বাস্য অলীক কোনো স্বপ্ন? পরক্ষণেই মনে হয়, স্বপ্ন নয়। ভাঙাচোরা চালার তলায় লণ্ঠনের ধোঁয়াটে আলোয় রঘুবীর এবং তার সঙ্গীদের মুখ স্পষ্ট যেন দেখতে পাচ্ছেন। শুধু তাই না, রঘুবীরের কণ্ঠস্বর এবং তাঁর প্রতিটি কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ মনে পড়ে যায়, চালাটার নিচে বেশ কিছু দেহাতি যুবক এবং প্রৌঢ়কে বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল। সাইলেন্ট মেজোরিটির এক নগণ্য ভগ্নাংশ। অর্জুনকুমার কোথায় যেন পড়েছিলেন, পলিটিক্যাল এক্সট্রিমিস্টরা রাত্তিরে গোপনে ক্লাস নিয়ে মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগিয়ে তোলে। সেই রকমই কোনো ক্লাস কি নিচ্ছিল রঘুবীর?

হয়তো তাই। ঐ সব শান্ত নিরীহ ভীরু মানুষেরা ভয় কাটিয়ে উঠে যাতে বন্দুক হাতে তুলে নেয় নিঃশব্দে, সবার চোখের আড়ালে, তারই প্রস্তুতি চলছে।

চা খাওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকেন অর্জুনকুমার।

একসময় ফারুক এসে ম্যাসাজ করে দিয়ে যায়। তারপর স্নান। স্নানের পর্ব চুকতে না চুকতেই রোহিতরা অর্জুনকুমারের কামরায় চলে আসেন। গ্রামে যাবার জন্য তৈরি হয়েই এসেছেন। ওঁরা জানেন না কাল মধ্যরাতে অর্জুনকুমার স্থির করেছেন, আজ বেরুবেন না।

নৌকরনীরা চাকা-ওলা ছোটো ছোটো ট্রলির মাথায় ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসে সবার সামনে সাজিয়ে দেয়।

খেতে খেতে রোহিত বলেন, 'দু-তিন মাইলের ভেতর যত গাঁ, সবগুলোই তো দেখা হল। আজ কোন দিকে যাচ্ছি, অর্জুনজি?'

অর্জুনকুমার বলেন, 'আজ আমরা বেরুচ্ছি না।'

রোহিতের বিশ্বাস হয় না। চোখ গোলাকার করে অবাক বিস্ময়ে বলেন, 'তা হলে ফুল রেস্ট!'

'ইয়েস।' অর্জুনকুমার বলেন, 'আজকের দিনটা স্রেফ আরাম করুন।'

'মেনি মেনি থ্যাঙ্কস স্যার। এ ক'দিন হেঁটে হেঁটে কোমর আর হাঁটুর বল বেয়ারিং বিলকুল লুজ হয়ে গেছে।' রোহিত মজাদার একটা ভঙ্গি করে বলেন, 'হোল ডে শুয়ে শুয়ে কোমর টোমর রিপেয়ার করে নেব।'

ফারুক বলে, 'ক'দিনে যত কিলোমিটার হেঁটেছি, সব জোড়া লাগালে এখান থেকে মাদাগাস্কার পর্যন্ত যাওয়া যেত।'

সঞ্জীব বলেন, 'গ্লোব ট্রটার হিসেবে নাম হয়ে যেত আমাদের।'

অর্জুনকুমার হাসতে থাকেন। হাসি-ঠাট্টার ভেতর বলেন, 'যে সব গান গাঁ থেকে টেপ করে আনা হয়েছে, সেগুলো বরং আজ শোনা যাক, কী বলেন?'

'গুড আইডিয়া।' সবাই একসঙ্গে সায় দেয়।

'ফারুক ভাই টেপরেকর্ডটা নিয়ে আসুন তো। খেতে খেতে শোনা যাক।'

তৎক্ষণাৎ সব ব্যবস্থা হয়ে যায়।

প্রথমে বালুয়ার সেই গানটা বেজে ওঠে।

বনোয়ারী হো, মেরে লরীকা ভাতার
লরীকা ভাতার লেকে সুতালি ওসরোয়া
খোলে কে ত চোলি বন্ধ, খোলে না কেওয়ার
বনোয়ারী হো, জরি গৈলে এড়িসে কপার...'

টেবিলে আঙুল ঠুকে তাল দিতে দিতে রোহিত বলেন, 'ফ্যানটাস্টিক। ছবিতে দুর্দান্ত সিচুয়েশান তৈরি করে এটা লাগাতে পারলে সুপার ডুপার হিট।'

রঘুবীরের সেই সশস্ত্র আন্দোলনের ব্যাপারটা আপাতত মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে অর্জুনকুমারের। তিনি, ফারুক এবং সঞ্জীব তালি বাজাতে বাজাতে গলার স্বরে জোর দিয়ে বলেন, 'নো ডাউট অ্যাট অল।' বলে টেপের সঙ্গে তাঁরাও গলা মিলিয়ে দেন।

'বনোয়ারী হো, মেরে লরীকা ভাতার—'

গানটা যখন প্রায় শেষ, সেই সময় জগনাথ ঘরে এসে ঢোকেন। ব্রেকফাস্ট থেকে ডিনার পর্যন্ত অনিবার্য নিয়মে কাছে থেকে তিনি অর্জুনকুমারদের খাওয়ার তদারক করেন। কিন্তু আজ সকাল থেকে এতক্ষণ যে তাঁকে দেখা যায়নি, সেটা আগে কেউ লক্ষ করেননি। বালুয়ার গানটা নিয়েই তাঁরা মেতে ছিলেন।

সঞ্জীব বলেন, 'আসুন জগনাথজি।' পরক্ষণে তাঁর সম্পর্কে হঠাৎ সচেতন হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'ভোরে উঠে রোজ আপনার মুখ দেখি। আজ কোথায় ছিলেন?'

একটা সোফায় বসতে বসতে জগনাথ বলেন, 'আমার কোঠিতে সকাল থেকে অনেকে এসেছিল। তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল। ক্ষমা করবেন। আপনাদের কোনো অসুবিধে হয়নি তো?'

কেউ খেয়াল করেননি, জগনাথকে আজ গম্ভীর এবং ভীষণ চিন্তিত দেখাচ্ছে। কথাগুলো যে তিনি বললেন তার ভেতর যথেষ্ট আন্তরিকতা নেই। নেহাত যান্ত্রিক নিয়মেই যেন বলার জন্য বলা।

রোহিত বলেন, 'আমাদের সেবার জন্যে যে স্কোয়াডটি লাগিয়ে দিয়েছেন তারা কি অসুবিধে হতে দেয়? এ নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।'

জগনাথ হাসির একটা ভঙ্গি করেন। বলেন, 'ধন্যবাদ।' তারপর অর্জুনকুমারের দিকে ফিরে বলেন, 'আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

জগনাথের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু আছে যা অর্জুনকুমারকে চকিত করে তোলে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'কী কথা?'

একটু ইতস্তত করে জগনাথ বলেন, 'অপরাধ নেবেন না, আপনাকে কিছুক্ষণ আলাদা পেতে চাই। সবার সামনে ওটা বলা যাবে না।'

স্থির চোখে কয়েক পলক জগনাথের দিকে তাকিয়ে থাকেন অর্জুনকুমার। বলেন, 'ঠিক আছে, তাই হবে। ব্রেকফাস্ট শেষ হলে রোহিতজিরা তাঁদের কামরায় চলে যাবেন।'

কিছুক্ষণ বাদে রোহিতরা চলে যান। এখন এ কামরায় শুধু অর্জুনকুমার আর জগনাথ।

খানিক আগের কুণ্ঠা আর নেই জগনাথের। সোজা কাজের কথায় চলে আসেন তিনি, 'কাল রাত্তিরে রেণুর সঙ্গে চুপকে চুপকে আপনি গাঁওয়ে গিয়েছিলেন?'

অর্জুনকুমারের শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো কিছু বয়ে যায়। স্নায়ু টান টান করে তিনি তাকিয়ে থাকেন। বলেন, 'আপনাকে কে বলল?'

'আমাকে খবর দেবার জন্যে হাজারো আদমি মজুত রয়েছে অর্জুনজি। আমার আঁখে ধুলো দিয়ে এখানে কিছু হবার উপায় নেই।'

অর্জুনকুমার উত্তর দেন না।

জগনাথ থামেননি, 'আপনার মতো বড়ে আদমিকে দেখে গেটের দারোয়ান কিছু বলতে সাহস পায়নি।'

নগদ একশ টাকা বখশিস দেবার পরও দারোয়ানটা বিশ্বাসঘাতকতা করল কিনা, অর্জুনকুমার পুরোপুরি নিশ্চিত নন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'দারোয়ানের কাছেই তা হলে খবর পেয়েছেন?'

'না। অন্য লোকের কাছে খবর পেয়ে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

অর্থাৎ টাকাটার কথা বাদ দিয়ে বাকি সবই কবুল করেছে দারোয়ানটা।

জগনাথ থামেননি, 'দারোয়ানদের হুকুম দেওয়া আছে, রাতে এ কোঠিতে কেউ যেন ঢুকতে না পারে, কাউকে এখান থেকে বেরুতেও যেন না দেওয়া হয়। লেকেন আপনার ওভাবে বেরুনো ঠিক হয়নি।'

অর্জুনকুমারের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে, দুই চোখ অসহ্য ক্রোধে জ্বলতে থাকে। জবাবদিহি চাওয়ার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি আমার ওপর নজরদারির ব্যবস্থা করেছেন? 'লাইক ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ পীপল! আমি কখন কোথায় যাব, না যাব, সেটা কনট্রোল করার ক্ষমতা আপনাকে কে দিয়েছে?'

অর্জুনকুমারের এই উগ্র, ক্রুদ্ধ, পরাক্রান্ত চেহারাটা আগে দেখেননি জগনাথ। রীতিমতো ঘাবড়ে যান তিনি। বোঝাতে চেষ্টা করেন, তাঁর নিরাপত্তার খাতিরে জগনাথকে এ সব করতে হচ্ছে।

অর্জুনকুমারের রাগ বা উত্তেজনা কোনোটাই কমেনি। চড়া গলায় তিনি বলেন, 'মুনেশ্বরজিকে আপনার এই ব্যাপারগুলো আমি বলব। দিজ আর হাইলি অবজেকশনেবল। কবে আসছেন তিনি পাটনা থেকে?'

'পরশু যে চিঠি পেয়েছি তাতে লিখেছেন হোলির আগে আসতে পারবেন না। ডাক্তাররা নার্সিং হোম থেকে বেরুতে দিচ্ছে না।' বলে কাঁচুমাচু মুখে অত্যন্ত বিনীতভাবে জগনাথ ফের বোঝাতে থাকেন, অর্জুনকুমারের ভালোর জন্যই তাঁর গতিবিধির ওপর নজর রাখতে হচ্ছে। কেননা এখানে গোপনে এমন সব ব্যাপার চলছে যাতে, যে কোনো মুহূর্তে, তাঁর বিপদ ঘটে যেতে পারে। যতদিন এ অঞ্চলে অর্জুনকুমার আছেন, তাঁর অত্যন্ত মূল্যবান জীবনের জিম্মাদার জগনাথ। এ দায়িত্ব তাঁকে পালন করতেই হবে।

কোনো কৈফিয়তেই কাজ হয় না। অসন্তুষ্ট, ক্ষুব্ধ অর্জুনকুমার কঠোর গলায় বলেন, 'জগনাথজি, আমি মায়ের কোলের বাচ্চা নই। নিজেকে রক্ষা করার মতো বুদ্ধি আর শক্তি আমার আছে।' আপনার জন্যে মুনেশ্বরজির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খারাপ হয়ে যাক, এটা নিশ্চয়ই আপনি চাইবেন না।'

এবার শিরদাঁড়া একেবারে দুমড়ে যায় যেন জগনাথের। তবে লোকটির অলৌকিক ক্ষমতা আছে। বার বার ক্ষমা চেয়ে, অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে, শেষ পর্যন্ত অর্জুনকুমারকে শান্ত করে ফেলেন। বলেন, 'অর্জুনজি, আপনি গুস্‌সা করবেন, তবু একটা কথা আমাকে বলতেই হচ্ছে।'

'কী কথা?'

'কাল রাতে রেণু আপনাকে রঘুবীর সিংয়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিল?'

মেরুদণ্ডে প্রবল ঝাঁকুনি লাগে অর্জুনকুমারের। বুঝতে পারেন মধ্যরাতে লুকিয়ে চুরিয়ে কোথায় কার সঙ্গে কার কাছে গিয়েছিলেন, জগনাথ জেনে গেছেন। তাঁর চোখে ধুলো দেওয়া অসম্ভব।

অস্বীকার করে কোনো লাভ হবে না। অর্জুনকুমার জগনাথের চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে বলেন, 'হ্যাঁ।'

'রঘুবীর বহোত খতারনাক, বহুত বহুত ডেঞ্জারাস আদমি।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয়নি।'

এরকম একটা উত্তর আদপেই আশা করেননি জগনাথ। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন তিনি, তারপর ধীরে ধীরে বলেন, 'কী মনে হয়েছে?'

অর্জুনকুমার বলেন, 'স্ট্রেট, আপরাইট ম্যান।' ইংরেজি শব্দগুলো জগনাথের বোধগম্য হয়েছে কিনা নিশ্চিত হতে না পারায় হিন্দিতে বুঝিয়ে দিয়ে বলেন, 'রঘুবীর আমাকে অনেক কিছু বলেছে। সেগুলো মুনেশ্বরজিকে জানানো দরকার। উনি যদি হোলির পর এখানে আসেন, হয়তো দেখা হবে না। আপাতত আপনি শুনুন, পরে দেখা হলে ওঁকে জানাবো।'

উত্তর না দিয়ে জগনাথ তাকিয়ে থাকেন।

রঘুবীরের সঙ্গে তাঁর যে কথা হয়েছে, অর্জুনকুমার তার সবটাই বলে যান, কিছুই বাদ দেন না।

ঘরের মধ্যে হঠাৎ স্তব্ধতা নেমে আসে।

একসময় অর্জুনকুমার আবার বলেন, 'রঘুবীর না বললে জানতেই পারতাম না কীভাবে মুনেশ্বরজিরা তাঁদের এম্পায়ার বাড়িয়েছেন আর এক্সপ্লয়টেশানটা কীভাবে জেনারেশানের পর জেনারেশান চলে আসছে।'

জগনাথ উত্তর দেন না।

অর্জুনকুমার থামেননি, 'মুনেশ্বরজিকে আপনি বোঝাবেন, এভাবে চলতে পারে না। ল্যান্ডলেস লোকেদের জমি সবটা না হলেও কিছু কিছু ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। তা ছাড়া এখানকার গাঁয়ের মানুষদের বাইরে গিয়ে কাজ করতে দেওয়া হবে না বলে শাসানো হচ্ছে। ভয় দেখানো বন্ধ করতে হবে। নইলে ভীষণ ঝঞ্ঝাট হবে।'

জগনাথ এবার মুখ খোলেন, 'আমি মুনেশ্বরজির নিমক খাই। এ সব কথা আমার পক্ষে তাঁকে বলা সম্ভব না। যতক্ষণ না মৌত হচ্ছে, তাঁর প্রপার্টি আমাকে পাহারা দিয়ে যেতেই হবে।' একটু থেমে বলেন, 'ঝঞ্ঝাটের কথা বলছেন? হোনে দিজিয়ে। জমিন-উমিনের ব্যাপারে ওসব থোড়াবহুত হয়েই থাকে। রঘুবীর বোধহয় বন্দুকের লড়াই চাইছে। ঠিক হ্যায়।'

একটু আগে যে লোকটা কেঁচো হয়ে ছিল, তার সঙ্গে এই জগনাথের আদৌ মিল নেই। তাঁর কণ্ঠস্বর একেবারে বদলে গেছে। তিনি যে মুনেশ্বর সিংয়ের তাবত বিষয়সম্পত্তির বিশ্বস্ত অছি এবং তাঁর প্রচণ্ড শক্তিধর স্থানীয় ম্যানেজার, সেটা তাঁর কথা বলা আর তাকানোব ভঙ্গিতে টের পাওয়া যাচ্ছে।

অর্জুনকুমার জগনাথকে লক্ষ করতে করতে বলেন, 'ঠিক আছে, মুনেশ্বরজিকে আমি নিজেই কথাটা বলব।'

'আপহিকা মর্জি অর্জুনজি। তব্—'

'তবে কী?'

'আমার জন্যে আপনার আর মুনেশ্বরজির সম্পর্কটা খারাপ হবে বলছিলেন না?'

'হ্যাঁ।'

'ওই কথাগুলো যদি সচমুচ মুনেশ্বরজিকে বলেন সম্পর্ক জরুর খারাপ হবে। তখন আমার মতো ছোটোমোটা আদমির আর কোনো দায় থাকবে না।'

ভূদানের স্পিরিট যে কোনোভাবেই মুনেশ্বরকে উদ্দীপ্ত করে তুলবে না, সেটা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন জগনাথ। বরং তার প্রতিক্রিয়া যে যথেষ্টই খারাপ হবে তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। অর্জুনকুমার কিন্তু মনে মনে স্থির করে ফেলেছেন, মুনেশ্বরকে বলবেনই। এখানে দেখা না হলেও বোম্বাইতে তাঁকে

ডাকিয়ে এনে বোঝাতে চেষ্টা করবেন।

জগনাথ এবার বলেন, 'অর্জুনজি, আপনি এখানে এসেছিলেন গাঁও টুঁড়ে টুঁড়ে সিনেমার জন্যে মালমশলা জোগাড় করতে। আফশোশকি বাত, বহুত ইনভলভড হয়ে যাচ্ছেন। আপনার মতো ওয়ার্ল্ড ফেমাস কলাকার কতগুলো জানবরের চেয়েও জানবর দেহাতিদের জন্যে এত ভাবছেন, এটা আপনার হেলথ আর কামকাজের পক্ষে ঠিক না। আপনার বড়ে বড়ে কাজের জন্যে পুরা দুনিয়া তাকিয়ে আছে।'

এর আগেও প্রায় এ জাতীয় দামি পরামর্শ দিয়েছেন জগনাথ। অর্জুনকুমার উত্তর দেন না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

জগনাথ একসময় জিজ্ঞেস করেন, 'অনেক বেলা হয়ে গেল, আজ বোধহয় বেরুবেন না?'

আস্তে মাথা নাড়েন অর্জুনকুমার, 'না।'

'ভেরি গুড। পুরা দিন রেস্ট নিন।' জগনাথের মুখচোখ দেখে মনে হয়, অর্জুনকুমারের না বেরুনোর সিদ্ধান্তে খুবই খুশি এবং দুশ্চিন্তামুক্ত হয়েছেন। বলেন, 'এখন উঠি, আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। লাঞ্চ টাইমে চলে আসব।'

'আচ্ছা।'

দরজা পর্যন্ত গিয়ে কিছু মনে পড়ায় ফিরে আসেন জগনাথ। বলেন, 'কৃপা করে আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?'

অর্জুনকুমার সতর্ক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেন, 'কী অনুরোধ?'

'এখানে যে ক'দিন আছেন আর বেরুবেন না।'

অর্জুনকুমারের মুখ বিরক্তিতে কুঁচকে যায়। কিন্তু তিনি জবাব দেবার আগেই হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দেন জগনাথ। বলেন, 'আমার কথা শেষ হয়নি অর্জুনজি। কৃপা করে পুরাটা শুনে নিন।'

অর্জুনকুমার রুক্ষ গলায় বলেন, 'বলুন—'

'আপনি যে এখানে আছেন, সেটা জানাজানি হয়ে গেছে। তা ছাড়া হোলির দিন তাম্বুর হল-এ আপনার একটা ফিলিম দেখানো শুরু হবে। আজকালের মধ্যে আপনার ছবি দেওয়া হ্যান্ডবিল বিলিয়ে পাবলিসিটি স্টার্ট করবে ফিলিমবালারা। এই অবস্থায় বেরুনোটা বহুত রিস্কি হয়ে যাবে অর্জুনজি।'

অর্জুনকুমার চমকে ওঠেন, 'আমার খবরটা জানাজানি হল কী করে?'

'আগুন কি কাপড় চাপা দিয়ে ঢেকে রাখা যায়?' বলে হাসেন জগনাথ। বলেন, 'আরেকটা কথা—'

'কী?'

গলাটা ঝপ করে নামিয়ে জগনাথ বলেন, 'এখানে বড় রকমের একটা গোলমাল হবে বলে শুনতে পাচ্ছি।'

ঠিক এই ধরনের আশঙ্কার কথা রঘুবীরের কাছ থেকে শুনেছিলেন অর্জুনকুমার। তিনি চকিত হয়ে ওঠেন, 'কী ধরনের গোলমাল?'

'বলতে পারছি না।'

গোলমালের চরিত্রটা কেমন হবে, তা পরিষ্কার বোঝাতে পারেনি রঘুবীর। জগনাথও এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বললেন না। অবশ্য রেণুকারা জানলে নিশ্চয়ই বলতেন। অর্জুনকুমারের হঠাৎ কেন যেন মনে হয়, গোলমাল বা হাঙ্গামা যাই ঘটুক, জগনাথ হয়তো তা জানতে পারেন। জিজ্ঞেস করেন, 'কেন গোলমাল হবে? কোনো কারণ আছে কি?'

'কিছু ঘটলে তার কারণ তো থাকেই।'

'সেটাই জানতে চাইছি।'

জগনাথ থতমত খেয়ে যান। বোঝা যায়, বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন। বিব্রতভাবে বলেন, 'কারণটা কী, আমি নিজেই তা জানি না। আপনাকে আর বিরক্ত করব না। চলি—' ব্যস্তভাবে তিনি চলে যান।

বারো

আজকের দিনটাকে ঘটনাবহুল বলা যেতে পারে।

সকালে জগনাথ চলে যাবার পর রোহিতরা ফের অর্জুনকুমারের কামরায় চলে এসেছিলেন। গোপনে জগনাথ কী আলোচনা করে গেলেন, সে সম্পর্কে প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল ওঁদের। অর্জুনকুমার সব জানিয়ে দিলে ওঁরা থ হয়ে যান। লুকিয়ে কাল রাতে অর্জুনকুমার রেণুকার সঙ্গে গাঁয়ে রঘুবীরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, এটা তাঁদের স্তম্ভিত হওয়ার কারণ। বিস্ময়টা থিতিয়ে এলে তাঁরা জগনাথের মতোই জানিয়ে দেন, ঝুঁকি নিয়ে অর্জুনকুমারের পক্ষে আর বাইরে বেরুনো কোনোভাবেই ঠিক হবে না। তা ছাড়া এখানকার ব্যাপারে ইনভলভড হওয়া উচিত নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বোম্বাই ফিরে যাওয়াটা এখন সব দিক থেকেই জরুরি।

অর্জুনকুমার উত্তর দেননি। তারপর থেকে দিনটা অন্যমনস্কর মতো কাটিয়ে দিচ্ছেন। অদ্ভুত এক অস্থিরতার মধ্যে তিনি দুপুরের খাওয়া চুকিয়ে চার্লি চ্যাপলিনের অটোগ্রাফি নিয়ে শুয়ে পড়েছেন কিন্তু দু-এক পাতার বেশি পড়া হয়নি। আবার খানিকক্ষণ যে ঘুমিয়ে নেবেন, তাও পারেননি।

এখন বেলা পড়ে আসছে। সূর্য মাথার ওপর থেকে গড়াতে গড়াতে পশ্চিমে নেমে গেছে অনেকটা। কিছুক্ষণ আগেও রোদটা ছিল ঝকঝকে ছুরির ফলার মতো, রং বদলে সেটা হলুদ হয়ে গেছে। দিনের তাপও জুড়িয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বসেন অর্জুনকুমার। বিশাল বিশাল জানালার বাইরে যতদূর চোখ যায় সেই পুরোনো দৃশ্যাবলী। আদিগন্ত ফাঁকা শস্যক্ষেত্র, পরিষ্কার নীলাকাশে দু-চার টুকরো ভবঘুরে মেঘ, পরদেশি 'শুগা'র ঝাঁক বা কাচ্চীতে ক্বচিৎ এক-আধটা দেহাতি মানুষ বা বয়েল গাড়ি। দুপুর এবং বিকেলের মাঝামাঝি জায়গায় সারা গায়ে অঢেল আলস্য জড়িয়ে দিনটা পড়ে আছে।

কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন খেয়াল নেই, হঠাৎ গেটের কাছে হইচই শুনে চমকে ওঠেন অর্জুনকুমার। দারোয়ানের গলা তো শুনতে পাচ্ছেনই, সেই সঙ্গে একটা অচেনা কণ্ঠস্বর। দু'জনেই গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে।

তুমুল চেঁচামেচির জন্য প্রথমে কথাগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ কান খাড়া করে রাখার পর টের পাওয়া যায়, অপরিচিত লোকটি 'রাজপুত নিকেত'-এ ঢুকতে চায় কিন্তু দারোয়ান কোনোমতেই তাকে ভেতরে আসতে দেবে না। হট্টগোলটা এই নিয়েই। এরই মধ্যে দু-একবার তাঁর নামটাও শুনতে পান অর্জুনকুমার। ফলে প্রবল ঔৎসুক্য বোধ করেন তিনি এবং বিছানা থেকে নেমে পায়ে পায়ে সামনের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ান।

জবরদস্ত লোহার গেটের এধারে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে দারোয়ান, বাইরে তার মুখোমুখি একটি যুবক। যুবকটির পরনে জিনস আর স্পোর্টস গেঞ্জি, পায়ে ভারী চপ্পল। তার চুল অবহেলায় অযত্নে উস্কখুস্ক, গালে খাপচা খাপচা দাড়ি, চোখে চৌকো ফ্রেমের ফ্যাশনেবল চশমা। এক কাঁধ থেকে চামড়ার খাপে ক্যামেরা ঝুলছে, আরেক কাঁধে ঢাউস ঝোলায় প্রচুর মালপত্তর।

ছেলেটাকে আগে কোথায় যেন দেখেছেন অর্জুনকুমার। কোথায়? প্রথমটা মনে না পড়লেও একটু পরেই চিনতে পারেন—সুরেশ কুলকার্নি। বোম্বাইয়ের একটা ইংরেজি কাগজের সিনেমা ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। যত দূর মনে পড়ছে ডেপুটি সিনেমা এডিটর। সুরেশ চমৎকার লেখে। তাঁর সম্বন্ধে ওদের কাগজে অজস্র লিখেছে সে, নানা সময়ে প্রচুর কভারেজ দিয়েছে।

কিন্তু সুরেশ এখানে এসে হাজির হল কী করে? ভাবার আর সময় পাওয়া গেল না। আচমকা সুরেশ তাঁকে দেখে ফেলে এবং ডান হাতটা তুলে নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'হাই অর্জুনজি, আমি সুরেশ। চিনতে পারছেন?' তার চোখেমুখে উল্লাস এবং উত্তেজনা।

অর্জুনকুমারও হাত নাড়তে থাকেন, 'হাই। আসুন, আসুন—'

'আসব কী করে? আপনাদের দারোয়ান তো ঢুকতে দিচ্ছে না।'

অর্জুনকুমার দারোয়ানকে হাতের ইঙ্গিতে গেট খুলে দিতে বলেন। একটু পরেই সুরেশ ওপরে উঠে আসে।

এদিকে রোহিতরা তাঁদের ঘর থেকে সুরেশকে দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁরা অর্জুনকুমারের কামরায় ছুটে আসেন।

সুরেশকে বসিয়ে সবাই তাকে প্রায় ঘিরে বসেন।

সুরেশ বলে, 'এই গড-ফরসেকেন জায়গাটা কী করে খুঁজে বার করলেন অর্জুনজি?'

'আমার কথা পরে হবে। দেখে মনে হচ্ছে অ-ফুলি টায়ার্ড।' অর্জুনকুমার বলেন, 'ক'দিন খাওয়া দাওয়া জোটেনি?'

'ক'দিন নয়, কাল রাত থেকে।'

'আগে কিছু খেয়ে নিন।'

তক্ষুনি নৌকরনীদের দিয়ে খাবারদাবার এবং চা আনানো হল। খাওয়ার পর পরিতৃপ্ত মুখে সুরেশ বলে, 'বাঁচলাম।'

অর্জুনকুমার বলেন, 'এবার বলুন, এখানে কী করে এলেন?'

'জার্নালিস্টরা পারে না, ওয়ার্ল্ডে এমন ব্যাপার নেই। সব বলব। তার আগে এগুলো দেখুন।' বলে তার প্রকাণ্ড ঝোলা থেকে গাদা গাদা খবরের কাগজ আর ফিল্ম ম্যাগাজিনের কাটিং বার করে দেয়।

অর্জুনকুমার বোম্বাই থেকে চলে আসার পর তাঁর সম্বন্ধে ওই কাগজগুলোতে হাজার রকমের গুজব, গবেষণা, এমনকি মেয়েদের জড়িয়ে নানা উদ্ভট এবং নোংরা কেচ্ছা ফেঁদে ছাপা হয়েছে।

দ্রুত এক পলক কাটিংগুলো দেখে একপাশে সরিয়ে রাখেন অর্জুনকুমার।

সুরেশ বলতে থাকে, 'আপনার অজ্ঞাতবাস নিয়ে হোল কান্ট্রি তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। আপনার খবর পাওয়ার জন্যে প্রতিটা নিউজপেপারে রোজ হাজার হাজার ফোন আসছে। স্টেট আর সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মাথা একেবারে খারাপ করে দিয়েছেন আপনি। তা ছাড়া আপনাকে নিয়ে কত রকমের যে স্ক্যান্ডাল বানানো হচ্ছে!' বলে রোহিতের দিকে তাকায়, 'রোহিতজি, আপনার মতো দুর্ধর্ষ স্টোরি রাইটারও অমন স্ক্যান্ডাল তৈরি করতে পারবেন না।'

সিনেমার পাতায় কাজ করার কারণে প্রায়ই স্টুডিও আর বিভিন্ন ফিল্ম কোম্পানির অফিসে যেতে হয় সুরেশকে। আর্টিস্ট, ডিরেক্টর, প্রোডিউসার, ক্যামেরাম্যান, সাউন্ড রেকর্ডিস্ট, সেট ডিজাইনার—যাদের নিয়ে সিনেমা, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয় তাকে। কাজেই রোহিতদের চেনে সে।

অর্জুনকুমার সামান্য হেসে বলেন, 'সে তো বুঝলাম। এবার আমার খোঁজটা কী করে পেলেন, সেটা বলুন।'

সুরেশ বলে, 'সারা দেশের জার্নালিস্টরা আপনার খোঁজে নেমে পড়েছে। আমিও চারদিকে চিঠি লিখে, ফোন টোন করে খবর নিচ্ছিলাম। হঠাৎ তিন-চারদিন আগে একজন জানাল, হারবার্টগঞ্জ থেকে আপনার মতো চেহারার একজনকে ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে চড়ে এদিকে আসতে দেখেছে। যা থাকে কপালে, বলে একটা চান্স নিলাম। ক্যামেরা আর ঝোলা কাঁধে ঝুলিয়ে বোম্বাই থেকে স্ট্রেট হারবার্টগঞ্জ, তারপর এদিকের লাইনে প্রতিটি স্টেশনে আপনার ডেসক্রিপশন দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত ধরমপুরায় এসে পাত্তা পেয়ে গেলাম।'

'পাত্তা দিলে কে?'

'ধরমপুরার স্টেশন মাস্টার। এর পর 'রাজপুত নিকেত'-এ চলে আসাটা কী এমন কষ্টের!' বলে একটু থামে সুরেশ। পরক্ষণে আবার শুরু করে, 'এবার বলুন, আপনার এই অজ্ঞাতবাসের উদ্দেশ্যটা কী?'

কিছুটা ইতস্তত করে বলেই ফেলেন অর্জুনকুমার।

সব শুনে তাঁর সম্পর্কে শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় বেড়ে যায় সুরেশের। গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের শীর্ষবিন্দুতে যিনি

বসে আছেন, যিনি দেশের একমাত্র মেগা স্টার, তাঁর পক্ষে একটা ছবির জন্য এত পরিশ্রম, এত কষ্ট এবং এত ঝুঁকি নেওয়া যে সম্ভব, না দেখলে বিশ্বাস হত না সুরেশের। সে বলে, 'ভাবা যায় না। এখানে কি রকম এক্সপিরিয়েন্স হল?'

সুরেশের কথাগুলো শুনতে খুব ভালো লাগছিল অর্জুনকুমারের। আবেগের গলায় তিনি এ ক'দিনের অভিজ্ঞতার কথা বলে যান।

অর্জুনকুমার আগে লক্ষ করেননি, তিনি কথা বলার আগেই একটা ছোটো, অত্যন্ত শক্তিশালী টেপরেকর্ডার চালিয়ে দিয়েছিল সুরেশ। সেটার সুইচ বন্ধ করার সময় খুট করে যে শব্দটা হয় তাতেই সচেতন হন অর্জুনকুমার। বলেন, 'কথাগুলো টেপ করে নিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ।' সুরেশ মাথা নাড়ে, 'আমার সাংবাদিক জীবনে আপনার ইন্টারভিউটা ভেরি ভেরি ভ্যালুয়েবল প্রপার্টি। আপনাকে আরেকটু কষ্ট দেবো। ওনলি টেন মিনিটস মোর।'

প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে অর্জুনকুমার বলেন, 'কী ব্যাপার?'

'আপনার ক'টা ফোটো নিতে চাই।'

ছবি তোলা হলে অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'আমার ইন্টারভিউ টিন্টারভিউ ছাপাবেন নাকি?'

সুরেশ জোর দিয়ে বলে, 'নিশ্চয়ই। অর্জুনকুমারের অজ্ঞাতবাসের খবরটা প্রথম ছবি আর ইন্টারভিউ সুদ্ধু ছাপতে পারলে জার্নালিস্ট হিসেবে কোথায় পৌঁছে যাব, চিন্তা করতে পারি না। তখন আমার কাছে স্কাই ইজ দা লিমিট। আপনার কাছে আমি হোল লাইফের জন্যে কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম।'

বিব্রতভাবে অর্জুনকুমার বলেন, 'না না ও-সব বলবেন না। আমিই আপনাদের, মানে মিডিয়ার লোকেদের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। সব সময় আমার খবর ছাপেন, আমার সম্বন্ধে লেখেন। কিন্তু এখানকার ব্যাপারটা আলাদা। আমি কোথায় আছি, জানাজানি হলে নানা জায়গা থেকে লোকজন এসে ডিসটার্ব করবে।'

রোহিত বলেন, 'জগনাথজি তো আপনাকে বলেই গেছেন, আপনার খবর এ অঞ্চলের লোকেরা জেনে গেছে। সুরেশজির রিপোর্ট ছাপা হলে আরো অনেক লোক না হয় জানবে। ছাপা হতে হতেও তো দু-তিন দিন লেগে যাবে। সেটা পড়ে লোকজন এখানে আসতে আরও ক'দিন পেরিয়ে যাবে। ততদিনে আমরা বোম্বাই ফিরে যাব।'

অর্জুনকুমার আর আপত্তি করেন না। করে লাভও নেই। সুরেশ এতদূর যখন ছুটে এসেছে, তাঁর খবর ছাপবেই।

সুরেশ ক্যামেরা ট্যামেরা খাপে পুরতে পুরতে বলে, 'অর্জুনজি, আরেকটা ফেভার আপনাকে করতে হবে।'

অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'কী ফেভার?'

'আপনি যখন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরবেন সেই সময় আমি আপনার সঙ্গে থাকতে চাই। প্লিজ, না বলবেন না।'

'তা হলে তো আপনাকে এখানে থাকতে হয়। জগনাথজিকে বলে তার ব্যবস্থা অবশ্য করে দেওয়া যেতে পারে।'

'এখানে থাকতে পারব না।'

'কেন?'

'এখানে থেকে বোম্বাইতে খবর পাঠানো যায় না।'

'তা হলে কী করে আমাদের সঙ্গে গাঁয়ে যাবেন?'

'হারবার্টগঞ্জের একটা ছোটো হোটেলে আমি উঠেছি। রোজ ভোরের ট্রেনে এখানে চলে আসব, সন্ধের পর ফিরে গিয়ে রিপোর্ট পাঠাব। ওখানে সব ব্যবস্থা আছে।'

হঠাৎ জগনাথের পরামর্শ বা হুঁশিয়ারি মনে পড়ে যায় অর্জুনকুমারের। তা ছাড়া মুখ ফুটে না বললেও কাল রাতে রেণুকার সঙ্গে ঘুরে আসার পর থেকে শরীর বেশ খারাপ লাগছে। আরও কয়েক দিন তাঁর বিশ্রাম দরকার। চিন্তিতভাবে তিনি বলেন, 'কিন্তু—'

'কী?' সুরেশ ক্যামেরা গুছিয়ে নিয়ে অর্জুনকুমারের দিকে তাকান।

অন্যমনস্কর মতো অর্জুনকুমার বলেন, 'কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে এখানে। চট করে বাড়ির বাইরে যাওয়া মুশকিল। কবে থেকে গাঁয়ে যেতে পারব, বুঝতে পারছি না।'

'নো প্রবলেম। আমি রোজ একবার করে আসছি। আপনি বেরুলে সঙ্গে থাকব। নইলে কী আর করা! আচ্ছা, আজ চলি।'

সুরেশ প্রচুর ছোটাছুটি করে খুবই ক্লান্ত হয়ে আছে। অর্জুনকুমাররা আজকের রাতটা থেকে যেতে অনুরোধ করেন কিন্তু তাকে আটকানো যায় না। বিনীতভাবে সে জানায়, হারবার্টগঞ্জে তাকে ফিরে যেতেই হবে। আসলে আজ রাতেই বোম্বাইতে অর্জুনকুমারের খবর পাঠাতে সে চেষ্টা করবে, সেটা আর মুখ ফুটে জানায় না।

সুরেশ চলে যাবার পর ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। আকাশ যেখানে দিগন্তে মিশেছে সেই লাইনটার ওপব রক্তবর্ণ সূর্যটা এখন দাঁড়িয়ে। মরা সোনার মতো জেল্লাহীন রোদ কুঁকড়ে পড়ে আছে চারিদিকে। মাঠের ওপর দিয়ে আরামদায়ক ঠান্ডা হাওয়া উঠে আসছে হু হু করে।

রোহিতরা সেই যে এসেছিলেন, এখনও অর্জুনকুমারের কামরাতেই আছেন। সবাই সুরেশের ব্যাপারেই কথা বলছিলেন।

হঠাৎ চটকদার হিন্দি গানের সুর ভেসে আসে টিলার নিচে থেকে। 'ও মেরে জান, মেরে দিলবালী—' দু-একটা লাইন বাজার পর রেকর্ড থামিয়ে মাইকে কেউ কী যেন বলতে বলতে চলেছে। মাঝে মাঝে অর্জুনকুমারের নামটা শোনা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে প্রবল হইচই ভেসে আসতে থাকে।

একটু পরেই দেখা যায় টিলার তলার কাচ্চী দিয়ে একটা ভৈসা গাড়ি হেলেদুলে চলেছে। সেটার ওপর তিন চারটে লোক বসে আছে। সার্কাসের ক্লাউনদের মতো তাদের সাজগোজ। গায়ে চিত্রবিচিত্র পোশাক, মাথায় চোঙা টুপি। একজন রেকর্ড চালাতে চালাতে মাঝে মাঝে থামিয়ে দিচ্ছে। তার ফাঁকে মাইকে আরেকটা লোক গলার স্বর কখনও উঁচুতে তুলে, কখনও খাদে নামিয়ে, এক নাগাড়ে কিছু বলে যাচ্ছে।

ভৈসা গাড়িটার পেছনে নানা বয়সের এক দঙ্গল মানুষ। বাচ্চাকাচ্চা থেকে মাঝবয়সী মেয়েপুরুষ, সব মিলিয়ে বিরাট জনতা। মাছির ঝাঁকের মতো তারা সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

ভৈসা গাড়ির তৃতীয় লোকটা তাদের দিকে রঙিন হ্যান্ডবিল ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছে।

রোহিত বলেন, 'মনে হচ্ছে তাম্বুবালা সিনেমার লোকেরা পাবলিসিটি করতে বেরিয়েছে।'

সঞ্জীব বলেন, 'পাবলিসিটির তরীকাটা দেখেছেন রোহিতজি! ক্লাউন সেজে যেভাবে সব বেরিয়ে পড়েছে, ক্যালকাটা দিল্লি বোম্বেতে তা ভাবাই যায় না।'

'যেখানে যা করলে ফায়দা ওঠানো যাবে তা-ই তো করতে হবে। এই রং ঢং তরীকা ছাড়া এখানে লোক টানা যাবে না।'

ভৈসা গাড়িটা 'রাজপুত নিকেত'-এর টিলার নিচে এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। গানের ফাঁকে ফাঁকে মাইকে সেই লোকটার চিৎকার চলছেই। আগে পরিষ্কার বোঝা না গেলেও এখন শুনতে অসুবিধে হচ্ছে না। সে যা বলছে তা এইরকম। দুনিয়ার সবসে বড়ে, সবসে প্যারা, সবসে 'জানিমানি' কলাকার অর্জুনকুমারের ফিলাম হোলির দিন সন্ধেয় শুরু হবে। মায়েরা, বহেনরা, ভাইয়োলোগ, আপনারা দলে দলে চলে আসবেন। আমাদের বহোত বহোত সৌভাগ, দুনিয়াকা সবসে বড়ে স্টার অর্জুনকুমারজি এখন এখানেই আছেন। দলে দলে আসবেন। যে ছবি এনেছি তার নাম 'দিল আউর মহব্বত', দেখলে আপনাদের দিল তর হয়ে যাবে।

হইচইটা হঠাৎ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। অর্জুনকুমারের কামরা দিয়ে দেখা যায়, ভৈসা গাড়ির পেছন পেছন যে জনতা আসছিল তাদের অনেকেই হঠাৎ টিলা বেয়ে ওপরে উঠে আসছে। তারা একসঙ্গে চিৎকার করে কী বলছে, বোঝা যায় না।

অর্জুনকুমারকে বেশ শঙ্কিত দেখায়। তিনি বলেন, 'দেখুন তো ফারুক ভাই, লোকগুলো হঠাৎ এদিকে আসছে কেন? মতলব কী ওদের?'

ফারুক দৌড়ে বেরিয়ে যায়।

ওধারে গেটের দারোয়ান জনতার দিকে বন্দুক তাক করে হুঙ্কার ছাড়ে, 'ভাগ শালে লোগ, ভাগ—'

বন্দুক দেখে লোকগুলো যেভাবে উঠে আসছিল তার পাঁচ গুণ স্পিডে দৌড়তে দৌড়তে নেমে যায়।

অর্জুনকুমাররা দেখতে পান, ফারুক নিচে গিয়ে দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলছে, তারপর গেট খুলে বেরিয়ে পাবলিসিটিওলাদের কাছে চলে যায়। কিছুক্ষণ বাদে যখন সে ফিরে আসে হিন্দি গান বাজতে বাজাতে ভৈসা গাড়ি আর জনতা দূরের গাঁগুলোর দিকে চলে যেতে শুরু করেছে।

খানকতক লাল নীল হ্যান্ডবিল অর্জুনকুমারকে দিয়ে ফারুক বলে, 'পাবলিসিটির নমুনা দেখুন।'

জেলজেলে পাতলা খেলো কাগজে ধ্যাবড়া করে অর্জুনকুমারের বড় ছবি ছাপা হয়েছে হ্যান্ডবিলগুলোতে। তার তলায় হিন্দিতে মোটা মোটা হরফে 'দিল মহব্বত' এবং অর্জুনকুমারের নামটা রয়েছে। আরও নিচে ছোটো অক্ষরে অন্য আর্টিস্ট, ডিরেক্টর এবং মিউজিক ডিরেক্টরের নাম।

হ্যান্ডবিলগুলো একপলক দেখে সামনের টেবলে রেখে দেন অর্জুনকুমার। জিজ্ঞেস করেন, 'ওই গেঁয়ো লোকগুলো উঠে আসছিল কেন?'

'ওরা দর্শনমাঙোয়া। কারা যেন কাল আর আজ গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে খবর দিয়ে এসেছে, দুনিয়ার সব থেকে বড় ফিল্মি হিরো 'রাজপুত নিকেত'-এ আছেন। তাই আপনাকে দেখতে এসেছিল।'

অর্জুনকুমার সঞ্জীব এবং রোহিত, তিনজনেই চমকে ওঠেন। চিন্তাগ্রস্তের মতো অর্জুনকুমার বলেন, 'মনে হচ্ছে, আমি যাতে ফ্রিলি ঘুরতে না পারি, সে জন্যে খবরটা রটানো হয়েছে। এখন বেরুলে লোকজন আমাকে ছেঁকে ধরবে। এই ষড়যন্ত্রটা কে করল বলুন তো?'

রোহিতরা বলেন, 'বুঝতে পারছি না।'

বিকেলে ফিল্মওলারা চলে যাবার পর আরও কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে।

এখন বেশ রাত হয়েছে। ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন অর্জুনকুমার, ঘুমও এসে গিয়েছিল। আচমকা চারিদিক থেকে বহু মানুষের চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে বসেন। খানিকক্ষণ চেঁচামেচিটা শুনতে থাকেন। তারপর আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ান।

হোলির আর দেরি নেই। গলানো চাঁদির মতো ধবধবে জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে। আকাশের চাঁদ ছাড়া মানুষের জ্বালানো আলো কোথাও চোখে পড়ে না। শুধু ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে, সব দিক থেকে একটানা গর্জনের মতো চিৎকারটা ভেসে আসছে। মানুষের কণ্ঠস্বর হলেও ওটা যেন অপার্থিব, ভয়ঙ্কর এবং আতঙ্কজনক। অচেনা ভয়ে প্রায় ঘামতে শুরু করেন অর্জুনকুমার।

এদিকে হল্লা শুনে 'রাজপুত নিকেত'-এর অন্য সবারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। নৌকররা ডায়নামো চালিয়ে ফের আলো জ্বালিয়ে দেয়। গেটের দারোয়ান শিরদাঁড়া টান করে দাঁড়িয়ে থাকে।

রোহিতরা অর্জুনকুমারের কামরায় দৌড়ে আসেন। সঞ্জীব জানালার কাছে গিয়ে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করেন, 'কী হয়েছে দারোয়ানজি, অত গণ্ডগোল কিসের?'

দারোয়ান বলে, 'জানি না হুজৌর।'

'যারা হল্লা করছে, এদিকে চলে আসবে নাকি?'

দারোয়ান জানায়, মুনেশ্বরজির কোঠিতে হাঙ্গামা করতে আসবে, এমন সাহস বা স্পর্ধা কারো হবে না। যদি তেমন দুঃসাহস হয়, এখান থেকে কেউ ফিরে যাবে না। তার কাছে কমসে কম বন্দুকের হাজারটা গুলি আছে। সে বলে, 'আপনারা আরাম করুন সরকার। আমি জেগে আছি।'

বাকি রাত হল্লা চলতেই থাকে। তবে 'রাজপুত নিকেত'-এর দিকে কেউ আসে না।

তেরো

পরদিন সকালে জগনাথ এসে জানান, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে অর্জুনজি, এখানে বোধ হয় দাঙ্গা শুরু হয়ে যাবে।' তাঁকে অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত আর অস্থির দেখায়।

অর্জুনকুমারের কামরায় সঞ্জীবরাও ছিলেন। সবাই চমকে ওঠেন, 'দাঙ্গা!'

'হাঁ।' আস্তে মাথা নাড়েন জগনাথ, বলেন, 'কমিউনাল রায়ট।'

অর্জুনকুমাররা স্তম্ভিত। সমস্ত অঞ্চল জুড়ে যেখানেই যাওয়া যাক, শুধু দারিদ্র আর ভুখ। এ যেন সেই জিওগ্রাফি অফ হাঙ্গার। এছাড়া কুসংস্কার এবং অশিক্ষায় গোটা এলাকাটা আকণ্ঠ ডুবে আছে। নিছক বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এখানকার মানুষজনকে এত যুদ্ধ করতে হয় যে অন্য কোনোদিকে তাদের তাকানোর সময় নেই। এই শান্ত, নিরীহ, ভীরুর চেয়েও ভীরু, গরিবের চেয়েও গরিব লোকগুলো দাঙ্গা বাধাবে, এ একেবারেই অভাবনীয়।

অর্জুনকুমার বলেন, 'এতদিন আমরা এতগুলো গাঁয়ে ঘুরলাম কিন্তু একবারও তো মনে হয়নি দুই কমিউনিটির মধ্যে কোনোরকম ইল-ফিলিং বা শত্রুতা রয়েছে। হঠাৎ কী এমন হল যাতে দাঙ্গা বাধতে পারে?'

জগনাথ সায় দিয়ে বলেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন অর্জুনজি। আমাদের এই এলাকাটা ছিল বহুত পিসফুল—বিলকুল শান্তিকা দিয়ারা। আইল্যান্ড অফ পিস। লেকিন পরশু থেকে সব বদলে গেছে। চারদিকে এখন স্রেফ উত্তেজনা আর টেনশন।'

'কারণটা কী?'

জগনাথ জানান, এখানে যে বিষুণজির মন্দির রয়েছে হোলির দিন চারিদিকের গাঁ থেকে মানুষ মিছিল করে ফাগ ওড়াতে ওড়াতে আর রং খেলতে খেলতে সেখানে যায়। সারাদিন মন্দির ঘিরে মেলা আর তৌহার চলে।

মন্দিরের কাছাকাছি মাইনোরিটিদের ক'টা গ্রাম রয়েছে। হোলির দু-একটা মিছিল গাঁয়ের ভেতর দিয়ে যায়, তবে বেশির ভাগই যায় ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে। এইভাবেই আবহমান কাল চলে আসছে। কিন্তু এবার আবহাওয়া একেবারে অন্যরকম। কারা যেন এসে তাতিয়েছে ফাগুয়ার সব মিছিল মাইনোরিটিদের গাঁয়ের ভেতর দিয়েই নিয়ে যেতে হবে, মাঠ ভেঙে কেউ যাবে না। মাইনোরিটিদেরও পরামর্শদাতার অভাব নেই। তাদেরও মরণপণ জেদ, হোলির একটা মিছিলও গাঁয়ে ঢুকতে দেবে না। জান কবুল। টেনশনটা এই নিয়েই। হোলির দিন কী হবে, কেউ জানে না।

অর্জুনকুমারকে উৎকণ্ঠিত দেখায়। তিনি বলেন, 'কাল রাত্তিরে এই জন্যেই কি চারপাশের গাঁগুলোতে গোলমাল হচ্ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'টেনশন চলছে। যত তাড়াতাড়ি পারেন, পুলিশে খবর দিন। রায়ট কোনোভাবেই বাধাতে দেওয়া যায় না। এতে শুধু কিছু নিরীহ মানুষ মারা পড়ে।'

রোহিত বলেন, 'এভাবে খুনখারাপির কোনো মানে হয় না। টোটালি মিনিংলেস।'

'আমি এখন যাই। দেখি কী করতে পারি।' বলতে বলতে উঠে পড়েন জগনাথ। দরজা পর্যন্ত গিয়ে একবার ঘুরে দাঁড়ান, 'অর্জুনজি, আপনি কিন্তু বেরুবেন না। এখানে আছেন, সেটা জানাজানি হয়ে গেছে। হাওয়া যেরকম গরম, আপনি বাইরে বেরুলে কী হয়ে যাবে, কে জানে।'

ফারুক বলে, 'আপনি ঠিক বলেছেন জগনাথজি। আমরা অর্জুনসাবকে 'রাজপুত নিকেত'-এর বাইরে যেতে দিচ্ছি না।'

জগনাথ আর দাঁড়ান না, সোজা বাইরের প্যাসেজ ধরে একতলার সিঁড়ির দিকে চলে যান।

জগনাথ চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উদ্‌ভ্রান্তের মতো অর্জুনকুমারের কামরায় এসে ঢোকেন রেণুকা। একটা সোফায় বসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, 'কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে, সে খবর কি পেয়েছেন?'

অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি নিশ্চয়ই কমিউনাল রায়টের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কয়েক মিনিট আগে আপনার বাবুজি এসেছিলেন। তাঁর কাছে সব শুনলাম। ভয়ঙ্কর ব্যাপার।'

হঠাৎ হাত দু'টো মুঠো পাকিয়ে যায় রেণুকার, গলার কাছে রক্তবাহী শিরাগুলো সমানে লাফাতে থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি তীব্র গলায় বলেন, 'বলতে লজ্জায় মাথা কাটা যায়, তবু শুনে রাখুন, এই রায়টের মেইন আর্কিটেক্ট আমার বাবুজি। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন রমজান সাহেব।' ক্রোধে ঘৃণায় এবং ধিক্কারে তাঁর কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকে।

অর্জুনকুমার ভয়ানক চমকে ওঠেন, 'বলেন কী!'

জোরে মাথা নাড়েন রেণুকা।

অর্জুনকুমার বিমূঢ়ের মতো জিজ্ঞেস করেন, 'রায়ট বাধিয়ে ওঁদের লাভ?'

রেণুকা এবার যে ব্যাখ্যাটা দেন তা খুবই চমকপ্রদ। রায়ট হলে জগনাথ মিশ্রর ব্যক্তিগত কোনো লাভ নেই, এটা বাধানোর চক্রান্ত চলছে তাঁর মনিব মুনেশ্বর সিংয়ের স্বার্থে। এখানকার অনেকেই এবার খরার সময় হারবার্টগঞ্জ এবং অন্যান্য শহরে ঠিকাদারদের কাছে কাজ করতে গিয়েছিল। জগনাথরা চাষের জন্য যা মজুরি দেন, ঠিকাদাররা তার দ্বিগুণের মতো দিয়েছে। ফলে কম মজুরিতে তারা আর কাজ করতে চাইছে না। তা ছাড়া পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট অর্থাৎ রঘুবীরেরা তাদের অধিকার সম্বন্ধে ক্রমশ সজাগ করে তুলছে। যে কোনো দিন এখানে বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। সুতরাং ধর্মীয় ফ্যানাটিসিজমকে উসকে দিয়ে যদি রায়ট বাধানো যায়, লোকজন মরবে, ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হবে, গরিবের ঘরে যার যেটুকু আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন করুণার অবতার হয়ে জগনাথ দৌড়ে যাবেন। গ্রামের লোকেদের নতুন ঘর বানিয়ে দেবেন, লঙ্গরখানা খুলে যতদিন না কেউ কামাই করতে পারছে, খাইয়ে যাবেন। চড়া সুদে নগদ কিছু টাকা দিয়ে খত লিখিয়ে নেবেন। বিগলিত, কৃতজ্ঞ মানুষ ঠিকাদারদের কথা বেমালুম ভুলে যাবে, রঘুবীররা যে অধিকার বা জমি ছিনিয়ে দেবার কথা বলে, তা-ও আর মাথায় থাকবে না। কম মজুরিতে ঘাড় গুঁজে ফের তারা মুনেশ্বর সিংয়ের জমি চষে যাবে। পুরুষানুক্রমে যেমনটি চলছিল তেমনিটই চলতে থাকবে। স্ট্যাটাসকো বা স্থিতাবস্থায় কোনোরকম ব্যাঘাত ঘটবে না।

রমজান সাহেবের অঙ্কটা একটু অন্য ধরনের এবং আরও সুদূরপ্রসারী। তাঁর জমিতেও চাষবাসের সমস্যা রয়েছে। একইভাবে মানুষ মেরে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে, পরে অসীম সহানুভূতিতে গরিব গাঁওবালাদের পাশে দাঁড়িয়ে সমস্যাটার সমাধান করা যাবে। এর পাশাপাশি আরেকটা বড় ব্যাপারও আছে। দশ বছরে দু'টো জেনারেল ইলেকশন আর একটা বাই-ইলেকশনে দাঁড়িয়ে তিনি হেরে গেছেন। সবচেয়ে কম ভোট তিনি পেয়েছেন মাইনোরিটিদের কাছ থেকে। ধর্মীয় উন্মাদনাকে খুঁচিয়ে দিতে পারলে তাঁর এবং জগনাথের ধারণা সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক তাঁর পক্ষেই চলে যাবে।

শুনতে শুনতে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন অর্জুনকুমাররা।

রেণুকা বলেন, 'কী মারাত্মক হিসেব একবার ভেবে দেখুন। ব্লাডশেড যেভাবে হোক বন্ধ করতেই হবে। আর এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য দরকার।'

অর্জুনকুমার জিজ্ঞেস করেন, 'কী রকম সাহায্য?'

'এক্ষুনি ঠিক বলতে পারছি না। তবে আপনার মতো মোস্ট পপুলার স্টার, সোসাইটির ওপর যাঁর প্রচণ্ড ইনফ্লুয়েন্স একবার যদি পীপলের সামনে গিয়ে দাঁড়ান, তাদের বোঝান, যথেষ্ট কাজ হবে।'

একধারে দাঁড়িয়ে ছিল ফারুক। সে বলে, 'অর্জুনজির শরীর ভালো না। এখানকার এই সব টেনশন আর এক্সাইটমেন্টের ভেতর তাঁকে টেনে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না রেণুকাজি।'

সেদিন মধ্যরাতে রঘুবীরদের সঙ্গে দেখা করে আসার পর থেকে শরীর একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। যদিও এর মধ্যে আর বাইরে বেরোননি, তবু বুকের ভেতর চাপা একটা অস্বস্তি চলছেই। সেই সঙ্গে কিছুটা শ্বাসকষ্ট। নিয়মিত ওসুধ খেয়েও সেটা কমানো যাচ্ছে না।

রেণুকা বলেন, 'ওঁর শরীরের ব্যাপারটা আমি জানি। তবু প্রতিটি মানুষের কিছু সোশাল কমিটমেন্ট থাকা উচিত ফারুকভাই। অর্জুনজি একবার গিয়ে দাঁড়ালে কয়েকটা প্রাণ যদি বেঁচে যায় সেটা পঞ্চাশটা সুপার ডুপার হিট ছবির সাকসেসের চেয়ে অনেক বড় ঘটনা। অবশ্য রায়ট এখনও বাধেনি। বাধলে তবেই ওঁকে যেতে হবে।'

রেণুকা আর বসেন না, উঠে পড়েন।

অর্জুনকুমার বলেন, 'এখন কোথায় যাবেন?'

'রঘুবীরদের সঙ্গে দেখা করব। দেখি, কিছু করা যায় কিনা।' বলে একটু থামেন রেণুকা। কী ভেবে ফের শুরু করেন, 'আরেকটা খবর দিয়ে যাই। আপনি যাতে গাঁয়ের মানুষের কাছে যেতে না পারেন সে জন্যে বাবুজি লোক লাগিয়ে আপনার এখানে থাকার খবরটা রটিয়ে দিয়েছে। কেননা আপনি ওদের কাছে গেলে রায়ট বাধানো সহজ হবে না।'

রেণুকা চলে যাবার পর ফারুকরা অর্জুনকুমারের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, 'আপনি কি সত্যিই দাঙ্গা হলে গাঁয়ে যাবেন?'

অর্জুনকুমার হাসেন, 'আগে দাঙ্গা হোক, তারপর তো যাবার কথা।'

চোদ্দ

আরও দু'টো দিন প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে কেটে যায়। এখানকার আবহাওয়া আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। চারিদিকের গাঁগুলো থেকে সর্বক্ষণই চিৎকার আর নানা ধরনের উত্তেজক স্লোগান ভেসে আসতে থাকে।

অর্জুনকুমাররা খবর পাননি, সুরেশ রোজ এখানে ঘুরে গিয়ে সন্ধেয় বোম্বাইতে যে রিপোর্ট পাঠায় সেগুলো একদিন পর পর তাদের কাগজে ছাপা হয়ে যায়। ওই কাগজের কপি এই গ্রামাঞ্চলে কোনোদিনই এসে পৌঁছয় না।

অর্জুনকুমার যেখানে আছেন সেখানে যে দাঙ্গার ষড়যন্ত্র চলছে, এই খবরটাও কাগজে বেরিয়ে গেছে। তাঁর এবং এখানকার মানুষজনের নিরাপত্তার জন্য স্টেট এবং সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খুবই উদ্বিগ্ন। পাটনা থেকে বিরাট আর্মড ফোর্স পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

টেলিভিশন, রেডিও এবং ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের খবরের কাগজ অর্থাৎ সব রকম মিডিয়ার লোকেরা ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার নিয়ে ধরমপুরার দিকে বেরিয়ে পড়েছে।

অর্জুনকুমারের খবর জানতে পেরে পাটনা ধানবাদ মজঃফরপুর পূর্ণিয়া কাটিহার—এমনি দূরের এবং কাছের শহরগুলো থেকে তাঁর ফ্যানেরা এখানে আসার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে।

ফারুক লুকিয়ে হারবার্টগঞ্জে গিয়ে রাধিকাকে টেলিগ্রাম করেছিল। দুই ছেলেমেয়ে বিবেক আর বনিতাকে নিয়ে তিনিও আসছেন।

আজ হোলি।

দাঙ্গা যে অনিবার্য সেটা কাল রাত থেকেই টের পাওয়া যাচ্ছিল। চারিদিকে শুধু উন্মত্ত চিৎকার আর ভয়াবহ সব স্লোগান।

গোটা রাত এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমোতে পারেননি অর্জুনকুমার। জানালার গ্রিল ধরে বাইরে তাকিয়ে থেকেছেন শুধু। আগের সেই কষ্ট আর অস্বস্তিটা চোরা বানের মতো এখন তাঁর সারা বুকে চারিয়ে গেছে।

রাত জাগার কারণে চোখ জ্বালা করছে, মাথাটা ভীষণ ভারী। কপালের দু'ধারে শিরাগুলো সমানে দপ দপ করছে অর্জুনকুমারের।

একসময় অন্ধকার কেটে যায়। দিগন্তের তলা থেকে উঠে আসে ফাল্গুনের সূর্য। ঝলমলে সোনালি রোদে ভরে যায় মাঠঘাট, ফাঁকা শস্যক্ষেত্র।

আর তখনই বহুদূরে দেখা যায় কয়েক হাজার মানুষ ঢোল করতাল বাজিয়ে হয়ত হোলির গান গাইতে গাইতে চলেছে। তাদের গানের একটি বর্ণও বোঝা যায় না, তবে সমুদ্র গর্জনের মতো আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে।

একসময় লোকগুলোকে আর দেখা যায় না। দূরে গাছপালার যে লাইনটা রয়েছে তার আড়ালে ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়। কিছুক্ষণ বাদেই ওধারের গাঁগুলো থেকে অমানুষিক চিৎকার আর কান্নার আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে। তারপরেই দেখা যায়, ধোঁয়ায় ছেয়ে যাচ্ছে আকাশ।

পেছন থেকে কে যেন বলে ওঠে, 'হরিবল, রায়ট বোধহয় শুরু হয়ে গেল।'

চমকে পেছন ফিরে অর্জুনকুমার দেখেন—ফারুক। তার পাশে রোহিত এবং সঞ্জীব। কখন ওঁরা এ ঘরে এসেছেন, টের পাননি অর্জুনকুমার। সবার চোখেমুখে ঘোর উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তার ছাপ।

উত্তর না দিয়ে অর্জুনকুমার ফের জানালার বাইরে তাকান।

কতক্ষণ ওঁরা চুপচাপ শ্বাসরুদ্ধের মতো বাসিমুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন, খেয়াল নেই। হঠাৎ নিচে গেটের কাছ থেকে রেণুকার গলা ভেসে আসে, 'অর্জুনজি, এক্ষুনি চলে আসুন। হয়তো এখনও সর্বনাশ ঠেকানো যাবে।'

রেণুকা একাই নয়, তাঁর সঙ্গে রয়েছে রঘুবীর এবং আরও কয়েকজন পলিটিক্যাল অ্যাকটিভিস্ট।

পাশ থেকে রোহিতরা অনবরত বলতে থাকেন, 'যাবেন না অর্জুনজি, যাবেন না।'

অর্জুনকুমার বিচলিত হয়ে পড়েন। বিভ্রান্তের মতো একবার রেণুকাদের, পরক্ষণে রোহিতদের দিকে তাকান। কী করবেন, ভেবে উঠতে পারেন না।

ওধারে রেণুকারা ব্যাকুলভাবে ডেকেই যাচ্ছেন।

শেষ পর্যন্ত অর্জুনকুমার কী সিদ্ধান্ত নিতেন বলা যায় না। আচমকা দেখা যায়, টিলা বেয়ে উন্মাদের মতো উঠে আসছে হাস্‌সু। সেই মেয়েটা যার নিষ্পাপ মুখে জগতের সবটুকু সারল্য মাখানো। পাখি ধরতে গিয়ে নকল ঝোপের লতাপাতা সরিয়ে অবাক চোখে তাঁর দিকে সে চেয়ে থেকেছে। এই গ্রামাঞ্চলে হাস্‌সুই প্রথম তাঁকে চিনেছিল।

এখন আর হাস্‌সুকে চেনা যায় না। তার রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ছে। চোখের দৃষ্টিতে আতঙ্ক। সারা গা ঘামে ভিজে যাচ্ছে।

হাস্‌সু বুক ফাটিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চেঁচায়, 'বাঁচান অর্জুনসাব, আমার ঘরবালাকে বাঁচান, আমার গাঁওবালাদের বাঁচান।' এর পর একটানা কান্নামাখা জড়ানো গলায় সে যা বলে যায় তা এইরকম। শত শত দুশমনকে একা শায়েস্তা করেছেন, অর্জুনকুমারের এমন অনেক ছবির নাম করে হাস্‌সু। যিনি এমন প্রচণ্ড শক্তিমান তিনি অবশ্যই দাঙ্গাবাজদের ঢিট করে দিতে পারবেন।

হাস্‌সুর কথাগুলো অর্জুনকুমারের সমস্ত অস্তিত্বকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে যায়। সিনেমার ইলিউশনকে মেয়েটা সত্যি বলে ধরে নিয়েছে। বিহ্বলের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন অর্জুনকুমার, তারপরেই টের পান তার মধ্যে কোথায় যেন মারাত্মক ভাঙচুর চলছে। কেউ যেন একটানে তাঁকে 'রাজপুত নিকেত' থেকে উপড়ে তুলে নিয়ে যায়। কখন যে সিঁড়ি ভেঙে তিনি নিচে নেমে হাস্‌সু রঘুবীর আর রেণুকাদের সঙ্গে দৌড়তে শুরু করেছেন, জানেন না। সমস্ত ব্যাপারটা যেন ঘোরের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে।

ফারুকরাও নেমে এসেছিল। অর্জুনকুমারের পেছনে দৌড়তে দৌড়তে পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকে, 'মাত্ যাইয়ে, মাত্ যাইয়ে—'

কিন্তু কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না অর্জুনকুমার। মাঠ ভেঙে তিনি ছুটেই চলেছেন।

ওঁরা কেউ লক্ষ করেননি, পেছনে অনেক দূরে গৈয়া ভৈসা এবং টাঙ্গায় করে বা পায়ে হেঁটে আর্মড গার্ড, মিডিয়ার লোকেরা আর অর্জুনকুমারের অগুনতি ফ্যান এদিকেই আসছে। নিশ্চয়ই সকালের ট্রেনে তারা ধরমপুরা স্টেশনে এসে নেমেছিল।

ছুটতে ছুটতে হাস্‌সুদের গাঁয়ের সামনে এসে পড়েন অর্জুনকুমাররা। জ্বলন্ত গাঁয়ের ভেতর তখন তাণ্ডব চলছে।

হঠাৎ অলৌকিক এক শক্তি যেন ভর করে অর্জুনকুমারের ওপর। গলার শির ছিঁড়ে তিনি গর্জে ওঠেন, 'রুখ যাও, রুখ যাও। হত্যা বন্ধ করো।' বলতে বলতেই টের পান পায়ের তলায় ভূমিকম্পের মতো কিছু একটা ঘটে চলেছে। টলতে টলতে তাঁর দীর্ঘ শরীর মাটিতে আছড়ে পড়ে। অর্জুনকুমারের চোখের সামনে থেকে সমস্ত পৃথিবী বিলুপ্ত হয়ে যায়।

*　　　*　　　*

এখানকার দাঙ্গা থেমে গেছে।

পর দিন সকালে পাটনা থেকে কাচের শবাধার আনানো হয়। তার ভেতর অর্জুনকুমারের দেহটি শুইয়ে এখন এই বিকেল বেলায় রোহিত, সঞ্জীব, ফারুক এবং আরও অসংখ্য মানুষ পালা করে বয়ে নিয়ে চলেছে ধরমপুরা স্টেশনের দিকে। অর্জুনকুমারের শব প্রথমে ট্রেনে নিয়ে যাওয়া হবে পাটনায়, সেখান থেকে প্লেনে বোম্বাই।

কাল বিকেলের ট্রেনে রাধিকা দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে এখানে চলে এসেছিলেন। শবাধারের পেছনে মুনেশ্বর সিংয়ের একটা ল্যান্ডোতে বসে আছেন তাঁরা আর অঝোরে কেঁদে চলেছেন। ল্যান্ডোর পেছনে উন্মাদের মতো কাঁদছে হাস্‌সু আর সেই মেয়েটা যাকে গাঁ থেকে উদ্ধার করে এনে 'রাজপুত নিকেত'-এ আশ্রয় দিয়েছিলেন অর্জুনকুমার, অর্থাৎ কুঁদরী। তাদের এবং রাধিকাদের কান্নার শব্দ আদিগন্ত মাঠের ওপর বিষাদ ছড়িয়ে দিতে থাকে।

শবাধারের পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছিলেন রেণুকা, রঘুবীর এবং পলিটিক্যাল অ্যাকটিভিস্টরা। একধারে জগনাথ আর রমজান সাহেবকেও দেখা যায়। নতমুখে তাঁরা পা ফেলছেন।

সবার পিছনে নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে বিশাল জনতা—স্তব্ধ, বিষণ্ণ, শোককাতর।

ফিল্ম ওয়ার্ল্ডের একমাত্র মেগা স্টার এই মুহূর্তে জনগণের শিল্পী হয়ে মানুষের কাঁধে কাঁধে শেষ যাত্রায় চলেছেন।

প্রতিধ্বনি

নহরপুরা টাউনের শেষ মাথায় সুমিত্রার কোয়ার্টার। কোয়ার্টার বলতে টালির চালের দু'খানা বড় বড় ঘর, কিচেন আর বাথরুম। মেঝে অবশ্য পাকা, আর দেওয়ালগুলো ইটের।

সামনের দিকে ঢালাও উঠোন। তার একধারে বাঁধানো কুয়ো, আরেক ধারে মাঝারি মাপের চাপা একটা ঘর। এই ঘরটায় থাকে আধবুড়ো রামবনবাস আর তার ঘরবালী লখিয়া।

পুরো কোয়ার্টারটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এর ডানপাশে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের প্রাইমারি স্কুল। সুমিত্রা ওখানকার হেড মিস্ট্রেস। রামবনবাস এবং লখিয়া ওই স্কুলের ক্লাস ফোর স্টাফের কর্মচারী।

সুমিত্রার মতো তরুণীর পক্ষে শহরের এই নির্জন প্রান্তে একা থাকাটা নিরাপদ নয়। তাই কোয়ার্টারের ভেতর রামবনবাসদের ঘর দেওয়া হয়েছে। এক হিসেবে তারা সুমিত্রার পাহারাদার।

স্কুল-বাড়ির ওধারে আরও ক'টি কোয়ার্টার আছে। কিন্তু সেগুলো তালা-বন্ধ। কেননা সুমিত্রা ছাড়া আর যে ছ'জন টিচার রয়েছে তারা নহরপুরা টাউনেরই বাসিন্দা। নিজেদের বাড়ি থেকে তারা যাতায়াত করে। তাদের বাসস্থানের সমস্যা নেই। শুধু সুমিত্রাই এসেছে একশো কিলোমিটার দূরের কাটিহার থেকে। কোয়ার্টারে থাকা ছাড়া তার উপায় নেই।

নহরপুরাকে টাউন বলা যাবে কিনা তা নিয়ে জোর তর্কাতর্কি চলতে পারে। ভারতবর্ষ কেন, বিহারের মানচিত্রেও এই জায়গাটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। গোটা কয়েক এবড়ো খেবড়ো আঁকাবাঁকা খোয়ার রাস্তা, তিন ফিট চওড়া কাঁচা নর্দমাগুলোতে থকথকে কালচে স্রোত, কয়েক কোটি মশা, মাছি এবং যাবতীয় রোগের অদৃশ্য জীবাণু, পঁচিশ তিরিশ গজ পর পর বজরঙ্গবলী রামসীতা বা কিষুণজির মন্দির, টালির বা টিনের চালের বাড়িঘরের ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটে ঝকঝকে একতলা কি দোতলা— এই নিয়ে নহরপুরা টাউন। এরই মধ্যেই শহরের ঠিক মাঝখানে ঠিকাদার মুনীশ্বর ঝা'র চারতলা বিশাল বাড়িটা প্রবল ঔদ্ধত্যে আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে। বছরখানেক হল ওখানে বিজলি এসেছে। নহরপুরার পয়সাওলাদের ঘরে ইলেকট্রিক লাইট জ্বলে। শহরে যে একটা মিউনিসিপ্যালিটি আছে, তার প্রমাণ হিসেবে সন্ধের পর ঘণ্টাখানেকের জন্য রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে দু'চারটে বাল্ব টিমটিম করে কিঞ্চিৎ আলো বিতরণ করেই নিভে যায়।

সন্ধে পার হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ আগেই। এখন ন'টার মতো বাজে। সুমিত্রা তার বেড-রুমে বিছানায় আধশোয়া ভঙ্গিতে কাত হয়ে একটা বই পড়ছিল। তার বয়স ছাব্বিশ সাতাশ। টান টান, ঝকঝকে চেহারা। সুমিত্রার দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায়, তাকে ঘিরে রয়েছে অটুট এক ব্যক্তিত্ব।

সমাজকল্যাণ দপ্তর স্কুলের কোয়ার্টারগুলোতে বিজলি বাতির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সেজন্য সুমিত্রা খুবই কৃতজ্ঞ। হেরিকেন বা মোমের আলোয় থাকার অভ্যাস নেই তার।

স্কুলটা নহরপুরা মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় হলেও সুমিত্রার ছাত্ররা আসে আশেপাশের দশ পনেরোটা গাঁ থেকে। ছাত্ররা সবাই জল-অচল অচ্ছুৎ—দোসাদ, গঞ্জু, গাঙ্গোতা বা ধাঙড়। স্কুলটা তাদের জন্যই খোলা হয়েছে।

দিনের বেলা এগারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত ক্লাস। ছুটির পর কোয়ার্টারে ফিরে একটু জিরোতে না জিরোতেই বেশি বয়সের ক'টি মেয়ে পড়তে আসে। সারাদিন কাজকর্মের পর পড়াশোনার জন্য এই সময়টুকুই তারা বার করে নিতে পারে। সমাজকল্যাণ দপ্তরে বয়স্ক শিক্ষার যে সরকারি কার্যক্রম রয়েছে, সুমিত্রা তার আওতাতেও পড়ে। এতে তার আপত্তি নেই। স্কুল ছুটির পর সময় যখন আর কাটতে চায় না তখন এই মেয়েদের পেয়ে খুশিই হয় সুমিত্রা। এই নগণ্য শহরে সিনেমা নেই, থিয়েটার নেই, হই হই করে অবসর কাটানোর মতো কোনো উপকরণ নেই। এই মেয়েগুলোকে পেয়ে সে বেঁচে গিয়েছে।

ঘণ্টা দেড়েক আগে বড় মেয়েরা পড়া শেষ করে আজকের মতো চলে গেছে। তারপর থেকে পৃথিবীর এই প্রান্তে জীবন একেবারে স্তব্ধ।

বই পড়তে পড়তে একবার শিয়রের দিকের বড় জানালাটার বাইরে তাকায় সুমিত্রা। তার কোয়ার্টারের দেওয়াল যেখানে শেষ হয়েছে তার পর থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার পর্যন্ত একটানা ধানখেত। ফাঁকে ফাঁকে অচ্ছুৎদের গাঁ।

ফাল্গুন মাস শেষ হয়ে এসেছে। ক'দিন পর এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় পরব হোলি। আকাশে রুপোর থালার মতো গোল চাঁদের গা থেকে মায়াবী আলো ঝরে পড়ছে নিচের পৃথিবীতে।

মাঠ এখন একেবারে ফাঁকা। মাস তিনেক আগেই কিষানরা ফসল কেটে নিয়ে গিয়েছে। এখন কোথাও একদানা শস্য চোখে পড়বে না।

এই মুহূর্তে শূন্য চরাচর জুড়ে হাজার হাজার জোনাকি জ্বলছে আর নিভছে। কোনো অদৃশ্য পাতাল থেকে ঝিঁঝিদের বিলাপ উঠে আসছে। কাছাকাছি কোথায় যেন কামার পাখিরা মাঝে মাঝে কর্কশ স্বরে ডেকে উঠছে। সেই শব্দ করাতের মতো বাতাস চিরে চিরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

সুমিত্রার মনে হয়, সময় যেন গতি এবং বেগ হারিয়ে এই মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। ঝিঁঝি বা কামার পাখিদের ডাক সত্ত্বেও জীবনের কোনো লক্ষণই যেন এখানে নেই। সে বুঝিবা জীবন্ত পৃথিবী থেকে এক অলৌকিক চিরনিদ্রার দেশে চলে এসেছে।

ফাল্গুন শেষ হয়ে এলেও শীতের অল্প একটু রেশ এখনও থেকে গেছে। সন্ধের পর দক্ষিণ দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে থাকে। রাত যত বাড়ে, বাতাসে হিম আরও বেশি করে মিশে যায়।

সুমিত্রার বেশ শীত করছিল। শাড়ির আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে ডান পাশের ছোট নিচু কাঠের আলমারিটার দিকে তাকায় সে। ওটার মাথায় একটা গোল টেবল-ক্লক বসানো রয়েছে। ঘড়িতে এখন ন'টা বেজে পঁয়ত্রিশ।

সুমিত্রা ঠিক করে ফেলে, এবার খেয়ে শুয়ে পড়বে। লখিয়া তার রাতের খাবার অর্থাৎ রুটি তরকারি এবং কিছু ভাজাভুজি যত্ন করে ঘরের কোণে গুছিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখেছে। এমনকি, জলের গেলাস এবং জগটিও পাশেই রেখে দিয়েছে।

সুমিত্রা দিনের বেলা নিজের হাতেই চাট্টি চাল ডাল ফুটিয়ে নেয়। কিন্তু সন্ধেবেলা রান্নাটান্না করতে তাব ভয়ানক আলস্য। এব্যাপারটা লখিয়ার ওপরই একরকম জোরজার করে সে চাপিয়ে দিয়েছে।

প্রথম প্রথম সুমিত্রার জন্য রুটি টুটি করে দিতে ঘোর আপত্তি ছিল লখিয়াদের। কেননা, সুমিত্রা উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ আর লখিয়ারা ঠাকুর অর্থাৎ নাপিত। কিন্তু সুমিত্রা কোনো কথা শোনেনি। জানিয়েছে, আদৌ সে জাতপাত মানে না। শেষ পর্যন্ত প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও লখিয়া রুটি বানাতে রাজি হয়েছে কিন্তু ভাত কখনই না। তার ছোঁয়া ভাত খেলে সুমিত্রার ব্রাহ্মণত্বের যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা-ও আর থাকবে না। জেনে শুনে এরকম একটা মারাত্মক পাপ সে কিছুতেই করতে পারবে না।

কথাটা মনে পড়তে একটু হাসে সুমিত্রা। ঘড়ির দিক থেকে তার চোখ আরেক বার জানালার বাইরে চলে যায়। রামবনবাস আর লখিয়ার কোনো সাড়াশব্দ নেই। এমনিতে ওরা মানুষ খুব ভালো। যথেষ্ট বিনয়ী এবং অনুগত, কিন্তু ভীষণ ঘুমকাতুরে। সন্ধে হতে না হতেই রাতের খাওয়াটি কোনোরকমে চুকিয়ে শুয়ে পড়ে। সুমিত্রা মাঝে মাঝে ভাবে, সমাজকল্যাণ দপ্তর তার জন্য ভালো পাহারাদারই জুটিয়ে দিয়েছে! আর রাত করা ঠিক হবে না। সুমিত্রা বিছানা থেকে নামতে যাবে, হঠাৎ বাইরে থেকে অনেকগুলো গলা ভেসে আসে, 'মা'জি, বহেনজি—' কারা যেন অধীরভাবে ডাকাডাকি করছে। সেই সঙ্গে দরজায় ধাক্কা দেওয়ার আওয়াজ।

সুমিত্রা চমকে ওঠে, একটু ভয়ও পেয়ে যায়। এত রাতে কারা তার কাছে আসতে পারে? মা এবং বোন বলে ডাকাটা কোনো ফন্দি নয় তো? দরজা খুললে বিপদে পড়বে কিনা সুমিত্রা বুঝতে পারে না।

বাইরের লোকগুলোর অধীরতা ক্রমশ বাড়তে থাকে, 'দরবাজা খুলিয়ে বহেনজি, দরবাজা খুলিয়ে—'

আগে খেয়াল করেনি সুমিত্রা। এবার স্পষ্ট শুনতে পায়, বাইরে যারা ডাকছে তাদের মধ্যে মেয়েরাও আছে। কিছুটা সাহস ফিরে আসে সুমিত্রার। তবু তাকে সতর্ক থাকতে হবে, হুট করে কিছুতেই বাইরের দরজা খুলবে না। খুব সন্তর্পণে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনের কোণে গিয়ে রামবনবাসদের ঘুম ভাঙিয়ে বাইরে ডাকাডাকির ব্যাপারটা জানায় সুমিত্রা।

রামবনবাস চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কৌন রে?'

বাইরে থেকে জবাব আসে, 'হামনিলোগ।'

'কৌন হামনিলোগ?' গলা আরও চড়ায় রামবনবাস।

'যোগীগাঁও আউর পিপরিয়াকা আদমি—বিষুণ, মহাদেও, অওতার, লাখন, সোমবারী, পুনিয়া—'

সব নামই চেনা। যোগীগাঁও এবং পিপরিয়া, এই গ্রাম দু'টো খুবই কাছে, কোনাকুনি মাঠের ওপর দিয়ে দেড় দু' কিলোমিটার হাঁটলেই ওখানে পৌঁছুনো যায়।

রামবনবাস হুঁশিয়ার মানুষ। নাম-ঠিকানা জানার পরও সে আরেকটু বাজিয়ে নেয়, 'এত রাতে কী জন্যে এসেছ? কাল সুবেহ্ চলে এসো।'

বাইরে থেকে এবার একটা মাত্র গলা ভেসে আসে, 'বহোত বিপদ রাম ভেইয়া। মা'জির সঙ্গে এখন দেখা করতেই হবে।'

মা'জি অর্থাৎ সুমিত্রা। আর এইমাত্র যার কণ্ঠস্বর শোনা গেল সে অওতার। অওতার এ অঞ্চলের তাবৎ অচ্ছুৎদের মুরুব্বি। 'পঞ্চ'-এর মাথা। অনেক বার সুমিত্রার এই কোয়ার্টাবে এসেছে সে। তার গলাটি তাই বিশেষ ভাবে চেনা।

রামবনবাস এবার সুমিত্রার দিকে ফিরে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'দরবাজা খুলব মা'জি?'

এ অঞ্চলের গঞ্জু গাঙ্গোতা দোসাদ বা তাতমারা খুবই সরল এবং বিশ্বাসী। সুমিত্রাকে তারা দেবীর মতো সম্মান করে।

সুমিত্রা বলে, 'খুলে দাও—'

রামবনবাস বাইরের দরজা খুলতেই পনেরো কুড়িটি মেয়ে এবং পুরুষ হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। তাদের কারো হাতে লণ্ঠন, কারো হাতে লাঠি বা টর্চ।

বেশির ভাগই মধ্যবয়সী নারীপুরুষ, দু' চারজন জোয়ান ছেলেমেয়েও রয়েছে। সবাব চোখেমুখে দুশ্চিন্তা এবং উৎকণ্ঠার ছাপ।

ওদের দিকে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর কিছু একটা আন্দাজ করে নেয় সুমিত্রা।

জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে?'

সবার প্রতিনিধি হিসেবে অওতাব যা জানায় তা এইরকম। বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রমে সুমিত্রা বিকেলে তাব কোয়ার্টারে বসে যে মেয়েদের পড়ায় তারা হল কবুতরী সরসতীয়া কুঁয়ারী আর মুনিয়া। কবুতরী সরসতীয়া আর কুঁয়ারী আসে যোগীগাঁও থেকে, আর মুনিয়া পিপরিয়া থেকে। রোজ সন্ধেবেলা পড়াশোনার পর ওরা চারজন একসঙ্গে ফিরে যায়। কবুতরী সরসতীয়া আর কুঁয়ারী আজ ঠিকমতোই ঘরে ফিরেছে, শুধু মুনিয়াই বাদ।

সুমিত্রার কোয়ার্টার থেকে মাঠের ওপর দিয়ে এক কিলোমিটারের মতো যাবার পর বাঁ দিকে একটা কাচ্চী বা কাঁচা রাস্তা পড়ে। ওই বাঁকটায় এসে সরসতীয়ারা তিনজন সোজা চলে যায়, আর বাঁয়ের পথটা ধরে একা মুনিয়াকে যেতে হয় পিপরিয়া গাঁয়ে।

আজও চারজন ওই বাঁক পর্যন্ত একসঙ্গে এসেছিল। তারপর রোজকার মতো তিনজন সোজা চলে গেছে আর মুনিয়া বাঁ দিকের রাস্তা ধরেছিল। মেয়ের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন সে ফিরল না, মুনিয়ার মা-বাপ অওতারের কাছে ছুটে যায়। অওতার তাদের নিয়ে যোগীগাঁওতে আসে। কিন্তু কবুতরীরা মুনিয়ার উধাও হয়ে যাওয়া সম্পর্কে কিছুই জানাতে পারে না। অগত্যা দুই গ্রামের শ'খানেক মানুষকে মুনিয়ার খোঁজে চারিদিকে পাঠিয়ে আরও কয়েকজনের সঙ্গে কবুতরী সরসতীয়া আর কুঁয়ারীকে নিয়ে সুমিত্রার কাছে এসেছে অওতার। এখন মা'জি যদি মুনিযার কোনো হদিস দিতে পারেন।

সুমিত্রার হাত-পা ভীষণ কাঁপছিল। এমন একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে, তার কাছে তা একেবারেই অভাবনীয়। কী হতে পারে মুনিয়ার? কোথায় যেতে পারে সে? প্রায় মাসছয়েক ওরা তার কাছে পড়তে আসছে, কিন্তু এমন ঘটনা আগে তো আর ঘটেনি। বিমূঢ়ের মতো সুমিত্রা মহাদেওকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের কোনো রিস্তেদারের বাড়ি যায়নি তো?'

মুনিয়া মহাদেওর মেয়ে। সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, 'নেহী মা'জি। মুনিয়ার এক মৌসি থাকে আমাদের পাশের গাঁওতে। সেখানে লোক পাঠিয়েছিলাম। লেকেন মুনিয়া মৌসির ঘরে যায়নি।'

'আর কোনো রিস্তেদার নেই কাছাকাছি?'

'নেহী মা'জি।'

'আব কোথায় যেতে পারে?'

'এত্তে রাতমে কিধর যায়গি? না বলে কোথাও তো ও যায় না।'

অওতার এবার জানতে চায়, মুনিয়ার আচরণে বা কথাবার্তায় সুমিত্রা কোনোরকম গোলমাল দেখেছে কিনা, যা থেকে মনে হয় মেয়েটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে।

সুমিত্রা বলে, 'না। অন্যদিন যেমন আসে আজও তেমনি এসে পড়াশোনা করেছে। ফাঁকে ফাঁকে বন্ধুদের সঙ্গে মজার কথা বলেছে। ও খুব হাসাতে পারে। আজও সবাইকে হাসিয়েছে। কোনো গোলমাল তো চোখে পড়েনি।'

অওতার বলে, 'বহোত মুসিবত। গয়ী কিধর মুনিয়া? কিছুই বুঝতে পারছি না। এত রাতে কঁহা কঁহা উনকো ঢুঁড়েগা? কোনো বদমাশের পাল্লায় পড়ল কিনা কে জানে। ঠিক হ্যায় বহেনজি, আমরা যাচ্ছি। নমস্তে—'

সুমিত্রা উদ্বিগ্ন মুখে বলে, 'ওর খবর পেলে আমাকে জানিয়ে যেও।'

'হাঁ হাঁ, জরুর।'

অওতাররা চলে যায়। রামবনবাস দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে বিষণ্ণ গলায় বিড় বিড় করে, 'লড়কীটার কী যে হল!'

'কী জানি, কিছুই বুঝতে পারছি না। ছেলে হলে এত চিন্তা হ'ত না। মেয়ে বলেই ভয় হচ্ছে।'

একটু পর সুমিত্রা নিজের ঘরে চলে আসে। রামবনবাস লখিয়াকে নিয়ে তাদের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

মুনিয়ার জন্য উৎকণ্ঠায় এবং দুর্ভাবনায় শ্বাস আটকে আসতে থাকে সুমিত্রার। এই মেয়েটাকে গোড়া থেকেই তার খুব পছন্দ। যেমন আমুদে তেমনি ছটফটে। কথায় কথায় তার হাসি। এমন প্রাণবন্ত ঝলমলে মেয়ে খুব কমই দেখেছে সুমিত্রা।

বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম চালু হবার পর সুমিত্রাকে প্রথম প্রথম অচ্ছুৎদের ঘরের ছাত্রী জোগাড় করার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হ'ত। কিন্তু উদয়াস্ত যাদের পরের খেত-খামারে 'গতরচূরণ' খাটাখাটনি করে পেটের দানা জোটাতে হয় তাদের পক্ষে লেখাপড়াটা নেহাতই বিলাসিতা। এমন একটা দামি শখের জন্য নষ্ট করার মতো পর্যাপ্ত সময় তাদের নেই। গোড়ার দিকে কেউ মেয়ে পাঠাতে চাইত না। অনেকেই সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে, পড়ার সময়টা জমি-মালিকের বাড়িতে গিয়ে ডাল কি মকাই ভেঙে দিলে কিংবা গম পিষাই করলে বাড়তি দু'টো পয়সা পাওয়া যাবে। ঠাট্টা করে কেউ বলত, 'কা, মেরা লেড়কীয়া জজ ম্যাজিস্টর বনেগী?' কেউ বলত, 'নেহী রে, মেমসাব বনেগী, এম্লে বনেগী, মনিস্টার বনেগী।' বলে সে কী হাসি!

কেউ কেউ সুমিত্রাকে বলত, 'বহেনজি, আমরা নিচা জাত— অচ্ছুৎ। আমাদের বাপ-দাদা আনপড়। আমাদের লেড়কা-লেড়কিরাও আনপড় হয়েই থাকবে। আমাদের মতো গরিব অচ্ছুতিযাদের দিন এভাবেই কেটে যাবে। আপনি বামহন-কায়াথদের ঘরে ঢুঁডুন, ওখানে জরুর লেড়কীয়া পেয়ে যাবেন।'

বংশ পরম্পরায় মার খেয়ে খেয়ে ওরা ধরেই নিয়েছে, যেভাবে এতদিন চলে আসছে আবহমান কাল সেই নিয়মেই চলতে থাকবে। এর হেরফের হওয়া কোনোদিনই সম্ভব নয়। চিরকাল অশিক্ষা, অবিচার এবং হাজার লাঞ্ছনা বঞ্চনা সয়ে সয়ে এতেই তারা অভ্যস্ত হয়ে গেয়েছে। এসব তাদের কাছে জন্মগত সংস্কারের মতো। ফলে তারা চায় স্থিতাবস্থাই বজায় থাক। এর বাইরে পা বাড়াতে তাদের যতটা সংশয়, ঠিক ততটাই ভয়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তারা ডিফিটিস্ট হয়ে বসে আছে।

অচ্ছুৎদের অনিচ্ছা আর আপত্তি তো ছিলই। নহরপুরা টাউনের উঁচা জাতের লোকেরাও তাকে নানাভাবে বাধা দিতে চেয়েছে। আজন্ম যারা পায়ের তলায় মাথা গুঁজে পড়ে আছে, লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের মাথা তোলার ব্যবস্থা করা কোনো কাজের কথা নয়। বিশেষ করে সুমিত্রার মতো শাক্যদ্বীপি ব্রাহ্মণ কুঁয়ারীর পক্ষে এটা অতীব গর্হিত এবং হীন কাজ। নেহাত এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের প্রকল্প, আর সরকারি কাজে হস্তক্ষেপ করাটা ঘোরতর বে-আইনি, তাই আপত্তিটা এতকাল মৌখিক স্তরেই থেকে গেছে। অন্য কোনোভাবে কেউ তাকে বাধা দেয়নি।

সুমিত্রা কিন্তু আশা ছাড়েনি। রোজ স্কুল ছুটির পর রামবনবাসকে সঙ্গে নিয়ে সে কাছের এবং দূরের গাঁ-গুলোতে চলে যেত। অবশ্য অওতার তাকে বরাবরই সাহায্য করেছে। তার দূরদৃষ্টি আছে। সে বুঝতে পারছিল, একটা কিছু ওলটপালট দরকার। তাদের জীবন প্রায় পশুর স্তরে পড়ে আছে। এই নরক থেকে বেরিয়ে আসতে হলে যেটা সবচেয়ে জরুরি তা হল লেখাপড়া। পেটের ভেতর খানিকটা কালির অক্ষর ঢোকাতে না পারলে আরও কত হাজার বছর যে উঁচা জাতের পায়ের নিচে পড়ে থাকতে হবে, কে জানে। সে খবর পাচ্ছিল, রাঁচিতে সাহারসায় মধুবনীতে কাটিহারে চামার দোসাদের ছেলেরা লেখাপড়া শিখে জজ ম্যাজিস্টর উকিল কী এম্লে হয়েছে। বামহন কায়াথরাই নাকি এখন তাদের তোয়াজ করে চলে। পড়াশোনা ছাড়া এটা কোনোভাবেই সম্ভব হ'ত না।

সুমিত্রার সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘুরে অওতারও সবাইকে লেখাপড়ার উপকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বোঝাতে চাইত কিন্তু কোনোভাবেই কিছু হচ্ছিল না। রোজই সুমিত্রাকে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হ'ত।

মাসকয়েক ছোটাছুটির পর সুমিত্রার যাবতীয় উদ্দীপনা যখন ক্ষয়ে ক্ষয়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সেইসময় একদিন পিপরিয়া গাঁয়ে গিয়েছিল। মুনিয়া তার বাপ-মায়ের সঙ্গে একরকম যুদ্ধ করেই সুমিত্রার কাছে পড়ার ব্যবস্থা করে নেয়। এই প্রথম সাফল্য তার ঝিমিয়ে পড়া উৎসাহকে প্রবল ধাক্কায় সজীব করে তোলে।

শুরুতে মুনিয়া একাই আসত। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে আরও তিনজনকে জুটিয়ে ফেলে। সে বলেছিল, মাসখানেকের ভেতর আরও সাত আটটা মেয়েকে নিয়ে আসতে পারবে। সুমিত্রার স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা যাতে ক্রমাগত বেড়ে চলে, সে চেষ্টা অবিরাম চালিয়ে যাবে। মুনিয়ার জন্যই এ অঞ্চলে বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হয়েছে।

সুমিত্রার কিছুই ভালো লাগছিল না। নিজের ঘরে এসে বিছানায় কাত হয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়েছে সে। চোখ দু'টি জানলার বাইরে ছড়ানো। আগের মতোই ফাঁকা মাঠে চাঁদের গা উপচে রুপোর স্রোত নেমে আসছে। কিন্তু এখন কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছে না সুমিত্রা। টেনশন এবং উৎকণ্ঠায় তার বুকে চাপা কষ্ট হতে থাকে। যদি মুনিয়াকে না পাওয়া যায়? যদি তার কোনো মারাত্মক বিপদ হয়ে থাকে?

শুয়ে থাকতে থাকতে কখন চোখ জুড়ে এসেছিল, সুমিত্রার খেয়াল নেই।

ঘুম ভাঙল ভোরের দিকে।

সুমিত্রা দেখল, ঘরের দরজা হাট করে খোলা। মাথার ওপর বাল্বটা জ্বলছে। কাল রাতে ওটা নেভাতে ভুলে গিয়েছিল। দরজায় খিল দেবার কথাও মনে ছিল না। ঘরের কোণে খাবার তেমনি ঢাকা দেওয়া আছে। উঠে গিয়ে দরজাটা যে বন্ধ করে আসবে কিংবা আলোটা নিভিয়ে দেবে, তেমন ইচ্ছাটুকুও নিজের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেল না সুমিত্রা। মাঠের দিক থেকে জোরাল ঠাণ্ডা বাতাস

উঠে আসছে। বেশ শীত লাগছে। সে শুধু পায়ের কাছ থেকে পাতলা কম্বলটা টেনে এনে গায়ে জড়িয়ে নিল।

ঘুম ভাঙার পর থেকেই মুনিয়ার চিন্তাটা নতুন করে সুমিত্রার মাথায় ফিরে আসে। সে ঠিক করে ফেলে, সকালের আলো ফুটলেই পিপরিয়া গাঁয়ে চলে যাবে। মুনিয়ার খবর না পাওয়া পর্যন্ত তার উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতা কাটবে না।

দুই

একসময় রাত ফুরিয়ে যায়। এখনও ঠিক রোদ ওঠেনি, তবে আকাশের গায়ে লালচে একটু আভা ফুটতে শুরু করেছে। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে এবং আরও দূরে অচ্ছুৎদের গ্রামগুলো পেন্সিলের অস্পষ্ট আঁচড়ের মতো দেখাচ্ছে। মিহি সিল্কের মতো সমস্ত চরাচরের ওপর কুয়াশা জড়িয়ে আছে।

সুমিত্রা আর দেরি করে না। খাট থেকে নেমে আলো নিভিয়ে ব্রাশ-পেস্ট-তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দ্রুত বাসি শাড়ি-টাড়ি বদলে, চুলে ক্ষিপ্র হাতে বারকয়েক চিরুনি টেনে বেরিয়ে পড়ে। উঠোনে নেমে প্রথমে লখিয়া আর রামবনবাসের ঘুম ভাঙিয়ে জানায়, সে পিপরিয়া যাচ্ছে।

এই সকালবেলায় অচ্ছুৎদের ওই বিশেষ গ্রামটিতে যাবার কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না রামবনবাসের। সে বলে, 'আমি সঙ্গে যাব।'

রামবনবাস একা একা তাকে কোথাও যেতে দিতে চায় না। সুমিত্রা বলে, 'আমি তো অনেক বার ওদিকে গেছি। চেনা জায়গা। কোনো চিন্তা নেই। তোমার এখানে থাকা খুব দরকার। যদি আমার ফিরতে দেরি হয়, স্কুল খুলে দেবে। মাস্টারজিরা এলে তাঁদের বলবে, ক্লাস শুরু করে দিতে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্যাপারটা মেনে নিতে হয় রামবনবাসকে। 'কী আর করা যাবে—'এমন এক ভঙ্গিতে সে বলে, 'ঠিক হ্যায়--'

সুমিত্রা বাইরের দরজা খুলে ফাঁকা মাঠে চলে আসে। একটা কাঁচা সড়ক বা কাচ্চী ফসলের খেত চিরে দূর দিগন্তের দিকে চলে গেছে। সেটা ধরে অন্যমনস্কর মতো সে হাঁটতে থাকে। প্রচণ্ড এক অস্থিরতা যেন তাকে তাড়া করে নিয়ে যায়। সে ঈশ্বরবিশ্বাসী নয়, আবার অবিশ্বাসীও না। বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে আছে। তবু এই মুহূর্তে সুমিত্রা মনে মনে বলে, 'হে ঈশ্বর, আমি গিয়ে মুনিয়ার ভালো খবর যেন পাই।'

খানিকটা যাবার পর দেখা যায়, একটা নহর মাঠকে আড়াআড়ি ভেদ করে চলে গেছে। বর্ষায় নহরটা কানায় কানায় ভরে থাকে, কিন্তু ফাল্গুনের শেষাশেষি এই সময়টায় যদিও ওখানে জল আছে, তবে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে ওটা পুরোপুরি শুকিয়ে যাবে। তখন গরু ছাগল সহজেই শুকনো খাত দিয়ে এপার ওপার করতে পারবে।

নহরের ওপর বাঁশের সাঁকো। সেটা পেরিয়ে ওপারে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে যায় সুমিত্রা। দূর থেকে বহু লোকজন এদিকেই আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে বিশাল জনতা কাছাকাছি এসে যায়। সুমিত্রা সবাইকেই চেনে। ওরা পিপরিয়া যোগীগাঁও বইহাল দুধারিন গাঁয়ের মানুষ। সবার আগে আগে রয়েছে অওতার। তার পেছনে বাঁশের নতুন একটা চালিতে কাউকে শুইয়ে চারজন বয়ে আনছে। চালিটার দু'পাশে মহাদেও এবং তার ঘরবালী বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে আসছে। কয়েকজন পুরুষ মহাদেওকে সামলাতে চেষ্টা করছে। চার পাঁচটি মেয়েমানুষ মহাদেও-এর ঘরবালীকে ভারী গলায় সমানে বলে যাচ্ছে, 'রো মাত্ রো মাত্—'এদের পেছনে চুপচাপ হেঁটে আসছে নানা বয়সের শ'খানেক মানুষ। তাদের মুখ বিষণ্ণ কিন্তু থমথমে।

বাঁশের চালিতে কাকে আনা হয়েছে, এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে সুমিত্রা। শ্বাসক্রিয়া মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যায় তার। মনে হয়, বুকের ভেতরটা কেউ যেন দুমড়ে মুচড়ে চুরমার করে দিচ্ছে। প্রথম যে, প্রশ্নটা

জ্বলন্ত পেরেকের মতো তার মাথায় বিঁধে যায় তা এইরকম। মুনিয়া কি বেঁচে নেই? কেউ কি তাকে খুন করে ফেলেছে?

অওতাররা আরও কাছে এসে দাঁড়িয়ে যায়। ধরা ধরা, ভাঙা গলায় সে বলে, 'বহেনজি কি আমাদের গাঁওয়ে যাচ্ছিলেন?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে সুমিত্রা। আবছা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'চালিতে কে?'

'মুনিয়া।'

'কী হয়েছে ওর?'

'সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

'ওকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ সবাই?'

'অসপাতাল।'

মনের কোনো অজানা প্রান্তে সামান্য একটু দুরাশাই বুঝি ঝিলিক দিয়ে ওঠে সুমিত্রার। সে বলে,'মুনিয়া বেঁচে আছে?' তার কণ্ঠস্বর আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠায় কাঁপতে থাকে।

অওতার বলে, 'অ্যায়সাই মালুম হোতা। লেকেন বাচ্চী বিলকুল বেহোঁশ।'

সুমিত্রা মনে মনে স্থির করে ফেলে, অওতারদের সঙ্গে হাসপাতালে যাবে। এখন আর কোয়ার্টারে ফিরবে না। সে হাসপাতালে গেলে অওতারদের সুবিধাই হবে। ওখানকার ডাক্তার বিজয় এবং সে দু'এক বছরের ভেতর বিয়ে করতে চলেছে। কেউ কাউকে মুখ ফুটে বিয়ের কথাটা বলেনি। তবে দু'জনেই সেটা জানে। কিন্তু এবিয়েতে বড় আকারেব কিছু সমস্যা আছে। কিন্তু সে কথা পরে।

বিজয় খুবই দায়িত্বশীল এবং হৃদয়বান মানুষ। তার ব্যবহার এক কথায় চমৎকার। যে রোগীই তার কাছে যাক না, খুব যত্ন করে সে তাকে দেখে। নহরপুরা অঞ্চলে তার বিপুল জনপ্রিয়তা। লোকে তাকে পছন্দ করে, ভালোবাসে। তার সম্পর্কে সবারই গভীর শ্রদ্ধা। তবু সুমিত্রা সঙ্গে থাকলে এই কেসের গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যাবে। একজন ডাক্তারের পক্ষে যতটা সম্ভব, মুনিয়াকে বাঁচাতে তার চেয়ে অনেক বেশি চেষ্টা করবে বিজয়। মেয়েটার আয়ু থাকলে তাকে সুস্থ করে তুলবেই সে। সুমিত্রা বলে, 'আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।'

অওতার বলে, 'অসপাতাল বহোত দূর, লগভগ দো-ঢাই (দুই'-আড়াই) 'মিল'। পাযদল এতটা যেতে আপনার তখলিফ হবে বহেনজি।'

'কোনো কষ্ট হবে না।'

বিজয়ের চাইতেও সুমিত্রাকে এ দিকের তাবৎ মানুষজন, বিশেষ করে অচ্ছুতরা যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করে। সে তাদের আপনজন। কেননা তারা জানে, রাজনৈতিক নেতাদের মতো তাদের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি জানিয়েই সুমিত্রা দায়িত্ব পালন করে না। ঘরবাড়ি মা-বাবাকে ছেড়ে এত দূরে এসে যে পড়ে আছে সে শুধু তাদের ভালোর জন্য।

এই নহরপুরাতে কত বামহন-কায়াথ রয়েছে। অওতার জানে তাদের একজনও অচ্ছুতের একটা মেয়েব সঙ্গে হাসপাতালে যাবে না। অথচ পবিত্র শাকাদ্বীপি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেও সুমিত্রার বাজে কোনো সংস্কার নেই, ছুঁয়াছুত সে মানে না। পৃথিবীর একেবারে নিচের স্তরে যারা পড়ে আছে তাদের প্রতি তার গভীর সহানুভূতি। মানুষ যে পর্যায়েরই হোক, তাকে সে মর্যাদা দিয়ে থাকে। অভিভূত অওতার বলে, 'ঠিক হ্যায় বহেনজি, চলিয়ে—'

সবাই আবার চলতে শুরু করে।

কাল রাত থেকেই ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে আছে সুমিত্রা। অওতারের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে মুনিয়ার?'

অওতার নিচু, চাপা গলায় এবার যে খবরটা দেয় তাতে শিউরে ওঠে সুমিত্রা। অনুভব করে তার স্নায়ুগুলো একেবারে কুঁকড়ে যাচ্ছে।

কাল রাতে সুমিত্রাব কোয়ার্টারে আসার আগে চারিদিকে মুনিয়ার খোঁজ করেছিল অওতাররা। ফিরে গিয়ে আবার নতুন করে খুঁজতে শুরু করে। কাছাকাছি যে চার পাঁচটা অচ্ছুৎদেব গাঁ রয়েছে

সেখানকার বুড়ো আর বাচ্চাকাচ্চা ছাড়া কেউ কাল রাত্তিরে ঘরে ছিল না, সবাই মুনিয়ার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল।

শেষ পর্যন্ত মাঝরাতের কিছু পরে এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে একটা ঝোপের ভেতর মুনিয়ার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত শরীর পাওয়া যায়। মেয়েটার সর্বনাশ করে, জানোয়ারেরা তাকে মারাত্মক জখম করে, ঝোপের ভেতর ফেলে রেখে গিয়েছিল। ওদের হয়তো ধারণা হয়েছিল, মুনিয়া মরে গেছে। উদ্দেশ্যও তা-ই ছিল। কিন্তু মুনিয়াকে তুলে আনার পর দেখা গেল, মারা যায়নি। তাই বাঁশের চালিতে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে সুমিত্রা। তারপর রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কে ওর এত বড় ক্ষতিটা করল?'

অওতার বলে, 'কৌন জানে! মুনিয়ার হোঁশ না ফিরলে কিছুই জানা যাবে না।'

সুমিত্রা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। অর্থাৎ অওতার যা বলেছে সেটাই ঠিক। আরও খানিকটা হাঁটার পর সমাজকল্যাণ দপ্তরের প্রাইমারি স্কুলটা ডাইনে রেখে নহরপুরা টাউনে ঢোকার মুখে সে বলে, 'মনে হচ্ছে, কাল রাত্তিরে রাস্তার মোড় থেকে সরসতীয়ারা গিয়েছিল যোগীগাঁওয়ে। আর মুনিয়া একা একা যখন পিপরিয়ার দিকে যাচ্ছিল, সেই সময় তার সর্বনাশ করা হয়।'

অওতার সায় দিয়ে জানায়, তারও সেই রকমই ধারণা।

সুমিত্রা ফের আগের প্রশ্নটাই করে, 'কে এমন জঘন্য কাজ করতে পারে?'

'কী করে বলব বহেনজি?'

'ওই রাস্তার আশেপাশে তো গাঁ রয়েছে। কেউ কিছু দেখেনি?'

'নেহী। তবে ছত্তরপুরের গাঁওবালারা বলছিল, কাচ্চী দিয়ে একটা মোটরিয়াকে দু'বার যেতে দেখেছে। একবার পছিম থেকে পুবে, আরেকবার পুব থেকে পছিমে।'

'কখন?'

'রাত্তিরে। হোগা আট ন' বাজে—'

অওতারদের সময়ের হিসেব খুবই গোলমেলে। হয়তো দেখেছে দশটা কী এগারোটায় কিংবা সাতটায়, বলছে আটটা ন'টায়। সঠিক সময় এদের কাছ থেকে বার করা খুবই মুশকিল।

মোটর কিংবা গৈয়া কী ভৈসা গাড়ি অবশ্য ফসলের মাঠে যেতে পারে। কিন্তু সুমিত্রার কোয়ার্টার যেখানে, সেদিক থেকে যাওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। কেননা মাঠের মাঝখানে খালের ওপর দিয়ে বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে তো মোটর টোটর আসতে পারে না। মূল কাঁচা সড়কটা দু'ভাগ হয়ে যে ফ্যাকড়াটা পিপরিয়ার দিকে গেছে সেটা অনেকটা ঘুরে ফসলের আদিগন্ত মাঠটাকে প্রায় বেড় দিয়ে পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে নহরপুরার টাউনে ঢুকেছে। ওধার দিয়ে গাড়িটাড়ি আসা-যাওয়া করতে পারে।

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'এদিকে গাড়িটাড়ি প্রায়ই আসে?' তার প্রশ্নের উদ্দেশ্য একটাই। কাদের গাড়ি মাঠে আসে জানতে পারলে কাল রাতে অমন একটা মারাত্মক কুকীর্তি কাদের বা কার পক্ষে করা সম্ভব, মোটামুটি আন্দাজ করা যেতে পারে।

অওতার জানায়, গৈয়া এবং ভৈসা গাড়ি আকছার মাঠের ওপর দিয়ে যাতায়াত করে। তবে মোটর খুব একটা আসে না। কচিৎ কখনো দু'চারটে।

'কাদের মোটর আসে বলতে পার?'

'পাইসাবালা বড়ে আদমিদের। ওই যারা টৌনে থাকে তাদের আর কী।' সুমিত্রা আর কিছু জানতে চাইল না। এখন তার অত্যন্ত জরুরি একটা কাজ আছে। মুনিয়ার মা বুক-ফাটা কান্নায় সমস্ত সকালটাকে বিষাদে ভরে দিয়ে বাঁশের চালিটার পাশ দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো টলতে টলতে আসছে। সুমিত্রা সোজা তার কাছে চলে যায়। কোনো সান্ত্বনার কথা না বলে তাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে হাঁটতে থাকে। সমবেদনার সামান্য ছোঁয়ায় মায়ের কান্না হঠাৎ দশগুণ বেড়ে যায়।

এতক্ষণে রোদ উঠে গেছে। লাল টকটকে একটা বলের মতো সূর্যটা দিগন্তের তলা থেকে লাফ দিয়ে উঠে এসেছে। এখনও বাতাস তেতে ওঠেনি। ফাল্গুনের ঠাণ্ডা, ঝিরঝিরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

নহরপুরার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চাল খুবই ঢিমে। রোদ ওঠার অনেকক্ষণ পর তার ঘুম ভাঙে। সন্ধের অন্ধকার নামতে না নামতেই এখানকার সিকিভাগ মানুষ খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে। তার ঘণ্টা দেড় দুই বাদে আরও সিকিভাগ বিছানায় চলে যায়। রাত দশটায় এই শহর একেবারে নিঝুম। গভীর ঘুমের আরকে ডুবে যায় এখানকার মানুষজন, পশুপাখি, বৃক্ষলতা।

এখনও ভালো করে ঘুম ভাঙেনি নহরপুরার। যে ক'জন উঠেছে তারা অওতাবদের দিকে কিছুটা বিরক্ত চোখে তাকায়। এই সকালবেলা এক পাল অচ্ছুতের মুখ দেখা প্রায় পাপকর্মের মতো ব্যাপার। গোটা দিনটা আজ যে একেবারেই ভালো যাবে না, এ বিষয়ে তাদের আদৌ সংশয় নেই। অবশ্য অসীম বিরক্তি এবং রাগ সত্ত্বেও একটু অবাক এবং কৌতূহলী না হয়েও পারে না তারা। বাঁশের চালিতে চাপিয়ে ওরা কাকে নিয়ে চলেছে? আগ্রহ থাকলেও অচ্ছুৎদের সঙ্গে এই সকালবেলায় কথা বলতে ইচ্ছা হয় না। মুখদর্শন করে একটা পাপ হয়েছে, কথা বলে দ্বিতীয় পাপটা আর না-ই করল।

নহরপুরা টাউনের এক মাথায় সমাজকল্যাণ দপ্তরের প্রাইমারি স্কুল, আরেক মাথায় হাসপাতাল। একসময় সুমিত্রারা সেখানে পৌঁছে যায়।

তিন

বছর তিনেক আগে সুমিত্রাদের প্রাইমারি স্কুলটার মতোই সরকারি সমাজকল্যাণ দপ্তর এখানে এই হাসপাতালটাও তৈরি করে দিয়েছে। আগে এই অঞ্চলের মানুষজনের 'রোগ বোখার' হলে যেতে হ'ত মিউনিসিপালিটির দাওয়াখানায়। টালির চালের দু'টো ছোটো ঘরে ছিল এই দাওয়াখানা। সেটা যেমন নোংরা তেমনি কুৎসিত। চরিদিকে ডাঁই হয়ে থাকত আবর্জনা, থুতু, কফ, পোড়া বিড়ির টুকরো ইত্যাদি। সারা চত্বর জুড়ে অগুনতি বেওয়ারিশ কুকুর আর ছাগল ঘুরে বেড়াত। এক কোণে রাজ্যের ভিখিরিরা আস্তানা গেড়েছিল। শুয়োরের খোঁয়াড়ও এর থেকে বেশি পরিচ্ছন্ন। সব মিলিয়ে ছোটোখাটো এক নরক যেন। আয়োডিন, মাথাধরার কিছু ট্যাবলেট এবং মস্ত পেট-মোটা বোতলে লাল রঙের মিক্সচার ছাড়া আর কোনো ওষুধ থাকত না। ওই রক্তবর্ণ মিক্সচারটি ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে শুরু করে রক্ত আমাশা, বেরিবেরি পর্যন্ত তাবৎ রোগেই শিশি বোঝাই করে বিতরণ করা হ'ত। একজন ক্ষয়াটে চেহারার ধুতি এবং কোট-পরা, মাথায় টিকি, বুড়ো ডাক্তার অবশ্য ছিল। তবে সে নাকি কস্মিনকালে মেডিক্যাল কলেজ বা স্কুলের চেহারা পর্যন্ত দেখেনি। আয়ুর জোর না থাকলে তার হাতে মৃত্যু একেবারে অবধারিত। এখানে এসে কেউ বেঁচে ফিরেছে কিনা সন্দেহ। পারতপক্ষে নহরপুরার বাসিন্দারা মিউনিসিপ্যালিটির দাওয়াখানার রাস্তা মাড়াত না।

নতুন হাসপাতালটা যেমন ঝকঝকে তেমনি পরিষ্কার। বিরাট কম্পাউন্ডের ভেতর সাদা ধবধবে একতলা প্রকান্ড হসপিটাল বিল্ডিংটায় ঢুকলেই মন ভালো হয়ে যায়। কোথাও একটুকরো কাগজ বা দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি কিংবা ধুলোবালি পড়ে নেই। সব রকম রোগের ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা আছে এখানে, আছে অপারেশন থিয়েটার এবং এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট। ইয়ার, নোজ, হার্ট, আই—সমস্ত বিভাগেই স্পেশালিস্ট ডাক্তাররা রয়েছেন। সেই সঙ্গে আছে ভালো ডিসপেনসারি। সব রকম ওষুধের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। এটা সম্ভব হয়েছে বিজয়ের জন্য। ওষুধ এবং চিকিৎসার ত্রুটির জন্য কারো মৃত্যু ঘটুক, এটা সে কোনোমতেই মেনে নেবে না। মানুষের জীবনের মূল্য তার কাছে অনেকখানি।

তিন বছর আগে এই হাসপাতালের দায়িত্ব নিয়ে নহরপুরায় এসেছিল বিজয়। গোড়ায় বিল্ডিংটা ছোটো ছিল, সামান্য দু'তিনটে বিভাগ নিয়ে এটা খোলা হয়েছিল। এত ডিপার্টমেন্ট আর এত ডাক্তারও তখন ছিল না। তিনটে বছর দিনরাত খেটে, দিল্লি এবং পাটনায় বারবার ছোটাছুটি করে, সোশাল ওয়েলফেয়ার এবং জনস্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাদের বুঝিয়ে প্রচুর টাকা বার করেছে সে। আগের বিল্ডিং ভেঙে নতুন বিরাট বিল্ডিং তৈরি হয়েছে। শুধু টাকা আর বিল্ডিং দিয়ে তো হয় না, দিনরাত বিজয়কে প্রচুর খাটতেও হয়েছে। তবেই না হাসপাতাল আজ এত বড় হতে পেরেছে। নহরপুরা এবং তার

বিশ তিরিশ মাইলের মধ্যে যত গাঁ-গঞ্জ সব জায়গায় বিজয়ের খুব নাম-ডাক। এ অঞ্চলের বাসিন্দারা তাকে প্রায় ঈশ্বরের মতো সম্মান দেয়। বিজয়রা তিন পুরুষের খ্রিস্টান। অচ্ছুৎ হিন্দু থেকে তারা খ্রিস্টান হয়েছে। তা সত্ত্বেও নহরপুরার ব্রাহ্মণ-কায়াথরা তাকে যথেষ্ট খাতির করে, দেখা হলে সসম্ভ্রমে কথা বলে।

আগে এদিকে মড়ক লেগেই থাকত। আজকাল বিজয় এবং তার হাসপাতালের কারণে মৃত্যু এখানে প্রায় ঘেঁষতেই পারে না।

সুমিত্রারা হাসপাতালে পৌঁছেই এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের সামনে বিজয়কে দেখতে পায়। সকালবেলা নানা ডিপার্টমেন্টে রাউন্ড দিতে দিতে সে এখানে এসে পড়েছিল।

হাসপাতাল কম্পাউন্ডের মধ্যে বিজয়ের কোয়ার্টার। সকাল হলেই মুখটুখ ধুয়ে এক কাপ চা খেয়ে বিজয় সোজা হাসপাতালে চলে আসে। ঘুরে ঘুরে প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম দেখে, আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি রোগীর খোঁজখবর নেয়। এভাবে ঘণ্টাদেড়েক কাটিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে যায়। স্নান এবং ব্রেকফাস্ট সেরে কাঁটায় কাঁটায় দশটায় আবার হাসপাতালে আসে। ঠিক একটায় কোয়ার্টারে গিয়ে দুপুরের খাওয়া চুকিয়ে ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম। বিকেল চারটেয় ফের হাসপাতাল। এবার কোয়ার্টারে ফিরতে ফিরতে রাত আটটা। তেমন জরুরি ব্যাপার থাকলে মাঝরাতেও তাকে রোগী দেখার জন্য ছুটে আসতে হয়। মোটামুটি এই হল তার দৈনন্দিন রুটিন। এর ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। হাসপাতালের বাইরে সে আর কিছু ভাবতে পারে না। যে তিন বছর এখানকার দায়িত্ব নিয়ে এসেছে তার মধ্যে একদিনের জন্যও ছুটি নেয়নি। পূর্ণিয়ায় তাদের বাড়ি থেকে তার মা-বাবা ভাইবোনেরা মাঝেমাঝে এসে দেখা করে গেছে কিন্তু তার পক্ষে একবারও সেখানে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে সুমিত্রার সঙ্গে আলাপ হবার পর তার জীবনের ছক কিঞ্চিৎ পালটে গেছে। কিন্তু সে কথা এখন নয়।

পারতপক্ষে সুমিত্রা হাসপাতালে আসে না। এই সকালবেলায় তাকে এবং তার সঙ্গে বিশাল জনতাকে দেখে রীতিমতো অবাকই হয়ে যায় বিজয়। বলে, 'একি, তুমি!'

'খুব বিপদে পড়ে আসতে হল।'

'সঙ্গে এত লোকজন কেন? কী হয়েছে?'

সুমিত্রা বলল, 'সব বলব। তার আগে এই মেয়েটির ব্যবস্থা কর।' বাঁশের চালিতে শোয়ানো মুনিয়াকে দেখিয়ে সে এবার বলে, 'ভেরি সিরিয়াস কেস।'

ভীষণ ব্যস্তভাবে বিজয় বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' পরক্ষণেই তার তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। একটা স্ট্রেচার আনিয়ে বাঁশের চালি থেকে দ্রুত মুনিয়াকে তার ওপর শুইয়ে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। বিপুল জনতাকে তো হাসপাতাল বিল্ডিংয়ে ঢুকতে দেওয়া যায় না, তাতে হইচই এবং ধুন্ধুমার বেধে যাবে। তাদের শান্তভাবে কম্পাউন্ডের খোলা জায়গায় বসে থাকতে অনুরোধ করা হয়। উদ্বিগ্ন মুখে চুপচাপ তারা সেখানে গিয়ে বসে থাকে। শুধু সুমিত্রা, অওতার এবং মুনিয়ার মা-বাপকে ভেতরে যেতে দেওয়া হয়। তারা এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের বাইরের করিডরে প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। কেউ কোনো কথা বলছে না। শ্বাসরুদ্ধের মতো বসে বা দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি মানুষেরই এক আশঙ্কা, মেয়েটাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যাবে তো?

মিনিট পনেরো বাদে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে বিজয়। তার চোখমুখ দুশ্চিন্তা এবং উত্তেজনায় থমথমে। সুমিত্রাকে একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় সে বলে, 'এ তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার। রেপ করার পর মার্ডার করার চেষ্টা হয়েছে। ক্লিন ক্রিমিনাল কেস। পুলিশ না আসা পর্যন্ত আমরা এর ট্রিটমেন্ট শুরু করতে পারব না। এখুনি থানায় ডায়েরি করা দরকার। পুলিশ দেখে গেলে সব ব্যবস্থা হবে।'

সুমিত্রার কাছে খবরটা নতুন নয়। অওতার তাকে আগেই জানিয়েছে। বিমর্ষ মুখে সে বলে, 'আমি এখনই থানায় যাচ্ছি।'

একটু ভেবে বিজয় বলে, 'তোমাকে যেতে হবে না। আমিই এখান থেকে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করছি।' একজন জুনিয়র ডাক্তারকে ডেকে লোকাল থানায় যেতে বলে। অফিসার-ইন-চার্জ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন চলে আসেন। বিজয়ের নাম করে যেন তাকে ব্যাপারটাব গুরুত্ব বোঝানো হয়। তিনি এসে কেস রেকর্ড না করা পর্যন্ত চিকিৎসা করা যাচ্ছে না। এখন একটা সেকেন্ডেরও দাম অনেক। পেশেন্টের জীবনমৃত্যু তার ওপর নির্ভর করছে।

ঝড়ের গতিতে জুনিয়র ডাক্তারটি চলে যায়।

বিজয় এবার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি এর মধ্যে কী করে জড়িয়ে গেলে?'

সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া জানিয়ে সুমিত্রা বলে, 'মুনিয়া বাঁচবে তো?'

বিজয় ম্লান হাসে, 'আমরা বাঁচাতে চেষ্টা করব। মৃত্যুর কথা ডাক্তারদের বলতে নেই। তবে কেসটা খুবই ডিফিকাল্ট।'

মুনিয়ার বাপ মহাদেও আর তার মা রুদ্ধশ্বাসে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। উদ্‌ভ্রান্তের মতো এগিয়ে এসে হাতজোড় করে আকুলভাবে বলতে থাকে, 'আমাদের বাচ্চীটাকে বাঁচিয়ে দিন ডাক্তারসাব। ওই একটাই আমাদের মেয়ে। ভগোয়ান আপনার ভালাই করবেন।'

অওতারও কাছে চলে এসেছিল। সে-ও বলে, 'আপনি কিরপা করলে মুনিয়া জরুর বেঁচে যাবে। ওকে রক্‌ষা করুন ডাক্তারসাব।'

বিজয় জানে, তার ওপর এ-অঞ্চলের বাসিন্দাদের অগাধ বিশ্বাস। এদের ধারণা, সে ঈশ্বরের মতো ক্ষমতাবান। ইচ্ছা করলে সে নাকি শ্মশান থেকে মরা মানুষ তুলে এনে বাঁচিয়ে দিতে পারে।

মুনিয়ার মা-বাপ এবং তাদের সঙ্গী মানুষগুলোর জন্য গভীর সহানুভূতিতে মন ভরে যায় বিজয়ের। মুনিয়ার মা এবং বাপের কাঁধে হাত রেখে আর্দ্র গলায় সে জানায়, তার দিক থেকে চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হবে না।

কিছুক্ষণ পব থানা থেকে অফিসার-ইন-চার্জ, একজন ফোটোগ্রাফার, একজন সাব-ইন্সপেক্টর এবং কয়েকজন কনস্টেবল চলে আসে। কেস হিস্ট্রি লিখিয়ে, বিভিন্ন কোণ থেকে মুনিয়ার অনেকগুলো ছবি তুলিয়ে অফিসার-ইন-চার্জ বলেন, 'এটা একটা টেরিফিক খতারনাক কেস। আমার সাব- ইন্সপেক্টরকে এখানে রেখে গেলাম। মেয়েটার হুঁশ ফিরে এলে যদি কোনো জবান দেয়, রেকর্ড করে নেবে।'

বিশাল চেহারার অফিসারটির পরনে ঢলঢলে ইউনিফর্ম, কোমরে চওড়া বেল্ট, পায়ে ভারী বুট। পুরু ঠোঁট তাঁর, বুরুশের মতো ঘন গোঁফ এবং জুলপি, চুল চামড়া ঘেঁষে ছোটোছোটো করে ছাঁটা, মাথার পেছন দিকে টিকির গোছায় ফুল বাঁধা, মোটা মোটা আঙুলে হীরে-নীলা-পান্না-পোখরাজ-গোমেদ ইত্যাদি পাথর-বসানো আটটা আংটি। রাহু কেতু থেকে শুরু করে শনি পর্যন্ত সব ক'টা গ্রহকে খুশি রাখার ব্যবস্থা করেছেন অফিসারটি।

তাঁর নাম মুলায়েম চৌবে। প্রচুর পান-জর্দা খান। প্রতিটি কথার সঙ্গে থুতু মেশানো পান সুপুরির কুচি তাঁর মুখ থেকে মিহি বৃষ্টির মতো ছুটতে থাকে। রঙিন থুতু ছিটোতে ছিটোতে অফিসার বলেন, 'এবার আমরা চলি। জরুরত হলে আবার খবর দেবেন। এখন অচ্ছুতিয়া ছোকরির ইলাজ শুরু করুন।'

বিজয় বলে, 'ঠিক আছে।'

'চিন্তা নেহী করনা। যো শালে অ্যায়সা বুরা কাম কিয়া উসকো নেহী ছোড়েগা। শালের জান বিলকুল তুড়ে দেব—হাঁ।'

বিজয় উত্তর দেয় না।

মুলায়েম আবার বলেন, 'নহরপুরায় আমি যতদিন আছি, হারামিগিরি করে কেউ পার পাবে না; আপনি দেখে নেবেন ডাক্তারসাহেব।'

বিজয় এবারও চুপ।

মুলায়েম চৌবে অতঃপর একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে হাসপাতালে মোতায়েন করে তাঁর বাহিনী নিয়ে চলে যান।

বিজয় সাব-ইন্সপেক্টরকে তার নিজস্ব কামরায় বসিয়ে সুমিত্রার কাছে ফিরে আসে। বলে, 'তোমার আজ স্কুল নেই?'

সুমিত্রা বলে, 'থাকবে না কেন?'

'তাহলে স্কুলে চলে যাও। আমাকে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ওই মেয়েটার কাছে থাকতে হবে। কখন বেরুতে পারব, ঠিক নেই। স্কুল ছুটির পর এসে খবর নিয়ে যেও।'

ঠিকই বলেছে বিজয়। যতক্ষণ না সে এমার্জেন্সি ওয়ার্ড থেকে বেরোয়, সুমিত্রাকে এই করিডরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, নইলে বিজয়ের চেম্বারে গিয়ে সাব-ইন্সপেক্টরের কাছেও বসে থাকা যায়। কিন্তু ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে কতটা সময় কাটাতে হবে, কে জানে। তার চেয়ে স্কুল করে বিকেলে আসাই সব দিক থেকে ভালো। অবশ্য ফিরে গেলেও তার উৎকণ্ঠা কাটবে না। মুনিয়ার জন্য গভীর দুশ্চিন্তা সারাক্ষণ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে।

সুমিত্রা বলে, 'তুমি যখন বলছ, স্কুলেই যাই। যদি এর মধ্যে মুনিয়ার জ্ঞান ফিরে আসে, আমাকে খবর দেবে কিন্তু, আমি ভীষণ চিন্তায় থাকব।'

বিজয় বলে, 'নিশ্চয়ই।' একটু চুপ করে থেকে আবার শুরু করে, 'একটা কাজ কর, মুনিয়ার মা-বাপ এখানে থাক। বাকি লোকজন নিয়ে তুমি চলে যাও।'

'ওরা কি যেতে চাইবে?'

'এখানে ভিড় করে তো কোনো লাভ নেই। বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে যাও।'

'আচ্ছা দেখি ওদের সঙ্গে কথা বলে।'

বিজয় আর দাঁড়ায় না, সোজা এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ে। আর সুমিত্রা চলে আসে মুনিয়ার মা এবং বাপের কাছে। বলে, 'তোমরা এখানে থাকো, আমি এখন যাচ্ছি। স্কুল ছুটি হলে আবার আসব।'

মুনিয়ার মা সমানে কেঁদে চলেছে। মুনিয়ার বাপ মহাদেও ঝাপসা গলায় বলে, 'তুমি চলে যাবে বহেনজি? আমার মুনিয়ার কী হবে?'

সুমিত্রা তাদের ভরসা দিয়ে বলে, 'কোনো ভয় নেই। ডাক্তারসাহেব নিজে ইলাজ করছেন। সব ঠিক হয়ে যাবে।' পাশে অওতার দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে বলে, 'তুমি ওদের একটু দেখো।'

অওতার ভারী গলায় বলে, 'দেখব, জরুর দেখব।'

মহাদেও আর কিছু বলে না। সুমিত্রা করিডর পেরিয়ে বাইরে চলে আসে। যে জনতা শ্বাসরুদ্ধের মতো কম্পাউন্ডের ভেতর ফাঁকা জায়গায় বসে ছিল, সুমিত্রাকে দেখে তারা উঠে দাঁড়ায়। ওদের ভেতর থেকে একজন বলে ওঠে, 'মুনিয়ার কী হল বহেনজি?'

'ডাক্তারসাহেব ইলাজ শুরু করেছেন।'

'লেড়কিটা বাঁচবে তো?'

সুমিত্রা বলে, 'নিশ্চয়ই বাঁচবে। শোন, তোমরা এখানে বসে থেকে আর কী করবে? মুনিয়াকে তো এখন দেখতে পাবে না। গাঁয়ে ফিরে যাও। কাজকর্ম সেরে, খেয়েদেয়ে, বিকেলে আবার এসো। আমাকে এখন স্কুলে যেতে হবে। আচ্ছা চলি।' বলে বাইরের রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়।

সুমিত্রার কথায় মনে মনে সবাই সায় দেয়। সত্যিই তো, এখানে চুপচাপ বসে থেকে মুনিয়ার ব্যাপারে কোনো সাহায্যই তারা করতে পারবে না। তাছাড়া জমি-মালিকের খেত বা খামারে গিয়ে কাজ না করলে একদিনের রুজি-রোজগার বন্ধ। তাদের মতো মানুষের কাছে একটা দিনের কামাই নষ্ট হওয়া খুব সামান্য ঘটনা নয়। সেটা বন্ধ হলেও যদি মুনিয়ার প্রাণটা রক্ষা করা যেত, তবু না হয় কথা ছিল। কিছুই যেখানে করা যাবে না সেখানে চুপচাপ বসে থেকে কী-ই বা হবে?

বেশির ভাগ লোকজনই সুমিত্রার সঙ্গে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসে। তবে আট দশজন থেকে যায়। মুনিয়ার একটা কিছু খবর না পাওয়া পর্যন্ত তারা এখান থেকে এক পাও নড়বে না।

চার

দুপুরের অনেক আগেই মুনিয়ার খবরটা হাওয়ায় হাওয়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

পৃথিবীর যাবতীয় হইচই এবং উত্তেজনা থেকে বহু দূরে এই নহরপুরা টাউন এবং আশেপাশের বিশ পঁচিশটা গ্রাম মুখ গুঁজে পড়ে আছে। পঞ্চাশ ষাট মাইল জুড়ে এই বিশাল অঞ্চলটা যেন পরোপুরি জেগে থাকে না; আধো-ঘুমে তার দিন কেটে যায়।

হাজার মাইল তফাতে দিল্লির লোকসভায় নিত্যনতুন আইন পাশ হচ্ছে, আতঙ্কবাদিদের গুলিতে প্রতিদিন কত প্রাণ নষ্ট হচ্ছে, কোথাও চলছে তীব্র আন্দোলন, কোথাও নামানো হচ্ছে মিলিটারি, কোথাও বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে রেল-সড়ক, কোথাও হাজার হাজার বেকারের মিছিল বেরুচ্ছে, সে-সব খবর এখানকার বাসিন্দারা রাখে না। মৃত্যু, হত্যা, গণধর্ষণ, কারখানায় লক-আউট, ক্লোজার, বিচ্ছিন্নতাবাদ, হেরোইন—এসবের আঁচ এখানে এসে লাগেনি। শান্ত, স্তিমিত, নিরুত্তাপ এখানকার জীবনযাত্রা। মান্ধাতার বাপের আমলে যেভাবে চলত এখনও প্রায় সেইভাবেই চলে আসছে। হাজার বছর ধরে এখানকার মানুষজনের একই দৈনন্দিন রুটিন। তবে ইদানীং দু'একটা খুনখারাপি আশেপাশে যে ঘটেনি তা নয়। কিন্তু ধর্ষণের ঘটনা এখানে এই প্রথম।

হাসপাতাল থেকে নিজের কোয়ার্টারে ফেরার সময় সুমিত্রা টের পেয়েছিল, মুনিয়ার ব্যাপারে সারা টাউন তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে, চায়ের দোকানগুলোতে, সাইকেল-রিকশা বা টাঙার স্ট্যান্ডে থোকায় থোকায় মানুষের ভিড়। তাদের মধ্যে উত্তপ্ত তর্কাতর্কি চলছে। নহরপুরায় আসার পর থেকে এমন উত্তেজনা আর চোখে পড়ে নি সুমিত্রার।

বেশ বেলা হয়ে গিয়েছিল। কোয়ার্টারে ফিরে চাট্টি চাল ডাল ফুটিয়ে, নাকে মুখে গুঁজে সুমিত্রা স্কুলে ছোটে। কিন্তু আজ পড়াশোনা প্রায় কিছুই হয় না। মাস্টারজিরাও ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে আছে। তারা জেনে গেছে, ধর্ষণের ব্যাপারটা ঘটে যাবার পর যোগীগাঁও, বইহাল, পিপরিয়া ইত্যাদি গ্রামগুলো থেকে অচ্ছুতেরা সুমিত্রার কাছে ছুটে এসেছিল। সে-ও নাকি অচ্ছুৎদের সঙ্গে মুনিয়াকে রাত্রিবেলা খুঁজে বেড়িয়েছে এবং আজ সকালে তাকে নিয়ে হাসপাতালে গেছে।

মাস্টারজিরা একসঙ্গে সুমিত্রার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কোথায় মুনিয়াকে পাওয়া গেল, কারা তার ওপর অত্যাচার করেছে, বদমাশেরা ধরা পড়েছে কিনা, মুনিয়ার বাঁচার সম্ভাবনা আছে কিনা, ইত্যাদি হাজারটা প্রশ্ন তাদের।

সুমিত্রা সংক্ষেপে, ভাসা ভাসা ভাবে উত্তর দিয়েছিল। মাস্টাবজিদেব যাবতীয় কৌতূহল মেটাতে গোটা দিন লেগে যাবে। মুনিয়ার প্রতি সহানুভূতির চাইতে এই জঘন্য ঘটনার মধ্যে যে চটচটে বিকৃতির দিক রয়েছে সে সম্বন্ধেই তাদের বেশি কৌতূহল। এই লোকগুলোর মন যে এত নোংরা, আগে বোঝা যায়নি। ধর্ষণের ব্যাপারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, প্রায় লালা ঝরিয়ে তারা যা যা জানতে চাইছিল তাতে কান এবং গাল লাল হয়ে উঠেছে সুমিত্রার, মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করছিল। সঙ্কোচে লজ্জায় বয়স্ক সহকর্মীদের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারছিল না সে।

কোনোরকমে স্কুলের সময়টা পার করে কোয়ার্টারে আসতেই লখিয়া চিঁড়ে ভাজা আর চা করে এনে দিয়েছিল। বিকেলের চা'টা সে-ই করে দেয়। সুমিত্রা সবে চায়ে চুমুক দিয়েছে, বাইরে তুমুল চেঁচামেচি শোনা যায়, সেই সঙ্গে দরজা ধাক্কাবার আওয়াজ। খুব সম্ভব লাথিও মারছে কেউ। লোকটা যে-ই হোক, প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে যে আছে সেটা ধাক্কাধাক্কি আর চিৎকারে টের পাওয়া যায়।

সুমিত্রা অবাকই হয়ে যায়, এবং কিছুটা বিমূঢ়ও। এদিকের মানুষজন তাকে যথেষ্ট ভালোবাসে, সমীহ করে। এভাবে কেউ কখনও তার বাড়িতে চড়াও হয়নি। সে রীতিমতো অবাকই হয়ে যায়, সেই সঙ্গে বেশ সন্ত্রস্তও। রামবনবাস স্কুল বন্ধ করে সুমিত্রার সঙ্গে চলে এসেছিল। তার ঘর থেকে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'কৌন রে গিদ্ধড়কা ছৌয়া?'

বাইরের গলাটা আরও কয়েক পর্দা চড়ে যায়, 'হামনি—তিহরলাল, তেরে বাপ।'

তিহরলাল পিপরিয়া গাঁয়ের এক জোয়ান ছোকরা। খুবই তেজী এবং বেপরোয়া। এ অঞ্চলের

বড় জমি-মালিক এবং নহরপুরায় বামহন কায়াথদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে মাঝে মাঝেই প্রচুর মার খেয়েছে, দু'একবার বাজে মামলায় ফাঁসিয়ে তাকে জেলও খাটানো হয়েছে। কিন্তু স্বভাবের ঝাঁজ এতটুকু কমেনি তার। পারতপক্ষে সে কাউকে রেয়াত করে না।

তবু এখানে এসে হামলা করায় রামবনবাস মারাত্মক খেপে যায়। তার সব রক্ত মাথায় চড়ে বসে। প্রথমত, হারামজাদের ছৌয়া তার বাপ তুলে কথা বলেছে। তার ওপর নিজের মা-বাপ, বজরঙ্গবলী এবং রামসীয়ার পর সবেচেয়ে বেশি সম্মান সে করে সুমিত্রাকে। সুমিত্রা সম্বন্ধে কেউ উলটোপালটা কথা বললে বা তাকে অপমান করলে রামবনবাস তাকে শেষ করে দেবে।

ঘরের ভেতর থেকে একটা পেতলে বাঁধানো মোটা বেতের লাঠি নিয়ে সে তেড়ে যায়। বাইরে দরজাটা দড়াম করে খুলে বলে, 'আমার বাপ! দেখি ক্যায়সন বাপ! উল্লুকা ছৌয়া শোর মচাতা হ্যায়? শির তোড় দুঙ্গা তুহারকা।'

দরজার বাইরে চোয়াড়ে ধরনের যে ছোকরা অর্থাৎ তিহরলাল দাঁড়িয়ে আছে তার বয়স চব্বিশ পঁচিশ। পরনে ময়লা লাল পাজামার ওপর নীল হাফশার্ট। মুখে চার পাঁচদিনের খাপচা খাপচা দাড়ি। চুলের সঙ্গে খুব সম্ভব তেলের সম্পর্ক নেই বছরখানেক। রুক্ষ, লালচে ধুলোয় জটবাঁধা চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে।

ছোকরার হাতের শির দড়ির মতো পাকানো, চোখের তলায় কালির পোঁচ। সারা গায়ে প্রচুর কাটাকুটি দাগ। সে যে বহুকাল ধরে অনবরত মারধোর খেয়ে আসছে, এগুলো তারই চিরস্থায়ী চিহ্ন। চোখের দৃষ্টি ভয়ানক উগ্র।

তিহরলাল রামবনবাসের দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বারকয়েক মাটিতে থুতু ছিটিয়ে বলে, 'আরে শির তোড়নেবালা, বহুৎ দেখা তেরা মাফিক চুহা। কঁহা হ্যায় তেরা মাস্টারনী—'

অর্থাৎ সুমিত্রার কাছেই এসেছে তিহরলাল। তার বলার ভঙ্গিতে রাগে রামববাসের মাথার একটা রগ যেন ছিঁড়ে যায়। যৌবনে সে ছিল এঅঞ্চলের বিখ্যাত ডাকু। তার শিরার ভেতর ঝিমিয়ে-আসা পুরনো রক্তে আগুন ধরে যায়। হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে গলার নলী ছিঁড়ে চিৎকার করে ওঠে, 'ভূচ্চরকা ছৌয়া—'

ভয়াবহ কিছু একটা ঘটে যেতে পারত, তার আগেই নিজের ঘর থেকে সুমিত্রা দৌড়ে বেরিয়ে আসে। ধমকের গলায় বলে, 'রামবনবাস, লাঠি নামাও—'

চমকে পেছন ফিরে তাকায় রামবনবাস। সুমিত্রাকে দেখে আস্তে বলে, 'জি—' তারপর মুখ নামিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায়।

সুমিত্রা গম্ভীর গলায় তিহরলালকে বলে, 'ভেতরে এসো—'

সুমিত্রার শান্ত চেহারা এবং বলার ভঙ্গিতে এমন এক প্রবল ব্যক্তিত্ব রয়েছে যে একটি কথাও না বলে দরজা পেরিয়ে এধারে চলে আসে তিহরলাল।

সুমিত্রা এবার জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে, বল—'

তিহরলালের চোখমুখের উগ্রতা একই রকম রয়েছে. তবে আগের মতো গলার শির ফুলিয়ে সে চিৎকার করে না। রুক্ষ গলায় সুমিত্রাকে বলে, 'আপনার জন্যে মুনিয়ার সর্বনাশ হয়ে গেল। ব্রিফ আপহীকা লিয়ে—' বলে আঙুল তুলে জোরে জোরে নাড়তে থাকে।

ছোকরার স্পর্ধায় রামবনবাসের মাথায় ফের রক্ত চড়ে যায়। সে তিহরলালের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিতে দিতে সুমিত্রা তিহরলালকে বলে, 'তার মানে?'

প্রচণ্ড ক্রোধে এবং তীব্র বিদ্রূপে টেনে টেনে তিহরলাল এবার যা বলল তা এইরকম। লেখাপড়া শিখলে জজ ম্যাজিস্টর এম্লে বা মনিস্টর হওয়া যায়, এমন একটা মতলব মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেবার কারণে এঅঞ্চলের যুবতী ছুকরিদের মাথা বিলকুল বিগড়ে গেছে। তারা ঝাঁক বেঁধে রাত্তিরে সুমিত্রাব কাছে আসে। মুনিয়ার উচ্চাকাঙক্ষাটি চাগিয়ে না দিলে এখানে সে আসতও না, আর অত রাত করে ফেরার জন্য তার এই ক্ষতিটাও হ'ত না। মুনিয়ার এই সর্বনাশের সম্পূর্ণ দায় সুমিত্রার। আবহমান কাল গ্রামেব মেয়েরা সংসারের কাজ, খেতখামারে পুরুষদের সাহায্য করা, ইত্যাদি নিয়ে জীবন কাটিয়ে

যাচ্ছে। ছোটো গণ্ডির ভেতর ছোটোছোটো সুখ দুঃখ আনন্দ ব্যর্থতা কষ্ট ইত্যাদি নিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। কেন তাদের মাথায় লেখাপড়ার হুজুগ ঢুকিয়ে দিতে গেল সুমিত্রা?

ঝাঁজ এবং বিদ্রূপটুকু বাদ দিলে তিহরলালের কথায় খানিকটা সত্যি তো আছেই। সুমিত্রার কাছে পড়তে না এলে রাত্তিরে নির্জন ফাঁকা মাঠের মাঝখানে মুনিয়াকে একা পেয়ে জানোয়ারেরা এভাবে ছিঁড়েখুঁড়ে শেষ করে দিতে পারত না। সুমিত্রা অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। সে বলে, 'আমি তো মুনিয়ার ভালোই চেয়েছিলাম। লেখাপড়া না শিখলে চিরকাল ঠকতে হয়। জমি-মালিক আর উঁচু জাতের লোকেরা জুতোর তলায় চেপে রাখে। তাই—'

সুমিত্রাকে কথাটা শেষ করতে দেয় না তিহরলাল। অসহিষ্ণুভাবে আঙুল নাচাতে নাচাতে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'ব্যস ব্যস, এল্লেদের মতো বকোয়াস বন্ধ করুন। মুনিয়ার যা ভালাই করেছেন তা তো বুঝতেই পারছি। মেয়েটা শেষ পর্যন্ত জানে বাঁচবে কিনা, কে জানে। অ্যায়সা ভালাইকা কোঈ জরুরত নেহী।'

তিহরলালের রাগ এবং উত্তেজনার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে। সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না সুমিত্রার। কবুতরী সরসতীয়া আর কুঁদরীর কাছে সে শুনেছে, তিহরলালের সঙ্গে মুনিয়ার 'শাদিকা বাত পাক্কা' হয়ে আছে। মুনিয়াকে এ নিয়ে মাঝে মাঝে একটু আধটু ঠাট্টাও করেছে সুমিত্রা। জানতে চেয়েছে তার ভাবী মরদ কেমন মানুষ, কী কাজ করে, কোথায় থাকে, তার সঙ্গে দেখা টেখা হয় কিনা, ইত্যাদি। কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দেয়নি মুনিয়া। শুধু লাজুক মুখে ফিক ফিক করে হেসেছে। অনেক বলার পর একদিন চোখ নামিয়ে সে জবাব দিয়েছিল, 'আদমি বহুৎ গাঁওয়ার (গোঁয়ার)।'

তিহরলালকে এই প্রথম দেখল সুমিত্রা। ছোকরা যে যথেষ্ট গোঁয়ার এবং অত্যন্ত বদমেজাজি তা তো বোঝাই যাচ্ছে। তবু এভাবে চড়াও হওয়ার জন্য তার ওপর বিরক্ত হয় না সে। তিহরলালের ওঠার পেছনে পর্যাপ্ত সঙ্গত কারণ রয়েছে। যার সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যে তার বিয়ে হতে চলেছে তার ওপর কেউ যদি হামলা চালিয়ে রক্তাক্ত বেহুঁশ এবং বেইজ্জত করে ফেলে রেখে যায় তাতে মাথা ঠিক রাখা সম্ভব নয়। সুমিত্রা কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই রামবনবাস বলে ওঠে, 'আরে ভূচ্চরকা ছৌয়া, তোর বাতচিত শুনে মনে হচ্ছে মা'জিই যেন মুনিয়ার ক্ষতি করে দিয়েছে। আনপড় মূরখ হয়ে জীওন কাটিয়ে দিচ্ছিলি তোরা। লেখাপড়া শিখিয়ে আঁখ ফোটাতে চেয়েছিল মা'জি। সেটা বহুৎ কসুর হল, না? যে হারামজাদা কুত্তারা মুনিয়ার সর্বনাশ করল তাদের গিয়ে ধর। তাদের শির ভেঙে দিয়ে আয়। তবে বুঝব তুই একটা মরদের বাচ্চা—'

তিহরলাল থতিয়ে যায়। এদিকটা সে আগে ভেবে দেখেনি। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর গলা নামিয়ে জানতে চায়, কারা মুনিয়ার এতবড় ক্ষতিটা করেছে?

রামবনবাস বলে, 'মা'জি কী করে তা বলবে? পুলিশকে সব জানিয়ে এসেছে মা'জি। থানাবালাবা খুঁজে বার করলে বোঝা যাবে, এই জানবরেরা কারা।'

তিহরলাল চুপ করে থাকে।

রামবনবাস বলে, 'এখানে চেল্লাচিল্লি না করে থানায় যা না। অফসরদের গিয়ে বল, হারামজাদদের যেন তুরন্ত পাকড়ায়।' একটু থেমে আবার বলে, 'মুনিয়ার জন্যে মা'জি কী করেছে, জানিস? কাল রাতে খায়নি, ভালো করে ঘুমোতে পারেনি, আজ সুবেহ্ উঠে অসপাতাল দৌড়ে গেছে। আর তুই কিনা তার ওপরেই হুজ্জুত করতে এসেছিস!'

তিহরলালের মাথার ভেতর যে রক্ত টগবগ করছিল সেটা জুড়িয়ে আসে। মুনিয়ার সর্বনাশ তো আর সুমিত্রা করেনি। বরং তার জন্য সে যা করেছে নিজের আত্মীয়স্বজনও ততটা করে না। তবু উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে যে দৌড়ে এসেছিল সেটা তার হঠকারী স্বভাবের কারণে। কোনো কিছু তলিয়ে বোঝার মতো ধৈর্য তিহরলালের নেই। না ভেবেচিন্তে সে ঝোঁকের মাথায় অনেক কিছু করে বসে। এর ফলে তার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে অনেক সময়।

রামবনবাস বলে, 'যা না, থানামে চলা যা। দেখি তোর হিম্মত কত!'

তিহরলালের জুড়িয়ে আসা রক্তে আবার আগুন ধরে যায়। সে চিৎকার করে বলে, 'জরুর যায়েঙ্গে,

আভ্ভি যায়েঙ্গে। ভুচ্চরের ছৌয়াদের কাউকে আমি ছাড়ব না। সব শালের গলার নলিয়া আমি ছিঁড়ে ফেলব।' শেষ হুমকিটা মুনিযার যারা ক্ষতি করেছে তাদের উদ্দেশে।

'হাঁ হাঁ, যা—' রামবনবাসও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে।

তিহরলাল উত্তেজিত ভঙ্গিতে চলে যাচ্ছিল, সুমিত্রা পেছন থেকে বলে, 'কাল রাত্তিরে এমন সাঙঘাতিক কান্ড হয়ে গেল। আজ সারাদিন চারদিক তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। তোমাকে তো না হাসপাতালে, না তোমাদের লোকজনের সঙ্গে, কোথাও দেখিনি। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

রামবনবাসও সায় দিয়ে বলে ওঠে, 'এখন শোর মচাতে এসেছিস! ছিলি কোথায়? উল্লু কাঁহিকা!'

তিহরলাল জানায়, এখান থেকে দশ মাইল তফাতে বরখা নদীর ওপর ঠিকাদার মুনীশ্বর ঝা যে পুল বানাচ্ছে, মাসখানেক ধরে সেখানে মজুরের কাজ করছে সে। আজ দুপুরে দু'দিনের ছুটি নিয়ে গাঁওয়ে ফিরেই মুনিয়ার খবরটা পেয়ে দৌড়ে এসেছে।

সুমিত্রা গভীর সহানুভূতির সুরে এবার বলে, 'তোমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছি।' তারপরেই সতর্ক করে দেয়, 'থানায় গিয়ে একদম মাথা গরম করবে না। তা হলে কিন্তু বিপদে পড়ে যাবে। বরং এক কাজ কর—'

'কী?'

একটা আনপড় গরিব অচ্ছুতের ক্ষোভ বা দুঃখের কোনো দামই নেই থানার জবরদস্ত অফিসারের কাছে। রাগ বা উত্তেজনার মাথায় ওখানে গিয়ে হইচই বাধালে তিহরলাল বেধড়ক মার তো খাবেই, হয়ত শান্তিভঙ্গের অজুহাতে তাকে হাজতেও পুরে দেওয়া হতে পারে। সুমিত্রা বলে, 'তুমি থানায় যেও না। সোজা হাসপাতালে চলে যাও। থানায় যেতে হলে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।'

সুমিত্রার এই পরামর্শটা মোটামুটি পছন্দ হয় তিহরলালের। থানা সম্পর্কে তার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। সেখানে একা একা গিয়ে মাথা গরম করলে তার পরিণতি খুব সুখকর যে হবে না তা সে জানে। বলে, 'ঠিক হ্যায়, আমি অসপাতালেই যাচ্ছি।'

তিহরলাল চলে যায়।

আরও কিছুক্ষণ পর সুমিত্রাও বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় এসে একটা সাইকেল রিকশা ধরে হাসপাতালের দিকে যেতে যেতে প্রচন্ড অস্থিরতা অনুভব করতে থাকে। মুনিয়া কেমন আছে, তার জ্ঞান ফিরেছে কিনা, কিছুই জানে না সে। বিজয় বলেছিল, মুনিয়ার কোনো খবর থাকলে স্কুলে লোক পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিজয়ের কাছ থেকে কেউ আসেনি।

রিকশা যত এগোয়, সুমিত্রার দুশ্চিন্তা এবং মানসিক চাপ ততই বাড়তে থাকে। উৎকণ্ঠায় তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

পাঁচ

হাসপাতালের গেটের কাছে আসতেই সুমিত্রা দেখতে পায়, ভেতর থেকে উন্মাদের মতো ছুটতে ছুটতে অওতার এবং আরও কিছু লোকজন বেরিয়ে আসছে। অওতারের সঙ্গীরা পিপরিয়া যোগীগাঁও-এর মানুষ। সুমিত্রাকে দেখে তারা চিৎকার করে বলতে থাকে, 'বহেনজি, সব খতম। আমরা আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।'

অওতারদের চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে ভয়াবহ সর্বনাশের ইঙ্গিত রয়েছে। কী ঘটে গেছে তা আর স্পষ্ট করে না বললেও চলে। সুমিত্রার হাত-পা যেন হঠাৎ আলগা হয়ে যায়। তার মনে হয়, এগুলো যেন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়, অন্য কারো শরীর সে বয়ে বেড়াচ্ছে। চোখের সামনের বাড়িঘর, গাছপালা, রাস্তা, গৈয়া এবং ভৈসা গাড়ির ঝাঁক, বিকেলের ঝলমলে রোদ, কিছু দূরের হাসপাতাল বিল্ডিং—পলকের জন্য চারপাশের পৃথিবী একেবারে অন্ধকার হয়ে যায়। কয়েক সেকেন্ড বাদে নহরপুরা টাউন আবার যখন দৃশ্যমান হয়ে ফুটে ওঠে তখন কোনোরকমে সুমিত্রা বলতে পারে, 'গাড়ি থামাও—'

রিকশা হাসপাতালের বাইরে থেমে যায়। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে অওতারদের সঙ্গে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে মহাদেও এবং মুনিয়ার মায়ের বুক ফাটানো কান্নার আওয়াজ শুনতে পায় সুমিত্রা।

অওতারেরা পাশাপাশি হেঁটে আসছিল। অওতার ঝাপসা, ভাঙা গলায় বলে, 'বহেনজি, ডাক্তারসাব বহুৎ কোসিস করেছিল। লেকেন কিছুই হল না। ভগোয়ানের কিরপা মিলল না। মুনিযা হামলোগনকা ছোড় কর ইস দুনিয়াসে চলি গয়ী।'

অর্থাৎ প্রিয় পরিজন এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছেড়ে মুনিয়া চিরদিনের মতো চলে গেছে। সুমিত্রা উত্তর দেয় না। কী-ই বা বলার আছে তার। বার বার ঝলমলে প্রাণবন্ত একটি গ্রাম্য যুবতীর মুখ তার চোখের ওপর ভেসে উঠছে। সর্বক্ষণ তার মুখে হাসি লেগে থাকত। সর্বাঙ্গে তার অঢেল স্বাস্থ্য। ও কাছে এলেই মন ভালো হয়ে যেত। কাল রাত আটটা পর্যন্ত তার কাছেই ছিল মুনিয়া। কিন্তু হাসিখুশি, প্রাণের প্রাচুর্যে ভরপুর মেয়েটাকে আর কোনোদিনই দেখা যাবে না।

সুমিত্রা টের পায়, তার দু'চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে। বুকের ভেতর থেকে কান্না উঠে এসে গলার কাছে শক্ত ডেলার মতো আটকে যাচ্ছে। শ্বাস টানতে কষ্ট হয় তার।

পাশ থেকে অওতার বলে, 'অভি কা হোগা বহেনজি?'

রুদ্ধ গলায় সুমিত্রা কী উত্তর দেয়, বোঝা যায় না।

ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে হাসপাতাল বিল্ডিং-এর এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের কাছে আসতেই সুমিত্রা দেখতে পায়, বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কাঁদছে মুনিয়ার মা, আর করিডরে সমানে গড়াগড়ি দিচ্ছে। এর মধ্যে মুনিয়ার খবর পেয়ে পিপরিয়া এবং যোগীগাঁও-এর বাসিন্দা, নানা বয়সের বহু মেয়ে এবং পুরুষরা হাসপাতালে ছুটে এসেছিল। মেয়েরা মুনিয়ার মাকে সামলে রাখতে পারছে না।

একটু দূরে মাথায় হাত রেখে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে মহাদেও শিশুর মতো চিৎকার করে কাঁদছে। তাকে ঘিরে পুরুষেরা সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সে সবের একটি শব্দও মহাদেও এর কানে ঢুকছে কিনা সন্দেহ।

এই শোকাচ্ছন্ন পরিবেশে একটি মানুষেরও চোখ শুকনো নেই। মহাদেও এবং মুনিয়াব মাকে তারা বোঝাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তাদের চোখও জলে ভরে আছে।

সুমিত্রাকে দেখে মুনিয়ার মায়ের কান্না হঠাৎ কয়েক গুণ বেড়ে যায়, 'আমাব মুনিযাকে ওরা খতম করে দিল বহেনজি। মেরে বচ্চী—'

সুমিত্রা এমনিতে কিছুটা আবেগপ্রবণ। তার গলাব কাছে সেই ডেলাটা যেন আরও শক্ত হয়ে যায়। অসহ্য কষ্টে বুকের ভেতরটা যেন তার ছিঁড়ে যাচ্ছে।

শুধু মুনিয়ার মা, বাপ বা গাঁয়েব লোকজনেরাই না, খানিকটা দূরে পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িযে আছে তিহরলাল। সে কিন্তু কাঁদছে না। তার চোয়াল শক্ত। চোখ থেকে আগুন ঠিকরোচ্ছে যেন। তাকে ঘিরে শোক বা দুঃখের চিহ্নমাত্র নেই। টের পাওয়া যায়, তিহরলালের ভেতরটা ক্রোধে এবং ঘৃণায় তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। বাইরে সেসব এখনও ফেটে বেরিয়ে আসেনি, শুধু গলার কাছের রক্তবাহী মোটা শিরা দু'টো সমানে লাফিয়ে চলেছে। বোঝা যাচ্ছে, যেকোনো মুহূর্তে একটা বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

সুমিত্রা মুনিয়ার মায়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তার আগেই এমার্জেন্সি ওয়ার্ড থেকে বিজয় বেরিয়ে আসে। চাপা গলায় বলে, 'যাক, তুমি এসে গেছ। অওতারদের তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম।' তার চোখেমুখে তীব্র টেনশন।

সুমিত্রা বলে, 'হ্যাঁ, রাস্তায় ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছে।'

বিজয় বলে, 'মেয়েটাকে বাঁচাতে পারলাম না।' হতাশায় তার গলা বুজে আসে, 'কী করব, আগেই ওকে শেষ করে ফেলা হয়েছিল। হাসপাতালে আনাব পর আমাদের করাব কিছুই ছিল না।'

সুমিত্রা চুপ করে থাকে।

বিজয় এবার বলে, 'আমার চেম্বারে চল। তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

'আমি একবার মুনিয়াকে দেখে আসি।'

'ওর বডি পোস্ট মর্টেমের জন্যে ডিস্ট্রিক্ট টাউনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কালকের আগে পাওয়া যাবে না। এসো—'

'একটু দাঁড়াও। মুনিয়ার মা-বাবার কাছে একবার যাই।' বলে মহাদেওদের কাছে চলে যায় সুমিত্রা। তার কিছু বলার ছিল না। তরতাজা টগবগে একটি মেয়ের এমন ভয়াবহ পরিণতি হলে তার মা-বাপকে কী-ই বা বলা যেতে পারে? এর কোনো সান্ত্বনা নেই। শুধু দু'হাতে মুনিয়ার মাকে জড়িয়ে ধরে খানিকক্ষণ বসে থাকে সুমিত্রা। তারপর আস্তে আস্তে উঠে এসে বিজয়ের সঙ্গে তার চেম্বারে চলে যায়।

মুখোমুখি বসে সুমিত্রা ধরা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'মুনিয়া কখন মারা গেল?'

'দুপুরে, একটা নাগাদ।' বিজয়ের গলার স্বর গভীর বিষাদে ডুবে যায়। মুনিয়ার মৃত্যু তাকেও প্রচন্ড নাড়া দিয়ে গেছে।

'তখনই খবর পাঠাওনি কেন?'

'পোস্ট মর্টেমের ব্যবস্থা করতে হল। নানা ঝঞ্ঝাটে লোক পাঠাবার কথা মনে ছিল না।'

একটু চুপচাপ।

একসময় সুমিত্রা বলে, 'কী জরুরি কথা যেন বলবে—'

চিন্তাগ্রস্তের মতো মাথা নাড়ে বিজয়। বলে, 'মারাত্মক একটা সমস্যায় পড়ে গেছি। কী করব, ভেবে উঠতে পারছি না। তোমার পরামর্শ দরকার।'

সুমিত্রাকে কিছুটা উদ্বিগ্ন দেখায়। সে জিজ্ঞেস করে, 'কী সমস্যা?'

বিজয় বলে, 'আজ সকালের দিকে, তুমি চলে যাবার পর, কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান ফিরে এসেছিল মুনিয়ার। সে আমাকে চিনতে পেরেছিল। মারাত্মক একটা খবর দিয়েছে সে।'

প্রবল উৎকণ্ঠায় বিজয়ের দিকে অনেকটা ঝুঁকে সুমিত্রা বলে, 'কী খবর?'

'যারা তার ওপর অত্যাচার করেছে তাদের একজনের নাম বলেছে মুনিয়া। বাকিদের সে অবশ্য চিনতে পারেনি।' বিজয় বলতে থাকে, 'অন্য ক্রিমিনালগুলোর নাম জানার জন্যে আমরা খুব চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আবার ও সেন্সলেস হয়ে যায়। তারপর আর জ্ঞান ফিরে আসেনি।'

সুমিত্রা শ্বাসরুদ্ধের মতো বসে থাকে। তারপর দ্রুত কিছু চিন্তা করে বলে, 'ক্রিমিনালের নাম যখন পাওয়া গেছে তখন তাকে অ্যারেস্ট করে বাকি বদমাশগুলোকেও বার করে ফেলতে পারবে।' একটু ভেবে বলে, 'মুনিয়াকে আর কোনোদিনই ফিরে পাওয়া যাবে না। তবে ক্রিমিনালদের যদি শাস্তি দেওয়া যায়, সেটুকুই যা সান্ত্বনা। ভালোরকম সাজা হলে অন্যেরা আর এরকম বদমাইশি করতে সাহস পাবে না।'

বিজয়ের চোখেমুখে দুশ্চিন্তা এবং সংশয়ের ছাপ ফুটে ওঠে। সে বলে, 'পুলিশের যে সাব-ইন্সপেক্টর এখানে ছিল, মুনিয়ার জবানবন্দি টেপ করে নিয়েছে। লোকটা ভালো। তার ইচ্ছা, ক্রিমিনালদের পানিশমেন্ট হোক। সে তো বলল, ওদের ফাঁসিতে লটকানো উচিত। তবু আমার মনে হয়, শেষ পর্যন্ত বোধহয় শাস্তি দেওয়া যাবে না।'

সুমিত্রা অবাক হয়ে যায়। কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো বিজয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'কেন?'

'মুনিয়া কার নাম করে গেছে, ভাবতে পার?'

'কার?'

'নহরপুরা টাউনের মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল আর সবচেয়ে পয়সাওলা লোক মুনীশ্বর ঝা'র ছেলে বিনোদের।'

মুনীশ্বর ঝা সম্পর্কে এর আগে অনেক খবরই সুমিত্রার কানে এসেছে। নহরপুরার হাওয়ায় হাওয়ায় তাকে ঘিরে বহু গুজব, বহু রটনা। দু' আড়াই শ মাইলের ভেতর মুনীশ্বরের মতো বড় কন্ট্রাক্টর আর নেই। ঠিকাদারি করে নাকি কোটি কোটি টাকা করেছে সে। শুধু টাকার জোরই নেই, যাকে বলে 'কিং মেকার', সে হল তাই। এ অঞ্চল থেকে কে এম. এল. এ হবে, কে এম. পি বা মিনিস্টার,

সে সব মুনীশ্বরই নাকি ঠিক করে দেয়। প্রচণ্ড দাপটে গোটা অঞ্চলটা সে হাতের মুঠোয় রেখেছে। ইলেকশনের সময় তার নিজস্ব ক্যান্ডিডেটদের পেছনে জলের মতো টাকা খরচ করে। অর্থবলের মতো তার জনবলও বিপুল। নহরপুরা এবং আশপাশের দশ বিশটা শহরের যাবতীয় গুন্ডা বজ্জাত মাসলম্যান আর অন্যান্য অ্যান্টিসোশালকে সে পুষে থাকে। চুনাও-এর সময় তাদের মিছিল বার করতে, জিপে করে মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে স্লোগান দিতে দেখা যায়। সুমিত্রা শুনেছে, তাদের দিয়ে আরও হাজার রকম কুকর্ম করিয়ে নেয় মুনীশ্বর। থানা পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা ইন্ডিয়ান পেনাল কোড যাতে এই সব অ্যান্টিসোশালদের চুলের ডগা ছুঁতে না পারে সেদিকটা দেখে থাকে মুনীশ্বর। সে তাদের গড ফাদার। অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ানো রয়েছে তার অদৃশ্য জাল এবং ছায়া। তাকে এড়িয়ে বা অগ্রাহ্য করে এখানে কারো কিছু করার নেই।

মুনীশ্বরকে মোটামুটি চেনে সুমিত্রা। কথায় বার্তায়, চালচলনে, অত্যন্ত বিনয়ী এবং ভদ্র। এই লোকটার যে কোটি কোটি টাকা, সে আঙুল নাড়লে দশ বিশটা এম. এল. এ, এম. পি বা মিনিস্টারের রাতের ঘুম যে ছুটে যাবে কিংবা তার একটি ইশারায় হাজারটা গুন্ডা ডাকু ছুরি রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়বে, তাকে দেখলে কিন্তু তা একেবারেই বোঝা যায় না।

সমাজকল্যাণ দপ্তরের প্রাইমারি স্কুলের দায়িত্ব নিয়ে সুমিত্রা যখন নহরপুরায় আসে তার দু'দিন বাদে এখানকার মান্যগণ্য বামহন-কায়াথদের সঙ্গে মুনীশ্বর ঝা তার কোয়ার্টারে এসেছিল। বলা যায়, সে-ই তাদের জুটিয়ে নিয়ে এসেছিল।

হাতজোড় করে খুবই বশংবদ ভঙ্গিতে মুনীশ্বর প্রথমে নিজেদের পরিচয় দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সুমিত্রা সম্পর্কে নানা খবর জেনে নেয়। তারা কোন জেলার লোক, বাবা-মা জীবিত আছেন কিনা, ভাইবোন ক'জন, ইত্যাদি। সুমিত্রা নহরপুরায় আসায় এখানকার মানুষজন, বিশেষ করে মুনীশ্বর ঝা ব্যক্তিগতভাবে যে নিদারুণ খুশি সেটাও সে সবিনয়ে জানিয়ে দেয়। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেও ছোটোখাটো একটা খিঁচ থেকে গেছে। মুনীশ্বরের মতে অচ্ছুতদের লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্বটা সুমিত্রার মতো উচ্চবর্ণের এক তরুণীর নেওয়া একেবারেই উচিত হয়নি। মুনীশ্বর পালটা একটা প্রস্তাব দিয়েছিল। তারা অর্থাৎ নহরপুরার বামহন-কায়াথরা একটা স্কুল বসিয়ে দিচ্ছে। সুমিত্রা সোশাল ওয়েলফেয়ারের চাকরি ছেড়ে মুনীশ্বরদের স্কুলের দায়িত্ব নিক, উঁচু জাতের ছেলেমেয়েদের মানুষের মতো মানুষ করুক। তাতে সবাই তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

সুমিত্রা বিনীতভাবে জানিয়েছেন, সরকারি চাকরি সে ছাড়তে পারবে না। সব জেনে বুঝেই কাজটা সে নিয়েছে। তার কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জের মতো। এখন সেটা ছেড়ে দেওয়া যায় না। ভয় পেয়ে ছেড়ে দেওয়া মানে হার মেনে নেওয়া। কোনো পরাজয়েই তার মন আদৌ সায় দেয় না। সে বোঝায়, যদি কোনো কারণে ছাড়েও, সরকার নিশ্চয়ই আরেক জনকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠাবে। সোশাল ওয়েলফেয়ারের স্কুল কোনোভাবেই বন্ধ করা যাবে না। তেমন চেষ্টা করাটা ঘোর বে-আইনি।

মুনীশ্বর কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল। তারপর সুমিত্রার কথাটাই শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছে। বলেছে, 'ঠিক হ্যায় সুমিত্রাজি, বে-কানুনি কাজ আমরাও করতে বলব না। আপনি আপনার স্কুল চালান। একদিন কৃপা করে আমার গরিবখানায় পায়ের ধুলো দিলে খুশি হব। নমস্তে—'

'নমস্তে।'

মুনীশ্বর সবান্ধবে সেদিন চলে গিয়েছিল। অবশ্য সুমিত্রার যাওয়া হয়ে ওঠেনি তার বাড়িতে। মুনীশ্বরও তার কোয়ার্টারে আর আসেনি। তবে রাস্তায় মাঝেসাঝে দু'জনের দেখা হয়েছে। কখনও ভদ্রতা বা বিনয়ের ঘাটতি হয়নি মুনীশ্বরের। সব সময়ই তার বংশবদ ভঙ্গি। পৃথিবীর সবার কাছেই যেন সর্বক্ষণ অনুগত হয়ে আছে লোকটা।

দেখা হলেই হাতজোড় করে মুনীশ্বর জানিয়েছে, 'কোনো অসুবিধা হলে আমাকে খবর দেবেন।'

সুমিত্রা ভদ্রতার খাতিরে বলেছে, 'নিশ্চয়ই। আপনার মতো ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মানুষের সাহায্য যে-কোনো সময় দরকার হতে পারে।'

মুনীশ্বর মনে করিয়ে দিয়েছে, 'আমার কোঠিতে একদিনও কিন্তু এলেন না সুমিত্রাজি।'

সুমিত্রা বলেছে, 'যাব একদিন। স্কুল নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে সময় পাই না।'

'আমার বিশ্বাস আছে, একদিন জরুর আমাদের ওখানে আসবেন। সেই আশায় দিন গুনে যাচ্ছি।' বলে হেসেছে মুনীশ্বর।

সুমিত্রাও হেসেছে। সে মনে মনে স্থিরই করে রেখেছে, মুনীশ্বরের ত্রিসীমানায় পারতপক্ষে ঘেঁষবে না। হয়ত মুনীশ্বরও সেটা টের পেয়ে গেছে। দু'চার বার দেখার পরই সুমিত্রা বুঝেছে লোকটা বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান না বলে চতুর বলাই ভালো। মানুষ্যচরিত্র বোঝার মতো বুদ্ধি মুনীশ্বরের আছে। তাই সুমিত্রার মনোভাবও ঠিকই ধরে ফেলেছে।

মুনীশ্বরের বাইরের চেহারায় সৌজন্য এবং বিনয়ের একটা পালিশ রয়েছে। যদিও সেটা মুখোশ, তবু সামনাসামনি তাকে কোনোদিন বিপজ্জনক বা ভীতিকর মনে হয়নি। কিন্তু বিনোদ তার বাবার একেবারে উলটো। জুয়াড়ি, মাতাল, রগচটা এবং চূড়ান্ত লম্পট। মদ, মেয়েমানুষ এবং জুয়ায় সে হাজার হাজার টাকা উড়িয়ে দেয়।

মার্কামারা লম্পটরা কিছু সামাজিক নিয়মকানুন মেনে চলে। তাদের বাঁধা আওরত থাকে, তাদের যত ফুর্তিফার্তা নিজস্ব মেয়েমানুষদের নিয়ে। কিন্তু বিনোদ একেবারেই দু'কান কাটা। নহরপুরাব ভদ্র ঘরের মেয়েদেরও তার কারণে নিরাপত্তা নেই। এই নিয়ে মুনীশ্বরের কাছে প্রচুর নালিশ গেছে।

এতদিন উঁচু জাতের যুবতীরাই ছিল বিনোদের শিকার। এই প্রথম দেখা গেল, তার নজর নিচের দিকে নেমেছে।...

সুমিত্রার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার জন্য বিজয় একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল।

সুমিত্রা বলে, 'মুনীশ্বর ঝা'র ছেলে বলে পার পেয়ে যাবে? দেশে 'রুল অফ ল' বলে কি কোনো বস্তু নেই?'

বিজয় বলে, 'তোমার কথাটা আমার মাথায় যে আসেনি তা তুমি কী করে ভাবলে? হারামজাদাটার চরম পানিশমেন্ট হওয়া উচিত।'

'তা হলে?'

'তুমি খুব সরল মেয়ে। পৃথিবী কিন্তু তোমার বা আমার ইচ্ছা অনুযায়ী স্ট্রেট লাইনে চলে না সুমিত্রা। এই ভারতবর্ষের খানিকটা অংশে নিশ্চয়ই 'রুল অফ ল' খাটে কিন্তু অদৃশ্য অনেকটা জায়গা রয়েছে যেখানে ওই নিয়ম অচল।'

'কী বলতে চাও তুমি?'

সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বিজয় পালটা একটা প্রশ্ন করে বসে, 'সোশাল, পোলিটিক্যাল থেকে শুরু করে সমস্ত লেভেলে মুনীশ্বর ঝা'র ইনফ্লুয়েন্স কতটা, তোমার ধারণা আছে?'

সুমিত্রা বলে, 'পুরোটা না হলেও খানিকটা আছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কিছুই বলতে পারব না। তবে লোকের মুখে মুনীশ্বর ঝা সম্পর্কে নানারকম ব্যাপার শুনি।'

'তুমি শোন, আর আমি নিজের চোখে এমন অনেক কিছু দেখেছি যা শুনলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। হী ইজ আ সুপার-ডেভিল। লোকটা কী করতে পারে আর না পারে, চিন্তা করতে পারবে না।'

একটু চিন্তা করে সুমিত্রা এবার বলে, 'মনে হচ্ছে, তুমি যেন ভয় পাচ্ছ।'

বিজয় বলে, 'অস্বীকার করব না, বেশ নার্ভাসই হয়ে পড়েছি।'

'তোমার নার্ভাস হবার কোনো কারণ নেই।'

সুমিত্রার কথা সঠিক বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে তাকায় বিজয়। সুমিত্রা বলে, 'পুলিশই তো মুনিয়ার স্টেটমেন্ট রেকর্ড করে নিয়েছে। এবার আইন তার কাজ করবে। এর ভেতর কারো কিছু করার বা বলার নেই। তুমি অকারণে নার্ভাস হচ্ছ কেন?'

বিজয় দ্বিধান্বিতভাবে এবার বলে, 'এখন তোমাকে যে খবরটা দেব সেটা আপাতত কাউকে বলবে না।'

'বেশ, বলব না। কী খবর?'

'সাব-ইন্সপেক্টর মুনিয়ার স্টেটমেন্ট রেকর্ড করার সময় চমকে উঠেছিল। যাবার সময় সে বলে গেছে, বিনোদের বিরুদ্ধে কতদূর কী করা যাবে, বলা মুশকিল।'

'মুশকিল কেন? টেপ রেকর্ডারের মতো এত বড় একটা এভিডেন্স রয়েছে। কোর্টে প্রোডিউস করলে লোকটা ছাড়া পাবে কী করে?'

'কোর্ট পর্যন্ত টেপ রেকর্ডারকে পৌঁছুতে দিলে তবে তো পানিশমেন্টের ব্যবস্থা হতে পারে।'

'তোমার কি ধারণা টেপ রেকর্ডারটা এভিডেন্স হিসেবে কোর্টে পাঠানো হবে না?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না বিজয়। অনেকক্ষণ পর বলে, 'কী জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

বিজয়ের সংশয় সুমিত্রার মধ্যে তীব্র এক প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে দেয়। সে বলে, 'এত বড় একটা ক্রাইম করে কেউ পার পেয়ে যাবে, এ আমি ভাবতেই পারি না।'

'ঠিকই বলেছ। কিন্তু—'

'কী?'

'বললে না, মুনীশ্বর ঝা সম্পর্কে তুমি অনেকটা জানো।'

বিজয় ঠিক কী বলতে চায়, বুঝতে না পেরে সুমিত্রা বলে, 'তা হয়তো জানি। তাতে কী হয়েছে?'

বিজয় বলে, 'লোকটার যা ইনফ্লুয়েন্স তাতে সমস্ত ব্যাপারটা চাপা না পড়ে যায়।' তাকে খুবই চিন্তিত দেখায়।

হঠাৎ অদম্য এক জেদ সুমিত্রার মাথায় ভর করে। সে বলে, 'মুনীশ্বর ঝা'র যত পয়সা আর ইনফ্লুয়েন্সই থাক, বিনোদকে কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া যায় না।'

বিজয় সামান্য হাসে। বলে, 'আইডিয়ালিস্ট বাবার মেয়ের মতোই কথাটা বলেছ, কিন্তু কাজটা খুব সহজ নয়।'

সুমিত্রার বাবা রঘুপতি মিশ্র যে একজন সৎ, আদর্শবাদী, শক্ত শিরদাঁড়াওলা মানুষ, বিজয় বহুবার তা শুনেছে। সে জানে, বাবার মতো মেয়েও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে জানে না। সুমিত্রার শান্ত নরম চেহারার মধ্যে এক প্রচন্ড অনমনীয়তা রয়েছে। বাবার মতোই তার মেরুদণ্ডও স্টিলের তৈরি।

সুমিত্রা বলে, 'যত কঠিনই হোক, সব জানার পর আমাদের কিছু একটা করতেই হবে, অবশ্য বিনোদ ঝা'কে যদি বাঁচাবার চেষ্টা করা হয়।'

বিজয় উত্তর দেয় না। বোঝা যায়, তার মধ্যে যথেষ্ট দ্বিধা এবং কিছুটা ভয় কাজ করছে।

সুমিত্রা বলে, 'বিনোদ ঝা'র ব্যাপারটা অওতারেরা জানে?'

বিজয় আস্তে মাথা নাড়ে, 'না, এখনও জানাইনি। মুনিযার মৃত্যুতে ওরা এমনিতেই ভেঙে পড়েছে। তার ওপর এই খবরটা জানাজানি হলে তার রি-অ্যাকশন মারাত্মক হবে।'

সুমিত্রা একটু চিন্তা করে বলে, 'ভালোই করেছ। দু'চারটে দিন দেখা যাক। তারপর তেমন বুঝলে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।'

অনিশ্চিতভাবে বিজয় বলে, 'আচ্ছা—'

'চল, বাইরে যাই। মুনিয়ার মা-বাবার কাছে এখন আমার থাকাটা খুব দরকার।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় সুমিত্রা।

ছয়

পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট এবং মুনিয়ার শব ডিস্ট্রিক্ট টাউন থেকে পরদিনই ছেড়ে দিয়েছিল। রিপোর্টে পরিষ্কার লেখা আছে, একাধিক ব্যক্তি তাকে ধর্ষণ করার পর হত্যা করেছে।

মুনিয়ার নশ্বর দেহ সেদিনই বরখা নদীর পাড়ে অওতাররা পুড়িয়ে আসে। তাদের সঙ্গে সুমিত্রা এবং বিজয়ও গেছে। শুধু তারাই না, পিপরিয়া যোগীগাঁও, ইত্যাদি গ্রামের একটি মানুষও সেদিন ঘরে থাকেনি। মৃতদেহের পেছন পেছন বিহ্বল শোকাচ্ছন্ন জনতা বরখা নদীর পাড়ে চলে গিয়েছিল।

মুনিয়ার বাপ এবং ভাইবোনেরা সমানে কেঁদেই যাচ্ছিল। কিন্তু মেয়ের মৃত্যুশোকের ধাক্কা তার মা কিছুতেই সামলে উঠতে পারছিল না।

যে কোনো মৃত্যুই মা-বাপ এবং প্রিয়জনের কাছে নিদারুণ ক্ষতি। তবু রোগে ভুগে কিংবা দুর্ঘটনায় মারা গেলে কিছু সান্ত্বনা থাকে। বলা যেতে পারে, আয়ু ফুরিয়ে এসেছিল। তার ওপর তো মানুষের হাত নেই। কিন্তু মুনিয়াকে যেভাবে খুন করা হল তা যেমন ভয়াবহ তেমনি মর্মান্তিক। এর কোনো সান্ত্বনা নেই। বিশেষ করে মা-বাপের কাছে। সারাটা রাস্তা দু'হাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে এসেছে মুনিয়ার মা। তার কান্নার আওয়াজ সমস্ত চরাচরকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল যেন। মাঝে মাঝেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ছিল সে।

চারিদিকের বিষণ্নতা, মুনিয়ার মা-বাপ আর তাদের অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কান্না সুমিত্রা এবং বিজয়ের মধ্যে এমনভাবে ঢুকে গিয়েছিল যে তারা একটা কথাও বলতে পারছিল না। সকলের সঙ্গে যন্ত্রচালিতের মতো হাঁটতে হাঁটতে তারা বরখা নদীর পাড়ে চলে আসে। তাদের চোখের সামনেই চিতা সাজিয়ে মুনিয়াকে শোয়ানো হয়। তারপর মহাদেওকে জীবনের সবচেয়ে কঠিন, সবচেয়ে মর্মান্তিক কাজটি অর্থাৎ মুনিয়ার মুখাগ্নি করতে হয়। তার সমস্ত শরীর তখন থরথর করে কাঁপছিল। মুখাগ্নির পরই সে দু'হাতে মুখ ঢেকে, একেবারে ভেঙেচুরে লুটিয়ে পড়ে। অওতার কাছেই ছিল। সে এবং আরও কয়েকজন তাকে ধরাধরি করে খানিকটা দূরে নিয়ে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে হুঁশ ফেরায়। তারপর চিতার দিকে আর একবারও তাকায়নি মহাদেও, সারাক্ষণ পেছন ফিরে দুই হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে বসে থেকেছে। শুধু কান্নার দমকে তারা সারা দেহ ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। তার গলার ভেতর থেকে কাতর, করুণ, একটানা আওয়াজ বেরিয়ে এসে ফাল্গুনের উলটোপালটা বাতাসে ছড়িয়ে যায়।

ঘণ্টা তিনেক চিতার কাছে বসে ছিল সুমিত্রারা। তাদের চোখের সামনে তাজা, টগবগে, হাসিখুশি মেয়েটার শরীর ছাই হয়ে মাটিতে মিশে যায়। পৃথিবীতে তার কোনো চিহ্নই থাকে না। কী নিদারুণ ভাবেই না একটা প্রাণবন্ত মেয়ে দুনিয়া থেকে মুছে গেল!

এত শোকের মধ্যেও একজনই শুধু কাঁদেনি, তার চোখে একফোঁটা জল দেখা যায়নি। সে তিহরলাল। হাসপাতালে যেমন দেখা গিয়েছিল তেমনি মুনিয়ার চিতার একধারে বুকের ওপর আড়াআড়ি দুই হাত রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেছে সে। তার চোয়াল পাথরের মতো শক্ত, চোখ দু'টো টকটকে লাল। শরীরের সব রক্ত তিহরলালের দু'চোখে গিয়ে যেন জমা হয়েছিল। যতক্ষণ না মুনিয়াব শরীর পুড়ে শেষ হয়ে যায়, পলকহীন জ্বলন্ত চিতার দিকে তাকিয়ে থেকেছে সে। মনে হচ্ছিল, তার নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে।

মুনিয়ার মৃত্যুর পর চার পাঁচদিন কেটে গেছে।

সুমিত্রা খবর রেখেছে, এখন পর্যন্ত বিনোদ ঝা'কে পুলিশ অ্যারেস্ট করেনি। শোনা যাচ্ছে, আগের মতোই বেপরোয়া ভঙ্গিতে সে দিন কাটিয়ে চলেছে। নেশা জুয়া মেয়েমানুষ—কোনোটাই বাদ নেই। ধর্ষণ মৃত্যু হত্যা ইত্যাদি তার কাছে কোনো ঘটনাই নয়।

আদৌ বিনোদকে ধরে কোর্টে চালান করা হবে কিনা, সেসম্পর্কে বিজয়ের যথেষ্ট সংশয় ছিল। দেখা যাচ্ছে, তার ধারণা এবং সন্দেহ পুরোপুরি নির্ভুল। বিজয় মুনীশ্বর ঝা'দের সুমিত্রার চেয়ে অনেক বেশি চেনে।

কিন্তু একটা চমৎকার টগবগে মেয়ের জীবন ধ্বংস করে দিয়ে কেউ পার পেয়ে যাবে, আদৌ তা হতে দেওয়া যায় না। মুনিয়ার এই ভয়ঙ্কর মৃত্যু কিছুতেই ভুলে যেতে পারছে না সুমিত্রা। তিহরলাল মোটামুটি ঠিকই বলেছিল, মুনিয়া তার কাছে পড়তে না এলে এমন মারাত্মক দুর্ঘটনা হয়ত ঘটত না। একটা নৈতিক দায় সুমিত্রার মাথায় ক্রমশ চেপে বসতে থাকে। প্রচন্ড ফিক্সেশনের মতো। ভালো করে খেতে ঘুমোতে, এমনকি স্কুলে ক্লাস নিতে পর্যন্ত পারছে না সুমিত্রা। প্রাণের প্রাচুর্যে বোঝাই, উচ্ছল, হাসিখুশি মেয়েটাব মুখ তার চোখের সামনে মাঝে মাঝেই ফুটে ওঠে। আর তখনই অসীম অপরাধবোধে মনটা বিপর্যস্ত হয়ে যায়।

যেকোনো হত্যাই সুমিত্রাকে ভীষণ বিচলিত করে, তার সমস্ত অস্তিত্বকে যেন আমূল ঝাঁকিয়ে দিয়ে যায়। মনে হয়, এইসব জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু তার একক শক্তি আর কতটুকু? তাছাড়া, এদের কাউকেই ব্যক্তিগতভাবে সে চেনে না। কীভাবে, কোথায় গিয়ে প্রতিবাদ জানাবে তেমন কোনো পদ্ধতিও তার অজানা।

তবে মুনিয়ার কথা আলাদা। এই মেয়েটা তার বড়ই প্রিয়। তার হত্যাকারীকেও শনাক্ত করা গেছে। জগতের সব ধর্ষণ, সব হত্যাকাণ্ডের প্রতিকার করতে না পারলেও বিনোদ ঝাঁকে সে ছাড়বে না। এই লম্পট শয়তানের বিরুদ্ধে তার মধ্যে বারুদ জমতে থাকে। এই শহরে এমন বিস্ফোরণ সে ঘটাবে যাতে বিনোদ ঝা'র মতো লোকেরা চিরকালের জন্য গুঁড়িয়ে যায়। এ-অঞ্চলে এমন এক দৃষ্টান্ত সে তৈরি করে দিয়ে যাবে যাতে ভবিষ্যতে মেয়েদের দিকে আঙুল তুলতে কেউ যেন সাহস না পায়। এর মধ্যে বিজয়ের সঙ্গে একবারও দেখা হয়নি সুমিত্রার। বিজয়কে ডেকে আনার জন্য রামবনবাসকে দু'বার হাসপাতালে পাঠিয়েছিল, কয়েকজন পেশেন্ট নিয়ে দিনরাত তাকে এত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে যে হাসপাতাল থেকে একেবারেই বেরুতে পারছে না। রোগীগুলোর এখন তখন অবস্থা, ক্রাইসিস না কাটা পর্যন্ত অন্য কিছু ভাবার বা করার সময় নেই তার। সে খবর পাঠিয়েছে, কয়েকদিন পর নিজে এসে দেখা করবে। তার কাছে লোক পাঠাবার দরকার নেই।

পাঁচ দিন পর আজ সকালে উঠেই সুমিত্রা ঠিক করে ফেলে, দুপুরের দিকে নিজেই একবার হাসপাতালে চলে যাবে। রোগীদের ব্যাপারে বিজয়ের যত ব্যস্ততা থাক, কিছুক্ষণের জন্য তাকে থানায় নিয়ে যেতেই হবে। কেননা আর দেরি হলে এই কেসের গুরুত্ব এবং তীব্রতা ক্রমশ ফিকে হয়ে যাবে। মুনিয়ার হত্যাকারীরা পুরোপুরি হাতের বাইরে চলে যাবে। তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ নষ্ট করে দেবার সুযোগ পাবে তারা।

মুখ টুখ ধুয়ে আসার পর চা খেতে খেতে জানালা দিয়ে অন্যমনস্কর মতো দূরের ফাঁকা মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিল সুমিত্রা।

এই সকালবেলায় মাঠের ওপর প্রচুর পাখি ওড়ে। শীতের সময় যে পরদেশি 'শুগা'র ঝাঁক উত্তর বিহারের এই অঞ্চলটায় চলে এসেছিল, এবার তারা ফিরে যাচ্ছে। দিনের শুরুতে নরম রোদে পাখিদের ওড়াউড়ি দেখতে খুব ভাল লাগে সুমিত্রার।

সামনের দিকে যতদূর চোখ যায়, ফসল-কাটা ফাঁকা মাঠ জুড়ে শুধুই শূন্যতা। কোথাও লোকজন নেই। সমস্ত চরাচর একেবারে নিঝুম। অসীম এই নির্জনতায় আকাশের পাখি দেখতে দেখতে হঠাৎ সুমিত্রার চোখে পড়ে, তিহরলাল মাঠ পেরিয়ে তার কোয়ার্টারের দিকে আসছে। মুহূর্তে তার স্নায়ুগুলো টানটান হয়ে যায়।

সামনের সদর দরজা হাট করে খোলা। এমনিতে সারাক্ষণ ওটা বন্ধই থাকে। হয়তো ওটা খুলে রেখে কোনো দরকারে রামবনবাস কাছাকাছি কোথাও গেছে।

একসময় কোয়ার্টারের ভেতরে চলে আসে তিহরলাল। ততক্ষণে এক চুমুকে চা শেষ করে, কাপটা নামিয়ে রেখে, বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় সুমিত্রা।

তিহরলাল অবশ্য ওপরে ওঠে না, নিচের উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকে।

তিহরলাল যে এখানে আসতে পরে, মুনিয়ার মৃত্যুর পর একবারও ভাবেনি সুমিত্রা। ভেতরে ভেতরে সে খানিকটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে থাকে। প্রথম দিন থেকেই সে দেখে আসছে, তিহরলালের মধ্যে একটা প্রবল বেপরোয়া দিক রয়েছে। হঠকারিতার বশে সে যখন যা খুশি করে বসতে পারে। এই ছোকরা মুনিয়ার হত্যাকাণ্ডের যাবতীয় দায় তার ওপর চাপিয়ে জবাবদিহি চাইতে এসেছে কিনা, কে জানে।

তিহরলালকে কিন্তু আগের দিনের মতো উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ দেখায় না। স্থির চোখে সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।'

সতর্ক ভঙ্গিতে তাকে লক্ষ করতে করতে সুমিত্রা বলে, 'কী কথা?'

'পুলিশের ব্যাপারটা ,আপনার নজরে পড়েছে?'

বুঝতে না পেরে সুমিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'কোন ব্যাপারটা?'

'মুনিয়াকে বেইজ্জতি করে খতম করা হল। লেকেন পুলিশ এখনও জানবরদের ধরল না।' বলতে বলতে তিহরলালের দু'চোখ ধক ধক করতে থাকে।

সুমিত্রা চমকে ওঠে, 'তুমি কাদের কথা বলছ?'

তিহরলাল পালটা প্রশ্ন করে, 'কাদের কথা বলছি, আপনি জানেন না?'

'আমি কী করে জানব?'

'ডাক্তারসাব আপনাকে কিছু বলেননি?'

ডাক্তারসাব অর্থাৎ বিজয়। মুনিয়ার মৃত্যুর দিন বিজয় যে সুমিত্রাকে তার চেম্বারে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, তিহরলাল নিশ্চয়ই তা লক্ষ করেছে। তাদের মধ্যে কী ধরনের আলোচনা হয়েছিল, তিহরলালের পক্ষে তা শোনা সম্ভব নয়। তবে ছোকরা বেপরোয়া, উদ্ধত হলেও অত্যন্ত বুদ্ধিমান। সে কি কিছু আন্দাজ করে নিয়েছে? যদি নিয়েই থাকে, খুব সম্ভব ঠিকই আঁচ করেছে। সুমিত্রার অস্বস্তি অনেকটা বেড়ে যায়। সে বলে, 'ডাক্তারসাহেব আমাকে কী বলবে?'

সুমিত্রার দিক থেকে চোখ সরায়নি তিহরলাল। সে আস্তে আস্তে বলে, 'শুনেছি, মরার আগে মুনিয়ার হুঁশ নাকি ফিরে এসেছিল। সে কয়েকজনের নাম করে গেছে। আমি তাদের কথা বলছি।' তিহরলাল জানায়, হাসপাতালের লোকজনের কাছে সে এসব শুনেছে।

সুমিত্রা চুপ করে থাকে।

তিহরলাল আবার বলে, 'শুনেছি, হুঁশ ফেরার পর যখন মুনিয়া জানবরদের নাম করেছিল, ডাক্তারসাব অর এক পুলিশ অফসর তার কাছে ছিলেন।'

সুমিত্রা এবারও উত্তর দেয় না।

তিহরলাল সরাসরি প্রশ্ন করে, 'ডাক্তারসাব শুনেছেন, আর উনি আপনাকে বলবেন না, তা কি হয়?'

সুমিত্রার সঙ্গে বিজয়ের যে একটা সম্পর্ক রয়েছে সেটা মোটামুটি এঅঞ্চলের অনেকেই জানে। তবে সম্পর্কটা কতখানি গভীর, কতটা সুদূরপ্রসারী তা হয়ত সবটা আন্দাজ করতে পারে না। সুমিত্রা বিব্রত ভাবে বলে, 'সব কথা আমাকে বলবে, এমন কোনো নিয়ম আছে?' বিনোদের নামটা ইচ্ছা করেই তিহরলালকে জানায় না সে। জানালে আক্রোশের বশে তিহরলাল এমন কিছু করে বসবে যার ফলাফল তার পক্ষে হবে খুবই মারাত্মক। তিহরলালকে সে যতটুকু দেখেছে তাতে মনে হয়েছে, ছোকরা প্রচন্ড ঝোঁকের বশে চলে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তার নেই। অত্যন্ত একরোখা, জেদী এবং হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য। এই পৃথিবীতে টিকে থাকতে বা কার্যসিদ্ধি করতে হলে নানারকম চাতুরির আশ্রয় নিতে হয়। তিহরলাল সেসব একেবারেই বোঝে না।

সুমিত্রার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করে না তিহরলাল। বিজয় তার কাছে কোনো কথা গোপন রাখবে, তিহরলালের কাছে এটা অভাবনীয়। পলকহীন তার দিকে আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর তিহরলাল বলে, 'আপনি তো মুনিয়াকে বহুৎ পেয়ার করতেন?'

এজাতীয় একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না সুমিত্রা। সে কিছুটা হকচকিয়ে যায়। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে ব্যস্তভাবে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ও আমার ছোটো বোনের মতো।'

'মুনিয়াকে ভূচ্চরের ছৌয়ারা খতম করে দিল। আর আপনি গুংগা (বোবা) হয়ে বসে থাকবেন? কিছু বলবেন না? কিছু করবেন না?' বলতে বলতে উত্তেজনায় এবং ক্ষোভে গলা বুজে আসে তিহরালালের। তার কপালের দু'পাশেব শিরা লাফাতে থাকে।

তিহরলালের আবেগ এবং কষ্ট সুমিত্রার মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে দিতে থাকে। সে বলে, 'তুমি কী করে জানলে আমি গুংগা হয়ে থাকব? কিছু করব না?'

'মুনিয়া পাঁচ রোজ মারা গেছে। এর ভেতর কী করেছেন আপনি?'

তিহরলালের গলায় প্রচন্ড অভিযোগের সুর। সরাসরি সুমিত্রাকে সে দোষারোপই করছে। এভাবে আগে আর কথা বলেনি তিহরলাল। সুমিত্রা প্রায় চমকে ওঠে। একটু ভেবে বলে, 'আর একটা দিন দেখ।'

'ঠিক হ্যায়। কাল আমি আবার আসব।'

'আসতে পার।'

তিহরলাল চলে যায়।

দুপুরে স্কুলের দায়িত্ব অন্য মাস্টারজিদের ওপর দিয়ে একটা রিকশা ডাকিয়ে হাসপাতালে চলে আসে সুমিত্রা। কিন্তু বিজয়কে সেখানে পাওয়া যায় না। একজন নার্স জানায়, বিজয় তার কোয়ার্টারে খেতে গিয়েছে।

অগত্যা কোয়ার্টারেই যেতে হয় সুমিত্রাকে।

দুপুরে ঘুমনোর অভ্যাস নেই বিজয়ের। খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল সে। সকালে পাটনায় যে কাগজ বেরোয়, নহরপুরায় সেটা পৌঁছুতে পৌঁছুতে দুপুর হয়ে যায়।

সুমিত্রাকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসে বিজয়। এই অসময়ে সুমিত্রা যে আসতে পারে, এটা ছিল নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। সে জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যাপার? আজ তোমার স্কুল নেই?'

'থাকবে না কেন?'

অবাক হয়ে যায় বিজয়। তার বিস্ময়ের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্রথমত, দুপুরে কখনও আসে না সুমিত্রা। তাছাড়া পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও সে স্কুল কামাই করে না। বিমূঢ়ের মতো বিজয় বলে, 'তা হলে?'

এপ্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সুমিত্রা বলে, 'যে পেশেন্টদের নিয়ে তুমি খুব ব্যস্ত ছিলে তারা কেমন আছে?'

'ক্রাইসিস কেটে গেছে। এখন বলা যায়, ওরা বেঁচে যাবে।'

'ভালো খবর। কিন্তু ওই ব্যাপারটার কী হবে?'

বিজয় ইঙ্গিতটা বুঝতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না। তার মুখচোখ দেখে মনে হয়, খুব অস্বস্তি বোধ করছে।

বিজয়ের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে করতে সুমিত্রা এবার বলে, 'পুলিশ কোনো অ্যাকশান নিয়েছে?'

বিজয় বলে, 'ঠিক জানি না। ক'টা দিন পেশেন্টদের কাছ থেকে তো উঠতেই পারিনি। আজই প্রথম দুপুরে কোয়ার্টারে এসে একটু রেস্ট নিতে পারছি।'

'আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

'কিন্তু—'

'কী?'

দ্বিধান্বিতভাবে বিজয় বলে, 'একটা কথা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখেছ?'

সুমিত্রা স্থির চোখে বিজয়কে লক্ষ করতে করতে বলে, 'মুনীশ্বর ঝা'দের প্রচুর টাকা, প্রচন্ড ইনফ্লুয়েন্স আর মাসল-পাওয়ার—এই তো?'

'সেসব তো আছেই। কিন্তু মুনিয়ার মৃত্যুর পর তার মা-বাবা আত্মীয়স্বজনদের তরফ থেকে এখন পর্যন্ত ক্রিমিনালদের ধরার জন্যে চাপ দেওয়া হয়নি। তারা এ নিয়ে থানায় গিয়ে হইচই করেছে, এমন খবরও আমার কানে আসেনি।'

'ওরা লেখাপড়া জানে না, থানায় যেতে ভয় পায়। ওরা যায়নি বলে আমরা যাব না? অন্যায় অন্যায়ই। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই হবে।'

একটু চিন্তা করে বিজয় বলে, 'পুলিশ যদি জিজ্ঞেস করে, এ ব্যাপারে আমাদের এত ইন্টারেস্ট কেন, কী উত্তর দেবে?'

সুমিত্রা বলে, 'যদি জিজ্ঞেস করে তখন দেখা যাবে। এখন আমার সঙ্গে থানায় চল তো—'

বিজয়ের সেরকম কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না। নিরুৎসুকভাবে সে বসে থাকে। বলে, 'পৃথিবীর সব অন্যায়ের প্রতিকার করার ক্ষমতা আমাদের নেই।'

'একথা তুমি বোধহয় আগেও বলেছ। সব অন্যায়ের না পারি, হাতের কাছে যেটা আছে সেটার ব্যাপারে একটু চেষ্টা করে দেখাই যাক না। একটা সোশাল রেসপনসিবিলিটি না হয় নিলামই। তাছাড়া—'

'কী?'

সুমিত্রা বলে, 'আমরা এগিয়ে গেলে মুনিয়ার মা-বাবা, তাদের গাঁয়ের লোকজন সাহস পাবে। তখন তারা আমাদের পেছনে এসে দাঁড়াবে। শুরুটা কিন্তু আমাদেরই করতে হবে। অশিক্ষিত, গরিব লোকদের ভয় ভাঙিয়ে দেওয়াটা খুবই জরুরি।' তার কণ্ঠস্বর শান্ত, কিন্তু দৃঢ়।

বিজয় হাসে, 'রিস্ক তা হলে নেবেই?'

এপ্রশ্নের উত্তর দেয় না সুমিত্রা। সে শুধু বলে, 'উঠে পোশাক পালটে নাও। আমাকে কিন্তু থানার কাজ সেরে আবার স্কুলে ফিরতে হবে।'

একটু পরে বিজয়কে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সুমিত্রা।

সাত

থানাটা নহরপুরা টাউনের ঠিক মাঝখানে। বিশাল কমপাউন্ডের ভেতর বৃটিশ আমলে তৈরি লাল রঙের প্রকান্ড একতলা বাড়ির একধারে ও সি'র কামরা। অন্য একটা ঘরে বিরাট বিরাট লোহার আলমারিতে নানা ধরনের রেকর্ড রাখা আছে। বিশাল এক হল-ঘরে সাব-ইন্সপেক্টর, হেড কনস্টেবল এবং সাধারণ কনস্টেবলদের বসার জন্য আলাদা আলাদা জায়গা। পেছন দিকে কয়েদিদের জন্য লক-আপ।

কমপাউন্ডের পেছন দিকে দু'টো দোতলা বাড়িতে ও. সি, সাব-ইন্সপেক্টর এবং কনস্টেবলদের সপরিবারে থাকার ব্যবস্থা। সামনের দিকে বিপুল বটগাছের নিচে বজরঙ্গবলী এবং শিবের মন্দির। কালো রঙের গোটা দুই পলিশ ভ্যান এবং পাঁচ ছ'টা জিপ এধারে ওধারে দাঁড়িয়ে আছে।

পুরো এলাকাটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সামনে লোহার গেট। সুমিত্রা এবং বিজয় গেটের যখন সাইকেল রিকশা থেকে নামল দু'টো আর্মড গার্ড রাইফেল নামিয়ে রেখে, টুলে বসে হাতের চেটোতে খৈনি ডলছিল। সুমিত্রাদের দেখে তারা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায়। ডাক্তার সাহেব এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের হেড মিস্ট্রেসকে তারা খুব ভালো করেই চেনে। ব্যস্তভাবে বলে, 'আইয়ে, আইয়ে—'

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'চৌবেজি আছেন?' চৌবেজি, অর্থাৎ মুলায়েম চৌবে নহরপুরা থানার ও. সি।

'আছেন। কোয়ার্টারে দুফারকা (দুপুরের) ভোজন করতে গেছেন।'

'আমরা ওঁর সঙ্গে দেখা করব।'

'হাঁ হাঁ, জরুর। আইয়ে—'

সুমিত্রা এবং বিজয়কে ও. সি'র কামরায় বসিয়ে একটা আমর্ড গার্ড ও. সি'কে খবর দিতে ছোটে।

কিছুক্ষণ পর ভারী, মাংসল চেহারার মুলায়েম চৌবে ঢুলু ঢুলু চোখে তাঁর ঘরে এসে ঢোকেন। এখন তাঁর পরনে পুলিশের ইউনিফর্ম নেই। যা আছে তা হল সিল্কের লাল টকটকে লুঙ্গি আর জালি-কাটা গেঞ্জি। দেখামাত্রই বোঝা যায়, দুপুরে উৎকৃষ্ট ভোজনটি সমাধা করে তিনি পরিপাটি দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন। এটা তাঁর বহুকালের অভ্যাস। খুনখারাপি রাহাজানি ডাকাতি, যাই ঘটুক না, দুপুরের ঘুম থেকে তাঁকে তোলা চলবে না। অবশ্য ডিস্ট্রিক্ট টাউন থেকে এস. পি এলে অন্য কথা। যাই হোক, এই মুহূর্তে কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে তাঁকে তুলে আনা হয়েছে। এস পি ছাড়া অন্য কেউ হলে

এই অসময়ে নিদ্রাভঙ্গের জন্য খেপে যেতেন মুলায়েম চৌবে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যত বিরক্তই হন না, বিজয়দের দেখার পর বাইরে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বরং সারা মুখে অলৌকিক একটি হাসি ফুটিয়ে হাতজোড় করে বলেন, 'নমস্তে, নমস্তে। আমার কী সৌভাগ! থানায় যে কোনোদিন আপনারা কৃপা করে আসতে পারেন, এ আমি ভাবতেই পারিনি।'

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বিজয়রা বলে, 'একটা জরুরি কাজে আপনার কাছে আসতে হল।'

'কাজের কথা পরে শুনব। এখন কী আনাব বলুন।—ঠাণ্ডা, গরম?'

'আপনাকে এনিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না চৌবেজি। আমরা একটু আগে খেয়েছি। এখন কিছু দরকার নেই।'

'তা-ই কখনও হয়! আজ পয়লা এখানে আপনাদের পায়ের ধুলো পড়ল। সারা জীওনে আর হয়তো কোনোদিন থানায় আসবেনই না। মেহমানদারির এই চান্সটা আমি কিছুতেই ছাড়ব না।' বলেই গলা চড়িয়ে চেঁচাতে থাকেন মুলায়েম চৌবে, 'এ গিরিধর—গিরিধর—'

পলকের মধ্যে বিশাল গোঁফওলা এক কনস্টেবল দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে তটস্থ ভঙ্গিতে স্যালুট করে, 'জি, স্যার—'

মুলায়েম চৌবে যে জবরদস্ত দারোগা, স্যালুটের বহর দেখে টের পাওয়া যায়। গিরিধরকে কাছে ডেকে নিচু গলায় ফিস ফিস করে তিনি কিছু হুকুম করেন।

গিরিধর ঘাড় হেলিয়ে তৎক্ষণাৎ উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে যায়।

কী উদ্দেশ্যে কনস্টেবলটাকে পাঠানো হল, বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু অস্বস্তি বোধ করা ছাড়া কিছুই আর করার নেই বিজয়দের। কেননা মেহমানদারি কাকে বলে, সেটা না দেখানো পর্যন্ত মুলায়েম চৌবেকে কোনোভাবেই রোখা যাবে না।

সুমিত্রা বলে, 'কাজের কথাটা তাড়াতাড়ি সেরে নেওয়া যাক—'

'নেহী নেহী—' জোরে জোরে মাথা এবং দুই হাত ঝাঁকিয়ে মুলায়েম চৌবে বলেন, 'এত তাড়াহুড়োর কী আছে? আগে থোড়েসে মুহ্ মিঠা করুন, তারপর ওসব হবে। দিনের পর দিন চোর ডাকু বদমাশ খুনিদের ঘেঁটে ঘেঁটেই কেটে যাচ্ছে। আপনাদের মতো সাচ্চা আদমি এখানে আসে না। জীওনটা বিলকুল বদবুওলা ডিরেন (ড্রেন) হয়ে গেছে। সৎসঙ্গ যতক্ষণ পাওয়া যায় ততক্ষণই পুণ্ (পুণ্য)।' বলে বিশাল শরীর কাঁপিয়ে হাসতে থাকেন মুলায়েম।

অগত্যা কী আর করা, এলোমেলো অনাবশ্যক কথায় সময় কাটাতে হয়। সুমিত্রার স্কুল কেমন চলছে, অচ্ছুৎদের ছেলেমেয়েরা কবে নাগাদ জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে বেরুবে কিংবা বিজয়ের হাসপাতালে কোনো সমস্যা আছে কিনা, ইত্যাকার নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে মিনিট পনেরো কুড়ি পার হয়ে যায়।

একসময় প্রকান্ড একটা স্টিলের থালায় ভারী ভারী প্লেটে প্যাঁড়া নিমকিন গুলাবজামুন এবং দইয়ের উৎকৃষ্ট ঠাণ্ডাই সাজিয়ে আনে গিরিধর। প্লেটগুলো আর ঠাণ্ডাইয়ের গেলাস বিজয়দের সামনে রেখে সে চলে যায়।

মুলায়েম চৌবে অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বলেন, 'নিন, শুরু করুন।'

বিজয় নীরস গলায় বলে, 'পেটে একেবারেই জায়গা নেই। শুধু আপনার অনুরোধ রাখতে যা পারছি খাচ্ছি। দয়া করে এরপর আর জোর করবেন না।' বলে একটা প্যাঁড়া তুলে ঠাণ্ডাইয়ের গেলাস টেনে নেয়। সুমিত্রা নেয় ঠাণ্ডাই এবং একটা গুলাবজামুন।

মুলায়েম আর জোরজার করেন না। শুধু বলেন, 'আপলোগকা মর্জি—'

দ্রুত খাওয়া চুকিয়ে সুমিত্রা মূলায়েমের দিকে তাকায়, 'এবার আরম্ভ করি?'

আস্তে ঘাড় হেলিয়ে দেন মুলায়েম।

সুমিত্রা খুব সতর্ক ভঙ্গিতে শুরু করে, 'আমরা মুনিয়ার খুনের ব্যাপারে এসেছি।'

প্রথমটা কিছুই মাথায় ঢোকে না। খানিকক্ষণ ভাবার পর হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায় মুলায়েমের। ভুরু সামান্য তুলে বলেন, 'ও, ওই অচ্ছুৎদের লেড়কীটার কথা বলছেন? বহুত দুখকা বাত।'

সুমিত্রা বলে, 'ও আমার কাছে পড়ত।'

'শুনেছি।'

'বড় ভালো মেয়ে ছিল।'

'ও, আচ্ছা—' বলে ধীরেসুস্থে টেবলের ড্রয়ার থেকে তামাক এবং চুন বার করে হাতের চেটোতে ডলে ডলে খৈনি বানাতে থাকেন মুলায়েম।

দেখা যাচ্ছে আর্মড গার্ড থেকে ও. সি পর্যন্ত এথানার সকলেরই খৈনির নেশা। সুমিত্রা বলে, 'মুনিয়ার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। বেঁচে থাকলে আসছে মাসে বিয়েটা হয়ে যেত। তার আগেই সব শেষ হয়ে গেল।'

জিভের ডগায় চুক চুক করে আক্ষেপসূচক শব্দ করেন মুলায়েম, 'আপসোসকি বাত।'

সুমিত্রা মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়। তারপর বলে, 'আমরা আপনার কাছে একটা অভিযোগ নিয়ে এসেছি চৌবেজি—'

মুলায়েমের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। খৈনি বানানো হয়ে গিয়েছিল। নিচের ঠোঁট টেনে দাঁতের ফাঁকে সেটা গুঁজে দিতে দিতে অবিচলিত ভঙ্গিতে বলেন, 'কী অভিযোগ? কার নামে?'

'এই থানার বিরুদ্ধে।'

কপালটা পলকের জন্য কুঁচকে গিয়ে পরক্ষণেই টান টান হয়ে যায় মুলায়েমের। ধীর চালে তিনি বলেন, 'আপনাদের মতো রেসপেক্টেড মানুষেরা যখন অভিযোগ করছেন তখন সেটা ফালতু ব্যাপার না। বলুন—'

সুমিত্রা বলে, 'মুনিয়া মারা গেছে পাঁচদিন আগে। এখন পর্যন্ত একজন ক্রিমিনালকেও অ্যারেস্ট করা হয়নি। এর কারণটা কী বুঝতে পারছি না।'

'আমরা জোর চেষ্টা করছি। খুব বেশি দেরি হবে না। মূলায়েম চৌবের চোখে ধুলো দিয়ে হত্যারা (খুনি) কোথায় গা ঢাকা দিয়ে থাকবে? ও শালেদের জরুর ঢুঁড়ে বার করব।' বলে টেবলের তলা থেকে পেতলের বিরাট একটা পিকদান তুলে এনে পুচ করে গাঢ় বাদামি রঙের থুতু ফেলে সেটা জায়গামতো রেখে দেন মুলায়েম।

যেভাবে মুলায়েম তার অভিযোগকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে হালকা ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন তাতে বেশ ক্ষুব্ধই হয় সুমিত্রা। বলে, 'আমার মনে হয় আপনাদের এব্যাপারে আরো সিরিয়াস হওয়া দরকার।'

'আমরা বহুৎ সিরিয়াস সুমিত্রাজি। চিন্তা মাত্ কিজিয়ে। ইয়ে এক সাদাশুধা লেড়কীকা মৌতকা সওয়াল। বহুৎ সিরিয়াস কেস।'

সুমিত্রা কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে মুলায়েম এবার বলেন, 'বহেনজি, আপনার ওয়েল-উইশার হিসেবে একটা কথা বলব?'

'বলুন—'

'আপনার মতো একজন রেসপেক্টেড লেডি এই সব গান্ধা ব্যাপার নিয়ে কেন নিজেকে এত হয়রান করছেন? আমরা নোংরা ঘাঁটি। আমাদের ওপর ওটা ছেড়ে দিন।'

স্থির চোখে মুলায়েম চৌবের দিকে তাকিয়ে থাকে সুমিত্রা। বলে, 'পাঁচ দিন তো চুপ করেই ছিলাম। দেখছিলাম, আপনারা কী করেন। কিন্তু আশ্চর্য, পুলিশের তরফ থেকে কিছু করা হয়নি। অথচ—' এই পর্যন্ত বলে থেমে যায়।

'অথচ কী?'

'আসল ক্রিমিনাল কে, আপনারা তা জানেন।'

মুলায়েম চৌবে হকচকিয়ে যান। বলেন, 'আমরা জানি! কী বলছেন বহেনজি!'

সুমিত্রার মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। সে বেশ জোর দিয়েই বলে, 'হ্যাঁ, জানেন।'

মুলায়েম দুই হাত উলটে দিয়ে অবাক হবার ভঙ্গিতে বলেন, 'আপনার এরকম ধারণা হল কী করে?'

মুলায়েমের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে সুমিত্রা বলে, 'এই প্রশ্নটা আপনার কাছে আশা করিনি চৌবেজি।'

মুলায়েম নড়েচড়ে বসেন। বলেন, 'মানে?'

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, মারা যাবার আগে মুনিয়ার জ্ঞান কিছুক্ষণের জন্যে ফিরে এসেছিল। তখন একটা লোকের নাম করে যায় সে। আপনাদের একজন সাব-ইন্সপেক্টর তার শেষ জবানবন্দি রেকর্ড করে রেখেছে।'

হঠাৎ যেন ব্যাপারটা মনে পড়ে যায় মুলায়েমের। ব্যস্তভাবে বলেন, 'হাঁ হাঁ, এস. আই সেদিন হাসপাতালে ডিউটি সেরে টেপ রেকর্ডার এনে দিয়েছিল ঠিকই। আমি বাজিয়ে দেখেও ছিলাম। লেকেন—'

সামনের দিকে ঝুঁকে সুমিত্রা গভীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'লেকেন কারো নাম ওটায় আছে কিনা, মনে পড়ছে না তো।'

এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল বিজয়। এবার বলে ওঠে, 'নিশ্চয়ই ছিল। আমি নিজ এস-আই'কে আমার চেম্বারে ডেকে এনে মুনিয়ার ডাইয়িং ডিক্লারেশন রেকর্ড করিয়েছিলাম।' বিজয়ের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

মুলায়েম উত্তর দেন না। চোখ সামান্য কুঁচকে বিজয় এবং সুমিত্রাকে সতর্ক ভঙ্গিতে লক্ষ করতে থাকেন।

বিজয় থামেনি, 'নামটা আমরা পরিষ্কার শুনেছি।'

মুলায়েম কিছুক্ষণ চিন্তা করার ভান করে বলেন, 'হয়তো নামটা আছে। আমি বোধহয় ভালো করে শুনিনি। তাই মনে পড়ছে না।'

'এক কাজ করুন চৌবেজি—'

'হাঁ হাঁ, ফরমাইয়ে—'

'টেপ রেকর্ডারটা একবার আনান। বাজালেই নামটা শুনতে পাবেন।'

মুলায়েম এটা ভাবতে পারেননি। তিনি থতিয়ে যান। বাইরে থেকে নিরেট আর ভোতা মনে হলেও আসলে মুলায়েম অসম্ভব ধূর্ত। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন, 'ওটা তো আনানো যাবে না ডাক্তারসাহেব।'

'কেন?'

'রেকর্ডটা ডিস্ট্রিক্ট টাউনে এস. পি'র কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। এটা একটা ইমপর্টান্ট ডকুমেন্ট। কোর্টে কেস উঠলে ম্যাজিস্ট্রেটকে বাজিয়ে শোনাতে হবে। এখানে রাখলে যদি হারিয়ে যায়, তাই এস. পি সাহেবের জিম্মায় পাঠানো হয়েছে।'

লোকটা সত্যি বলছে কিনা, ঠিক ধরা যাচ্ছে না। থানা বা আইন-আদালত সম্পর্কে বিজয়ের ধারণা খুব ভাসা ভাসা। তবু যেটুকু সে জানে তা এইরকম। মার্ডার কেসে থানা থেকেই সাক্ষ্যপ্রমাণ আদালতে পেশ করা হয়। কাজেই টেপ-রেকর্ডারটা কেন এস. পি'র কাছে পাঠানো হল, সে বুঝতে পারছে না।

এখানে আসার আগে রীতিমতো দ্বিধাই ছিল বিজয়ের। মুনিয়ার প্রতি তার যথেষ্ট সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও নিজেকে তার হত্যাকান্ড থেকে দূরেই সরিয়ে রাখতে চেয়েছে। সুমিত্রা যে এব্যাপারে প্রচন্ড জেদ ধরে আছে, সেটা তার বিশেষ ভালো লাগেনি। কিন্তু এখন তার মনোভাব অনেকটা বদলাতে শুরু করেছে। মুলায়েমের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, মুনিয়ার হত্যাকারীদের ধরার ব্যাপারে কোথায় যেন অদৃশ্য জট পাকানো রয়েছে। হঠাৎ একটা একগুঁয়েমি যেন পেয়ে বসে বিজয়কে। এই পৃথিবীতে গা বাঁচিয়ে নিজের স্বার্থটুকু আগলে নিশ্চয়ই জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। সেই পরামর্শই কিছুক্ষণ আগেও সুমিত্রাকে দিয়েছিল সে। কিন্তু এখন টের পাওয়া যাচ্ছে, পুলিশের কাজকর্মে ইচ্ছাকৃত একটা ঢিলেমি রয়েছে। এমন একটা ভয়াবহ ঘটনার ওপর তারা বিশেষ কোনো গুরুত্বই দিচ্ছে না। এখনও যে উত্তেজনাটুকু আছে, আর কিছুদিন বাদে তা-ও থাকবে না। মানুষের স্মৃতি খুব দুর্বল।

ভবিষ্যতে আরও উত্তেজক কোনো ঘটনা মুনিয়ার মৃত্যুকে একেবারেই হয়তো আড়াল করে দেবে। এই ভয়াবহ মৃত্যু ক্রমশ এঅঞ্চলের মানুষের স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে যাবে। মুনিয়া নামের একটা টগবগে মেয়ে এই পৃথিবীতে যে বাস করে গেছে, সে কথা কারো মনেও থাকবে না। শুধু সারাদিন 'গতরচূরণ' পরিশ্রমের পর রাত্তিরে শুয়ে ঘুমোবার আগে মেয়েটার এমন প্রতিকারহীন মৃত্যুর কথা ভেবে তার মা-বাবার চোখ কিছুক্ষণের জন্য সিক্ত হয়ে উঠবে। নইলে পৃথিবীর আর কোথাও এই মৃত্যু একটুকু দাগ রেখে যাবে না।

বিজয় বলে, 'টেপ রেকর্ডারটা যখন ভালো করে শোনেননি তখন এক কাজ করুন চৌবেজি—'

'বলুন।'

'ওটা আনিয়ে শুনে নিন। নামটা জানতে পারবেন।'

মুলায়েম চৌবে নড়েচড়ে বসেন, 'তা কী করে হয় ডাক্তার সাহেব?'

বিজয় বলে, 'কেন হয় না?'

'এস. পি সাহেব আমার উপরবালা। একবার তাঁর কাছে টেপ-রেকর্ডারটা দিয়ে আবার কি চেয়ে আনা যায়? নিজে যদি তিনি দেন তখন জরুর বাজিয়ে শুনে নেব।'

পরিষ্কার বোঝা যায়, টেপ-রেকর্ডারের ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাইছেন মুলায়েম। বিজয় বলে, 'আপনার যখন ওটা আনার অসুবিধে, নামটা আমিই বলে দিচ্ছি।'

মুলায়েম উত্তর দেন না। তাঁকে দেখে মনে হয়, ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করছেন।

বিজয় থামেনি, 'মুনিয়া যার কথা বলে গেছে সে বিনোদ ঝা। কনট্রাক্টর মুনীশ্বর ঝা'র ছেলে। তাকে এখনও অ্যারেস্ট করা হয়নি।'

মুলায়েম গলা খাকরে এবং ঘাড়টাড় চুলকে অস্বস্তিটা কাটিয়ে নেন। তারপর বলেন, 'আপনি যখন বলছেন তখন ধরেই নিচ্ছি বিনোদের নাম টেপ রেকর্ডারে আছে। লেকেন ডাক্তার সাহেব, কেউ কারো নাম বললেই তাকে আটক করা যায় না।'

রুক্ষ গলায় বিজয় এবার জানতে চায়, 'কেন?'

মুলায়েম যা উত্তর দেন তা এইরকম। প্রথমত, বিনোদ বিরাট পয়সাওলা ঘরের ছেলে। পলিটিক্যাল লিডার, এম. পি, মিনিস্টার থেকে শুরু করে ডি. এম, এস. ডি. ও অর্থাৎ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সবাই বিনোদের বাবা মুনীশ্বর ঝা'কে খাতির করে চলে। এমন একজন প্রভাবশালী লোকের ছেলেকে হুট করে অ্যারেস্ট করা যায় না। কেননা, কেস কোর্টে নিয়ে যাবার পর যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ যদি দাখিল করতে না পারা যায়, বিনোদ তো বেকসুর বেরিয়ে আসবেই, আর এসেই মানহানির মামলা ঠুকে দেবে। তখন কে মুলায়েমকে রক্ষা করবে?

বিজয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে মুলায়েম বলেন, 'আপনি কী বলবেন, আমি জানি। অনেক সময় মরার আগে শত্রুতা করে অনেকে অনেকের নাম করে যায়। নাম বললেই যে তাকে অ্যারেস্ট করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। ডাক্তার সাহেব, পুরাপুরি নিশ্চিত না হয়ে কারো চামড়ায় আঙুল পর্যন্ত ঠেকানো যায় না। ইন্ডিয়ার সবার জন্যেই কানুন রয়েছে। সেটা একতরফা নয়। তবে একটা গ্যারান্টি আপনাকে আমি দিতে পারি—'

'কিসের গ্যারান্টি?'

'আমার এলাকায় খুন করে কেউ পার পাবে না। যত জবরদস্ত আদমিই হোক, হত্যারাকে আমি ধরবই।'

'সেটা কবে?'

'দেরি হবে না।'

'ঠিক আছে, আমরা পরশু এসে একবার খবর নিয়ে যাব।'

একটু হকচকিয়ে যান মুলায়েম। তারপর বলেন, 'আপনারা যখন খুশি পায়ের ধুলো দেবেন। এ তো আমার বহুত সৌভাগ। লেকেন ওই গন্ধা ব্যাপারে কেন তখলিফ করবেন? কী হল না-

হল, আমি নিজে গিয়ে আপনাদের খবর দিয়ে আসব। ওই রকম একটা ফুলষ্যায়সা লেড়কী খুন হয়ে গেল, অথচ কিছু করতে পারছি না—এ বহুত শরমকা বাত।'

এসব বাক্যের আতশবাজি যে শুধুই কথার কথা এবং অন্তঃসারশূন্য তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বিজয় জানায়, এখানে আসতে তাদের কোনোরকম তখলিফ বা কষ্টই নেই।

মুলায়েম বিরস মুখে বলেন, 'আপলোগকা মর্জি।'

'আচ্ছা, আজ তবে যাওয়া যাক।' বলতে বলতে বিজয় এবং সুমিত্রা উঠে পড়ে।

থানার গেট পর্যন্ত তাদের সঙ্গে আসেন মুলায়েম। বলেন, 'নমস্তে--'

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বিজয় বলে, 'আপনার ওপর আমার পুরো বিশ্বাস আছে। তবু একটা কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই।'

'বলুন—'

'কেউ যদি চায়, টেপ-রেকর্ডার থেকে ভয়েস মুছে দেবে, সেটা কিন্তু পাবা যায়।'

মুলায়েমের গোলাকার ছোটোছোটো চোখে আগুনের ফুলকি দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। অদ্ভুত হেসে বলেন, 'আমার ওপর আপনাদের বিশ্বাস আছে, বলছিলেন না?'

'হ্যাঁ।'

'বিশ্বাসটা যাতে নষ্ট না হয় সেটা আমি মনে রাখব।'

'ধন্যবাদ।'

থানা থেকে বেরিয়ে বিজয় বলে, 'তিনটে বেজে গেছে। এখন আর স্কুলে গিয়ে কী হবে? আমার সঙ্গে হাসপাতালে চল।'

সুমিত্রা বলে, 'না না, স্কুলে আমাকে যেতেই হবে। পবশু বিকেলে ছুটিব পর তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

'তা হলে আর কী করা যায়, তোমাকে একটা রিকশায় তুলে দিয়ে আমি একটা বিকশা ধরি।'

থানার সামনে রাস্তাটা খাড়া উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কোথাও একটা রিকশা চোখে পড়ছে না।

বিজয় বলে, 'মুশকিল হল। যাবে কী করে?'

সুমিত্রা বলে, 'হেঁটেই যেতে হবে।'

'চল, তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দিই।'

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সুমিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'ও. সি'র সঙ্গে কথা বলে কী মনে হল?'

বিজয় বলে, 'কোথায় যেন হেজিটেশন বয়েছে ভদ্রলোকের পেছন থেকে কেউ দড়ি টানছে কিনা বুঝতে পারছি না। হয়তো টানছে, এদিকে আমরাও প্রেসার দিচ্ছি। দেখা যাক ক'টা দিন।'

একটু চুপচাপ।

তারপর কী চিন্তা করে বিজয় বলে, 'কাল স্কুল ছুটির পর কী করছ?'

'কী আর করব, কোয়ার্টারেই থাকব।'

'আমি কাল তোমার ওখানে যাচ্ছি। ধর পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটায়।'

'পরশুই তো তোমার ওখানে যাব।'

'না, কালই তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। আর্জেন্ট কিছু কথা আছে।'

'কী কথা?'

'কাল শুনো।'

সুমিত্রা আর কোনো প্রশ্ন করে না।

থানা পেছনে রেখে ওরা যখন খানিকটা এগিয়েছে, হঠাৎ চোখে পড়ে, একটা ঝাঁকড়া-মাথা পিপর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে তিহরলাল। সুমিত্রাদের দেখে সে প্রায় দৌড়ে সামনে চলে আসে।

তিহরলালকে এখানে দেখবে, ভাবতে পারেনি সুমিত্রা। অবাক হয়ে বলে, 'তুমি!'

তিহরলাল বলে, 'আপনাদের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। থানার অফসর কী বলল?'

সুমিত্রা বলে, 'খুনিকে যত তাড়াতাড়ি পারে, ধরবে।'

'পাঁচ রোজেও ধরতে পারল না, আর কবে ধরবে? মতলব কী ওদের?'

'আর দু' একদিন দেখা যাক।'

তিহরলাল কর্কশ গলায় বলে, 'খুনিদের না ধরলে আমি কাউকেই ছাড়ব না।'

তিহরলালকে মাত্র কয়েক বারই দেখেছে সুমিত্রা। তাতে মনে হয়েছে, ছোকরার রাগটা অত্যন্ত বেশি। উত্তেজনার মাথায় যা খুশি করে বসতে পারে। সুমিত্রা বলে, 'মাথা গরম কোরো না তিহর।' আগেও তাকে একবার সতর্ক করে দিয়েছে সে।

তিহরলাল উত্তর দেয় না, স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে।

সুমিত্রা আবার বলে, 'এখন তুমি কোন দিকে যাবে?'

তিহরলাল জানায়, গাঁয়ে ফিরবে।

সুমিত্রা বলে, 'ভালোই হল, তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে স্কুল পর্যন্ত যাওয়া যাবে।' বিজয়কে বলে, 'একজন সঙ্গী পাওয়া গেছে। তোমাকে আর আসতে হবে না, হাসপাতালে ফিরে যাও।'

বিজয় বলে, 'ঠিক আছে। কাল বিকেলে দেখা হচ্ছে।'

'আচ্ছা।'

বিজয় ঘুরে উলটো দিকে হাঁটতে থাকে। সুমিত্রা এবং তিহরলাল সোজা এগিয়ে যায়।

খানিকক্ষণ চুপচাপ চলার পর তিহরলাল বলে, 'সাফ সাফ একটা কথা বলবেন?'

একটু চমকে ওঠে সুমিত্রা। চোখের কোণ দিয়ে তিহরলালকে লক্ষ করতে করতে বলে, 'কী কথা?'

'পাক্কা দো ঘণ্টা থানায় বসে অফসরের সঙ্গে তো বাতচিত করলেন। কী মনে হল আপনাদের, সচমুচ হারামজাদের ছৌয়াদের ওরা ধরবে? নাকি পাইসা খেয়ে আঁখ বন্ধ করে রাখবে?'

হারামজাদের ছৌয়ারা অর্থাৎ মুনিয়ার হত্যাকারীরা। এদের ধরার ব্যাপারে সুমিত্রার নিজেরই খানিকটা সংশয় রয়েছে। থানার অফিসার যেভাবে কথা বলেছে তাতে সঠিক কিছু বলা যাচ্ছে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখে নিশ্চিতভাবে কোনো মন্তব্য করা ঠিক নায়। সুমিত্রা বলে, 'তখনই তো তোমাকে বললাম, ও. সি কথা দিয়েছে—ধরবে।'

'আমার মনে হয়, ধরবে না।' বলে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে তিহরলাল।

বোঝা যায়, ছোকরা বেপরোয়া এবং গোঁয়ার হলেও যথেষ্ট বুদ্ধিমান। পয়সাওলা ক্ষমতাবান মানুষদের সম্পর্কে পুলিশের আচরণ কী ধরনের হয়, সে তা জানে। চলতে চলতে মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকায় সুমিত্রা। বলে, 'হঠাৎ তোমার এরকম মনে হল?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না তিহরলাল। একটু ভেবে বলে, 'আপনাকে একটা খবর দিই—'

'কী?'

'কাল দুফারে আমি ছত্তরপুরা গাঁওয়ে গিয়েছিলাম।'

সুমিত্রার মনে পড়ে যায়, ছত্তরপুরা গ্রামের দু-তিনটে লোক মুনিয়ার খুন হওয়ার রাতে একটা সাদা গাড়িকে পিপরিয়ার দিক থেকে ঘুরপথে নহরপুরা টাউনের দিকে চলে যেতে দেখেছিল। অওতারের কাছে এখবরটা সে আগেই পেয়েছে। কোনো কথা না বলে সুমিত্রা অপেক্ষা করতে থাকে।

তিহরলাল এবার বলে, 'ওহী গাঁওয়ের তিন আদমি—ধনিয়া, লচ্ছু আর পাওয়ন—একটা সফেদ গাড়ি দেখেছে। তার ভেতর থেকে আওরতের গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। আওরতটা চিৎকার করে কাঁদছিল। গাড়িটা বহুৎ জোরে ছুটছিল। লচ্ছুরা ওটাকে রুখবার জন্যে শোর মচাতে মচাতে পেছন পেছন দৌড়ে যায়, লেকেন মোটরিয়ার সঙ্গে দৌড়ে পারবে কেন? লগভগ এক 'মিল' দৌড়ুবার পর তারা থেমে যায়। সফেদ গাড়ি আওরতকে নিয়ে চলে যায়।'

অওতার দু' তিনটে লোকের কথাই জানিয়েছিল, কিন্তু তিহরলাল তাদের নাম পর্যন্ত বলছে।

দেখা যাচ্ছে, পুলিশ কবে কী করবে, সে জন্য বসে নেই তিহরলাল। মুনিয়ার হত্যাকারীদের খোঁজে সে বেরিয়ে পড়েছে। তাদের ফাঁসিতে না চড়ানো পর্যন্ত তিহরলালকে থামানো যাবে না।

তিহরলাল বলতে থাকে, 'ওই আওরতটা জরুর মুনিয়া।'

সুমিত্রা চুপ।

তিহরলাল থামেনি, 'আরেকটা জরুরি খবর আপনাকে দিচ্ছি।'

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'ওই গাড়িটা কার, লচ্ছু জানতে পেরেছে। ভুচ্চরটা তখন ওটার ভেতর বসে ছিল।'

তিহরলাল কার নাম করবে, সুমিত্রা তা আন্দাজ করতে পারে। তবু রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করে, 'লোকটা কে?'

'ওহী জানবর—বিনোদ, মুনীশ্বর ঝা'কা বেটোয়া। কুত্তা কাঁহিকা!' বলতে বলতে প্রচণ্ড ঘৃণায় এবং ক্রোধে তার মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে। মাটিতে জোরে জোরে থুতু ফেলে বলে, 'ওর মুহ্‌মে দশ বার থুক, থুক, থুক—'

সুমিত্রা বলে, 'আস্তে তিহর। অত চেঁচিয়ে বোলো না। কেউ শুনলে বিপদ হয়ে যাবে।'

'আমি কোনো কিছু পরোয়া করি না। পুলিশ যদি বিনোদকে ফাঁসিতে না চড়ায়, আমি ওর জান নেব।'

মুনিয়ার মৃত্যু তিহরলালকে একেবারে আমূল তোলপাড় করে দিচ্ছে। যে কাম্য যুবতীটির সঙ্গে একমাস বাদে তার বিয়ে ঠিক হয়ে ছিল তাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে যারা খুন করল তাদের কিছুতেই সে ছেড়ে দেবে না। প্রতিহিংসা সে নেবেই। ছেলেটা এক বগ্‌গা, গোঁয়ার। আদিম মানুষের মতো আঘাত পেলে সরাসরি প্রত্যাঘাত করতেই সে জানে। তার হিসেব খুবই সোজা। হত্যার বদলে হত্যা। কিন্তু এই পৃথিবীর কূটকৌশল আর চতুর কারসাজি সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। তার প্রতিপক্ষ যে কত ভয়াবহ সে সম্পর্কে তিহরলাল বোধহয় পুরোটা জানে না। বেশি হইচই করলে দুনিয়া থেকে সে নিঃশব্দে উধাও হয়ে যাবে, কেউ কোনোদিন তার খোঁজও পাবে না।

সুমিত্রা বলে, 'বড় বোনের মতো একটা কথা বলছি। সেটা তোমাকে রাখতে হবে।'

তিহরলাল ভুরু কুঁচকে বলে, 'কী?'

'তুমি যা বললে তাতে তোমার ক্ষতি তো হবেই, লচ্ছুকেও বিপদে পড়তে হবে।'

তিহরলাল থতিয়ে যায়। অনেকক্ষণ বাদে গলা নামিয়ে বলে, 'অওতার চাচাও এই কথাই বলছিল।'

'ঠিকই বলেছে। এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। সাদা গাড়িতে লচ্ছুরা যাকে দেখেছে সে কেমন লোক, তুমি নিশ্চয়ই জানো—'

'জানি। বহোত খতারনাক।'

'জানোই যখন, গলা দিয়ে ওদের ব্যাপারে কোনো আওয়াজ বার করবে না। যা করবার ডাক্তার সাহেব আর আমি করব। তোমাকে যা বলব, সেটুকুই শুধু করবে। তার বেশি কিছু না। মনে থাকবে?'

উত্তর না দিয়ে হাঁটতে থাকে তিহরলাল। কথাটা তার খুব একটা মনঃপূত হয়নি।

সুমিত্রা বলে, 'কী হল, চুপ করে রইলে যে?'

তিহরলাল বলে, 'ঠিক হ্যায়, আপনি যখন বলছেন—'

বোঝা যায়, যথেষ্ট আপত্তি সত্ত্বেও নেহাত সুমিত্রার অনুরোধেই সে মুখ বুজে থাকতে রাজি হয়েছে।

এরপর বিশেষ কোনো কথা হয় না। স্কুলের কাছাকাছি এসে তিহরলাল বলে, 'আমি গাঁওয়ে চলে যাচ্ছি। দো-এক রোজ পরে আবার আসব।'

'আচ্ছা—' সুমিত্রা মাথা নাড়ে।

তিহরলাল স্কুল ডাইনে রেখে সোজা ফাঁকা মাঠে গিয়ে নামে, আর সুমিত্রা সোজা স্কুলে চলে যায়।

আট

পরের দিন স্কুল ছুটির পর কোয়ার্টারে ফিরে সুমিত্রা লখিয়াকে বলে, 'এখন আমার জন্যে চা করতে হবে না। একটু পর ডাক্তার সাহেব আসবেন। তখন করো।'

বিজয়কে নহরপুরা টাউনের অন্য সকলের মতো লখিয়ারা খুব ভালোই চেনে এবং যথেষ্ট মান্যও করে। এই কোয়ার্টারে তাকে দু'চারবার আসতেও দেখেছে। লখিয়া খুশি হয়ে বলে, 'ডাক্তারসাব বহুত রোজ পর আসছেন। লগভগ তিন মাহিনা বাদ।'

সুমিত্রা হাসে, 'আরে বাবা, তুমি মনে করে রেখেছ!'

লখিয়া বলে, 'হাঁ, জরুর। সারাদিন ছৌরাছৌরীগুলোর (ছেলেমেয়েগুলোর) সঙ্গে বকর বকর করে এল। গলা শুকিয়ে গেছে। তোমাকে এখন চা বানিয়ে দিই। ডাক্তারসাব এলে আবার করে দেব।' চা খুব একটা পছন্দ করে না সুমিত্রা। সকাল বিকেলে দু'বেলা দু'কাপ। সে বলে, 'এখন আর কষ্ট করতে হবে না তোমাকে। ডাক্তার সাহেব এলে একসঙ্গে খাব।'

'ঠিক হ্যায়। লেকেন—'

'কী?'

'মেহমানকে স্রিফ চা-ই খাওয়াবে?'

সুমিত্রার মুখে লালচে আভা ফুটে ওঠে। মোটামুটি তার সঙ্গে বিজয়ের সম্পর্কটা আন্দাজ করে নিয়েছে লখিয়া। ভবিষ্যতে বিজয়ের সঙ্গে তার যে বিয়ে হতে পারে, এমনটাই তার ধারণা। তবে মুখ ফুটে এবিষয়ে কখনও কিছু বলেনি।

সকালে এক ফাঁকে বেরিয়ে গিয়ে লুকিয়ে নহরপুরার সবচেয়ে বড় মিঠাই-এর দোকান থেকে টাটকা কলাকন্দ, গুলাবজামুন আর প্যাঁড়া কিনে এনে রেখেছে সুমিত্রা। সে কথা তো আর লখিয়াকে বলা যায় না। নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সে বলে, 'নতুন মেহমান তো আর নয়। চা দিলেই চলবে।'

লখিয়া জোর দিয়ে জানায়, নতুন না হলেও বিজয় মান্য অতিথি তো বটে। তাকে খাতিরদারি না করলে চলে!

সুমিত্রা উত্তর দেয় না।

কিছুক্ষণ জিরিয়ে গা'টা ধুয়ে, শাড়ি বদলে নেয় সুমিত্রা। লম্বা চুলগুলো এক বেণী করে পিঠের ওপর আলতো করে ফেলে রাখে। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দুই ভুরুর মাঝখানে মেরুন রঙের বড় একটা টিপ এঁকে বিছানায় এসে বসে।

কী জন্য বিজয় আজ আসছে, মোটামুটি অনুমান করতে পরে সুমিত্রা। বুকের ভেতর থেকে মৃদু সুগন্ধের মতো কিছু একটা উঠে আসছে তার। চমৎকার এক সুখানুভূতিতে মন ভরে যেতে থাকে। অনেকদিন তারা অপেক্ষা করে আছে। আর দেরি করতে ইচ্ছা করে না। এখন তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। সন্ধের ঢের আগেই বিজয় এসে পড়ে। লখিয়া সদর দরজা খুলে তাকে সঙ্গে করে সুমিত্রার ঘরে পৌঁছে দেয়। সুমিত্রা কিছু বলার আগেই সে বলে, 'আমি চা বসিয়ে দিচ্ছি।' মুখ টিপে মিষ্টি একটু হেসে লখিয়া চলে যায়।

সুমিত্রার দিকে মুগ্ধ চোখে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে বিজয়। শেষ বিকেলের কোমল আলোয় তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু মুখ ফুটে সেকথা বলার মতো প্রগলভতা তার নেই। সে খুবই ধীর, স্থির এবং সংযত। তার চরিত্রে বাড়াবাড়ি বলে কোনো ব্যাপার নেই।

সুমিত্রা বিজয়ের মনোভাবটা বুঝতে পারছিল। মৃদু গলায় সে বলে, 'বোসো।'

বিজয় সুমিত্রার বিছানার এক কোণে বসতে বসতে বলে, 'তোমার সঙ্গে ভীষণ, ভীষণ জরুরি একটা কথা আছে।'

'সে তো কালকেই বলেছ। আগে চা খাও, তারপর তোমার ভীষণ, ভীষণ জরুরি কথাটা শোনা

যাবে।' বলতে বলতে সুমিত্রা ঘরের কোণে চলে যায়। সেখানে তারের জালে-ঘেরা ছোটো একটা আলমারিতে মিষ্টির বাক্স, ডালমুট, চিড়েভাজা ছাড়াও টুকিটাকি আরও কিছু খাবার দাবার থাকে। দু'টো প্লেটে মিষ্টি সাজিয়ে, নিজের লেখার টেবলটা বিজয়ের সামনে টেনে এনে সেটার ওপর রাখে সুমিত্রা। একটা প্লেট বিজয়ের, একটা তার।

বলে, 'খাও—'

প্লেট তুলে নিয়ে বিজয় বলে, 'তুমি একেবারে অন্তর্যামী। মারাত্মক খিদে পেয়েছিল।'

ঠিক এই সময় চা নিয়ে ঘরে ঢোকে লখিয়া। বিজয়ের হাতে খাবারের প্লেট দেখে নিঃশব্দে হাসে সে। তার চোখে কৌতুকের ছটা চলকাতে থাকে। চায়ের কাপ দু'টো টেবলের ওপর রেখে চাপা গলায় বলে, 'মেহমানদারির বাওস্থাটা তা হলে লুকিয়েই করে রেখেছিলে!'

ধরা পড়ে যাওয়ার কারণে লজ্জায় মুখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে সুমিত্রার। কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল সে, তার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায় লখিয়া।

খাওয়ার পর সিগারেট ধরিয়ে বিজয় বলে, 'এবার শুরু করি?'

সুমিত্রা উত্তর দেয় না।

বিজয় বলে, 'আমাদের এবার একটা ডিশিসন নেওয়া বোধহয় উচিত। আমার মা-বাবাকে চিঠি লিখে জানিয়েছি। তাঁরা তোমাকে পেলে সৌভাগ্য বলে মনে করবেন। কিন্তু সমস্যাটা তোমার দিক থেকে। তোমার মা-বাবা কি ব্যাপারটা জানেন?'

সুমিত্রা বলে, 'এখনও জানাইনি।'

বিজয় চুপ করে থাকে।

সুমিত্রা একটু দূরে খাটের ওপরেই বসে ছিল। আস্তে আস্তে জানালার বাইরে তাকায় সে। দিনের শেষ আলো দ্রুত নিভে আসছে, শস্যহীন ফাঁকা মাঠ ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেই প্রথম দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায় সুমিত্রার।

নহরপুরায় আসার মাসখানেক বাদে টাইফয়েড হয়েছিল তার। রামবনবাস এবং লখিয়া এতই ঘাবড়ে গিয়েছিল যে হাসপাতাল থেকে বিজয়কে ডেকে আনে।

সুমিত্রার তখন যা অবস্থা তাতে চব্বিশ ঘণ্টা নার্সিং দরকার। তা ছাড়া চার ঘণ্টা পর পর ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে, গা স্পঞ্জ করতে হবে, টেম্পারেচার নোট করে রাখতে হবে। রামবনবাসদের পক্ষে সেসব সম্ভব নয়। তাই অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে স্ট্রেচারে করে সুমিত্রাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে প্রায় তিন সপ্তাহ ছিল সে। এই সময়টা রোজই দশ বারো ঘণ্টা তার বিছানার পাশে বসে থাকত বিজয়। প্রথম দিকে যখন সুমিত্রা প্রচন্ড জ্বরে বেহুঁশ, চার পাঁচটা রাত একটা নার্সকে সঙ্গে নিয়ে তার বেডের কছে জেগে কাটাতে হয়েছে বিজয়কে। শুধু তাই না, স্কুল থেকে সুমিত্রাদের মণিহরির ঠিকানা জোগাড় করে তার মা-বাবাকে চিঠি লিখে অসুখের খবর জানিয়ে নহরপুরায় আসতে বলেছিল। সুমিত্রা পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা তার কোয়ার্টারেই ছিলেন। ফিরে যাবার সময় বিজয়েব হাত ধরে বলেছিলেন, 'তোমার জন্যেই আমার মেয়েকে ফিরে পেলাম।'

সুমিত্রা হাসপাতাল থেকে 'রিলিজ' হলে দু'চারদিন পর পর তাঁকে দেখতে আসত বিজয়। অনাত্মীয়, হৃদয়বান এই যুবকটির সেবা, যত্ন এবং মমতার তুলনা নেই। সে না থাকলে কী যে হ'ত, সুমিত্রা ভাবতে পারে না।

প্রথম দিকে বিজয় সম্পর্ক তার মনে যা ছিল তা গভীর কৃতজ্ঞতা। পরে কখন যে এই যুবকটি তার সমস্ত অস্তিত্ব একেবারে তোলপাড় করে দিয়েছিল, টের পাওয়া যায়নি। একদিন সুমিত্রা হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলে, বিজয়কে ছাড়া জীবনের মানে হয় না। হয়তো বিজয়ও তা-ই ভেবেছিল। কিন্তু এতদিন মুখ ফুটে কেউ কিছু বলেনি। তবে বলে ফেললে কারো পক্ষেই অবাক হবার কিছু ছিল না।

বিজয় আস্তে করে ডাকে, 'সুমিত্রা—'

জানালার বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে বিজয়ের দিকে তাকায় সুমিত্রা।

বিজয় জিজ্ঞেস করে, 'একটা কথার পরিষ্কার উত্তর দেবে?'

সুমিত্রা বলে, 'কী?'

'আমার সম্পর্কে তোমার কি কোনোরকম দ্বিধা আছে?'

সুমিত্রা চমকে ওঠে, 'কীসের দ্বিধা?'

বিজয় বলে, 'আমরা প্রথমত শিডিউলড কাস্ট, তার ওপর কৃশ্চান। তোমার কাছে আমি কিন্তু কিছুই লুকোইনি। তোমার যদি দ্বিধা বা আপত্তি থাকে, আমার জানা দরকার। তোমাকে না পেলে আমার ভীষণ কষ্ট হবে ঠিকই, তবে মেনে নেব। জোর করে সংস্কার ভাঙা, এ আমি চাই না।'

ব্যাকুলভাবে সুমিত্রা বলে, 'আমাকে তুমি এতকাল দেখছ, তবু তোমার এরকম একটা ধারণা হল কী করে?'

বিজয় চুপ করে থাকে। সুমিত্রার ব্যাকুলতাটুকু খুব ভালো লাগে তার।

সুমিত্রা বলে, 'জাতপাত আমি মানি না। এ সম্বন্ধে আমার কোনো কুসংস্কার নেই।'

'তোমার মা-বাবা তো মানতে পারেন। তাঁদের মনে দুঃখ দিয়ে আমি কিছু করব না।'

'বাবার দিক থেকে আপত্তি হবে বলে মনে হয় না। তবে মা'কে বোঝাতে হবে।'

'ওঁদের কবে চিঠি লিখছ?'

'কয়েকদিন আগেই লিখব, ভেবেছিলাম। হঠাৎ মুনিয়ার ব্যাপারটা ঘটে গেল। এমন দিশেহারা হয়ে পড়লাম যে চিঠির কথা মনে ছিল না।'

মুনিয়ার প্রসঙ্গ উঠতেই ঘরের আবহাওয়া ভারী হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধতা নেমে আসে। তারপর বিজয় যখন কিছু বলতে যাবে, ঘরের ভেতর দৌড়ে আসে রামবনবাস। শশব্যস্তে বলে, 'মুনীশ্বরজি আয়া, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

প্রথমটা বুঝতে পারেনি সুমিত্রা। সে জিজ্ঞেস করে, 'কোন মুনীশ্বরজি?'

'ওহী, বড়ে ঠিকাদার।'

নহরপুরা টাউনের সবচেয়ে পয়সাওলা, সবচেয়ে বিখ্যাত লোকটি যে এসময় এখানে আসতে পারে, সুমিত্রার কাছে তা ছিল অভাবনীয়। সে হকচকিয়ে যায়। বলে, 'কোথায় মুনীশ্বরজি?'

রামবনবাস জানায়, সদর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে মুনীশ্বর।

বিজয়ও অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলে, 'লোকটা তোমার কাছে কী চায়?'

সুমিত্রা বলে, 'কী জানি, বুঝতে পারছি না।'

রামবনবাস বলে, 'মুনীশ্বরজিকে ভেতরে নিয়ে আসব?'

একটু চিন্তা করে সুমিত্রা বলে, 'তোমাকে যেতে হবে না, আমি যাচ্ছি।' সদরের কাছে যেতেই মধ্যবয়সী শৌখিন মুনীশ্বর ঝা হাতজোড় করে বিনীতভাবে বলে, 'নমস্তে। ক্ষমা করবেন, আগে থেকে খবর না দিয়ে আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম। না এসে উপায় ছিল না। আধ ঘণ্টার বেশি সময় আপনার নেব না।'

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে সুমিত্রা বলে, 'আসুন।' ভেতরে ভেতরে সে যথেষ্ট উদ্বেগ বোধ করছিল। নেহাত অকারণে মুনীশ্বর ঝা আজ এখানে আসেনি। লোকটার উদ্দেশ্য নাজানা পর্যন্ত তার উৎকণ্ঠা কাটবে না।

সুমিত্রার সঙ্গে তার ঘরের দিকে যেতে যেতে মুনীশ্বর বলে, 'খুব অবাক হয়ে গেছেন, না?'

সুমিত্রাকে স্বীকার করতে হয়, অবাক সে অবশ্যই হয়েছে। তার মতো সামান্য একজন স্কুল-মাস্টারনীর কোয়ার্টারে মুনীশ্বর ঝা'র মতো মান্যগণ্য বিত্তবান লোক পায়ের ধুলো দেবেন, এ ভাবা যায় না।

মুনীশ্বর বলে, 'এভাবে আচমকা চলে এলে অবাক হবার কথাই।'

ঘরে এসে বিজয়কে দেখে খুশিই হয় মুনীশ্বর। বলে, 'ডাক্তার সাহেব, আপনাকে এখানে পেয়ে

ভালোই হল। কিছুক্ষণ আগে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। শুনলাম আপনি সুমিত্রাজির কোয়ার্টারে এসেছেন। দু'জনকে এক জায়গায় পেয়ে অনেকটা সময় বেঁচে যাবে। নইলে আবার আমাকে হাসপাতালে দৌড়ুতে হ'ত।'

বিজয় কয়েক পলক মুনীশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কাছে মুনীশ্বরের যাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে, সে বুঝতে পারে না। একটু সতর্কভাবেই জিজ্ঞেস করে, 'আমার কাছে কিছু দরকার আছে?'

'হাঁ, জরুর।'

বিজয় আর কোনো প্রশ্ন করে না। মুনীশ্বরের দরকারি কথাটা শোনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

ঘরের একমাত্র চেয়ারটা দেখিয়ে সুমিত্রা মুনীশ্বরকে বলে, 'বসুন। একটু চা দিতে বলি?'

'বলুন। তবে শুধুই চা, আর কিচ্ছু না। অসময়ে খাওয়ার অভ্যাস আমার নেই।' চেয়ারে বসতে বসতে বলে মুনীশ্বর।

লখিয়াকে ডেকে আরেক কাপ চা দিতে বলে খাটের কোণে বসে পড়ে সুমিত্রা।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা এসে যায়। একটা লম্বা চুমুক দিয়ে মুনীশ্বর ভারী গলায় বলে, 'ক'দিন জরুরি কাজে পাটনায় গিয়ে থাকতে হয়েছিল। ফিরে এসে শুনলাম, আমাদের এই এলাকায় অচ্ছুৎদের একটা মেয়েকে খুন করা হয়েছে। অচ্ছুৎ হলেও একটা মানুষ তো। বহুৎ দুখকা বাত।' তার বিষণ্ণ মুখচোখ দেখে মনে হয়, মুনিয়ার মৃত্যুতে সে আন্তরিকভাবেই দুঃখিত।

বছর তিনেক আগে সুমিত্রা যখন সমাজকল্যাণ দপ্তরের এই স্কুলে চাকরি নিয়ে আসে, মুনীশ্বর সবান্ধবে একবার তার কোয়ার্টারে এসেছিল। তারপর এই দ্বিতীয় বার এল। আজ তার আসার উদ্দেশ্য অনেকটাই বোঝা যাচ্ছে। সুমিত্রার স্নায়ুগুলো হঠাৎ টান টান হয়ে যায়। সে লক্ষ করে, খাটের আরেক মাথায় শিরদাঁড়া খাড়া করে একদৃষ্টে মুনীশ্বরের দিকে তাকিয়ে আছে বিজয়। অর্থাৎ সে-ও কিছু একটা আভাস পেয়েছে।

মুনীশ্বর আবার বলে, 'শুনলাম আপনারা মেয়েটাকে বাঁচাতে কোসিস করেছেন, লেকেন বাঁচা-মরা সবই ভাগোয়ান শিউশঙ্করজির হাতে। মানুষ স্রিফ কোসিসই করতে পারে।' এরপর একনাগাড়ে সে যা বলে যায় তা এইরকম। সুমিত্রারা যা করেছে সেটা তাদের মহত্ত্ব এবং মনুষ্যত্বেরই প্রকাশ। তাদের মতো মানুষ দ্রুত কমে যাচ্ছে। তাদের সংখ্যা যদি বাড়ত, এই পৃথিবী আরও সুন্দর, আরও বাসযোগ্য হয়ে উঠত।

এসব যে নেহাতই কথার কথা, বুঝতে অসুবিধা হয় না সুমিত্রা বা বিজয়ের। একটানা ভণিতার পর ঝুলি থেকে যে বেড়াল বেরিয়ে পড়বে, সেটা তারা আঁচ করতে পারে। তবে তা কীভাবে এবং কতক্ষণ পর, সেটাই এখন দেখার।

চা খাওয়া শেষ হয়েছিল। ফাঁকা কাপটা টেবিলের ওপর রেখে রুমালে মুখ মুছে মুনীশ্বর বলে, 'আরেকটা কথা শুনলাম সুমিত্রাজি—'

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'আপনারা ওই লেড়কী—কী যেন নাম?'

'মুনিয়া—'

'হাঁ, মুনিয়ার খুনিকে ধরবার ব্যাপারে থানায় গিয়েছিলেন।'

সুমিত্রা দ্রুত এক পলক বিজয়কে দেখে নেয়। তারপর মুনীশ্বরের দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বলে, 'হ্যাঁ।'

বিজয় বলে, 'খুনির শাস্তি হোক, এটা আমরা চাই।'

গলায় অস্বাভাবিক জোর দিয়ে মুনীশ্বর বলে, 'আমিও তা-ই চাই। ও. সি মুলায়েম চৌবেকে আমি সে কথা বলেছি। এই এরিয়াতে এরকম ক্রাইম বরদাস্ত করা হবে না। খুনিদের সমঝিয়ে দিতে হবে দেশে আইনকানুন এখনও আছে।'

সুমিত্রা এবং বিজয় হকচকিয়ে যায়। মুনীশ্বর ঝা ঠিক কী ধরনের চাল দিল, ধরা যাচ্ছে না। তারা চুপ করে থাকে।

মুনীশ্বর আবার বলে, 'এখানে এবকম ঘটনা ঘটতে পারে, আমি ভাবতেই পারি না। এতে আমাদের এই টাউনের বদনাম, আমাদের বদনাম। ডাক্তার সাহেব, বহেনজি, আপনাদের একটা রিকোয়েস্ট করব?'

দু'জনে একসঙ্গে বলে ওঠে, 'কী রিকোয়েস্ট?'

'আমি তো মুলায়েমের ওপর চাপ দিচ্ছিই, আপনারাও দিন। এই প্রেসারটা বারবার দিতে হবে। নইলে পুলিশের ঘুম ভাঙবে না। 'দু'দিক থেকে প্রেসার পড়লে জরুর সে ক্রিমিনালদের অ্যারেস্ট করবে।'

হঠাৎ বিজয় জিজ্ঞেস করে, 'আপনাকে কি চৌবেজি সেই কথাটা বলেছেন?'

'কোনটা?' মুনীশ্বর বিজয়ের দিকে মুখ ফেরায়।

'মরার আগে মুনিয়া একটা ক্রিমিনালকে চিনতে পেরেছিল। সে তার নাম জানিয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ। মুলায়েম আমাকে তা বলেছে।'

'ধরুন, সেই ক্রিমিনাল যদি আপনার বা আমার খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয় তখন কী করা হবে?'

এজাতীয় প্রশ্নের জন্য খুব সম্ভব প্রস্তুত হয়েই এসেছিল মুনীশ্বর। তক্ষুনি সে উত্তর দেয়, 'সে যে-ই হোক, ভাই বন্ধু ছেলে চাচা—তাকে ছাড়া হবে না। ক্রিমিনাল ক্রিমিনালই। আমি চাইব, তার সাজা হোক। আচ্ছা, আজ ওঠা যাক। পরে আবার দেখা হবে।'

সুমিত্রা বা বিজয়কে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বড় বড় পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মুনীশ্বর।

মুনীশ্বর ঝা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ বিমূঢ়ের মতো বসে থাকে বিজয় এবং সুমিত্রা। তার এখানে আসাটা যেমন অভাবনীয় তেমনি যা বলে গেল সেটা তার চেয়েও বিস্ময়কর।

একসময় বিজয় বলে, 'লোকটাকে ভালোই মনে হচ্ছে। থানা থেকে নিশ্চয়ই সে খবর পেয়েছে, মৃত্যুর সময় মুনিয়া বিনোদের নাম করে গেছে। তবু ও. সি'র ওপর চাপ দিতে বলে গেল। মনের জোর আছে লোকটার। ক্রিমিনাল হলেও বিনোদ তার ছেলে তো। মনে হচ্ছে, মুনীশ্বর ছেলেকে প্রোটেকশন দেবে না।'

সুমিত্রা কিন্তু বিজয়ের মতো এত সহজে মুনীশ্বরকে বিশ্বাস করেনি। তার মধ্যে খানিকটা সংশয় কোথাও থেকে গেছে।

সে বলে, 'আমার তা মনে হয় না।'

'কেন?

'ঠিক বলতে পারব না। তবে—'

'তবে কী?'

একটু চিন্তা করে সুমিত্রা বলে, 'লোকটা যে ভালোমানুষ সেজে এত সব বলে গেল, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো চাল আছে।'

বিজয় উত্তর দেয় না। সুমিত্রা তার মনে সন্দেহ উসকে দিয়েছে। মুনীশ্বরের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে সে।

সুমিত্রা বলে, 'মুনীশ্বর যা বলে গেল, সেটা যদি সত্যি সত্যি তার মনের কথা হয়ে থাকে, তা হলে বলব, তার মতো মহাপুরুষ পৃথিবীতে খুব বেশি জন্মায়নি।' একটু থেমে আবার বলে, 'তবে এখানকার মানুষজনের মুনীশ্বর সম্পর্কে ধারণা অন্যরকম। আমার ভয়টা সেখানে।'

বিজয় বলে, 'আমরাও এখানে আছি, মুনীশ্বর ঝা'ও আছে। দেখাই যাক, শেষ পর্যন্ত ছেলের ব্যাপারে সে কী করে। গোলমাল কিছু করলে আমরা তাকে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেব না।'

সুমিত্রা বলে, 'ঠিক আছে, দেখাই যাক।'

আকাশের গায়ে শেষবেলায় যে আলতো আভাটুকু লেগে ছিল, আচমকা কেউ যেন এক ফুঁয়ে সেটা নিভিয়ে দিল। সমস্ত চরাচর জুড়ে আবছা অন্ধকার নেমে আসতে লাগল।

বিজয় একসময় বলে, 'এবার ওঠা যাক। অনেকক্ষণ এসেছি—' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায়।

'এখনই যাবে? আরেকটু বোসো না—' সুমিত্রা বলে।

'প্লিজ, আজ আর বসতে বোলো না। কাল একজন পেশেন্টের অপারেশন আছে। কেসটা বেশ জটিল। তাই নিয়ে অন্য ডাক্তারদের সঙ্গে বসতে হবে।'

বিজয়কে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবার ইচ্ছা ছিল না সুমিত্রার। কিন্তু সে চলে যাবাব যে কারণ বলল তাতে আর তাকে ধরে রাখা উচিত হবে না।

সুমিত্রা বলে, 'তা হলে আটকাব না।'

সুমিত্রাও উঠে পড়ে। ঘর থেকে বেরিয়ে সদর দরজা পর্যন্ত বিজয়কে এগিয়ে দিতে দিতে বলে, 'আবার কবে দেখা হচ্ছে?'

বিজয় বলে, 'কালই। থানায় গিয়ে চাপ সৃষ্টি করতে হবে না?' বলে হাসে।

'কাল কখন যাবে?'

'বিকেলে। তুমি স্কুল ছুটির পর আমার কোয়ার্টারে না গিয়ে থানায় চলে যেও। আমি স্ট্রেট হাসপাতাল থেকে যাব।'

'আচ্ছা।'

বাইরের দরজার কাছে এসে সুমিত্রা দাঁড়িয়ে পড়ে। সামনের রাস্তায় গিয়ে বিজয় বলে, 'বাড়িতে চিঠি লেখার কথাটা ভুলে যেও না।'

মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে সুমিত্রা—ভুলবে না।

বিজয় আরেক বার মনে করিয়ে দেয়, 'আমরা কয়েক পুরুষ আগে শিডিউল্ড কাস্ট থেকে কৃশ্চান হয়েছি, সেটা কিন্তু মা-বাবাকে অবশ্যই জানিয়ে দেবে।'

সুমিত্রা আস্তে করে বলে, 'জানাব।'

নয়

পরের দিন বিকেলে সুমিত্রা থানায় এসে দেখ ও. সি মুলায়েম চৌবের কামরায় বিজয় এবং মুলায়েম মুখোমুখি বসে আছেন।

পরশু ঘুম থেকে মুলায়েমকে তুলে আনা হয়েছিল। পরনে ছিল লুঙ্গি। আজ তাঁর গায়ে পুরোদস্তুর পুলিশের ইউনিফর্ম।

সুমিত্রাকে দেখে আপ্যায়নের সুরে মুলায়েম বলেন, 'আইয়ে বহেনজি, আইয়ে। আপনার জন্যে ডাক্তার সাহেব ওয়েট করছেন।'

বিজয়ের পাশে বসতে বসতে সুমিত্রা তাকে জিজ্ঞেস করে, 'কতক্ষণ এসেছ?'

'মিনিট কুড়ি।' বিজয় জানায়।

'আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল।'

'ঠিক আছে।'

মুলায়েম চৌবে বলেন, 'আপনি আসবেন বলে ডাক্তার সাহেবকে এখনও চা দিইনি। এবার আনতে বলি?'

বিব্রত মুখে সুমিত্রা বলে, 'না না, রোজই চা খেতে হবে নাকি? প্লিজ আনাবেন না।'

'তাই কখনও হয়? আপনারা আমার রেসপেক্টেড গেস্ট। থোড়েসে মেহমানদারি করতে দিন।'

আপত্তি করলেও মুলায়েম চৌবে শুনবেন না। অনর্থক কথা বলা, মানে সময় নষ্ট। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হতে হয় সুমিত্রাকে। সে বলে, 'শুধুই চা কিন্তু—'

'ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন—' বলে সেদিনের সেই কনস্টেবল অর্থাৎ গিরিধরকে ডেকে তার কানে গুজগুজ করে কী যেন হুকুম দেন মুলায়েম।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রচুর মিষ্টি-টিষ্টি আর চা এসে হাজির হয়।

বিজয় বলে, 'আপনাকে নিয়ে আর পারা যায় না চৌবেজি। সুমিত্রা কিন্তু চায়ের কথাই বলেছিল।'

'কৃপা করে আপনারা একটু মুহ্ মিঠা না করলে আমার কি ভালো লাগে ডাক্তার সাহেব? আর না বলবেন না—'

অগত্যা আজও দু-একটা মিষ্টি তুলে নিতে হয় সুমিত্রা এবং বিজয়কে।

দ্রুত খাওয়া চুকিয়ে বিজয় বলে, 'এবার তা হলে কাজের কথা শুরু করা যাক।'

মুলায়েম শশব্যস্তে বলেন, 'হাঁ হাঁ, জরুর।'

বিজয় বলে, 'মুনিয়ার মার্ডারের ব্যাপারে কতদূর কী হল?'

এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে মুলায়েম চৌবে যা বলেন তা এইরকম। সুমিত্রা এবং বিজয় তাদের প্রচুর ব্যস্ততার মধ্যেও যে থানায় এসে মুনিয়ার হত্যার ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছে, এতে স্বাধীন দেশের সৎ নাগরিক হিসেবে তাদের সামাজিক দায়িত্ববোধেরই পরিচয় রয়েছে। এই কারণে তাদের ওপর শ্রদ্ধা বহুগুণ বেড়ে গেছে মুলায়েমের।

সুমিত্রা এবং বিজয় দু'জনেই বেশ অবাক হয়ে যায়। পরশুই মুলায়েম বলেছিল, খুনখারাপি ধর্ষণের মতো নোংরা ব্যাপারে তাদের মতো ভদ্র শ্রদ্ধেয় মানুষদের জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। অথচ আজ সে একেবারে উলটো কথা বলছে। একদিনের মধ্যে হঠাৎ কী এমন ঘটেছে যাতে মুলায়েম চৌবে পুরোপুরি বদলে গেলেন!

মুলায়েম একটানা বলে যায়, 'জানেন, মুনীশ্বরজিও আপনাদের মতোই ক্রিমিনালদের ধরার জন্যে বহুৎ প্রেসার দিচ্ছেন। আরে, আসল কথাটাই তো বলতে ভুলে গেছি।'

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'শুনলাম মুনীশ্বরজি আপনাদের সঙ্গে দেখা করেও আমার ওপর প্রেসার দিতে বলেছেন।'

সুমিত্রা স্পষ্ট টের পায়, মুনীশ্বর ঝা'র সঙ্গে মুলায়েম চৌবের গভীর যোগাযোগ রয়েছে। রাতারাতি মুনিয়ার খুনের ব্যাপারে তাঁর কথাবার্তার ধরন যে পুরো বদলে গেল তার কারণ অবশ্যই মুনীশ্বর। কিন্তু একটা জট কিছুতেই ছাড়ানো যাচ্ছে না। মুনীশ্বর কি টের পায়নি, মুনিয়ার আসল হত্যাকারী তারই ছেলে? সব জেনেশুনেই কি সে খুনিকে ধরার জন্য মুলায়েমের ওপর নিজে তো চাপ দিচ্ছেই, সুমিত্রা আর বিজয়কেও চাপ দিতে বলছে? এর পেছনে গভীর কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে কিনা, কে জানে। এই ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সুমিত্রা বা বিজয়।

সুমিত্রা খুব সতর্ক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে, 'মুনীশ্বরজি যে আমাদের সঙ্গে দেখা করেছেন, আপনাকে কে বলল?'

মুলায়েম বলেন, 'কে আর বলবে? উনি নিজেই আমাকে জানিয়েছেন। সে যাক, বহেনজি আপনাদের একটা ভালো খবর দিই—'

'কী?' সুমিত্রা উৎসুক চোখে তাকায়।

'মুনিয়ার খুনিকে আমরা দু-চার দিনের ভেতর ধরে ফেলছি।'

সুমিত্রা এবং বিজয়, দু'জনকেই এবার উত্তেজিত দেখায়। একসঙ্গে তারা বলে ওঠে, 'ঠিক বলছেন?'

মুলায়েম বেশ জোর দিয়ে বলেন, 'হাঁ, জরুর। তবে একটা কথা—'

সুমিত্রা বলে, 'কী?'

ঝপ করে গলাটা অনেকখানি নামিয়ে মুলয়েম বলে, 'কথাটা কিন্তু বহুৎ সিক্রেট। কাউকে বলবেন না। বেশি জানাজানি হলে খুনিরা হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। আরেকটা কথা—'

'বলুন—'

'কাল এস. পি সাহেবের কাছ থেকে টেপটা আনিয়ে, বাজিয়ে শুনে নিলাম। আপনারা যা বলেছিলেন সেটাই ঠিক। মুনিয়া মরার আগে বিনোদের নামই করে গেছে।'

'তা হলে?'

'তা হলে আর কী। কানুন তার নিজের কাজ করে যাবে।'

সুমিত্রা কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিতে দিতে মুলায়েম বলেন, 'যতক্ষণ না খুনি অ্যারেস্ট হচ্ছে, এই নিয়ে আর অলোচনা না করাই ভালো। অ্যারেস্ট হওয়া মাত্র আপনারা খবর পেয়ে যাবেন। বহেনজি, আমাকে এবার যে বেরুতে হবে। এক ব্যওসাদারের গদিতে ডাকাতি হয়েছে। সেখানে যাব।'

মুলায়েম চৌবের ইঙ্গিতটা পরিষ্কার। সুমিত্রা এবং বিজয় উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আজ চলি। নমস্তে—'

'নমস্তে।'

বাইরে এসে সুমিত্রা একটা রিকশা ধরে তার স্কুলের দিকে চলে যায়। আরেকটা রিকশা নিয়ে বিজয় যায় তার হাসপাতলে।

কোয়ার্টারে ফিরে রীতিমতো অবাকই হয় সুমিত্রা। তার ঘরের সামনের বাঁধানো বড় বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে আছেন মহেশ্বর সহায়। একটু দূরে দাঁড়িয়ে রামবনবাস তাঁর সঙ্গে কথা বলছে।

যে চেয়ারটায় মহেশ্বর বসে আছেন সেটা সুমিত্রার ঘরে থাকে। বোঝাই যাচ্ছে, রামবনবাস সেটা বার করে এনে ওঁকে বসিয়েছে।

সুমিত্রাকে দেখে উঠে দাঁড়ান মহেশ্বর। হাতজোড় করে বলেন, 'নমস্তে সুমিত্রাজি। একটা বিশেষ দরকারে আপনার কাছে আসতে হল।'

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে সুমিত্রা সসম্ভ্রমে বলে, 'বসুন, বসুন—'

মহেশ্বর সহায় নহরপুরা টাউনের একজন মান্যগণ্য বিখ্যাত মানুষ। শুধু এই শহরেই তাঁর খ্যাতি সীমাবদ্ধ নয়, নহরপুরা ছাড়িয়ে তা বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছে।

মহেশ্বর এখানকার একমাত্র সাপ্তাহিক খবরের কাগজটি বার করেন। নাম 'নহরপুরা সমাচার'।' দুর্দান্ত সাহস তাঁর। এই পিছিয়ে-থাকা এলাকাটির উন্নয়নের জন্য তিনি যেন অঘোষিত এক যুদ্ধই শুরু করে দিয়েছেন। স্বাধীনতার পর প্রায় সব অঞ্চলেই কল-কারখানা বসেছে, কিন্তু নহরপুরা একশ কি দু'শ বছর আগে যা ছিল, এখনও তা-ই। কারখানা না বসলে, এই এলাকায় শিল্পের বিকাশ না ঘটলে, শুধু মাত্র পুরোনো আমলের চাযবাস দিয়ে আর্থিক উন্নয়ন কী করে সম্ভব? এই নিয়ে 'নহরপুরা সমাচার'-এ জোরালো সব লেখা ছাপা হয়েছে। শুধু তা-ই না, সামাজিক নানা বৈষম্য, ধর্মীয় গোঁড়ামি, জাতপাতের কড়াকড়ি, ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর কাগজে নিয়মিত রিপোর্ট বেরোয়। কাউকে রেয়াত করেন না মহেশ্বর। দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার, অন্যায়—সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে তাঁর অবিরাম লড়াই। লোভ বা হুমকির কাছে তিনি মাথা নোয়ান না। বিবেকেব নির্দেশ অনুযায়ী' চলেন। যা সত্য বলে মনে করেন তা-ই লেখেন এবং ছাপেন।

বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পরনে হ্যান্ডলুমের গেরুয়া পাঞ্জাবি আর মোটা সুতোর ধুতি, পায়ে ভারী চপ্পল, কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ। চুল ছোটোছোটো করে, প্রায় চামড়া ঘেঁষে ছাঁটা। বাঁ হতের কবজিতে ওয়েস্ট এন্ড ওয়াজ কোম্পানির পুরনো মডেলের একটা রিস্টওয়াচ। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা।

মধ্যবয়সী এই মানুষটির গায়ের রং তামাটে। মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমে তাঁর মেদহীন পেটানো স্বাস্থ্যটি দেখার মতো। মেরুদন্ড টান টান। হাইটও বেশ ভালোই।

তিন বছর আগে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের চাকরি নিয়ে সুমিত্রা যখন এখানে আসে, মহেশ্বর তার সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, 'একটা ভালো কাজে এসেছেন। অনেকে পেছনে লাগতে পারে। যদি কোনো অসুবিধা হয়, আমাকে জানাবেন।'

সুমিত্রা মাথা নেড়েছে—জানাবে।

তারপরও বারকয়েক তার খোঁজখবর নিয়ে গিয়েছেন মহেশ্বর। পরে অবশ্য তাঁর আসাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দেখাসাক্ষাৎ তেমন না হলেও তিন বছরে মহেশ্বর সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছে সুমিত্রা। শুনতে শুনতে এই সাহসী, আইডিয়ালিস্ট মানুষটির ইমেজ তার কাছে ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রামবনবাস দৌড়ে ঘর থেকে সুমিত্রার জন্য একটা মোড়া নিয়ে আসে। মহেশ্বর ফের চেয়ারে বসার পর সুমিত্রাও বসে। বলে, 'আগে একটু চা খান। তারপর কাজের কথা হবে।'

মহেশ্বর জানান, আপ্যায়নে কোনোরকম ত্রুটি হয়নি, সুমিত্রা আসার আগেই রামবনবাস তাঁকে চা খাইয়েছে।

আর কিছু না বলে সুমিত্রা উৎসুক চোখে মহেশ্বরের দিকে তাকায়।

মহেশ্বর বলেন, 'খবর পেলাম মুনিয়ার খুনের আসামিদের ধরার ব্যাপারে আপনি আর হাসপাতালের ডাক্তার বিজয় থানার ওপর খুব প্রেসার দিচ্ছেন।'

মহেশ্বর সম্পর্কে সুমিত্রার গভীর বিশ্বাস এবং আস্থা রয়েছে। সে বলে, 'হ্যাঁ। মুনিয়া আমার ছাত্রী ছিল। যেভাবে তাকে খুন করা হয়েছে, নিশ্চয়ই আপনি তা শুনেছেন। আমি চাই খুনিদের চরম শাস্তি হোক।'

'আমিও তা-ই চাই। মুনিয়ার খুনের ব্যাপারে 'নহরপুরা সমাচার'-এ একটা বড় রিপোর্ট ছাপব। নেক্সট উইকে সেটা বেরুবে। আপনি যা জানেন, সব বলুন। কিছু বাদ দেবেন না।'

উত্তর দিতে গিয়ে ভেতরে ভেতরে থমকে যায় সুমিত্রা। কেননা মুনিয়ার খুনের সঙ্গে আইন আর পুলিশ জড়িত। হত্যাকারী এখনও ধরা পড়েনি। এই অবস্থায় মুখ খোলা ঠিক হবে কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। তাছাড়া, কিছু বলার আগে বিজয়ের সঙ্গে একটু পরামর্শ করে নেওয়াও দরকার। তার মতামতটা খুব জরুরি।

সুমিত্রার দ্বিধার কারণটা আঁচ করে মহেশ্বর বলেন, 'আপনার চিন্তার কারণ নেই। আইন বাঁচিয়েই আমি লিখব। কেউ আপনাদের গায়ে আঁচড় কাটতে পারবে না।'

সুমিত্রা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলে, 'দয়া করে আমাকে একটু সময় দিন। আজ নয়, পরে যা জানি বলব।'

'কেন বলুন তো?'

'কিছুক্ষণ আগে থানায় গিয়েছিলাম। চৌবেজি বললেন, দু'একদিনের ভেতর খুনিরা ধরা পড়বে। এখন কিছু বললে ওরা হুঁশিয়ার হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে, আপনার যখন ইচ্ছা নেই, জোর করব না। আমি কি পরশু একবার যোগাযোগ করব?'

একটু ভেবে সুমিত্রা বলে, 'তার পরের দিন আসুন।' সুমিত্রার ধারণা, তার মধ্যেই হত্যাকারীদের হদিস পাওয়া যাবে।

মহেশ্বর বলেন, 'আমি দু'দিন পরেই আসব। আজ আর আপনাকে বিরক্ত করছি না।' বলতে বলতে উঠে পড়েন।

মহেশ্বরকে সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে সুমিত্রা বলে, 'একটা কথা বলব?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'আপনি যখন মুনিয়ার খুনের ব্যাপারে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং করতে যাচ্ছেন তখন একবার ও. সি চৌবেজির সঙ্গে কথা বলতে পারেন। এ বিষয়ে তিনি কী করছেন সেটা জানা দরকার।'

'আজ রাত্তিরেই চৌবেজির কাছে যাচ্ছি। ওঁর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে।'

'আরেকটা জায়গায় আপনার যাওয়া দরকার।'

'কোথায়?'

সুমিত্রা বলে, 'যেখানে মুনিয়ার ডেড-বডি পাওয়া গেছে। ওখানকার লোকজনকে জিজ্ঞেস করলে হয়ত ইম্পর্টান্ট কিছু পেয়ে যাবেন।' ইচ্ছা করেই ছত্তরপুর গাঁও-এর লচ্ছু, ধনিয়া এবং পাওয়নের নাম করল না সে। এরাই মুনিয়ার খুনের রাতে একটা সাদা গাড়ি ওই এলাকা দিয়ে চলে যেতে দেখেছিল। লচ্ছুরা লেখাপড়া জানে না, সাদাসিধে দেহাতি। কোনো জটিল মারপ্যাঁচের ধার ধারে না। কী বলতে কী বলে শেষ পর্যন্ত হয়তো মুশকিলে পড়ে যাবে।

মহেশ্বর বলেন, 'ওদিকে তো যেতেই হবে। কাল একবার সময় করে চলে যাব।' বলে তিনি চলে যান। দরজায় খিল দিয়ে সুমিত্রা তার ঘরে ফিরে আসে।

দশ

দু'টো দিন কেটে যায়। এর মধ্যে বিজয়ের ব্যাপারে বাবাকে একটা চিঠি লিখেছে সুমিত্রা। কোনো কিছুই সে গোপন করেনি। অচ্ছুৎ থেকে বিজয়রা যে খ্রিস্টান হয়েছে, মিশনারিদের কাছে থেকে লেখাপড়া শিখে সে এখন নাম-করা ডাক্তার, তার ভাইবোনদের কেউ অধ্যাপক, কেউ সরকারি অফিসার ইত্যাদি যাবতীয় খবর দিয়েছে সে। অবশ্য এসব তার মা-বাবা মোটামুটি জানেন।

সব শেষে সুমিত্রা জানিয়েছে, বিজয়কে সে বিয়ে করতে চায় এবং এ বিয়েতে মা এবং বাবার সম্মতি এবং আশীর্বাদ একান্ত প্রয়োজন। চিঠির নানা জায়গায় বার বার সে লিখেছে, জাতটুকু বাদ দিলে ব্রাহ্মণ কায়াথদের মধ্যেও বিজয়দের মতো ভদ্র, শিক্ষিত পরিবার ক্বচিৎ চোখে পড়ে।

রামবনবাসকে দিয়ে চিঠিটা ডাকে দেবার পর থেকে অদ্ভুত এক উৎকণ্ঠায় সময় কাটছে সুমিত্রার। বাবা যদিও যথেষ্ট উদার, তবু তাঁর মধ্যে এখনও কিছু সংস্কার আছে। এবিয়েতে তিনি শেষ পর্যন্ত মত দেবেন কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। কেননা, তাদের বংশে এ-জাতীয় বিয়ে আগে আর কখনও হয়নি। বাবার দিক থেকে সমস্যাটা তো রয়েছেই। তাছাড়া, যারা সব চেয়ে বেশি বাধা দেবে তারা হল আত্মীয়স্বজন। কাকা, জেঠা, পিসে, পিসি, মামা মামি—এমন একজনকেও সুমিত্রার মনে পড়ে না যে জাতপাতের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত। এই মানুষগুলো হাজার রকমের কুসংস্কার আর গোঁড়ামিতে একেবারে অন্ধ হয়ে আছে।

এই দু'দিনে খবর নিয়ে জানা গেছে, মুনিয়ার খুনি ধরা পড়েনি।

আজ আবার মহেশ্বর সহায় আসবেন। লোকটা ঝানু সাংবাদিক। তুখোড় উকিলদের মতো প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে পেটের ভেতর থেকে কথা বার করে নিতে চান। সতর্ক না থাকলে অবধারিত ফাঁদে ফেলে দেবেন।

দশটা নাগাদ স্নান এবং খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে সুমিত্রা বেরুতে যাবে, গিরিধর থানা থেকে এসে হাজির। চেনা কনেস্টেবল। যে দু'বার সুমিত্রা থানায় গিয়েছে, সে-ই চা এবং মিঠাই টিঠাই এনে দিয়েছিল।

লম্বা সেলাম ঠুকে কনস্টেবল বলে, 'ও. সি সাহেব আপনার কাছে পাঠালেন।'

অবাকই হয়ে যায় সুমিত্রা। বলে, 'কেন?'

'একটা খবর দিতে। ওহী লেড়কীর খুনি ধরা পড়েছে।'

সুমিত্রার মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ ছুটে যায়। মুনিয়ার হত্যাকারীর ধরা পড়াটা তার কাছে বিরাট খবর। এতদিন এর জন্যই বিজয়কে সঙ্গে নিয়ে সে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। সুমিত্রা কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই গিরিধর ফের শুরু করে, 'ও সি আপনাকে খুনির নাম জানিয়ে দিতে বলেছেন।'

এই মুহূর্তে হত্যাকারীর নামটা সম্পর্কেই সুমিত্রার সবচেয়ে বেশি কৌতূহল। সে জিজ্ঞেস করে, 'কী নাম?' আগ্রহে এবং প্রবল উত্তেজনায় তার গলা কাঁপতে থাকে।

'বিনোদ।'

সাহস করে মুলায়েম চৌবে যে বিনোদকে ধরতে পেরেছেন সে কারণে তাঁর প্রতি রীতিমতো শ্রদ্ধাই হয় সুমিত্রার। বিনোদের গায়ে হাত দেওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়, এর জন্য বুকের পাটা চাই। মুনীশ্বর ঝা সম্পর্কেও তার ধারণা আগাগোড়া পালটে যায়। তার সম্বন্ধে কত কথাই না শুনেছিল সুমিত্রা। এখন দেখা যাচ্ছে, মুনীশ্বরের জোরালো একটি বিবেক রায়েছে। নিজের ছেলে অন্যায় করলে তার কাছে প্রশ্রয় পায় না। খুনি প্রমাণিত হলে বিনোদের হয়তো ফাঁসি বা সারা জীবনের জন্য

জেল হয়ে যাবে। তবু অবিচলিতই থেকেছে মুনীশ্বর। মারাত্মক সংকটের সময় মানুষের আসল চেহারাটা বেরিয়ে আসে। সেদিক থেকে মুনীশ্বরকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। না, লোকটাকে ভুলই বোঝা হয়েছিল।

সুমিত্রা বলে, 'কখন যেতে বলেছেন চৌবেজি?'

'আপনার যখন ইচ্ছা।'

সুমিত্রার মনে হচ্ছিল, এখনই থানায় গিয়ে মুলায়েম চৌবেক অভিনন্দন জানিয়ে আসে। কিন্তু আজ স্কুলে দু'জন মাস্টারজি ছুটি নিয়েছেন। সে-ও যদি চলে যায়, ক্লাস ফোরে পড়াবার মতো কেউ থাকবে না। ছেলেমেয়েদের পড়া নষ্ট হোক, সেটা একেবারেই মনঃপূত নয় সুমিত্রার। সে বলে, 'চৌবেজিকে বলবেন, আমি বিকেলে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করব।'

'ঠিক হ্যায়।' চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েও ঘুরে দাঁড়ায় গিরিধর। বলে, 'বহেনজি, ও. সি সাহেব খুনির খবরটা ডাক্তারসাহেবকে দিতে বলেছেন। আমি এখন হাসপাতালে যাচ্ছি। আপনি বিকেলে থানায় যাবেন, এখবর কি তাঁকে দেব?'

এ-ব্যাপারটা আগে ভাবেনি সুমিত্রা। থানায় বিজয়েরও যাওয়া দরকার। যৌথভাবেই তো তারা খুনিকে ধরার জন্য চাপ দিয়েছে। ব্যস্তভাবে সে বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

গিরিধর চলে যায়।

•

একটু পর স্কুলে ক্লাস নিতে নিতে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল সুমিত্রা। মুনিয়াকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তার মা-বাবার যে ক্ষতি হয়ে গেছে তা কোনোদিনই পূরণ হবার নয়। কিন্তু তার হত্যাকারীকে যে ধরা গেছে এবং তার শাস্তির জন্য যে সবরকম ব্যবস্থা করা হবে, এটুকুই একমাত্র সান্ত্বনা।

পর পর চারটে ক্লাস নেবার পর টিফিন হয়ে গেল। রামবনবাস ঘণ্টা পেটাতেই হইচই করতে করতে ক্লাস ফাঁকা করে ছেলেমেয়েরা সামনের মাঠে চলে যায়।

এই স্কুলে হেড মিস্ট্রেস সুমিত্রার জন্য একটা আলাদা ঘর আছে। অন্য টিচাররা আরেকটা বড় ঘরে একসঙ্গে বসে।

টিফিনের ঘণ্টা পড়ার পর নিজের ঘরে সুমিত্রা সবে এসে বসেছে, দরজার সামনে তিহরলালকে দেখা যায়। ছোকরা আচমকা মাটি ফুঁড়েই যেন উঠে এল। তার চোখ রক্তবর্ণ, চুল উষ্কখুষ্ক, গালে খাপচা খাপচা দাড়ি, পরনে ময়লা জামা আর খাটো পায়জামা। তাকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছে। সুমিত্রার কাছে যে ক'দিন সে এসেছে, এই চেহারায় এবং এমন পোশাকেই তাকে দেখা গেছে।

তিহরলাল বলে, 'ভেতরে আসব?'

সুমিত্রা বলে, 'এসো। কী ব্যাপার?'

ভেতরে ঢুকে তিহরলাল বলে. 'আপনি কি একটা খবর শুনেছেন?'

কোন বিশেষ খবরটির কথা তিহরলাল বলছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না সুমিত্রার। সে বলে, 'তুমি নিশ্চয়ই বিনোদের কথা বলতে চাইছ, তাই না?'

ঘাড়টা একদিকে সামান্য হেলিয়ে দেয় তিহরলাল, 'হাঁ।'

'পুলিশ তাকে ধরেছে।'

'আমিও তা-ই শুনে থানার দিকে যাচ্ছিলাম। লেকেন—'

তিহরলালের গলায় এমন কিছু ছিল যাতে চমকে ওঠে সুমিত্রা। বলে, 'কী?'

'থানায় পৌঁছুবার আগে রামসীতা মন্দিরের কাছে বিনোদ ঝাকে দেখলাম। চামচাদের সঙ্গে মাজাক করে কী সব বলছে। আর চামচারা হেসে হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে।'

স্নায়ুগুলো পলকে টান টান হয়ে যায় সুমিত্রার। সঙ্গে সঙ্গে তীরের মতো উঠে দাঁড়ায় সে। মেরুদণ্ড খাড়া করে তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'কী বলছ তুমি তিহর! বিনোদকে ঠিক দেখেছ! না অন্য কেউ?'

করাতের মতো শাণিত গলায় তিহরলাল বলে, 'আমার আঁখ ভুল দেখে না। মুনীশ্বর ঝা'র বেটোয়া বিনোদকেই দেখে এলাম।'

বিমূঢ়ের মতো সুমিত্রা বলে, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তিহরলাল।

সুমিত্রা এবার বলে, 'ঠিক কতক্ষণ আগে তুমি বিনোদ ঝাকে দেখেছ?'

তিহরলাল সময়ের কোনো গোলমাল করে ফেলেছে কিনা সেটাই সে যাচাই করে নিতে চায়।

তিহরলাল বলে, 'বললাম তো, রামসীতা মন্দিরের কাছে বিনোদ ঝাকে দেখেই আমি দৌড়ে এসেছি।'

মনে মনে সময়ের হিসেবটা কষে নেয় সুমিত্রা। রাসমসীতা মন্দিরটা এই শহরের পুব দিকের শেষ মাথায়। সেখান থেকে আস্তে আস্তে কেউ হেঁটে এলেও স্কুলে পৌঁছুতে চল্লিশ মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়। অর্থাৎ বড় জোর মিনিট চল্লিশেক আগে বিনোদকে দেখেছে তিহরলাল। কিন্তু প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা আগে গিরিধর খবর দিয়ে গেছে, বিনোদকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। যোগবলে সত্য কি ত্রেতাযুগের মুনীঋষিরা একসঙ্গে তিন চার জায়গায় থাকতে পারতেন। তেমন অলৌকিক ক্ষমতা বিনোদের আছে বলে শোনা যায়নি।

অনেকক্ষণ চিন্তা করে সুমিত্রা বলে, 'তা হলে কনস্টেবলটা কী খবর দিয়ে গেল!'

তিহরলাল চুপ করে থাকে।

সুমিত্রা এবার বলে, 'ঠিক আছে, বিকেলে ডাক্তার সাহেব আর আমি থানায় যাচ্ছি। তখন বোঝা যাবে, সত্যিসত্যিই ধরা পড়েছে কিনা। এক কাজ কর—'

'বলুন—'

'তুমিও বিকেলে থানায় এস।'

'ঠিক হ্যায়।' বলে আর দাঁড়ায় না তিহরলাল। ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এগারো

টিফিনের পর তিনটে ক্লাস কীভাবে কেটে গেছে, সুমিত্রার খেয়াল নেই। ছাত্রছাত্রীদের কী পড়িয়েছে, আদৌ কিছু পড়িয়েছে কিনা, তা-ও সে মনে করতে পারে না। এই সময়টা ছিল সে ভীষণ অন্যমনস্ক, অস্থির। মাথার ভেতর চাকার মতো অনবরত কী যেন ঘুরে যাচ্ছিল।

ছুটির ঘণ্টা বাজতে না বাজতেই স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়ে সুমিত্রা। রাস্তায় আসতেই একটা রিকশা পেয়ে যায়।

মিনিট দশেক বাদে সুমিত্রার রিকশা যখন থানার গেটে এসে থামে, উলটো দিক থেকে প্রায় একই সময়ে একটা টাঙা এসে দাঁড়ায়। দেখা যায়, সেটা থেকে বিজয় নামছে।

গেটের গা ঘেঁষে একটা কড়াইয়া গাছ। তার তলায় দু-তিনটে বাচ্চা নিয়ে একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের দেহাতি বউ এবং একটা বুড়ি একটানা কেঁদে চলেছে। একবার বুড়িটা সাহস করে গেটের কাছে এসে পাহারাদার আর্মড গার্ডটার পায়ে পড়ে আকুল গলায় বলে, 'আমার লেড়কাকে ছেড়ে দে বাবা। ও তো একটা মচ্ছরও মারতে পারে না, আদমি খুন করবে কী করে?'

এক লাথিতে বুড়িকে দশ হাত দূরে ছিটকে ফেলে আর্মড গার্ড খেঁকিয়ে ওঠে, 'যা যা, ভাগ। বুড়হী গিধ—'

দৃশ্যটা দেখতে দেখতে সুমিত্রা এবং বিজয়ের মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। রিকশা আর টাঙার ভাড়া চুকিয়ে আর্মড গার্ডকে তারা জিজ্ঞেস করে, 'এই বুড়ি কে?'

আর্মড গার্ড বিজয়দেব চেনে। সে সসম্ভ্রমে জানায়, আজ সকালে একটা 'বহুত ভারী' খুনের আসামি ধরা পড়েছে। বুড়িটা তার মা। কড়াইয়া গাছের তলায় যে বউ আর বাচ্চাগুলো বসে আছে তারা ওই খুনির ঘরবালী এবং ছেলেমেয়ে। গার্ড আরও জানায়, সেই সকাল থেকে ওরা ধবনা দিয়ে বসে আছে, আর মাঝে মাঝেই এসে খুনিটাকে ছেড়ে দেবার আর্জি জানাচ্ছে। এতবার চলে যেতে বলা হচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই ওরা নড়ছে চাইছে না।

সুমিত্রার মন শঙ্কায় এবং সংশয়ে ভরে যায়। হয়ত তিহরলাল স্কুলে গিয়ে দুপুরে যা বলে এসেছে সেটাই ঠিক। তবু নিজের চোখে একবার দেখা দরকার।

কোনো প্রশ্ন না করে বিজয়কে নিয়ে গেট পেরিয়ে থানার কমপাউন্ডে ঢুকে পড়ে সুমিত্রা। আর তখনই ভেতর থেকে করুণ কাতর চিৎকার শুনতে পায়, 'হামনিকো ছোড় দো, হামনিকো ছোড় দো। কোই কসুর নেহী হ্যায় মেরা—' থানার মধ্যেই লক-আপ। চিৎকারটা সেখান থেকে ভেসে আসছে।

থানার লাল বিল্ডিংটার সামনের দিকে টালির চালের তলায় টানা বারান্দা। সেখানে দাঁড়িয়ে দু'হাত নেড়ে একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে কিছু বোঝাচ্ছিলেন মুলায়েম চৌবে। সুমিত্রাদের দেখে এবড়ো খেবড়ো বত্রিশটা কালচে দাঁত বার করে হাসেন তিনি, আপ্যায়নের ভঙ্গিতে বলেন, 'আসুন আসুন বহেনজি, আসুন ডাক্তারসাহেব। আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। একসঙ্গে এলেন বুঝি?'

বিল্ডিংটা মাটি থেকে অনেকখানি উঁচুতে। মোট আটটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে সুমিত্রা জানায়, তারা একসঙ্গে আসেনি, দু'জনে দু'দিক থেকে এসেছিল, গেটের সামনে দেখা হয়েছে।

কাছাকাছি এলে মুলায়েম চৌবে বলেন, 'আগে আমার কামরায় চলুন। চা খান। তারপর দেখাব, আমি আমার কথা কীভাবে রেখেছি—'

বিজয় বলে, 'আজ আর চায়ের হাঙ্গামা করবেন না চৌবেজি। বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে ফিরে যেতে হবে।'

মুলায়েম চৌবে অন্যদিনের মতো তেমন জোরজার করেন না। শুধু বলেন, 'এক কাপ চা খেলে আমার আনন্দ হত। তবে আপনাদের যখন এত তাড়া তখন কী আর বলি। ঠিক আছে, আপনাদের যা ইচ্ছা—'

বিজয় বলে, 'যে লোকটাকে ধরা হয়েছে তাকে দেখাবার জন্যেই কি আমাদের খবর দিয়েছিলেন?'

'হাঁ। অচ্ছুৎদের মেয়েটাকে আপনারা পছন্দ করতেন, ভালোবাসতেন। গরিব ঘরের লেড়কী। ওদের জন্যে আপনাদের মতো কেউ ভাবে না। ওর খুনিকে ধরার জন্যে বার বার থানায় এসেছেন। মনটা যেন কেমন হয়ে গেল আমার। জবান দিয়েছিলাম, যেভাবে হোক খুনিকে হাজতে ঢোকাবই। দিনরাত তখন আমার এক চিন্তা, হত্যাকারীকে কোথায় পাই, কিভাবে ধরি। খুনিটা ধরা পড়ার পর ভাবলাম, আপনাদের ডেকে এনে দেখাই। নিজের চোখে দেখলে আপনাদের আত্মার শান্তি হবে।'

হাজতের ভেতর থেকে সেই চিৎকারটা সমানে ভেসে আসছে, 'হামনিকো ছোড় দো, হামনিকো ছোড় দো—' তার সঙ্গে কান্নার আওয়াজ।

সুমিত্রা মোটামুটি বুঝতে পারছিল। তবু জিজ্ঞেস করে, 'কে কাঁদছে?'

'মুনিয়ার খুনিটা, যাকে আজ ধরেছি। চলুন, ওকে দেখিয়ে আনি।' নিঃশব্দে মুলায়েম চৌবের সঙ্গে থানার পেছন দিকে লক-আপের সামনে চলে আসে সুমিত্রা আর বিজয়।

মোটা মোটা গরাদের ওপারে একটি মাত্র কয়েদিই রয়েছে। বছর তিরিশেক বয়স, রোগা ক্ষয়াটে চেহারা, গালে কয়েক দিনের দাড়ি, মাথায় জট-পাকানো রুক্ষ চুল। চোখ দু'টো লাল টকটকে, চোখের তলায় কালির পোঁচ। পরনে তালি-মারা খাটো কাপড় আর ছেঁড়া সবুজ জামা। লোকটার কপাল ঢিবির মতো ফুলে আছে। চামড়া থেঁতলে সেখান থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। বোঝা যায়, বহুক্ষণ ধরে মেঝেতে বা দেওয়ালে কপাল ঠুকে ঠুকে ওই হাল করা হয়েছে।

মুলায়েমকে দেখে তার কান্না দশগুণ বেড়ে যায়, 'ছোড় দো দারোগাসাব, ছোড় দো—'

প্রচন্ড ধমকে তাকে থামিয়ে দেন মুলায়েম। দাঁতে দাঁত ঘষে বলেন, 'শালে, হারমাজাদা কাঁহিকা—'

লোকটার কান্নার শব্দ প্রায় থেমে যায়।

সুমিত্রা রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করে, 'একেই আপনারা মুনিয়ার খুনের দায়ে ধরেছেন?'

'হাঁ—' চকচকে, পরিতৃপ্ত মুখে বলে ঘাড় হেলিয়ে দেন মুলায়েম, 'আমার চোখে ধুলো দিয়ে লুকিয়ে থাকবে, এমন হত্যারা দুনিয়ায় জন্মায়নি।' তাঁর গোটা মুখ জুড়ে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে উঠতে থাকে।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুমিত্রা। তারপর বিমূঢ়ের মতো বলে, 'এ কে?'

'কে আবার, বিনোদ। টেপ-রেকর্ডারে যার নাম রয়েছে, এই সেই খতারনাক মার্ডারার।'

'কী বলছেন আপনি চৌবেজি! মুনিয়া যার—'

সুমিত্রাকে থামিয়ে দিয়ে মুলায়েম বলেন, 'আপনি আমার সঙ্গে আসুন। এখানে দাঁড়িয়ে এসব বাতচিত ঠিক না।'

নিজের কামরায় সুমিত্রাদের এনে মুলায়েম বলেন, 'ডাক্তার সাহেব, বহেনজি, লোকটাকে ধরতে আমাদের যে কী হয়রানি হয়েছে, বলে বোঝাতে পারব না। বহুৎ তখলিফ করে পুরা এক ভ্যান আমর্ড পুলিশ নিয়ে তবে ওকে পাকড়ানো গেছে।'

বিজয় বলে, 'এই লোকটাকে দেখে আপনার মনে হয় সে খুনটুন করতে পারে! এরকম উইক চেহারা, ফুঁ দিলে উড়ে যাবে।'

এবার মুলায়েমের মুখে উঁচু দরের হাসি ফোটে। বক্তৃতার ঢংয়ে তিনি যা বলে যান তা এইরকম। বিজয় এবং সুমিত্রার হৃদয় খুবই কোমল। তাছাড়া, মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ কোনো ধারণাই নেই। ওই লোকটার কান্না এবং চিৎকারে তাঁরা বিচলিত হয়ে পড়েছেন। আসলে এই বিনোদ অত্যন্ত ধুরন্ধর। কেঁদে কেটে, দেওয়ালে মাথা ঠুকে, সে সহানুভূতি আদায় করতে চাইছে। কিন্তু ক্রিমিনাল ঘেঁটে ঘেঁটে চুল পাকিয়ে ফেলেছেন মুলায়েম। সারা জীবন কত বিচিত্র ধরনের হত্যাকারী আর ডাকুই না দেখেছেন। নিজেদের বাঁচাবার জন্য তারা কত রকম কৌশলই না নিয়ে থাকে— যেমন এই বিনোদ কান্নার কৌশল নিয়েছে। কিন্তু মুলায়েম চৌবেকে ধোঁকা দেওয়া অত সহজ নয়।

শুনতে শুনতে বিজয়ের মুখ শক্ত হয়ে উঠছিল। সে বলে, 'চৌবেজি, আপনি যা বললেন তার খানিকটা মানছি, বাকিটা একেবারেই মানতে পারছি না! মানুষের প্রতি আমাদের মায়া মমতা আছে। তাই বলে লোকচরিত্র বুঝি না, আপনার এই ধারণা একেবারেই ভুল।'

মুলায়েম স্থির চোখে, সন্দিগ্ধভাবে, বিজয়কে লক্ষ করতে থাকেন। তবে কোনো উত্তর দেন না।

বিজয় থামেনি, 'যাই হোক, মৃত্যুর সময় মুনিয়া যে বিনোদের কথা বলে গিয়েছিল সে আলাদা লোক। যাকে ধরে এনেছেন সে নয়।'

মুলায়েম অবাক বিস্ময়ে বলেন, 'বহুৎ তাজ্জবকি বাত! এই লোকটা ছাড়া ওই দেহাতগুলোতে আর কোনো বিনোদ নেই।' তিনি আরও জানান, মুনিয়াদের গাঁও এবং তাদের চারপাশের যত গাঁও আছে, সেগুলোর প্রতিটি বাড়িতে তাঁরা হানা দিয়েছেন। যদি আরেকটি বিনোদকে কেউ খুঁজে বার করতে পারে, নহরপুরা টাউনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাজার বার কান ধরে ওঠ বোস করবেন।

বিজয় একদৃষ্টে মুলায়েমের চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। বুঝতে পারছে, লোকটা কী সাঙ্ঘাতিক ধূর্ত। আসল হত্যাকারীকে বাঁচাতে একই নামের অন্য একটি নিরীহ লোককে ধরে এনেছে। বিজয় প্রায় ফেটে পড়তে যাচ্ছিল, নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'এই বিনোদের কথা মুনিয়া বলেনি।'

'বলেনি!'

'না।'

'তবে কার কথা বলেছে?'

'মুনীশ্বর ঝা'র ছেলে বিনোদের।'

কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত থানাটা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। এমনকি লক-আপে সেই লোকটার একটানা বিলাপও যেন থেমে গেছে।

একসময় সোজা বিজয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে মুলায়েম চৌবে বলেন, 'আপনার বোধহয় ভুল হচ্ছে ডাক্তার সাহেব।'

বিজয় গলার স্বরে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বলে, 'একেবারেই না চৌবেজি। আমি নিজের কানে শুনেছি।'

'লেকেন—'

'লেকেন কী?'

মুলায়েম সতর্কভাবে বলেন, 'মুনিয়ার জবানবন্দির টেপ-রেকর্ডারটা আমি কমসে কম বিশ বার বাজিয়ে শুনেছি। তাতে স্রিফ বিনোদের নাম আছে। এই বিনোদ যে মুনীশ্বর ঝা'র ছেলে বিনোদ ঝা, তা কিন্তু প্রমাণ করা যাবে না।'

বিজয় জানায়, 'নিশ্চয়ই প্রমাণ করা যাবে।'

যেন খুবই অবাক হয়েছেন এমনভাবে মুলায়েম চৌবে বলেন, 'যাবে বলছেন!'

'নিশ্চয়ই। বিনোদ ঝা যে মাতাল, লম্পট এবং তার জন্যে যে এই অঞ্চলের কোনো যুবতী মেয়েরই নিরাপত্তা নেই তা এখানকার পাঁচ বছরের বাচ্চারাও জানে।'

মুলায়েম থতিয়ে যান। একটু চিন্তা করে, গলা না নামিয়ে, বলেন, 'ডাক্তার সাহেব, আপেনি যা বলেছেন তা হয়তো ঠিক। লেকিন বিনোদরা উঁচা জাত, ব্রাহ্মণ। অচ্ছুতের লেড়কীর দিকে হাত বাড়াবে, এতটা নিচে সে নামতে পারে না। কভী নেহী।' বলে জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে থাকেন।

কর্কশ গলায় বিজয় বলে, 'আপনি ভালো করেই জানেন, মুনিয়ার বেলায় সে নেমেছে।'

মুলায়েমের চোখে আগুনের ঝিলিক দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। ভেতরে ভেতরে তিনি খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু সেই মনোভাবটা বাইরে বেরিয়ে আসতে দেন না। আস্তে আস্তে, শান্ত গলায় বলেন, 'আমি কী করে জানব! আমি তো আর অচ্ছুৎদের ছোকরির ওপর যখন হামলা হয়, কাছে ছিলাম না।'

'আমি জানি আপনি ছিলেন না, থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু আপনার বিবেক কী বলে?'

মুলায়েম চৌবে নড়ে চড়ে বসেন। বলেন, 'ডাক্তার সাহেব, আমার কারবার বিবেক নিয়ে নয়, কানুন নিয়ে।'

এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল সুমিত্রা। এবার সে বলে, 'কানুন নির্দোষ লোককে কিন্তু শাস্তি দেয় না। তাকে প্রোটেকশন দেয়। আশা করি যে নিরীহ লোকটাকে আপনারা ধরে এনেছেন তার কোনো ক্ষতি হবে না।'

'লেকিন—'

'কী?'

'কে অন্যায় করেছে আর কে করেনি, তা আদালত সাক্ষিসাবুদ যাচাই করে ঠিক করবে। আমার সেখানে মাথা গলাবার রাইট নেই। অচ্ছুৎদের ছোকরি মরার সময় বিনোদের নাম করেছে। আমরা বিনোদকে ধরেছি। এবার তাকে কোর্টে চালান করে দেব। আমাদের কাজ খতম হয়ে যাবে। বাকিটা জজ সাহেবদের কাজ। তাঁরা বিচারে যা ঠিক করবেন তাই হবে।'

সুমিত্রা উত্তেজিত ভাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে বিজয় বলে, 'চৌবেজি, আপনাকে একটা কথা জানিয়ে রাখি—'

'হাঁ হাঁ, জরুর—' সামনে ঝুঁকে গভীর আগ্রহে বিজয়ের দিকে তাকান মুলায়েম।

'আমিই মুনিয়ার মৃত্যুকালীন জবানবন্দি নিয়েছিলাম। সে জন্য তো বটেই, ডাক্তার হিসেবেও আদালত নিশ্চয়ই আমকে সাক্ষি দিতে ডাকবে, নাকি বলেন?'

বিজয়ের এই প্রশ্নটা মুলায়েমকে হুঁশিয়ার করে দেয়। ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসে বলেন, 'সেইরকমই তো নিয়ম।'

'আদালতে গিয়ে যা সত্যি তা-ই বলব। আর আসল খুনি যাতে শাস্তি পায় সেই চেষ্টা করব। একটা নির্দোষ লোককে ফাঁসির দড়িতে ঝোলাবার যে চেষ্টা হচ্ছে সেটা আমরা কিছুতেই হতে দেব না। আচ্ছা, নমস্তে—' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় বিজয়।

সুমিত্রাও উঠে পড়েছিল। সে-ও মুলায়েমের উদ্দেশে বলে, 'নমস্তে—'

প্রতি-নমস্কারের জন্য অপেক্ষা না করেই দু'জনে বেরিয়ে পড়ে। মুলায়েম চৌবের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য পেছন ফিরে একবার তাকায়ও না। বাইরে আসতেই সেই লোকটার করুণ চিৎকার ফের শুনতে পায় সুমিত্রারা। 'হামনিকো ছোড় দো, ছোড় দো—' তার কান্নার আওয়াজ বাতাসে ছড়িয়ে যেতে থাকে।

বিষণ্ণ চোখে একবার বিজয়ের দিকে তাকায় সুমিত্রা। বিজয়ও তাকে লক্ষ করছিল। কেউ কিছু অবশ্য বলে না। তবে দু'জনই খুব সম্ভব একই কথা ভাবে, যেভাবেই হোক লোকটার মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। থানা থেকে বেরিয়ে সুমিত্রারা দেখতে পায় কড়াইয়া গাছের তলায় সেই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে বউ এবং বুড়িটা এখনও কেঁদেই চলেছে। তাদের কাছে বসে তিহরলাল গভীর সহানুভূতির সুরে বলছে, 'রো মাত্ রো মাত্। সব কুছ ঠিক হো যায়েগা।' কিন্তু তার সান্ত্বনার একটি শব্দও ওদের কানে ঢুকছে না।

থানায় ঢোকার সময় তিহরলালকে দেখেনি সুমিত্রারা। নিশ্চয়ই সে পরে এসেছে।

সুমিত্রাদের দেখে তিহরলাল উঠে আসে। বলে, 'দেখলেন তো, আমি যা বলেছিলাম ঠিক কিনা—'

তিহরলাল দেহাতি বিনোদ অর্থাৎ যাকে খুনের দায়ে ধরে আনা হয়েছে তার কথাই যে বলছে, সুমিত্রা তা বুঝতে পারে। আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয় সে। ঝাপসা গলায় বলে, 'ঠিক।'

'এই বিনোদকে যে ধরা হয়েছে, এখানে এসে একটু আগে ওদের কাছে জানতে পারলাম।' বলে গাছতলায় বুড়ি আর বউটিকে দেখিয়ে দেয়।

সুমিত্রা উত্তর দেয় না।

তিহরলাল এবার জিজ্ঞেস করে, 'এখন কী হবে?'

'বুঝতে পারছি না। তবে কিছু একটা করতেই হবে।'

'কী করবেন?'

'এখনও ভাবিনি।'

একটু চুপ করে থেকে তিহরলাল তীব্র, চাপা গলায় বলে, 'বিনোদ ঝা'র সাজা হবে না?'

'দেখা যাক। তার আগে এই বিনোদকে লক-আপ থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে।' বলে একটু থামে সুমিত্রা। কড়াইয়া গাছের তলায় আঙুল বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি ওদের চেনো?'

তিহরলাল বলে, 'চিনব না কেন? আমাদের পাশের গাঁওয়ের গাঁওবালা। ওরা জাতে গঞ্জু।'

'তুমি এক কাজ কর—'

'বলুন।'

'এখানে বসে কাঁদলে কোনো লাভ হবে না। বাচ্চাগুলো বোধহয় সকাল থেকে খায়নি। তুমি ওদের গাঁওয়ে পৌঁছে দাও। ঘরে টাকা পয়সা কিছু আছে বলে মনে হয় না। এই নাও কুড়িটা টাকা। চাল ডাল যা দরকার হয়, কিনে দিও।'

হাত বাড়িয়ে সুমিত্রার কাছ থেকে টাকাটা নেয় তিহরলাল।

সুমিত্রা একটু চিন্তা করে বলে, 'আজ আমরা ভেবে দেখি। কাল সকালে একবার আমার কোয়ার্টারে আসতে পারবে?'

'পারব।'

তিহরলাল আর দাঁড়ায় না, কড়াইয়া গাছটার দিকে চলে যায়। সুমিত্রা বিজয়কে বলে, 'হাসপাতালে জরুরি কাজ কিছু নেই তো?'

বিজয় বলে 'না। কেন?'

'তা হলে আমার সঙ্গে চল। এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।' মনে মনে এটাই চাইছিল বিজয়। বলল, 'চল—'

প্রথম দিকে মুনিয়ার কেসটায় নিজেকে খুব একটা জড়াতে চায়নি বিজয়। কিন্তু বিনোদ ঝা'কে বাঁচাবার জন্য অন্য একটি নির্দোষ মানুষকে যেভাবে ফাঁসিকাঠের দিকে ঠেলে দেবার চক্রান্ত চলছে, তাতে মাথায় আগুন ধরে গিয়েছে তার। মুখ বুজে এত বড় একটা অন্যায় মেনে নেওয়া যায় না। বিনোদ ঝা'কে চরম শাস্তি দেওয়া সম্ভব হবে কিনা, কে জানে। কিন্তু গঞ্জু বিনোদকে যেভাবে হোক রক্ষা করতে হবে।

বারো

কোয়ার্টারে ফিরে সুমিত্রারা দেখতে পায়, সেদিনের মতো বারান্দায় বসে আছেন মহেশ্বর সহায়। দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছে রামবনবাস।

মহেশ্বর উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'নমস্তে বহেনজি। দু'দিন পর আসতে বলেছিলেন। তাই এসেছি।' বিজয়কে বলে, 'নমস্তে ডাক্তার সাহেব।'

মহেশ্বর সহায়ের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল সুমিত্রা। তাঁকে দেখে মনে মনে অনেকটা ভরসা পায়। তারা যা করতে চায় সেজন্য এরকম একজন বুকের পাটাওলা, সাহসী মানুষ পাশে থাকা দরকার। রামবনবাস আগেই বারান্দায় একটা মোড়া এনে রেখেছিল। বিজয়কে দেখে আরও একটা নিয়ে আসে।

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে সুমিত্রারা বলে, 'বসুন মহেশ্বরজি। আপনাকে আমাদের খুব দরকার।'

তিনজনে মুখোমুখি বসে পড়ে।

মহেশ্বর বলেন, 'শুনলাম, সেই মেয়েটির খুনির ধরা পড়েছে।'

সুমিত্রা বলে, 'একটা লোককে ধরা হয়েছে। এইমাত্র তাকে দেখে এলাম। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে—'

'মানে—'

সুমিত্রা আগোগোড়া দুই বিনোদের যাবতীয় কথা বলে যায়, খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দেয় না। সব জানবার পর বলে, 'ওই গরিব লোকটাকে বাঁচাতেই হবে। আপনি আমাদের সাহায্য করুন।'

শুনতে শুনতে শিরদাঁড়া টান টান হয়ে যায় মহেশ্বরের। তিনি বলেন, 'এতটা আমি ভাবতে পারিনি।'

সুমিত্রা বলে, 'এখন বলুন আমরা কীভাবে এগুব?'

মহেশ্বর বলেন, 'প্রথমে একজন উকিল দিয়ে বিনোদের জামিনের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'আমাদের তো কোনো ল'ইয়ারের সঙ্গে জানাশোনা নেই।'

'আমার এক বন্ধু পূর্ণিয়ায় প্র্যাকটিস করে। তাকে খবর দিয়ে যত তাড়াতাড়ি হয় আনিয়ে নিচ্ছি।'

'খুব ভালো হয় তা হলে।' সুমিত্রা খুবই উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, 'কিন্তু আসল কালপ্রিটকে তো ধরতে হবে। তা কি সম্ভব?'

মহেশ্বর বলেন, 'অসম্ভব কেন?'

'শুনেছি উঁচু লেভেলে ওদের খুব ইনফ্লুয়েন্স।'

মহেশ্বর বলেন, 'উচু লেভেলের সব লোক খারাপ হয়ে গেছে, এ আমার মনে হয় না। আগে এই বিনোদকে তো লক-আপ থেকে বার করা যাক। তারপর অন্য কথা ভাবা যাবে। অবশ্য—'

বিজয় জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'মার্ডার কেসে ধরা হয়েছে। নিশ্চয়ই ওকে কোর্টে চালান করে কেস লেখানো হবে। খুনের কেসের আসামিকে এত তাড়াতাড়ি কোর্ট জামিন দেবে বলে মনে হয় না। যাই হোক, চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর মহেশ্বর আবার এভাবে শুরু করেন, 'এই বিনোদকে বাঁচাতে গেলে আমাদের আরেকটা কাজ করতে হবে। মুনিয়া মার্ডারের সময় সে কোথায় ছিল, কারা কারা সে সময় তাকে দেখেছে, সেই সব সাক্ষিপ্রমাণ জোগাড় করা দরকার। আজ থেকেই এ-ব্যাপারটা আরম্ভ করতে হবে। এটা ভীষণ জরুরি।'

সুমিত্রা বলে, 'তা হলে তো ওদের গ্রামে যেতে হয়।'

'অবশ্যই।' বলে একটু থেমে ফের শুরু করেন মহেশ্বর, 'আমি ঘণ্টাখানেকের জন্যে বাড়ি যাচ্ছি।

কাউকে পূর্ণিয়া পাঠিয়ে আমার ল'ইয়ার বন্ধুকে এখানে আনার ব্যবস্থা করে ফিরে আসব। তারপর আমরা তিনজন বিনোদদের গাঁয়ে যাব।'

মহেশ্বরের কাছ থেকে এতটা সহযোগিতা পাওয়া যাবে, ভাবতে পারেনি সুমিত্রারা। আইনঘটিত ব্যাপারে যে উকিল, সাক্ষিপ্রমাণ ইত্যাদি দরকার, এসব চিন্তা তাদের মাথায় আগে আসেনি। প্রবল ভাবাবেগে তারা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি করছিল। সরল দেহাতি বিনোদকে বাঁচাবার সঠিক পদ্ধতিটা মহেশ্বরই তাদের জানিয়ে দিলেন, এ জন্য তারা কৃতজ্ঞ।

এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল না, তার অনেক আগেই মহেশ্বর ফিরে এলেন। মানুষটির সঙ্গে সামান্য আলাপ হয়েছিল তিন বছর আগে। কিন্তু এই দু'তিন দিনে তাঁকে যেটুকু সুমিত্রা দেখল তাতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বহুগুণ বেড়ে গেছে। 'নহরপুরা সমাচার'-এ অন্যায় অবিচার বা বৈষম্যের বিরুদ্ধে রিপোর্ট বা সম্পাদকীয় ছেপেই তিনি হাত ধুয়ে ফেলেন না। দেখা যাচ্ছে, সামাজিক দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে এসবের মধ্যে জড়িয়েও পড়েন। অনেক বিখ্যাত ইনটেলেকচুয়াল কবি সাহিত্যিক সম্পর্কে সুমিত্রা জানে, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দামি দামি স্টেটমেন্ট দিয়েই তাঁরা খালাস। মহেশ্বর এঁদের একেবারে উলটো। এখনও সন্ধে হয়নি। দিনের তাপ অবশ্য জুড়িয়ে গেছে। রোদের রং বাসি হলুদের মতো। আকাশের গায়ে হালকা নিরুত্তাপ একটু আলো আটকে আছে। এই অবস্থাটা আরও আধ ঘণ্টার মতো থাকবে। তারপর অন্ধকার নামতে শুরু করবে।

মহেশ্বর এসে আর বসেন না, সুমিত্রা এবং বিজয়কে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

মুনিয়ার রক্তাক্ত, বেহুঁশ দেহ যেখানে পাওয়া গিয়েছিল সেই ছত্তরপুরার পাশের গ্রাম বিনোদদের। একে ওকে জিজ্ঞেস করে সুমিত্রারা যখন বিনোদদের ভাঙাচোরা টিনের চালের বাড়িতে এসে পৌঁছয়, সন্ধে নামতে শুরু করেছে।

বিনোদের ঘরের সামনে বিশাল ভিড়। সারা গাঁ সেখানে ভেঙে পড়েছে। ঘরের মেটে নীচু দাওয়ায় পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে বিনোদের বউ। বড় ছেলেমেয়ে দু'টো আর বিনোদের বুড়ি মা গোঙানির মতো শব্দ করে কেঁদে চলেছে। সকালে বিনোদকে যখন থানায় ধরে নিয়ে যায়, সেই যে কান্না শুরু হয়েছিল, এখনও থামেনি। ছোটো বাচ্চাটা শুধু কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

গাঁয়েরই কিছু মেয়েমানুষ দাওয়ায় বুড়ি আর বাচ্চাদের কাছে বসে আছে। তারা গভীর সহানুভূতিতে যা বলছে তা এইরকম। মাথার ওপর ভাগোয়ান শিউশঙ্কর, ভগোয়ান কিষুণজি রয়েছেন। তাঁদের চোখে ধুলো দিয়ে কিছুটি হবার জো নেই। তাঁরা জানেন বিনোদ নির্দোষ। তাঁরা বিনোদিয়াকে রক্ষা করবেন।

বিনোদের বুড়ি মা, তার বউ বা বাচ্চারা কতটা ভরসা পাচ্ছে, বলা মুশকিল। দাওয়ার সামনের দিকের ফাঁকা জায়গায় দু' আড়াই শ মানুষ বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখে একটাও কথা নেই। ভিড়ের মধ্যে তিহরলালকেও দেখা যায়। দাওয়ার শেষ মাথায় একটা ঘুণে-ধরা বাঁশের খুঁটি ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সে।

সুমিত্রাদের দেখে তিহরলাল প্রথমটা অবাক হয়ে যায়। তারা যে এসময় এখানে আসবে, ভাবতে পারেনি। একরকম দৌড়েই সে এগিয়ে যায় এবং ভিড় সরিয়ে তাদের জন্য রাস্তা করে দেয়।

দাওয়ার দিকে যেতে যেতে তিহরলাল বলে, 'আপনারা যে আসবেন, আগে বলেননি তো?'

সুমিত্রা বলে, 'একটা জরুরি কাজে আসতে হল।'

তিহরলাল আর কোনো প্রশ্ন করে না।

সুমিত্রা হঠাৎ এখানে এসে পড়ায় রীতিমতো চাঞ্চল্য দেখা দেয়। তাকে এবং বিজয়কে চারপাশের বিশ-পঞ্চাশটা গ্রামের সবাই চেনে এবং যথেষ্ট সমীহ করে থাকে। মহেশ্বরকেও অনেকে চেনে।

তিহরলাল চটপটে কাজের লোক। একে ওকে দিয়ে তিনখানা হাতল-ভাঙা চেয়ার আনিয়ে সুমিত্রাদের বসায়। অন্ধকার নামতে শুরু করেছিল। চারিদিকে ঝাপসা হয়ে গেছে। এখন দশ হাত

দূরের মানুষজনকে স্পষ্ট দেখা যায় না। কাজেই তিহরলাল কোত্থেকে একটা হেরিকেন জোগাড় করে ফেলে।

সুমিত্রাদের আসার খবর পেয়ে শুধু এই গাঁয়েরই না, চারপাশের দেহাতগুলো থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আরও মানুষ আসতে থাকে।

বিজয় বিনোদের বউ-বাচ্চাদের দেখিয়ে তিহরলালকে বলে, 'মনে হচ্ছে, ওরা এখনও খায়নি। তখন টাকা দিলাম, ওদের কিছু কিনে দাওনি?'

তিহরলাল জানায়, চাল ডাল আটা আনাজপাতি, সবই কিনে দিয়েছে কিন্তু বিনোদের বউ বা মা রসুই চড়ায়নি।

বিজয় বলে, 'রসুই করার মতো মনের অবস্থা ওদের নয়। কিন্তু খেতে তো হবে। বাচ্চাগুলোর কথাও ভাবা দরকার। এক কাজ কর। গাঁয়ের অন্য মেয়েদের বল, ওরা যেন ডালভাত কী চাপাটি টাপাটি করে দেয়।'

এ-ব্যাপারটা তিহরলালের মাথায় আগে আসেনি। সে ব্যস্তভাবে একটি বয়স্কা মেয়েমানুষের কাছে গিয়ে কিছু বলে ফিরে আসে।

সুমিত্রা বলে, 'একটা বিশেষ দরকারে তোমাদের এখানে আসতে হল।'

'কী?' তিহরলাল জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

মহেশ্বরকে দেখিয়ে সুমিত্রা বলে, 'সেটা ইনি বলবেন।'

মহেশ্বর হঠাৎ এখানে আসার কারণটা জানিয়ে বলেন, 'বিনোদকে ছাড়িয়ে আনতে হলে সাক্ষি সাবুদ দরকার। যে রাত্তিরে মুনিয়া খুন হয়, বিনোদ কোথায় ছিল—তোমরা জানো?' বলে চারপাশের ভিড়টার দিকে তাকায়।

অনেকে বলে ওঠে, গাঁওমেই থা।'

'একসঙ্গে না, একজন একজন করে বল।' সামনের মধ্যবয়সী একটা লোকের দিকে আঙুল বাড়িয়ে মহেশ্বর বলেন, 'তুমি তাকে রাত্তিরে কতক্ষণ দেখেছ?'

লোকটার নাম মনভাওন। সে জানায়, প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত বিনোদ এবং গাঁয়ের আরও কয়েকজন মিলে বিষুণদেও-এর পুজো সম্পর্কে আলোচনা করেছিল। কারণ এবছর খুব রোগ-বীমার হচ্ছে। বিষুণজিকে পুজো চড়ালে তিনি সন্তুষ্ট হবেন। গাঁ রোগের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবে, এটাই তাদের বিশ্বাস।

কোথায় পুজো হবে, খরচের টাকা কীভাবে পাওয়া যাবে, গাঁয়ের পরিবার পিছু কত চাঁদা ধরা হবে, এই সব কথাবার্তা শেষ হবার পর মনভাওনরা বিনোদকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে চলে যায়।

মহেশ্বর বলেন, 'পুজো নিয়ে কথাবার্তার সময় আর কে কে ছিল?'

মনভাওন জন পনেরো লোকের নাম করে। ভগলু, জগদেও, মানেকলাল, গহেরু ইত্যাদি।

মহেশ্বর জিজ্ঞেস করেন, 'তারা কি এখন এখানে আছে?'

'হাঁ।'

'তাদের ডাকো।'

ভিড়ের ভেতর থেকে পনেরো জনকে মহেশ্বরের সামনে এনে হাজির করে মনভাওন। আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করে মহেশ্বর জানতে পারেন, সত্যিই তারা পুজোর ব্যাপারে কাল মাঝরাত পর্যন্ত কথাবার্তা বলেছে।

মহেশ্বর তাঁর ঝোলা থেকে ডায়েরি আর পেন বার করতে করতে বলেন, 'তোমাদের নাম আর ঠিকানা বল, লিখে নিই।'

মনভাওনরা ভয় পেয়ে যায়। একসঙ্গে তারা বলে, 'নাম ঠিকানা দিয়ে কী হবে?'

মহেশ্বর বুঝিয়ে দেন, আদালতে গঞ্জু বিনোদের মামলা উঠলে মনভাওনদের সাক্ষ্য দিতে হবে। সে জন্য নাম-ঠিকানা দরকার। মনভাওনরা আরও ঘাবড়ে যায়। বলে, 'আমরা গরিব আদমি, ঝামেলা হবে না তো হুজৌর?'

'না। আদালতে দাঁড়িয়ে যা আমাদের বললে তা-ই বলবে। মিথ্যে তো আর তোমাদের বলতে বলছি না। সত্যি না বললে বিনোদকে বাঁচানো যাবে না।'

দ্বিধান্বিতভাবে নিজেদের মধ্যে চাপা নীচু গলায় মনভাওনরা কী সব আলোচনা করতে থাকে।

সুমিত্রা এবং বিজয় একধারে চুপচাপ বসে সব লক্ষ করছিল। বুঝতে পারছিল, আদালতের নামে মনভাওনরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। এবার তারা বলে, 'ভয়ের কিছু নেই। আমরা তো আছি।'

সুমিত্রা এবং বিজয়ের ওপর এ অঞ্চলের তাবত দেহাতি মানুষের অগাধ বিশ্বাস। মনভাওনরা অনেকখানি ভরসা পেয়ে বলে ওঠে, 'ডাক্তারসাব, বহেনজি, আপনারা থাকলে আমাদের ডর নেই।'

এরপর একে একে পনেরো জনের নামধাম টুকে নিয়ে মহেশ্বর বলেন, 'মাঝরাত পর্যন্ত তো তোমরা পুজো নিয়ে কথা বলেছ। তারপর আর কেউ তাকে দেখেছে?'

তিনজন এগিয়ে আসে। জানা যায় তাদের একজনের নাম লগন, একজনের বিরজু এবং তৃতীয় লোকটি হল ধুরুয়া। বিনোদদের ঘরের মুখোমুখি ওদের ঘর। বিনোদের শ্বাসের ব্যারাম (হাঁপানি) আছে। এই রোগটা গরমের সময় ছাড়া বছরের বাকি মাসগুলো তাকে ভীষণ কাবু করে রাখে। মুনিয়ার মৃত্যুর দিন মাঝরাত থেকে হাঁপানির টান উঠেছিল তার। লগনরা বিনোদকে ভোর পর্যন্ত তার ঘরের দাওয়ায় বসে বিকট শব্দ করে হাঁপাতে দেখেছে।

মহেশ্বর এই তিনজনের নাম ঠিকানাও টুকে নেন। সন্ধে অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। অন্ধকার এবং মিহি কুয়াশায় এখন চারিদিক আচ্ছন্ন। কাছাকাছি কোথায় যেন কামাব পাখিরা মাঝে মাঝে কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠছে। যেধারে তাকানো যায়, অন্ধকার বিঁধে বিঁধে হাজার হাজার জোনাকি উড়ছে।

এখানকার কাজ আপাতত শেষ। মহেশ্বর মনভাওনদের উদ্দেশে বলেন, 'আজ আমরা চলি। তোমাদের অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। পরে আবার জরুরত পড়ে তো আসব।'

মনভাওনরা হাতজোড় করে বলে, 'যখন ইচ্ছে আসবেন।' তারপর গ্রামের সীমান্ত পর্যন্ত মহেশ্বরদের এগিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু তিহরলাল তাঁদের সঙ্গ ছাড়ে না।

গ্রামটার পাশ দিয়ে একটা মোটামুটি পাকা রাস্তা বহু দূরে ডিস্ট্রিক্ট টাউনের দিকে চলে গেছে। সেটা ধরে ওরা চারজন—সুমিত্রা, তিহরলাল, বিজয় আর মহেশ্বর এখন নহরপুরার দিকে চলেছেন। মনভাওনদের সাক্ষ্যের জোরে গঞ্জু বিনোদকে কতটা বাঁচানো যাবে, আদৌ যাবে কিনা, তাই নিয়ে নানা মন্তব্য করে যাচ্ছিলেন মহেশ্বর। আসলে মুনীশ্বর ঝা'র টাকার জোর এবং মাসল পাওয়ারের ব্যাপারটা তার মাথায় রয়েছে। ঘাঘী ল'ইয়ার নিশ্চয়ই লাগিয়ে দেবে মুনীশ্বর। তাদের উলটোপালটা জেরার সামনে মনভাওনদের মতো আনপড় ভীরু দেহাতিরা দু' মিনিটও শিরদাঁড়া সোজা রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। তাছাড়া আদালতে যাবার আগেই পোষা বন্দুকবাজদের দিয়ে এমন ভয়ও দেখাতে পরে যাতে তারা শেষ পর্যন্ত সাক্ষ্য দিতেই হয়ত গেল না। আর প্রমাণ না পাওয়া গেলে গঞ্জু বিনোদকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

অন্ধকারে চরাচর ঝাপসা হয়ে আছে। রাস্তার দু'ধারে ফাঁকা মাঠ। মাঝে মাঝে স্থির বিন্দুর মতো কিছু কিছু আলো দেখে বোঝা যায় ওখানে চাষাভুসোদের গাঁ। সেদিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কর মতো মহেশ্বরের কথায় 'হুঁ হাঁ' করে যাচ্ছিল সুমিত্রা। হঠাৎ ছত্তরপুরের লচ্ছুদের কথা মনে পড়ে যায় তার। দ্রুত মুখ ফিরিয়ে মহেশ্বরকে বলে, 'আপনার কি আজ নহরপুরায় এখনই ফিরতে হবে?'

সুমিত্রার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে বেশ অবাকই হন মহেশ্বর। বলেন, 'না। তেমন জরুরি কিছু নেই। কেন বলুন তো?'

'তা হলে চলুন একবার ছত্তরপুরো গা'টা ঘুরে যাই।'

'সেখানে কী?'

'আসল সাক্ষীরা তো সেখানেই রয়েছে।'

মহেশ্বর চকিত হয়ে ওঠেন, 'তারা কারা?'

সুমিত্রা তিহরলালের মুখে যা শুনেছিল তাই বলে। মুনিয়াকে যেদিন ধর্ষণ করে রাস্তায় ফেলে দিয়ে যাওয়া হয়, সেই রাতে ছত্তরপুরার তিনটি লোক ধনিয়া, পাওয়ান এবং লচ্ছু দেখেছিল ক'টা বদমাশ মেয়েটাকে একটা সফেদ গাড়িতে তুলে নিয়ে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে। শয়তানদের দলে বিনোদ ঝা ছিল। একমাত্র লচ্ছুই তাকে চিনতে পেরেছে। কাজেই তারা সাক্ষ্যটা সবচেয়ে দরকারি।

মহেশ্বর উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, 'নিশ্চয়ই। চলুন চলুন, ছত্তরপুরা ঘুরে যাই। ওদের, বিশেষ করে লচ্ছুকে আমাদের পেতেই হবে। সে গঞ্জু বিনোদকে বাঁচাতে পারে।'

এ অঞ্চলের গ্রামগুলো যেমন হয়, ছত্তরপুরা তার থেকে আলাদা কিছু নয়। গঞ্জু বিনোদদের গাঁ থেকে জায়গাটা মাইলখানেক দক্ষিণে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সুমিত্রারা তিন জন সেখানে পৌঁছে যায়।

গোটা গ্রাম জুড়েই কাচের লণ্ঠন বা হেরিকেন জ্বলছে। অনুজ্জ্বল ম্যাড়মেড়ে আলোয় দেখা যায়, প্রায় সব ঘরেই মেয়েরা রান্না বান্না করছে। প্রতিটি বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গায় চৌপায়া কী শতরঞ্চি বিছিয়ে বসে পুরুষেরা হাতের চেটোয় খৈনি ডলতে ডলতে কী কড়া তামাকের লম্বা লম্বা বিড়ি টানতে টানতে 'গপসপ' (গল্প সল্প) করছে। বাচ্চাকাচ্চরা মায়েদের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বা বসে। যারা একটু বড়, হুল্লোড় বাধিয়ে চারিদিকে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে।

সন্ধের পর দেহাতের লোকজনেরা বেশিক্ষণ জেগে থাকে না। সারাদিন 'গতরচূরণ' খাটুনির পর ক্লান্তিতে শরীর এমনিতেই ভেঙে আসে। পেটে কিছু পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ আর মেলে রাখতে পারে না, খেয়েই তারা শুয়ে পড়ে। তৎক্ষণাৎ ঘুম। ভোরে কাক ডাকার আগে সে ঘুম আর ভাঙে না।

সুমিত্রাদের দেখে সারা গাঁয়ে সাড়া পড়ে যায়। ছত্তরপুরার মাঝামাঝি জায়গায় দশ বারোটা পরাস গাছ গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। তিন চারজন টানাটানি করে দু'টো চারপায়া এনে বিজয়, সুমিত্রা আর মহেশ্বরকে বসায়। তিহরলাল সেখানে বসে না, একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। বিজয় ও সুমিত্রাকে এ গ্রামেরও সবাই চেনে, প্রচুর খাতিরদারিও করে থাকে। তিহরলালও তাদের পরিচিত, তবে মহেশ্বরকে না চিনলেও তিনি যে খুবই মান্যগণ্য মানুষ সেটা তাঁর চেহারা দেখে ছত্তরপুরাবাসীরা আন্দাজ করে নিয়েছে। তা ছাড়া, সুমিত্রা যখন সঙ্গে করে এনেছে তখন নিশ্চয়ই তিনি যথেষ্ট ওজনদার কেউ যে হবেন তাতে সন্দেহ নেই। মেয়েপুরুষ অনেকেই কাজকর্ম ফেলে পরাস গাছগুলোর তলায় সুমিত্রাদের ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়ায়। তাদের চোখেমুখে যতটা কৌতূহল, তার চেয়ে বেশি উৎকণ্ঠা। ছাত্রছাত্রী জোগাড় করার জন্য এই গাঁয়ে আগে বহুবার এসেছে সুমিত্রা কিন্তু ফি বারই দিনের বেলায়। হঠাৎ এই অসময়ে কেন এল, সেটা কেউ আপাতত বুঝে উঠতে পারছে না।

ছত্তরপুরার সবচেয়ে বয়স্ক মানুষটি হল ভালরাম, জাতে গাঙ্গোতা। গাঁয়ের লোকেরা তাকে যথেষ্ট মানে, তার কথায় ওঠে বসে। হাতজোড় করে সে সুমিত্রাকে বলে, 'জরুরত না হলে রাতে আমাদের গাঁওয়ে আসতেন না। হুকুম করুন দিদিজি, কী করতে হবে—'

সুমিত্রা এখানে আসার উদ্দেশ্যটা জানিয়ে দেয়।

ভালরাম তক্ষুনি ডেকে আনার জন্য তিনটে ছোকরাকে ধনিয়া, পাওয়ান আর লচ্ছুদের ঘরে পাঠিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পর দু'জন ফিরে এসে জানায়, ধনিয়া আর পাওয়ান গাঁয়ে নেই। সাহারসার কাছে এক ছোটো শহরে ধনিয়ার মাসির বাড়ি। মাসির মেয়ের বিয়ে, ধনিয়া সেখানে গেছে। পাওয়ান গেছে তার সসুরাল মণিহারিতে। শাশুড়ির যায় যায় অবস্থা। মারা গেলে একেবারে পুড়িয়ে ফিরবে। ওদের কারোই তিন চারদিনের ভেতর ফেরার আশা নেই। তবে তৃতীয় ছোকরাটি লচ্ছুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

লচ্ছুর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। রোগা পাকানো চেহারা, মাথায় রুক্ষ জটপাকানো চুল, ওগুলোর সঙ্গে তেল বা চিরুনির কোনোরকম সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। ভাঙা গালে কাঁচাপাকা খাপচা খাপচা দাড়ি।

ভালরাম লচ্ছুকে বলে, 'দিদিজিরা তোর সঙ্গে কথা বলতে এসেছে। মুনিয়াকে যেদিন গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় সেদিন কী কী দেখেছিলি বল। সোচবুঝ করে বলবি।'

লচ্ছু এক মুহূর্তও ভাবে না। বড় রাস্তার দিকে আঙুল বাড়িতে বলে, 'সেদিন রাতে টৌন থেকে ওহী সড়ক ধরে পাওয়ান, ধনিয়া আর আমি ফিরছিলাম। আচানক উলটা দিক থেকে একটা সফেদ মোটরিয়া বহুত তেজ চলে এল। তার ভিতর এক আওরত চিৎকার করছিল, 'বঁচাও—বঁচাও—' নজদিগ এসে গেলে এক জোয়ানে লড়কী গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়তে চাইছে, আর তিন চার হারামজাদ তাকে জাপটে ধরে রেখেছে। লড়কীটাকে চিনতে পারলাম, পিপরিয়া গাঁওয়ের মহাদেও দুসাদের মেয়ে। লেকিন আমরা কিছু করার আগেই গাড়িটা ঝট্‌সে বেরিয়ে গেল। ওদের রুখবার জন্যে আমরা পিছা নিয়ে দৌড়ে গেলাম, লেকিন মোটরিয়ার সঙ্গে দৌড়ে পারা যায়! গাড়িটা আন্ধেরায় কোন দিকে যে গেল, আর দেখতেই পেলাম না।'

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'যে বদমাশেরা গাড়ির ভেতর ছিল তাদের চিনতে পেরেছিলে?'

'একজনকে ছাড়া আর কাউকে পারিনি দিদিজি—'

'সেই একজনটা কে?'

'ভূচ্চরকা ছৌরা ওহী বিনোদ ঝা—নহরপুরার বড়ে ঠিকেদার মুনীশ্বর ঝা'কা লেড়কা। শালে লম্বরী হারামজাদ—' বলতে বলতে লচ্ছুর চোখ থেকে ঘৃণায় এবং রাগে আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছিল যেন।

সুমিত্রা একদৃষ্টে লচ্ছুর দিকে তাকিয়ে ছিল। বলে, 'তুমি ঠিক দেখেছিলে তো? অন্ধকারে ভুল হয়ে যায়নি?'

তার দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে সুমিত্রার সংশয়ে একটু তেতেই ওঠে লচ্ছু। বলে, 'দিদিজি, আমার আঁখের তেজ বিল্লির মতো। আন্ধেরাতেও আধ 'মিল' দূরের জিনিস দেখতে পাই। ও কুত্তা বিনোদ ঝা। ভগোয়ান রামজি কসম, বিনোদ ঝা ছাড়া আর কেউ না।'

এতক্ষণ একটি কথাও বলেননি মহেশ্বর। এবার আস্তে আস্তে বলেন, 'মুনিয়া কীভাবে মারা গেছে, নিশ্চয়ই তুমি শুনেছ।'

লচ্ছু জোরে জোরে মাথা নাড়ে—অবশ্যই শুনেছে।

'এর জন্যে কে দায়ী বলে তোমার মনে হয়?'

'কে আবার, ওহী জানবর বিনোদ ঝা। কত লড়কীর ইজ্জৎ লুটেছে—'

'ওর সাজা হয়, এটা তুমি চাও?'

লণ্ঠনের মলিন আলোয় দেখা গেল, লচ্ছুর চোখদু'টো জ্বলছে। মুখ পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠেছে, হাতের মুঠি দু'টো পাকিয়ে যাচ্ছে। হিংস্র গলায় সে বলে, 'ভূচ্চরটাকে ফাঁসিতে ঝোলানো দরকার। সেদিন যদি ধরতে পারতাম, ওর গলার নলিয়া ছিঁড়ে ফেলতাম। এত্তে আচ্ছা লড়কী মুনিয়া—' বলতে বলতে চুপ করে যায় লচ্ছু। মুনিয়াকে সেদিন সে যে রক্ষা করতে পারেনি, এটা যেন তার ব্যক্তিগত পরাজয়।

মহেশ্বর বলেন, 'ফাঁসি তো আর মুখের কথায় হয় না লচ্ছু। তার জন্যে কানুন রয়েছে, আদালত রয়েছে। জজসাহেবের কাছে মুনিয়ার মামলা তুলতে হবে। তিনি সবার কথা শুনে, ঠিকমতো প্রমাণ পেলে তবেই ফাঁসির সাজা দেবেন।

আইন-আদালতের ব্যাপারে লচ্ছুর মোটামুটি ধারণা আছে। সে বলে, 'জানি, জজ-ম্যাজিস্টর হুকুম না দিলে কাউকে ফাঁসিতে চড়ানো হয় না।'

'যাতে ফাঁসির হুকুম দেন তার জন্যে তোমাকে খুব দরকার।'

'বলুন আমাকে কী করতে হবে—'

'আদালতে মামলা উঠলে তোমাকে সাক্ষি দিতে হবে। মোটরে তুলে মুনিয়াকে জোর করে যখন তুলে নিয়ে যায়, তুমি ছাড়া আর কেউ বিনোদ ঝাঁকে চিনতে পারেনি। তোমার একার সাক্ষির জোরে ওর কড়া সাজা হয়ে যাবে। কী, রাজি?'

আদালতে তার মতো গরিবের চেয়ে গরিব, আনপড় অচ্ছুতের সাক্ষি যে এত মূল্যবান, ভাবতে পারেনি লচ্ছু। লাখ লাখ টাকার মালিক মুনীশ্বর ঝা'র হারামজাদা লম্পট ছেলের জীবন মৃত্যু তার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করছে, এটা শোনার পর রীতিমতো উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে সে। বলে, 'হাঁ, জরুর।'

'শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যাবে না তো?'

'কভ্‌ভী নেহী হুজৌর। বিনোদ ঝা'র সাজা না হলে আমার আত্মার শান্তি হবে না।'

সুমিত্রারা আর বসে না। পাওয়ান আর ধনিয়া ফিরে এলে তার কাছে ওদের পাঠিয়ে দেবার কথা বলে উঠে পড়ে।

তেরো

ছত্তরপুরা গাঁও পেছনে ফেলে বিজয়, মহেশ্বর আর সুমিত্রা পাকা সড়ক ধরে নহরপুরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তিহরলালও তাদের পেছন পেছন চলেছে।

মাইলখানেক হাঁটার পর একটা মোড়ের মাথায় রাস্তাটা দু' ভাগ হয়ে বাঁয়ে পিপরিয়া আর ডাইনে নহরপুরার দিকে গেছে। সেখানে এসে সুমিত্রা তিহরলালকে বলে, 'তুমি আর আমাদের সঙ্গে গিয়ে কী করবে? অনেক রাত হয়েছে, গাঁয়ে ফিরে যাও।'

তিহরলাল বলে, 'যাচ্ছি। কাল আপনার কোয়াটারে গিয়ে দেখা করব কি?'

'আসতে পার।'

'লচ্ছু তো গাওয়া (সাক্ষি) দিতে রাজি হয়েছে। কাজ কিছু হবে?'

'দেখা যাক।'

তিহরলাল আর কিছু বলে না, বাঁ ধারের রাস্তা ধরে পিপরিয়ার দিকে চলে যায়। আর সুমিত্রারা যায় ডান পাশের রাস্তায়। এই সড়কটা অনেক ঘুরে নহরপুরায় পৌঁছেছে। ঘুরপথে না গিয়ে খানিক এগিয়ে ওরা ফাঁকা মাঠে নেমে পড়ে।

আকাশে এর মধ্যে চাঁদ উঠে গেছে। এ অঞ্চলের পথঘাট মাঠ-প্রান্তর সব মুখস্ত সুমিত্রাদের। ফিকে জ্যোৎস্নায় জমির আলের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে তাদের অসুবিধে হচ্ছিল না।

চলতে চলতে সুমিত্রা বলে, 'এখন আমাদের সামনে দু'টো কাজ।'

মহেশ্বরও এই কথা ভাবছিলেন। আস্তে মাথা নেড়ে বলেন, 'হ্যাঁ। এক জামিনে গঞ্জু বিনোদ বার করে আনতে হবে, সেই সঙ্গে বিনোদকে ঝা'র এগেনস্টে একটা কেসের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'হ্যাঁ। দু'টোই ইমিডিয়েটলি করা দরকার। আপনার কে একজন উকিল বন্ধুর কথা বলছিলেন—'

'শক্তিনাথ সিং পূর্ণিয়ার নাম-করা ক্রিমিনাল ল'ইয়ার। কাল সকালে চিঠি দিয়ে ওর কাছে লোক পাঠাব। একসঙ্গে আমরা পাটনায় কলেজে পড়েছি। আশা করি আমার চিঠি পেলে চলে আসবে।'

'উনি না আসা পর্যন্ত আমরা কী করব? থানায় বিনোদ ঝা'র নামে ডায়েরি লেখাব?'

কিছুক্ষণ ভেবে মহেশ্বর বলেন, 'আমার মনে হয়, শক্তিনাথের সঙ্গে কথা না বলে কিছু করা উচিত হবে না। আইন কানুনের অনেক মারপ্যাঁচ রয়েছে, আমাদের পক্ষে সেসব জানা তো সম্ভব নয়। তারপর মুনীশ্বর ঝা'র মতো ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পয়সওলা পাওয়ারফুল লোকের কথাটাও মাথায় রাখতে হবে।'

সুমিত্রা বুঝতে পারছিল, ঝোঁকের মাথায় বা আবেগের বশে হুট করে কিছু করতে চান না মহেশ্বর, রীতিমতো আটঘাট বেঁধে খুব সতর্ক ভঙ্গিতে এগুতে চান।

মহেশ্বর বলেন, 'আমি কাগজের লোক, জার্নালিস্ট। আমার পক্ষে ডাইরেক্টলি এই কেসের সঙ্গে

জড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়, তবে পেছন থেকে সবরকম সাহায্য করব। সুমিত্রাজি, বাঘের সঙ্গে লড়তে চলেছেন, সবসময় হুঁশিয়ার থাকবেন।'

সুমিত্রা বলে, 'সে তো বটেই। তবে আমি কোনোভাবেই পিছিয়ে যেতে রাজি নই। লাস্ট রাউন্ড পর্যন্ত আমি দেখব।'

এই ভদ্র, বিনয়ী কিন্তু অসীমসাহসী জেদি তরুণীটি সম্পর্কে আগে থেকেই যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল মহেশ্বরের, এখন সেটা আরও বেড়ে যায়। আবছা অন্ধকারে সসম্ভ্রমে তার দিকে একবার তাকান তিনি।

শক্তিনাথ সিং কিন্তু পরদিন এলেন না। দু'তিনটে জটিল মার্ডার কেসের ডেট পড়েছে এ সপ্তাহের গোড়ায়। ক'টা অতি ঘাঘী সাক্ষীকে জেরা করে করে শিরদাঁড়া দুমড়ে ফেলতে হবে, কেননা এই জেরার ওপরই তাঁর মক্কেল জেলে গিয়ে জাঁতা ঘোরাবে, না বেকসুর খালাস পাবে—নির্ভর করছে। ক্রস একজামিনেশনটা হয়ে গেলেই তিনি নহরপুরায় চলে আসবেন। যে লোকটা মহেশ্বরের চিঠি নিয়ে গিয়েছিল তার হাতেই উত্তর লিখে পাঠিয়ে দিয়েছেন শক্তিনাথ। মহেশ্বর সুমিত্রার স্কুলে এসে ছুটির আগে আগে এই খবরটা দিয়ে গেছেন।

শক্তিনাথ আসেননি, কিন্তু সন্ধেবেলা মণিহারি থেকে রঘুপতি মিশ্র এলেন। রঘুপতি সুমিত্রার বাবা। ক'দিন আগে সুমিত্রা তাঁকে চিঠি লিখেছিল, সেটা পেয়েই তিনি ছুটে এসেছেন। তবে একাই, সঙ্গে স্ত্রী অর্থাৎ হেমবতীকে আনেননি।

রঘুপতির বয়স বাহাত্তর তিয়াত্তর। কিশোর বয়সেই দেশের মুক্তি আন্দোলনে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। জীবনের সেরা সময়টা তাঁর জেলে জেলেই কেটে গেছে। সাতচল্লিশের পর আরও অনেক স্বাধীনতা-সংগ্রামীর সঙ্গে কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন বটে, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর মোহভঙ্গ ঘটে গেল। গ্লানি ও মালিন্যহীন যে উজ্জ্বল ভারতের স্বপ্ন তিনি আর তাঁর সহযোদ্ধারা দেখেছিলেন এবং তার জন্য আত্মত্যাগের সংকল্প নিয়েছিলেন তার সঙ্গে স্বাধীন ভারতের কোনো মিল নেই। দেশটা রাতারাতি বদলে যেতে শুরু করেছিল। পোস্ট ইন্ডিপেনডেন্স পেট্রিয়টস নামে নতুন একদল দেশপ্রেমীর সৃষ্টি হল। দেশের জন্য এই প্রজাতিটির এক কানাকড়িও ত্যাগ নেই। বিবেক, সততা, আদর্শ, মানবিক মূল্যবোধ ইত্যাদি ব্যাপারগুলোকে তারা গলাধাক্কা দিতে দিতে দেশের সীমানা পার করে দিয়েছে। এদের রয়েছে প্রচুর মানি আর মাসল পাওয়ার। জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল, টাকা আর বন্দুকের জোরে ক্ষমতা দখল করা বা টিকে থাকা। যেভাবেই হোক এম. এল. এ, এম. পি বা মন্ত্রী হতেই হবে। ক্ষমতার কেন্দ্রে বছর পাঁচেক কাটানো মানেই টাকার পাহাড়ের মাথায় চড়ে বসা। অসৎ ধান্দাবাজ বিজনেসম্যানদের পারমিট বা লাইসেন্স পাইয়ে দিয়ে, প্রোমোটার-ডেভলাপারদের তাবত বেআইনি কাজে মদত দিয়ে, এসবের বিনিময়ে ঘুষ নামে যে বস্তুটি ব্রিফকেস বোঝাই হয়ে চোরাপথে ঘরে এসে জমা হয় তা দিয়ে নিজেরা তো বটেই, পরবর্তী চোদ্দপুরুষ রাজা মহারাজার স্টাইলে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। তার ওপর উঠতে বসতে চলতে ফিরতে পুলিশের স্যালুট, সভায় গেলে মালা—এসব তো আছেই। সারাক্ষণ অনুগ্রহপ্রার্থীরা মাছির মতো ভন ভন করে। তারা যে ক্ষমতাবান এটা তার প্রমাণ। চারপাশে জনতার ভিড় এদের দম্ভ এবং আত্মতৃপ্তি ক্রমাগত বাড়িয়েই চলেছে। মন্ত্রী হতে পারলে তো কথাই নেই, কোথাও বেরুলে সঙ্গে আর্মড গার্ড, হুটার-বাজানো গাড়ি।

যেদিকেই তাকানো যাকগে শুধু ভ্রষ্টাচার আর ভ্রষ্টাচার। দেখতে দেখতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন রঘুপতি। নিজেকে চারিদিক থেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। গভর্নমেন্ট তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামীর তাম্রপত্র আর পেনশন দিতে চেয়েছিল, তিনি নেননি। পৈতৃক কিছু জমিজমা ছিল, তাতে ভালো ধান এবং আখ হয়, তার আয়েই সংসার চলে। তাছাড়া তাঁর স্ত্রী একসময় সরকারি স্কুলে পড়াতেন, রিটায়ারমেন্টের পর প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি মিলিয়ে কিছু টাকা পেয়েছিলেন, সেগুলো ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করা আছে, সেখান থেকে মাসে মাসে কিছু ইন্টারেস্ট পান। দুই মেয়ে তাঁর। বড় মেয়েব

বিয়ে হয়ে গেছে, জামাই লাইফ ইন্সিওরেন্সের বড় অফিসার। ওরা আপাতত আছে কলকাতায়, শিগগিরই ট্রান্সফার হয়ে এলাহাবাদ যাবার কথা। সুমিত্রা তাঁর ছোটো মেয়ে।

রঘুপতির যথেষ্ট বয়স হলেও বেশ মজবুত স্বাস্থ্য। চুল তেমন পাকেনি, গায়ের রং এখনও স্বর্ণাভ, অবশ্য চামড়া বেশ কুঁচকে গিয়েছে। শিরদাঁড়া টান টান, হাঁটেন লম্বা লম্বা পা ফেলে, অবিকল টগবগে যুবকদের মতো। মণিহারিতে ধাঙড়, গাঙ্গোতা, দুসাদ—এমনি পিছড়ে বর্গের ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা স্কুল খুলেছেন। রঘুপতি তার জন্য একটা পয়সাও নেন না। শেষ জীবনে এটাই তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।

সুমিত্রা আজ আর বেরোয়নি, স্কুল ছুটির পর নিজের কোয়ার্টারে এসে চা'টা খেয়ে খাটের ওপর শুয়ে শুয়ে রাহুল সংকৃত্যায়নের একটা বই পড়ছিল। লখিয়া তাদের ঘরে খুটখাট করে কী যেন করছিল। তবে রামবনবাস নেই, সে বাজারে আটা-চাল-ডাল কিনতে গেছে।

সদর দরজায় খিল লাগানো ছিল। বাইরে থেকে রঘুপতির গলা শুনে ধড়মড় করে উঠে পড়ে সুমিত্রা, হাতের বইটা বিছানায় রেখে দৌড়ে গিয়ে দরজা খোলে। রঘুপতি ভেতরে ঢুকতেই নিচু হয়ে প্রণাম করে তাঁর হাত থেকে বড় চামড়ার সুটকেসটা নিয়ে নেয়।

এদিকে লখিয়াও বেরিয়ে এসেছিল। রঘুপতিকে সে চেনে, বেশ কয়েক বার তিনি এখানে এসেছেন। সেবার যখন সুমিত্রার টাইফয়েড হল তখন তো প্রায় মাসখানেক থেকে গিয়েছিলেন। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে রঘুপতিকে প্রণাম সেরে সুমিত্রার হাত থেকে দ্রুত সুটকেসটা নিয়ে ওর ঘরে গিয়ে রাখে।

সুমিত্রা বলে, 'এসো বাবুজি—'

মেয়ের সঙ্গে ঘরের দিকে যেতে যেতে রঘুপতি বলেন, 'আমাকে দেখে খুব অবাক হয়ে গেছিস, তাই না রে গুড়িয়া?' সুমিত্রার আদরের নাম গুড়িয়া।

'না। জানতাম আমার চিঠি পেলেই তুমি চলে আসবে।'

'কাল তোর চিঠি পেয়েছি। ভাবলাম দেরি করা ঠিক হবে না। আজ ভোরের ট্রেন ধরে চলে এলাম। তোর মাকে ইচ্ছে করেই আনিনি।'

রঘুপতি কী ইঙ্গিত দিলেন, বুঝতে অসুবিধা হয় না সুমিত্রার। সে উত্তর দেয় না।

রঘুপতি এবার বলেন, 'তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।'

সুমিত্রা বলে, 'ওসব পরে হবে। এতটা ট্রেন জার্নি করে এসেছ। আগে জিরোও, খাওয়া দাওয়া কর—'

ঘরে এসে রঘুপতি একটা চেয়ারে বসেন। সুমিত্রার একটা টেবল ফ্যান আছে, কিন্তু ফাল্গুনের শেষাশেষি এই সময়টা অন্য দিনের মতো আজও জোর হাওয়া ছেড়েছে, ফাঁকা মাঠের দিক থেকে স্রোতের মতো বয়ে আসছে দক্ষিণা বাতাস। এমনিতে ফ্যানের দরকার হয় না, তবে রঘুপতি খুবই শ্রান্ত। মণিহারি থেকে সোজাসুজি তো এখানে আসা যায় না, পূর্ণিয়া পর্যন্ত ট্রেনে এসে আবার বাস ধরতে হয়েছে। এ-অঞ্চলের মান্ধাতার আমলের বাসগুলোর যা হাল, ঝাঁকুনিতে শরীরে আর কিছু থাকে না। সন্ধের পর থেকে দিনের উত্তাপ জুড়িয়ে আসে ঠিকই, কিন্তু দুপুর বেলায় ঝাঁ ঝাঁ রোদ, বৈশাখ পড়ার আগেই লু বইতে শুরু করেছে। রঘুপতিকে দেখে বোঝা যায় ভীষণ শ্রান্ত, ঘামে জামা এখনও ভিজে আছে। সুমিত্রা বলে, 'বাবুজি, ফ্যানটা চালিয়ে দেব?'

রঘুপতি বলেন, 'দরকার নেই, বেশ হাওয়া আছে।'

'তুমি বোসো, আমি চা করি।'

বাইরের বারান্দায় লখিয়া দাঁড়িয়ে ছিল। সে আস্তে করে ডাকে, 'দিদিজি—' সুমিত্রা বেরিয়ে এলে জিজ্ঞেস করে, 'চা আমি করে দিচ্ছি। দাদাজি রাত্তিরে তো ভাত খান, সেটা আপনি বসিয়ে দিন।'

রঘুপতি জাতপাত বা ছুঁয়াছুত মানেন না, সবার ছোঁয়াই খান। কিন্তু আগে যখন তিনি এসেছেন চা ছাড়া আর কিছুই করে দেয়নি লখিয়া। সুমিত্রা ছাড়া আর কোনো ব্রাহ্মণকে নিজের হাতে রসুই করে সে কোনোভাবেই খাওয়াতে পারবে না, আজন্মের সংস্কার কাটিয়ে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুমিত্রার কথা আলাদা, তার জেদের কাছে তাকে মাথা নোয়াতে হয়েছে।

সুমিত্রা বলে, 'বহেনজি, আমার ঘর থেকে স্টোভটা বার করে নিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দাও। আমি চাল টাল ধুয়ে রসুইয়ের জোগাড় করি।'

'ঘরে আনাজ নেই, ক'টা আলু পড়ে আছে। দাদাজির ভোজন তো ভালো হবে না দিদিজি।'

এই সময় রামবনবাস ফিরে আসে। রঘুপতিকে দেখে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে। তাঁকে একটা প্রণাম করে রাতে দাদাজির খাওয়ার জন্য কী ব্যবস্থা হচ্ছে সুমিত্রা এবং লখিয়াকে জিজ্ঞেস করে। যখন জানতে পারে ঘরে তেমন কিছু নেই, তৎক্ষণাৎ সুমিত্রার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বেরিয়ে যায়। রঘুপতি ঘরে বসে ওদের কথা শুনতে পাচ্ছিলেন, রামবনবাসকে আটকাবার খুবই চেষ্টা করেন, একটা রাত ভাতে ভাত খেলে কিছু অসুবিধা হবে না, কিন্তু কে কার কথা শোনে!

রঘুপতি নিরামিষ খান। নহরপুরায় রাতে বাজার বসে না, কিন্তু আধ ঘণ্টার ভেতর কোত্থেকে যেন ভাল বেগুন, কড়াইশুঁটি, পটল, মুলো আর ভালো এক ছড়া কলা এনে হাজির করে রামবনবাস।

অল্প সময়ের মধ্যে বেশ ক'টি পদ রেঁধে ফেলে সুমিত্রা। বাসমতী চালের ভাত, বেগুন ভাজা, অড়হরের ডাল, আলু-কড়াইশুঁটির তরকারি তা ছাড়া দুধ আর কলা তো আছেই।

এদিকে রঘুপতি খানিকক্ষণ জিরিয়ে শুধু এক কাপ চা খেয়েছেন। তারপর রসুইয়ের ফাঁকে কুয়োতলা থেকে স্নান করে এসে জামাকাপড় পালটে নিয়েছেন।

চারজনের মতো রেঁধেছে সুমিত্রা। রঘুপতিকে খাইয়ে রামবনবাসদের ভাত তরকারি তাদের ঘরে দিয়ে এসে নিজে খেয়ে নেয়। লখিয়া এসে এঁটো বাসন তুলে নিয়ে ঘর মুছে দিলে রঘুপতির জন্য তক্তপোসে বিছানা করে দেয়, তারপর মেঝেতে শতরঞ্চি বিছিয়ে বিছানা পাতে।

এখনও খুব একটা রাত হয়নি, কিন্তু নহরপুরা তো কলকাতা বম্বে নয়, এর মধ্যেই চারিদিক ঘুমে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে।

সুমিত্রার স্কুল আর তার কোয়ার্টারটা শহরের একেবারে শেষ মাথায়। ফলে এদিকটা আরও নিঝুম হয়ে গেছে।

হোলির আর বেশি দেরি নেই। পূর্ণিমার চাঁদ ক্রমশ তার পূর্ণ মহিমায় ফুটে উঠতে শুরু করেছে। গলানো রুপোর ঢল নেমেছে চারিদিকে, ভেসে যাচ্ছে মাঠঘাট শস্যক্ষেত্র। জানালার বাইরে সমস্ত চরাচর অলৌকিক স্বপ্নের মতো মনে হয়।

খাওয়ার পর এখন একটা বালিশ কোলে নিয়ে রঘুপতি তক্তপোশে বসে আছেন। তক্তপোশেরই আরেক প্রান্তে বাবার দিকে মুখ করে বসেছে সুমিত্রা। বুকের ভেতর এক ধরনের চাপা উৎকণ্ঠা বোধ করছে সে। চিঠি পাওয়ার পর তাদের বাড়িতে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা জানার জন্য সে অস্থির হয়ে উঠেছে। সুমিত্রা চাপা স্বভাবের অন্তর্মুখী মেয়ে। বাইরে থেকে ভেতরের চাঞ্চল্য বোঝা যায় না। বাবা যে খুব একটা অসন্তুষ্ট বা ক্ষুব্ধ হননি সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে। যদি তাই হতেন, কখনই নহরপুরায় আসতেন না।

রঘুপতি ইতস্তত করছিলেন। কীভাবে শুরু করবেন, মনে মনে হয়তো গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। একসময় মনস্থির করে বলেন, 'তোর চিঠিতে দু'টো পয়েন্ট আছে। আগে মুনিয়ার ব্যাপারটা বলি। তুই রাইট ডিশিসন নিয়েছিস। ওই বদমাশ বিনোদ ঝা'কে কিছুতেই ছাড়া উচিত নয়। ওর যাতে কড়া সাজা হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে—'

সুমিত্রা উন্মুখ হয়ে ছিল। জিজ্ঞেস করে, 'তবে কী?'

রঘুপতি সেই পুরোনো কথাটাই বলেন, 'বিনোদের বাবা পয়সাওলা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক, গুন্ডা টুন্ডাও তার হাতে প্রচুর। কাজেই খুব সতর্ক হয়ে এগুতে হবে।'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়ে সুমিত্রা।

এবার তাঁক মেয়ে মুনিয়ার কেসটা নিয়ে কীভাবে কতদূর এগিয়েছে, জানতে চান রঘুপতি।

আজ পর্যন্ত যা যা করেছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে যায় সুমিত্রা। সব শোনার পর রঘুপতি জানান, সঠিক পথেই চলেছে তারা।

সুমিত্রা বলে, 'এখন অনেকটাই নির্ভর করছে লচ্ছু, ধনিয়া আর পাওয়ানের সাক্ষির ওপর।'

'হ্যাঁ।' রঘুপতি চিন্তিতভাবে বলেন, 'মুনীশ্বর ঝা'র মতো লোকেরা ভীষণ ডেঞ্জারাস হয়। ছেলের পানিশমেন্ট হোক, লোকে তাদের নামে থুতু ছেটাক, তা কি সে মেনে নেবে? আমি বলি কি, কিছুদিন এখানে থেকে যাই।'

রঘুপতিকে মুনিয়ার কেসটায় জড়াতে চায় না সুমিত্রা। যথেষ্ট বয়স হয়েছে তাঁর। তা ছাড়া, নিজেকে নানা দিক থেকে সরিয়ে নিয়েছেন, এখন রঘুপতির সব উদ্যম এবং উৎসাহ শুধু তাঁর স্কুলটাকে নিয়ে। সুমিত্রা হেসে বলে, 'তুমি এখানে থাকলে তোমার স্কুলের কী হবে? কে পড়াবে তোমার স্টুডেন্টদের?'

'ক'দিন ওদের কাছ থেকে ছুটি চেয়ে নিয়েছি।' রঘুপতি বলেন, 'তোর এদিকটা একটু গুছিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরব।'

'তুমি এখানে থাকলে মাকে কে দেখবে?'

কিছুদিন ধরেই সুমিত্রার মা হেমবতী খুব অসুস্থ। হার্টের অসুখ ধরা পড়েছে। রঘুপতি বলেন, 'তার ব্যবস্থা করে এসেছি। তোর পিসি এসেছে পাটনা থেকে। মাসখানেক থাকবে। সে-ই দেখাশোনা করবে। তা ছাড়া, পুনিয়ার মা আর হরঘড়ি তো আছেই। কোনো অসুবিধা হবে না।'

সুমিত্রার পিসি সুশীলা থাকেন পাটনায় তাঁর ছেলেদের কাছে। বয়স পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন। বছর তিনেক আগে স্বামীকে হারিয়েছেন। হাসিখুশি, স্নেহপ্রবণ মানুষ। এই হোলির সময়টা বড় ভাই অর্থাৎ রঘুপতিদের কাছে এসে মাসখানেক কাটিয়ে যান। পুনিয়ার মা আর হরঘড়ি বহুকাল সুমিত্রাদের বাড়িতে আছে। পুনিয়ার মায়ের আসল নাম কী, কারো তো মনে নেই, খুব সম্ভব সে নিজেও ভুলে গেছে। বয়স ষাটের ওপারে। সতেরো বছর বয়স থেকেই সে বিধবা। স্বামী মরার আগে তার একটা বাচ্চা হয়েছিল, কে যেন আদর করে শিশুটিকে পুনিয়া বলে ডেকেছিল কিন্তু সে ছিল বড়ই স্বল্পায়ু, পৃথিবীর আলো সাতদিনের বেশি সে দেখতে পায়নি। বাচ্চাটা মরে গেলেও তার মাকে চিরকালের মতো পুনিয়ার মা নামে অবিস্মরণীয় করে রেখে গেছে। হরঘড়ি সুমিত্রাদের মোটা কাজের লোক, অতীব কর্মঠ। সারাক্ষণ চরকির মতো ঘুরছে। ঘর ধোয়া মোছা, কুয়ো থেকে জল তোলা, লকড়ি ফাড়া, ইত্যাদি যাবতীয় শক্ত শক্ত কাজ হাসি মুখে করে যায়। বয়স ষাটের কাছাকাছি, পেটানো স্বাস্থ্য, ছোট ছোটো করে ছাঁটা চুল, দুই কানে চাঁদির মাকড়ি, খৈনিতে কালচে হয়ে যাওয়া দাঁত—এই হল হরঘড়ি। শীতগ্রীষ্ম বারোমাস তার মুখে সারাক্ষণ একই গান। বাঁশ-চেরা বেসুরো গলায় সারা বাড়ি মাথায় তুলে সে গেয়ে যায় 'হোলি আয়া হো লহেরিকা বহিনিয়া'—যৌবনের গোড়ায় কোন এক লহেরির বোনের সঙ্গে তার কিছু পেয়ার-মহব্বত হয়ে থাকবে, কিন্তু তার পরিণাম সুখকর হয়নি। প্রেমের তুষানল হরঘড়ির বুকের ভেতর ধিকি ধিকি এখনও বুঝি বা জ্বলে যাচ্ছে। আমৃত্যু সেই বিরহ গানের ভেতর দিয়ে জানিয়ে যাবে হরঘড়ি। প্রথম প্রথম এ নিয়ে সবাই হাসাহাসি করত, এখন ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে।

হরঘড়ি এবং পুনিয়ার মা অত্যন্ত বিশ্বাসী। প্রাণ দিয়ে তারা বাড়ির সবাইকে আগলে রাখে। তার ওপর সুশীলা তো আছেনই। মায়ের যত্নের যে কোনো ত্রুটি হবে না সে সম্বন্ধে সুমিত্রা একেবারে নিশ্চিন্ত। তবু সে বলে, 'তোমার যতদিন ইচ্ছে এখানে থাক। তবে বিনোদ ঝা'র ব্যাপারটা আপাতত আমিই দেখি। তুমি তো মাথার ওপর আছই। যদি অসুবিধা হয় তখন তোমাকেই দায়িত্ব নিতে হবে।'

নিজের এই মেয়েটিকে খুব ভালো করেই চেনেন রঘুপতি। বাইরে থেকে মনে হয় খুবই নম্র, বিনয়ী, শান্ত কিন্তু ভেতরে ভেতরে প্রচন্ড জেদী, প্রবল আত্মবিশ্বাস তার। একটা কিছু করবে বলে ঠিক করলে সেখান থেকে তাকে টলানো অসম্ভব। একটু চিন্তা করে রঘুপতি বলেন, 'কিন্তু—'

বাবুজির দ্বিধার কারণটা আন্দাজ করতে পারছিল সুমিত্রা। মুনীশ্বর ঝা'র মতো দুর্ধর্ষ শক্তিমান প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সে কতটা কী করে উঠতে পারবে, রঘুপতির দুশ্চিন্তাটা তাই নিয়ে। সুমিত্রা অল্প হেসে বলে, 'আমি দুঃসাহসী ফ্রিডম-ফাইটার রঘুপতি মিশ্রের মেয়ে। আমার ওপর তুমি একটু আস্থা রাখো বাবুজি।'

রঘুপতি হেসে বলেন, 'ঠিক আছে ঠিক আছে, আস্থা রাখলাম। তাহলে এখন আর আমি নহরপুরায় বেশিদিন থাকছি না, পরশু বাড়ি ফিরে যাব।'

'পরশু যেতে হবে না, ক'দিন থেকে যাও।'

'হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে কী করব? অকারণে স্কুলটা বন্ধ রাখার মানে হয় না।'

'না না—' আবদারের গলায় সুমিত্রা বলে, 'চলেই যখন এসেছে, এক সপ্তাহের আগে তোমাকে ছাড়ছি না।'

রঘুপতি সস্নেহে বলেন, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'

সুমিত্রা এবার বলে, 'তোমার স্কুল কেমন চলছে, বাবুজি?'

স্বাধীনতার পর নিজের বাড়িঘর, দুই মেয়ে, এবং স্ত্রীকে নিয়ে যে জীবন সেই বৃত্তের বাইরে একটা মাত্র বিষয় যার কথা উঠলে রঘুপতি খুব আন্তরিকভাবেই সতেজ আর উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। শেষ বয়সে দেশের একজন সৎ নাগরিক হিসেবে তাঁর কাছে বেঁচে থাকার এটা একটা বড় আশ্রয় বা সান্ত্বনা। উদ্দীপ্ত মুখে বলেন, 'চমৎকার। হরদেও নাপিতের দু'টো ছেলে—ভুনিয়া আর খইটা, লাখপতি ঝাড়ুদারের মেয়ে থিরুয়া—এমন দশ বারোটা ছেলেমেয়ে আছে, এক কথায় ওরা ব্রিলিয়ান্ট। যদি সুযোগ পায়, অনেক উঁচুতে উঠবে।'

'সুযোগ করে দাও।'

'আমি আর কতটা কী করতে পারব বল। আমি তো আর এম. এল. এ, এম পি কি মন্ত্রী টন্ত্রী নই। তা ছাড়া আর ক'দিনই বা বাঁচব!'

'না না বাবুজি, তোমাকে কিছু একটা করতেই হবে। অপরচুনিটি না পেলে ওদের সব উৎসাহ নষ্ট হয়ে যাবে। ওদের হাল দেখে অন্য কেউ আর পড়াশোনা করতে এগিয়ে আসবে না।'

কিছুক্ষণ ভেবে রঘুপতি বলেন, 'যাক আর কিছুদিন। তারপর পাটনায় এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দেখা করব।'

সুমিত্রা বলে, 'খুব ভালো। তুমি বললে কেউ না বলবে না। নিশ্চয়ই ছেলেমেয়েগুলোর জন্য ভালো একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' আসলে রঘুপতি যে মহান উদ্যোগটা নিয়েছেন সেটা আপাতত ছোটো আকারে থাকলেও তার অসীম সম্ভাবনা। উদ্যোগটা নষ্ট হয়ে যাক, কোনোভাবেই তা চায় না সুমিত্রা।

রঘুপতি বলেন, 'দেখা যাক।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

চাঁদির থালার মতো গোলাকার চাঁদ অফুরান জ্যোৎস্না ঢেলে যাচ্ছিল। রামবনবাসদের ঘর থেকে অস্পষ্ট গুনগুনানি ভেসে আসেছে। রামবনবাস খানিকটা লেখাপড়া জানে, এই সময়টা একান্ত ভক্তিভরে সে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ে আনপড় লখিয়াকে শোনায়।

এক সময় রঘুপতি বলেন, 'এবার দু'নম্বর পয়েন্টটা নিয়ে ডিসকাস করা যাক, কী বলিস গুড়িয়া?' বলে মজার চোখে মেয়ের দিকে তাকান।

রঘুপতি এমনিতে গম্ভীর ধরনের, কিন্তু তাঁর মধ্যে একটি সরল কৌতুকপ্রবণ মানুষ রয়েছে। দুই মেয়ের সঙ্গেই তাঁর আচরণ বন্ধুর মতো। তারা বড় হওয়ার পর প্রায় সব বিষয়েই খোলামেলা আলোচনা করেন। তাঁর স্বভাবে কোথাও রাখঢাক বা গোপনীয়তা নেই।

বাবুজি কী ইঙ্গিত দিয়েছেন, বুঝতে পারছিল সুমিত্রা। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। মুখ নামিয়ে বলে, 'মাকে কি তুমি সব জানিয়েছ?' রঘুপতি বলেন,' 'মা যখন, জানাতে তো হবেই। তাকে বাদ দিয়ে কিছু হওয়া সম্ভব নয়।'

মা যে বিজয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কটা একেবারেই পছন্দ করবেন না সেটা ভালো করেই জানে সুমিত্রা। কিন্তু তার চেয়েও বেশি ভয় পিসিমাকে। পিসিমা অর্থাৎ সুশীলা তাকে যে স্নেহ করেন না তা নয়, যথেষ্টই করেন। সুশীলা এবং হেমবতী দু'জনেই পুরনোপন্থী আর স্থিতাবস্থায় বিশ্বাসী। আবহমান যা চলে আসছে তার এক চুল পরিবর্তন ঘটুক তা একেবারেই চান না ওঁরা। বিশেষ করে শাক্যদ্বীপি ব্রাহ্মণ কুমারীর সঙ্গে অচ্ছুৎ আর খ্রিস্টানের বিয়ে হবে, তাঁদের কাছে এ একেবারে অকল্পনীয়। পৃথিবীর আচমকা রসাতলে তলিয়ে যাবার মতো দুর্ঘটনা। হেমবতী আঘাত পেলে কিংবা

কোনো কিছু তাঁর মনঃপূত না হলে, প্রতিবাদ করতে পারেন না, শুধু তাঁর চোখ দিয়ে অবিরল জল ঝরে যায়। কিন্তু এই জায়গাটায় তাঁর সঙ্গে সুশীলার তফাত। সুশীলা জন্মসূত্রে অর্জিত যাবতীয় সংস্কারকে যখের মতো আগলে আগলেই শুধু রাখেন না, কেউ সেগুলো ভাঙার চেষ্টা করল পালটা আঘাত করবেনই। রেগে, চেঁচিয়ে একটা হুলস্থূল কান্ড বাধিয়ে ছাড়বেন। যাতে সেসব অটুট, অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্য যতদূর যাবার যেতে তিনি প্রস্তুত। বিজয়ের খবরটা কানে গেলে তিনি এক মুহূর্তও বসে থাকবেন না, নহরপুরায় ছুটে আসবেন এবং তারপর কী যে করে বসবেন ভাবতেও সাহস হয় না। ভয়ে ভয়ে সুমিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'পিসিমাকে কি কিছু বলেছ?'

আস্তে আস্তে মাথা দোলান রঘুপতি, 'না। সুশীলাকে বললে তার রি-অ্যাকশন কী হবে তুই তো জানিসই।'

'আর মা?'

'সে খুবই কষ্ট পেয়েছে। ওর স্বভাব তোর ভালো করেই জানা আছে।'

'কিছু বলেছে মা?'

'না, শুধু সমানে কাঁদছে। তাই দেখে সুশীলা ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েছে, বার বার জিজ্ঞেস করছে তার কী কষ্ট। হেম উত্তর দিচ্ছে না। সুশীলা মনে করেছে শরীরে কিছু দর্দ টর্দ হচ্ছে, আমাকে ডাক্তার ডেকে আনতে বলল। আমি তো জানি ডাক্তার এনে কিছু হবে না, তবু সুশীলা যাতে কিছু বুঝতে না পারে সেজন্যে ডাক্তার দাসকে 'কল' দিলাম। সে ওষুধও দিয়ে গেছে।'

সুমিত্রা বলে, 'তুমি চলে এলে। মা কি পিসিমাকে বলে দেবে?'

রঘুপতি বলেন, 'বলতে বারণ করে এসেছি।'

সুমিত্রা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলে, 'বাবুজি, আমি কি অন্যায় করেছি?'

রঘুপতি বলেন, 'এরকম একটা প্রশ্ন যে তুই করতে পারিস সেটা কাল তোর চিঠি পেয়েই মনে হয়েছিল। এর দু'টো উত্তর আমি ভেবে রেখেছি।'

সুমিত্রা বেশ একটু অবাকই হয়, 'দু'টো উত্তর!'

'হ্যাঁ। 'রঘুপতি বলেন, 'আমার র‍্যাশনাল উদার মন বলছে তুই ঠিকই করেছিস, কোনো ভুল বা অন্যায় হয়নি। মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেওয়া উচিত। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির শেষ মাথায় এসে জাতপাতের বিচার ধরে বসে থাকা অপরাধ। ইট'স আ ক্রাইম। তাছাড়া বিজয় চমৎকার ছেলে, অসাধারণ ডাক্তার। ওদের ফ্যামিলিও খুব শিক্ষিত, কালচারড। বহু বামন কায়াথের ঘরেও এমন ছেলে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু—'

সুমিত্রা রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু কী?'

রঘুপতি বলেন, 'আমাদের সবার মধ্যেই সংস্কার খুব অ্যাক্টিভ থাকে। জেনারেশনের পর জেনারেশন ওটা উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়ে আসছি। সেটা কাটিয়ে ওঠা ভীষণ মুশকিল। আমাদের ফ্যামিলিতে এ জাতীয় বিয়ে আগে তো আর ঘটেনি।'

রঘুপতি যে দ্বিধান্বিত, সেটা বুঝতে পারা যাচ্ছিল। সুমিত্রা চমকে ওঠে। ব্যাকুলভাবে বলে, 'তোমার এতে মত নেই বাবুজি?'

'হ্যাঁ বা না, এক্ষুনি বলছি না। এরকম প্রবলেমের সামনে আমি কখনও পড়িনি।'

'আমি তা হলে এখন—এখন—' বলতে দু' হাতে মুখ ঢাকে সুমিত্রা। আসলে তার বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর আর কেউ না হোক রঘুপতি তার পাশে এসে দাঁড়াবেন, তাঁর পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যাবে। কিন্তু বাবুজির দ্বিধা সুমিত্রাকে দিশেহারা করে ফেলেছে।

রঘুপতি বিছানা থেকে নিচে নেমে সস্নেহে মেয়ের কাঁধে একটা হাত রাখেন। আর্দ্র সুরে বলেন, 'ভেঙে পড়িস না গুড়িয়া। মানুষ চেষ্টা করলে কী না পারে। আমিও সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারব। শুধু আমাকে একটু সময় দে—'

সংস্কার থেকে মুক্ত হতে বাবুজির কত দিন লাগবে, কে জানে। অনন্ত কাল কি সুমিত্রাকে অপেক্ষা

করতে হবে? এসব প্রশ্ন রঘুপতিকে করা যায় না, ভাববেন মেয়েটা একেবারেই নির্লজ্জ হয়ে উঠেছে।

রঘুপতি এবার বলেন, 'তাছাড়া আরও অনেক দিক আছে। সেগুলো সম্পর্কে ভালো করে ভাবতে হবে। সে জন্যেও সময় চাই।'

উদ্বিগ্ন মুখে সুমিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'অনেক দিক বলতে?'

'আমাদের রিস্তেদারদের কথা বলছি। খবরটা জানাজানি হলে তারা কী যে বাধিয়ে বসবে, ভাবতে পারছি না। কীভাবে তাদের সামলাব তার জন্যে একটা স্ট্র্যাটেজি আগে থেকে ঠিক করতে হবে।'

শুধু হেমবতীর কথাই মাথায় এসেছিল সুমিত্রার কিন্তু কাকারা, মামাবাড়ির লোকজনেরা, দিদির শ্বশুর শাশুড়ি থেকে অজস্র আত্মীয়স্বজন, তার ওপর গোটা শাক্যদ্বীপি ব্রাহ্মণ কমিউনিটি যখন জানতে পারবে সুমিত্রা এক বিধর্মী অচ্ছুৎকে বিয়ে করতে চলেছে, চারিদিকে আগুন জ্বলে উঠবে। নিন্দায় ধিক্কারে অপমানে মা-বাবার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে। এমন হতে পারে, তাদের সঙ্গে কেউ কোনো সম্পর্ক রাখবে না, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কাছে রঘুপতিদের নাম চিরদিনের মতো খারিজ হয়ে যাবে। সুমিত্রা বুঝতে পারে, চারপাশের এত সব হানাদারের বিরুদ্ধে এতগুলো ফ্রন্টে লড়াই চালাতে গেলে সূক্ষ্ম রণকৌশল প্রয়োজন। সব রকম স্থিতাবস্থা আর সংস্কার মেনে নিয়ে এটা একটা মামুলি বিয়ে নয়। এর সঙ্গে সামাজিক, পারিবারিক, হাজার রকমের সমস্যা জড়িয়ে রয়েছে। এমনিতেই বিস্ফোরণ ঘটে যাবে, তবু সেটা যাতে খুব একটা মারাত্মক না হয়ে ওঠে তা আগে থেকে ঠিক করে ফেলা দরকার।

রঘুপতি জিজ্ঞেস করেন, 'আমার কথা বুঝতে পারছিস তো, কী রে?'

মাথাটা সামান্য হেলিয়ে সুমিত্রা বলে, 'হ্যাঁ।'

রঘুপতি মেয়েকে লক্ষ করতে করতে এবার বলেন, 'একটা কথার ঠিক ঠিক জবাব দিবি গুড়িয়া?'

'কী?'

'এই বিয়েতে তুই সুখী হবি তো?'

এক পলক রঘুপতির দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা নিঃশব্দে তাঁর কোলে মুখ গুঁজে দেয়। এটা তার চিরকালের স্বভাব। এইভাবেই সে বাবার কাছ থেকে অনেক কিছু আদায় করে নিয়েছে।

রঘুপতি মেয়ের মনোভাব আঁচ করতে পারছিলেন। তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন, 'এবার বল তো তোরা কতদূর এগিয়েছিস?'

বাবুজি কী বলতে চাইছেন বুঝতে না পেরে মুখ তোলে সুমিত্রা। বলে, 'কীসের এগুনোর কথা বলছ?'

'তোরা এর ভেতর পাটনা কি অন্য কোনো বড় শহরে গিয়ে রেজিস্ট্রি বিয়ে টিয়ে করে ফেলিসনি তো?' রঘুপতি জানেন নহরপুরায় রেজিস্ট্রি ম্যারেজ অফিস নেই, তাই পাটনা কী অন্য শহরের কথা বললেন।

সুমিত্রা চকিত হয়ে ওঠে, 'না বাবুজি, একেবারেই না। তোমার আর মায়ের আশীর্বাদ না নিয়ে আমার জীবনে এত বড় একটা ঘটনা ঘটবে, তাই কখনও হয়?'

রঘুপতি বলেন, 'জানি, তবু তোদের যা বয়েস তাতে অনেকেই আবেগের বশে—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে সুমিত্রা ক্ষুব্ধ মুখে বলে, 'আমাকে অনেকের দলে ফেলে দিলে বাবুজি!'

রঘুপতি একটু বিব্রত হন। তারপর হেসে হেসে বলেন, 'ঠিক আছে, আই উইথড্র। কাল বিজয়কে খবর দিস, একবার যেন এখানে আসে। ওর সঙ্গে আমার কিছু আলোচনা আছে।'

বিজয়ের সঙ্গে বাবুজি কী আলোচনা করবেন, সুমিত্রা তা জানে। এ নিয়ে সে কোনো প্রশ্ন করে না।

চোদ্দ

পরদিন সকালে একটা চিঠি লিখে রামবনবাসকে বিজয়ের কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেয় সুমিত্রা। তার ধারণা ছিল, চিঠি পাওয়ামাত্র বিজয় চলে আসবে, কিন্তু ঘণ্টাখানেক বাদে রামবনবাস ফিরে এসে

জানায় ডাক্তারসাহেবের খুব জরুরি একটা অপারেশন আছে, রোগীর যায় যায় অবস্থা, অপারেশনটা না সেরে তিনি আসতে পারবেন না।

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'কখন আসবেন কিছু বলেছেন?'

'হাঁ। সামকো (সন্ধেবেলায়)।'

বেলা আরেকটু চড়লে রঘুপতি আর নিজের জন্য রান্না করে, স্নান সেরে স্কুলে চলে যায় সুমিত্রা। আজ শনিবার, একটায় ছুটি হয়ে যাবে। তারপর কোয়ার্টারে ফিরে এসে বাবুজিকে খাইয়ে সে খাবে।

কিন্তু দুপুরের খাওয়াটা বিকেলের আগে আর হয়ে উঠল না। ছুটির পরই ফিরে এসেছিল সুমিত্রা। হাতমুখ ধুয়ে ভাত বাড়তে যাবে, আচমকা মুনীশ্বর ঝা এসে হাজির। এমনিতে দলবল নিয়ে সে ঘোরাফেরা করে, কিন্তু আজ সে একাই এসেছে।

মনীশ্বরকে আশা করেনি সুমিত্রা, এখানে সে কোনোভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। অকারণে, কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া, নিশ্চয়ই সে আসেনি। তাকে দেখামাত্র মুহূর্তে মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে সুমিত্রার। সে এবং বিজয় যে তার ছেলের চরম শাস্তির জন্য চারিদিক তোলপাড় করে ফেলছে সেটা তার অজানা থাকার কথা নয়। তবু কেন মুনীশ্বর বিরুদ্ধ শিবিরে হাজির হল, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সদর দরজাটা সুমিত্রাই খুলে দিয়েছিল। মুখে বিগলিত হাসি ফুটিয়ে হাতজোড় করে মুনীশ্বর বলে, 'অসময়ে এসে পড়েছি, দয়া করে কিছু মনে করবেন না।'

সুমিত্রা সতর্ক হয়ে যায়। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মুনীশ্বরকে লক্ষ করতে করতে বলে, 'না না, ঠিক আছে।'

মুখ থেকে হাসিটা এতটুকু স্থানচ্যুত হয় না মুনীশ্বরের। অমায়িক আন্তরিক ভঙ্গিতে বলে, 'কী, বাইরের দাঁড় করিয়ে রাখবেন? ভেতর যেতে বলবেন না?'

দেখামাত্র মুনীশ্বরকে ঘরে ডেকে আনাটা ভদ্রতা। আতিথ্যে যে ত্রুটি ঘটেছে সেটা জেনেও বিব্রত হয় না সুমিত্রা। নীরস সুরে বলে, 'আসুন—'

মাঝখানের চবুতর পেরিয়ে ঘরের দিকে যেতে যেতে মুনীশ্বর বলে, 'শুনলাম, আপনার বাবুজি এসেছেন?'

দ্রুত মুখ ফিরিয়ে সুমিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'কে বললে আপনাকে?'

'রঘুপতিজির মতো এত বড় একজন পূজ্য ফ্রিডম-ফাইটার টাউনে এসেছেন, তা কি চাপা থাকে? খবরটা পাওয়া মাত্র চলে এলাম। ওঁকে দেখলে, ওঁর চরণ ছুঁতে পারলে, 'পুণ' হয়।'

এর আগেও রঘুপতি যতবার সুমিত্রার কাছে এসেছেন, মুনীশ্বর তাঁর সঙ্গে দেখা করে গেছে। মৌখিকভাবে যতটা শ্রদ্ধাভক্তি জানানো সম্ভব, সবই জানিয়েছে। তখন তাকে খুবই আন্তরিক মনে হত সুমিত্রার, কিন্তু এখন কেন যেন মনে হচ্ছে, আজকের এই আসাটা একজন প্রাচীন মুক্তিযোদ্ধাকে নেহাতই শ্রদ্ধা জানানোর জন্য নয়, এর পেছনে এই 'নোটোরিয়াস' ঠিকাদারের দূরপ্রসারী কোনো পরিকল্পনা রয়েছে।

সুমিত্রার সঙ্গে ঘরের ভেতর চলে আসে মুনীশ্বর। রঘুপতি জানালার পাশে একটা চেয়ারে বসে ছিলেন। মুনীশ্বর সোজা তাঁর কাছে গিয়ে ঝুঁকে পায়ে হাত দেয়।

রঘুপতি বলেন, 'বসুন, বসুন—'

ঘরে আরও একটা চেয়ার রয়েছে কিন্তু সেটায় বসে না মুনীশ্বর, মেঝেতে বসে পড়ে।

রঘুপতি এবং সুমিত্রা ভীষণ বিব্রত বোধ করে। সুমিত্রা বলে, 'না না, ওখানে নয়, চেয়ারে বসুন।'

মুনীশ্বর চেয়ারে বসবে না, রঘুপতিরাও ছাড়বেন না। সে জিভ কেটে বলে যায়, 'রঘুপতিজির সামনে আমি কি চেয়ারে বসতে পারি?' অনেক বলার পর শেষ পর্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে অবশ্য বসে।

রঘুপতি জিজ্ঞেস করেন, 'আমার কাছে আপনার কি কোনো দরকার আছে?'

মুনীশ্বর বলে, 'দরকার ছাড়া কি আমি আসতে পারি না? আপনি নহরপুরায় এলেন, আমি না এসে পারি! এর আগে যতবার এসেছেন, দর্শন করে যাইনি?'

রঘুপতি সামান্য হাসেন।

মুনীশ্বর বলে, 'দর্শন ছাড়াও এবার অন্য একটা কাজের কথা আছে আপনার সঙ্গে। তার আগে বলুন শরীর কেমন আছে?'

সুমিত্রা চকিত হয়ে ওঠে। কী কাজের কথা থাকতে পরে মুনীশ্বরের? সে অসীম উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

রঘুপতি বলেন, 'ওই আছে একরকম।'

'মা'জি ভালো আছেন?'

মা'জি বলতে হেমবতী—সুমিত্রার মা। বছরখানেক আগে সুমিত্রা যখন টাইফয়েডে শয্যাশায়ী, হেমবতী এবং রঘুপতি নহরপুরায় এসে কিছুদিন থেকে গিয়েছিলেন। তখনই যেচে এসে হেমবতীর সঙ্গে আলাপ করেছিল মুনীশ্বর। সেই থেকে হেমবতী তার মা'জি।

এই মুহূর্তে বেশি কথা বলতে ইচ্ছা করছে না রঘুপতির, তা ছাড়া খিদেও পেয়েছে খুব। যদিও হেমবতী বেশ অসুস্থ, তবু বলেন, 'ভালোই আছে।' কেন না খারাপ বললে আরও হাজারটা প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হবে।

কিন্তু মুনীশ্বর খুবই নাছোড়বান্দা। একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যায় সে, 'সরকার আপনাকে তাম্রপত্র আর ফ্রিডম-ফাইটারদের পেনশন দিতে চেয়েছিল, আপনি নেবেন না বলে দিয়েছিলেন। সিদ্ধান্তটা নতুন করে কি বিবেচনা করবেন?'

'না।' সংক্ষেপে উত্তর দেন রঘুপতি। মুনীশ্বরের ইঙ্গিতটা তিনি বুঝতে পারছিলেন, তাঁর মুখ কঠোর হয়ে ওঠে।

গোটা মুখ আলো করে হাসে মুনীশ্বর। বলে, 'আমাকে কে একজন সেদিন বলছিল আপনি পেনশন নিতে পারেন, আমি বলেছি অসম্ভব। দেশের জন্যে সব কুছ স্যাক্রিফাইস করে আর যে যাই করুক, উনি তার দাম নেবেন না।'

এটা যে নেহাতই চাটুকারিতা সেটা টের পেতে অসুবিধা হয় না। লোকটা তুখোড় কন্ট্রাক্টর, লাখ লাখ টাকার ব্যবসা করে। তার সময়ের দাম যথেষ্ট, তবু ভরদুপুরে এসে এত যে বক বক করে চলেছে তার পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণ অবশ্যই আছে। কিন্তু ঝুলি থেকে বেড়াল কখন বেরুবে সেটাই আন্দাজ করা যাচ্ছে না।

রঘুপতি ভেতরে ভেতরে প্রচন্ড বিরক্ত হচ্ছিলেন, কিন্তু আদ্যোপান্ত ভদ্রলোক তিনি, শিষ্টাচারের খাতিরে মুনীশ্বরকে বিদায় নিতে বলতে পারছিলেন না। শুধু বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার কী একটা দরকারের কথাটা তখন বলছিলেন?'

হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে মুনীশ্বর, 'হাঁ হাঁ, অনেকটা সময় আপনাদের নষ্ট করে দিয়েছি, এধার কাজের কথাটা শুরু করি—'

রঘুপতি উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে থাকেন।

গলা খাকরে খুব অন্তরঙ্গ সুরে মুনীশ্বর বলে, 'কথাটা হল সুমিত্রা বহেনকে নিয়ে—'

সুমিত্রাও মুনীশ্বরের দিকে তাকিয়ে ছিল, তার হৃৎপিন্ডে আচমকা একটা ধাক্কা লাগে।

রঘুপতি বলেন, 'সুমিত্রাকে নিয়ে কী কথা?'

'তার আগে বলুন আপনি আমাকে আপনা আদমি মনে করেন কিনা?' এই লোকটা আসল কথাটা কিছুতেই সোজাসুজি বলবে না। কত রকমের যে তার ভণিতা আর ধানাই পানাই! বিরক্তি ক্রমশ বাড়ছিলই রঘুপতির। তিনি বলেন, 'আপন-পরের কথা উঠছে কেন?'

মধুর হেসে মুনীশ্বর বলে, 'আপনারাও ব্রাহ্মণ, আমিও ব্রাহ্মণ, তাই উঠছে। সবসময় আমি আপনাদের শুভকামনা করি।'

এত বড় একটা ঘোষণা সত্ত্বেও হিতাকাঙ্ক্ষীটিকে কোনোরকম আমলই দেন না রঘুপতি। ঈষৎ রুক্ষ গলায় বলেন, 'আপনি যা বলতে চান, দয়া করে তাড়াতাড়ি বলুন।'

রঘুপতির কণ্ঠস্বরের ঝাঁঝ বা রুক্ষতা গায়ে মাখে না মুনীশ্বর। হেসে হেসে বলে, 'হাঁ, বলছি।

আমার এক বন্ধুর ছেলে রাজীব খাস আমেরিকা থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এসেছে। ওরা চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ, দিল্লিতে বড় কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে, আট দশ হাজার রুপেয়া স্যালারি। পাটনায় ওদের তিনটে বাড়ি, দেহাতে শও বিঘা জমিন। দিল্লিতেও বড় ফ্ল্যাট রয়েছে। আর রাজীব মা-বাপের একমাত্র ছেলে। ওকে আমি জন্মাতে দেখেছি। এমন ভালোছেলে হয় না। এত বছর আমেরিকায় কাটিয়ে এল, কোনোরকম নেশা নেই। না স্মোকিং, না ড্রিংকিং। আজকাল তো এল এস ডি, ব্রাউন সুগারের খুব চল হয়েছে। ও টাচ ভি করে ন। আমার বন্ধু দু'চারদিনের ভেতর নহরপুরায় আসবে। আমি বলি কী, আপনি এই ক'দিন থেকে যান।'

রঘুপতি স্থির চোখে মুনীশ্বরকে লক্ষ করতে করতে জিজ্ঞেস করেন, 'কেন বলুন তো?'

চেয়ারটা রঘুপতির কাছে এগিয়ে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে মুনীশ্বর। গাঢ় গলায় বলে, 'বুঝতে পারছেন না? আপনি থেকে গেলে আমার বন্ধুকে এখানে নিয়ে আসব। আপনি 'হাঁ' বললেই এ শাদি হয়ে যাবে। আপনার মতো পূজ্য দেশপ্রেমীর মেয়েকে পুতহু (পুত্রবধূ) পেলে ওরা ধন্য হয়ে যাবে।'

রঘুপতি এবং সুমিত্রা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। প্রথম দিকে ওদের মনে হয়েছিল, বিনোদের ব্যাপারেই এসেছে মুনীশ্বর, কিন্তু ছেলের সম্বন্ধে একটি শব্দও তার মুখ দিয়ে বেরোয়নি। সুমিত্রার বিয়ের জন্য যে তার ঘুম হচ্ছে না, কে ভাবতে পেরেছিল!

রঘুপতি মুনীশ্বরের দিক থেকে চোখ ফেরাননি, পলকহীন তাকিয়েই থাকেন।

মুনীশ্বর বলে, 'আমার কথায় মেয়ের শাদি দেবেন না। রাজীবের দিল্লির অফিস আর ফ্ল্যাটের ঠিকানা দিয়ে দেব। আপনারা ভালো করে খোঁজ খবর নিন। তারপর তো বিয়ের কথা। যা ইনফরমেশন দিয়েছি তার একটা কথাও যদি ঝুট হয়, বিয়ে তো দেবেনই না, নহরপুরার চৌরাহায় আমাকে দাঁড় করিয়ে গুনে গুনে হাজারটা জুতির বাড়ি মারবেন।'

বিব্রতভাবে রঘুপতি বলেন, 'এসব কী কথা! ছি ছি—'

হাতজোড় করে মুনীশ্বর বলে, 'রাগ করবেন না, ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে ফেলেছি। রাজীব লেড়কাটা সত্যি খুব ভালো, নইলে সুমিত্রা বহেনজির সঙ্গে শাদির কথা বলতে পারি?'

রঘুপতি মুনীশ্বরের হাত থেকে নিষ্কৃতির আশায় বলেন, 'মেয়ের শাদির ব্যাপারে এখনও কিছু ভাবিনি। ভাবলে আপনার কথা নিশ্চয়ই মনে রাখব। আপনি কৃপা করে এত ভালো একটা ছেলের খবর এনেছেন, সে জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা ঝাঁকিয়ে যেন কতই না কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে, এমন জড়সড়ো ভঙ্গিতে, মুনীশ্বর বলে, 'ধন্যবাদের কথা আমার শুনতে নেই। এটা আমার কর্তব্য।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। অন্যভাবে নেবেন না, আমাদের এখনও খাওয়া হয়নি। তাই—'

প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় মুনীশ্বর, 'না জেনে অপরাধ করে ফেললাম। জানতাম না, আপনাদের এখনও ভোজন হয়নি। আমি যাই, পরে আবার আসব।'

মুনীশ্বর চলে যায়। সাময়িকভাবে তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া গেলেও পুরোপুরি মুক্তির আশা নেই। পরিষ্কার জানিয়েই দিয়ে গেছে, ফের সে হানা দেবে।

সুমিত্রা বলে, 'তোমার আজ খুব কষ্ট হল বাবুজি। দেড়টি ঘণ্টা বক বক করে কানের পোকা বার করে দিয়ে গেল লোকটা। ভাতটাত সব ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে, গরম করে দেব?'

রঘুপতি ভোরে ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাত্তিরে শুতে যাওয়া পর্যন্ত সব কিছু সময় মেনে চলেন। অত্যন্ত নিয়মানুবর্তীও তিনি। কোনো কিছুতেই হেরফের হওয়ার জো নেই। অন্যদিন একটার ভেতর তাঁর দুপুরের খাওয়া হয়ে যায়, কিন্তু বাজে, অবাঞ্ছিত ওই লোকটা গায়ে পড়ে অনেকটা সময় নষ্ট করে দিয়ে গেল।

রঘুপতি বলেন, 'না না, গরম করার দরকার নেই। আমাকে দিয়ে, তুইও খেতে বসে যা।'

সুমিত্রা ভাত বেড়ে দিল।

খেতে খেতে রঘুপতি হাসছিলেন।

সুমিত্রা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি হাসছ যে বাবুজি! কী হল?'

'তোদের ওই কনট্রাক্টর লোকটার কথা ভাবছিলাম। কী সাঙঘাতিক ধুরন্ধর। আমাদের ওয়েল-উইশারের রোলটা কী চমৎকার প্লে করে গেল।'

বাবুজি ঠিক কী ইঙ্গিত দিচ্ছেন, ধরতে না পেরে সুমিত্রা তাঁর দিকে তাকায়।

রঘুপতি থামেননি, 'একবারও নিজের ছেলের কথা বলল না। অনুরোধ করল না, বিনোদের কেসটা নিয়ে আমরা যেন মাথা না ঘামাই। শুধু বুঝিয়ে দিল তোর শাদির জন্যে ওর ঘুম হচ্ছে না, ওর মতো ভালো বন্ধু আমাদের আর নেই—'

মুনীশ্বর গায়ে পড়ে বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আসায় তখন থেকে মনটা কঠোর হয়ে আছে সুমিত্রার। এভাবে তার ব্যাপারে নাক গলাবার সাহস লোকটার কী করে হল! মুনীশ্বরের অনধিকার চর্চায় সে যতটা না অবাক হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে ক্রুদ্ধ। অসহ্য রাগে তার মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করে যাচ্ছে তখন থেকে।

রঘুপতি বলেন, 'আমার কী মনে হয় জানিস?'

খুব আস্তে সুমিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'দিল্লির ওই ছেলেটি সম্পর্কে মুনীশ্বর যা যা বলে গেল, খবর নিলে দেখা যাবে তার একটা বর্ণও মিথ্যে নয়। না দেখেও বলছি ছেলেটা খুবই ভালো।' ভাতের ওপর ডাল ঢালতে ঢালতে রঘুপতি বলেন, 'এমন সম্বন্ধ খুব কমই পাওয়া যায়—'

সুমিত্রা হকচকিয়ে যায়, 'কিন্তু বাবুজি—'

মেয়ের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিলেন রঘুপতি। হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'আমি ওই ছেলের ব্যাপারটা নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাচ্ছি না। শুধু ভাবছি মুনীশ্বর কী ধূর্ত একটা চালই না দিয়ে গেল! ওর মতলবটা ধরতে পেরেছিস?'

সুমিত্রা আস্তে মাথা নাড়ে—পারেনি।

রঘুপতি বলেন, 'তুই বিনোদের কেস নিয়ে চারদিকে ছোটাছুটি করছিস। মুনীশ্বর ভয় পেয়ে গেছে। তাই বিয়ের ব্যবস্থা করে ও তোকে এখান থেকে সরাতে চায়।' কোনোরকম গোলমাল, ঝঞ্ঝাট কিছু নয়। বিয়েটা হলে ও জানে, কৃতজ্ঞতার জন্যও আমরা আর মুনিয়ার খুন টুন নিয়ে হইচই বাধাব না। তুই এখান থেকে দিল্লি চলে গেলে কেউ আর এ ব্যাপারে গোলমাল করবে না, টাকা দিয়ে ও সবার মুখ বন্ধ করে দেবে, কেসটা বেমালুম চাপা পড়ে যাবে।'

মুনীশ্বরের এই সূক্ষ্ম চাতুরির দিকটা ভেবে দেখেনি সুমিত্রা। নিজের ছেলেক বাঁচাবার জন্য কী আশ্চর্য কৌশলই না সে মাথা থেকে বার করেছে! লোকটার উদ্ভাবনী প্রতিভায় স্তম্ভিত হয়ে যায় সুমিত্রা।

রঘুপতি এবার বলেন, 'দেখিস, ও বারবার আসবে—'

সুমিত্রা আতঙ্কগ্রস্তের মতো বলে, 'তুমি তখন কী বলবে?'

রঘুপতি হাসেন, 'কিছু তো একটা বলতেই হবে। ভেবে দেখি কী বলা যায়—'

'ফের এলে তুমি কিন্তু ওকে তাড়িয়ে দেবে—'

'মাথা গরম করলে গন্ডগোল হয়ে যাবে গুড়িয়া। যা করার, যা বলার, সব হাসিমুখে ট্যাক্টফুলি করতে আর বলতে হবে, যাতে লোকটা অফেন্ডেড না হয়। রাগারাগি করে কেসটা আরও জটিল করে ফেলে কোনো লাভ নেই।'

সন্ধের কিছু আগে, সূর্য তখনও দিগন্তের কাছে লাল টকটকে একটা বলের মতো আটকে আছে, বিজয় এল। তাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। রঘুপতিকে প্রণাম করে একটা চেয়ারে বসতে বসতে সে বলে, 'রামবনবাস সকালে যখন খবর দিল, আমার আসার উপায় ছিল না।'

রঘুপতি বলেন, 'হ্যাঁ, ও বলল তোমার কী একটা খুব আর্জেন্ট অপারেশন রয়েছে।'

বিজয় বলে, 'হ্যাঁ। কেসটা ভীষণ কমপ্লিকেটেড। অপারেশনটা করতে তিন চার ঘণ্টা সময় লাগল,

তারপর পেশেন্টকে আরও কয়েক ঘণ্টা অবজার্ভেশনে রাখতে হয়েছে। তাই আসতে দেরি হল।'

'সে ঠিক আছে। তোমাকে কীরকম যেন দেখাচ্ছে, শরীর খারাপ নাকি?'

'না না, ভালোই আছি। সারাদিন ধকল গেছে, তাই টায়ার্ড ফিল করছি।'

'অপারেশন কেমন হল—সাকসেসফুল?'

'মনে তো হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে পেশেন্টের জ্ঞান ফিরেছে। তারপর হাসপাতাল থেকে আসতে পারলাম।' বলে একটু হাসে বিজয় রোগীকে বাঁচিয়ে তুলতে পেরেছে, সেজন্য পরিতৃপ্তির হাসি।

বিজয়কে দেখেই সুমিত্রা চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছিল। চা করে বিজয় এবং রঘুপতিকে দিয়ে নিজেও এক কাপ নেয় সে।

রঘুপতি হেসে হেসে বলেন, 'গেস্টকে শুধু চা খাওয়াবি নাকি রে?'

কলেজে পড়ার সময় এক বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে প্রায়ই যেত সুমিত্রা। ওদের ওখানে ময়দার লুচি খেয়ে খুব ভালো লাগে তার, সঙ্গে সঙ্গে তৈরির প্রক্রিয়াটাও শিখে নেয়। বিজয়কেও কয়েক বার করে খাইয়েছে। লুচিটা বিজয়ও খুব পছন্দ করে। বিকেলে ময়দা মেখে রেখেছে সুমিত্রা। বিজয় এলে গরম গরম ভেজে তাকে আর রঘুপতিকে দেবে। তাছাড়া, রামবনবাসকে দিয়ে ওবেলা কিছু ক্ষীরের মিষ্টিও আনিয়ে রেখেছে।

সুমিত্রা বলে, 'আগে চা খাক, পরে খাবার দিচ্ছি। তোমরা কথা বল, আমি লুচি ভেজে আনছি।' সে আর বসে না, রান্নাঘরে চলে যায়।

কিছুক্ষণ পর স্টেনলেস স্টিলের থালায় ধবধবে লুচি, আলুর তরকারি এবং প্যাঁড়া সাজিয়ে এনে রঘুপতি আর বিজয়কে দেয় সুমিত্রা। বলে, 'খাও। পরে আবার চা করে দেব।'

রঘুপতি বলল, 'তোর লুচি টুচি কোথায়?'

'আমার এখন খেতে ইচ্ছে করছে না। পরে খাব।'

সুমিত্রা যখন লুচি ভাজছে সেই সময় রঘুপতি দেশের সকল দিকে ভ্রষ্টাচার, পুলিশ প্রশাসন এবং রাজনৈতিক নেতাদের নানা নৈতিক অবনতি নিয়ে সাধারণভাবে বিজয়ের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। এভাবে চললে ভারতবর্ষ যে ধ্বংস হয়ে যাবে, সে বিষয়ে দু'জনেই একমত। এই আলোচনায় মুনিয়ার খুন বা বিজয়ের সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ের প্রসঙ্গ একবারও ওঠেনি। আসলে মেয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন রঘুপতি, আলাদাভাবে বিজয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাননি।

লুচি খেতে খেতে এবার রঘুপতি মেয়েকে বলেন, 'তুই আমার কাছে বস—' সুমিত্রা বসলে বিজয়ের উদ্দেশে বলেন, 'গুড়িয়া এর মধ্যে আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল। আশা করি তুমি তা জানো।'

বিজয় মাথাটা সামান্য হেলিয়ে দেয়, অর্থাৎ জানে। সুমিত্রার আদরের নাম যে গুড়িয়া তাও তার অজানা নয়। রঘুপতি বলেন, 'ও মুনিয়ার কথা ডিটেলে লিখেছে। এখানে আসার পর ওর সঙ্গে আলোচনাও করেছি। এ ব্যাপারে তুমি আর গুড়িয়া ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ। তবে খুব কেয়ারফুলি এগুতে হবে। সবসময় মনে রাখবে, তোমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের শুধু টাকা আর বন্দুকই নেই, সে যথেষ্ট চতুরও।'

বিজয় বলে, 'হ্যাঁ।'

রঘুপতি এবার বলেন, 'আরও একটা কথা গুড়িয়া লিখেছিল, সেটা খুবই ইমপর্টান্ট ব্যাপার। ওর সঙ্গে তোমার সম্পর্কের কথা স্পষ্ট করে জানিয়েছে, কোনোরকম লুকোচুরি করেনি। এরকম ফ্র্যাঙ্কনেস অমি পছন্দ করি। কিন্তু—'

রঘুপতির মুখ থেকে বেরিয়ে আসা শেষ শব্দটি বিজয়কে চকিত করে তোলে। বলে, 'আপনি কি চান না আমরা—' বলতে বলতে মুখ নামিয়ে নেয়। রঘুপতির ব্যক্তিত্ব এমনই প্রবল যে তাঁর চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না।

রঘুপতি হাসেন। বলেন, 'আমার কথা শেষ করতে দাও। সবটা শুনলে তবে তো বুঝতে পারবে আমি কী চাই—'

ফের মুখ তোলে বিজয়, অসীম উৎকণ্ঠা নিয়ে রঘুপতিকে লক্ষ করতে থাকে।

রঘুপতি বলেন, 'আমি পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত, এমন দাবি করি না। স্বীকার করছি, গুড়িয়ার চিঠিতে

যখন পড়লাম তোমরা ঠিক করেছ বিয়ে করবে, বেশ একটা ধাক্কাই খেয়েছিলাম। এমন অভিজ্ঞতা আগে আর কখনও আমার হয়নি।'

রুদ্ধশ্বাসে বিজয় বলে, 'আপনি কি তাহলে রাজি নন?'

রঘুপতি বলেন, 'মানুষ সংস্কার তৈরি করে, আবার মানুষই তা ভাঙে। আমার ধারণা সেটা ভাঙার মতো শক্তি আমার আছে। তবে—'

'তবে কী?'

'আমি তো স্বয়ম্ভু নই। আত্মীয়স্বজন নিয়ে একটা ওয়েল-নিট সোসাইটির একজন। তাদের পক্ষে চট করে সংস্কার ভাঙা খুব সহজ নয়। ওদের সময় দিতে হবে। এই কথাটা গুড়িয়াকেও বলেছি।' রঘুপতি বলে যান, 'চিরকালের প্রথাকে আচানক আঘাত দিলে তার একটা টেরিবল রি-অ্যাকশন হয়। আমার মনে হয় ধৈর্য ধরে ধীরে ধীরে এগুনো দরকার।'

বিজয় জিজ্ঞেস করে, 'কতদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে?'

'ধর আরও বছরখানেক।'

'কিন্তু তারপরেও যে অশান্তি হবে না, তার কি কোনো গ্যারান্টি আছে?'

'তুমি একটা পার্মানেন্ট সিস্টেমকে ঘা দেবে আর অশান্তি হবে না, তা কি কখনও হয়? কিন্তু এই এক বছরের ভেতর আস্তে আস্তে সবাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা গ্রাউন্ড তৈরি করে ফেলব যাতে ঝঞ্ঝাটটা কম হয়।'

রঘুপতি মানুষটি যে অত্যন্ত দূরদর্শী এবং স্থিতধী, কোনো আকস্মিক ঝোঁকের বশে চলেন না, বুঝতে পারছিল বিজয়। সমাজকে আঘাত করলে প্রত্যাঘাত আসাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু চারপাশের মানুষজনের মানসিক পরিবর্তন ঘটাতে পারলে সমস্যার তীব্রতা অনেক কমে যাবে। লজিকের দিক থেকে কথাটা ঠিক, কিন্তু আবেগ বলে একটা ব্যাপার আছে। তাছাড়া, তাদের যা বয়স তাতে পরস্পরকে কাছে পাওয়ার প্রচন্ড আকুলতাও থাকে। বিজয় বলতে যাচ্ছিল, একটা বছর অনেকখানি সময়, কিন্তু নিজেকে সামলে নেয়। এমন একজন শ্রদ্ধেয় মানুষের মুখের ওপর এ জাতীয় কথা বলা যায় না, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলে সেটা হবে নির্লজ্জতার চরম প্রকাশ। বিজয় চুপ করে থাকে।

তার মনোভাব কিছুটা হয়ত আঁচ করে নেন রঘুপতি। বুঝিবা বিজয়ের চোখেমুখে ক্ষণিক হতাশার চিহ্ন দেখে মনে মনে একটু হাসেনও। বলেন, 'এতে তোমাদের ভালোই হবে। ধৈর্যটা হেলাফেলার জিনিস নয়। সেটা থাকলে অনেক সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে যায়।'

বিজয় মনস্থির করে নেয়। বলে, 'আপনি যা বললেন তাই হবে। আমি অপেক্ষা করব।'

'দ্যাট শুড বি দা স্পিরিট।' বলে আন্তরিকভাবে হাসেন রঘুপতি।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে চলে যায় বিজয়।

পনেরো

দিন দুই নহরপুরায় মেয়ের কাছে কাটিয়ে মণিহারিতে ফিরে গেলেন রঘুপতি। সুমিত্রা আরও কয়েকদিন থেকে যেতে বলেছিল, তিনি রাজি হননি। যাবার আগে বলে গেয়েছেন মুনিয়ার কেসটা কোন দিকে গড়াল তাঁকে যেন জানানো হয়। যদি খুব একটা জটিলতা বা গোলমাল দেখা দেয়- টেলিগ্রাম করলেই চলে আসবেন। সব দিক বিবেচনা না করে উত্তেজনার বশে সুমিত্রা বা বিজয় যেন খুব বড় রকমের বিপজ্জনক ঝুঁকি না নিয়ে বসে। চিঠি অথবা টেলিগ্রাম না পেলেও সপ্তাহ দুই তিন বাদে তিনি আবার আসবেন।

রঘুপতি চলে যাবার পরদিনই পূর্ণিয়ার উকিল শক্তিনাথকে সঙ্গে করে সুমিত্রার কোয়ার্টারে এলেন মহেশ্বর। শক্তিনাথের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। নিরেট চেহারা, ধারাল মুখচোখ, মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি। নাকের তলায় পাকানো গোঁফ, চোখের দৃষ্টি তীব্র এবং দূরভেদী। তিনি যে জবরদস্ত এবং সফল আইনজ্ঞ, দেখামাত্র টের পাওয়া যায়। সুমিত্রা জানে না, আদালতে তাঁর জেরাব মুখে পড়লে সাক্ষী বা আসামি যত বড় ঘাঘীই হোক না, তটস্থ হয়ে ওঠে।

ওঁরা আসার সঙ্গে সঙ্গে চায়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছিল সুমিত্রা। ঘরে বেশ কিছু বালুসাই, গুলাবজামুনও ছিল।

খেতে খেতে শক্তিনাথ বলেন, 'নহরপুরায় এসে মুনিয়া নামে মেয়েটির মার্ডার আর রেপের ঘটনাটা মহেশ্বরের কাছে মোটামুটি শুনেছি। আপনি এলাবোরেটলি বলুন, কোনো কিছু বাদ দেবেন না।' তাঁর কণ্ঠস্বর ভারী এবং গমগমে।

কুণ্ঠিত মুখে সুমিত্রা বলে, 'তার আগে আমার অন্য একটা কথা আছে।'

'কী?' ডান ভুরুটা সামান্য উঁচুতে তুলে জানতে চান শক্তিনাথ।

সুমিত্রা বলে, 'আপনার মতো বড় ল'ইয়ারকে ফীজ দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই শক্তিনাথজি।'

'মহেশ্বর আমাকে তা জানিয়েছে। এ নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। মহেশ্বর এই কেসটা নিতে বলেছে, আমি নেব। এমনকি পূর্ণিয়া থেকে যাতায়াতের খরচও দিতে হবে না। আশা করি, এরপর আপনার আর কুণ্ঠিত হবার কারণ নেই।'

কৃতজ্ঞ চোখে সুমিত্রা শক্তিনাথের দিকে তাকায়।

শক্তিনাথ থামেননি, 'আমি বড়লোকের কাছ থেকে গলায় পা তুলে টাকা আদায় করি, তাদের ছাড়ার মানে হয় না। লেকেন যাদের পয়সা নেই তাদের কেস মুফতে করে দিই। উকিল হলেও আমি সোসাইটির একজন, বে-সাহারা হেল্পলেস মানুযের জন্যে কিছু করা আমার ডিউটি। মুনিয়ার মতো একটা মেয়ের জন্যে আপনারা এতটা করছেন। আমি কিছু করব না, তাই কি হয়?'

এই দুর্দান্ত ভীতিকর ক্রিমিনাল ল'ইয়ারের মধ্যে এতটা সহৃদয়তা রয়েছে, আগে ভাবা যায় নি। বাইরে কঠোরতার একটা খোলস এঁটে ভেতরের আসল মানুষটিকে তিনি বোধ হয় গোপন রাখতে চান। মুগ্ধ গলায় সুমিত্রা বলে, 'আপনি সঙ্গে থাকলে আমাদের সাহস আর শক্তি অনেক বেড়ে যাবে। কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব—'

হাত তুলে সুমিত্রাকে থামিয়ে দিয়ে শক্তিনাথ বলেন, 'ধন্যবাদের দরকার নেই। কেস হিস্ট্রিটা শুরু করুন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, করছি।'

আগাগোড়া সব বলে যায় সুমিত্রা। চোখ বুজে শুনতে থাকেন শক্তিনাথ, মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে কোনো কোনো জটিল পয়েন্ট পরিষ্কার করে নেন। তারপর ফের চোখ মেলে সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আজ রাতটা আমি মহেশ্বরের বাড়িতে থাকছি। কাল সকালে ন'টায় আপনি আর ডাক্তার সাহেব ওখানে আসতে পারবেন?'

ডাক্তার সাহেব মানে বিজয়। সুমিত্রা বলে, 'পারব। কিন্তু দশটার ভেতর আমাকে ফিরে আসতে হবে। স্কুল আছে তো—'

শক্তিনাথ আস্তে মাথা নাড়েন, 'না, স্কুলটা বোধ হয় কাল আর আপনার করা হবে না। আপনাদের সঙ্গে নিয়ে থানায় যাব। গঞ্জু বিনোদের জামিনের বন্দোবস্ত করতে। সেখানে কতক্ষণ লাগবে জানি না।'

একটু ভেবে সুমিত্রা বলে, 'ঠিক আছে। স্কুলের দায়িত্ব অন্য কাউকে দিয়ে যেতে হবে। তবে জরুরি অপারেশন থাকলে বিজয়ের হয়ত যাওয়া হবে না।'

'তাহলে আর কী করা যাবে, আপনি একাই যাবেন।'

'ঠিক আছে।'

'আপনি বা মহেশ্বর যে সাক্ষীদের কথা বলেছেন তাদের শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে তো?'

সুমিত্রা বলে, 'আশা করি।'

শক্তিনাথ বলেন, 'দেখেবেন ওরা ভড়কে না যায়। ওরা যে সাক্ষি দেবে এটা আপাতত জানাজানি না হওয়াই ভালো। ওদের এ ব্যাপারে চুপচাপ থাকতে বলবেন, অন্য কারো সঙ্গে যেন কথা না বলে।'

'ঠিক আছে, আজই লোক পাঠিয়ে ওদের ডাকিয়ে এনে বলে দেব।'

একটু চুপচাপ।

তারপর শক্তিনাথ বলেন, 'লড়াইটা আমাদের দু'দিক থেকে করতে হবে। এক, মহেশ্বর ওর 'নহরপুরা সমাচার'-এ এমনভাবে রিপোর্ট লিখবে যাতে বোঝা যায়, গঞ্জু বিনোদ মুনিয়াকে খুন বা ধর্ষণ কোনোটাই করেনি, করেছে অন্য কেউ। পুলিশ ভুল করে তাকে ধরে এনে হাজতে পুরেছে।'

সুমিত্রা অধীরভাবে বলে, 'ভুল করে তো নয়, সব জেনেশুনেও চক্রান্ত করে ওকে অ্যারেস্ট করে আটকে রেখেছে।'

শক্তিনাথ হাসেন, 'আমরা জানি গঞ্জু বিনোদ বেকসুর, কিন্তু পুলিশ যখন তাকে ধরেছে তখন খুব হুঁশিয়ার হয়ে এগুতে হবে। সত্য হলেও সবসময় সব কিছু সোজাসুজি ছাপা যায় না।'

'ডাইরেক্টলি না লিখতে পারলে ছেপে কী লাভ?'

'প্রেসার দেবার জন্যে। পুলিশ বুঝবে, তাদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। ঘুষ খেয়ে কেসটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া যে সহজ হবে না, সেটা ওদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার।'

সুমিত্রা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, 'আপনি ঠিকই বলেছেন শক্তিনাথজি। কানুনের দিকটা তো আমরা ভালো জানি না।'

শক্তিনাথ হাসেন, 'যুদ্ধটা করতে হবে দুই ফ্রন্টে। একদিকের জেনারেল মহেশ্বর। সে 'নহরপুরা সমাচার'-এ রেগুলার এই কেসটা সম্পর্কে এমনভাবে লিখে যাবে যাতে পুলিশ বা মুনীশ্বররা বুঝতে পারে প্রিন্ট মিডিয়া অনেক কিছু জেনে ফেলেছে, যে কোনো সময় তা ফাঁস করে দেবে। আর সেকেন্ড ফ্রন্টে আছি আমি। আপনারা সাক্ষি সাবুদ প্রমাণ জোগাড় করে দেবেন। আদালতে একবার পেলে মুনীশ্বররা কত বড় হারামজাদা দেখে নেব।' খানিক চিন্তা করে আবার বলেন, 'আপনার সেই তিন উইটনেস, বিশেষ করে লচ্ছুকে খুব দরকার। কাল কি ওদের খবর দিয়ে আনানো যাবে?'

সুমিত্রার মনে পড়ে, ধনিয়া আর পাওয়ানের এতদিনে ফিরে আসার কথা। লচ্ছুও বলেছিল, নহরপুরায় এসে তার সঙ্গে দেখা করবে কিন্তু এখনও আসেনি। ব্যাপারটা কী দাঁড়াল, বোঝা যাচ্ছে না। সে বলে, 'কালই ওদের ডাকিয়ে আনব। কখন আসতে বলব?'

'বিকেলে। তার ভেতর থানার কাজ চুকে যাবে। সাক্ষীদের সঙ্গে কথা বলে সন্ধের বাস ধরে আমি ফিরে যাব। কাল আমার একটা কেস আছে পূর্ণিয়ায়।'

'ঠিক আছে।'

'এখন তা হলে ওঠা যাক।'

পরদিন সকালে স্কুলের সেকেন্ড টিচার উপাধ্যায়জিকে একটা চিঠি লিখে রামবনবাসের কাছে রেখে বেরিয়ে পড়ে সুমিত্রা। উপাধ্যায় আজকের মতো স্কুলের কাজকর্ম চালাবেন। কাল থেকে সে আবার সব দায়িত্ব নেবে।

রাস্তায় এসে একটা সাইকেল রিকশা নিয়ে সোজা বিজয়ের কোয়ার্টারে আসে সুমিত্রা। পাটনা থেকে কাল বিকেলে আসা 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' পড়তে পড়তে চা খাচ্ছিল বিজয়। সুমিত্রাকে দেখে বেশ অবাকই হয়। বলে, 'এত সকালে! কী ব্যাপার? এনি প্রবলেম?'

বেতের সোফায় বসতে বসতে সুমিত্রা বলে, 'আগে হরিয়াকে চা দিতে বল—' হরিয়া বিজয়ের কুক-বেয়ারা থেকে অভিভাবক পর্যন্ত সব কিছু। এই কোয়ার্টারে এখন পর্যন্ত তারই একচ্ছত্র রাজত্ব। তাকে ছাড়া এখানকার সমস্ত অচল।

হরিয়া হিন্দি ফিল্মের গান গাইতে গাইতে কিচেনে খুটখাট করে কী যেন করছিল। বিজয় চেঁচিয়ে বলে, 'দিদিজি এসেছে, চটপট চা নিয়ে আয়।'

হরিয়া চেঁচিয়ে বলে, 'এক মিনিট ভাইসাব। তুরন্ত লাতে হ্যায়। গরমা গরম—' কথাটা সে একটু বেশিই বলে থাকে।

কাল শক্তিনাথ এবং মহেশ্বরের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে, সব জানিয়ে সুমিত্রা বিজকে বলে, 'আজ হাসপাতালে কোনো জরুরি অপারেশন টপারেশন নেই তো?'

বিজয় বলে, 'না। কেন?'

'তা হলে চা খেয়ে আমার সঙ্গে বেরুবে।'

'কোথায়?'

'আগে মহেশ্বরজির বাড়িতে, সেখান থেকে থানায়।'

হরিয়া চা নিয়ে আসে, সেই সঙ্গে প্রচুর মিষ্টি। বিজয়ের সঙ্গে সুমিত্রার সম্পর্কটা কী, সে তা জানে। তাই সুমিত্রা এলে তাকে যথেষ্ট খাতিরযত্ন করে থাকে।

সুমিত্রা বলে, 'এই সকালবেলায় এত মিঠাই কে খাবে? চা রেখে এগুলো নিয়ে যাও।'

সুমিত্রা খাবে না, হরিয়াও ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত একটা কলাকন্দ খেয়ে চায়ের কাপটা তুলে নিতে নিতে লচ্ছুদের কথা মনে পড়ে যায়। তাড়াহুড়ো করে সে বেরিয়ে এসেছে, রামবনবাসকে যে ছত্তরপুরে যাবার কথা বলে আসবে, খেয়াল ছিল না।

সুমিত্রা বলে, 'হরিয়াকে এখনই একবার ছত্তরপুর পাঠাতে চাই। তোমার অসুবিধা হবে না তো?'

বিজয় জিজ্ঞেস করে, 'ছত্তরপুরে কেন?'

শক্তিনাথ যে সাক্ষীদের সঙ্গে কথা বলতে চান তা জানিয়ে সুমিত্রা বলে, বিকেলের ভেতর লচ্ছুদের মহেশ্বরজির বাড়িতে আসা দরকার। সন্ধেবেলায় উনি পূর্ণিয়া ফিরে যাবেন।'

'কিন্তু—'

'কী হল?'

'ছত্তরপুরে গিয়ে ফিরে আসতে মিনিমাম ঘণ্টা চারেক লাগবে। এখনও তো রসুই হয়নি। দুপুরে খাব কী?'

সুমিত্রা বলে, 'এই ব্যাপার? তুমি আর হরিয়া আমার ওখানে খাবে। থানার কাজ চুকিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে রান্না চড়িয়ে দেব।'

বিজয় বলে, 'ঠিক আছে। তাই হবে।'

চা খেয়ে হরিয়াকে ছত্তরপুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে, বিজয়কে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সুমিত্রা।

নহরপুরা টাউনের উত্তর দিকে নয়া টুলিতে মহেশ্বরদের সাবেক ধাঁচের দোতলা বাড়ি। একদা বছর পঞ্চাশেক আগে নয়া টুলি নতুনই ছিল, কিন্তু এলাকাটার গায়ে প্রাচীনত্বের মলিন ছাপ পড়লেও নামটা আর পালটায়নি। এক'শ বছর বাদেও সেটা 'নয়া'ই থেকে যাবে।

এ অঞ্চলের বাড়িঘর যেমন হয়, মহেশ্বরদের 'শান্তি নিবাস' তার থেকে আলাদা কিছু নয়। চওড়া চওড়া দেওয়াল, ছোটো জানালা। একতলায় এবং দোতলায় সারি সারি খান পাঁচেক করে ঘর। সামনের দিকে অনেকটা ফাঁকা জায়গা, তার একধারে টিনের ঢালু শেডের তলায় ছাপাখানা এবং 'নহরপুরা সমাচার' পত্রিকার অফিস। আরেক ধারে ছোটো পারিবারিক শিবমন্দির। মন্দিরের গা ঘেঁষে টালির চালার তলায় একটা জিপ। গাড়িটা নিউজ প্রিন্ট আনা, পত্রিকা বেরুলে নানা জায়গায় বিক্রির জন্য পৌঁছে দেওয়া, ইত্যাদি নানা কাজে ব্যবহার করা হয়।

একই কম্পাউন্ডের ভেতর বাড়ি, প্রেস এবং পত্রিকা অফিস। সুমিত্রা শুনেছে 'নহরপুরা সমাচার'-এর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। পত্রিকাটার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহেশ্বরের বাবা সুরেশ্বর সহায়, এই বাড়িও তাঁরই তৈরি। সুরেশ্বর একসময় ছিলেন গান্ধিজির খুব কাছের মানুষ, ঘনিষ্ঠ অনুগামী। অসহযোগ আন্দোলন করে বেশ কয়েক বার জেলও খেটেছেন। গান্ধিজিই নাকি তাঁকে এই ছোটো শহরে একটি পত্রিকা বার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকবে তাতে। তাদের ওপর যদি কোনো জুলুম বা অন্যায় হয়, পত্রিকাটি তার তীব্র প্রতিবাদ করবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে গড়ে তুলবে প্রবল জনমত। এটাও একটা বড় রকমের দেশসেবা।

সুরেশ্বের সহায় মারা গেছেন বছর পনেরো আগে। মহেশ্বর কিন্তু পত্রিকা বন্ধ করেননি, বরং আরও বড় করেছেন। আগে ছিল ট্যাবলয়েড সাইজে আটপাতা, এখন সেটা হয়েছে যোলো পাতা। দেশ বিদেশের নানা খবর তো ছাপা হয়ই, তবে বেশি জোর দেওয়া হয় স্থানীয় সংবাদ এবং সমস্যার ওপর। পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সবাই 'নহরপুরা সমাচার'কে যথেষ্ট সমীহ করে থাকে। সঠিক খবর ছাপার জন্য কাগজটার প্রচুর সুনাম। এমনকি এই পত্রিকার নানা সংবাদের সূত্র ধরে পাটনার বিধানসভায় বহুবার সরকারি এবং বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে তুমুল হইচই হয়ে গেছে।

বহু পত্রপত্রিকা রয়েছে, বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য অনুগ্রহের কারণে সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেয় না। বরং মন্ত্রী বা এম. এল. এ, এম. পি'দের তোয়াজ করে চলে, তাদের লম্বা লম্বা ভাষণের সঙ্গে বড় করে ছবি ছেপে খুশি করে দেয়। কিন্তু মহেশ্বর 'নহরপুরা সমাচার'-এর চরিত্র পালটাননি। সুরেশ্বরের আমলের আদর্শবাদ এবং পলিসি হুবহু অনুসরণ করে চলেছেন। নহরপুরার মানুষজন এই কারণে তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করে।

এক জায়গায় সুমিত্রার সঙ্গে মহেশ্বরের গভীর মিল রয়েছে। দু'জনেই জেল-খাটা স্বাধীনতা-সংগ্রামীর সন্তান। আদর্শবাদের যে উত্তরাধিকার তারা পেয়েছে তার এতটুকু অমর্যাদা হতে দেয়নি। অমূল্য ঐশ্বর্যের মতো সেটা সযত্নে আগলে রেখেছে।

মহেশ্বর এবং শক্তিনাথ 'নহরপুরা সমাচার'-এর অফিস-ঘরে বসে চা খেতে খেতে গল্প করছিলেন। বিজয় আর সুমিত্রাকে বাড়ির কম্পাউন্ডে ঢুকতে দেখে মহেশ্বর বাইরে বেরিয়ে আসেন। হাসিমুখে সমাদরের ভঙ্গিতে বলেন, 'আসুন, আসুন। আপনাদের জন্যেই আমরা অপেক্ষা করছি।'

অফিস-ঘরে নিয়ে সুমিত্রাদের বসানো হয়।

অফিস বলতে বই আর কাগজপত্রে ঠাসা গোটা কয়েক আলমারি। ড্রয়ারওলা বড় একটা টেবলের একধারে সম্পাদকের চেয়ার, মুখোমুখি ওধারে ভিজিটরদের জন্য আরও ছ'টা। মাথার ওপর চার ব্লেডওলা পুরোনো আমলের ফ্যান। টেবলের ওপর ফোন, কিছু ফাইল, তাড়া তাড়া প্রুফ, ডট পেন, প্যাড, পিন-কুশন, জেম ক্লিপের বাক্স, ইত্যাদি।

অফিস-ঘরের ডান দিকের দেওয়ালে একটা দরজা। তার ওধারে কম্পোজিং সেকশন। সেখানে এই সকালবেলাতেই চার পাঁচটি কম্পোজিটর লাইট জ্বেলে কাজ করে চলেছে। কম্পোজিটরদের ঘরের পর অনেকটা জায়গা জুড়ে ছাপার মেশিন। মেশিন-ঘরে এখন কেউ নেই।

মহেশ্বর বলেন, 'একটু চা খান, তারপর বেরিয়ে পড়া যাবে।'

সুমিত্রা এবং বিজয় দু'জনেই একসঙ্গে জানায়, চায়ের প্রয়োজন নেই, এইমাত্র খেয়ে এসেছে।

মহেশ্বর বলেন, 'আরেক কাপ খেলে ক্ষতি হবে না।' বলে হাঁকেন, 'এ দুখিয়া, দো পেয়ালা চায় লেকে আ—'

শুধু চা-ই-না, পাঁচ মিনিটের ভেতর কিছু মিষ্টি এবং বিস্কুটও এসে হাজির হয়। আপত্তি করলে মহেশ্বর কোনোমতেই শুনবেন না, তাই নিঃশব্দে খেতেই হয়।

মহেশ্বর বলেন, 'ডাক্তার সাহেব চার সাল এই শহরে এসেছেন, সুমিত্রা বহেনজিও এসেছেন লগভগ তিন সাল। লেকেন গরিবখানায় এই পয়লা এলেন। মুনিয়ার আনফরচুনেট ডেথটা না হলে হয়ত কোনোদিনই আসতেন না।'

বিজয় আর সুমিত্রা খুবই কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। সত্যিই এখানে আসার কথা কখনও ভাবেনি তারা। সুমিত্রা বলে, 'না, মানে—'

বিজয় বিব্রত ভাবটা কাটিয়ে উঠে বলে, 'বোঝেনই তো, হাসপাতালের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর রোগীটোগী নিয়ে সারাদিন আমার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যায়। ছুটি বলতে কিছু নেই। রাউন্ড দা ইয়ার চব্বিশ ঘণ্টার ডিউটি। কখনও যদি রিসেস পাই, কোথাও আর বেরুতে ইচ্ছে করে না। কোয়ার্টারে গিয়ে শুয়ে থাকি।'

মহেশ্বর বলেন, 'তা ঠিক। আপনার যা পরিশ্রম তাতে বিশ্রামটা খুব দরকার। তবু কখনো সখনো একটু সময় করে এখানে এলে আমাদের ভালো লাগবে—এই আর কী।'

বিজয় একটু হেসে বলল, 'না আসার আরও একটা কারণ ছিল।'
'কী কারণ?'
'আপনার সঙ্গে ঠিক সেভাবে ঘনিষ্ঠতা হয়নি। দু'একবার ভেবেছি আসব। কিন্তু আচমকা এলে যদি কিছু মনে করেন, তাই—'
'এ বাড়ির দরজা সবার জন্যে সবসময় খোলা। আশা করি, এখন থেকে সঙ্কোচ কেটে গেল।'
'নিশ্চয়ই গেল। দেখবেন, মাঝেমাঝেই সুমিত্রা আর আমি এমন হানা দেব যে বিরক্ত হয়ে উঠবেন।'
মহেশ্বর বললেন, 'বিরক্ত কী বলছেন! আপনাদের মতো মানুষেরা হানা দিলে খুশিই হব।'
চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল।
শক্তিনাথ বললেন, 'এবার কিন্তু বেরিয়ে পড়তে হবে। থানার লাইনটা একবার ধর তো মহেশ্বর। দেখ ওসি আছে কিনা। যদি থাকে, আধ ঘণ্টা যেন ওয়েট করে। আমার নাম কোরো না। তা হলে ভড়কে যাবে। লোকটাকে বলবে তুমি তোমার কোনো দরকারে যাচ্ছ।'
মহেশ্বর ফোনে মুলায়েম চৌবেকে পেয়ে যান। চৌবে জানিয়েছেন, ঘণ্টাখানেকের ভেতর থানায় এলে তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে, তারপর এলে তাঁকে পাওয়া যাবে না। একটা ডাকাতির কেসে কুড়ি মাইল দূরের এক গ্রামে তাঁকে ইনভেস্টিগেশনে যেতে হবে।

কয়েক মিনিটের ভেতর সুমিত্রারা সাইকেল রিকশায় চেপে থানায় পৌঁছে গেল।
ওসি মুলায়েম চৌবে ধড়াচুড়ো বুটপট্টি পরে তাঁর কামরাতেই ছিলেন। সুমিত্রাদের, বিশেষ করে শক্তিনাথকে দেখে, একেবারে তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মহেশ্বর আর শক্তিনাথকে তিনি হাড়ে হাড়ে চেনেন। মহেশ্বর তাঁর পত্রিকায় অনেক বার মুলায়েমের নানা গোপন কুকর্মের খবর ফাঁস করে দিয়েছেন। তাই নিয়ে তাঁকে প্রচুর ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। একবার মোটা টাকা ঘুষ খেয়ে রাহাজানির কেস চেপে যাবার খবর 'নহরপুরা সমাচার'-এ বেরুতে চাকরি প্রায় যেতে বসেছিল মুলায়েমের। কী কষ্ট করে সেটা বাঁচাতে পেরেছেন, তা শুধু তিনিই জানেন। সেই থেকে মহেশ্বর সম্পর্কে তাঁর মনে চিরস্থায়ী একটা আতঙ্ক।
শক্তিনাথকে তাঁর ভয় অন্য কারণে। কোর্টে বারকয়েক সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তাঁকে শক্তিনাথের নানা প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। এই ক্রিমিনাল ল'ইয়ারটার জিভে ছুরির ধার। একবার জেরা শুরু করলে শরীরের হাড় পর্যন্ত ঢিলে করে ছাড়েন।
তিন চার বার আদালতে সওয়াল-জবাব শুনতে আসা দর্শকরা হেসে ঢলে পড়তে পড়তে বলেছে, 'ভকিলসাবনে থানেদারকা প্যান্টুল ঢিলা কর দিয়া।' শুনতে শুনতে মুখ লাল হয়ে উঠেছে মুলায়েমের। এ জগতে পুলিশের সঙ্গে বাঘা ক্রিমিনাল ল'ইয়ারদের প্রণয় নেই। সম্পর্কটা সাপ আর বেজির। তবে শক্তিনাথ আর পুলিশের ব্যাপারটা একেবারে একতরফা। পুলিশের ওপর শক্তিনাথের আক্রোশ অন্য উকিলদের চেয়ে অনেক বেশি। শোনা যায়, তাঁর বয়স যখন দশ কী এগারো, তাঁর বাবাকে সাজানো কেসে জড়িয়ে থানায় নিয়ে পুলিশ এমন মেরেছিল যে কোমরের হাড় ভেঙে যায়। এই কারণে জীবনের অনেকগুলো বছর তাঁকে পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে হয়। পুলিশকে এজন্য শক্তিনাথ কখনও ক্ষমা করেননি। আদালতের কাঠগড়ায় কোনো পুলিশ অফিসারকে পেলে রাগারাগি করেন না, তীব্র বিদ্বেষে তাঁর ঠোঁট দু'টো বেঁকে যায় শুধু। তারা যে অপদার্থ, ঘুষখোর, বদ, তাদের পায়ের তলা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত দুর্নীতিতে ঠাসা, জনগণের টাকায় তাদের মতো ভ্রষ্টাচারী ডাকুদের পোষা হচ্ছে—প্রতি মুহূর্তে এসব তিনি বুঝিয়ে দেন।
মহেশ্বরের আসার কথা ছিলই। সেজন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন মুলায়েম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ক্রিমিনাল ল'ইয়ারটা যে এসে হাজির হবে, এটা ছিল খুবই অভাবনীয়। সন্ত্রস্ত তিনি যতটা হয়েছেন, তার চেয়ে অবাক কম হননি। হঠাৎ তাঁর মনে হল, বিজয় এবং সুমিত্রার সঙ্গে যখন ওঁরা

এসেছেন, নিশ্চয়ই কোনো একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যটা কী হতে পারে, ক্রমশ তা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

ভবিষ্যতে সুমিত্রারা, বিশেষ করে পত্রকার আর উকিল তেমন বিপাকে না ফেলে, সেজন্য শশব্যস্ত মুলায়েম বলেন, 'বহেনজি, ডাক্তার সাব, মহেশ্বরজি, ভকিল সাব—কৃপা করকে বৈঠিয়ে।' তারপর ঠাণ্ডাই, মিঠাই ইত্যাদি দিয়ে খাতিরদারির জন্য অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

চেয়ারে বসতে বসতে মহেশ্বর জানিয়ে দেন, 'মেহমানদারির প্রয়োজন নেই মুলায়েমজি। আমরা এইমাত্র ব্রেকফাস্ট সেরে এসেছি। একটা জরুরি ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। দয়া করে সেটা শুনলে খুশি হব।'

তবু মুলায়েম বলে ওঠেন, 'লেকেন—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে এবার শক্তিনাথ বললেন, 'অফিসার, মিঠাই খাওয়াবার জন্য গভর্নমেন্ট আপনাকে নৌকরি দেয়নি। এটা কাজের জায়গা।'

শক্তিনাথের কণ্ঠস্বরে এবং বলার ভঙ্গিতে এমন এক কঠোরতা রয়েছে যে মুলায়েম চমকে ওঠেন। ম্রিয়মাণ সুরে বলেন, 'ঠিক হ্যায়, আপকো য্যায়সা মর্জি।'

শক্তিনাথ বললেন, 'এবার তা হলে কাজের কথা শুরু করা যাক। মুনিয়া নামের একটা মেয়ে রেপড অ্যান্ড মার্ডারড হয়েছে। এ ব্যাপারে সুমিত্রাজিরা আগেই আপনার কাছে এসেছেন। আমাকেও বাধ্য হয়ে আসতে হল।'

এই চারজনের আসার কারণ যে মুনিয়া তার সংকেত আগেই পেয়ে গিয়েছিলেন মুলায়েম। স্থির চোখে তিনি শক্তিনাথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। টের পান, ভেতরে ভেতরে অস্থিরতা এবং ভয়টা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে তাঁর।

শক্তিনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'মুনিয়ার মার্ডার কেসটা কী অবস্থায় আছে?'

মুলায়েম ঢোক গিলে বলেন, 'সুমিত্রা বহেনজিদের কাছে কিছু শোনেননি?'

'শুনেছি। আপনারা মুনিয়ার মার্ডারারকে অ্যারেস্ট করেছেন।'

'হাঁ। একটা কথা ভেবে আমার খুব খারাপ লাগছে—'

'কী ভেবে?'

মুলায়েম বলেন, 'এই ছোটোখাটো ব্যাপারে আপনার মতো এত্তে বড়ে ভকিল সাব পূর্ণিয়া থেকে এতদূরে চলে এসেছেন!' সুমিত্রাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মহেশ্বরজি, ডাক্তারসাব আর সুমিত্রাজি নিশ্চয়ই আপনাকে পরেসানি করে এখানে ছুটিয়ে এনেছেন। বহুত আপশোশকি বাত—'

শক্তিনাথ নীরস, গম্ভীর স্বরে বলেন, 'কেউ আমাকে কষ্ট দিয়ে বা জোর করে ধরে আনেননি। আমি নিজের ইচ্ছায় এসেছি। একটা কথা স্পষ্ট করে জানতে চাই—'

'হাঁ হাঁ, বলুন কী জানতে চান—'

'আপনারা আসল মার্ডারারকে অ্যারেস্ট করেছেন তো?'

মুলায়েম চৌবে নড়েচড়ে বসেন। বলেন, 'জরুর ভকিল সাব। লেকেন—'

শক্তিনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'লেকেন কী?'

'আপনি এরকম একটা প্রশ্ন করলেন কেন? আপনার কি 'শক' হচ্ছে?'

'আমি তো নহরপুরায় থাকি না। তবে এখানে আসর পর অনেকের কাছেই শুনেছি যে ঠিক অপরাধীকে ধরা হয়নি।'

মুলায়েম জোরে জোরে হাত পা এবং মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন, 'নেহী নেহী, এ বিলকুল ঝুট। আমাদের ডিপার্টমেন্টের বদনাম করার জন্যে কেউ কেউ হয়ত এসব রটাচ্ছে।'

শক্তিনাথ বললেন, 'সচ কী ঝুট, সেটা আদালতে প্রমাণ করার ব্যাপার। সে যাক, চৌবেজি আপনাকে একটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি—'

মুলায়েম উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে থাকেন।

শক্তিনাথ বলেন, 'আপনার সঙ্গে আদালতে আমার বেশ কয়েক বার দেখা হয়েছে। ভকিল হিসেবে আমার দৌড় কতদূর, আশা করি আপনি তা জানেন।'

ঢোক গিলে মুলায়েম বলেন, 'হাঁ। আপনি যে আমাদের স্টেটের সবচেয়ে বড় ভকিল সবাই তা জানে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর শক্তিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'যে মার্ডারারকে আপনারা অ্যারেস্ট করেছেন তাকে কোর্টে প্রোডিউস করা হয়েছে?'

মুলায়েম কণ্ঠস্বরে অনেকখানি জোর দিয়ে বললেন, 'জরুর। সরকারি দপ্তরে বসে বে-কানুনি কাজ কি আমি করতে পারি? অ্যারেস্ট করার পরদিন বিনোদকে আদালতে হাজির করেছিলাম। ম্যাজিস্ট্রেট জামিন দেননি। আসছে সপ্তাহে আবার তাকে কোর্টে নিয়ে যেতে হবে।'

এতক্ষণ নিঃশব্দে বাকি সবাই মুলায়েম আর শক্তিনাথের কথোপকথন শুনে যাচ্ছিল। সুমিত্রা হঠাৎ বলে ওঠে, 'এই খবরটা তো আপনি আমাদের দেননি!'

মুলায়েম বললেন, 'কালপ্রিট ধরা পড়লে তাকে কোর্টে নিয়ে যেতে হয়, এটাই তো নিয়ম। আপনাদের মতো এডুকেটেড মানুষের এ সবই জানা। এই মামুলি খবরটা কি দেবার মতো?'

শক্তিনাথ বললেন, 'ওসব আলোচনা থাক। বিনোদের পক্ষে কোনো ভকিল দাঁড়িয়েছে?'

মুলায়েম বললেন, 'ও কি একটা পয়সা ফী দিতে পারবে? কোন ভকিল ওর হয়ে মামলা লড়বে!'

'ম্যাজিস্ট্রেট তো জামিন দেননি। বিনোদ এখন আছে কোথায়?'

'পুলিশ কাস্টডিতে। থানার লক-আপে তাকে রাখা হয়েছে।'

'আমি ওর সঙ্গে দেখা করব।'

'কেন ভকিল সাহেব?'

'বিনোদের কেসটা আমিই লড়ব ভাবছি।'

মুলায়েম বলল, 'ও লুচ্চা, বদমাশ, খুনি। ভকিল সাহেব, আপনার মতো বড়ে আদমি—'

শক্তিনাথ হাত তুলে মুলায়েমকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'আপনি তো জানেন, আমি ক্রিমিনাল ল'ইয়ার। রেপিস্ট, মার্ডারার, বজ্জাতদের নিয়েই আমার কারবার।'

মুলায়েম শেষ বারের মতো শক্তিনাথকে ঠেকানোর চেষ্টা করেন। টেবলের ওপর দিয়ে অনেকখানি ঝুঁকে পরম শুভাকাঙক্ষীর মতো বলেন, 'ভকিল সাহেব, একটা গান্ধা খুনির জন্যে আপনি কেন নিজের এত দামি সময় আর টাকা বরবাদ করবেন? আমি জানি আপনি কোর্টে একবার উঠলে তিনশো এক টাকা পান। বিনোদের তো একটা ফুটা কড়িও দেবার ক্ষমতা নেই।'

'আপনাকে তা নিয়ে ভাবতে হবে না। বিনোদের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিন।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন শক্তিনাথ।

শক্তিনাথের ব্যক্তিত্ব এমনই প্রবল যে মুলায়েমও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান। নিরুপায় ভঙ্গিতে বলেন, 'ঠিক হ্যায়, চলিয়ে। লেকেন—'

'কী?' বিরক্ত চোখে তাকালেন শক্তিনাথ।

মুলায়েম জানালেন, ভকিল হিসেবে একমাত্র শক্তিনাথকেই তিনি বিনোদের কাছে নিয়ে যাবেন। বাকি সবাই ইচ্ছা করলে এই কামরায় অপেক্ষা করতে পারেন। সুমিত্রা, বিজয় বা মহেশ্বরকে আপাতত বিনোদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে না।

এটা মুলায়েমের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। খুনের আসামি হিসেবে যাকে লক-আপে পোরা হয়েছে তার সঙ্গে উকিল ছাড়া অন্য কাউকে দেখা করতে দেওয়া বা না-দেওয়াটা পুরোপুরি তাঁর বিবেচনা এবং বিচার-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে।

শক্তিনাথ বললেন, 'ঠিক আছে, আমি একাই যাব।'

মুলায়েম শক্তিনাথকে সঙ্গে নিয়ে থানার ভেতর দিকে লক-আপের সামনে চলে এলেন। সেটার সামনের দিকে মোটা মোটা, মজবুত লোহার গরাদ। গরাদের গায়ে ভেতরে যাতায়াতের জন্য ছোটো ফোকর। সেখানে তিনটে ভারী তালা ঝুলছে।

হাজতটা দু'ভাগে ভাগ করা, মাঝখানে ইটের দেওয়াল। একদিকে রয়েছে ছ'সাতটা চোর, গুন্ডা, পকেটমার ক্লাসের ক্রিমিনাল। আরেক পাশে একা বিনোদ। কোণের দিকে দেওয়াল ঘেঁষে কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে একটা ধুসো কম্বলের ওপর শুয়ে ছিল সে।

দূরে প্যাসেজের শেষ মাথায় একটা বন্দুকওলা কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। হাতের ইশারায় তাকে কাছে ডেকে এনে মুলায়েম বললেন, 'ওই খুনিটার ঘুম ভাঙাও—'

কনস্টেবল কর্কশ গলায় সারা থানা কাঁপিয়ে চেঁচাতে থাকে, 'এই—এই—এই—'

চমকে ধড়মড় করে উঠে বসল বিনোদ। গরাদের দারোগা, কনস্টেবল এবং একজন অচেনা লোককে দেখে একেবারে সিঁটিয়ে গেল। লোকটা এতটাই ভয় পেয়েছে যে তার চোখদু'টো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। বিনোদের কাছে থানার দারোগা পুলিশ যে কতটা ভীতিপ্রদ, মুহূর্তে টের পেয়ে গেলেন শক্তিনাথ।

বন্দুকধারী কনস্টেবলকে চলে যেতে বলে মুলায়েম খুব নরম গলায় বিনোদকে হাত নেড়ে ডাকলেন, 'ইধর আ—আ না—কোই ডর নেহী—'

দারোগার এমন কোমল ব্যবহারে বিনোদ আদৌ অভ্যস্ত নয়। ব্যাপারটা এমনই অবিশ্বাস্য যে সে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে।

মুলায়েম আগের সুরেই ফের ডাকেন, 'কী রে, অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন? উঠে আয়। বললাম তো ঘাবড়াবার কিছু নেই।'

একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল বিনোদ। তার চোখ রক্তাভ। চুল রুক্ষ এবং ধুলোবালিতে জট-পাকানো, ভাঙা গালে খাপচা খাপচা দাড়ি। তার চাউনিটা ভয়ার্ত পশুর মতো। যন্ত্রচালিতের মতো টলতে টলতে এগিয়ে এসে গরাদ ধরে দাঁড়ায় বিনোদ। তার চোখে মুখে ভয়ের ছাপ যতটা, ঠিক ততটাই হল বিস্ময়। খুব সম্ভব মুলায়েমের এমন সদয় কণ্ঠস্বর আগে কখনও শোনেনি সে।

শক্তিনাথ লক্ষ করলেন, বিনোদের হাতে পায়ে অজস্র কালো-কালো দাগ। ডান ভুরুর ওপরটা ফেটে, ফুলে, রক্তাক্ত মাংসের একটা ডেলা হয়ে ঝুলছে। দু'পাশের চোয়াল, গাল আর কপালে বড় বড় ঘায়ের মতো ক্ষত। কণ্ঠার কাছের মাংস থেঁতলে গিয়ে বিরাট গর্ত হয়ে গেছে। মাথার সামনের দিকে অনেকটা জায়গায় চুল ওপড়ানো, সেখানেও রক্ত জমে আছে। হাত পায়ের আঙুল ফুলে দু'তিন গুণ মোটা হয়ে রয়েছে। এলোপাথাড়ি কিল ঘুষি লাথি মেরে আর বেধড়ক লাঠি চালিয়ে যে তার এই হাল করা হয়েছে সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। বিনোদের দাঁড়িয়ে থাকতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। তার পা এবং মাথা ভীষণ কাঁপছে। লোহার গরাদ ধরে না থাকলে সে হুড়মুড় করে পড়ে যেত।

মুলায়েম শক্তিনাথকে দেখিয়ে বিনোদকে বললেন, 'ইনি বিহারকা সবসে বড়ে ভকিল। তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।'

একে দারোগা, তার ওপর উকিল—সন্ত্রস্ত বিনোদের দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল তার। রুদ্ধশ্বাসে বিড় বিড় করে কী বলল বোঝা গেল না।

বিনোদের শরীরের ক্ষতগুলো দেখিয়ে শক্তিনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'এই চোটগুলো কীভাবে লাগল?'

বিনোদ মুখ খোলার আগেই মুলায়েম ব্যগ্রভাবে বলে ওঠেন, 'আমরা যখন ওকে অ্যারেস্ট করি, এগুলো ছিল।'

কথাগুলো যে ডাহা মিথ্যে তা বলে না দিলেও চলে। তীব্র চোখে মুলায়েমের দিকে তাকিয়ে শক্তিনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কবে ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে?'

'পাঁচ দিন আগে।'

'এই চোটগুলো কিন্তু অত পুরোনো নয়।'

থতিয়ে থতিয়ে কিছু একটা জবাব দিলেন মুলায়েম, তার একটি বর্ণও বোধগম্য হল না।

শক্তিনাথ এবার বললেন, 'চৌবেজি, এখন আপনি নিজের চেম্বারে যান। পুলিশের সামনে আমি ওর সঙ্গে কথা বলব না।'

মুলায়েম খুশি হলেন না। ঘোর অনিচ্ছায়, একান্ত নিরুপায় হয়েই, নিজের কামরার দিকে ফিরে যেতে যেতে বলেন, 'ভকিল সাহেব, আধ ঘণ্টার বেশি সময় আপনাকে দিতে পারব না।'

'ঠিক আছে।'

আতঙ্কগ্রস্ত বিনোদের দিকে তাকিয়ে খুব নরম গলায় শক্তিনাথ তাকে বললেন, 'তোমার কোনো ভয় নেই।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে বিনোদের আতঙ্ক খানিকটা কেটে যায়। শক্তিনাথকে সে আগে কখনও দেখেনি। কিন্তু তিনি যে প্রচন্ড ক্ষমতাবান সেটা মুলয়েম চৌবের মতো জবরদস্ত দারোগাকে একেবারে চুহা বনে যেতে দেখে বুঝতে পেরেছে সে। মনে হয়েছে, এই লোকটার ওপর ভরসা করা যায়।

থানায় ধরে আনার পর এই ক'টা দিন মুলায়েম এবং তার সিপাহীরা নিষ্ঠুরভাবে তাকে পিটিয়েছিল। কথায় কথায় তার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে অকথ্য খিস্তি দিয়েছে। কিন্তু শক্তিনাথের সামনে সেই মুলায়েম চৌবের মুখ থেকে যেন মধু ঝরছিল। শক্তিনাথকে দেখতে দেখতে বিনোদের মনে হতে লাগল, এই লোকটা তাকে হয়ত রক্ষা করতে পারেন। হঠাৎ সে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। ব্যাকুলভাবে বলে, 'হুজৌর আমি বেকসুর। মুনিয়ার খুনের ব্যাপারে কিছুই জানি না।'

বিনোদের একটা হাত আলতো করে ছুঁয়ে সদয় কণ্ঠে শক্তিনাথ বললেন, 'আমি জানি তুমি বেকসুর। কোনো অন্যায় করোনি।'

বিনোদ বলল, 'লেকেন ওরা আমার কথা বিশ্বাস করছে না। আমি যে খুনি সেটা জোর করে কবুল করাতে চাইছে। রোজ এমন মার মারছে যে জানটা বেরিয়ে যাবে।'

শক্তিনাথ বললেন, 'আর যাতে মারতে না পারে তার ব্যবস্থা আমি করছি। আজ থেকে তোমার গায়ে হাত তুলতে ওরা সাহস করবে না।'

হঠাৎ মেঝেতে বসে পড়ে গরাদের ফাঁক দিয়ে দু'হাত বার করে শক্তিনাথের পা দু'টো আঁকড়ে ধরে বিনোদ। একটানা কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'ওরা আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে হুজৌর। আপনি আমাকে বাঁচান। আমার বালবাচ্চা, বুড়হী মা, জরু রয়েছে। আমার ফাঁসি হলে ওদের জীওন বরবাদ হয়ে যাবে।'

'তোমার ফাঁসি হবে না। উঠে দাঁড়াও—'

ধীরে ধীরে গরাদ ধরে উঠে শক্তিনাথের মুখোমুখি দাঁড়াতে দাঁড়াতে বিনোদ বলে, 'লেকেন—'

জিজ্ঞাসু সুরে শক্তিনাথ জানতে চান, 'লেকেন কী?'

'আমি এই হাজত থেকে বেরুতে না পারলে বালবাচ্চারা কী খাবে? কে ওদের দেখবে?'

'খুব তাড়াতাড়ি তোমার জামিনের বন্দোবস্ত করছি। যতদিন না সেটা হচ্ছে সুমিত্রাজি আর মহেশ্বরজি ওদের দেখবেন।' শক্তিনাথ বলতে লাগলেন, 'সুমিত্রাজিদের চেনো তো?'

বিনোদ জানায় খুব ভালো করেই চেনে। সুমিত্রাজি আর পত্রকার মহেশ্বরজির মতো মানুষ হয় না।

শক্তিনাথ বললেন, 'এবার তোমার জামাটা খোল—'

হতভম্বের মতো বিনোদ বলল, 'জামা খুলব!'

'হাঁ। যা বলছি কর।'

গায়ের জামাটা আস্তে আস্তে খুলে ফেলে বিনোদ। তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শরীরের সামনের এবং পেছন দিকের ক্ষতচিহ্নগুলো গুনতে থাকেন শক্তিনাথ। ছোট বড় মিলিয়ে সবসুদ্ধ সাতাশটা। পকেট থেকে ছোটো একটা ডায়েরি বার করে শরীরের কোন কোন অংশে আঘাতগুলো লেগেছে, নম্বর

দিয়ে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিখে রাখেন। তারপর একটা ওকালতনামা বার করে জিজ্ঞেস করেন, 'সই করতে পারো, না টিপ সই দেবে?'

বিনোদ বলে, 'পারি হুজৌর। পাদ্রি সাহেবদের স্কুলে দো সাল পড়েছি।'

শক্তিনাথরা জানেন না, সমাজ কল্যাণ দপ্তর এ অঞ্চলে স্কুল খোলার আগে আইরিশ মিশনারিরা একটা স্কুলে বসিয়েছিল। বাড়ি বাড়ি ঘুরে পিছড়ে বর্গের মানুষ আর আদিবাসীদের ছেলেমেয়ে জোগাড় করে এনে সেখানে ভর্তি করা হয়, কিন্তু স্কুলটা ছিল স্বল্পায়ু। চার পাঁচ বছর চলার পর উঠে যায়। সেই সময় ওখানে কিছুদিন যাতায়াত করেছিল বিনোদ। শক্তিনাথ বিনোদকে দিয়ে সই করিয়ে ওকালতনামা পকেটে পুরতে পুরতে বললেন, 'এখন আমি যাচ্ছি। আসছে সপ্তাহে আদালতে আবার তোমাকে হাজির করা হবে। তার আগেই এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

শক্তিনাথের সামনে বিলকুল চুহা বনে গেলেও তিনি চলে যাবার পর মুলায়েমরা কী মূর্তি ধারণ করবে, সে সম্পর্কে ভেতরে ভেতরে আশঙ্কা একটা ছিলই বিনোদের। সেই কথাটা ভয়ে ভয়ে জানাতেই ফের ভরসা দিয়ে শক্তিনাথ বললেন, 'তোমাকে তো বলেছি, তোমার গায়ে হাত তুলতে পুলিশ সাহস করবে না।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে বিনোদ, 'ঠিক হ্যায়।'

শক্তিনাথ আর দাঁড়ালেন না, সোজা ওসি'র চেম্বারে চলে এলেন।

সুমিত্রা উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। মহেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, 'কথা হল বিনোদের সঙ্গে?'

শক্তিনাথ বললেন, 'হাঁ। ওকালতনামায় ওর সইও করিয়ে এনেছি।'

মুলায়েম চৌবে তাঁর চেয়ারে খাড়া হয়ে বসলেন। ঢোক গিলে বললেন, 'একটা কথা বলব স্যার?'

ভুরু কুঁচকে মুলায়েমের দিকে তাকালেন শক্তিনাথ, 'বলুন—'

মুলায়েম বললেন, 'একটা লুচ্চা, বদমাশ, খুনির জন্যে আপনার মতো এত বড় ভকিল মাগনায় কেস লড়বেন, এ আমার ভালো লাগছে না শক্তিনাথজি—'

শক্তিনাথ বুঝতে পারছিলেন, যেভাবেই হোক বিনোদের কাছ থেকে তাঁকে তফাতে রাখতে চাইছেন মুলায়েম। তিনি যাতে এই মামলাটা না নেন সেজন্য প্রথম থেকেই নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করছেন। শক্তিনাথ বললেন, 'আমার শুভাকাঙ্ক্ষীর মতোই সৎ পরমার্শ দিচ্ছেন মুলায়েমজি। লেকেন আপনি তো জানেন আমি খুব ঠেটা আদমি। যেটা ঠিক করি সেটা করেই ছাড়ি। আমাকে এ ব্যাপারে আর কিছু বলবেন না।'

পাংশু মুখে বিড় বিড় করে মুলায়েম কী একটা উত্তর দেন, ঠিক বোঝা যায় না।

শক্তিনাথ বললেন, 'এবার আমার একটা কথা খুব মন দিয়ে শুনুন—'

'জি—' মুলায়েম সোজাসুজি শক্তিনাথের দিকে তাকালেন, তাঁর চোখে চাপা উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল।

শক্তিনাথ বলতে লাগলেন, 'গুনে গুনে দেখেছি বিনোদের সারা গায়ে সাতাশটা চোটের দাগ রয়েছে। তার কোনোটাই পুরোনো নয়। গত দু'চার দিনের মধ্যে মেরে তার ওই হাল করা হয়েছে।'

মুলায়েম কী উত্তর দিতে গিয়ে মুখ বুজে ফেলল।

শক্তিনাথ থামেননি, 'চৌবেজি, আপনি বলেছেন, আসছে উইকে ফের বিনোদকে আদালতে নিয়ে যাবেন।'

'হাঁ। ঠিক সাতদিন পর।'

'আপনাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, এই সাতদিনের ভেতর ওর গায়ে যেন সাতাশটার জায়গায় আটাশটা চোটের দাগ না পাওয়া যায়। কথাটা মনে থাকবে?'

'জি—'

'যদি তেমন কিছু আমার চোখে পড়ে তার ফলাফল মারাত্মক হবে।'

মুলায়েম উত্তর দিলেন না, অক্ষম আক্রোশে শক্তিনাথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শক্তিনাথ আর বসলেন না। সুমিত্রাদের নিয়ে উঠে পড়তে পরতে বললেন, 'আজ যাচ্ছি। ভবিষ্যতে আশা করি, ফের দেখা হবে। নমস্তে—'

'নমস্তে—'

থানার বাইরে এসে মহেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার আমাদের কী করণীয়? সাক্ষীদের ঠিক কখন পাওয়া যাবে?'

সুমিত্রা জানাল, 'বিজয়ের কাজের লোক হরিয়াকে ছত্তরপুরে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে সাক্ষীদের নিয়ে দু'টো আড়াইটা নাগাদ ফিরে আসবে। ওরা এলেই ওদের নিয়ে আপনার অফিসে যাব।'

একটু ভেবে মহেশ্বর বললেন, 'আপনাদের আর কষ্ট করে আমার ওখানে আসতে হবে না। শক্তিনাথকে নিয়ে আমিই আপনার কোয়ার্টারে সাড়ে তিনটে চারটের মধ্যে চলে আসছি। কোনো রকম অসুবিধা হবে না তো?'

সুমিত্রা ব্যস্তভাবে বললেন, 'না না, কিসের অসুবিধে? আপনারা আসবেন, এ তো আমার দারুণ সৌভাগ্য। দয়া করে নিশ্চয়ই আসবেন।'

শক্তিনাথ মনে করিয়ে দিলেন, 'কাল কিন্তু পুর্ণিয়ায় আমার খুব ইমপর্টান্ট একটা কেস আছে। সন্ধের বাস ধরে ফিরে যেতে না পারলে সব গোলমাল হয়ে যাবে।'

সুমিত্রা বলল, 'হরিয়ার যথেষ্ট দায়িত্ববোধ। ও দেরি করবে না। আপনি সন্ধের বাস অবশ্যই ধরতে পারবেন।'

মহেশ্বর বললেন, 'ঠিক আছে। এখন তা হলে চলি—'

শক্তিনাথ আর মহেশ্বর চলে গেলেন। একটা রিকশা ডেকে বিজয়কে নিয়ে উঠে পড়ল সুমিত্রা।

ষোলো

খাওয়া দাওয়া সারতে সারতে আড়াইটা বেজে গেল সুমিত্রাদের। সকালে মহেশ্বরদের বাড়ি যাবার আগে আনাজ টানাজ কেটে, লখিয়াকে দিয়ে বাটনা বাটিয়ে, আয়োজন অনেকটাই করিয়ে রেখেছিল সে। থানা থেকে বিজয়কে নিয়ে ফেরার পর রান্না সারতে বেশ দেরি হয়ে গেছে। সুমিত্রা ভেবে রেখেছিল, এক ফাঁকে স্কুলে ঘুরে আসবে, কিন্তু আজ আর তা সম্ভব নয়। কেননা, বিজয়কে একা কোয়ার্টারে ফেলে রেখে যাওয়াটা ঠিক হবে না। তা ছাড়া যে কোনো মুহূর্তে লচ্ছুদের নিয়ে ফিরে আসবে হরিয়া। রামবনবাসকে দিয়ে সুমিত্রা স্কুলে উপাধ্যায়জিকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে, আজ আর সে যাচ্ছে না। উপাধ্যায়জি এবং অন্য মাস্টারজিরা যেন তার ক্লাসগুলো নেন।

খাওয়ার পর খাটে কাত হয়ে শুয়ে আছে বিজয়। কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে তার সঙ্গে এলোমেলো গল্প করছে সুমিত্রা। মুনিয়ার ভয়াবহ মৃত্যু, মুলায়েম চৌবের বজ্জাতি, সম্পূর্ণ নির্দোষ গঞ্জু বিনোদের ওপর থানায় নিষ্ঠুর অত্যাচার—এই সব অলোচনার পর তাদের বিয়ের প্রসঙ্গটা এসে পড়ল।

বিজয় বলল, 'তোমার বাবা মণিহারি ফিরে গিয়ে কি কিছু জানিয়েছেন?'

বিজয় কী জানাবার কথা বলছে, সুমিত্রার তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সে একটু চকিত হয়ে ওঠে। তারপর মুখ নামিয়ে খুব আস্তে আস্তে বলে, 'না।'

একটু চুপচাপ।

তারপর বিজয় অল্প হেসে বলে, 'তুমি হয়তো ভাবছ, বিয়ের জন্যে আমি অস্থির হয়ে পড়েছি।'

সুমিত্রা বলল, 'আমি কি তা বলেছি?'

এ কথার উত্তর না দিয়ে বিজয় বলল, 'একটা ব্যাপারে আমার ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে।'

উৎসুক সুরে সুমিত্রা জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপারে?'

'তোমার বাবুজি যখন আমার সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা বাড়ি ফিরে আত্মীয়স্বজনদের বলবেন, বিরাট গন্ডগোল বাধবে। তিনি কীভাবে সামাল দেবেন বুঝতে পারছি না।' বিজয় বলতে লাগল, 'ওঁকে ভীষণ বিপদে ফেলে দেওয়া হল।'

সুমিত্রা বলল, 'বাবুজিই পারবেন আমাদের বিয়েটা বেশির ভাগ আত্মীয়দের দিয়ে মানিয়ে নিতে। তবে—'

'কী?'

'কয়েকজন রিলেটিভ এটা কিছুতেই মানবেন না। ওঁরা খুব গোঁড়া। ওঁদের সঙ্গে আমাদেব সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে।' সুমিত্রা মুখটা ধীরে ধীরে ফিরিয়ে জানালার বাইরে তাকাল। অন্যমনস্কর মতো এবার বলল, 'নতুন কিছু পেতে হলে পুরোনো কিছু হারাতে হয়।' একটু চুপ করে থাকার পর ফের বলল, 'আমার বিশ্বাস, যাদের দিক থেকে বাধা বা আপত্তি আসবে, দু'চার বছর পরে তারা ধীরে ধীরে মেনে নেবে।'

বিজয় কী বলতে যাচ্ছিল, হরিয়া ছত্তরপুরা থেকে লচ্ছু, পাওয়ান আর ধনিয়াকে সঙ্গে করে হাজির হল। ধনিয়ার বয়স ত্রিশ বত্রিশ, লচ্ছুর চেয়ে বছর দশেকের ছোটো। তার স্বাস্থ্য বেশ ভালো, লচ্ছুর মতো রোগা নয়। গায়ের রং তামাটে, পুরু ঠোঁট, মোটা নাক, চুল ছোটোছোটো করে চামড়া ঘেঁষে ছাঁটা। পরনে চাপা আধময়লা পাজামা আর ডোরা-কাটা হাফ শার্ট।

পাওয়ান লচ্ছু এবং ধনিয়ার চেয়ে বেশ বড়, পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। চুলের আধাআধি সাদা হয়ে গেছে। ঢ্যাঙা চেহারা তার। শরীর ভাঙাচোরা। লম্বাটে মুখ, চওড়া কপালে প্রচুর আঁকিবুকি, গায়ের চামড়া কোঁচকানো। হাত-পায়ের আঙুলগুলো গাঁট পাকিয়ে গেছে। শিরদাঁড়া বেঁকে যাওয়ায় তাকে খানিকটা কুঁজো দেখায়। তোবড়ানো গালে কয়েকদিনের কাঁচাপাকা দাড়ি। সে পরে আছে খাটো ধুতি আর লালের ওপর সবুজ চেক-কাটা কামিজ।

লচ্ছুরা বিজয় এবং সুমিত্রাকে অনেকদিন ধরে চেনে। তিনজনই হাতজোড় করে, অনেকখানি শরীর ঝুঁকিয়ে, সসম্ভ্রমে বলল, 'নমস্তে বহেনজি, নমস্তে ডাক্তার সাব—'

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে লচ্ছুদের বসতে বলল সুমিত্রারা। লচ্ছুরা মেঝেতে থেবড়ে বসে পড়ে। এ অঞ্চলে আসার পর সুমিত্রা লক্ষ করেছে, তাদের সামনে ওরা কখনও কুরসি বা উঁচু জায়গায় বসে না। নিজেদের তারা সুমিত্রাদের সমকক্ষ ভাবতেই পারে না। এই ছোটো ভাবার মানসিকতা একদিনে তৈরি হয়নি। এটা কাটিয়ে উঠতে কতকাল লাগবে, কে জানে।

সুমিত্রা বলল, 'তোমাদের সঙ্গে বিশেষ দরকার আছে। তাই হরিয়াকে পাঠিয়েছিলাম। এতটা রাস্তা আসতে হল। তোমাদের কষ্ট না দিয়ে উপায় ছিল না।'

লচ্ছু বলল, 'কীসের কষ্ট! আপনি বললে আমরা দু'পাঁচ 'মিল' (মাইল) কী, শও 'মিল' হাঁটতে পারি।'

'তোমাদের দুপুরের খাওয়া হয়েছে তো?'

'হাঁ, বহেনজি। আমরা খেয়েই এসেছি।'

'ঠিক তো?'

'হাঁ হাঁ—' তিনজনেই জোরে মাথা নাড়ে, 'আপনার কাছে ঝুট বলতে পারি?'

হরিয়া কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। জানাল, সত্যিই লচ্ছুরা খাওয়া সেরে এসেছে।

সুমিত্রা বলল, 'ঠিক আছে। এতটা রাস্তা ভেঙে আসতে যদি খিদে পেয়ে থাকে, লজ্জা না করে বল। ভাত চাপিয়ে দিচ্ছি—'

ধনিয়া বলল, 'আপনার কাছে লজ্জা কী। তবে বিকেলে চা খাওয়াতে হবে কিন্তু—'

'নিশ্চয়ই।'

হরিয়ার ভাত-তরকারি ঘরের একধারে ঢাকা দেওয়া ছিল। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে সুমিত্রা বলল, 'খেয়ে নাও—'

হরিয়া ভাতের থালা টালা তুলে নিয়ে বাইরের বারান্দায় চলে গেল।

সুমিত্রা এবার লচ্ছুদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন তোমাদের ধরে এনেছি জানো? হরিয়া কিছু বলেছে?'

পাওয়ান জানায়, হরিয়া কিছু না বললেও মুনিয়া হত্যার ব্যাপারেই যে তাদের ডেকে আনা হয়েছে, সেটা আন্দাজ করতে পারছে।

সুমিত্রা বলল, 'ঠিকই আন্দাজ করেছ। পূর্ণিয়া থেকে বড় ভকিল সাহেব শক্তিনাথজি নহরপুরায় এসেছেন। কিছুক্ষণের ভেতর উনি এখানে আসবেন। তোমাদের সঙ্গে ওঁর জরুরি কথা আছে।'

'গাওয়ার ব্যাপারে?'

'হাঁ।'

লচ্ছুরা আসার মিনিট কুড়ি বাদে শক্তিনাথ আর মহেশ্বর চলে এলেন। তাঁদের সমাদর করে বসানো হল। সুমিত্রা লচ্ছুদের সঙ্গে শক্তিনাথের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শক্তিনাথ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মুনিয়া হত্যার রাতে কী ঘটেছিল, সব লচ্ছুদের কাছে জেনে নিলেন। লচ্ছুরা সুমিত্রাদের যা বলেছিল, প্রশ্নের উত্তরে হুবহু তা-ই বলল।

শক্তিনাথ এবার বললেন, 'আদালতে মুনিয়ার মামলা খুব শিগগিরই উঠবে। তখন তোমাদের তিনজনকে গাওয়ার জন্যে ডাকা হবে। তোমাদের গাওয়ার ওপরেই গঞ্জু বিনোদের বেকসুর খালাস আর বিনোদ ঝা'র সাজা নির্ভর করছে।'

লচ্ছু খুব চালাক চতুর লোক। দুনিয়ার অনেক খবর সে রাখে। বলল, 'জানি তো হুজৌর। আদালতে মামলা জোরদার করতে ভালো গাওয়াটা বহুত জরুরি।'

'একটা কথা ভেবে দেখেছ?'

'কী?'

'বিনোদ ঝা যার ছেলে সেই মুনীশ্বর ঝা বহুত পয়সাবালা আদমি। পয়সা যেমন আছে তেমনি তার হাতে রয়েছে গন্ডা গন্ডা পহেলবান আর বন্দুকবাজ।'

'হাঁ, জানি তো।'

শক্তিনাথ বলতে লাগলেন, 'যখনই মুনীশ্বর জানতে পারবে তোমরা সাক্ষি দিয়ে তার ছেলেকে ফাঁসাতে চাইছ তখন সে কী করতে পারে বলে তোমার মনে হয়?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে লচ্ছু। তারপর জানায়, কিছুই সে ভাবতে পারছে না। আদালতে গাওয়া দেবে তারা, মুনীশ্বর ঝা'র এতে কী করার থাকতে পারে সেটাই ওর মাথায় আসছে না।

শক্তিনাথ বললেন, 'প্রথমে মুনীশ্বর ঝা টাকা দিয়ে তোমাদের কিনে নিতে চাইবে। তোমরা যাতে ঝুটা গাওয়া দিয়ে ওর ছেলেকে বাঁচিয়ে দাও সেজন্যে যত টাকা চাও সব পাবে।'

লচ্ছু মানুষটা আদ্যোপান্ত সৎ, সাহসী। খানিকটা আবেগের ঝোঁকে চলে। সে বলল, 'ওই মুনীশ্বর ঠিকাদারের লুচ্চা বেটোয়াকে বাঁচাতে আমি পাইসা নেব! পাইসা দিতে এলে আমি ওর মুখে দশ বার থুক দেব। আমি চাই বিনোদ ঝা ফাঁসিতে ঝুলুক। তা হলে মুনিয়ার পারমাত্মার শান্তি হবে।'

শক্তিনাথ বললেন, 'খুব ভালো কথা। লেকেন—'

'লেকেন কী?'

'পয়সা দিয়ে তোমাকে কিনতে না পারলে কিন্তু বন্দুকবাজদের লেলিয়ে দেবে মুনীশ্বর।'

ঠিক এ জাতীয় কথাই কয়েক দিন আগে সুমিত্রাও বলেছিল। লচ্ছু কিছু উত্তর দিতে গিয়ে থমকে গেল।

ওদিকে আধবুড়ো কোলকুঁজো পাওয়ান হাতজোড় করে হাইমাই করে উঠল, 'হুজৌর, আমরা বহোত গরিব আদমি। গাওয়া দিতে গিয়ে কি জানটা চলে যাবে? বালবাচ্চা তা হলে ভুখা মরবে।'

ধনিয়াও একই সুরে বলতে লাগল, 'মাফি মাংতা হ্যায় হুজৌর, আমাদের কিরপা করে ছেড়ে দিন।'

ওদের থামিয়ে দিয়ে শক্তিনাথ বললেন, 'ডরো মাত্। ওরা যাতে তোমাদের গায়ে একটা আঁচড়ও কাটতে না পারে, তার ব্যবস্থা আমি করব।'

ওরা, বিশেষ করে ধনিয়া আর পাওয়ান কতটা ভরসা পেল, কে জানে। তবে লচ্ছু বলল, তার এবং তার বউ-বাচ্চাদের যদি ক্ষতি না হয় সাক্ষি দিতে সে রাজি।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে লচ্ছুরা ছত্তরপুরায় ফিরে গেল। বেলা অনেকখানি হেলে গিয়েছিল। শক্তিনাথও আর বসলেন না, তাঁকে পূর্ণিয়ার বাস ধরতে হবে। মহেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি উঠে পড়লেন।

সতেরো

ক'দিন পর 'নহরপুরা সমাচার'-এর পুরো দু'পাতা জুড়ে মুনিয়া হত্যা এবং ধর্ষণের রিপোর্টটা বেরুতে সারা শহর জুড়ে হইচই শুরু হয়ে গেল।

শক্তিনাথ যেমন পরামর্শ দিয়েছিলেন, অবিকল সেইভাবে নিজেই রিপোর্টটা লিখেছেন মহেশ্বর। অবশ্য তাঁর নাম ছাপা হয়নি। নিজস্ব সংবাদদাতার অন্তর্তদন্তমূলক প্রতিবেদন হিসেবে ওটা বেরিয়েছে।

মহেশ্বর নাম না করেও পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন, মুনিয়া হত্যার কেসে বিনোদ নামে একটি গরিব গ্রাম্য গঞ্জু যুবককে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য এক বিনোদ যে লম্পট, মাতাল এবং বদমাশ, সে-ই যে এই কুকীর্তিটি করেছে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু তার বাবা প্রচুর পয়সাওলা এবং প্রভাবশালী। টাকার জোরে পুলিশের সঙ্গে যোগসাজস করে নিজের ছেলেকে বাঁচাতে তার দুষ্কর্মের দায়টা নিরীহ, নিরপরাধ গঞ্জু বিনোদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। একটি নিরীহ, নির্দোষ মানুষকে এভাবে ফাঁসির দড়ির দিকে ঠেলে দেওয়া ভয়ঙ্কর অপরাধ। উচ্চ প্রশাসনের এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

মুনিয়া হত্যা এবং ধর্ষণের সঙ্গে বিনোদ ঝা যে জড়িত, এমন একটা গুজব নহরপুরার বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। রিপোর্টটা বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক সচকিত হয়ে উঠল।

ছোটো শহরের জীবন খুবই ম্যাড়মেড়ে, অবিরাম ঢিমে তালে গড়িয়ে চলে। সেখানে চমকপ্রদ ঘটনা দু'চার বছরে হয়তো এক-আধবার ঘটে। আর ঘটলে বেশ ক'দিন ধরে সারা শহর তোলপাড় হতে থাকে। মুনিয়া হত্যার রিপোর্টটা বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে নহরপুরার প্রতিটি রাস্তায়, প্রতিটি বাড়িতে একই আলোচনা। প্রবল উত্তেজনায় এই নগণ্য টাউন এখন উথালপাথল।

যেদিন রিপোর্টটা বেরুল সেদিন দশটা নাগাদ সুমিত্রা যখন স্কুলে বেরুচ্ছে সেই সময় কাগজওলা 'নহরপুরা সমাচার'-এর কপিটা দিয়ে গিয়েছিল। তখন পড়ার সময় ছিল না। ছুটির পর কোয়ার্টারে ফিরে কাগজ খুলে প্রতিবেদনটা বার করল সে। মহেশ্বর পাকা হাতে ঘটনা পরম্পরা চমৎকার সাজিয়েছেন। পড়তে পড়তে চোখের সামনে পরিষ্কার ছবি ফুটে উঠছিল। জানানো হয়েছে, লেখাটা কয়েক কিস্তিতে ধারাবাহিক বেরুবে। নিচে 'ক্রমশ' দেখে তা বোঝা যায়।

লেখাটার স্টাইল এত চমৎকার যে বার বার পড়তে ইচ্ছা করে। প্রথম বার পড়ার পর সুমিত্রা আবার যখন শুরু করেছে, সেইসময় হঠাৎ মহেশ্বর এলেন। ক'দিন আগেই শক্তিনাথকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। আজ যে আসবেন, আগে জানাননি।

সুমিত্রা বেশ অবাকই হল। হাতের কাগজটা দ্রুত বিছানায় রেখে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন, আসুন—'

মহেশ্বর ঘরের ভেতর এসে একমাত্র চেয়ারটিতে বসতে বসতে বলেন, 'আচানক এসে ডিসটার্ব করলাম তো?'

সুমিত্রা যে ক'টি মানুষকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করে, মহেশ্বর তাঁদের একজন। বলল, 'একেবারেই না। আপনার যখন ইচ্ছা আসবেন। অলওয়েজ ওয়েলকাম।'

'ধন্যবাদ।' বলতে বলতে বিছানায় 'নহরপুরা সমাচার'টা দেখতে পান মহেশ্বর। জিজ্ঞেস করেন, 'মুনিয়া মার্ডার কেসটা পড়লেন নাকি?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়ে সুমিত্রা।

'ঠিক আছে?'

'নিশ্চয়ই। পড়তে পড়তে মেয়েটার জন্যে নতুন করে এত কষ্ট হচ্ছিল যে বলে বোঝানো যাবে না।'

মহেশ্বর উত্তর দিলেন না। বিষণ্ণ মুখে বললেন, 'কত কম বয়েস মেয়েটার, আর কী ভয়ঙ্কর ভাবেই না তার মৃত্যুটা হল! সত্যিই ভেরি ট্র্যাজিক।'

সুমিত্রা অন্যমনস্কর মতো বলল, 'আমি একটা কথা ভাবছি।'

মহেশ্বর জানতে চাইলেন, করলেন, 'কী?'

'গঞ্জু বিনোদের জন্যে ভীষণ ভয় হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ওকে বাঁচানো যাবে কী?'

'শক্তিনাথ যখন কেসের দায়িত্ব নিয়েছে তখন বিনোদের ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। ও যদি মনে করত বিনোদ দোষী, তা হলে এই মামলা কখনই নিত না।'

মহেশ্বরের কথা শেষ হতে না হতে লখিয়া চা নিয়ে ঘরে ঢোকে। কাকে কীভাবে আপ্যায়ন করতে হবে সেটা তার ভালোই জানা আছে। মহেশ্বরকে কোয়ার্টারে আসতে দেখেই সে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছিল। মহেশ্বর লখিয়ার হাত থেকে চায়ের কাপ নিতে নিতে হাসেন। বলেন, 'এ তো অন্তর্যামী দেখছি। আগে থেকেই আন্দাজ করে নিয়েছে আমি কী চাই। বহুত বহুত ধন্যবাদ।'

লাজুক হেসে লখিয়া চলে যায়।

চায়ে লম্বা চুমুক দিয়ে আরামসূচক শব্দ করেন মহেশ্বর, 'আ!' তারপর বলেন, 'জানি অসময়ে এসে পড়েছি। এখন আপনি স্কুল থেকে ফিরেছেন, খুব ক্লান্ত, রেস্ট দরকার। তবু একটা খবর দেবার জন্যে না এসে পারলাম না।'

উৎসুক চোখে তাকায় সুমিত্রা।

মহেশ্বর বলেন, 'আজ সকালে আমাদের কাগজ বেরিয়েছে। দুপুরে একটা ফোন পেলাম। কার ফোন ভাবতে পারেন?'

'না। কার?'

'মুনীশ্বর ঝা'র।'

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করল, 'কী বলল সে?'

মহেশ্বর বলেন, 'আমাকে তার বাড়ি যাবার জন্য ফোনেই হাতে পায়ে ধরতে লাগল। বলল, গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে—'

মুনীশ্বরের উদ্দেশ্য মোটামুটি বুঝতে পারছিল সুমিত্রা। তাকে উদ্বিগ্ন দেখায়। জিজ্ঞেস করে, 'আপনি গিয়েছিলেন নাকি?'

'পাগল! আমি কি পাঁচ বছরের বাচ্চা যে ওর ফাঁদে পা দিতে যাব!'

'কী বললেন মুনীশ্বর ঝা'কে?'

'বললাম, আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। তার দরকার হলে আমাদের অফিসে আসতে পারে।'

'তখন কী বলল?'

'বলল, আমি এক্ষুনি চলে আসছি।'

'এসেছিল?'

'নিশ্চয়ই। আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে হাজির।'

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'কী বলল?'

চায়ে চুমুক দেবার ফাঁকে হেসে হেসে মহেশ্বর বলতে লাগলেন, 'আন্দাজ করুন তো।'

একটু চিন্তা করে সুমিত্রা বলে, 'নিশ্চয়ই আপনার লেখাটা বন্ধ করার জন্যে পা জড়িয়ে ধরল।'

'একেবারেই না।'

'তা হলে?'

'আমার প্রেসটা ভালো করে ঘুরে ঘুরে দেখল। তারপর বলল 'নহরপুরা সমাচার' হল এই শহরের

গর্ব। কিন্তু যে অবস্থায় সেটা রয়েছে তাতে তার বহুৎ দুঃখ হচ্ছে। হাল ফিরিয়ে পত্রিকাটাকে অনেক বড় করা দরকার। এই শহরে কোনো ডেইলি পেপার নেই। সাপ্তাহিক 'নহরপুরা সমাচার'কে কলকাতা পাটনার দৈনিকগুলোর মতো বিরাট ডেইলি করতে হবে। আমি হেসে হেসে বললাম, মুখের কথা খসালেই তো ডেইলি করা যায় না। তার জন্যে অনেক টাকা চাই মুনীশ্বরজি। এত টাকা কোথায় পাব?'

সুমিত্রা কিছু না বলে উন্মুখ হয়ে রইল।

মহেশ্বর থামেননি। বলতে লাগলেন, 'আমার কথা শুনে মুনীশ্বর ঝা বললে, বড় কাজে টাকার অভাব হয় না মহেশ্বরজি। বললাম, ওটা তো কথার কথা। আমাকে কে টাকা দেবে? মুনীশ্বর অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, আমার কিছু বাড়তি টাকা আছে। আপনি হুকুম করলে সেটা দিতে পারি। বড় বাড়ি কিনে নতুন প্রেস বসান, এফিসিয়েন্ট পত্রকার অ্যাপয়েন্ট করুন। 'নহরপুরা সমাচার'-এর নাম সারা ইন্ডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ুক। আমি বললাম, এ তো খুব ভালো কথা। কিন্তু তাতে আপনার কী লাভ? স্বার্থ ছাড়া কেউ টাকা ঢালে? হাতজোড় করে মুনীশ্বর এবার বললে, আমার অনেক দিনের শখ একটা নিউজ পেপার পাবলিশ করা। লেকেন তার জন্যে প্রচুর বিদ্যাবুদ্ধি চাই। আমার সেসব কিছুই নেই। আপনার পায়ের কাছে বসে যদি নিউজ পেপার সম্পর্কে কিছু শিখতে পারি, জীবনের একটা বড় ইচ্ছা পূরণ হয়।'

সুমিত্রা উৎকণ্ঠিতের মতো জিজ্ঞেস করে, 'আপনি রাজি হয়ে গেলেন?'

মহেশ্বর হাত তুলে সুমিত্রাকে থামিয়ে দিতে দিতে মজার গলায় বলেন, 'রাজি হওয়াই উচিত ছিল। তবে—'

'তবে কী?'

'আমি মূরখ তো। দশ বিশ লাখ টাকা পেয়ে যাবার মতো এত বড় মাওকাটা হাতছাড়া করে দিলাম।'

হেসে সুমিত্রা বলল, 'বহুত আপশোশকি বাত।'

মহেশ্বর অনেকখানি মাথা হেলিয়ে বললেন, 'বিলকুল।'

'কী বলে মুনীশ্বর ঝা'কে ভাগালেন?'

'বললাম, আমি একটা ছোটোখাটো পত্রিকা চালাই। বেশি টাকা দেখলে আমার মাথায় চক্কর লাগে। বেশ সুখেই আছি। বাকি জীবনটা এভাবেই কাটিয়ে দিতে চাই।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী। আমাকে আরও ঘণ্টাখানেক ধরে ভজাতে চেষ্টা করল মুনীশ্বর। কিন্তু—'

মহেশ্বরের কথার মধ্যেই সুমিত্রা বলে ওঠে, 'কিন্তু এত বড় একটা মহৎ প্রচেষ্টা একেবারে বানচাল করে দিলেন—এই তো?'

মহেশ্বর বললেন, 'রাইট। লোকটা কী মতলববাজ বুঝুন। আমাকে টাকার ফাঁদ পেতে কবজা করতে এসেছিল। ভেবেছিল, টাকার থলে হাতে পেলেই আমি ওর বিরুদ্ধে লেখা বন্ধ করে দেব। একটা স্কাউন্ড্রেল।'

'অন্য দিকটা ভেবে দেখেছেন?'

'কী?'

সুমিত্রা বলল, 'আপনি তাড়িয়ে দেওয়ায় লোকটা কিন্তু ভীষণ খেপে রইল। সুযোগ পেলেই আপনার বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাট পাকাবে।'

মহেশ্বর মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'তা তো পাকাবেই। তার জন্যে আমি তৈরি। সাপের ল্যাজে পা দেব আর সে ছোবল দিতে চেষ্টা করবে না, সেটা তো হয় না। মুনীশ্বর আর তার ছেলে দু'টোই ক্রিমিনাল। তবে একবার যখন শুরু করেছি, যুদ্ধটা শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যেতেই হবে।'

'লড়েঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে—' হাসতে হাসতে বলল সুমিত্রা।

মহেশ্বরও হেসে ফেলেন, 'ঠিক বলেছেন।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর মহেশ্বর বলেন, 'লড়াইয়ের কথায় একটা ব্যাপার মনে পড়ে গেল।'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় সুমিত্রা।

মহেশ্বর বলেন, 'মুনীশ্বর ঝা'কে আমি দম ফেলতে দেব না। গঞ্জু বিনোদকে নিয়ে তো লিখছিই। খবর পেয়েছি, আমাদের নহরপুরার ওপর ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের নজর পড়েছে। এখানে বেশ কিছু কল-কারখানা বসবে।'

'এ তো ভালো খবর। কিন্তু এর সঙ্গে মুনীশ্বর ঝা'র কী সম্পর্ক?'

'আছে আছে। সবটা শুনে নিন।'

সুমিত্রা কোনো প্রশ্ন না করে তাকিয়ে রইল।

মহেশ্বর বলতে লাগলেন, 'ইন্ডাস্ট্রি হবে বলে নহরপুরার ডান পাশে গভর্নমেন্ট লেভেলে একটা নতুন টাউনশিপ তৈরির প্ল্যানও করা হয়েছে। অবশ্য এখনও বিষয়টা গোপন রাখা হয়েছে। তবে মুনীশ্বর ঝা'র প্রচুর যোগযোগ। সে খবরটা বার করে ফেলেছে। এবার তার গেম-প্ল্যানটা কী হতে পারে ভাবতে পারেন?'

'না--'ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে সুমিত্রা।

'লাস্ট সাত আট মাস ধরে জোরজার করে, পুলিশ আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের একটা অংশকে ঘুষ টুষ খাইয়ে, গরিব দেহাতিদের প্রচুর জমি জলের দরে কিনে নিয়েছে মুনীশ্বর। আরও কয়েকশ' একর কেনার ব্যবস্থা করছে।'

'এত জমি কেনার উদ্দেশ্যটা কী? এতকাল কনট্রাক্টরি করত মুনীশ্বর। এখন কি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতে চায়?'

হাসতে হাসতে মহেশ্বর বলেন, 'আপনি খুব সরল মানুষ বহেনজি। ছাত্রছাত্রী আর সোশাল কমিটমেন্ট ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারেন না। লোকটার মতলব কী জানেন?'

'কী?'

'সস্তায় যে জমি কিনছে, সেগুলো যারা কল-কারখানা করতে আসছে, তাদের কাছে চড়া দরে বেচে দেবে।'

'বলেন কী!' বেশ চমকেই ওঠে সুমিত্রা।

আস্তে মাথাটা একদিকে হেলিয়ে মহেশ্বর বলেন, 'আমি আমাদের কাগজের একজন রিপোর্টারকে ডিটেলে সব ইনফরমেশন জোগাড় করার জন্যে লাগিয়ে দিয়েছি। ছেলেটা দারুণ বুদ্ধিমান। সে তথ্য প্রমাণ নিয়ে এলেই মুনীশ্বরের বিরুদ্ধে আরেকটা কামান দাগব।'

সুমিত্রা বলে, 'অ্যাটাকটা সব দিক থেকেই করতে চান, দেখছি।'

'নইলে ওকে পহেলবানদের মতো আসমান দেখাব (কুস্তির পরিভাষায় প্রতিপক্ষকে চিত করে আকাশ দেখানো মানে হারিয়ে দেওয়া) কী করে?'

সুমিত্রা হাসতে থাকে।

আঠারো

মহেশ্বর সেই যেদিন এসেছিলেন তারপর আরও আট দিন কেটে যায়। মুনিয়া হত্যা এবং ধর্ষণের ব্যাপারে কিছুই এগোয়নি। সব থমকে আছে।

এর মধ্যে একদিন কোর্টে হাজির করা হয়েছিল গঞ্জু বিনোদকে। পূর্ণিয়ায় বড় মামলা থাকায় শক্তিনাথ আসতে পারেননি। তাঁর একজন জুনিয়রকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু জামিন পাওয়া যায়নি; গঞ্জু বিনোদকে ফের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আজ সকালের দিকে ঘুম থেকে উঠে মুখটুখ ধুয়ে সুমিত্রা যখন চা খাচ্ছে, হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মতো

তিহরলাল এসে হাজির। মুনিয়ার মৃত্যুর পর থেকে সে দাড়িটাড়ি কামায়নি। রক্তবর্ণ চোখের তলায় কালি পড়েছে। দেখামাত্র টের পাওয়া যায়, এ ক'দিন স্নান করেনি সে, ভালো করে ঘুমোয়নি, খায়নি। পরনের চাপা পাজামা আর শার্টটা নোংরা, তেলচিটে।

তিহরলালের দিকে তাকিয়ে সুমিত্রার মনে হল, মারাত্মক কিছু একটা ঘটেছে। অপরিসীম উৎকণ্ঠা নিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, 'হঠাৎ এ সময় তুমি এলে! কী হয়েছে?'

চাপা, খসখসে গলায় তিহরলাল বলল, 'আপনারা ওহী হারামজাদকা ছৌরা বিনোদ ঝা আর তার ঠিকাদার বাপের চামড়ায় একটা নখ বসাতে পারবেন না। মাঝখান থেকে ওই ভোলাভালা, বেকসুর গঞ্জু বিনোদের গলায় ফাঁসির ফান্দা লেগে যাবে।'

সুমিত্রা বলে, 'কী বলতে চাইছ তুমি! গঞ্জু বিনোদের ফাঁসি হবে কেন?'

'হবে, হবে। কেউ রুখতে পারবে না।' তিহরলালের গলার স্বর ক্রমশ কর্কশ হয়ে উঠতে থাকে।

. এবার বেশ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে সুমিত্রা। আসল কথা না বলে সমানে আজেবাজে বকে যাচ্ছে ছোকরা। সে বলে, 'আমরা বিনোদকে বাঁচাবার জন্যে থানা থেকে শুরু করে কত জায়গায় ছোটাছুটি করছি। পূর্ণিয়ার বড় ভকিল শক্তিনাথজিকে লাগিয়েছি। মুখের কথায় বিনোদের ফাঁসি হয়ে যাবে?'

'মুখের কথায় হবে কেন? সচমুচ যাতে হয়, ওহী ভূচ্চরের ছৌরা ঠিকাদার তার ব্যবস্থা করে ফেলেছে।'

'পুলিশকে হাত করে বিনোদ ঝা'র বদলে গঞ্জু বিনোদকে ধরে আদালতে চালনা করা হয়েছে বলে সে ফাঁসিতে ঝুলবে? ব্যাপারটা এত সোজা!'

'আদালতে দু দু'বার বিনোদকে তোলা হয়েছে। আমি কি তখন আপনাকে কিছু বলতে এসেছি?'

'তা হলে এর মধ্যে কী এমন ঘটল যে ছুটে আসতে হল?'

তিহরলাল বলে, 'আপনারা তো লচ্ছুদের গাওয়ার ওপর ভরসা করে আছেন—'

বিমূঢ়ের মতো সুমিত্রা বলে, 'হ্যাঁ। কেন?'

'তা হলে তুরন্ত ছত্তরপুরা গিয়ে লচ্ছুদের সঙ্গে দেখা করুন। সব জানতে পারবেন।' বলে আর দাঁড়ায় না তিহরলাল, লম্বা লম্বা পা ফেলে সদর দরজার দিকে চলে যায়।

সুমিত্রা উঠে দাঁড়িয়ে পেছন থেকে তাকে ডাকে, 'এই তিহর যেয়ো না—শোন—শোন—'

তিহরলাল ফিরেও তাকায় না, মুহূর্তে চবুতর পেরিয়ে সদর দরজার ওধারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ বিভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকে সুমিত্রা। তারপর বিছানায় বসে পড়ে। লচ্ছুদের সঙ্গে দেখা করার কথা কেন বলল তিহরলাল? ওদের কী হতে পারে? ক্ষতির কথাটাই প্রথম মনে এল। কিন্তু ক্ষতি হবে কেন? কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তাকে একটা বিরাট ধন্দ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে ফেলে রেখে তিহরলাল চলে গেছে। মুনিয়া হত্যার ব্যাপারে মূল সাক্ষীই হল লচ্ছুরা। এই মামলাটা সম্পূর্ণ ওদের ওপর নির্ভর করছে। ওদের সঙ্গে দেখা করে কিংবা ডেকে পাঠিয়ে এনে সব কিছু জানাটা একান্ত জরুরি। বিকেলের দিকে রামবনবাসকে ছত্তরপুরায় পাঠিয়ে লচ্ছুদের ডাকিয়ে আনাবে কিনা যখন ভাবছে, লখিয়া এসে হাজির। বলল, 'বহোত বেলা হয়ে গেল। স্কুলে যাবে না?'

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায় সুমিত্রা, 'হাঁ হাঁ, স্কুলে যেতেই হবে।'

'এখনও নাহানা হল না, খাওয়া হল না, কখন যাবে?'

'এই যাচ্ছি—'

কাঁধে তোয়ালে এবং পাট-ভাঙা শাড়ি আর জামা নিয়ে উঠোনের একধারে স্নানঘরের দিকে চলে যায় সুমিত্রা।

স্কুলে এসেও ভালো করে ক্লাস করতে পারে না সুমিত্রা। পড়ানো ছাড়াও হেডমিস্ট্রেসের নানারকম দায়দায়িত্ব রয়েছে। কোনো কাজেই মন বসে না তার। তিহরলাল লচ্ছুদের কথা বলে যাবার পর থেকেই সে ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে আছে।

শুধু অন্যমনস্কতাই নয়, প্রচন্ড উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তাও যেন ক্রমশ চারপাশ থেকে সুমিত্রাকে ঘিরে

ফেলছিল। সমাজ কল্যাণ দপ্তরের এই স্কুলটা তার ধ্যানজ্ঞান। রোজ দশটায় এখানে পা রাখার পর থেকে ছুটি পর্যন্ত তার নিশ্বাস ফেলার সময় থাকে না। আজ তাকে দেখে মনে হচ্ছে, এই স্কুলের সঙ্গে তার যেন কোনো সম্পর্ক নেই। হঠাৎ বুঝিবা সে এখানে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছে। খানিকটা সময় উদাসীনভাবে কাটিয়ে চলে যাবে।

অন্য মাস্টারজিরা, বিশেষ করে সেকেন্ড টিচার বিষুণলাল উপাধ্যায় সুমিত্রাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল। লোকটার চেহারা রোগাটে, পাকানো ধরনের। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এমনিতে ভীষণ ধূর্ত, ধড়িবাজ, কিন্তু মুখে সর্বক্ষণ মধুর একটি হাসি লেগেই আছে। বিষুণলাল জিজ্ঞেস করে, 'আপনাকে আজ এরকম দেখাচ্ছে কেন সুমিত্রাজি?'

লোকটাকে আদৌ পছন্দ করে না সুমিত্রা। ওকে দিয়ে স্কুলের কাজগুলো, যেমন ছেলেমেয়েদের পড়ানো বা সে যেদিন স্কুলে যেতে পারে না, সেদিন স্কুলের শৃঙ্খলা রক্ষা করা, এবং প্রশাসনের অন্যান্য দিক সে মোটামুটি চালিয়ে নেয়। কিন্তু বিষুণলালের নানা বিষয়ে, বিশেষ করে সুমিত্রা সম্পর্কে, অপার কৌতূহল। মাঝে মাঝে সে যখন একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রশ্ন করে সেটা ভীষণ অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। কেননা তার ঔৎসুক্যের মধ্যে সেক্সের চাপা আঁশটে গন্ধ মেশানো থাকে।

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করল, 'কীরকম দেখাচ্ছে?'

'মনে হচ্ছে, তবিয়ত আচ্ছা নেহী—'বলতে বলতে বিষুণলালের দুই চোখ চরকির মতো সুমিত্রার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘুরপাক খেতে থাকে। তার দুই ঠোঁটে অবশ্য চিরস্থায়ী হাসিটি লেগেই আছে।

সুমিত্রা একটু চমকে ওঠে। বলে, 'না না, আমার শরীর ঠিক আছে।'

'তাহলে?'

'তাহলে কী?'

বিষুণলাল তীক্ষ্ণ চোখে সুমিত্রাকে লক্ষ করতে করতে বলে, 'ক্লাসে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকছেন। আমরা কিছু জিজ্ঞেস করলে স্রিফ হুঁ হাঁ করছেন। আজ সোশাল ওয়েলফেয়াব ডিপার্টমেন্টে একটা জরুরি চিঠি লিখে আমার হাতে দেবার কথা ছিল। সেটা নিয়ে আজই সন্ধের বাসে আমার পাটনা যাবার কথা আছে। চিঠিটা কিন্তু এখনও লেখেননি।'

কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল সুমিত্রা। অন্তত তার ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ে কৌতূহল দেখায়নি বিষুণলাল। পরক্ষণে খেয়াল হল, তিহরলাল আজ এসে সমস্ত কিছু গোলমাল করে দিয়ে গেছে। স্কুল বাড়িটাকে আরও বড় করতে হবে, কম করে চার পাঁচ খানা নতুন পাকা ঘর না তুললেই নয়। কেননা এখানকার দেহাতি, আনপড় মা-বাপদের গোড়ার দিকের প্রবল আপত্তি বা অনিচ্ছা কোনোটাই আর নেই। এখন তারা নিজেরাই অসীম আগ্রহে স্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠাচ্ছে। বুঝতে পারছে, তাদের জীবনটা কোনোরকমে কেটে গেছে কিন্তু জমানা আর আগের মতো নেই, যত দিন যাচ্ছে আমূল পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এখন পেটে কালির অক্ষর না থাকলে উপায় নেই। লেখাপড়াটা ভীষণ জরুরি। স্কুলে আপাতত যে ক'খানা ঘর আছে তাতে এত ছেলেমেয়ের জায়গা হবে না। তাই মাস তিনেক আগে স্কুল বিল্ডিংটা বাড়াবার জন্য কিছু টাকা চেয়ে সমাজ কল্যাণ দপ্তরে চিঠি লিখেছিল সুমিত্রা। ওই দপ্তরের কেরানি থেকে অফিসার পর্যন্ত সবাই তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। অভাব, অশিক্ষা আর হাজার কুসংস্কারে ঠাসা নহরপুরায় অচ্ছুৎ এবং পিছড়ে বর্গের কিষান, ভাগচাষী আর দিনমজুরদের ছেলেমেয়ে জুটিয়ে যেভাবে সে স্কুল বসিয়েছে তা অভাবনীয়। তাই সে কোনো অনুরোধ করলে সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর হয়ে যায়।

নহরপুরার স্কুলটাকে মডেল বলা যেতে পারে। ওটা সমাজ কল্যাণ দপ্তরের গৌরব এবং সুনাম অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। পরে এই মডেলেই অনেকগুলো ডিস্ট্রিক্টে কুড়ি পঁচিশটা স্কুল বসানো হয়েছে।

সুমিত্রার চিঠি পাওয়া মাত্র সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে উত্তর এসে গিয়েছিল। তারা নতুন বাড়ি তৈরির বাজেট চেয়েছে। সুমিত্রা রাজমিস্ত্রি ডাকিয়ে মোটামুটি কত খরচ হতে পারে তা জেনে নিয়ে আজই চিঠি পাঠাবে ঠিক করে রেখেছিল। সেই অনুযায়ী বিষুণলালের জন্য লং-ডিসট্যান্স বাসের

একখানা টিকেটও কাটিয়ে রাখা হয়েছে। বাসটা সোজা পাটনায় যায়। কিন্তু এই অত্যন্ত জরুরি কাজের কথাটাই সে বেমালুম ভুলে বসে আছে। আসলে তিহরলাল ধূমকেতুর মতো হঠাৎ আজ হাজির হয়ে সব জট পাকিয়ে দিয়ে গেছে।

বিব্রতভাবে সুমিত্রা বলে, 'বাজেট তৈরি করাই আছে। দশ মিনিটের ভেতব চিঠিটা লিখে দিচ্ছি উপাধ্যায়জি। আপনি স্টাফ রুমে গিয়ে একটু বসুন—'

বিষুণলাল কিন্তু দাঁড়িয়েই থাকে।

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'আর কিছু বলবেন?'

'হাঁ।'

সুমিত্রা কিছু না বলে বিষুণলালের মুখের দিকে তাকায়।

বিষুণলাল বলে, 'চার পাঁচ সাল একসঙ্গে কাজ করছি। আপনাকে এরকম আগে কখনও দেখিনি। তাই ভাবনা হচ্ছে।' টেবলরে ওপর দিয়ে অনেকখানি ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব সুমিত্রাজি?'

লোকটা নাছোড়বান্দা ধরনের। কেন সুমিত্রাকে দূরমনস্ক এবং চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে তা না জানা পর্যন্ত বিষুণলাল এ কামরা ছেড়ে যাবে বলে মনে হয় না। এবারও উত্তর দেয় না সুমিত্রা, শুধু স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে।

বিষুণলাল হেসে হেসে বলে, 'আমার কী মনে হয় জানেন—'

লোকটার বলার ভঙ্গিতে কিসের একটা সংকেত পেয়ে যায় সুমিত্রা।

দাঁতে দাঁত চেপে সুমিত্রা বলে, 'কী?'

বিষুণলাল চোখ নাচিয়ে বলে, 'জরুর ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে আপনার কিছু গোলমাল হয়েছে। সেই জন্যে তবিয়ত, মন, কোনোটাই আচ্ছা নেই।'

বিজয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কটা নহরপুরার প্রায় কারোরই অজানা নেই। বিষুণলাল লোকটা বিষাক্ত জীবাণুর মতো। যে কোনো সুস্থ স্বাভাবিক ব্যাপারকেও চটচটে রগরগে কেচ্ছায় পরিণত করার অপার্থিব ক্ষমতা তার আছে। সমাজ কল্যাণ দপ্তরের সেই চিঠিটার প্রসঙ্গ থেকে নোংরা মাছির মতো সে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে।

লোকটাকে সুমিত্রা অপছন্দ করে, ওর সংস্পর্শে এলে তার শরীর এবং মন কেমন যেন কুঁকড়ে যায়। ভেতরে ভেতরে এই জঘন্য, নোংরা জীবটাকে ভয় পায় সে। কিন্তু এই মুহূর্তে শরীরের সব রক্ত মাথায় উঠে আসে সুমিত্রার। বিষুণলালকে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না। এমনিতে সে খুবই শান্ত, সংযত, কখনও কারো সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলে না। কিন্তু এখন অত্যন্ত তীব্র স্বরে এবং রূঢ় ভাষায় বলে ওঠে, 'আপনি অভদ্র, ইতর। সব কিছুর একটা সীমা আছে। আপনি তা পেরিয়ে যাচ্ছেন উপাধ্যায়জি। এখানে দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই। স্টাফ রুমে যান। চিঠি লেখা হলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যান—'আঙুল তুলে সোজা দরজা দেখিয়ে দেয় সে।

চার বছর সুমিত্রার সঙ্গে এই স্কুলে পড়াচ্ছে বিষুণলাল। এমন মধুর স্বভাবের, মৃদুভাষী মেয়ে আগে আর কখনও দেখেনি সে। ওর মধ্যে যে একটা প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, কঠোর, তীক্ষ্ণভাষী তরুণী লুকনো ছিল, কে ভাবতে পেরেছে!

প্রথমটা একেবারে থ হয়ে যায় বিষুণলাল। কী করবে, কী বলবে, ঠিক করে উঠতে পারে না।

কণ্ঠস্বর আরেক পর্দা উঁচুতে তোলে সুমিত্রা, 'আপনাকে যে যেতে বলেছি, সেটা কানে যায়নি?'

'হাঁ হাঁ, যাচ্ছি—' ঘা-খাওয়া, ত্রস্ত কুকুরের মতো কুঁই কুঁই করতে করতে একরকম দৌড়েই ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বিষুণলাল।

উত্তেজনায়, রাগে মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছিল সুমিত্রার। মাথার ভেতরটা জ্বালা জ্বালা করছে। লোকটার সীমাহীন স্পর্ধায় প্রচন্ড অবাক হয়ে গেছে সে। ভদ্রতা এবং শোভনতার খাতিরে অনেক সময় সে চুপ করে থাকে বলে, যা ইচ্ছা তা-ই করে পার পেয়ে যাবে লোকটা? কী ভেবেছে সে?

চিৎকার শুনে অন্য মাস্টারমশাইরা ছুটে এসেছিল। এরা বিষুণলালের মতো কুচুটে, নোংরা ধরনের নয়। খুবই নিরীহ এবং শান্ত, কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে এদের অযথা কৌতূহল নেই। সুমিত্রাকে ওরা খুবই শ্রদ্ধা করে।

একজন মাস্টারমশাই, যার নাম মুকুটপ্রসাদ, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে দিদিজি?' তার ভয়ের কারণ, এর আগে আর কখনও এত চড়া গলায় সুমিত্রাকে চেঁচামেচি করতে শোনেনি; নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটেছে।

সুমিত্রা বলল, 'না না, কিছু হয়নি। আপনারা নিজেদের কাজে যান।'

মাস্টারজিদের আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। সুমিত্রার দিকে তাকাতে তাকাতে নিঃশব্দে চলে যায়।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে সুমিত্রা। উত্তেজনা জুড়িয়ে এলে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের সেই চিঠিটা লিখে রামবনবাসকে দিয়ে স্টাফ রুমে বিষুণলাল উপাধ্যায়কে পাঠিয়ে দেয়।

উনিশ

চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ অনুযায়ী পরের সপ্তাহে আবার আদালতে তোলা হল বিনোদকে। মুলায়েম চৌবে স্বয়ং তাকে একটা জিপে করে নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে পাহারাদার হিসেবে সশস্ত্র তিনটি কনস্টেবল, তাদের প্রত্যেকের হাতে রাইফেল।

পূর্ণিয়ায় শক্তিনাথের আজও একটা জরুরি কেস আছে। সেজন্য তাঁর পক্ষে নহরপুরায় আসা সম্ভব হয়নি। তাই আগের দিনের মতো একজন জুনিয়র উকিলকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। নাম প্রভাকর সিং। প্রভাকরের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মাঝারি হাইট তাঁর, মজবুত স্বাস্থ্য। চেহারা বেশ বুদ্ধিদীপ্ত। আজ বিনোদের জামিনের জন্য তিনিই আদালতে দাঁড়াবেন।

সকালের বাসে নহরপুরায় এসে প্রভাকর প্রথমেই মহেশ্বর আর সুমিত্রার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। শক্তিনাথের সেরকমই নির্দেশ ছিল। সুমিত্রাদের সঙ্গে কথা বলে মহেশ্বরের বাড়িতে স্নান-খাওয়া সেরে ওঁদের নিয়ে কোর্টে এসেছেন।

মুনিয়া হত্যার মামলাটা সারা শহর তোলপাড় করে দিয়েছিল। তা ছাড়া 'নহরপুরা সমাচার'-এ এই খুন নিয়ে পর পর বেনামে মহেশ্বরের ক'টা লেখা বেরুনোয় এ অঞ্চলের মানুষের আগ্রহ প্রচন্ড বেড়ে গিয়েছিল। ফলে আদালতে এত ভিড় হয়েছে যে একটা কুটো ফেলার জায়গা নেই। শক্তিনাথ আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, খুনের কারণে যাকে ধরা হয়েছে, অভিযোগ যত মিথ্যেই হোক, তাকে কোর্ট সহজে জামিন দেবে না। জামিন পাওয়ার আগে অন্তত দু'তিন বার তাকে আদালতে তোলা হবে। তবু যদি জামিনটা পাওয়া যায় এমন একটা দুরাশা নিয়ে সুমিত্রা স্কুল কামাই করে আজ এখানে চলে এসেছে। বিজয়েরও আসার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হঠাৎ তাকে একটা অপারেশন করতে হবে বলে আসা সম্ভব হয়নি।

সুমিত্রা আর মহেশ্বর ছাড়াও এসেছে তিহরলাল, মুনিয়ার বাপ মহাদেও এবং ওদের গাঁওয়ের আরো কয়েকজন। অওতারকেও তাদের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

ম্যাজিস্ট্রেট যে উঁচু মঞ্চটায় বসেন তার সামনের দিকে সারি সারি বেঞ্চ। প্রথম বেঞ্চটায় বসেন উকিলেরা। সেখানে প্রভাকর ছাড়া পাবলিক প্রসিকিউটর এবং আরো দু' চারজন উকিল বসে আছেন। পরের বেঞ্চে প্রভাকরের ঠিক পেছনে বসেছে সুমিত্রা আর মহেশ্বর। তিহরলালরা অবশ্য বসেনি। তারা শেষ সারিতে যে বেঞ্চ পাতা রয়েছে সেগুলোর পেছনের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

ম্যাজিস্ট্রেট এখনও আসেননি। বিনোদকেও কাঠগড়ায় তোলা হয়নি। চারিদিকে সকলে চাপা গলায় কথা বলছিল। ফলে একটা গুঞ্জনের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রভাকর একটু হাসলেন, 'আমার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হবে না। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কী হয়—'

খুব একটা ভরসা দিলেন না প্রভাকর। ভেতরে ভেতরে বেশ হতাশই হল সুমিত্রা।

এই সময় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এলেন এবং পি পি অর্থাৎ পাবলিক প্রসিকিউটরের সঙ্গে কথা বলে বিনোদকে কাঠগড়ায় তোলার আদেশ দিলেন।

আলোচনা থামিয়ে সামনের দিকে ঘুরে বসলেন প্রভাকর। আর তখনই মহেশ্বরের নজরে কিছু পড়ল। সুমিত্রার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললেন, 'ডান পাশে থার্ড রো'যের প্রথম লোকটাকে বাদ দিয়ে পরের তিনজনকে লক্ষ করুন।'

সুমিত্রা অনেকখানি ঘুরে তাকাল। যে তিনজনের কথা মহেশ্বর বললেন তারা সবাই মধ্যবয়সী। তিনজনেরই পেটানো, চোয়াড়ে চেহারা। দু'জনের জমকালো গালপাট্টা, তৃতীয় লোকটির মোমে-মাজা সূক্ষ্ম গোঁফ। গোঁফদাড়ির এই বহর তাদের মুখগুলোকে ভীতিকর করে তুলেছে। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে ওরা এধারে ওধারে তাকাচ্ছিল। লক্ষ করলে দেখা যাবে, ওদের চাউনির মধ্যে অদ্ভুত এক নিষ্ঠুরতা লুকানো রয়েছে।

প্রভাকর বললেন, 'দেখলেন?'

'হাঁ।' আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয় সুমিত্রা।

'চিনতে পারলেন?'

'না। তবে দেখেছি মনে হচ্ছে—'

মহেশ্বর বললেন, 'তিনটেই মারাত্মক। লালবিহারী, ফণীশ্বর আর জগনাথ। নামগুলো চেনা চেনা মনে হচ্ছে কি?'

সুমিত্রা চমকে উঠল। এই তিনটে নাম নহরপুরায় কে শোনেনি? সমাজ কল্যাণ দপ্তরের স্কুল এবং পিছড়ে বর্গের আনপড় কিষান আর দিনমজুরদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিদ্যা বিতরণ করা ছাড়া অন্য কোনো দিকে নজর না থাকলেও এই নামগুলো তার কানে ঠিকই পৌঁছে গেছে। রাস্তাঘাটে দু'একবার দেখলেও ওরাই যে সেই তিনজন সেটা জানত না সুমিত্রা।

লোক তিনটে নহরপুরার মার্কামারা ক্রিমিনাল। ওদের নামে কত যে খুন-জখমের অভিযোগ তার হিসেব নেই। তিনজনের কীর্তিকলাপের নানা কাহিনি ভাইরাসের মতো এখানকার হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়।

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'ওরা কোর্টে এসেছে কেন?'

মহেশ্বর বললেন, 'ওরা কার লোক, আপনি কি জানেন না?'

'না তো—'

'ঠিকাদার মুনীশ্বর ঝা, মানে বিনোদ ঝা'র বাপ, ওদের পোষে। কোর্টে আজ কী হল, না হল তার খবর ওরা তাকে পৌঁছে দেবে।'

সুমিত্রা চুপ করে থাকে।

এবার প্রথম সারির বাঁ ধারের শেষ প্রান্তের একজন উকিলকে দেখিয়ে প্রভাকর জিজ্ঞেস করেন, 'ওঁকে চেনেন?'

সুমিত্রা আস্তে মাথা নাড়ে, 'না।'

'উনি হলেন দিগ্বিজয় মিশ্র। মিশ্রজি মুনীশ্বর ঝা'র মাইনে করা ভকিল। গুন্ডা, বন্দুকবাজ লালবিহারীদের আর দিগ্বিজয়জিকে পাঠিয়ে সে এই মামলার ওপর নজর রাখছে।'

'কারণটা কী?'

'ভেরি সিম্পল। বিনোদ, আই মিন গঞ্জু বিনোদ যাতে জামিন না পায়, সেজন্যে পিপি'কে সাহায্য করবেন দিগ্বিজয়জি। আর যদি জামিন পেয়ে যায়, লালবিহারীরা মনে হচ্ছে ঝামেলা করতে পারে।' বলতে বলতে একটু থমকে গিয়ে ফের শুরু করলেন, 'মুনীশ্বর ঝা ভকিল লাগাবে, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু আদালতে বন্দুকবাজদের পাঠাবে, ভাবতেই পারিনি।'

সুমিত্রা উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করল, 'কী ধরনের ঝামেলা ওরা করতে পারে?'

'সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না।' মহেশ্বরকে বেশ চিন্তিত দেখাল।

কোর্টে লালবিহারীদের দেখে এবং তাদের ইতিহাস ভালো করে জেনে ভীষণ টেনশন হচ্ছিল সুমিত্রার। এমন কোনো দুষ্কর্ম নেই যা ওরা পারে না। টেনশনটা হঠাৎ শতগুণ বেড়ে যায় তার।

এদিকে কোর্টের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

প্রভাকর বেশ বিচক্ষণ উকিল। গলার স্বর দারুণ গমগমে। তাঁর বলার ভঙ্গিতে এমন একটা ব্যক্তিত্ব ফুটে বেরোয় যা সবাইকে চকিত করে তোলে। তিনি পরিষ্কার জানালেন, ষড়যন্ত্র করে গঞ্জু বিনোদকে ফাঁসানো হয়েছে। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। তথ্য এবং সাক্ষী হাজির করে পরে মহামান্য আদালতে তা প্রমাণ করা হবে। একটি নিরপরাধ মানুষকে এভাবে আটক করে রাখাটা অমানবিক। অতএব মাননীয় বিচারক যেন তার জামিন মঞ্জুর করেন।

পিপি এতক্ষণ দিগ্বিজয় মিশ্রর সঙ্গে গুজ গুজ করে কী পরামর্শ করছিলেন। এবার উঠে দাঁড়িয়ে প্রবলভাবে জামিনের বিরোধিতা করলেন। তাঁর বলার স্টাইল নাটকীয়। থিয়েটারে অভিনয় করলে যথেষ্ট নাম করতে পারতেন।

পিপি কণ্ঠস্বর একবার উঁচুতে তুলে, পরক্ষণে খাদে নামিয়ে, একটানা বলতে লাগলেন, গঞ্জু বিনোদই অপরাধী। সে একজন চতুর অভিনেতা। এমন একটা ভাব করে আছে যেন তার মতো নিষ্পাপ ব্যক্তি দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি নেই। একটা ফুলের মতো পবিত্র কুমারী মেয়েকে সে ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। তদন্তের স্বার্থে কোনোভাবেই তাকে জামিন দেওয়া উচিত হবে না। দিলে সে সাক্ষ্যপ্রমাণ নষ্ট করে ফেলবে। ফলে একটা জঘন্য অপরাধী শাস্তির হাত এড়িয়ে যাবে। সমাজের পক্ষে সেটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। পরেও সে এ ধরনের অপরাধ যে ঘটাবে না তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে? কাজেই আদালত যেন আরও কিছুদিন গঞ্জু বিনোদকে পুলিশের হেফাজতে রাখার আদেশ দেন।

পিপি'র বক্তব্য শেষ হলে ফের উঠে দাঁড়ালেন প্রভাকর। বিনোদের নির্দোষিতা সম্পর্কে আরও কিছুক্ষণ জোরালোভাবে বলার পর ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললেন, 'ইওর অনার, আপনাকে একটা ভয়াবহ জিনিস দেখাতে চাই।'

ম্যাজিস্ট্রেটকে উৎসুক দেখাল। বললেন, 'কী?'

কাঠগড়ার কাছে এগিয়ে প্রভাকর বিনোদকে বললেন, 'তোমার জামাটা খুলে ফেল—'

যন্ত্রচালিতের মতো জামা খুলল বিনোদ।

প্রভাকর তার শরীরের ক্ষতচিহ্নগুলো দেখিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে বললেন, 'দেখুন ইয়োর অনার, থানায় কীভাবে একে মারা হয়েছে। দয়া করে আঘাতের চিহ্নগুলো লক্ষ করুন।'

ম্যাজিস্ট্রেট মস্ত টেবিলের ওধার থেকে ঝুঁকে দেখতে লাগলেন।

প্রভাকর বলতে থাকেন, 'জোর করে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে বিনোদের ওপর এই অত্যাচার চালানো হয়েছে। এবং ভবিষ্যতে চালানো হবে।'

পিপি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'এসব পুরোনো চোটের দাগ ইওর অনার। থানায় আনার আগেই আঘাতের এই চিহ্নগুলো বিনোদের গায়ে ছিল।'

ঠিক এই কথাগুলোই সেদিন শক্তিনাথকে বলেছিলেন মুলায়েম। নিশ্চয়ই পিপি'কেও তেমনটিই জানানো হয়েছে এবং তিনি আদালতে সেগুলো আওড়াচ্ছেন।

প্রভাকর তীব্র গলায় এর প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু খুন ধর্ষণ এবং খুনের দায়ে অভিযুক্ত কেউ এত তাড়াতাড়ি জামিন পায় না। বিনোদও পেল না। ম্যাজিস্ট্রেট তাকে আরও কয়েকদিন পুলিশের হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিলেন।

প্রভাকর আবেদন করলেন, পুলিশ কাস্টডির বদলে বিনোদকে জেল কাস্টডিতে রাখা হোক, কিন্তু সেটাও নাকচ হয়ে গেল।

কাঠগড়া থেকে নামিয়ে বিনোদকে মুলায়েম চৌবে তাঁর জিপে তুলে চলে গেলেন।

প্রভাকর, মহেশ্বর, সুমিত্রা, তিহরলাল, মহাদেও এবং তাদের গাঁয়ের লোকজনেরা কোর্টরুম থেকে সামনের ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসেছিল। সুমিত্রা প্রভাকরকে জিজ্ঞেস করল, 'এখন আমাদের কী করণীয়?'

প্রভাকর বললেন, 'একবার থানায় যেতে হবে। শক্তিনাথজি বিনোদের কাছ থেকে জেনে নিতে বলেছেন, পুলিশ তাকে আর মারধর করেছে কিনা—'

'চলুন তা হলে—'

মহাদেও এবং তাদের গাঁয়ের লোকেদের চলে যেতে বলে সুমিত্রা আর মহেশ্বর যখন সাইকেল রিকশা ডাকতে যাবেন সেই সময় লালবিহারী, ফণীশ্বর আর জগনাথ মাটি ফুঁড়ে যেন তাঁদের পাশে উঠে এল। লোকগুলোকে খানিক আগে কোর্টরুম থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। এতক্ষণ তারা কোথায় ছিল, কে জানে।

সুমিত্রা অস্বস্তি বোধ করছিল। চোখের কোণ দিয়ে সে লালবিহারীদের লক্ষ করতে লাগল।

জগনাথ নামের লোকটি নিচু গলায় সুমিত্রাকে বলল, 'দিদিজি, আপনাকে একটা কথা বলছি। বহোত ধ্যান দিয়ে শুনুন—'

সুমিত্রা উত্তর দিল না। তার অস্বাচ্ছন্দ্য বাড়তে থাকে। মহেশ্বর আর প্রভাকর একটু দূরে সাইকেল রিকশা খুঁজছিলেন। তাঁদের ডাকবে কিনা, বুঝতে পারছে না। মহাদেও এবং তাদের গাঁয়ের অন্য লোকেরা এখনও চলে যায়নি, কাছাকাছিই রয়েছে। সুমিত্রা লক্ষ করল, জগনাথদের দেখে ওরা ভয়ে একেবারে সিঁটিয়েল গেছে। ওদের থাকা না থাকা দুইই সমান। জগনাথদের বিরুদ্ধে ওরা রুখে দাঁড়াবে, সেটা নেহাতই দুরাশা।

জগনাথ এবার বলল, 'বিনোদ গঞ্জুর ব্যাপারে একেবারেই থাকবেন না। আপনাকে নহরপুরার হর আদমি সম্মান দেয়। একটা বদ, গান্ধা হত্যারার জন্যে কেন নিজের টেইম বরবাদ করছেন?'

ঠিক এই ধরনের কথাই একদিন তার কোয়ার্টারে গিয়ে শুনিয়ে এসেছিল মুনীশ্বর ঝা। এবার নিজের পোষা ক্রিমিনালগুলোকে দিয়েও তাই বলাচ্ছে। খুব মোলায়েম করে বললেও এর ভেতর যে একটা চাপা হুমকি আছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

সুমিত্রা ভেবে নিল, ভয়ে গুটিয়ে থাকলে ওরা পেয়ে বসবে। কড়া গলায় সে কিছু জবাব দিতে যাচ্ছিল, জগনাথের পাশ থেকে লালবিহারী বলে ওঠে, 'জগনাথ ভাইয়া আপনাকে যে বলল সেটা ইয়াদ রাখবেন দিদিজি। আখেরে আচ্ছাই হবে।'

দু'টো ফাঁকা রিকশা পেয়ে গিয়েছিলেন মহেশ্বর। মুখ ফিরিয়ে সুমিত্রাকে ডাকতে গিয়ে জগনাথদের দেখতে পেলেন। ভুরুদু'টো কুঁচকে গেল তাঁর। কিসের একটা আঁচ পেয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে কাছে চলে এলেন তিনি। রুক্ষ গলায় জগনাথদের জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, কী হয়েছে?'

লালবিহারী বলল, 'কিছু না পত্রকারজি, দিদিজির সঙ্গে থোড়েসে বাতচিত করছিলাম। আচ্ছা, নমস্তে—'হাতজোড় করে মাথা ঝুঁকিয়ে ওরা চলে যায়।

মহেশ্বর একই সঙ্গে উৎকণ্ঠা এবং কৌতূহল বোধ করছিলেন। বললেন, 'লালবিহারীরা কি কোনোরকম ঝামেলা করছিল?'

'না। তবে—'

'কী?'

লালবিহারীরা যা যা বলেছে সেসব জানিয়ে দিল সুমিত্রা। শুনে কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন মহেশ্বর। প্রভাকর সাইকেল রিকশা দু'টোর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে ডেকে লালবিহারীদের হুমকির ব্যাপারটা জানিয়ে বললেন, 'ওরা সুমিত্রাজির নার্ভের ওপর প্রেসার ক্রিয়েট করতে চাইছে।'

'হুঁ। সেরকমই মনে হচ্ছে।'

'ক্রিমিনালগুলো মারাত্মক ধরনের। এত ডেসপারেট, যা খুশি করে বসতে পারে।'

প্রভাকর আস্তে মাথা নাড়লেন, 'কোর্ট কমপাউন্ডের ভেতর এসে যারা শাসাতে পারে তাদের পক্ষে সমস্ত কিছুই সম্ভব।'

মহেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা যাতে কিছু না করতে পারে, সে ব্যাপারে প্রিকশনারি মেজার হিসেবে আমাদের তরফ থেকে কী করা উচিত বলে মনে করেন?' একটু ভেবে বললেন, 'মানে বুঝতেই পারছেন, সুমিত্রাজি ওঁর কোয়ার্টারে একলা থাকেন। যদিও পাহারাদার হিসেবে ওঁদের স্কুলের

ক্লাস-ফোর স্টাফের একটি লোক আর তার স্ত্রী আছে। কিন্তু তাদেরও যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। ক্রিমিনালগুলো হামলা করলে কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না। এই অবস্থায়—' বলতে বলতে থেমে গেলেন তিনি।

প্রভাকর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'আমার মতে আজই ওদের নামে থানায় একটা ডায়েরি করা উচিত। আমাকে তো থানায় গিয়ে বিনোদের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। শক্তিনাথজি ওর কাছ থেকে একটা কথা জেনে নিতে বলেছেন। চলুন, একসঙ্গেই যাওয়া যাক। দু'টো কাজই হয়ে যাবে।'

সুমিত্রারা আর দাঁড়াল না, রিকশায় উঠে বসল।

থানায় মুলায়েমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সুমিত্রাদের দেখে তিনি রীতিমতো অবাক। বললেন, 'ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তো বিশ পঁচিশ মিনিট আগে বিনোদকে পুলিশ কাস্টডিতে রাখার হুকুম দিয়েছেন। আর সেটা আপনারা ভালো করেই জানেন। তবে হঠাৎ থানায় কী মনে করে?'

সুমিত্রারা লক্ষ করল, মুলায়েম অভদ্রতা করছেন না ঠিকই, তবে আগের মতো বশংবদ ভাবটা আর নেই। ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশটা হয়তো তাঁকে কিঞ্চিৎ সাহসী করে তুলেছে।

মহেশ্বর বললেন, 'দরকার না হলে কে আর পুলিশের কাছে আসে। থানা এমন একটা জায়গা যেখানে সাধারণ সিটিজেন কি সহজে ঘেঁষতে চায়? সে যাক, যে কারণে আমাদের আসতে হয়েছে তা বলতে হলে খানিকটা সময় লাগবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো কথা বলা যায় না।'

মুলায়েম এবার যেন সচেতন হয়ে উঠলেন। ব্যস্তভাবে বললেন, 'হাঁ হাঁ, কৃপা করকে বৈঠিয়ে—'

সুমিত্রারা মুলায়েমের মুখোমুখি বসে পড়ে।

মুলায়েম এবার আর কিছু না বলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকান।

প্রভাকর বললেন, 'শক্তিনাথজি আজ আসতে পারেননি। পূর্ণিয়ায় তাঁর অন্য কেস আছে। তাঁর জুনিয়র হিসেবে তাই আমাকে আসতে হয়েছে।'

মুলায়েম বললেন, 'তা তো দেখতেই পেলাম। এখন বলুন, আপনাদের জন্যে কী করতে পারি?'

সুমিত্রা লক্ষ করল, অন্য দিন তারা থানায় এলে চা মিঠাই টিঠাই খাওয়াবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন মুলায়েম। আজ মেহমানদারি সম্পর্কে তাঁর এতটুকু আগ্রহ দেখা গেল না।

প্রভাকর বললেন, 'শক্তিনাথজি বলে দিয়েছেন পূর্ণিয়ায় ফিরে যাবার আগে আমাদের ক্লায়েন্টের সঙ্গে যেন একবার আলাদাভাবে দেখা করে যাই।'

মুলায়েম জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

প্রভাকর একটু কড়া গলায় বললেন, 'ক্লায়েন্টের সঙ্গে দেখা করার রাইট তার ল'ইয়ারের থাকে। কেন দেখা করব তা আপনাকে বলতে আমি বাধ্য নই।'

শক্তিনাথের সহকারী তাঁর সিনিয়রের মতোই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। প্রয়োজন হলে রূঢ় ভাষায় কথা বলতে পারেন।

মুলায়েম চকিত হয়ে উঠলেন, 'হাঁ হাঁ, ঠিক হ্যায়। আসুন আমার সঙ্গে—'শুধু প্রভাকরকেই সঙ্গে নিলেন তিনি। মহেশ্বর এবং সুমিত্রা তাঁর চেম্বারে বসে রইল।

থানার ভেতর দিকের লক-আপে যেখানে বিনোদকে রাখা হয়েছিল, প্রভাকরকে সেখানে নিয়ে এলেন মুলায়েম। বিনোদ ডান দিকের দেওয়াল ঘেঁষে চুপচাপ বসে ছিল। মুলায়েমদের দেখে উদ্বিগ্ন চোখে তাকায়। কিছুক্ষণ আগে আদালতে বেশ খানিকটা সময় ওঁদের কাছাকাছি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। এর মধ্যে হঠাৎ কী ঘটেছে যে থানাদার আর নতুন উকিল সাহেব ফের তার কাছে এলেন!

প্রভাকর মুলায়েমকে বললেন, 'কৃপা করে আপনি নিজের চেম্বারে গিয়ে বসুন। আমি বিনোদের সঙ্গে কথা বলে আসছি।'

'ঠিক হ্যায়—'মুলায়েম সিমেন্টের মেঝেতে বুটের আওয়াজ তুলে চলে গেলেন।

প্রভাকর বিনোদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাছে এসো।'

বিনোদ ধীরে ধীরে উঠে আসে। শক্তিনাথজিই যে প্রভাকরকে তাঁর জন্য পাঠিয়েছেন, আগেই তা জেনে গেছে বিনোদ। সে পলকহীন তাঁকে লক্ষ করতে থাকে।

প্রভাকর জিজ্ঞেস করেন, 'শক্তিনাথজি একটা কথা তোমার কাছ থেকে জেনে যেতে বলেছেন।'

আবছা গলায় বিনোদ বলে, 'কী?'

'উনি তোমার সঙ্গে কয়েকদিন আগে দেখা করেছিলেন। তারপর পুলিশ কি তোমাকে আর মারধর করেছে?

'নেহী হুজৌর।'

প্রভাকর বললেন, 'ঠিক বলছ তো? নাকি থানেদার বলতে বারণ করেছে?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে বিনোদ, 'নেহী, নেহী—'সে জানাল, স্বীকারোক্তির জন্য লাগাতার হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন মুলায়েম, ক্রমাগত শাসিয়ে চলেছেন, তবে গায়ে নতুন করে আর একবারও হাত তোলেননি।

প্রভাকরের ঠিক বিশ্বাস হল না। কারণ পুলিশের চরিত্র তাঁর ভালো করেই জানা আছে। তারা বেধড়ক মারবেও, কিন্তু মার খেয়ে বেমালুম হজমও করতে হবে। গলা দিয়ে এ সম্বন্ধে কারো কাছে টুঁ শব্দটিও বার করা চলবে না। সেই কারণে বিনোদ মুখ খুলতে চাইছে কিনা, কে জানে।

প্রভাকর জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠিক বলছ তো?'

'হাঁ হুজৌর—'

'তোমার জামাটা খোল তো।'

প্রভাকরের উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারছিল বিনোদ। গায়ের জামা খুলে ফেলে সে। প্রভাকর তার শরীরের ক্ষতচিহ্নগুলো গুনতে লাগলেন। শক্তিনাথ বলে দিয়েছিলেন, মোট সাতাশটা চোটের দাগ আছে বিনোদের গায়ে। দেখা গেল, সাতাশটাই রয়েছে। একটাও বাড়েনি। কোর্টে একবার বিনোদের জামা খোলানো হয়েছিল। তখন গোনা হয়নি। দেখা যাচ্ছে ঠিকই বলেছে বিনোদ, তর্জন গর্জনই করেছেন মুলায়েমরা। শক্তিনাথের ভয়ে নতুন করে তারা গায়ে হাত তুলতে সাহস করেননি।

প্রভাকর বললেন, 'ঠিক আছে। জামা পরো। আমি এখন যাচ্ছি। কোনো ভয় নেই। তোমাকে ফের যেদিন আদালতে তোলা হবে, শক্তিনাথজি আসবেন। এবার তুমি জামিন পেয়ে যাবে।'

প্রভাকর ওসি'র চেম্বারে ফিরে এলেন। মুলায়েমের মুখোমুখি বসতে বসতে বললেন, 'বিনোদের সঙ্গে কী কথা বললাম, শোনার জন্যে নিশ্চয়ই আপনার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে, তাই না?'

বেজার মুখে মুলায়েম বললেন, 'ক্লায়েন্টের সঙ্গে ল'ইয়ারের কী কথা হয় তা শোনা তো পুলিশের বারণ।'

'সেটা ঠিকই। তবে আমি এখন যা বলে এলাম তা আপনাকে বলতে বাধা নেই।'

মুলায়েম উত্তর না দিয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

প্রভাকর বললেন, 'শক্তিনাথজি বিনোদের গায়ে সাতাশটা চোটের দাগ দেখে গিয়েছিলেন। আমাকে খোঁজ নিতে বলেছিলাম চোটের সংখ্যাটা এর মধ্যে বেড়ে গেছে কিনা। যদি বাড়ে তিনি এসে এ-ব্যাপারে স্টেপ নেবেন।'

মুলায়েম চুপ। তাঁর মুখ হঠাৎ খুব শক্ত হয়ে ওঠে।

প্রভাকর বললেন, 'খুব আনন্দের বিষয়, আঘাতের চিহ্ন একই আছে। আপনারা যে শক্তিনাথজির কথাটা রেখেছেন সে জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

একটু নীরবতা।

তারপর প্রভাকর আবার শুরু করেন, 'এবার মন দিয়ে আরেকটা কথা শুনুন।'

মুলায়েম বললেন, 'কী?'

প্রভাকর বললেন, 'আপনাদের থানায় এই এলাকার দাগী ক্রিমিনালদের লিস্ট নিশ্চয়ই আছে?'

প্রশ্নটার মধ্যে কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে, বুঝতে চেষ্টা করলেন মুলায়েম। সতর্কভাবে বললেন, 'তা তো আছেই। প্রতিটি থানায় সেই অঞ্চলের অ্যান্টি-সোশালদের নাম আর ছবি থাকে। এটাই নিয়ম।'

প্রভাকর বললেন, 'ভেরি গুড। তা হলে ফণীশ্বর, লালবিহারী আর জগনাথকে অবশ্যই চেনেন।'

মুলায়েম ঢোক গিলে বললেন, 'তা তা —চিনি। কিন্তু—'

হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে প্রভাকর বললেন, 'আমি যতদূর শুনেছি, ওদের এগেনস্টে গন্ডা গন্ডা মার্ডার, ডাকাতি, জবরদস্তি টাকা আদায়, এই ধরনের নানা অভিযোগ আছে।'

'আছে। লেকিন—'

'লেকিন কী?'

'আদালতে ওদের বিরুদ্ধে কোনো কেসই দাঁড়ায়নি। ওদের অ্যারেস্ট করেও সব সময়ই ছেড়ে দিতে হয়েছে।'

প্রভাকর হেসে হেসে বললেন, 'কেস দাঁড়াবে কী করে? জানের ভয়ে কে ওদের বিপক্ষে সাক্ষি দেবে? থানাদার হিসেবে আপনার জানা দরকার, ওরা কী ধরনের খতারনাক ক্রিমিনাল।'

মুলায়েম উত্তর দিলেন না।

টেবলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে প্রভাকর এবার বললেন, 'আপনি কি লক্ষ করেছিলেন, আজ আদালতে ওই ক্রিমিনাল তিনটে ছিল?'

মুলায়েম অবাক হবার ভঙ্গি করে বললেন, 'তাই নাকি! কই, আমার চোখে তো পড়েনি।'

লোকটা যে ডাহা মিথ্যে বলছে, সুমিত্রারা বুঝতে পারছিল। কোর্টরুমে সব মিলিয়ে সত্তর আশি জনের বেশি লোক ছিল না। তাদের ভেতর তিনটে মার্কামারা ক্রিমিনাল বসে ছিল, আর মুলায়েম দেখেননি, সেটা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য?

প্রভাকর বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন ওদের দেখেননি, তখন তা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কী?'

মুলায়েম চুপ।

প্রভাকর থামেননি, 'আপনাকে একটা মারাত্মক খবর দিচ্ছি—'

মুলায়েম সতর্কভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী?'

প্রভাকর বললেন, 'লালবিহারীরা আজ আদালত থেকে বেরিয়ে সুমিত্রাজিকে জানে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে।'

মুলায়েম চমকে উঠলেন, 'বলেন কী!'

তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হল, লালবিহারীদের এই বাড়াবাড়িটা তিনিও চিন্তা করতে পারেননি। প্রভাকর বললেন, 'চৌবেজি, আপনার কাছে একটা পরামর্শ চাইছি।'

'কিসের পরামর্শ?'

'লালবিহারীদের মতো খুনিরা যখন হুমকি দেয় তখন আমাদের কী করা উচিত?'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

প্রভাকর বললেন, 'এই ধরনের লোকেদের শাসানিটা ফাঁকা বুলি নয়। ওরা যা বলে তা কিন্তু করে।'

মুলায়েম বললেন, 'না না, এ আপনি কী বলছেন প্রভাকরজি! দেশটা মগের মুল্লুক হয়ে ওঠেনি। আইন আছে, শৃঙ্খলা আছে। মুখে থ্রেট করলাম আর খুন করে ফেললাম, ব্যাপারটা এত সোজা নাকি?' একদমে কথাগুলো বলে জোরে জোরে বারকয়েক শ্বাস টেনে ফের শুরু করলেন, 'বিশেষ করে সুমিত্রাজির মতো একজন রেসপেক্টেড লেডির ক্ষতি করতে পারে, এত সাহস নহরপুরার কোনো আদমির নেই।'

প্রভাকর বললেন, 'আপনার কথাগুলো শুনতে ভালো লাগল। কিন্তু বললেন না তো, হুমকিটার জন্যে আমাদের কী করা দরকার?'

মুলায়েম বললেন, 'আমার মনে হয়, আপনারা একটু বেশিই ভয় পাচ্ছেন প্রভাকরজি। ঠিক আছে, লালবিহারীরা যাতে কোনোরকম হামলা করতে না পারে সেদিকটা আমি দেখব।'

'নো, নো—' আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে লাগলেন প্রভাকরজি। বুঝতে না পেরে মুলায়েম বললেন, 'নো মানে?'

'আমরা এই হুমকির একটা অফিসিয়াল রেকর্ড আপনাদের কাছে রাখতে চাই।'

'কীরকম?'

'লালবিহারীদের নামে এফ আই আর করব।'

মুলায়েমের মুখে হাসির একটা ভঙ্গি ফুটে বেরুল, 'সামান্য একটা বিষয় নিয়ে কেন এত দুশ্চিন্তা করছেন? কত লোকে কত জনের নামে কত কথাই তো বলে। তার প্রত্যেকটার ব্যাপারে এফ আই আর লেখাতে হলে সারা দিন শুধু তাই করে যেতে হবে। অভিযোগই যদি লিখে যাই, চোর গুন্ডা খুনিদের ধরব কখন?'

চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে প্রভাকরের। মুলায়েমের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, লালবিহারীদের এগেনস্টে ডায়েরি নিতে চাইছেন না। আইনের রক্ষক হিসেবে সেটা নিতে কিন্তু আপনি বাধ্য। সুমিত্রাজির যদি কোনোরকম ক্ষতি হয়, তার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আপনার।'

মুলায়েম এবার বেশ ঘাবড়েই যান। বলেন, 'না না, ডায়েরি নেব না কেন? আপনাদের মতো রেসপেক্টেড লোকেরা যখন বলছেন তখন নিতে হবে বৈকি। তবে বলতে চাইছিলাম, ব্যাপারটা এমন কিছু সিরিয়াস নয়। ঠিক আছে, আপনাদের যখন ইচ্ছে—আচ্ছা, কৃপা করে লিখে দিন--'

ডায়েরি লেখানো হলে সুমিত্রারা থানা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলে আসে।

মহেশ্বর বললেন, 'এরকম অসৎ পুলিশ অফিসার নহরপুরায় আগে আর কখনও আসেনি। কেন লালবিহারীদের বিরুদ্ধে এফ আই আর নিতে চাইছিল না, বুঝতে পারছেন?'

প্রভাকর হাসলেন, 'তা আর পারছি না? মুনীশ্বর ঝা'র কাছ থেকে প্রচুর টাকা খেয়ে বসে আছে যে।' একটু থেমে বললেন, 'মুনিয়া মার্ডার কেস থেকে যেভাবে হোক সুমিত্রাজিকে সরিয়ে দিতে চাইছে মুনীশ্বর। সে জানে, সুমিত্রাজি সরে গেলে এই কেস নিয়ে অন্য কেউ তত মাথা ঘামাবে না। সেজন্যে লালবিহারীদের ওঁর পেছনে লাগিয়ে দিয়েছে। পুলিশ যাতে লালবিহারীদের বিরুদ্ধে স্টেপ না নেয়, তাই মুলায়েম চৌবেকে কিনে নিয়েছে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর প্রভাকর ফের শুরু করেন, 'সুমিত্রাজি, আপনি ভয় পেলে কিন্তু মুনিয়ার আসল মার্ডারারকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো যাবে না। একটা বেকসুর সাদাসুধা লোক শাস্তি পাবে।'

সুমিত্রা বলল, 'না, ভয় আমি পাচ্ছি না। মুনীশ্বর ঝা কয়েকদিন আগে আমার কোয়ার্টারে গিয়ে নানারকম লোভও দেখিয়ে এসেছে। মুনিয়া মার্ডার কেস থেকে কেউ আমাকে সরাতে পারবে না। লাস্ট রাউন্ড পর্যন্ত আমি দেখতে চাই।'

প্রভাকর বললেন, 'জানি মুনিয়ার খুনিদের আপনি ছেড়ে দেবেন না। তবু—'

'তবু কী?'

'লালবিহারীরা খুব খারাপ এলিমেন্ট। একটু সাবধানে থাকবেন। আর—আর—'

'আর?'

প্রভাকর বললেন, 'পূর্ণিয়ায় ফিরে গিয়ে শক্তিনাথজিকে সব জানাবো। আপনার প্রোটেকশনের জন্যে অন্য কী করা দরকার তার ব্যবস্থা তিনি নিশ্চয়ই করবেন।'

কথায় কথায় সবাই সাইকেল রিকশার স্ট্যান্ডের কাছে এসে পড়েছিল। একটা রিকশা নিয়ে মহেশ্বর 'নহরপুরা সমাচার'-এর অফিসে চলে গেলেন। আরেকটা রিকশায় উঠে প্রভাকর গেলেন বাস টারমিনাসের দিকে। তৃতীয় রিকশাটা নিল সুমিত্রা। সে যাবে তার কোয়ার্টারে।

কুড়ি

আরও কয়েকদিন কেটে গেল।

এর মধ্যে চাঞ্চল্যকর কিছু ঘটেনি। তিহরলাল শুধু একবার এসেছিল। আগের মতোই সে বলেছে, 'ওসব আদালত টাদালতে গিয়ে ফায়দা কিছু হবে না। দুই তরফের উকিলরা স্রেফ হল্লাগুল্লা করে যাবে। আর ওই ভূচ্চরের ছৌয়া ঠিকাদারের বাচ্চার গায়ে একটা টোকাও লাগবে না।'

ছোকরা যে অত্যন্ত রগচটা, বদমেজাজি, প্রথম আলাপের দিনই জেনে গিয়েছিল সুমিত্রা। মুনিয়ার মৃত্যু এবং ধর্ষণটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি, প্রায় উন্মাদের মতো হয়ে উঠেছে সে।

তিহরলাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। তাকে বসিয়ে সুমিত্রা বলেছে, 'কোর্টের একটা নিয়ম আছে। তুমি যা চাইছ অত তাড়াতাড়ি তা হয় না। প্রথমে গঞ্জু বিনোদ যে নির্দোষ তা প্রমাণ করতে হবে। তাকে ছাড়িয়ে আনার পর মুনীশ্বর ঝা'র ছেলেকে যাতে পুলিশ ধরে সে ব্যবস্থা করব। তারপর শুরু হবে ওর বিরুদ্ধে মামলা। আমাদের হাতে যে সাক্ষী টাক্ষী আছে তাতে বদমাশটার সাজা হতে বাধ্য।'

তিহরলাল অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে, 'এত সব করতে কতদিন লাগবে?'

'অনেক সময় লাগবে তিহরলাল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কোর্ট থেকে মামলা যাবে জজ সাহেবের কোর্টে। মুনীশ্বর ঝা'র তো পয়সার অভাব নেই। জজ সাহেবের আদালতে হেরে গেলে সে যাবে হাইকোর্টে। তার পর আছে দিল্লির সুপ্রিম কোর্ট।' সুমিত্রা বলতে লাগল, 'আমাদের দেশে মুখের কথা খসালেই কারো শাস্তি হয় না।'

তিহরলাল বলেছে, 'আপনি যা বললেন তাতে কমসে কম তিন চার সাল লাগেগা। লেকেন—'

সুমিত্রা চমকে উঠেছে, 'কী হল?'

'এত্তে রোজ আমি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারব না। ওহী জানবর বিনোদ ঝা'কো হামনি আপনা হাতোসে সাজা দুঙ্গা। চাকু দিয়ে ওর গলার নলিয়া ফেঁড়ে ফেলব।'

বলে উন্মাদের মতো ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল তিহরলাল। তার হাত ধরে জোর করে ফের বসিয়ে দিয়েছে সুমিত্রা। বুঝতে পারছিল, মুনিয়া হত্যার প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তার প্রচন্ড রাগ জুড়োবে না। সে তিহরলালকে বুঝিয়েছে, বিনোদ ঝা কখনও একা রাস্তায় বেরোয় না। তার সঙ্গে সবসময় দু'চারজন সশস্ত্র পাহারাদার থাকে, খুন টুন তাদের কাছে জলভাতের মতো ব্যাপার। তিহরলাল বিনোদের গায়ে একটা আঁচড় তো কাটতে পারবেই না, বেঘোরে তার প্রাণটাই চলে যাবে। এখন মাথা গরম না করে কানুনের সাহায্যে বিনোদ ঝা'র ফাঁসির ব্যবস্থা করতে পারলেই সঠিক প্রতিশোধ নেওয়া হবে এবং মুনিয়ার আত্মার শান্তিও তাতেই হবে। উত্তেজনার বশে কোনোরকম হঠকারিতা করাটা উচিত নয়। সেটা নিজেরই মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে উঠবে।

অনেক বোঝানোর পর তিহরলাল অনেকটা শান্ত হয়েছে। বলেছে, 'ঠিক হ্যায়, আপনি যা বললেন তাই হবে।'

'মনে রাখবে, অধৈর্য হলে সব গন্ডগোল হয়ে যায়।'

তিহরলাল আর কিছু বলেনি। ধীরে ধীরে উঠে চলে গেছে।

এই ক'দিনে তিহরলাল ছাড়া আর কেউ সুমিত্রার কোয়ার্টারে আসেনি। মহেশ্বর বা বিজয়ের সঙ্গেও তার দেখা হয়নি। ওদের দু'জনের কেউ নহরপুরায় নেই। মহেশ্বর রাঁচী গেছেন, সেখানে তাঁর বড় ভাইয়ের হঠাৎ মারাত্মক রকমের স্ট্রোক হয়েছে। বাঁচার বিশেষ আশা নেই। অন্তিম সময়ে মহেশ্বরকে তিনি দেখতে চেয়েছেন। বিজয় তার হাসপাতালের কী সব দরকারে পাটনায় গেছে। সেখানে হেলথ ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টরের সঙ্গে তার দেখা করার কথা। দু'জনেই অবশ্য গঞ্জু বিনোদকে দ্বিতীয় বার আদালতে হাজির করার আগেই ফিরে আসবেন। এই ক'টা দিন গতানুগতিক কেটে গেছে। দৈনন্দিন রুটিন অনুযায়ী স্কুল আর কোয়ার্টার, কোয়ার্টার আর স্কুলের বাইরে কোথাও যায়নি সুমিত্রা। এর ভেতর মণিহারি থেকে বাবার কোনো চিঠিও আসেনি। বিজয়ের সঙ্গে তার

বিয়ে সম্পর্কে মা, পিসি বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে তিনি কিছু জানিয়েছেন কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। জানিয়ে থাকলে তার প্রতিক্রিয়া কী হয়েছে তা ভাবতেও সাহস হয় না। এ ব্যাপারে সে খুবই উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে।

অন্য দিনের মতো আজও স্কুল থেকে ফিরে এসেছিল সুমিত্রা। চা খেয়ে এই মুহূর্তে সে বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে হিন্দি অনুবাদে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসটা পড়ছিল। বিহার নিয়ে বাংলাভাষায় এমন চমৎকার একটা বই অনেকদিন আগে লেখা হয়েছিল, ভাবা যায় না। উপন্যাসটা তাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

সন্ধে নামতে শুরু করেছে। দূরের ফাঁকা মাঠগুলো হিমে এবং অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে গেছে। চারপাশ থেকে ঝিঁঝিদের একটানা বিলাপ উঠে আসছিল। মাঝে মাঝে কাছাকাছি কোথায় যেন শিয়ালের সমবেত ডাক শোনা যাচ্ছে। কোয়ার্টারের পেছন দিকের তেঁতুলগাছে বহুকাল ধরে একটা প্রাচীন তক্ষক সপরিবারে বসবাস করছে। থেকে থেকে সেটাও ডেকে উঠছে।

'দিদিজি—'

হঠাৎ ডাকটা শুনে চমকে ওঠে সুমিত্রা। বই থেকে মুখ তুলতেই চোখে পড়ে রামবনবাস দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বলল, 'ভেতরে এস—' একটু অবাকই হয়েছে সে। এক বাড়িতে থাকলেও খুব জরুরি কাজ না থাকলে রামবনবাস কখনও এ সময় তার ঘরে আসে না। হঠাৎ কী এমন ঘটেছে যাতে তাকে আসতে হল!

রামবনবাস ভেতরে ঢুকে দেওয়ালের ধার ঘেঁষে একটা মোড়ায় বসে পড়ে। বলে, 'দিদিজি, একটা ব্যাপারে আমার বহোত ডর লাগছে।'

ভালো করে লক্ষ করতে সুমিত্রা দেখতে পায়, রামবনবাসের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা ফুটে বেরিয়েছে। সে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে?'

'আপনি কি লীলাধর বংশীকে চেনেন?'

'কে সে?'

'মুনীশ্বর ঝা'র মুনশি।'

একটু চিন্তা করে সুমিত্রা জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক মনে করতে পারছি না।'

রামবনবাস বলল, 'ওহী হারামজাদকে নিশ্চয়ই দেখেছেন। সারাদিনই তো সাইকেলে করে ঘুরে ঘুরে মুনীশ্বর ঝা'র সুদের টাকা আদায় করে।'

সুমিত্রা শুনেছে মুনীশ্বর ঝা ঠিকাদারি ছাড়াও সুদের কারবার করে থাকে। এই ব্যবসাটা দেখে লীলাধর বংশী। খাতককে টাকা ধার দেওয়া থেকে সুদ আদায় করা, সবই করে সে। সুমিত্রার মনে পড়ল, রোগা পাকানো চেহারার একটা লোককে, পরনে ধুতির ওপর ধুসো কোট, চোখে নিকেলের গোল চশমা, মাথায় টুপি, শকুনের ঠোঁটের মতো বাঁকা নাক—সাইকেলে চেপে শহরময় টহল দিতে দেখেছে বটে। তবে তার নাম যে লীলাধর বংশী সেটা জানত না। সুমিত্রা বলল, 'কী করেছে লীলাধর?'

'স্কুল ছুটির পর আপনি কোয়ার্টারে চলে এলে দু'দিন ধরে সে এসে মাস্টারজিদের ঘরে উপাধ্যায়জির সঙ্গে কী সব গুজ গুজ করছে।'

ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিল না সুমিত্রা। বলল, 'হয়তো নিজের কোনো দরকারে আসে। তাই—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে রামবনবাস বলল, 'নেহী—নেহী—'

একটু অবাক হয়ে সুমিত্রা তাকিয়ে থাকে।

রামবনবাস এবার চাপা গলায় জানায়, সুমিত্রার বিরুদ্ধে কিছু একটা ষড়যন্ত্র করার জন্য লীলাধর বংশী স্কুলে আসছে।

সুমিত্রা চমকে ওঠে, 'আমার বিরুদ্ধে?'

রামবনবাস আস্তে মাথা নাড়ে, 'হাঁ—'

'কী করে বুঝলে?'

ওরা যখন কথা বলছিল তখন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে আমি শুনছিলাম। বার বার আপনার নাম করছিল। লীলাধর বংশী বলছিল, আপনাকে নাকি এমন শিক্ষা দেবে, সারা জীওনে ভুলবেন না।'

সুমিত্রা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না। লীলাধর বংশীর কোনো ক্ষতি করা তো দূরে থাক, সে তাকে ভালো করে চেনে না পর্যন্ত। অথচ লোকটা তাকে নাকি শিক্ষা দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কারণটা কী, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সে সাহসী মেয়ে, তবু আকণ্ঠ এক উদ্বেগে তার শ্বাস নিতে যেন কষ্ট হতে থাকে।

রামবনবাস বলে, 'একটা কথা জেনে রাখুন দিদিজি। ওহী উপাধ্যায়জি বহোতই বুরা আদমি, আপনার দুশমন। ওর মাথায় সবসময় আপনার সর্বনাশের ধান্দা ঘুরছে।' একটু থেমে বলল, 'আপনি খবর রাখেন না, উপাধ্যায় হারামজাদ আপনাকে ঝঞ্ঝাটে ফেলার জন্যে মুনীশ্বর ঝা'র সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।'

বিষ্ণুলাল উপাধ্যায় লোক খারাপ, সেটা সুমিত্রার অজানা নয়। কিন্তু সে যে মুনীশ্বর ঝা'র সঙ্গে চক্রান্ত করবে, এতটা ভাবা যায়নি। পরক্ষণে খেয়াল হয়, লীলাধর বংশীকে নিশ্চয়ই মুনীশ্বর ঝা উপাধ্যায়ের কাছে পাঠাচ্ছে। এমনও হতে পারে, তাকে বিপাকে ফেলার জন্য উপাধ্যায়ই মুনীশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। হয়তো দু' পক্ষের মধ্যে খবর চালচালির জন্য লীলাধর স্কুলে আনাগোনা করছে।

রুদ্ধশ্বাসে সুমিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'মুনীশ্বর ঝা'র সঙ্গে উপাধ্যায়জি হাত মিলিয়েছে, এখবর তোমাকে কে দিল? লীলাধর বংশীর সঙ্গে এ নিয়ে কি ও কোনো কথা বলেছে?'

রামবনবাস বলে, 'আমি শুনিনি। তবে—'

'তবে কী?'

'আজ স্কুল ছুটির পর কিছুক্ষণ গুজ গুজ করে দু'জনে মুনীশ্বর ঝা'র বাড়ি গিয়েছিল। আমি ওদের পিছু নিয়েছিলাম। মুনীশ্বরজির বাড়ির ফটক খোলা ছিল। ভেতরে চবুতরে মুনীশ্বরজি দাঁড়িয়ে ছিল। উপাধ্যায়কে দেখে বহোত খুশ হয়ে গেল। তার হাত ধরে, খাতিরদারি করে ঘরের ভেতব নিয়ে গেল।'

'বল কী!'

'হাঁ দিদিজি। ওখান থেকেই সিধা আপনাকে খবরটা দিতে এলাম।'

সুমিত্রা একটু চিন্তা করে জিজ্ঞেস করে, 'মুনীশ্বর ঝা'র বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিলে। লীলাধর বংশী কি উপাধ্যায়জি তোমাকে দেখতে পায়নি তো?'

'নেহী—'

রামবনবাস বুঝিয়ে দেয়, কাঁচা কাজ করার লোক সে নয়। সুমিত্রা সঙ্গে তার সম্পর্কটা উপাধ্যায়জি জানে। সে পিছু নিয়েছে টের পেলে ওরা তাকে সহজে ছাড়ত না। কাজেই নিজেকে গোপন রেখে রামবনবাস ওদের গতিবিধি লক্ষ করে গেছে।

একটু চুপচাপ।

তারপর সুমিত্রা বলে, 'ঠিক আছে। তুমি এখন নিজের ঘরে গিয়ে আরাম কর।'

রামবনবাস উঠে পড়তে পড়তে বলে, 'দিদিজি, আপনি সবসময় হোঁশিয়ার থাকবেন।'

সুমিত্রা উত্তর দেয় না। যে খবরটা রামবনবাস দিল সেটা খুবই বিপজ্জনক। উপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে মুনীশ্বর ঝা কী চক্রান্ত করছে, কে জানে। তার দুশ্চিন্তা এবং মানসিক চাপ হঠাৎ কয়েক গুণ বেড়ে যায়।

রামবনবাস কখন চলে গেছে, খেয়াল করেনি সুমিত্রা। বাইরে দিনের শেষ আলো নিভে গেছে। সন্ধে নেমেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। দূরে ফাঁকা শস্যক্ষেত্রগুলো অন্ধকারে আর কুয়াশা ঝাপসা।

উপাধ্যায়ের সঙ্গে মুনীশ্বর ঝা'র হাত মেলানোটা এমনই দুশ্চিন্তার কারণ যে বসে থাকতে পারছিল না সুমিত্রা। বিছানা থেকে নেমে কিছুক্ষণ অস্থির পায়ে ঘুরে বেড়ায় সে। মহেশ্বর আব বিজয় এর মধ্যে নহরপুরায় ফিরে এসেছে। সুমিত্রা একসময় মনস্থির করে ফেলে, এ বিষয়ে মহেশ্বরের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। হাসপাতালে বিজয়ের কাছেও যাওয়া যায়, কিন্তু সে একটুতেই বিচলিত হয়ে পড়ে। খেপে গিয়ে এমন কিছু করে বসতে পারে যাতে পরে হয়ত বিপন্ন হতে হবে। কিন্তু মহেশ্বর ঠাণ্ডা মাথার মানুষ—ধীর, স্থির, বিচক্ষণ। তাঁর কাছে গেলে সঠিক পরামর্শ পাওয়া যাবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে লখিয়া এবং রামবনবাসকে ডেকে সুমিত্রা বলল, 'আমি একটু বেরুচ্ছি। ঘণ্টাদেড়েকের ভেতর ফিরে আসব।'

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই অবাক। রামবনবাস বলল, 'সন্ঝা হয়ে গেছে। আন্ধেরাতে কুথায় যাবেন দিদিজি?'

কোথায় যাচ্ছে সেটা বলব কিনা একবার ভাবল সুমিত্রা। তারপর ঠিক করে ফেলল, জানিয়েই দেবে। বলল, 'মহেশ্বরজির বাড়ি যাচ্ছি। তোমরা দরজা বন্ধ করে দাও—'

রামবনবাস বলে, 'আমি কি আপনার সঙ্গে যাব দিদিজি?'

কেন সে সঙ্গী হতে চাইছে, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না সুমিত্রার। বলল, 'চিন্তা কোরো না, মুনীশ্বব ঝা'দের সাহস হবে না রাস্তায় আমার অপমান করে—' বলে আর দাঁড়ায় না।

মহেশ্বরদের বাড়ি এসে তাঁকে 'নহরপুরা সমাচার'-এর অফিসেই পাওয়া গেল। এসময়, আগে থেকে না জানিয়ে সুমিত্রা যে এসে পড়তে পারে, এটা ছিল তাঁর কাছে অভাবনীয়। অবাক তিনি যতটা হয়েছেন, তার চেয়ে ঢের বেশি খুশি। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আসুন আসুন সুমিত্রাজি বসুন—'

টেবিলের ওধারে মুখোমুখি বসতে বসতে সুমিত্রা বলল, 'হঠাৎ এসে আপনাকে বিবক্ত করলাম নিশ্চয়ই।'

'একেবারেই না। আপনি আসবেন, এ তো আমাব পবম সৌভাগ্য। আগে চা আনাই, তাবপব কথা হবে।'

পাঁচ মিনিটের ভেতর চা এসে গেল। কাপে হালকা চুমুক দিয়ে মহেশ্বর একদৃষ্টে কয়েক সেকেন্ড সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, 'আপনাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে বহেনজি—'

সুমিত্রা বুঝতে পারল, ভেতরের উৎকণ্ঠাটা তাব চোখেমুখেও ছাপ ফেলেছে, এবং সেটা অন্যের চোখেও ধরা পড়েছে।

মহেশ্বর বললেন, 'মনে হচ্ছে দুর্ভাবনার কোনো কাবণ ঘটেছে।'

আস্তে মাথা নাড়ে সুমিত্রা, 'হাঁ—'

টেবলের ওপর অনেকটা ঝুঁকে মহেশ্বর জিজ্ঞেস করেন, 'কী হয়েছে?'

রামবনবাস যে খবরটা দিয়েছিল তা জানিয়ে দিয়ে সুমিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'এবার কী করা উচিত?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন মহেশ্বর। তারপর প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে বলেন, 'ওরা যে আপনার ক্ষতি করতে চাইছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।'

সুমিত্রা এখনও চায়ে চুমুক দেয়নি। ভরা কাপ থেকে ধোঁয়া উঠে আসছিল। সেদিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে সুমিত্রা বলে, 'আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু—'

'কী?'

'ওরা কী ধরনের ক্ষতি করতে চাইছে, বুঝতে পারছি না। আপনি কি কিছু ভাবতে পারছেন?'

মহশ্বের বললেন, 'না। ওদের মাথায় কী মতলব ঘুরছে কে জানে।'

সুমিত্রার উদ্বেগ বাড়ছিলই। সে জিজ্ঞেস করল, 'এই অবস্থায় আমার কী করা উচিত? থানায় কি একটা এফ আই আর করে রাখব?'

'না। সেটা সম্ভব নয়।'

'কেন?'

মহেশ্বর বলেন, 'বহেনজি, ওরা এখন পর্যন্ত আপনাকে হুমকি দেয়নি, কোনোরকম ক্ষতি করার চেষ্টা করেনি। উপাধ্যায়ের মতো একটা বজ্জাত মুনীশ্বর ঝা'র সঙ্গে দেখা করেছে বলে সন্দেহের বশে তাদের নামে কি পুলিশে ডায়েরি করা যায়? মুলায়েম চৌবের কাছে গেলে কিছুতেই অভিযোগ কানে তুলবে না।'

সুমিত্রা চিন্তিতভাবে বলল, 'তা হলে আমাকে কী করতে বলেন?'

মহেশ্বর বললেন, 'আপাতত স্কুল আর কোয়ার্টারের বাইরে অন্য কোথাও যাবেন না। যতটা সম্ভব সাবধানে থাকবেন।'

সুমিত্রার মনে পড়ল, রামবনবাসও ঠিক এই ধরনের পরামর্শই দিয়েছিল। উপাধ্যায়রা মিলিতভাবে যে চরম একটা আঘাত হানবে সে সম্পর্কে সে শতকরা এক শ ভাগ নিশ্চিত। উৎকণ্ঠা তো ছিলই, উপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক কোনো ব্যবস্থা নিতে না পারার জন্য সেই সঙ্গে তার মন হতাশাতেও ভরে যায়।

মহেশ্বর কী চিন্তা করছিলেন। বললেন, 'বহেনজি, একটা কাজ করতে পারেন?'

সুমিত্রা উৎসুক চোখে তাকায়। জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'উপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলে ওর পেটের কথাটা বার করতে চেষ্টা করুন। তবে ও যেন কোনোভাবেই আপনার উদ্দেশ্যটা টের না পায়।'

'কিন্তু—'

'কিন্তু কী'?

'লোকটা মারাত্মক ধূর্ত। আমি কিছু আভাস দিলে ঠিক ধরে ফেলবে।'

'যাতে ধরতে না পারে সেভাবেই কথাটা পাড়বেন।'

'ঠিক আছে, চেষ্টা করব।'

মহেশ্বর বললেন, 'ওদের অভিসন্ধিটা জানতে পারলে আমাদের রণকৌশল স্থির করা যাবে।'

আস্তে মাথা নাড়ে সুমিত্রা, 'আচ্ছা। এখন তা হলে চলি—'

সুমিত্রা উঠে পড়েছিল। মহেশ্বর বললেন, 'উপাধ্যায়ের সঙ্গে কী কথা হল, আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেবেন।'

'দেব।'

সুমিত্রা বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

একুশ

পরদিন যথারীতি সঠিক সময়েই স্কুলে চলে আসে সুমিত্রা। কাল সারারাত ভালো করে ঘুমোতে পারে নি। সর্বক্ষণ উপাধ্যায়দের চিন্তাটা তার মাথায় প্রচন্ড চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। ওদের আঘাত বা আক্রমণটা কী ধরনের হতে পারে কিংবা কোন দিক থেকে আসতে পারে, অনুমান করা যাচ্ছে না। যেসব সাঙঘাতিক বন্দুকবাজ মুনীশ্বর ঝা পোষে, হেন দুষ্কর্ম নেই যা ওরা পারে না। খুনিদের এই বাহিনীর পক্ষে তার কী কী ক্ষতি করা সম্ভব, নানাভাবে চিন্তা করে দেখেছে সুমিত্রা। রাস্তায় ওরা তাকে অশ্লীল মন্তব্য এবং অঙ্গভঙ্গি করে অপমান করতে পারে। মাঝরাতে কোয়ার্টারে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। এমনকি তাকে তুলে নিয়ে মুনিয়ার মতো ধর্ষণ, এমনকি খুন করে ফেলাও ওদের পক্ষে অসম্ভব নয়। শেষের কথাটা ভাবতেই শিউরে উঠেছে সুমিত্রা। অসীম নৈরাশ্যে এবং আতঙ্কে একবার ভেবেছে, মুনিয়া হত্যার ব্যাপার থেকে সে হাত গুটিয়ে নেবে। কিন্তু পরক্ষণে মনে হয়েছে, তার ধমনীতে স্বাধীনতা-সংগ্রামী রঘুপতি মিশ্রর রক্ত বয়ে চলেছে। সেই রঘুপতি যিনি দুঃসাহসী, জেদি, প্রাণের ভয়ে কখনও কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। সঙ্গে সঙ্গে সে স্থির করে ফেলেছে, পিছু হটবে না। রাত্রিবেলা নির্জন মাঠে মুনিয়ার মতো একটি মেয়েকে খুন এবং ধর্ষণ করা, আব

তার ওপর হামলা চালানো, এক ব্যাপার নয়। তার পেছনে মহেশ্বর আছেন, শক্তিনাথ আছেন, বিজয় আছে, আছেন রঘুপতি এবং স্বাধীনতার সৈনিক তাঁর বন্ধুরা। তার ওপর রয়েছে নহরপুরা এবং চারপাশের গ্রামগুলোর অসংখ্য মানুষ। এ অঞ্চলের বাসিন্দারা তাকে যতটা শ্রদ্ধা করে, ঠিক ততটাই ভালোবাসে। তার ওপর হামলা করে অত সহজে পার পাবে না মুনীশ্বর। এত সব ভেবেছে ঠিকই এবং এগুলো খুবই যুক্তিসঙ্গত ভাবনা, তবু দুশ্চিন্তা আর মানসিক চাপ কিছুতেই কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা ফিক্সেশনের মতো তার মাথায় আটকে রয়েছে।

স্কুলে আসার পর একটানা চারটে ক্লাস নিল সুমিত্রা। তারপর টিফিনের জন্য আধ ঘণ্টা ছুটি।

চতুর্থ ক্লাসটার পর নিজের ঘরে চলে এসেছিল সে। আগে থেকেই মনস্থির করে রেখেছে, মহেশ্বরের কথামতো উপাধ্যায়কে একটু বাজিয়ে দেখবে। কীভাবে কথাটা পাড়বে সেটাই ঠিক করে উঠতে পারছিল না। চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার মাথায় একটা পরিকল্পনা এসে যায়। মনে হল, এতে কাজ হতে পারে। রামবনবাসকে ডেকে বলল, 'উপাধ্যায়জিকে একবার আমার ঘরে আসতে বল তো। নজর রাখবে, উনি আসার পর আর কেউ যেন না ঢোকে।'

রামবনবাস হকচকিয়ে যায়। বলে, 'লেকেন—'

'উপাধ্যায়জিকে ডাকছি বলে খুব অবাক হয়ে গেছ, তাই না?'

'হাঁ। মতলব—'

সুমিত্রা বলে, 'কারণটা তোমাকে রাত্তিরে জানিয়ে দেব। এখন আর কিছু জিজ্ঞেস করো না।'

রামবনবাস নিঃশব্দে স্টাফরুম থেকে উপাধ্যায়জিকে ডেকে এনে, সুমিত্রার কামরার বাইরে পাহারা দিতে থাকে। চোখ তার অন্যদিকে থাকলেও কামরার ভেতরে কী কথা হচ্ছে শোনার জন্য কান খাড়া করে রাখে। সুমিত্রার জন্য তার উৎকণ্ঠার শেষ নেই। এই অসম সাহসী মেয়েটার মনোবল, চরিত্রের দৃঢ়তা, এই অঞ্চলের পিছড়ে বর্গের ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোলার জন্য তার অবিরত লড়াই রামবনবাসকে মুগ্ধ করে। কত বড় একটা মানুষের মেয়ে সে, কত লেখাপড়া শিখেছে, ইচ্ছা করলে অনেক বড় নৌকরি করতে পারত। কিন্তু নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা সে ভাবেনি। নিঃস্বার্থভাবে বহুজনের হিতে এখানে কাজ করে যাচ্ছে। মুনিয়ার হত্যাকারীদের সাজা দেবার জন্য সারা দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলছে সে। কোথায় উপাধ্যায় তাকে সাহায্য করবে তা নয়। সহকর্মী হয়েও তার ক্ষতি করার জন্য মুনীশ্বর ঝা'র মতো একটা জঘন্য লোকের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। সুমিত্রার গায়ে হাত পড়লে রামবনবাস উপাধ্যায়কে ছাড়বে না, এতে তার যা হবার হবে। তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে।

উপাধ্যায় ঘরে ঢুকে বলে, 'আপনি আমাকে দেখা করতে বলেছেন সুমিত্রাজি?'

সুমিত্রা যে তাকে আদৌ পছন্দ করে না সেটা নিশ্চিত ভাবেই জানে উপাধ্যায়। সন্দিগ্ধ চোখে সুমিত্রাকে লক্ষ করতে করতে সে বসে পড়ে।

সুমিত্রা বলল, 'চা খাবেন?'

সংশয়টা বেড়েই যায় উপাধ্যায়ের। হঠাৎ ডাকিয়ে এনে খাতিরদারির উদ্দেশ্যটা সে বুঝতে পারে না। সতর্কভাবে বলে, 'চা খাওয়াবেন? ঠিক আছে, খাব।'

রামবনবাসকে দিয়ে চা আনায় সুমিত্রা।

একটা কাপ তুলে হালকা চুমুক দিয়ে ধীরে ধীরে উপাধ্যায় জানতে চায়, হঠাৎ তাকে তলব করা হয়েছে কেন?

সুমিত্রা বলে, 'সমাজকল্যাণ দপ্তরে সেদিন যে চিঠিটা দিয়ে এসেছিলেন সে সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কথা হয়নি। ডিরেক্টর কী বললেন?'

উপাধ্যায় বুঝতে পারছিল, তাকে ডেকে এনে সোশাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টরের মতামত জানতে চাওয়াটাই আসল কারণ নয়। এটা ভূমিকা মাত্র। সে বলল, 'স্কুল বিল্ডিংয়ের টাকা স্যাংশন হয়ে যাবে। তবে মনে হচ্ছে, আপনাকে দু' একবার পাটনা যেতে হবে। ডিরেক্টর ডিটেলে আপনার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করতে চান।'

'কবে যেতে বলেছেন?'

'ডেট টেট কিছু বলেননি। আপনি গেলেই দেখা হবে। তবে তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভালো।'

একটু চিন্তা করে সুমিত্রা বলল, 'ঠিকই বলেছেন। জরুরি কাজ ফেলে রাখতে নেই। ভাবছি দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই চলে যাব।' মনে মনে সে ঠিক করে নিল, আসছে কয়েক দিনের মধ্যে বিনোদকে আবার আদলতে তোলা হবে। তারপর ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলতে যাবে।

চা খাওয়া হয়ে এসেছিল। উপাধ্যায় জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু বলবেন সুমিত্রাজি?'

'হাঁ—'

উৎসুক চোখে তাকিয়ে উপাধ্যায়।

সুমিত্রা বলে, 'আপনার কাছে আমি একটা পরামর্শ চাইছি।'

উপাধ্যায় বলে, 'কী পরামর্শ?'

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, মুনিয়া মার্ডারের কেস নিয়ে সারা টাউন উথলপাথল হয়ে যাচ্ছে। আর এই মামলাটার সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়েছি।'

ভেতরে ভেতরে চকিত হয়ে উঠল উপাধ্যায়। কীসের একটা সংকেত যেন সে পাচ্ছে। স্থির দৃষ্টিতে সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে একটু চাপা গলায় বলল, 'শুনেছি।'

'লোকের ধারণা, যে লোকটাকে খুনের দায়ে ধরা হয়েছে সে অপরাধী নয়।'

উপাধ্যায় উত্তর দিল না।

সুমিত্রা বলতে লাগল, 'সবাই বলাবলি করছে, অপরাধটা নাকি করেছে মুনীশ্বর ঝা'র ছেলে বিনোদ।'

উপাধ্যায় এবারও চুপ। তবে মুখচোখ দেখে মনে হয়, বেশ অস্বস্তি বোধ করছে।

সুমিত্রা থামেনি। সে জানায়, মামলা যেভাবে চলছে তাতে নাকি বিনোদ ঝা'র ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা। যদি সত্যিই তা হয়, মুনীশ্বর ঝা নিশ্চয়ই সুমিত্রার ওপর খেপে উঠবে, কেননা এই মামলায় সে সবচেয়ে বড় উদ্যোগ নিয়েছে।

উপাধ্যায় উত্তর দেয় না।

সুমিত্রা বলে, 'আপনিও নিশ্চয়ই চান কালপ্রিট সাজা পাক—'

'তা তা—' বলতে বলতে থেমে যায় উপাধ্যায়।

'কেউ চায় না, একজন নিরপরাধ লোকের গলায় ফাঁসির দড়ি পরানো হোক—' সুমিত্রা বলল।

ঢোক গিলে শুকনো গলায় উপাধ্যায় বলে, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই—'

সুমিত্রা বলল, 'আমি শুনেছি, মুনীশ্বরজি আমার ওপর রেগে আছেন। আপনার সঙ্গে তো ওঁর সম্পর্ক খুব ভালো।'

'কে বলল?' প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে উপাধ্যায়।

'অনেকেই বলে। আপনি তো প্রায়ই ওঁদের বাড়ি যান।' সোজাসুজি উপাধ্যায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা বলল।

উপাধ্যায় হতচকিত। উত্তর দিতে তার সময় লাগে। কিছুক্ষণ ভেবে বলে, 'মুনীশ্বর ঝা'র সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তবে প্রায়ই ওঁদের বাড়ি যাই না, বড় জোর দু'চার বার গেছি।'

'আপনি না গেলেও মুনীশ্বর ঝা'র মুনশি লীলাধর বংশী ইদানীং রোজই তো স্কুলে আপনার কাছে আসছে।'

একটা মারাত্মক দুষ্কর্ম ধরা পড়ে গেলে অপরাধীর মুখের চেহারা যেমন হয়ে যায়, অবিকল সেইরকম দেখাল উপাধ্যায়ের মুখটা। চোখদু'টো কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে উঠেছে তার। এবার যখন সে কথা বলল তার গলা অত্যন্ত চাপা শোনায়, 'লীলাধরের সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ। তাই মাঝে মাঝে গল্প করতে আসে।'

টেবলের ওপর দিয়ে খানিকটা ঝুঁকে সুমিত্রা বলে, 'ওরা আমার সম্বন্ধে ঠিক কী ভাবছে বলতে পারেন?'

উপাধ্যায় একেবারে কুঁকড়ে যায়, 'তা আমি কী করে বলব? আমার সঙ্গে আপনার বিষয়ে কখনও ওদের কোনো কথা হয়নি।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। বিশ্বাস করুন।'

একটু চুপ।

তারপর সুমিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'আমি জানি, আপনি আমার খুবই শুভাকাঙ্ক্ষী। এই অবস্থায় আমার কী করা উচিত?'

উপাধ্যায় জোরে শ্বাস টেনে বলে, 'বলাটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না। তবে— '

'তবে কী?'

'আমার মতামত যদি সত্যিই চান তা হলে একটাই পরামর্শ দিতে পারি। মামলার রেজাল্ট কী হবে, আমার জানা নেই। সেটা নির্ভর করছে জজসাহেবের ওপর। যে রায়ই তিনি দিন না, মুনিয়া বেঁচে উঠবে না। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। মাঝখান থেকে মুনীশ্বর ঝা'র মতো একজন ভেরি পাওয়ারফুল লোককে শত্রু করে কী লাভ?'

উপাধ্যায়ের মনোভাবটা পরিষ্কার হয়ে যায়। সে যে পুরোপুরি মুনীশ্বর ঝা'র লোক সেসম্পর্কে এতটুকু সংশয় নেই। মুনিয়া হত্যার মামলা থেকে সুমিত্রা হাত গুটিয়ে নিকে, সেটা তার এবং মুনীশ্বর ঝা'র একান্ত কাম্য। মুনীশ্বর নিজেও এ নিয়ে কম চেষ্টা করেনি।

সুমিত্রা বলল, 'মুনিয়া ফিরে আসবে না ঠিকই, কিন্তু আমি মামলা থেকে সরে দাঁড়ালে একটা নিরপরাধ লোকের ফাঁসি হয়ে যাবে।'

উপাধ্যায় চুপ।

সুমিত্রা ফের বলে, 'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, আমি মামলা নিয়ে যেখানে পৌঁছেছি সেখান থেকে এই মুহূর্তে সরে আসা মুশকিল। এই অবস্থায় কী করলে ভালো হয়?'

উপাধ্যায় বলল, 'আমার যা মনে হয়েছে তা বলেছি। এখন আপনি সব দিক বিবেচনা করে দেখুন।'

উপাধ্যায়দের ইচ্ছাটা জানা গেল ঠিকই, কিন্তু মামলা চালিয়ে গেলে ওরা কী ধরনের ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে সেটা কিছুতেই লোকটার পেট থেকে বার করা সম্ভব হল না। সুমিত্রা বেশ হতাশই হয়ে পড়ে।

উপাধ্যায় জিজ্ঞেস করে, 'আর কিছু বলবেন সুমিত্রাজি?'

আস্তে মাথা নাড়ে সুমিত্রা, 'না।'

'এখন তা হলে উঠি?'

'আচ্ছা—'

উপাধ্যায় চলে যায়। তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে সুমিত্রা। একসময় মনে হয়, লোকটার সঙ্গে তার যা কথা হয়েছে, মহেশ্বরজিকে জানানো দরকার। উপাধ্যায় এবং মুনীশ্বর ঝা'র হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য কী করা উচিত, সে সম্পর্কে মহেশ্বরের পরামর্শ খুবই জরুরি। দ্রুত একটা চিঠিতে উপাধ্যায় যা যা বলেছে সব লিখে খামে পুরে, আঠা দিয়ে সেটার মুখ আটকে, রামবনবাসকে ডাকল সুমিত্রা। চিঠিটা তার হাতে দিয়ে বলল, 'এটা মহেশ্বরজিকে আজই পৌঁছে দেবে।'

বাইশ

চিঠি পাঠানোর দু'দিন পর সকালবেলায় সুমিত্রা রান্নাবান্নার তোড়জোড় করছে, হঠাৎ শক্তিনাথকে সঙ্গে নিয়ে মহেশ্বর এসে হাজির। ওঁরা যে আসবেন ঘুণাক্ষরেও আগে জানাননি। সুমিত্রা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

হেসে হেসে মহেশ্বর বলেন, 'আমরা যে এ সময় আসব, ভাবতে পারেননি তো?'

সুমিত্রা বলে, 'সত্যিই ভাবিনি। আসুন—আসুন—'মহেশ্বররা ঘরে এসে বসলে জিজ্ঞেস করে, 'নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটেছে যে জন্যে শক্তিনাথজিকে সঙ্গে করে আপনাকে আসতে হল—তাই না?'

'এখনও কিছু ঘটেনি। তবে যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা করার জন্যে শক্তিনাথকে নিয়ে এসেছি।'

'ওঁকে পেলেন কোথায়?'

'সেদিন আপনার চিঠিটা পাওয়ার পর শক্তিনাথের কাছে লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছিলাম, যত তাড়াতাড়ি পারে সে যেন চলে আসে। আজ ভোরে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে আপনার এখানে নিয়ে এলাম।'

ভেতরে ভেতরে চাপা উদ্বেগ টের পাচ্ছিল সুমিত্রা। শক্তিনাথকে বলল, 'কোনো ঘটনা ঠেকাবার ব্যবস্থা করবেন যেন বললেন—'

শক্তিনাথ বলেন, 'মহেশ্বরের চিঠি পড়ে বুঝলাম মুনীশ্বর ঝা আপনার চরম কিছু ক্ষতি করতে চায়। সেটা আটকাতে হবে। আজ স্কুলে ছুটি নিতে পারবেন?'

'তা পারব। কিন্তু কেন?'

'আমি একটা গাড়ি নিয়ে এসেছি। আমার সঙ্গে মহেশ্বর আর আপনাকে এখনই ডিস্ট্রিক্ট টাউনে যেতে হবে।'

বিমূঢ়ের মতো সুমিত্রা বলল, 'ডিস্ট্রিক্ট টাউনে!'

'হাঁ।' মাথাটা সামান্য হেলিয়ে শক্তিনাথ বলেন, 'আমার আর মহেশ্বরের ধারণা, এখানকার থানা আপনাকে কোনোরকম প্রোটেকশন দেবে না। মুনীশ্বর ওদের কিনে নিয়েছে। কীরকম বদমাইশি করে আসল কালপ্রিটের বদলে একটা নিরীহ লোককে ফাঁসিয়ে দিয়েছে, সে তো বুঝতেই পারছেন। যেহেতু আপনি গঞ্জু বিনোদকে বাঁচাতে চাইছেন আর আসল অপরাধীকে সাজা দেবার চেষ্টা করছেন সেজন্য আপনার ওপর ওদের প্রচন্ড রাগ। ওরা আপনার যে ক্ষতি করতে চাইছে সেটা আপনি আমি যেমন জানি, এখানকার থানাও ভালো করেই জানে। এ নিয়ে যদি অভিযোগ করতে যান, থানা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে।' শক্তিনাথ বলতে লাগলেন, 'তাই হায়ার অথরিটির কাছে যেতে হবে। এই ডিস্ট্রিক্টের এস. পি খুবই স্ট্রিক্ট আর অনেস্ট অফিসার। ওঁকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি। তাঁর কাছে গিয়ে সব জানালে, আমার বিশ্বাস, কাজ হবে।'

'ঠিক আছে।'

ডিস্ট্রিক্ট টাউনে সুমিত্রারা পৌঁছুল দুপুরে। সকালে চা চাড়া কেউ কিছু খেয়ে আসেনি। প্রচন্ড খিদে পেয়ে গিয়েছিল। একটা হোটেলে খাওয়া সেরে এস. পি'র অফিসে যখন ওরা এল আড়াইটা বাজে।

এস. পি জানকীলাল ত্রিবেদী সুমিত্রাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শক্তিনাথ যে তাঁকে আগেই খবর দিয়ে রেখেছিলেন, সুমিত্রাকে জানাননি।

এস. পি'র সুসজ্জিত বিশাল কামরায় ঢুকতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে বললেন, 'আসুন শক্তিনাথজি, মহেশ্বরজি—'শক্তিনাথকে তো বটেই, মহেশ্বরজিকেও যে তিনি চেনেন সেটা বোঝা গেল। সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই সুমিত্রাজি।'

সুমিত্রা একটু অবাক হল, 'আমাকে চিনলেন কী করে?'

এস. পি বললেন, 'শক্তিনাথজি জানিয়েছেন, আজ আপনাকে নিয়ে আসবেন। প্লিজ বি সিটেড।'

সবাই বসার পর এস. পি এবার শক্তিনাথকে বললেন, 'আপনাদের প্রবলেমটা শোনা যাক।'

শক্তিনাথ ধীরে ধীরে আদ্যোপান্ত সব বলে গেলন। শুনতে শুনতে মুখ লাল হয়ে ওঠে এস. পি'র। তিনি বললেন, 'একটা মেয়ে রেপড আর মার্ডারড হয়েছে, এটাই শুধু আমাকে জানানো হয়েছে, কিন্তু এর পেছনে এত সব মারাত্মক ঘটনা যে রয়েছে তা শুনিনি। মুলায়েম চৌবের সম্বন্ধে কিছু কিছু কমপ্লেন আমার কানে এসেছে। ব্যাপারটা এত গুরুতর ভাবতে পারিনি। কয়েকটা কোরাপ্ট লোকের জন্যে আমাদের ডিপার্টমেন্টের বদনাম হয়ে যাচ্ছে।' তাঁর কণ্ঠস্বরে রাগ এবং আক্ষেপ ফুটে বেরোয়।

একটু চুপচাপ।

তারপর এস. পি ফের বলেন, 'এবার বলুন আমার কাছে আপনারা কী ধরনের সাহায্য চান?'

শক্তিনাথ বললেন, 'প্রথমত, আসল খুনি সাজা পাক, তার ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে।'

এস. পি বললেন, 'আপনি আমার চেয়ে আইন অনেক ভালো বোঝেন। যে কেস সাব-জুডিস, কোর্টের এখতিয়ারে চলে গেছে, সেখানে আমার কিছু করার থাকে না। আদালতের রায় মাথা পেতে নিতেই হবে।'

শক্তিনাথ বলেন, 'আপনি একটা কাজ করতে পারেন ত্রিবেদী সাহেব—'

'কী কাজ?'

'আসল অপরাধীকে ধরা।'

'আসল অপরাধীকে ধরার জন্যে তো প্রমাণ চাই, সাক্ষী চাই—'

'সাক্ষী আছে।'

'কোর্টে তাদের হাজির করুন। আদালত রায় দিলেই আমরা রিয়াল কালপ্রিটকে অ্যারেস্ট করব।'

'প্রমাণ আমি করে দিতে পারি, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সাক্ষীদের নিয়ে।'

'কীসের সমস্যা। ওদের কি বিগড়ে যাবার সম্ভাবনা?'

শক্তিনাথ জানান, ঠিক তা নয়। তারা আন্তরিকভাবেই চায় মুনীশ্বর ঝা'র ছেলের শাস্তি হোক, কিন্তু লোকটার টাকার জোর তো রয়েছেই, উঁচু মহলেও তার প্রচণ্ড প্রভাব। তা ছাড়া, বন্দুকবাজদের একটা বাহিনীও সে পোষে। মুনীশ্বরের ভয়ে সাক্ষীরা শেষ পর্যন্ত আদালতে আসবে কিনা সন্দেহ। এস. পি যদি তাদের নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করেন তবে তারা নির্ভয়ে সাক্ষি দিতে পারে। এর ফলে একটি নিরপরাধ লোকের জীবন রক্ষা হবে।'

এস. পি বললেন, 'নিশ্চয়ই প্রোটেকশন দেব। আপনি সাক্ষীদের নামগুলো আর ওদের ঠিকানা লিখে দিন।'

'এক্ষুনি দিচ্ছি। কিন্তু সুমিত্রাজির ব্যাপারে কী স্টেপ নেবেন?'

এস. পি বললেন, 'সে ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই হবে। ওঁর কোয়ার্টারের সামনে পুলিশ পোস্টিং করিয়ে দেব।' একটু চুপ করে থেকে খানিকটা আত্মগতভাবেই বলে উঠলেন, 'শী ইজ আ ব্রেভ লেডি। আমাদের সোসাইটিতে এমন একজন মহিলা আছেন, ভাবতেও গর্ববোধ করছি। শক্তিনাথজি, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, কেউ ওঁর এতটুকু ক্ষতি করতে পারবে না।'

'লচ্ছুদের ভিলেজেও কি পুলিশ বসাবেন?'

'অবশ্যই। আজই নহরপুরা থানায় মেসেজ পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওরা পুলিশ প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করবে। আর—'

'আর কী?'

এস. পি বললেন, 'দু-একদিনের ভেতর মুনীশ্বর ঝা'র বন্দুকবাজদের থানায় ডাকিয়ে এনে মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়া হবে, সুমিত্রাজির ওপর তারা যেন কোনোরকম হামলা না করে।'

মহেশ্বর বললেন, 'ওরা তো এখন পর্যন্ত কিছু করেনি। এভাবে মুচলেকা লেখাতে গেলে মুনীশ্বর ঝা গোলমাল করবে না?'

'একটু আগে জানিয়েছেন, 'ওই অ্যান্টি-সোশালগুলোর নামে থানায় ডজন ডজন অভিযোগ আছে। ওদের ডেকে এনে হুঁশিয়ার তো করে দেওয়াই যায়।' এস. পি বললেন।

দ্বিধান্বিতভাবে মহেশ্বর বললেন, 'কিন্তু—'

'কী?' উৎসুক চোখে তাকালেন এস. পি।

'শুনেছি এম. এল এ, এম. পি আর মিনিস্টারদের সঙ্গে মুনীশ্বর ঝা'র খুব দহরম মহরম। যদি—'বলতে বলতে চুপ করে গেলেন মহেশ্বর।

এস. পি বললেন, 'আপনি বোধ হয় বলতে চাইছেন, মন্ত্রী টন্ত্রীদের দিয়ে আমার ওপর লোকটা প্রেসার দেবে, যাতে ওদের ওপর আমি কোনো কড়া স্টেপ না নিতে পারি—এই তো?'

আস্তে মাথা নাড়লেন মহেশ্বর।

টেবলের ওপর অনেকখানি ঝুঁকে এস. পি বললেন, 'মহেশ্বরজি, আপনি জানেন, কোনো প্রেসারের কাছেই আমি মাথা নোয়াই না। আমার এলাকায় কাউকে কানুন ভাঙতে দেব না। সে যে-ই হোক। পুলিশের উর্দি যখন গায়ে চড়িয়েছি তখন 'রুল অফ ল' চালু রাখবই। মন্ত্রী বা এম. পি—যে যাই বলুক, আমার যা আইনসঙ্গত মনে হবে তা-ই করব। 'রুল অফ ল' ছাড়া আমি আর কিছু বুঝি না।' তাঁর কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য ফুটে বেরোয়।

মহেশ্বর এস. পি'র মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন। তাঁর মনোভাবটা আন্দাজ করে নিয়ে এস. পি বলেন, 'আপনি হয়তো ভাবছেন, এর ফলে আমার ক্ষতি হয়ে যাবে--'

আস্তে মাথা হেলিয়ে দেন মহেশ্বর, 'হাঁ।'

হেসে হেসে এস. পি বলেন, 'এম. এল. এ, এম. পি কি মিনিস্টটাররা হল দু'দিনের। আজ হুটার বাজিয়ে, গাড়ির মাথায় লাল বাতি জ্বালিয়ে, রাস্তা কাঁপিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরের ইলেকশনে হেরে গেলে তাদের দাম ফুটা কড়িও নয়। লেকেন আমার চাকরিটা পাকা। কোনো মিনিস্টারের বাবারও সাধ্য নেই সেটা খেতে পারে। আমার জন্যে চিন্তা করবেন না।'

শক্তিনাথ বললেন, 'আপনার কাছে এসে যথেষ্ট ভরসা পাওয়া গেল। এবার তা হলে উঠি—'

'আসুন।'

তেইশ

নিরাপত্তার জন্য সব ব্যবস্থাই করা হয়েছে, কিন্তু তবু পালটা আঘাতটা ঠেকানো গেল না।

ডিস্ট্রিক্ট টাউনে এস. পি'র সঙ্গে দেখা করে আসার দু'দিন পর আজ ভোরে হাসপাতালের কোয়ার্টারে গিয়েছিল সুমিত্রা। বন্দুকধারী দুই দেহরক্ষীও তার সঙ্গে গেছে।

আসলে এই দু'দিন বিজয়ের সঙ্গে সুমিত্রার দেখা হয়নি। ডিস্ট্রিক্ট টাউন থেকে ফিরে স্কুল নিয়ে সে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে যাবার মতো সময় করে উঠতে পারেনি। অথচ সে জানে, এস. পি'র সঙ্গে তার, মহেশ্বরের এবং শক্তিনাথের কী কথা হয়েছে, শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে বিজয়। অবশ্য রামবনবাসকে দিয়ে সুমিত্রা খবর পাঠিয়েছিল, ব্যস্ততার জন্য সে আপাতত যেতে পারছে না, বিজয় যেন একবার তার কোয়ার্টারে আসে। বিজয়ের পক্ষেও আসা সম্ভব হয়নি। রামবনবাসকে সে বলে দিয়েছিল, তিন চারটে মরণাপন্ন রোগী নিয়ে দিবারাত্রি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। তার পক্ষে হাসপাতাল থেকে এখন বেরুনো অসম্ভব। ব্যস্ততা কমলে সুমিত্রা যেন তার ওখানে চলে যায়। সেই অনুযায়ী আজ সকালে বেরিয়ে পড়েছিল।

বিজয়কে তার কোয়ার্টারে পাওয়া গেছে। সে তখন ঘুমোচ্ছিল। ওর নৌকর হরিয়া জানিয়েছে, আগে দু'রাত দু'দিন হাসপাতালে দু'টো মুমূর্ষ রোগীর কাছে বসে কাটিয়েছে বিজয়। কোয়ার্টারে শুধু একবার স্নান টান করার জন্য এসেছিল। রোগীরা একটু সুস্থ হলে আজ ভোরে এসে শুয়ে পড়েছে।

হরিয়া জিজ্ঞেস করেছে, 'ডাক্তারসাবকে ডাকব?'

সুমিত্রা বলেছে, 'না, থাক। ও ঘুমোক। আমি অপেক্ষা করছি।'

হরিয়া অবশ্য খাতিরদারির ত্রুটি রাখেনি। সুমিত্রাকে চা করে দিয়েছে, সেই সঙ্গে বিস্কুট এবং কলাকন্দ।

বিজয়ের ঘুম ভাঙল দশটায়। চোখ মেলে খাটের পাশে সুমিত্রাকে বসে থাকতে দেখে তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, 'কখন এসেছ?'

'সাড়ে পাঁচটায়। তখনও ভালো করে রোদ ওঠেনি।'

'কী আশ্চর্য, এতক্ষণ চুপচাপ বসে আছ! ডাকোনি কেন?'

'হরিয়া ডাকতে চেয়েছিল, আমি বারণ করেছি। দু'রাত ঘুমোওনি। হুট করে জাগিয়ে দিলে শরীর খারাপ হত।'

'তুমি একটু বোসো। আমি মুখ ধুয়ে আসি।—হরিয়া চা বসিয়ে দে।'

কিছুক্ষণ পর মুখোমুখি বসে চা খেতে খেতে সুমিত্রার কাছ থেকে এস. পি'র সঙ্গে তার এবং মহেশ্বরদের যা কথাবার্তা হয়েছে সব শুনে খুশি হল বিজয়। এখন অনেকটাই দুশ্চিন্তামুক্ত সে। বলল, 'যাক, পুলিশ প্রোটেকশন যখন তোমাকে দিয়েছে তখন ভয়টা কাটল। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এস. পি মানুষটা খুব ভালো আর কড়া অফিসার।'

'হাঁ।' আস্তে মাথা নাড়ে সুমিত্রা, 'ওই বন্দুকবাজগুলো জন্যে কী আতঙ্কে যে ছিলাম বলে বোঝাতে পারব না।'

একটু চিন্তা করে বিজয় জিজ্ঞেস করে, 'গঞ্জু বিনোদকে আবার কবে যেন আদালতে তোলা হবে?'

'শুক্রবার।'

'আজ হল সোমবার। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি—হাতে তিনটে দিন আছে।'

'হাঁ।'

'আমার ধারণা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবার গঞ্জু বিনোদকে নিশ্চয়ই 'বেইল' দেবেন।'

'মনে হচ্ছে।'

'বেইল পেলে আমাদের একবার বিনোদদের গাঁয়ে যাওয়া দরকার। এতে ওরা অনেকখানি ভরসা পাবে।'

সুমিত্রা আস্তে মাথা নাড়ে, আমিও ভেবে রেখেছি, জামিন পাওয়া গেলে বিনোদকে সঙ্গে নিয়ে ওদের বাড়িতে পৌঁছে দেব।'

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় ব্যস্তভাবে বিজয় জিজ্ঞেস করে, 'কয়েক দিন আগে বিনোদের স্ত্রীকে শ'খানেক টাকা দেওয়া হয়েছিল। তারপর কি কিছু পাঠিয়েছ?'

সুমিত্রা চমকে ওঠে, 'না। নানা ঝঞ্ঝাটে একেবারে খেয়াল ছিল না। ওদের আগেই কিছু পাঠিয়ে দেব।'

বিজয় বলল, 'শুক্রবার আমি তোমাদের সঙ্গে কোর্টে যাব।'

'তা হলে তো খুবই ভালো হয়।'

আরও খানিকক্ষণ কথা বলে সুমিত্রা উঠে পড়ে।

ভোরবেলায় একটা রিকশায় সুমিত্রা এবং অন্য একটা রিকশায় চড়ে তার দুই দেহরক্ষী বিজয়ের কোয়ার্টারে এসেছিল। এখন দু'টো রিকশা নিয়ে তারা ফিরে যাচ্ছে।

নহরপুরার মতো ছোটো শহরে রাস্তার মোড়ে মোড়ে পান বা চায়ের দোকানগুলোর সামনে থোকা থোকা ভিড় জমে থাকে প্রায় সারাদিনই।

বড় রাস্তা ধরে খানিকটা যাবার পর প্রথম মোড়টার কাছে আসতেই হইহল্লা কানে এল সুমিত্রার। ডান ধারে মুখ ফেরাতেই সে দেখতে পেল, কতকগুলো হট্টাকাট্টা চেহারার লোক চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, 'এ সুমিত্রাজি রিকশা রুখিয়ে, রিকশা রুখিয়ে—' বলতে বলতে ওরা সাইকেল রিকশার সামনে এসে দাঁড়াল।

আর্মড গার্ড দু'টো বন্দুক উঁচিয়ে চিৎকার করে, 'হঠো, হঠো—হঠ যাও—'

ভিড়ের একেবারে সামনের দিকে যে রয়েছে তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। পরনে হাফ-হাতা জামা আর ধুতি, ধুতিটার কাছা পাকিয়ে কোমরে গুঁজে দেওয়া হয়েছে। মাথায় তেরছা করে টুপি পরা, গালে দু-তিন দিনের না-কামানো দাড়ি। জাবর কাটার মতো সমানে পান চিবিয়ে যাচ্ছে সে।

লোকটা বন্দুকধারী গার্ডদের বলল, 'সিপাহিজিরা, আমরা কোনোরকম ঝঞ্ঝাট করছি না। ব্রিফ সুমিত্রাজির সঙ্গে দো-চারগো কথা বলছি।' বলে সুমিত্রার দিকে ফিরল, 'আপনি সুবে সুবে সূরয ওঠার আগে ডাক্তারসাবের কোয়ার্টারে এসেছিলেন, তা আমরা জানি।'

সুমিত্রা চকিত হয়ে ওঠে। লোকগুলো কি তার গতিবিধির ওপর নজর রেখেছে? উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে সে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

লোকটা এবার বলে, 'সুমিত্রাজি, আসার সময় আমাদের টৌনের দীবারগুলো আপনার নজরে পড়েছে?'

দীবার অর্থাৎ দেওয়ালগুলোর দিকে চোখ ফেরাবার কথা মনে হয়নি সুমিত্রার। বিমূঢ়ের মতো সে মাথা নাড়ে, 'না তো—'

'না পড়ারই কথা। অত ভোরে দিনের রোশনি তখনও ভালো করে ফোটেনি। তাই দেখতে পাননি। ওই দেখুন—'বলে লোকটা রাস্তার দু'ধারের বাড়িগুলোর দেওয়াল দেখিয়ে দিতে থাকে।

প্রতিটি দেওয়ালের গায়ে বড় বড় পোস্টার সাঁটা। সাদা কাগজের ওপর কালো কালো হরফে যা লেখা রয়েছে তা এইরকম। ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে সমাজ কল্যাণ দপ্তরে স্কুলের হেডমিস্ট্রেস সুমিত্রা মিশ্র অচ্ছুৎ থেকে খ্রিস্টান হওয়া নহরপুরা হাসপাতালের ডাক্তার বিজয়ের সঙ্গে প্রেম করছে। শুধু তাই না, লুকিয়ে লুকিয়ে একজন আরেকজনের কাছে রাত কাটিয়ে আসে। আওরতটা দুশ্চরিত্র, বদ। নহরপুরায় এই ধরনের বেলেল্লাপনা আর নষ্টামি বরদাস্ত করা হবে না, ইত্যাদি।

লোকটা আবার বলে, 'দেখা হ্যায় তো?' সে আরও জানায়, এরকম পোস্টারে পুরো শহর ছেয়ে আছে। তারপর সারা শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে হেসে ওঠে।

শুধু ওই লোকটাই না, তার সঙ্গীরাও গোটা এলাকা কাঁপিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করে হাসতে থাকে। লোকটা সারা মুখ জুড়ে হেসে হেসে বলে, 'বাতচিত হয়ে গেছে। অব যাইয়ে—'

মাথার ভেতর একটা আগুনের চাকা ঘুরে যাচ্ছে সুমিত্রার। ব্যাপারটা এতই অভাবনীয় আর আতঙ্কজনক যে তার শ্বাস আটকে আসতে থাকে।

রিকশা ফের চলতে শুরু করে। লোকটা মিথ্যে বলেনি, সত্যিই প্রতিটি বাড়ির দেওয়ালে তার সঙ্গে বিজয়কে জড়িয়ে অগুনতি কুৎসিত পোস্টার লাগানো রয়েছে।

যে বড় রাস্তাটা দিয়ে সুমিত্রাদের সাইকেল রিকশা দু'টো চলেছে, কিছু দূর পর পর সেটার গা থেকে সরু সরু গলি ডাইনে এবং বাঁয়ে চলে গেছে। এই গলিগুলোর প্রতিটিরই মুখে আট দশটা করে লোকের জটলা। আগের সেই টুপি-পরা লোকটার মতো ওরা তার রিকশা আটকাচ্ছিল না তবে তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে নোংরা অঙ্গভঙ্গি করে জোরে জোরে খ্যা খ্যা করে হাসছিল।

সমস্ত শরীর টলছে সুমিত্রার। সূর্য প্রায় মাথার ওপর উঠে এসেছে। চারিদিকে উজ্জ্বল রোদের ছড়াছড়ি। তবু কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিল না সে, তার চোখের সামনে সমস্ত কিছু দ্রুত ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

একসময় সুমিত্রারা মুনীশ্বর ঝা'র বিশাল বাড়ির সামনে চলে আসে।

প্রকাণ্ড লোহার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মুনীশ্বর, তার পেছনে বাছা বাছা তাগড়া চেহারার ক'টা লোক।

মুনীশ্বর ডাকে, 'সুমিত্রাজি—সুমিত্রাজি—'

প্রথমটা লক্ষ করেনি সুমিত্রা। ডাকটা কানে যেতে চমকে ওঠে সে। তারপর মুখ ফিরিয়ে মুনীশ্বরকে দেখতে পায়। লোকটা হাতজোড় করে মধুর হেসে বলে, 'এদিকে এসেছিলেন বুঝি?'

প্রশ্নটা নেহাতই অনাবশ্যক। শহরের এই অঞ্চলে সুমিত্রা যে এসেছে তা তো দেখাই যাচ্ছে। তবু সেটা এত ঘটা করে জিজ্ঞেস করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। সুমিত্রা উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে রইল শুধু। মুনীশ্বর ফের বলে, 'খবর পেলাম আপনি এই রাস্তা দিয়ে ফিরে যাবেন। তাই দাঁড়িয়ে আছি। অনেক দিন দেখা হয়নি তো—'

বিদ্যুৎচমকের মতো সুমিত্রার মাথায় কিছু একটা খেলে যায়। তার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার লাগানো, তার উদ্দেশে শয়তানী হাসি হাসার

জন্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে লোক মোতায়েন করা—এ সবই ছক কষে করেছে মুনীশ্বর। বন্দুকবাজদের দিয়ে হুমকি দেওয়া নয়, অত্যন্ত মসৃণভাবে তার বিরুদ্ধে এবার বিষ উগরে দিয়েছে লোকটা। অথচ কিছুই করার নেই সুমিত্রার। মুনীশ্বর যে পোস্টার লাগিয়েছে বা রাস্তার লোকগুলোকে তার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে, কোনোভাবেই তা প্রমাণ করা যাবে না।

মুনীশ্বর হাতজোড় করেই ছিল। অত্যন্ত বিনীত সুরে বলল, 'ভালো আছেন তো?'

উত্তর না দিয়ে সুমিত্রা রিকশাওলাকে বলল, 'তুরন্ত চালাও—'

সারাটা রাস্তা পেরিয়ে কোয়ার্টারে আসতেই দেখা গেল, টেবলের ওপর অনেকগুলো চিঠি পর পর সাজানো রয়েছে। এগারোটা নাগাদ এখানে ডাক পিওন আসে। তখন সে স্কুলে থাকে। চিঠিপত্র এলে লখিয়া তার টেবলে রেখে দেয়।

চিঠি খুব কমই আসে তার। বাবা মাঝে মাঝে লেখেন। ক্বচিৎ কখনও পিসতুতো আর মামাতো ভাইবোনেরা। তবে তার কলেজের বন্ধু রজনী কানাডা থেকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে গ্রিটিংস কার্ড পাঠায়।

সুমিত্রা টেবলের চিঠিগুলো গুনে গুনে দেখল। সবসুদ্ধ সাতাশখানা। সবগুলোই খাম। একসঙ্গে এত চিঠি জীবনে আগে আর কখনও পায়নি সে। কারা এগুলো লিখল, বোঝা যাচ্ছে না। রীতিমতো অবাক হয়ে একটা খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠি বার করল সুমিত্রা। মোট চারটি লাইন। নহরপুরার দেওয়ালে দেওয়ালে আর পোস্টারগুলোতে যা রয়েছে, চিঠিটায় হুবহু তা-ই লেখা। এরপর উন্মাদের মতো অন্য খামগুলো খোলে সুমিত্রা। সব চিঠির বয়ান অবিকল এক।

মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে সুমিত্রার। মনে হয়, তার এই ঘর, টেবল চেয়ার, খাটের ধবধবে বিছানা থেকে শুরু করে মেঝে পর্যন্ত সব দুলছে। এই মুহূর্তে কোনো কিছুই গুছিয়ে ভাবতে পারছে না সুমিত্রা। তবু তারই মধ্যে মনে হল, এই চিঠিগুলো অন্তত দু'দিন আগে ডাকে দেওয়া হয়েছে। নইলে আজ এসে পৌঁছুত না। সুচতুর পরিকল্পনা করে তার জীবন দুর্বিষহ করে তোলার জন্যই এত পোস্টারে পোস্টারে শহর ছেয়ে দেওয়া এবং এতগুলো চিঠি পাঠানো হয়েছে।

সুমিত্রা বুঝতে পারছিল, এরপর আর নহরপুরায় থাকা একেবারেই সম্ভব নয়। এখান থেকে তাকে চলে যেতে হবে। মুহ্যমানের মতো বসে থাকে সে।

একসময় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে রামবনবাস ঘরে এসে ঢোকে। তার চোখেমুখে আতঙ্ক। সন্ত্রস্ত সুরে বলে, 'দিদিজি, সর্বনাশ হয়ে গেছে। পুরা শহর আপনার নামে—'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে সুমিত্রা বলে, 'জানি। একটু আগে ডাক্তার সাহেবের কোয়ার্টার থেকে ফেরার সময় আমার চোখে পড়েছে।'

কী বলবে ভেবে পায় না রামবনবাস। দিশেহারার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। সুমিত্রা হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। একটা সুটকেসে তার জামাকাপড় পুরতে পুরতে বিলে, 'আমি চলে যাচ্ছি—'

রামবনবাস চমকে ওঠে। বিমূঢ়ের মতো বলে, 'চলে যাবেন?'

সুমিত্রা বলে, 'মুনীশ্বর ঝা'রা যা অবস্থা করেছে তাতে এখানে কী করে থাকব! রাস্তায় আমার পক্ষে বেরুনো অসম্ভব—'

'লেকেন এখানকার স্কুলের কী হবে? এতগুলো ছেলেমেয়ে—'বলতে বলতে থেমে যায় রামবনবাস।

সুমিত্রা উত্তর দেয় না। জামাকাপড় ভরা হয়ে গিয়েছিল। সুটকেস বন্ধ করে সে বেরুতে যাবে, কোয়ার্টারের সামনের রাস্তা থেকে পরিচিত একটি কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'গুড়িয়া—'পরক্ষণে রঘুপতি মিশ্রকে দেখা যায়। সামনের আঙিনা পেরিয়ে তিনি ঘরের ভেতর চলে আসেন। তাঁর কাঁধ থেকে একটা ভারী কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে।

রঘুপতি কাছাকাছি আসতেই তাঁর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বালিকার মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে

ওঠে সুমিত্রা। মেয়ের মাথায়, পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে খাটে বসে তাকে পাশে বসিয়ে স্নেহার্দ্র সুরে রঘুপতি বলেন, 'কাঁদিস না মা, কাঁদিস না।'

বাবাব বুকের ভেতর থেকে মুখ তুলে কান্না-জড়ানো গলায় সুমিতার বলে, 'আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলাম বাবুজি—'

'কেন?'

'তুমি জানো এখানে কী হয়েছে?'

'জানি। বাস স্ট্যান্ডে নেমে আসার সময় রাস্তায় রাস্তায় পোস্টারগুলো চোখে পড়ল।'

'এরপর কি এখানে থাকা যায়?'

রঘুপতি বললেন, 'বাড়ি গিয়েও কি তুই স্বস্তিতে থাকতে পারবি? এই দ্যাখ—'ব্যাগ থেকে অগুনতি খামের চিঠি বার করে বিছানায় রাখেন তিনি।

অবাক হয়ে সুমিত্রা জিজ্ঞেস করে, 'এত চিঠি কিসের?'

'একটা পড়ে দ্যাখ—'

প্রতিটি খামের মুখ খোলা। একটা চিঠি তুলে বার করে চোখ বুলিয়েই শিউরে উঠল সুমিত্রা। রঘুপতিকেও সেই একই ধরনের নোংরা চিঠি দেওয়া হয়েছে।

সুমিত্রা টেবলের দিকে আঙুল বাড়িয়ে চিঠির স্তূপ দেখাতে দেখাতে বলল, 'আমাকেও দিয়েছে।'

রঘুপতি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, 'তোকে আমাকে ছাড়াও মণিহারির আরও অনেককে একই চিঠি পাঠানো হয়েছে এখান থেকে।' অর্থাৎ বাড়ি ফিরে গিয়েও নিস্তার নেই সুমিত্রার। প্রতিবেশীরা, বিশেষ করে যারা উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেখানেও তাকে ছোবল মারার সবরকম ব্যবস্থাই করে রেখেছে মুনীশ্বর ঝা।

দু'হাতে মুখ ঢেকে একেবারে ভেঙে পড়ে সুমিত্রা। রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'এখন আমি কী করব বাবুজি?'

'যা করলে ওদের নোংরামি খানিকটা বন্ধ করা যাবে সে জন্যে আজ আমি এসেছি।'

'কী করতে চাও?'

'কাল বিজয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব। তাতে কুৎসাটা আটকানো যাবে। ভারতীয় আইনে পছন্দমতো কাউকে বিয়ে করার অধিকার দিয়েছে।'

হতচকিত সুমিত্রার শিরদাঁড়া টান টান হয়ে যায়। বিহ্বলের মতো সে বলে, 'কিন্তু মা, পিসি, মামা, মাসিরা—'নিজেদের বাড়ির লোকজন এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হবে, সে সম্বন্ধে খুবই চিন্তিত দেখায় তাকে।

রঘুপতি বলেন, 'সেটা আমি সামলাব। তোকে এ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

পরদিন ডিস্ট্রিক্ট টাউনে এক ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে নিয়ে গিয়ে সুমিত্রা আর বিজয়ের বিয়ে দেন রঘুপতি। মহেশ্বর এবং শক্তিনাথকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা এ বিয়ের সাক্ষী হিসেবে সই করেন। তারপর দিন কোর্টে তোলা হয় গঞ্জু বিনোদকে। রঘুপতি, মহেশ্বর, সুমিত্রা, বিজয় সবাই সেখানে গিয়েছিল। আজ প্রভাকর নয়। শক্তিনাথ বিনোদের পক্ষে দাঁড়ালেন। তিনি এমন জোরালোভাবে কেসটা ব্যাখ্যা করেন যে বিচারক তার জমিন দিতে বাধ্য হন।

আদালত থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে রঘুপতি বলেন, 'একটা যুদ্ধ জেতা গেল। আশা করা যায়, গঞ্জু বিনোদকে সসম্মানে মুক্ত করে আনতে পারবেন শক্তিনাথজি। আব আসল অপরাধীর সাজা হবে।'

শক্তিনাথ হেসে হেসে বললেন, 'আমার সেইরকম আশা।'

কথা বলতে বলতে সবাই রাস্তায় চলে আসে।

সুমিত্রা ভাবছিল, একটা যুদ্ধ জেতা গেল। এরপর সামনে অনেক লড়াই রয়েছে। যুদ্ধের কি শেষ আছে?

মানুষের ভূমিকায়

মাঘ মাস শেষ হয়ে এল। কিন্তু উত্তুরে বাতাস থেকে হিমের ভাব এখনও পুরোপুরি কাটেনি।

শীতের শেষাশেষি এই সময়টা আকাশ বড় নীল, বড় মায়াবী। কোথাও এক ফোঁটা মেঘ চোখে পড়ে না। গোটা আকাশ একখানা পালিশ-করা আরশি হয়ে সারাদিন যেন ঝকমকায়।

এখন দুপুর। সূর্যটা সোজাসুজি মাথার ওপর উঠে এসেছে। চারদিকে টলটলে সোনালি মদের মতো অঢেল রোদের ছড়াছড়ি। এই রোদ যেন চোখে নেশা ধরিয়ে দেয়।

এখানে বিশাল প্রাচীন আকাশের তলায় পূর্ণিয়া জেলার সীমাহীন শস্যক্ষেত্র গা এলিয়ে পড়ে আছে। আকাশ যেখানে শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে দিগন্ত পর্যন্ত ছুটে গেছে, চাষের জমি ততদূর ছড়ানো। মাঘের শেষে এখন মাঠ একেবারে ফাঁকা। মাসদেড়েক আগে অঘ্রাণের গোড়াতেই সব ফসল কাটা হয়ে গিয়েছিল। শূন্য মাঠের ওপর দিয়ে সারাদিন হু হু করে উত্তুরে হাওয়া ছুটে যায় আর উড়তে থাকে ঝাঁক ঝাঁক বুনো টিয়া। থেকে থেকে তারা জমিতে নেমে চোখা ঠোঁটে মাটি ঠোকরায়। কিন্তু না, কেউ তাদের জন্য একদানা শস্য কোথাও ফেলে রেখে যায়নি। শীতের নরম রোদ গায়ে মেখে অলস গোসাপেরা সোনালি পেট টেনে টেনে আলের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

ফসলের জমি এখানে একটানা নয়। ফাঁকে ফাঁকে ঝোপঝাড়, টুকরো টুকরো আখের খেত, লম্বা লম্বা বন ঝাউয়ের ঝুপসি জঙ্গল। আর আছে ছন্নছাড়া চেহারার কিছু কিছু গাঁ—এখানে বলে দেহাত। অনেক দূরে মাঠের একধারে সবুজ বনভূমির একটা ঘের চোখে পাড়ে। বনের পর পাহাড়ের ঝাপসা আঁকাবাঁকা রেখা।

মাঠ চিরে চিরে কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। বর্ষায় তার ওপর হাঁটুভর থকথকে কাদা জমে থাকে, বছরের বাকি সময়টা ধুলোর পুরু স্তর।

এখন মাঘের শেষাশেষি এই দুপুরবেলায় ধুলোর ওপর চাকার দাগ বসিয়ে বসিয়ে উমানাথদের ভাড়া-করা একটা বয়েল গাড়ি ঢিমে তালে এগিয়ে চলেছে। প্রকাণ্ড শিংওলা দু'টো আধবুড়ো বলদ গাড়িটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের কাঁধে থকথকে ঘা আর গলায় এক থোকা করে পিতলের ঘুণ্টি বাঁধা। জন্তু দু'টোর ঘায়ের ওপর চাক বেঁধে মাছির ঝাঁক চলেছে। চাকার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ আর বয়েলের গলার অনবরত ঘুণ্টির ধ্বনি উত্তুরে হাওয়ায় মিশে যাচ্ছে।

গাড়িটার সামনের দিকটা যেখানে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে সেখানে হট্টাকাট্টা চেহারার দেহাতি গাড়িওলা দু'ধারে পা ঝুলিয়ে বসে আছে ; তার হাতে লম্বা হিলহিলে বেতের ছপটি। বাহারের জন্য ছপটিটার আগায় নানা রঙের ফালি ফালি কাপড়ের টুকরো সেলাই করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গাড়িওলা বেসুরো বেঢপ গলায় অনবরত গেয়ে যাচ্ছে 'আরে বিলাখী বিলাখী রোয়ে সীয়া জনকীয়া—' কখনও তার গলা চাপা গুনগুনানির মতো শোনায়, কখনও দারুণ চড়ায় উঠে যায়। গাইতে গাইতে আচমকা বয়েল দু'টোর শিরদাঁড়ায় ছপটি হাঁকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'উর্‌রা—তুরন্ত কর বেটে। মেরে জোড়ে পঙ্খীরাজ উড়াল লে চল্‌। উর্‌রা—'

তার ঠিক পেছনেই গাড়ির গোল ছইয়ের বাইরে বসে আছে উমানাথ এবং তার বড় ছেলে সুবথ।

উমানাথের বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন। মাথার চুল সিকিভাগ সাদা। কণ্ঠার হাড় গজালের মতো মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। চামড়ায় জেল্লা নেই। এলোপাথাড়ি ছুরি দিয়ে দাগ টানার মতো কপালে কত যে আঁকিবুকি। না-কামানো মুখে খাপচা খাপচা কাঁচা দাড়ি। পরনে সস্তা লংক্লথের নোংরা হাফ শার্ট আর মোটা বনাতের খাটো ধুতি। তাকানোমাত্র টের পাওয়া যায়, এক শতাব্দীর আধাআধি যে সুদীর্ঘ সময় উমানাথ এই পৃথিবীতে টিকে আছে তার প্রতিটি দিন, প্রতিটি ঘণ্টা, প্রতিটি মিনিট তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। বেঁচে থাকার অবিরত যুদ্ধ। শরীরে স্বাস্থ্যে ক্ষয়ের ছাপ থাকলেও চোখদু'টো তার বড় জ্বলজ্বলে। মনে হয়, কেউ যেন সে দু'টোর পেছনে তেজী আলো জ্বেলে রেখেছে। এই চোখ বুঝিয়ে

দেয় অঢেল বাতাস, অশেষ শস্যক্ষেত্র, সীমাহীন নীলাকাশ, গাছপালা, পাখিপতঙ্গ—জগতের সব কিছু সম্বন্ধেই এখনও তার বিপুল আগ্রহ। এই পৃথিবীতে সে আরও দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকতে চায়।

সুরথের বয়স সতেরো আঠারো। লম্বাটে নরম মুখ। এক মাথা না-আঁচড়ানো রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল। ঠোঁটের ওপর সবে কালচে গোঁফের রেখা পড়তে শুরু করেছে। তার চোখেমুখে এবং চেহারায় উমানাথের ছাঁচটা অবিকল বসানো। চোখ দু'টি বড় সরল সুরথের, বড় নিষ্পাপ। পৃথিবীতে অনেক পরে এসেছে সুরথ, এখনও তার পাতলা তাজা শরীরে বাপের মতো ক্ষয় বা ধ্বংসের ছাপ পড়েনি।

আরও পেছনে ছইয়ের তলায় বসে আছে উমানাথের বউ সরযূ। পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছরের মেয়েমানুষ সে ; কোনো একদিন রূপসীই ছিল। সেই রূপের আভা এখনও তার ভাসা ভাসা চোখে, পাতলা নাকে এবং শরীরের গড়নে আবছাভাবে লেগে আছে। স্বামীর চাইতে পনেরো বছরের ছোটো সরযুর স্বাস্থটি কিন্তু এখনও অটুট। উমানাথের মতো মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এই পৃথিবীর সঙ্গে তাকেও কম যুদ্ধ করতে হয়নি, তবু তার শরীর এখনও ভাঙেনি।

সরযূর পরনে সাদা খোলের মোটা সুতোর লালপাড় শাড়ি আর সাদা ব্লাউজ। হাতে শাঁখা আর লাল কড়ের বালা ছাড়া আর কিছু নেই। কপালে সিঁদুরের বাসি টিপ। সিঁথির দু'ধার থেকে তেলহীন রুক্ষ চুল উড়ছে। ছোট ছেলে গৌর আর মেয়ে জবা বসে বসে ঢুলছে। গৌরের বয়স বারো। তার চেহারায় সরযূর আদল বসানো। মাতৃমুখী ছেলে। কিন্তু জবার মুখে আবার বাপের ছাপ। গৌরের পরনে ইজের আর চেক-কাটা হাফ শার্ট ; জবা পরেছে বেঢপ সবুজ ফ্রক আর ইজের।

বয়েল গাড়িটার একেবারে পেছন দিকে ছইয়ের বাইরে ডাঁই করে রাখা হয়েছে নারকেল দড়ি-বাঁধা খানকতক রংচটা টিনের বাক্স। সেগুলোর কলকব্জা ভাঙাচোরা। আর আছে পুরনো ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে জড়ানো তিন চারটে ঢাউস ঢাউস বিছানার বাণ্ডিল। এ ছাড়া কত যে কৌটা বাটা, পোঁটলা পুঁটলি আর হাজার রকমের লটবহর, তার লেখাজোখা নেই।

গাড়ির চাকার ধাক্কায় আর বয়েল দু'টোর খুরে খুরে রাস্তার ধুলো উড়ছে অবিরাম। আর সেই ধুলো বাতাসে ভাসতে ভাসতে উমানাথদের গায়ে মাথায় এক কড় পুরু হয়ে জমে গেছে।

উমানাথের কিন্তু ধুলোটুলোর দিকে লক্ষ্য নেই। অনন্ত আগ্রহ নিয়ে পূর্ণিয়া জেলার অফুরন্ত শস্যক্ষেত্র দেখছিল সে। সুরথও তার পাশে বসে এক অচেনা নতুন পৃথিবীকে দেখে যাচ্ছে।

ছইয়ের তলে বসে সরযূও চারপাশের চাষের জমিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। তার দু'চোখে আগ্রহ যতটা, ভয় আর সংশয়ও ঠিক সেই পরিমাণেই। ষোল বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছে। তারপর চোদ্দ পনেরোটা বছর স্বামীর পিছু পিছু পূর্ব বাংলার এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে, এক গঞ্জ থেকে আরেক গঞ্জে, এক জেলা থেকে আরেক জেলায় বেবাজিয়াদের (বেদে) মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। কী অনিশ্চিত জীবন তখন তাদের। তারপর শেষের ক'টা বছর ধলেশ্বরীর নতুন জাগা চরে মালো আর বারুইদের নয়া গ্রাম চরচিকন্দিতে একটু থিতু হয়ে বসেছিল। কিন্তু কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল, দেশখানা রাতারাতি দু'ভাগ হল। চরচিকন্দির সেই বড় সাধের ঘরদুয়ার ভেঙে আবার বেবাজিয়াদের মতো স্বামীর পিছু পিছু অজানা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে চলেছে সে। কোথায় ধলেশ্বরীর মাঝখানে বড় বাহারের চরচিকন্দি গ্রাম আর কোথায় পৃথিবীর কোন মাথায় পূর্ণিয়া জেলার এই মাঠঘাট শস্যক্ষেত্র। মেঘের গায়ে রোদের মতো আশা আর ভয়ে পঁয়ত্রিশ বছরের হৃৎপিণ্ড দুলতে থাকে সরযূর।

বয়েল গাড়িটা চলতে চলতে একটা আখের খেতের পাশে এসে গিয়েছিল। মোটা মোটা সরস আখগুলো দেখিয়ে উচ্ছ্বাসের গলায় প্রায় চেঁচিয়েই উঠল উমানাথ, 'দেখ ধনবৌ, আউখের (আখের) গোছ দেখ—'

মুখটা ছইয়ের বাইরে বাড়িয়ে সরযূ বলে, 'হ, বড় বাহাইরা (বাহারের)—'

'আমগো জলের দ্যাশে এমুন আউখ হয় না। মাটির বন্ন (রঙ) দেখ। মনে লয়, জমিনের ফলন এইখানে জবর। আমরা এই দ্যাশে পনেরো কানি জমিন পাইছি। দেইখো বছরের খোরাকির চিন্তা থাকব না।'

সরযূ উত্তর দেয় না। তার পঞ্চাশ বাহান্ন বছরের এই স্বামীটি বড় আশাবাদী আর বিপুল

জীবনীশক্তিতে ভরপুর। আজ তো প্রথম না, বিয়ের পর পনেরো ষোল বছরের কম করে পূর্ব বাংলার বিশ বাইশ জায়গায় তারা সংসার পেতেছে, আবার ক'দিন বাদে মালপত্র বেঁধে নৌকোয় তুলে আরেক ঠিকানায় পাড়ি দিয়েছে। একখান থেকে আরেকখানে যাবার সময় পিছন ফিরে আর তাকায় না উমানাথ। নতুন যেখানে সে যাচ্ছে, সেই জায়গাটা সম্বন্ধে তখন তার কত প্রত্যাশা, কত প্রগাঢ় মমতা! সে ভাবতে থাকে কীভাবে নতুন জায়গায় গিয়ে শিকড়হীন হতচ্ছাড়া জীবনটাকে গুছিয়ে বসবে। এই বিশাল পৃথিবীতে ছেলেমেয়েদের জন্য খান দুই ঘর এবং এক টুকরো নিজস্ব জমি রেখে যাবার স্বপ্ন তার বহুকালের। উমানাথের সঙ্গে একটানা কুড়িটা বছর ছায়ার মতো ঘুরতে ঘুরতে সরযূর মনে হয়েছে, স্বপ্নদর্শী এই মানুষটার আশার শেষ নেই। একটা দিনের জন্যও তাকে কখনও ভেঙে পড়তে দেখেনি সরযূ, কোনোদিন সে হার মানতে জানে না।

উমানাথ ফের বলল, 'আরফিন সাহেবে কইছে এইখানের মাটি দুই ফসলী। দুইবার যদি ধান উঠাইতে পারি খোরাকিরটা রাইখা বাকি ধান বেইচা ত্যাল-লবণ-কাপড়ের ব্যবস্থাও হইয়া যাইব। তাইলে (তা হলে) আর ভাবনা থাকব না। তুমি কী কও ধনবৌ?'

স্বামীর বিপুল আশাবাদ সরযূকে অনেকখানি সজীব করে তোলে। সে বলে, 'দুইবার ধান উঠলে আর ভাবনা কী? তুমি তো হগল (সব) দিক দেইখা শুইনাই এইখানে আইছ!'

'হ। প্যাটের ভাত আব পিন্ধনের (পরনের) কাপড়ের ব্যবস্থা হইয়া গ্যালে টাণ্ঠা মাণ্ঠা (এটা সেটা) কইরা দুইটা পয়সা নি ঘরে আনতে না পারুম?' উমানাথ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অল্প হাসে।

স্বামীর কর্মক্ষমতার ওপর সরযূর অগাধ ভরসা। সে বলে, 'হে (তা) তুমি পারবা। তুমি বাপু না পার কী?'

ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করতে করতে বয়েল গাড়ি একসময় আখের খেত পেরিয়ে যায়। আবার মুখ ফিরিয়ে সামনে তাকাতে গিয়ে উমানাথের চোখ পড়ে গাড়িওলার দিকে। কী একটু ভেবে পকেট থেকে দু'টো লম্বা বিড়ি আর দেশলাই বার করে ডাকে, 'এই ভাই—'

গাড়িওলা গাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কা?'

'বিড়ি ধর—' উমানাথ নগদ পয়সায় কেনা একটা বিড়ি যে গাড়িওলাকে খয়রাত কবতে চায় তা অকারণে নয়। তার উদ্দেশ্য এইরকম—লোকটার সঙ্গে একটু জমিয়ে এখানকার মানুষজন, তাদের হালচাল, জমিজমা এবং চাষ-আবাদ সম্পর্কে আগাম কিছু খবর জেনে নেওয়া। অবশ্য আরফিন সাহেব এ-দেশ সম্পর্কে তাকে অনেক কথা আগেই বলে দিয়েছে। তবু যত লোকের কাছ থেকে যত বেশি জানা যায়!

গাড়িওলা বলে, 'নায় বাবুজি, হামনিকো (আমাদের) খয়নি চলতা—' খাটো ধুতির ট্যাক থেকে শুকনো তামাকপাতা আর চুন বার করে বাঁ হাতের তালুতে ডলে ডলে খইনি বানিয়ে ফেলে সে। তারপর খইনি-সমেত হাতটা উমানাথের দিকে বাড়িয়ে বলে, 'লেও বাবুজি—'

আগে আর কখনও খইনি খায়নি উমানাথ, চোখেও দেখে নি। তবে কেউ আদর করে ভালবেসে দিতে চাইলে না বলা যায় না, বিশেষ করে জিনিসটা যখন নেশার। সন্দিগ্ধভাবে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে দুই আঙুল দিয়ে একটু খইনি তুলে নিতে নিতে উমানাথ ভাবে, তামাক এবং চুণ কতটা, ক্ষতি আর করতে পারে। সে বলে, 'জিনিসখান কেমুন?'

উমানাথের ঢাকা জেলার ভাষা আন্দাজে বুঝে নেয় গাড়িওলা। তার চোখ চকচকিয়ে ওঠে। বলে, 'বহোৎ বঢ়িয়া চিজ—'

খইনি খাওয়ার প্রক্রিয়াটা জানা নেই উমানাথের। দুই আঙুলের টিপে তামাক আর চুণে মেশানো বস্তুটি ধরে গাড়িওলার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে সে। গাড়িওলা কী করে তা দেখে খইনিটার সদ্‌গতি করবে।

গাড়িওলা নিচের ঠোঁটটা টেনে দাঁতের ফাঁকে তামাক-চুণ গুঁজে দিয়ে একটুক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকে। তারপর পচাক করে থুতু ফেলে বয়েল দু'টোর পিঠে ছপটি হাঁকায়, 'উর্‌রা, চল্ বেটে—চল্—'

দেখাদেখি উমানাথও ঠোঁটের তলায় খইনি গুঁজে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা বোঁ করে ঘুরে যায়। তবে নতুন এই নেশাটা যে মোটামুটি খারাপ না, সেটা কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পায় সে। সারা শরীরে

একটা চনমনে ভাব বেশ আমেজ নিয়ে আসে। আর তার ভেতরেই এখানকার জমিজমা এবং মানুষজন সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করে যায় উমানাথ।

গাড়িওলা জানায়, সে পূর্ণিয়া ডিস্টিকের (ডিস্ট্রিক্টের) মানুষ না; সে এসেছে অনেক দূরের গয়া ডিস্টিক থেকে। জমি বা চাষ-আবাদ সম্পর্কে তার বিশেষ কোনো ধারণা নেই। তিন পুরুষ তারা বয়েল গাড়ি চালাচ্ছে। দেহাতের দিকে বড় একটা আসে না। তাদের কাজ কারবার সব 'ভারি ভারি টৌন' (বড় বড় শহর) আর ভারি ভারি বাজার আর গঞ্জ নিয়ে। দো মাহিনা বাদ আজ উমানাথদের গাড়িতে তুলে 'কাচ্চী'তে (কাঁচা রাস্তায়) নেমেছে সে। যাই হোক, খেতির ব্যাপারটা তেমন না বুঝলেও এটা তার চোখে পড়েছে, এখানকার জমির তাকত খুব। প্রচুর ধান, গেঁহু এবং গেণ্ডারি (আখ) ফলে। শীতকালে এখানে বহোৎ 'জাড়' (ঠাণ্ডা), গরমের দিনে বহোত 'গরমি'। তবে বর্ষায় 'বারিষ'টা খুব বেশিও না, খুব কমও না—মাঝামাঝি। আর মানুষজন? এবার দার্শনিকের মতো মুখচোখ উদাস করে গাড়িওলা বলে, 'রামজি আর কিষুণজি দুনিয়ার হর জায়গায় আচ্ছা আদমিও পাঠায় আবার বুরাই আদমিও পাঠায়। ভালাই বুরাই লে কর ইস দুনিয়া বাবুজি। এখানেও ভগোয়ান রামজি কিষুণজিকা একই খেল।

কথা বলতে বলতে মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে যায় ওরা। সূর্য আকাশের মাঝমধ্যিখান থেকে পশ্চিমে হেলতে শুরু করে।

সুরথ এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। এবার সে ডাকে, 'বাবা—'

ছেলের দিকে তাকিয়ে উমানাথ বলে, 'কী ক'স (বলছিস)?'

সুরথ জিজ্ঞেস করে, 'আর কদ্দূর?' অর্থাৎ যেখানে তারা যাচ্ছে সেই ভিরৌলিতে পৌঁছুতে এখনও কতটা পথ বাকি? ভোরবেলা পূর্ণিয়া স্টেশনে নেমে এই বয়েল গাড়িটায় উঠেছে তারা। ফরবেশগঞ্জের দিকের পাক্কী (পাকা সড়ক) ধরে মাইল ছয়েক যাবার পর গাড়িটা মাঠের কাঁচা রাস্তায় নেমে পড়েছিল। তারপর চলেছে তো চলেছেই। মাঠের পর মাঠ পার হয়ে যায়, কিন্তু কোথায় ভিরৌলি? প্রথম দিকে চোখ টান করে অচেনা নতুন পৃথিবী দেখছিল সুরথ। ঘন্টার পর ঘন্টা বয়েল গাড়ির ঝাঁকানিতে এখন কোমর টন টন করছে। মনে হচ্ছে, শরীরের হাড়গুলো পুরোপুরি আলগা হয়ে যাবে। গাড়িতে বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না তার।

ভিরৌলিতে আরেফিন মিঞার বাড়িতে আগে বার দুই মোটে এসেছে উমানাথ। এদিককার রাস্তার অস্পষ্ট একটা আন্দাজ আছে তার। মনে হচ্ছে, কাছাকাছি এসে পড়েছে তারা। তবু ছেলের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবার জন্য সে গাড়িওলাকে শুধোয়, 'ভিরৌলিতে পৌঁছাইতে আর কতক্ষণ লাগব ভাই?'

গাড়িওলা বলল, 'আউর কোশভর (দু মাইলের মতো)।' দূরে আঙুল বাড়িয়ে ফের বলে, 'উ পিপর পেঁড় (পিপুল গাছ), উসকো বাদ থোড়াই—'

ছেলের দিকে ফির উমানাথ বলল, 'আইসা গ্যাছি। আর বেশিক্ষণ লাগব না।'

একটু চুপচাপ।

তারপর সুরথ আবার ডাকে, 'বাবা—'

খইনিটা উমানাথের মুখের ভেতর মিলিয়ে গিয়েছিল। বিড়ি ধরিয়ে আস্তে আস্তে সুখটান দিতে দিতে আর নাকমুখ দিয়ে নীল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে বলে, 'ক' (বল)—'

'ভিরৌলিতে ইস্কুল আছে?'

'জানি না, গিয়া খোজখবর লইতে হইব।'

'ইস্কুল না থাকলে কী হইব বাবা?'

'ব্যাবস্থা কিছু একটা হইবই। মেট্রিক কেলাস তরি পইড়া আইছস। পরীক্ষা ঠিকই দিতে পারবি। আগে গিয়া তো থিতু হইয়া বহি (বসি)—'

বিকেলের কিছু আগে আগে উমানাথরা ভিরৌলিতে পৌঁছে যায়।

দুই

পূর্ণিয়া জেলার আর দশটা ছিরিছাঁদহীন গাঁয়ের মতোই এই ভিরৌলি। আগে যে বার দুই উমানাথ

এখানে এসেছে তখন আরেফিন মিঞা গাঁ' টা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে দেখিয়ে দিয়েছে। ধোবি, গঞ্জু, তাৎমা, দুসাদ, খ্রিস্টান ধাঙড়—এমনি নানা জাতের বাস এখানে। একেকটা জাত গাঁয়ের একেক দিকে চাপ বেঁধে রয়েছে। এক জাতের লোক অন্য জাতের মহল্লায় ঘর তোলেনি। নিজেদের মধ্যে তারা খুব সম্ভব অলিখিত চুক্তি করে নিয়েছে, কেউ কারো এলাকায় ঢুকবে না।

এখানকার বাড়িগুলো বেঢপ। এক দেড় হাত পুরু মাটির দেওয়ালের মাথায় খাপরা কিংবা খড়ের ছাউনি। মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে, সেই চালের কাছাকাছি, বাখারি-বসানো ছোটো ছোটো জানালা চোখে পড়ে। সবগুলো মহল্লাতেই রয়েছে পাল পাল কুকুর আর মুরগি। ধাঙড়পাড়ায় আছে অগুনতি শুয়োর।

এক মহল্লা থেকে আরেক মহল্লা বেশ দূরে দূরে। মাঝখানে অনেকটা করে ফাঁকা জায়গা। সেখানে বনতুলসি আর বুনোঝাউয়ের ঝোপ। তবে এখানে সব চাইতে বেশি করে যা চোখে পড়ে তা হল বাদরার জঙ্গল। আরেফিন জানিয়ে দিয়েছে, এই বাদরা পুড়িয়ে তার ছাই দিয়ে ক্ষারের মতো জামাকাপড় কাচা যায়। রীতিমত সুখবর। অন্তত সোডা-সাবানের খরচাটা বেঁচে যাবে।

ভিরেলির পশ্চিম ধার ঘেঁষে সাত ঘর মুসলমান নিয়ে রয়েছে ছোটোখাটো একটা মহল্লা। সাত ঘরের মধ্যে পাঁচ ঘর দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাস্তু আর জমিজমা তিন 'কোশ' দূরের নবলপুরার রাজা খেতাবওলা কায়াথ জমিদার ত্রিলোক প্রসাদজির কাছে জলের দরে বেচে পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেছে।

এ-খবরটাও আরেফিনের কাছ থেকেই পাওয়া।

পাঁচ ঘর চলে যাবার পর বাকি আছে শুধু দু' ঘর—আরেফিন মিঞারা আর আলি রেজারা।

গাঁয়ের ভেতর ঢুকে কাঁচা ধুলোট রাস্তায় চাকার দাগ বসিয়ে বসিয়ে উমানাথদের বয়েল গাড়ি পশ্চিম দিকে যেতে থাকে।

ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ শুনে মহল্লাগুলো থেকে খুনখুনে বুড়োবুড়ি, বাচ্চা-কাচ্চা, জোয়ান-জোয়ানী—নানা বয়সের লোকজন দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় তারা বলাবলি করে, 'আ গিয়া হো। নয়া আদমিলোগন আ গিয়া—' অর্থাৎ উমানাথরা যে আসবে গাঁয়ের লোক আগেই তা জেনে গেছে। তাদের চোখে দুনিয়ার সুদূর অজানা প্রান্ত থেকে আসা এই নতুন মানুষগুলি সম্পর্কে অসীম কৌতূহল।

উমানাথের উদ্দেশে কেউ কেউ হাতজোড় করে বলে, 'রাম রাম বাবুজি—'

উমানাথও বলে, 'রাম রাম—'

গ্রামে ঢুকবার পর আগ্রহে ছইয়ের বাইরে চলে এসেছিল সরযূ। উমানাথ স্ত্রীকে বলে, 'এই গেরামে অহন থিকা আমরা থাকুম। দেখ—'

বুকের গভীর থেকে শ্বাস ফেলে সরযূ বলে, 'এ কোন দ্যাশে লইয়া আইলা!' তার গলার স্বর কেমন যেন বিষণ্ণ শোনায়। একটু আগে স্বামীর অফুরন্ত আশাবাদ তাকে সতেজ করে তুলেছিল। কিন্তু পূর্ণিয়া জেলার সুদূর প্রান্তে এই ভিরৌলি গ্রাম এবং তার মানুষজন দেখে সরযূর বুক সাত হাত দমে যায়। কী করে যে বাকি জীবন এখানে কাটাবে, তা ভাবতে গিয়ে বিষাদে মন ছেয়ে যেতে থাকে।

উমানাথ বলে, 'এই দ্যাশেও মানুষ থাকে ধনবৌ। এইহানেও আকাশ আছে, জল আছে, বাতাস আছে, ফসলের জমিন আছে।'

'কিন্তুক—'

'মানুষের কাছেই তো আইছি। জন্তু জাওনারের কাছে না। দেখবা হগল (সব) ঠিক হইয়া যাইব।'

সরযূ বলে', 'বাংলা দ্যাশ থনে বড় দূরে—'

উমানাথ বলে, 'কী করুম কও। যার ভাত যেহানে মাপা রইছে, যার চিতা যেইহানকার শ্মশানে সাজাইনা আছে তারে হেইহানে যাইতেই হইব। নিয়তিই আমাগো টাইনা নিয়া আইছে। নাইলে (না হলে) চরচিকন্দিতে তো জমিজমা বেবাকই পাইছিলাম। কপালে নাই, দ্যাশ দুই ভাগ হইয়া গ্যালো।' একটু থেমে আবার বলে, 'পিছনের ভাবনা ভাইবা লাভ নাই। যেইহানে আইছি সেইহানকার কথা অহন থেইকা ভাবো।'

নানা মহল্লার পাশ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত উমানাথদের বয়েল গাড়িটা ভিরৌলি গাঁয়ের পশ্চিম প্রান্তে মুসলমান পাড়ার আরেফিন মিঞার বাড়ি চলে এল।

গাঁয়ের আর সব বাড়ির সঙ্গে আরেফিন মিঞার বাড়ির তফাত কিছু নেই। উঁচু ভিতের খানতিনেক মাটির ঘর, প্রকাণ্ড উঠোন, উঠোনের একধারে বাতাবি লেবুর গাছ, গাছটার গা ঘেঁষে ইঁদারা।

একটা ঘরের দাওয়ায় আরেফিন মিঞা এবং তার বউ ছেলেমেয়ে বিষণ্ণ মুখে বসে ছিল। আরেফিনদের পরিবারে পর্দার কড়াকড়ি নেই। তার বিবির পরনে ময়লা হেটো শাড়ি ; মাথায় শাড়ির একটা দিক আধ ঘোমটার মতো টেনে দেওয়া। ছেলেদের পরনে ময়লা ইজের আর লাল-নীল জামা, তার ওপর মোটা চাদর। মেয়েদের পরনে খেলো কাপড়ের সালোয়ার-কামিজ এবং চাদর। আরেফিনের পোশাক-আশাকও খুব সস্তা আর খেলো। ময়লা পাজামা, কটকটে লাল ফুলশার্ট আর ধুসো কম্বল।

আরেফিন মিঞা চুপচাপ বসে ছিল। তবে তার বিবি এবং ছেলেমেয়েরা চাপা বিলাপের মতো শব্দ করে একটানা কেঁদে যাচ্ছে।

পাশের বাড়ির আধবুড়ো আলি রেজা আর তার বউ ছেলেমেয়ে এসে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখচোখও করুণ, বিষাদ-মাখানো।

উঠোনের কোণের দিকে এই মুহূর্তে একটা বয়েল গাড়ি কাত হয়ে আছে। সেটার ছইটুকু বাদ দিয়ে বাকি জায়গা বাক্সপ্যাটরা এবং নানারকম লটবহরে বোঝাই। গাড়ির সঙ্গে এখন বয়েল দু'টো জোতা নেই। জন্তুদু'টো বাতাবি লেবুগাছটার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে খড় চিবিয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছাকাছি উঠোনের মাটিতে উবু হয়ে বসে আছে গাড়িওলাটা।

আরেফিন মিঞারা তৈরি হয়েই রয়েছে। উমানাথরা এলেই বয়েল দু'টো গাড়িতে জোতা হবে। তারপর ওরা ভিরৌলির ভিটেমাটি ঘরবসত ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যাবে।

উমানাথদের বয়েল গাড়িটা উঠোনে ঢুকতেই আরেফিনের বিবি এবং ছেলেমেয়েদের সেই চাপা অনুচ্চ কান্নাটা হঠাৎ তুমুল হয়ে উঠল। এই কান্না আরেফিন মিঞার বুকের ভেতরটা মুচড়ে তোলপাড় করে দিচ্ছিল। হৃৎপিণ্ডের কয়েক পরত তলা থেকে অসীম দুঃখ হু হু করে উঠে আসতে চাইছিল। কিন্তু অনেক কষ্টে সেটাকে চাপা দিয়ে রুদ্ধ গলায় বউ-বাচ্চাদের সে বলতে লাগল, 'রো মাত্ (কোঁদিস না), রো মাত্। সবহি খুদাকা মর্জি—' বলেই বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে উমানাথদের দিকে এগিয়ে এল। বলল, 'আইয়ে ভাইসাব, আইয়ে। আপলোগনকো লিয়ে ইন্তেজার করতা থা। আপকো কোঠি দেখ বুঝকে লিজিয়ে—'

এদিকে গাড়িওলা লাফ দিয়ে নেমে বয়েল দু'টোর বাঁধন খুলে দিল। তারপর গাড়ির একটা দিক টেনে মাটিতে নামিয়ে উমানাথদের বলল, 'উতারো (নামো) বাবুজি—' বলে গাড়ির তলায় বাঁধা একটা চটের থলে থেকে খোলমেশানো শুখো ঘাস বার করে বয়েল দু'টোকে খেতে দিল। জন্তুদু'টো জিভ বার করে খানিকক্ষণ হাঁপিয়ে খাওয়া শুরু করল।

ওধারে বয়েল গাড়ির যে দিকটা মাটিতে ঠেকানো সেদিক দিয়ে উমানাথরা নিচে নেমে এসেছে। প্রথমে উমানাথ আর সুরথ, তাদের পিছু পিছু সরযূ, গৌর এবং জবা।

আরেফিন মিঞা আগেই গাড়িটার কাছে চলে এসেছিল। সে আলি রেজাকে হাত নেড়ে ডেকে আনল। তারপর সবাই মিলে ধরাধরি করে মালপত্র নামিয়ে একটা ঘরের বারান্দায় নিয়ে রাখতে লাগল। ওদের সঙ্গে গাড়িওলাও হাত লাগিয়েছে।

মালপত্র নামানো হলে সরযূ গৌর আর জবা গিয়ে লটবহরের পাশে বসল। গাড়িওলা ইঁদারার বাঁধানো উঁচু পাড়ের ওপর বসে চুন-তামাক বার করে ডলে ডলে খইনি বানাতে লাগল।

উঠোনের মাঝখানে উমানাথ আরেফিন সুরথ আর আলি রেজা এখনও দাঁড়িয়ে। আরেফিন মিঞা বলল, 'ভাইসাব, আপকো কোঠি-উঠি সাফসুতার করকে রাখা।'

ঘর আর উঠোন যে নিকিয়ে এবং ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে সেটা তাকালেই টের পাওয়া যায়।

উমানাথ বলল, 'হেয়া (সে) তো দেখতেই আছি।'

'থোড়া ইধর আইয়ে ভাইসাব—'

উমানাথকে একটা ঘরেব ভেতর ডেকে নিয়ে গিয়ে আরেফিন একটা মেটে হাঁড়ি বার করে এনে

বলল, 'ইসমে থেড়েসে চাউর (চাল), দাল আউর আলু হ্যায়; আপলোগনকে লিয়ে।' জামাব পকেট থেকে গোটা পাঁচেক টাকা বার করে উমানাথকে দিতে দিতে বলল, 'লিজিয়ে—'

একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিল উমানাথ। বলল, 'চাউল, ট্যাকা!'

তার কথা শেষ হবার আগেই আরেফিন মিঞা যা বলল তা এইরকম। উমানাথ এখানে ছেলেপুলে নিয়ে নতুন আসছে। নিশ্চয়ই সঙ্গে করে চাল-ডাল-আটা নিমক নিয়ে আসেনি। কিন্তু নিজেদের এবং কাচ্চাবাচ্চাদের মুখে তো কিছু দিতে হবে। ভুখা তো আর থাকা যাবে না। এসেই অচেনা জায়গায় ঘরদুয়ার গুছিয়ে বসবে, না চালডালের খোঁজে ছোটাছুটি করবে? দেশের ভিটেমাটি ছেড়ে আসছে উমানাথ। তার হাতে রুপেয়া-পয়সা সোনাচাঁদি কত কী আছে, নিজেকে দিয়েই টের পায় আরেফিন। তাই ভাইসাব ভিরৌলিতে পা দিয়েই যাতে তখলিফে না পড়ে সেই জন্য খানিকটা চাল ডাল আর ক'টা টাকা নিজের দিল থেকে পেয়ারসে দিয়ে যাচ্ছে। ভাইসাব যেন মেহেরবানি করে নেয়। না নিলে তার খুব কষ্ট হবে। ইত্যাদি—

শুনতে শুনতে কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এসে যায় উমানাথের। এই আকাশের নিচে মানুষ যে কত ভালো হতে পারে, নতুন করে তার প্রমাণ পেতে পেতে বুক ভরে যেতে থাকে তাব। আরেফিনের দু' হাত ধরে ধরা গলায় উমানাথ বলে, 'মেঞাভাই, আপনের কথা কুনোদিন ভুলুম না। চাউল ডাইল নিচ্চয় নিমু কিন্তুক ট্যাকা লাগব না। আমার কাছে ট্যাকা পয়সা কিছু আছে।'

একটু পর ঘব থেকে বেরিয়ে এসে উমানাথকে দেখিয়ে আরেফিন আলি রেজাকে বলে, 'আলিভাই, এই ভাইসাব রইল। নয়া জায়গা, থোড়েসে দেখভাল জরুর করনা—'

আলি রেজার সঙ্গে মাস দুই আগে যখন ভিরৌলিতে আরেফিনের বাড়িঘর আর জমিজমা দেখতে এসেছিল উমানাথ, তখনই আলাপ পরিচয় হয়েছে। আরেফিনই আলাপটা করিয়ে দিয়েছিল। আলি রেজা এখনও হিন্দুস্থান ছেড়ে যাবার কথা ভাবেনি, বা যাবার মতো কোনোরকম ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। সে ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'হাঁ হাঁ, জরুর। হামনিলোগ একসাথ রহেঙ্গে। দেখনা তো জরুর পড়ে—'

আরেফিন আবার উমানাথের দিকে ফিরল, 'আভি হামনিকো যানে হোগা ভাইসাব। দের করনেসে আন্ধেরা উতার যায়েগী—'

বেলাবেলি বেরিয়ে পড়তে না পারলে অন্ধকার নেমে যাবে। মাঘের শেযাশেযি যখন উত্তুরে হাওয়া বইছে তখন সন্ধেবেলায় হিমের ভেতর পূর্ণিয়া জেলার ফাঁকা শস্যক্ষেত্র পাড়ি দিয়ে যেতে খুবই কষ্ট হবে আরেফিনদের ; বিশেষ করে ছোটো ছেলেমেয়েগুলোর। উমানাথ কী বলবে, ভেবে পেল না।

আরেফিন তার গাড়িওলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'গাড়ি লাগাও ভাই—' তাবপব বিবি এবং ছেলেমেয়েদের গাড়িতে উঠতে বলল।

বিবিদের কান্না কিছুক্ষণের জন্য ঝিমিয়ে পড়েছিল ; আবার সেটা দশগুণ বেড়ে গিয়ে চারিদিকে একটা শোকের আবহাওয়া ঘনিয়ে তুলতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতেই তারা গাড়িতে উঠে ছইয়ের নিচে গিয়ে জড়াজড়ি করে বসল। আর গাড়িওলাটা বাতাবি লেবুগাছের তলা থেকে উঠে এসে বয়েল দু'টোকে গাড়ির সঙ্গে জুতে ফেলল।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে আরেফিন উমানাথকে বলে, 'ভাইসাব গরমিকা টেইমনে (টাইমে) হোঁশিয়ার রহ্না। উধার ওহি জঙ্গলমে ভাল্লু আউর শের নিকালকে ইধরি গাঁওমে আতে হ্যায়।'

উমানাথ বলেন, 'হ হ, পোলামাইয়া লইয়া ঘর করি, নিচ্চয় সাবধানে থাকুম।'

উমানাথের দু'হাত ধরে আরেফিন এবার বলে, 'হামনিলোগ আভি চলে ভাইসাব। দিলমে শান্তি আউর খুশ লেকর এহি কোঠি পর রহ্ যাইয়ে। খুদাকা মেহেরবানিসে আচ্ছাই হোগা—'

উমানাথও বলল, 'আপনেও চরচিকন্দিতে গিয়া পোলামাইয়ানিয়া শান্তিতে থাকেন। ভগমানের দয়ায় আপনেরও মঙ্গল হইব।'

'ভাইসাব আউর এক বাত—'

'ক'ন (বলুন)—'

ঘরবাড়ি উঠোন ইঁদারা ইত্যাদি দেখাতে দেখাতে আরোফিন বলল, 'ইয়ে কোঠি হামনিকো দাদাকো আব্বাজাননে বানায়া। ইঁহা মেরে দাদা, মেরে আব্বাজান, হামনি, হামনিকো বেটে বেটি পয়দা হুয়া। লগভগ শও (এক শো) সাল হামনিকো ইঁহা গুজর গিয়া। দিল চাহে তো কভী কভী হাম চলা আয়েগা। নারাজ নায় হোগা তো ভাইসাব?' বলতে বলতে গলার স্বর বুজে আসতে থাকে তার।

বলে কী আরেফিন! ধরেশ্বরীর উঠন্ত চরে মাত্র কয়েকটা বছর কাটিয়ে খান দুই ঘর আর চোদ্দ কানি চাষের জমির ব্যবস্থা করতে পেরেছিল উমানাথ। তাই ছেড়ে আসতে তাদের বুকের পাঁজর ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আর এখানে এক শো বছর কাটিয়ে দিয়েছে আরেফিন মিঞারা। তার দাদার বাপ গত শতাব্দীতে এই ভিরৌলি গাঁয়ে এসে বাড়িঘর তুলেছিল। তারপর দেখতে দেখতে চার পাঁচ পুরুষ পেরিয়ে গেছে। এখানকার মাটির তলায় কত কাল ধরে তাদের শিকড় বাকড় ছড়িয়ে আছে। মাঝে মধ্যে আরেফিন এখানে এলে সে রাগ করবে! দু'হাতে আরেফিনকে উমানাথ বুকের ভিতর টেনে এনে গভীর আবেগের গলায় বলে, 'কী যে ক'ন মেঞাভাই, আপনের যেইদিন ইচ্ছা যহন ইচ্ছা আইয়া পড়বেন। এই বাড়িঘর ভিটামাটি বেবাকই আপনের।'

রুদ্ধ গলায় আরেফিন বলে, 'দিল হোনেসে আপ ভি চরচিকন্দি চলা যাইয়েগা। ও ভি আপহীকো কোঠি, আপহীকো জমিন।'

'ঈশ্বর যদি টানে মরার আগে যামু একবার। যামু দ্যাশ দেখতে।'

বয়েল জোতার পর গাড়িওলা ওপরে উঠে তৈরি হয়ে বসে আছে। সে তাড়া লাগাল, 'সাব হো, দের নায় করনা। বহোত দূর যানা পড়ে—'

ঘাড় ফিরিয়ে আরেফিন মিঞা বলে, 'হাঁ হাঁ, যাতা হ্যায় ভাই, আভি যায়গা।'

উমানাথরা যে গাড়িওলার গাড়িতে এসেছিল, ইঁদারার পাড় থেকে উঠে এসে সেও তার গাড়িতে বয়েল জুতে ফেলেছে। উমানাথের কাছ থেকে ভাড়া বুঝে নিয়ে সে তার গাড়িতে গিয়ে উঠল। ইচ্ছা, আরেফিন মিঞাদের সঙ্গে সে-ও পূর্ণিয়া ফিরে যাবে।

উমানাথ যখন ভাড়াটাড়া মিটিয়ে দিচ্ছে সেই সময় আরেফিন বাড়িঘর গাছপালা ইঁদারা, সব কিছু শেষ বারের মতো দেখে নিচ্ছিল। দেখতে দেখতে তার দু'চোখ জলে ভরে যেতে লাগল।

হঠাৎ উমানাথের চোখ গিয়ে পড়ল আরেফিনের ওপর ; সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতব উথাল পাতাল ঢেউ উঠল যেন। চরচিকন্দি থেকে চলে আসার সময় শেষ বারের মতো এমন করেই নিজের তৈরি বাড়িঘর দেখতে দেখতে তার চোখ বেয়ে স্রোত নেমেছিল।

কোথায় সুদূর বিহারের পূর্ণিয়া জেলায়, এই অজানা ভিরৌলি গ্রামের এক কোণে পুরুষানুক্রমে পড়ে ছিল আরেফিন মিঞা আর কোথায় পূর্ব বাংলার ধলেশ্বরী নদীর নতুন জাগা চরে, মালো আর বারুইদের গ্রাম চরচিকন্দিতে ছিল উমানাথ! চার মাস আগেও তারা কেউ কাউকে চিনত না, উমানাথ পূর্ব বাংলার ভটাচায্যি ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, নানা ধরনের উঞ্ছবৃত্তিতে জীবনের দীর্ঘ সময় কাটাবার পর চিরচিকন্দিতে শেষের ক'টা বছর যে থিতু হয়ে বসেছে তার সঙ্গে উত্তর প্রদেশ থেকে আসা বিহারের একশো বছরের বাসিন্দা মুসলমান গৃহস্থ আরেফিন মিঞার কোনো কিছুই মেলে না। না রুচি, না পোশাক আশাক, না জীবনযাত্রার ধরন। কেউ কারো ভাষা ষোল আনা বোঝে না ; ভাষার বাইরে আভাসে ইঙ্গিতে অনেকটাই আন্দাজ করে নিতে হয়। চন্দ্র সূর্য আর অসংখ্য নক্ষত্রমালায় সাজানো এই বিপুল পৃথিবীতে নিজের নিজের সুখদুঃখ, ছোটো মাপের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর সাধ-আহ্লাদ নিয়ে যে যার মতো ঘুরছিল। কোনোদিন একজনের সঙ্গে আরেক জনের দেখা হবার সম্ভাবনাই ছিল না। আশ্চর্য, সব দিক থেকে আলাদা হয়েও ভিটেমাটি ঘরদুয়ার চিরকালের জন্য ছেড়ে যাবার সময় দু'জনেরই বুক ভেঙে যায়, একই রকম কষ্টে আর বেদনায় চোখ সজল এবং কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কয়েকশো মাইল দূরবর্তী দু'টি মানুষের মধ্যে যে একই দুঃখ একই রকম ঝঙ্কার তোলে, আগে তা কে জানত!

বাড়িঘর দেখা হলে ঝাপসা গলায় আরেফিন মিঞা উমানাথকে বলল, 'আদাব ভাইসাব, 'আদাব। হামনিলোগ চলে—' বলে প্রায় টলতে টলতে বয়েল গাড়িটার গিয়ে উঠল।

উমানাথদের দেখবার জন্য ভিরৌলি গাঁয়ের নানা বয়সের লোকজন এসে কখন যে উঠোনের চার পাশ ঘিরে দাঁড়িয়েছে, কেউ খেয়াল করেনি। ওদের মধ্যে কাচ্চাবাচ্চাই বেশি।

এধারে আরেফিন মিঞা গাড়িতে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িওলা বয়েলের ল্যাজে মোচড় দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'উর্‌রা—ফুর্তিসে চল্ বেটে—'

গাড়ি চলতে শুরু করল। তার পিছু পিছু উমানাথরা যেটায় করে এসেছিল সেই ফাঁকা গাড়িটাও চলতে লাগল। আর আরেফিনদের বয়েল গাড়িতে তার বিবি এবং ছেলেমেয়েদের কান্না তুমুল হয়ে উঠল।

ভিরৌলি গ্রামের যে-সব লোকজন উঠোনেব চারপাশে ঘের দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তারা বয়েল গাড়ি দু'টির পেছন্ পেছন চলতে লাগল। ওরা এ-গাঁয়ের নতুন মানুষ উমানাথদেরই শুধু দেখতে আসেনি, ভিরৌলির পুরোনো যে-বাসিন্দারা গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে তাদের শেষ বিদায়ের দৃশ্যও দেখতে এসেছে।

সামনের যে-রাস্তাটা সোজাসুজি খানিকটা যাবার পর একটা বন-ঝাউয়ের জঙ্গল ঘুরে বাঁ দিকে গেছে বয়েল গাড়ি দু'টো এক সময় সেখানে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপরও অনেকক্ষণ উত্তুরে হাওয়ায় আরেফিন মিঞার বিবি আর তার বাচ্চাদের কান্নার শব্দ ভেসে আসতে লাগল। বাতাসে শোকের চিহ্ন এঁকে এঁকে ওরা চলে যাচ্ছে।

তিন

সূর্যটা কিছুক্ষণ আগেও ছিল খাড়া মাথার ওপরে। এখন সেটা পশ্চিম আকাশের ঢালের দিকে অনেকখানি নেমে গেছে। শীতশেষের বেলা হেলে যাচ্ছে ক্রমশ। উঠোনের এক কোণে বাতাবি লেবু গাছটার ছায়া দ্রুত দীর্ঘ হচ্ছে।

খানিক আগে পূর্ণিয়া জেলার শস্যক্ষেত্র পাড়ি দিয়ে আসার সময় রোদটা ছিল মোটামুটি উষ্ণ এবং আরামদায়ক। এখন তাতে হিমেল ভাব মিশতে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা রোদে বেশ শীত শীত লাগে।

দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায় এখনও বসে রয়েছে সরযূ গৌর আর জবা। অচেনা নতুন জায়গায় এসে তারা কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছে।

বাড়িটা এখন একেবারে ফাঁকা। উমানাথরা ক'জন ছাড়া গাঁয়ের লোকজন যারা তাদের দেখতে এসেছিল সবাই আরেফিন মিঞাদের বয়েল গাড়ির পিছু পিছু চলে গেছে। এমনকি পাশের বাড়ির আলি রেজারাও।

উমানাথ দক্ষিণের ঘরের দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'ধনবৌ, এই তুমার নয়া ঘরবাড়ি। কেমন দেখতে আছ?'

পূর্ব বাংলা থেকে বহুদূরে এই নতুন জায়গাটাকে মন প্রাণ দিয়ে ঠিক মেনে নিতে পারছে না সরযূ। সে কিছুটা উদাসীন মুখে বলল, 'আমাগো চরচিকন্দির লাখান (মতো) না।' ক্ষীরের মতো নরম পলি দিয়ে গড়া ধলেশ্বরীর এক চর তার সমস্ত স্মৃতিকে এখনও আপ্লুত করে রেখেছে!

স্ত্রীর মনের কথা বুঝতে পারছিল উমানাথ। সে বলল, 'এক দ্যাশ কি আরেক দ্যাশের লাখান হয় ধনবৌ? একেক দ্যাশ একেক কিসিমের। পরথম পরথম (প্রথম প্রথম) চিরচিকন্দিও তুমার ভালো লাগত না। পরে মন বসলে চরচিকন্দিরে ছাড়া তহন কিছুই বুঝতা না। দ্যাখবা, থাকতে থাকতে এই দ্যাশও ভালো লাইগা গ্যাছে। তহন ভিরৌলির ভিটামাটি বাদ দিয়া অন্য কিছু ভাবতে পারবা না।'

সরযূ উত্তর দেয় না। তার বুকের কয়েক পরত নিচ থেকে দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে।

একটু চুপ করে থেকে উমানাথ ফের বলে, 'বেইল (বেলা) হেইলা গ্যাছে। ওঠ, মালপত্তর ঘরে তুলি। পোলাপানগুলন (ছেলেমেয়েগুলো) কুন ভোরে পুইণ্যা (পূর্ণিয়া) ইস্টিশনে চাউরগা মুড়ি খাইছিল! খিদায় অগো (ওগো) মুখ শুকাইয়া গ্যাছে।'

সরযূ, 'শুকাইয়া তো যাইবই। পথ কি কমখানি ? গরুর গাড়িতে উঠনের পর বেইলের মনে বেইল (বেলার মনে বেলা) যায় ; পথ আর ফুরায় না।'

'হ, জবর দূর। হাতে হাতে জিনিসপত্তর গোছগাছ কইরা ভাত বসাইয়া দাও। আরেফিন মিঞা চাউল ডাইল দিয়া গ্যাছে।'

'ঘর ধোয়ামোছা না হইলে জিনিসপত্তর ঘরে উঠামু না।'

সরযূর এই এক বাতিক। কতবার উমানাথরা সংসার তুলে নিয়ে এক গাঁ থেকে আরেক গাঁয়ে, এক চর থেকে আরেক চরে গিয়ে বসেছে কিন্তু নতুন জায়গায় গিয়েই হুট করে অন্যের বাড়িতে ঢোকেনি সরযূ। যতই ধোয়ামোছা বা সাফসুফ থাক, নিজের হাতে লেপেপুঁছে না নিলে তার গা ঘিন ঘিন করে। অন্যের পরিত্যক্ত ঘরদুয়ার নিজের মতো করে পরিষ্কার না করা পর্যন্ত তার মন ওঠে না। উমানাথ বলল, 'বারো চৌদ্দ মাইল গরুর গাড়ির ঝাকানি খাইতে খাইতে আইছ : শরীলে তো কিছু নাই। আইজের রাইতখান জিরাইয়া লও। কাইল যা মনে লয় কইরো।'

'না, আইজই ধুইয়া পাখলাইয়া নিমু।'

'আমি আর কী কমু! কর তাইলে—'

আসার সময় কলকাতার শিয়ালদা বাজার থেকে প্ল্যাস্টিকের বালতি, হাঁড়ি-কড়া, তেলের কুপি, হেরিকেন, কলাই-করা থালা গেলাস—এমনি টুকিটাকি সংসারের নানা দরকারি জিনিস কিনে এনেছে উমানাথরা। গাঁটরি-বোঁচকা, পোঁটলা-পুঁটলি খুলে বালতি টালতি বার করা হল।

সরযূর একটা পুরোনো শাড়ির পাড় ছিঁড়ে বালতির হ্যাণ্ডেলে বেঁধে ইদারা থেকে জল তুলে দিতে লাগল উমানাথ। আর সরযূ সুপটু হাতে কাপড়ের ন্যাতা বানিয়ে তিনখানা ঘর নিকিয়ে ফেলতে লাগল। গৌর জবা আর সুরথ হাতে হাতে মা-বাপকে সাহায্য করতে লাগল।

ঘরদুয়ার কাজ চালানোর মতো ধুয়ে মুছে স্নান করে নিল সরযূ। ছেলেমেয়ে তিনটে এবং উমানাথ—ওদেরও সকাল থেকে মাথায় পড়েছে না এক ছিটে তেল, না এক ফোঁটা জল। ওরাও স্নান টান সেরে নেয়। তারপর সবাই মিলে বাক্স বিছানা এবং হাজার গণ্ডা পোঁটলাপুঁটলি ঘরে নিয়ে রাখতে লাগল।

জিনিস তারা কম আনেনি। অনেক কালের পুরোনো লেপ তোষক, ছেঁড়া কাঁথাবালিশ, জামাকাপড়, বাতিল পিচবোর্ডের বাক্স, মুড়ি ভাজার বালি, অর্ধেক ক্ষয়ে যাওয়া ঝাঁটা-ফাঁটা মেটে হাঁড়ি তোবড়ানো সিলভারের বাটি, ডাঁটার বীজ, কুলের বীজ, লাউ-কুমড়ো ও পেঁপের বিচি—অস্থাবর যা কিছু ছিল, যা কিছু সঙ্গে করে আনা যায়, সব নিয়ে এসেছে সরযূ। সংসারে কম জিনিসের তো দরকার হয় না। চরচিকন্দি ছেড়ে আসার সময় সে ভেবেছিল, স্বামীর সঙ্গে দূর দেশে গিয়ে কাজের জিনিসপত্র কতটা কী পাবে তার তো ঠিকঠিকানা নেই। নতুন দেশটা কেমন, সে সম্বন্ধে তার পরিষ্কার ধারণা ছিল না। উমানাথ অবশ্য আগেভাগেই দশমুখে এ দেশের গুণ গেয়েছে। স্বামীর ওপর সরযূর খুবই বিশ্বাস ; তবু দূর দেশের অনিশ্চিত জীবন সম্পর্কে নিজের মনে তার খানিকটা আশঙ্কা, খানিকটা ধুকপুকুনি ছিলই। এখানে এসে হাতের কাছে যদি প্রয়োজনীয় জিনিস না পাওয়া যায় তখন প্রতি মুহূর্তে তারই তো অসুবিধে। তাই হাতের কাছে যা পেয়েছিল সব নিয়ে এসেছে সরযূ।

মালপত্র আপাতত ঘরে তুলে রাখা হল। পরে ধীরেসুস্থে সব গোছানো হবে। এখানে তো আর দু'দিনের জন্য আসা হয়নি ; বাকি জীবন থাকতে হবে। গোছগাছের অত তাড়া কিসের?

সব তোলা হলে সরযূ সিলভারের হাঁড়িতে আরেফিন মিঞার সেই চাল থেকে আন্দাজে খানিকটা মেপে দিয়ে জবাকে বলে, 'যা তো মা, কুয়ার পাড় থন (থেকে) ধুইয়া লইয়া আয়।'

জবা চালসুদ্ধ হাঁড়ি নিয়ে চলে যায়। আর তখনই সরযূর একটা কথা মনে পড়ে যায়। সে স্বামীকে বলে, 'ভাত তো বসামু, আখা (উনুন) কই, লাকড়ি কই?'

তাই তো, উনুন এবং কাঠ ছাড়া রান্না হবে কী করে? এত বিবেচনা আরেফিন মিঞার, চাল-ডাল-নুন-আলু, সবই রেখে গেছে, খুব সম্ভব তাড়াহুড়োয় কাঠটাঠের কথা তার মনে ছিল না।

সরযূ আবার বলল, 'এট্টু সউরষার (সর্ষের) ত্যাল আর ক্রাচিন (কেরোসিন) ত্যালও লাগব।'

উমানাথ বুঝতে পারছে, সর্ষের তেল ছাড়া ডালে সম্বরা দেওয়া যাবে না, আলু সিদ্ধ করলে মাখতে লাগবে। তবু না হয় এক বেলা বিনা তেলেই খেল। কিন্তু কেরোসিন ছাড়া তো চলবে না। ছেলেপুলে নিয়ে নতুন জায়গায় প্রথম রাত কাটাবে। বাতি-টাতি না থাকলে কি চলে? কিন্তু এখানে কোথায় দোকানপাট, হাটবাজার—কিছুই জানে না উমানাথ। আগে যে বার দুয়েক সে ভিরৌলিতে এসেছে, তখন শুধু বাড়িঘর জমিজমা নিয়েই আরেফিন মিঞার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। বাজার টাজারের কথা মনে আসেনি।

উমানাথ কী বলতে যাচ্ছিল, তার অগেই গাঁয়ের সেই লোকজনদেব দেখা গেল। খুব সম্ভব আরেফিন মিঞাদের ভিরৌলির সীমানা পার করে দিয়ে এই গাঁয়ের নতুন বাসিন্দাদের আবার দেখতে এসেছে। আলি রেজা এবং তার বাড়ির লোকজনরা অবশ্য এই ভিড়ের মধ্যে নেই।

ভিরৌলির কৌতূহলী জনতা আগের মতোই ঢালাও উঠোনের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ; ভেতরে ঢুকছে না। উমানাথ ভাবল, ওদের কাছে জিজ্ঞেস করে এখানকার বাজারহাটের হদিশ নেবে। সে বলল, 'বাইরে খাড়ইয়া (দাঁড়িয়ে) আছ ক্যান ভাইরা, ভিতরে আসো—'

বলা সত্ত্বেও কেউ উঠোনের ভেতর আসে না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু একটা আধবুড়ো লোক সামান্য এগিয়ে এসে খুবই বিনীতভাবে বলে, 'নায় নায়, হামনিলোগনকা (আমাদের) অন্দর নায় যানা—'

উমানাথ অবাক হয়, 'ক্যান, ভিতরে আসবা না ক্যান?'

'হামনিলোগ অচ্ছুৎ। আউর শুনা আপলোগ বরাম্ভন (ব্রাহ্মণ)।'

'হেয়াতে (তাতে) কী?'

'বরাম্ভনসে হামনিলোগনকা দূর রহনা পড়ে।'

উমানাথ যে দেশ থেকে এখানে এল সেই পূর্ব বাংলায় জলচল, জল-অচল এবং ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার প্রবল। তাই বলে জল-অচলদের কেউ এলে সেখানে ঘরের ভেতর ঢোকানো হয় না ঠিকই, তবে উঠোনে বা বারান্দায় বসলে বামন-কায়েতদের জাত যায় না বা মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। উমানাথ কতবার এইরকম জল-অচলদের নিজের ঘরের দাওয়ায় বসিয়ে গল্প করেছে। কিন্তু এখানে অচ্ছুৎরা নিজেবাই দূরে সরে থাকছে।

উমানাথ বলল, 'আ রে ভাইরা, ঘরে না ওঠো, উঠানের মইদ্যে তো আইয়া বইতে পার। আসো আসো—'

লোকটার ভয় এবং সংস্কার তবু ঘোচে না। সেই সঙ্গে মিশে যায় অপার বিস্ময়। এই গাঁয়ে ব্রাহ্মণ নেই। শুধু ভিরৌলি কেন, রাজা খেতাবধারী ত্রিলোকীপ্রসাদের গাঁ নবলপুরা বাদ দিলে, দশ বিশ ক্রোশের মধ্যে যত দেহাত, তার কোনটাতেই ব্রাহ্মণ পাওয়া যাবে না।

নবলপুরা ছাড়া চারিদিকের সব গাঁয়েই অচ্ছুৎদের বাসই বেশি। যেখানে অচ্ছুৎ গিজ গিজ করছে সেখানে দেওতার অংশ বরাম্ভনেরা থাকে কী করে? আধবুড়ো লোকটা ভালো করেই জানে, ওইসব বামুনের বাড়ির আধ মাইলের মধ্যে ঘেঁষার উপায় নেই তার মতো অচ্ছুৎদের। সে ভয়ে ভয়ে বলে, 'মগর দেওতা—'

উমানাথ বলে, 'আরে আসো তো।'

লোকটা এবং তার পিছু পিছু অন্য সবাই উঠোনের ধার থেকে খানিকটা ভেতরে ঢুকে জড়সড় হয়ে বসে।

উমানাথ জিজ্ঞেস করে, 'তুমার নামখান কী বাপু?'

'রামনগিন'

'কী জাত তুমরা।'

'দুসাদ দেওতা—'

উমানাথ এবার কাজের কথায় আসে। বলে, 'ভাই, এইহানকার বাজারহাট কুনহানে?'

রামনগিন জানালো, ভিরৌলিতে বাজারহাট বলতে তেমন কিছু নেই। গাঁয়ের পূব মাথায় মারবাড়ির গিরধরলালের মুদি দোকান আছে। সেখানে চাল ডাল তেল নিমক শুখা মিরচা থেকে শুরু করে উনকুটি যাবতীয় জিনিস মেলে। গিরধরলালের দোকানের গা ঘেঁষে নেওকীরামের চায়ের দোকান। নেওকীরাম জাতে হাজম এবং খ্রিস্টান। আগেভাগেই সে খবর জানিয়ে দিচ্ছে রামনগিন। দেওতা বরাম্ভন নতুন এ-গাঁয়ে এসেছেন, ভুল করে নেওকীরামের হাতের ছোঁয়া চা খেয়ে যেন জাত নষ্ট না করেন।

এ তো গেল এখানকার দোকানপাটের কথা। তবে শানিচারিতে হাট বসে নবলপুরাতে। সেখানে যা চাই তাই পাওয়া যায়। বহোত ভারি (বড়) হাট নবলপুরার।

উমানাথ বলল, 'রামনগিন, আমার একটা উপকার করতে হইব ভাই।'

রামনগিন অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। বামুন কায়েত ইত্যাদি উঁচু জাতের লোকেরা তাদের ছায়া দেখলে সাত হাত লাফিয়ে ওঠে, ঘেন্নায় থুতু ফেলে, কিন্তু দূর দেশ থেকে আসা এই বঙ্গালী বরাম্ভন সেই তুলনায় অনেক ভালো, অনেক উদার। বাড়ির উঠোনে ডেকে নিয়ে তো সে বসিয়েছেই, তার ওপর তার কাছে উপকারও চাইছে। 'ভাই' ছাড়া এই দেওতা বরাম্ভন কথা বলে না। উমানাথের সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেছে রামনগিন। সে বলল, 'কা উপকার দেওতা?'

'একজন লোক দিবা যে আমারে মুদির দুকানখান চিনাইয়া দিব। কিছু সদাই (সওদা) করতে লাগব।'

'হাঁ হাঁ, জরুর। আমি নিজে গিয়েই কিনে এনে দিতাম দেওতা। লেকেন আমি অচ্ছুৎ দুসাদ; আমার ছোঁয়া নায় চলেগা।' বলেই ভিড়ের দিকে তাকিয়ে একটা জোয়ান ছোকরাকে ডাকল, 'এ গানহী—।' আঠারো বিশ বছরের একটি ছেলে উঠে এলে তাকে বলল, 'দেওতাকো গিরধর মারবাড়িকে দুকান দেখলা দে—'

গানহী বলল, 'হাঁ—'

সরযে এবং কেরোসিন, দু'রকম তেলের জন্য কাচের শিশি ও টিন দিয়ে গানহীর সঙ্গে সুরথকে পাঠিয়ে দিল উমানাথ। শুধু দু'ধরনের তেলই না, আরও কয়েকটা দবকারি জিনিসের ফর্দ করে ছেলের হাতে দিয়েছে সে।

সুরথরা চলে গেলে উমানাথ রামনগিনকে আবার বলল, 'আরেকখান উপকার যে চাই ভাই—'

'কা দেওতা?'

'আখা যে ধরান হইব, লাকড়ি (কাঠ) নাই। লাকড়ি না পাইলে পাক হইব না।'

'ঠিক বাত। আভ্‌ভি লাকড়ি লেকে আতা হ্যায়—' বলে রামনগিন চলে গেল।

ওদিকে সরযূ কোত্থেকে তিনখানা বড় বড় ইটের টুকরো জোগাড় করে কাজ চালানোর মতো একটা উনুন বানিয়ে ফেলেছে। চাল-ডালও ধোয়া হয়ে গেছে। এখন শুকনো কাঠ কি পাতাপুতি পেলেই রান্না চাপিয়ে দেওয়া যায়।

সরযূ অস্থায়ী উনুনটার কাছে বসে ছিল। তার গা ঘেঁষে জবা আর গৌর। সরযূ ওখান থেকে গলা তুলে বলে, 'আইজ পাকের ঘরে (রান্না ঘরে) হাত দিতে পারলাম না। কাইল ভোরে উইঠা লেইপা পুইছা (লেপে পুছে) উইহানে নয়া আখা পাততে লাগব। এট্টু আঠাইলা (এঁটেল) মাটির যে দরকার।'

উমানাথ বলল, 'এই দ্যাশে কি মাটির অভাব ধনবৌ, আইনা দিমু কাইল সকালে।' বলতে বলতে দক্ষিণের ঘরের উঁচু বারান্দায় উঠে বসল সে। তারপর ভিরৌলি গাঁয়ের লোকজনের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।

একটা বুড়োমতো লোক উঠোনের ভিড়টার সামনের দিকে বসে ছিল। মাথার চুল তার বকের পাখার মতো সাদা। কিন্তু এই বয়সেও স্বাস্থ্যটা তার দেখবার মতো। চওড়া কাঁধ, হাত-পায়ের হাড় মোটা এবং মজবুত, বুকটা কালো পাথরের প্রকাণ্ড একখানা চাংড়া যেন। এ-দেশের বেশির ভাগ মানুষের মতো তার মুখচোখ ভারি সরল। উমানাথ তাকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমার নামখান কী কত্তা?'

লোকটা বলে, 'আজুলাল দেওতা—'

'তুমিও কি দুসাদ?'

'নায় দেওতা। হামনিলোগ হাজম—'

হাজাম যে নাপিত সেটা আগেই জেনেছে উমানাথ। সে বলে, 'কাম-কাইজ (কাজকর্ম) কী কর? জাইত ব্যবসা?'

আজুলাল জানালো, জাতব্যবসা অর্থাৎ নাপিতের কাজ তারা দু'পুরুষ হল ছেড়ে দিয়েছে। তারা এখন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে কূয়ো কাটে আর পুরোনো কুয়োর বালিতোলার কাজ করে। বংশগত ব্যবসায় ক'পয়সা আর কামানো যায় ; তাতে সংসার চলে না।

শুধু আজুলালই না, গঞ্জু যমনাপ্রসাদ, ধোবী বাগেরাম, তাৎমা অবোধী—এমনি অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। ওরা সবাই কৌলিক বা বংশগত বৃত্তি বহুকাল আগেই ছেড়ে দিয়েছে। কথা বলতে

বলতে উমানাথ জানতে পারে, এখানকার শতকরা নব্বই জনই বাজা খেতাবওলা জমিদার ত্রিলোকীপ্রসাদের 'বাঁধী কিষান'। সোজা কথায় ভূমিদাস। স্রেফ পেটভাতায় ত্রিলোকীপ্রাসাদের খেত খামারে বংশ পরম্পরায় বেগার দিয়ে আসছে। বাদবাকি যারা আছে, একমাত্র ধাঙড় তাৎমাবা ছাড়া সবাই বালিকাটা কুয়োকাটা ঘরামিগিরি—এমনি নানান উঞ্ছবৃত্তি করে পেট চালায়। এগুলো উমানাথ মোটামুটি বুঝতে পারল, কিন্তু ভূমিদাস ব্যাপারটা তার মাথায় পরিষ্কাব ঢুকল না।

উমানাথ ভাবে, ঠিক এইরকম না হলেও এদের সঙ্গে তাব জীবনযাত্রারও কোথায় যেন একটা মিল আছে। আজন্ম তারও নির্দিষ্ট কোনো জীবিকা নেই। সংসাব চালাবার জন্য কতবকম কাজই না সে করেছে!

ওদের কথার মধ্যে একসময় রামনগিন ঘাড়ে করে সিসম গাছের শুকনো ডালপালা আর গোটাকতক কুঁদরু এবং পাকা শশা নিয়ে ফিরে এল। সেগুলো উঠোনের একধারে নামিয়ে বেখে সরযূকে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল, 'মা'জি, এহী লাকড়ি আউর থোড়েসে সবজি— আপহীকে লিয়ে। রসুই চঢা দিজিয়ে।'

উমানাথ দক্ষিণের ঘরের দাওয়া থেকে শশা আর কুঁদরুগুলো দেখিয়ে বলে, 'এইগুলান আবাব কিনা (কিনে) আনলা ক্যান ভাই?'

'এ সবজি ঘরমে বনায়া। দেওতা বরাম্ভনকে লিয়ে লায়া হ্যায়। কিরপা করকে নায় মাত্‌ বোলনা-'

দেবতা ব্রাহ্মণ বলতে উমানাথরা। তাদের সেবার জন্য বাড়ির ফলানো আনাজ নিয়ে এসেছে রামনগিন। উমানাথ যাতে ফিরিয়ে না দেয় সেজন্য মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে বয়েছে। উমানাথের মনে হয়, বড় ভালো তো এই মানুষটি। সে বলে, 'ঠিক আছে ভাই। ভালবাইসা দিতে আছ। না কমু না।'

রামনগিনের তামাটে মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে বলে, 'আপকো কিরপা। আপ কহিয়ে হামনি আউব কা করে?'

রামনগিন জানতে চাইছে, আর কিছু করে দিতে হবে কিনা। উমানাথ বলল, 'না, তুমারে মেলা (অনেক) খাটাইছি। অহন বসো।' বলতে বলতেই সেই কথাটা মনে পড়ে যেতে আবার শুরু করে, 'ভাই, চুলা বানানের লেইগা এট্টু ভাল মাটি যে চাই। কই পামু?'

রামনগিন উত্তর দেবার আগেই গঞ্জু জগপত উঠে দাঁড়াল, 'হামনি আভি লানে (আনতে) যাতা—' বলেই ছুটল।

ওধারে উনুন ধরিয়ে ভাত চাপিয়ে দিয়েছে সরযূ এবং ভাতে ফুট ধরার আগেই মুদি মারবাড়ি গিরধরলালের দোকান থেকে কেরোসিন এবং সর্ষে, দু রকমের তেল আর নুন, শুকনো লঙ্কা, হলুদ ইত্যাদি কিনে গান্‌হীর সঙ্গে ফিরে আসে সুরথ। মায়ের কাছে সওদাপাতি নামিয়ে দিয়ে দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায় বাপের পাশে এসে বসে সে।

উমানাথ যেমন এদেশের হালচাল, চাষ-আবাদ এবং মানুষজনের খবব নেয় তেমনি রামনগিনরা তার কাছে ফেলে-আসা সুদূর পূর্ব বাংলা সম্পর্কে হাজারটা প্রশ্ন করে। সেখানে মাঠভর্তি প্রচুর ধান, অজস্র দুধ, অফুরন্ত মাছ আর নানা রকমের অঢেল খাদ্য—এসব কথা শুনতে শুনতে পূর্ণিয়া জেলার শেষ মাথায় অচ্ছুৎ ভূমিদাসদের চোখ চকচক করতে থাকে। রামনগিনরা বলে, 'ওহী স্বরগ্‌ ছোড়কে কায় ইধরি (এখানে) আয়া দেওতা?'

উমানাথ বলে, 'কী করুম, দ্যাশ যে দুইভাগ হইয়া গ্যাল।'

রামনগিনরা ঠিক বুঝতে না পেরে বিমূঢ় মুখে জিজ্ঞেস করে, 'কা?'

উমানাথ তখন দেশভাগের বিষয়টা তার জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী বুঝিয়ে বলে। শুনে অনেকক্ষণ থ হয়ে থাকে রামনগিনরা। তারপর প্রায় সমস্বরেই বলে, 'অ্যায়সা?'

'হ।'

'হামনিকা দেশ কাটকে দোনো (দুই) হিস্যা হো গিয়া?'

'হ। পাকিস্তান আর ইণ্ডিয়া।'

রামনগিন খানিকক্ষণ মাথা নেড়ে বলে, 'শুনা অ্যায়সা। পিছা সাল পূর্ণিয়া 'টৌন' (টাইন) গিয়াথা। উধরি গন্ধেরীলালজি কা বহোত বড়কা দুকান হ্যায়—' সে যা বলে তার মর্মাথ হল এইরকম। গত বছর রামনগিন পূর্ণিয়া শহরে গিয়েছিল। একটা কাচ-বসানো লালটিন (লণ্ঠন) কেনার জন্য যা কিনা ভিরৌলি কিংবা নবলপুরার হাটে তখন পাওয়া যেত না। ঘুরতে ঘুরতে সে গন্ধেরীলালের বড় দোকানে যায়। সেখানে টৌনের লোকদের বলাবলি করতে শুনেছে, দেশটা নাকি কেটেকুটে দু'টো ভাগ করা হয়েছে। এক হিস্যা মুসলমানের, আরেক হিস্যা হিন্দুর। তবে কথাটা কতদূর সত্যি সে সম্বন্ধে সে বলতে পারবে না। টৌনের লিখিপড়ী আদমিরা যখন বলাবলি করেছে তখন কি আর সেটা ঝুট হবে? এ নিয়ে অবশ্য পরে সে আর মাথা ঘামায়নি।

জগপতও মাথা নাড়ে। সে যা বলে তা হল নবলপুরায় শনিচারীর হাটে গিয়ে সে জমিদার ত্রিলোকী প্রসাদজির ঘোড়ার সহিস দরবারা সিং আর পুলিশ চৌকির সিপাহী তার খুব জানপয়চান ভজন আহীরের মুখ থেকে পাকিস্তানের কথা শুনে এসেছে। তাও পুরোপাক্কা ছ' মাহিনা গুজার গেল। তারপর অবশ্য পাকিস্তানের কথা বেমালুম ভুলে গেছে সে।

আরও কয়েকজনও ঘাড়টাড় নেড়ে জানায়, পাকিস্তানের কথা তারাও শুনেছে।

পাকিস্তান এবং দেশভাগের কথায় আজাদির কথা ওঠে, গান্হী (গান্ধী) বাবার প্রসঙ্গও আসে।

বাগেরাম বলে, 'শুনা হায়, দেশমে আজাদি আ গিয়া, গান্হী বাবাকা রাজ চালু হুয়া—হুয়া নায়?'

এই যে পূর্ব-বাংলার চরচিকন্দি থেকে সুদূর পূর্ণিয়া জেলার শেষ প্রান্তে উমানাথ তার ঘর-সংসার স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে আরেফিন মিঞার ফেলে-যাওয়া বাড়িতে এসে উঠেছে, আর দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় বসে ভিরৌলি গ্রামের মানুষজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে—এটা স্বাধীনতা বা দেশভাগের ঠিক পরেকার ঘটনা নয়। বছর সাড়ে ছয় কী সাতেক আগে দেশ ভাগজোখ করে ইংরেজরা চলে গেছে। কিন্তু এখনও স্বাধীনতা এবং দেশ দ্বিখণ্ডিত হবার খবর ভারতবর্ষের দূরতম গ্রামগুলোতে ভালো করে পৌঁছয়নি। দেশের ভাগ্য যে রাতারাতি কীভাবে বদলে গেল, কতভাবে, কী চড়া দামে যে আমূল পরিবর্তন এসে গেছে, সে সম্বন্ধে ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের, বিশেষ করে ভিরৌলির বাসিন্দাদের মতো মানুষজনের কোনোরকম পরিষ্কার ধারণাই নেই।

স্বাধীনতা এবং দেশভাগের কথায় আরও নানা প্রসঙ্গ এসে যায়।

আজুলাল বলে, 'শুনা আংরেজলোগ চলা গিয়া, গান্হী মহাত্মা আভি দেশকা রাজা বনা?' সে শুনেছে ইংরেজরা চলে যাবার পর গান্ধি মহাত্মা এখন দেশের রাজা।

অবোধী আজুলালের চেয়ে আরেকটু বেশি খবরাখবর রাখে। সে বলে, 'আরে নায় নায়, গান্হী মহাত্মা মর গিয়া , জবাহরলাল আভি রাজা বনা—'

এসম্বন্ধে কেউ প্রতিবাদ করে না। কেননা অবোধী ভিরৌলি গ্রামের সবচেয়ে জ্ঞানী লোক। ছাপরা আরা পূর্ণিয়া কাটিহার—এমনি নানা ভারি ভারি টৌনে (টাউনে) সে ঘুরে বেড়ায়। কত লোকের সঙ্গে মেশে সে, দুনিয়ার হরেক খবর রাখে। সে যখন বলেছে তখন জবাহরলালের খবরটা অবশ্যই অভ্রান্ত।

উমানাথও এ-ব্যাপারে আপত্তি করে না। জবাহরলালের নামটা তারও জানা। তবে জবাহরলাল এ- দেশের রাজা কিনা, এ-বিষয়ে সে পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। তবে তার ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়া ছেলে সুরথ বলল, 'জওহরলাল এই দ্যাশের রাজা না, প্রধানমন্ত্রী।'

'প্রধানমন্ত্রী' শব্দটা ভিরৌলির লোকজনেরা এই প্রথম শুনল। এমনকি যে-অবোধী নানা জায়গায় ঘোরে, সে-ও এ-কথাটা আগে কখনও শোনেনি।

উমানাথ বলে, 'আমার পোলা সুরথ মেট্রি কেলাসে (ক্লাসে) পড়ে, দ্যাশবিদ্যাশের মেলা (বহু) খবর রাখে। ও যা কইব ঠিকই কইব।' পুত্রগর্বে তার চোখমুখ উজ্জ্বল দেখায়।

ভিরৌলির বাসিন্দারা, এমনকি মধ্যবয়সী জ্ঞানী অবোধীও সুরথের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে বলে, 'ছোটা দেওতা যব বোলা অয়সায় (এমনই) হোগা।' ছোট দেওতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণসন্তান যখন বলেছে, তার ওপর আর কথা নেই। জবাহরলাল রাজা না হয়ে প্রধানমন্ত্রীই হবে।

কথা বলতে বলতে আজুলাল এবং রামনগিন ট্যাক থেকে তামাক-চুণ বার করে বাঁ হাতের তালুতে

ডলে ডলে খৈনি বানিয়ে অন্যান্যদের দেয়, এবং নিজেরাও নিজের নিজের ঠোঁট টেনে মাড়ির গোড়ায় নেশার বস্তুটি গুঁজে দেয়।

দেখতে দেখতে উমানাথের লোভ হয়। খানিকক্ষণ আগে বয়েল গাড়ি করে পূর্ণিয়া থেকে আসার সময় গাড়িওলা তাকে খানিকটা খৈনি দিয়েছিল। তখনই তার মনে হয়েছিল তামাক-চূণ মিশ্রিত এই জিনিসটা নেশা হিসেবে মন্দ না। কিন্তু রামনগিনরা নিজেদের মধ্যেই খৈনি দেওয়া নেওয়া করেছে, তাকে ভাগ দেয়নি। উমানাথ বুঝতে পারে, অচ্ছুৎরা ওদের হাতের ছোঁয়া জিনিস তাকে দেবে না। ব্রাহ্মণ বলেই ওরকম একটা লোভনীয় নেশা থেকে সে বঞ্চিত হল।

অবশ্য অচ্ছুৎদের ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে উমানাথের মনোভাব খুব একটা অনমনীয় নয়। এটা ঠিক, তাদের হাতের রান্না কোনো জিনিসই সে খাবে না, এমনকি চা পর্যন্ত না। তাই বলে তামাক বিড়িটিড়ি দিলে 'না' বলে না।

জল অচলদের সম্পর্কে উমানাথের মনোভাবটা নরম হয়েছে দেশভাগের পর। চরচিকন্দি থেকে আসার সময় গাদা মেরে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে দিনসাতেক মুন্সিগঞ্জের স্টিমারঘাটায় পড়ে থাকতে হয়েছিল তাদের। দিনে গোয়ালন্দের স্টিমার মোটে একটা, আর দেশ ছেড়ে চলে-যাওয়া মানুষের সীমাসংখ্যা নেই। কাজেই স্টিমারের আশায় পড়ে না থেকে উপায় কী। এই স্টিমারঘাটায় কত জাতের মানুষের সঙ্গে ঠাসাঠাসি করে থাকতে হয়েছে, তার কি ঠিক আছে? তা ছাড়া, বাঁচতে হলে পেটে কিছু দিতে হয়। মুন্সিগঞ্জে নদীর ধার বরাবর ভাতের হোটেল বা অন্য সব খাবারের দোকানে গিয়ে সাত দিনে চোদ্দ বার ছেলেপুলে নিয়ে খেয়ে আসতে হয়েছে। ওগুলো কাদের দোকান বা হোটেল, তাদের কী জাত, এসব বাছবিচার তখন আর ছিল না। শুধু কি স্টিমারঘাটেই, স্টিমারে করে গোয়ালন্দে এসে সেখানকার ভাতের দোকানে এবং কলকাতায় পৌঁছবার পরও হোটেল টোটেলে তাদের খেতে হয়েছে। এই সব হোটেলের মালিক থেকে কর্মচারীরা নিশ্চয়ই শাণ্ডিল্য গোত্রের ভট্টাচার্যি বামুন না।

বেঁচে থাকা বড় সাঙঘাতিক ব্যাপার।

উমানাথের চারপাশ ঘিরে জাতপাতের যে অদৃশ্য অগুনতি দেওয়াল তোলা ছিল, দেশভাগ তার বেশ কয়েকটাই ভেঙে দিয়েছে। তবে অনেকগুলোই এখনও মাথা খাড়া করে রয়েছে। রক্তের মধ্যে পুরুষানুক্রমে যে-সংস্কার বিষের মতো ঢুকে যায় তা কি সহজে ঘোচে?

রামনগিনদের খৈনি খেতে দেখে কিছু একটা নেশার জন্য গলা খুস খুস করতে থাকে উমানাথের। নেশার তিয়াস বড় জবর তিয়াস। জামার পকেট হাতড়ে উমানাথ একটা বিড়িও খুঁজে পায় না। সব বিড়ি শেষ। হতাশ মুখে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকতে থাকতে একটা কথা মনে পড়ে যায় তার। ব্যস্তভাবে সে বলে ওঠে, 'গৌর, বোচকার থনে (থেকে) তামুক আর কইলকা বাইর কর তো বাবা -' চরচিকন্দি থেকে আসার সময় মাখা তামাক, গোটা পঞ্চাশেক পোড়া মাটির কলকে, হুঁকো ইত্যাদি ইত্যাদি নেশার সরঞ্জাম সে নিয়ে এসেছিল।

গৌর ঘরে গিয়ে বোঁচকা খুলে তামাক টামাক বার করে আনে। তিন চারটে কলকেতে তামাক পুরে সরযূর কাছে চলে যায়। তারপর আখা থেকে জলন্ত কাঠের টুকরো তামাকের ওপর চড়িয়ে আবার দক্ষিণের বারান্দায় ফিরে আসে। তারপর কিছু বলার আগেই হুঁকোতে জল ভরে আনে। বাপের নেশার জন্য কী কী দরকার সেটা ও ভালো করেই জানে।

উমানাথ একটা কলকে নিজের হুঁকোর মাথায় বসিয়ে বাকিগুলো উঠোনে নামিয়ে রামনগিনদের বলে, 'পরথম আমার বাড়িত্ আইলা। এক্কেবারে হুধা মুখে (শুধু মুখে) যাইবা! এট্টু নিশা (নেশা) কর ভাইরা।'

বরাম্ভন দেওতার এই কথায় কৃতার্থ হয়ে যায় রামনগিনরা। নবলপুরায় যে মৈথিলি বামুনরা রয়েছে তাদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষা যায় না। তাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় অচ্ছুৎদের ছায়া পড়লে চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে দেয়। কিন্তু সেই তুলনায় এই বঙ্গালি বরাম্ভন কত ভালো, যেন স্বয়ং দেওতার অংশ।

বরাম্ভনের দেওয়া কলকেগুলো পরম যত্নে তুলে নেয় রামনগিনরা। তারপর সেগুলো হাতে হাতে ফিরতে থাকে। কড়া সুগন্ধি তামাকের ধোঁয়ায় শীতশেষের বিকেল নেশাতুর হয়ে উঠতে থাকে।

একসময় তামাক খাওয়া শেষ হয়। কলকের মাথা থেকে তামাক পোড়া ছাই বাড়িব বাইরের রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসে সেগুলো মুছে সাফ করতে করতে বলে, 'এগুলো দিয়ে কী করব দেওতা? ফেঁক (ছুঁড়ে) দেগা?'

উমানাথ পুরের ঘরের চালটা দেখিয়ে বলে, 'কইলকাগুলান উইহানে গুইজা রাখো। আবার যহন আইবা তহন তামুক খাইতে পারবা।'

বরাম্ভনের বাড়িতে তামাকের ব্যাপারে একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে যাওয়াতে রামনগিনরা বর্তে যায়। তারা বলে, 'বহোত কিরপা দেওতাকো—' তারপর পুবের ঘরের চালের বাতায় কলকেগুলো গুঁজে রাখে।

উমানাথ বলে, 'এইহানে তামুক আর রাব পাওন যাইব তো?'

আজুলাল জিজ্ঞেস করে, 'রাব কা চিজ?'

উমানাথ বুঝিয়ে দেয়। রাব হলো চিটে গুড়, তামাক মাখার জন্য দরকার।

আজুলাল বলল, 'বহোত মিলতে শানচারীকা হাটিয়ামে—'

উমানাথ আগেই শুনেছে, ফি শনিবার নবালপুরায় হাট বসে। আজ বুধবার। মাঝখান দুটো দিন বাদ দিলেই হাট। সেদিন একবার হাটে যেতে হবে। সংসারের জন্য অনেক কেনাকাটা দরকার। সে বলে, 'আমারে এই শনিবার হাটে লইয়া যাইবা ভাইরা? এই দিকের রাস্তাঘাট তো কিছুই চিনি না। একবাব চিনাইয়া দিলে নিজেরাই যাইতে পারুম।'

রামনগিনরা একসঙ্গে বলে ওঠে, 'জরুর লে যায়েগা।'

দেখতে দেখতে বেলা আরও হেলে যায়। উঠোনে বাতাবি লেবু গাছের ছায়া দীর্ঘতর হয়। অনেক দূরে ধূসব পাহাড় আব সবুজ বনরেখার ওপারে সূর্য ডুবতে থাকে। রোদের রং এখন বাসি হলুদেব মতো। উত্তুরে হাওয়ায় হিম আরও ঘন হয়ে মিশে যায়। পৃথিবী ক্রমশ নিরানন্দ, বিষণ্ণ হতে থাকে।

ওদিকে সরযূর সামনে সিলভারের হাঁড়ির ভাত টগবগ করে ফুটতে থাকে। ফুটন্ত ভাতের গন্ধ শীতের বাতাসে ম ম করে।

রামনগিনরা একসময় বলে, 'অব (এখন) যাতা হ্যায় দেওতা। ফির কাল সবিরে আওগে। চিন্তা নায় করনা। হামনিলোগনকে আপনা নৌকর সমঝ লেনা। যো চাহেগা, হামনি কর দেগা—রাম রাম দেওতা—' গ্রামের অচ্ছুৎ জনতা বিদায় নিয়ে চলে যেতে থাকে।

উঠোনটা প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়। তবে দু-চারজন এখনও রয়েছে। উমানাথ লক্ষ করে, তাদের মধ্যে একটা ভাঙাচোবা চেহারার বুড়ি আর তিনটে আধ ন্যাংটো বাচ্চা সমেত একটা যুবতী মেয়ে বসে রয়েছে। যুবতীর পরনে শাড়িটা শতচ্ছিন্ন, ধুলধুলি। কোনোরকমে গিঁট পাকিয়ে গিঁট পাকিয়ে আর সেলাই করে করে পরে এসেছে। আর আছে আধবুড়ো একটা লোক, তার ডান হাতটা নেই। দেখেই টের পাওয়া যায়, এই মানুষগুলোর পেটে বেশ কয়েকদিন ভাতের দানা পড়েনি। ক্ষুধার্ত করুণ মুখ তাদের। সবাই ভাতের হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।

উমানাথ বলে, 'হগলে (সবাই) গেল গিয়া। তুমরা তো গ্যালা না!'

বুড়িটা বলল, 'নায় দেওতা। আউর থোড়া বৈঠেগি (বসব)।'

উমানাথ বলে, 'ঠিক আছে, বসো না—'

বসতে বলার জন্য লোকগুলো কৃতজ্ঞ চোখে তাকায়, মুখে অবশ্য কিছু বলে না।

লোকজন কাছাকাছি থাকলে মুখ বুজে তো আর থাকা যায় না। উমানাথ খুনখুনে বুড়িটাকে এবার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি থাকো কুনহানে?'

কাঁপা কাঁপা গলায় বুড়ি বলে, 'হামনিকা ঘর নেহী হ্যায় দেওতা। ইধরি উধরি ঘুমতা ফিরতা (ঘুবি ফিরি)।'

'কে কে আছে তুমার?'

'কোই নেহী, বিলকুল একেলী।'

সেই হাতকাটা লোকটা যার চেহারা বাজে-পোড়া তালগাছের মতো, গাল তোবড়ানো, সারা গায়ে দিনের পর দিন উপোস দেবার ছাপ—সে বলল, 'সাচ বাত। ও বুড়ির বহোত তখলিফ। ও ছিল রাজা ত্রিলোকজির (ত্রিলোক) বাপের রাখনি (রক্ষিতা), জাতে ধোবী, নাম মণিয়া। বিড় বিড় করে অনেক কথা বলে যায় সে, মণিয়া ধোবানীর যদ্দিন বয়েস ছিল, জওয়ানি ছিল, শরীরে জলুস ছিল, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ছিল, তদ্দিন এখনকার রাজার বাপের কাছে তার যথেষ্ট কদর ছিল। তারপর যেই শরীর-স্বাস্থ্য-বয়েস-যৌবন, একে একে সব চলে গেল, তাকে অচল পয়সার মতো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। দুনিয়ায় তার কেউ নেই। মণিয়ার জাতের লোকেরা তাকে দ্যাখে না। সে এখন ভিখমাঙনি হয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়।

শুনতে শুনতে বড় দুঃখ হয় উমানাথের। মনে মনে বলে, 'আহা রে—' তারপর হাত-কাটা লোকটাকে জিজ্ঞেস করে,' কিছু মনে কইরো না ভাই, তুমার দেখতে আছি, ডাইন হাতখান নাই। কী হইছিল?'

লোকটা যা বলে, তা এইরকম। সে জাতে গঞ্জু, নাম মটরু। সে ছিল নবলপুরার রাজা ত্রিলোকী-প্রসাদের শিকারের সঙ্গী, জঙ্গল হাঁকোয়া। ত্রিলোকীজি যখন হাতির পিঠে চড়ে পূর্ণিয়ার জঙ্গলে শিকারে যেতেন তখন দশ বিশ জনের একটা দল চিৎকার করে আর টিন পিটিয়ে জন্তু-জানোয়ারদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে রাজার বন্দুকের মুখে নিয়ে যেত। এই ছিল তার জীবিকা। কিন্তু একবার জঙ্গলে ঢুকে শিকার তাড়িয়ে নেবার সময় বাঘের মুখে পড়ে যায় মটরু। বাঘটা এক কামড়ে তার ডান হাতটা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। একটা পঙ্গু লোককে দিয়ে তো এ-জাতীয় কাজ হয় না। সুতরাং মটরু জঙ্গল-হাঁকোয়াদের দল থেকে খারিজ হয়ে গেছে।

উমানাথ বলে, 'তাইলে তুমার চলে কেমনে?'

মটরু বলে, 'চলে আর কই দেওতা। আমিও এখন ভিখ মাঙোয়া, ভিখ মিললে খেতে পাই, না হলে ভুখা থেকে যাই। এই তো তিন রোজ সিরিফ (স্রেফ) পানি ছাড়া আর কিছু খাইনি।'

বুড়ি মণিয়া বলে, 'হাম ভি, আমিও তিন চার রোজ উপোস দিয়ে আছি দেওতা—'

খানিকক্ষণ চুপাচাপ। তারপর উমানাথ সেই হতদরিদ্র মেয়েটার দিকে তাকায়। তিনটে বাচ্চা তার গায়ের সঙ্গে এখনও লেপটে রয়েছে। মেয়েটার কোনো দিকে হুঁশ নেই। সে অদূরে উনুনে চাপানো ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িটার দিকে লুব্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। উমানাথের মনে হয়, বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে এই মেয়েটাও বেশ কয়েকদিন উপোস দিয়ে আছে।

উমানাথ আস্তে করে ডাকে, 'তুমার নামখান কী গো মাইয়া?'

মেয়েটা চমকে উঠে মুখ ফেরায়। চুরি ধরা পড়ার পর মুখচোখের চেহারা যেমন হয়, তাকে তেমনই সন্ত্রস্ত দেখায়। অত্যন্ত জড়সড় হয়ে ভীরু গলায় সে বলে,'লখী—'

এখন যে ক'জন এখানে রয়েছে তাদের মুখপাত্র হয়েই যেন হাতকাটা মটরু বলে ওঠে, 'বহোত দুখি লেড়কি—'

শুনে হাসি পায় উমানাথের। মটরু নিজে যেন কত সুখী! তার জীবনে যেন দুঃখের ছিটেফোঁটাও নেই। উমানাথ কিছু বলার আগে মটরু ফের বলে ওঠে, 'লখী দুসাদদের মেয়ে। ওর মরদ হরদেও আউর লখী রাজার জমিনে মাড়োয়া আউর থোড়েসে চানার বদলে বেগার দিত। হরদেও এক রোজ ঠিক করল, আর বেগার দেবে না। এখান থেকে বৌ ছেলে পুলে নিয়ে টৌনে ভেগে অন্য কামকাজ করবে। লেকেন খবরটা কীভাবে যেন রাজা জেনে যায়। তারপর নিজের পোষা পহেলবান দিয়ে সে হরদেওকে এমন মার মারায় যে মুখ দিয়ে খুন ছুটে হট্টাকাট্টা জোয়ানটা তক্ষুনি মরে যায়। সেই থেকে তিন তিনগো বাচ্চা নিয়ে তখলিফের শেষ নেই লখীর—'

শুনতে শুনতে বুকের ভেতর শ্বাসকষ্টের মতো কিছু একটা হতে থাকে উমানাথের।

এদিকে বহুদূরে বনরেখার ওপারে সূর্য ডুবে যায়। দ্রুত সন্ধ্যা নেমে আসতে থাকে। অন্ধকারে পূর্ণিয়া জেলার মাঠ-প্রান্তর গাছপালা আকাশ নিয়ে যে চরাচর—সব ঝাপসা হয়ে আসে।

শীতশেষের বাতাস এমনিতেই এত ঠান্ডা যে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে হিমটা আচমকা যেন বিশ গুণ বেড়ে গেল।

উমানাথ দক্ষিণের ঘরের দাওয়া থেকে চেঁচিয়ে বলল', গৌর, জবা, ধনবৌ—জবর শীত। তুমরা কাথা কুথা (কাঁথা টাঁথা) জড়াইয়া বসো—'

গরম চাদর উমানাথদের নেই। কাঁথা আর ছেঁড়া কম্বল টম্বলই ভরসা। জবারা তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে ভারী কাঁথা আর কম্বল বার করে সারা গায়ে জড়িয়ে নিল। উমানাথ আর সুরথকেও একটা করে দিয়ে গেল।

উমানাথ নিজের গায়ে কম্বলটা জড়াতে গিয়ে থমকে গেল। উঠোনে বুড়ি মণিয়া, হাত-কাটা মটরু আর লখী শীতে দুই হাঁটু বুকের ভেতর ঢুকিয়ে কাঁপছে। বড় কষ্ট হয় লখীর বাচ্চাগুলোকে দেখে। তারা কুঁকড়ি মুকড়ি মেরে মায়ের গায়ের সঙ্গে আরো লেপটে গেছে। চোখের সামনে এ দৃশ্য দেখা যায় না। উমানাথ বলল, 'তুমাগো দ্যাশে জবর ঠাণ্ডা। উই ভাবে খোলা উঠানে বইসা থাকলে অসুখ বিসুখ হইয়া যাইব। তুমরা যে যার বাড়িত্ যাও গা।'

কিন্তু লখীদের বাড়ি ফেরার আদৌ কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। তারা উন্মুক্ত আকাশের তলায় অনাচ্ছাদিত উঠোনেই বসে থাকে। মটরু বলে, 'হামনিলোগ অ্যায়সা জাড়মে (ঠাণ্ডায়) রহতা ; চিন্তা নায় কর না—' অর্থাৎ এমন ঠাণ্ডায় থাকার অভ্যাস তাদের আছে। উমানাথ যেন দুশ্চিন্তা না করে।

যাবেই না যখন, তখন তো আর তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। উমানাথ পূবের ঘরের বারান্দাটা দেখিয়ে বলে, 'তাইলে উইখানে উইঠ্যা বসো—'

জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে মটরু বলে, 'নায় নায় দেওতা, বরাম্ভনের আঙনায় (উঠোনে) বসতে পেরেছি, এই আমাদের কত জন্মের পুণ্ (পূণ্য)। লেকেন ওপরে উঠে বসতে পারব না। গা গরম রাখার বন্দোবস্ত করছি।' বলেই উঠে চলে গেল সে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে কিছু শুকনো কাঠ কুটো আর পাতা নিয়ে ফিরে এল। সেগুলো উঠোনের মাঝখানে চুড়োর মতো সাজিয়ে সরযূর কাছ থেকে আগুন চেয়ে নিয়ে ধরিয়ে দিল। আগুনের শিখা লকলকিয়ে উঠলে সবাই তার চারপাশে গোল হয়ে বসে হাত-পা সেঁকতে লাগল।

ইঙ্গিতটা আগেই বুঝতে পেরেছিল উমানাথ। দক্ষিণের বারান্দা থেকে আস্তে আস্তে উঠে চলে যায় স্ত্রীর কাছে। চোখের কোণ দিয়ে মটরুদের দেখিয়ে বলে, 'অগো লেইগা আর দু'গা (দুটি) ভাত বসাইয়া দাও ধনবৌ।'

সরযূ বলে, 'হে আমি বুঝছি। নয়া কুটুমরা না খাইয়া ভিটা ছাড়ব না।' বলে একটা সিলভারের ডেকচি দেখিয়ে দেয়।

উমানাথ দেখতে পায়, ডেকচিটায় খানিকটা ধোয়া চাল রয়েছে। মনে মনে ভাবে স্ত্রীটি তার বড়ই বুদ্ধিমতী এবং তার মনটাও ভারি নরম। বিশ বছর একসঙ্গে ঘর করছে। সে দেখেছে মুখ থেকে কথা খসবার আগে সরযূ সব বুঝে ফেলে।

উমানাথ বলে, 'ধনবৌ, এট্টা ব্যাপার তুমার চৌখে পড়ছে?'

সরযূ স্বামীর দিকে মুখ ফেরায়। বলে, 'কী?'

'পিরথিমীতে আমাগো থনেও (আমাদের থেকেও) দুঃখী গরিব মানুষ আছে। যেই দ্যাশে আশ্শয় (আশ্রয়) নিতে আইলাম হেই দ্যাশেও মাইনষের কত কষ্ট!'

'হ। তয় (তবে)— '

'তয় কী?'

'একদিন যদি এগো খাওয়াও, দেখবা গুষ্টি রোজ আইসা খাওনের লেইগা বইসা থাকব।'

উমানাথ বলে, 'যদি আসেই কী আর করন! কে কারে খাওয়ায় ধনবৌ। আরেফিন মিঞা চাউল দিয়া গ্যাছিল, তাই ভাগজোগ কইরা খাইতে আছি। এইভাবেই চাইলা যাইব। ঘরে যদিন ভাত না থাকে, তহন আর কই থনে দিবা?' একটু থেমে ফের শুরু করে, 'মাইনষেই মাইনষের কাছে আহে। জন্তু জাওনারের কাছে যায় না। কেউ যদি আহে তারে তো আর কুত্তা-মেকুরের (কুকুর বেড়ালের) লাখান (মতো) খেদাইয়া দিতে পারি না।'

সরযূ বলে', মাইনষের কথা ভাবলেই চলব? নিজের পোলামাইয়া সোমসারের কথা ভাবতে হইব না? তাগো কথাহান মনে রাইখো।'

'তাগো কথাই তো চিরটা কাল ভাইবা আইলাম। নাইলে কাগো লেইগা এত দূরে দুইখান ঘর আর এট্টু জমিনের লেইগা আইছি' তুমার আমার আর কয় দিন? হগলই পোলামাইয়া গিনিগোর লেইগা। তবু অন্য মাইনষের কথা তো এট্টু ভাবতে হইব।'

সরযূ আর কিছু বলে না। উমানাথ আবার গিয়ে দক্ষিণের বারান্দায় বসে। তারপর মটরুদের বলে, 'তুমরা আইজ এইহানে দু'গা ভাত খাইয়া যাইবা।'

মটরুরা সমস্বরে বলে ওঠে, 'দেওতাকি কিরপা (কৃপা)।'

উঠোনের সেই জলন্ত কাঠকুটোর আগুনের আভায় উমানাথ দেখতে পায় হতদরিদ্র ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর চোখমুখ চকচক করছে।

ক্রমশ রাত আরও গভীর হয়। দিগন্তের তলা থেকে ঝকঝকে চাঁদির থালার মতো পরিপূর্ণ একখানা চাঁদ উঠে আসে। জরির ফুলের মতো নক্ষত্রমালায় আকাশের অদৃশ্য বাগান ভরে যেতে থাকে।

একসময় রান্না শেষ হয় সরযূর। স্বামীকে সে বলে, 'এইবার খাইতে দিমু কিন্তুন অরা (ওরা) খাইব কিসে?' ওরা বলতে মটরুরা।

উমানাথ মটরুদের উদ্দেশে বলে, 'ভাই, আমাগো ভাণ্ড-বাসন খুব কম। তুমরা কলার পাতা আনতে পারবা?' অবশ্য থালা বাসন বাড়তি থাকলেও তাতে অচ্ছুৎদের ভাত বেড়ে দেবার মতো এতটা সংস্কারমুক্ত এখনও হয়ে উঠতে পারেনি উমানাথ।

লখী আর মটরু তৎক্ষণাৎ আগুনের কুণ্ডের পাশ থেকে উঠে গিয়ে কোত্থেকে যেন কলাপাতা নিয়ে আসে।

সরযূ কেরোসিনের ডেমি আগেই ধরিয়েছিল। এবার সে ভাতটাত বাড়তে থাকে। ডেমির আলোয় দাওয়ায় বসে উমানাথ আর তিন ছেলেমেয়ে ভাত খায়। নিচে আগুনের কুণ্ডের পাশে বসে খায় মটরুরা।

খাওয়া-দাওয়ার পর এঁটো কলাপাতাগুলো বাড়ি থেকে বহুদূরে ফেলে আসে ওরা। তারপর উঠোনের আগুন নিভিয়ে ছাইটাই পরিষ্কার করে জায়গাটা ধুয়ে নিকিয়ে দেয়।

এবার মটরু উমানাথ আর সরযূকে বলে, 'দেওতাকে কিরপাসে ভোজন হো গৈল। চার রোজ উপোস দিয়েছি। আর ভাত খেলাম দো মাহিনা বাদ।'

লখী বলল, 'হামনিও বালবাচ্চা নিয়ে তিন দিন উপোস দেবার পর আজ এই খেতে পেলাম। আর ভাতের মুখ দেখলাম তিন মাহিনা বাদ।'

বুড়ি মণিয়াও একই কথা বলল, সেও ক'দিন উপোস দেবার পর আজ খেতে পেল। ভাত তো তারা খেতে পায় না। লোকের বাড়ি গিয়ে হাত পাতলে হয়ত একমুঠো মাড়োয়া মেলে কিংবা খানিকটা বাজরা। বেশির ভাগ দিনই তাদের খাদ্য হলো ঘাসের দানার রুটি। ভাত তারা কালেভদ্রে খেতে পায়।

বরাম্ভনের বাড়ি পেট পুরে বহোত সন্তোষ করে তারা ভাত খেতে পেয়েছে।

ভগোয়ান জরুর উমানাথদের ভালাই করবে—এসব বলতে বলতে পূর্ণিমা জেলার হিমাক্ত রাত্তিরে চাঁদের শীতল আলো গায়ে মেখে তারা চলে যায়।

চার

সবাইকে খাইয়ে সরযূও একসময় খেয়ে নেয়। তারপর এঁটো কাঁটা পরিষ্কার করে বাসনকোসন ধুয়ে দক্ষিণের ঘরে বিছানা পেতে ফেলে।

পেটে ভাত পড়তেই ছেলেমেয়েগুলো ঢুলতে শুরু করেছিল, দু' চোখ ভেঙে ঘুম নেমে আসছিল তাদের। বিছানা পেয়েই কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিয়ে তারা শুয়ে পড়েছে।

উমানাথ কিন্তু কোনোকালেই রাত্রে খাওয়ার পর শুয়ে পড়ে না। সেই চরচিকন্দিতে থাকতে, শুধু চরচিকন্দি কেন, তার আগে ফরিদপুরের ভোজেশ্বর, ভোজেশ্বরের আগে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে,

তারও আগে বরিশাল কুমিল্লা ত্রিপুরা—এমনি কত কত জায়গায় রাত্তিরে খাওয়ার পর, কী শীত কী গ্রীষ্ম, বারোমাস ঘরের দাওয়াটিতে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবত। রাত হলে সরযূর ভাষায় তাকে যেন নিশিতে পায়। এককালে মানুষটার গানবাজনা যাত্রা আর ঢপের বেজায় শখ ছিল। কাঠের কলমের মাথায় দু পয়সার নিব লাগিয়ে সেই কলম কালির দোয়াতে চুবিয়ে রাত জেগে জেগে কত পালা কত গান বাঁধত উমানাথ। কী চমৎকার সব গানের কথা।

'তোমার লগে দেখা কইন্যা
কতকালের পর।
তোমার গলায় দিব বন্দু
গজমোতির হার।
আমার পরানে নূপুর বাজে রে—'

নিজের লেখা গানে নিজেই সুর দিয়ে গাইত উমানাথ। শুনতে শুনতে নেশা ধরে যেত সরযূর। সেসব যেন আরেক জন্মের কথা। ইদানীং ক' বছর অবশ্য গান টান বাঁধেনি উমানাথ। তবে রাত্রে কোথাও যাত্রা বা ঢপের আসর বসলে দৌড়ে গেছে, নইলে ঘরের দাওয়ায় বসে আকাশের দিকে অন্যমনস্কর মতো তাকিয়ে থেকেছে।

চরচিকন্দি থেকে বহু দূরে পূর্ণিয়া জেলার শেষ মাথায় ভিরৌলি গাঁয়ের এই নতুন বাড়িতে এসে অভ্যাসবশত রাতের খাওয়ার পরই শুয়ে পড়েনি উমানাথ। দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায় একখানা শতরঞ্চি বিছিয়ে তার ওপর বসে আছে।

সরযূ সব কাজকর্ম সেরে এক ছিলিম তামাক সেজে স্বামীর কাছে এল। বলল, 'এই ধর—'

দূরমনস্কর মতো হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা স্ত্রীর হাত থেকে নিল উমানাথ।

সরযূ আবার বলল, 'শুইবা না?

'এট্টু পরে।'

'আমার কিন্তু চৌখ ভাইঙ্গা আইতে আছে।'

'ঘুমাইবা, ঘুমাইবা। এট্টু বসো না—'

কতদিন এই রকম নিঝুম রাতে, চরাচর যখন ঘুমের অতলে ডুবে যায়, একান্তে স্বামীর গা ঘেঁষে বসেছে সরযূ। সারাটা দিন সংসারের জন্য নানা উঞ্ছবৃত্তিতে কেটে গেছে উমানাথের। কোথায় কোথায় টোটো করে ঘুরেছে সে। এই সময়টায় যা একটু তাকে পাওয়া যেত। উমানাথ অন্যমনস্ক থাকলেও তার সঙ্গে দু-একটা মনের কথা বলা যেত। আজ ইচ্ছা থাকলেও শরীরে দিচ্ছে না। কাল সন্ধ্যায় শিয়ালদায় ট্রেনে উঠেছিল তারা ; গাড়িতে ছিল গাদাগাদি ভিড়। সারারাত বিনা ঘুমে প্রায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আসতে হয়েছে। সকালে তারা এসেছিল সাহেবগঞ্জ সেখান থেকে হয়ে ছোট ট্রেনে সগরিগলি ঘাট, তারপর নদী পেরিয়ে মণিহারি ঘাটে এসে ফের ট্রেন। সেই ট্রেনে কাটিহার। কাটিহার থেকে আবার ট্রেনে পূর্ণিয়া। পূর্ণিয়া থেকে বয়েল গাড়িতে এই ভিরৌলি। একটানা পুরো চব্বিশটা ঘন্টা ট্রেন আর বয়েল গাড়ির ঝাঁকুনিতে শরীরের হাড় মাংস আলগা হয়ে গেছে। সরযূ বলে, 'আইজ আর না। শরীলে কিছু নাই। শুইয়া পড়ি গা---'

উমানাথ স্ত্রীর একটা হাত ধরে জোর করে পাশে বসিয়ে দেয়। বলে, 'এট্টু বইসা যাও—'

অগত্যা কী আর করা। পাশাপাশি বসে স্বামীর কাঁধে আস্তে করে মাথা এলিয়ে দেয়।

উমানাথ বলে, 'একহান কথা ভাবছি ধনবৌ—'

'কী?' উমানাথের কাঁধে মাথা রেখেই সরযূ জানতে চায়।

'একখান তুলসী গাছ না থাকলে বাড়িঘর মানায় না। দ্যাশ থনে তুলসীর বিচি আনছ না?'

'শিকড়ে মাটি লাগাইয়া কয়টা চারাও আনছি।'

'হেয়া (সে) কি আর তাজা আছে! শুকাইয়া মইরা গ্যাছে। যদি তাজা থাকে কাইল উইানে উই কোণে পুইতা (পুঁতে) মাটি দিয়ে মঞ্চ কইরা দিমু।' বলে উঠোনের পুবদিকটা দেখিয়ে দেয় উমানাথ।

'ভাল হইব।' বলতে বলতে স্বামীর কাঁধ থেকে আস্তে আস্তে মাথা তোলে সরযূ। বলে, আর উইখানে উই কুয়ার কাছে যে জামরুল গাছের বিচি আনছি তা রুইয়া দিমু।'

দেশ থেকে তারা শুধু তুলসী আর জামরুলের বীজই আনেনি, চরচিকন্দির বাড়িতে পরম মমতায় যা যা ফলফুলের গাছ লাগিয়েছিল—বরই, আম কালোজাম লটকা ডাঁটা লাউ কুমড়ো কাঁঠাল, ইত্যাদি সব কিছুর বীজও সঙ্গে করে এনেছে। কোন গাছটা কোথায় বুনবে, কীভাবে ধলেশ্বরীর চরে সেই চরচিকন্দির বাড়িঘরের ধাঁচে ভিরৌলি গাঁয়ের এই বাড়িটাকে সাজিয়ে তুলবে, তাই নিয়ে স্বামী-স্ত্রী বেশ খানিকটা সময় স্বপ্নাতুর হয়ে থাকে। এইভাবেই গত বিশ বছরে এক জায়গা ছেড়ে আরেক জায়গায় গিয়ে নতুন ঘর-সংসার পাততে পাততে দু'জনে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করেছে, নতুন করে জীবনকে সাজিয়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছে।

কথা বলতে বলতে আবার চোখ জুড়ে আসতে লাগল সরযূর, কথা জড়িয়ে যেতে লাগল। সস্নেহে স্ত্রীর কাঁধে একটু ঠেলা দিয়ে উমানাথ বলে, 'যাও ধনবৌ, শুইয়া পড় গিয়া!'

সরযূ হাই তুলতে তুলতে বলে, 'হ, যাই। তুমি যাইবা না? মেলা (অনেক) রাইত হইছে কিলাম---'

'আমি অরেট্টু বসি।'

সরযূ ঢুলতে ঢুলতে ঘরে চলে যায়। আর উমানাথ আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

সেই চাঁদটা এখন মাথার ওপর উঠে এসেছে। হিম পড়ছে গাঢ় হয়ে। চাঁদের আলোর সঙ্গে হিম মিশে সমস্ত চরাচর এখন অলীক স্বপ্নের মতো দেখায়।

এই ভিরৌলি গাঁয়ে কেউ জেগে আছে বলে মনে হয় না। এই নিশুতি রাতে কোথাও মনুষ্য জগতের কোনো শব্দ নেই। থেকে থেকে কোথায় যেন ঝিঁঝি ডেকে উঠছে। বহুদূর থেকে আচমকা কোন রাতজাগা পশু বা পাখির চিৎকার ভেসে আসে। এই সব শব্দ পূর্ণিয়া জেলার রাতের স্তব্ধতাকে যেন বহুগুণ গাঢ় করে তুলছে। মানুষ নামে এক জাতের প্রাণী যে পূর্ণিয়া জেলার এই প্রান্তে বাস করে, এখন তা মনেই হয় না।

অসংখ্য নক্ষত্রমালায় সাজানো আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন দুরন্ত এক পিছু টান অনুভব করতে থাকে উমানাথ। গোটা পূর্ব বাংলা জুড়ে কী আশ্চর্য ছড়ানো জীবন ছিল তাদের। ঠাকুরদার কথা বলতে পারবে না উমানাথ। তার খুব ছেলেবেলাতেই ঠাকুরদা মারা যায়। বাবা ছিল ভূমিহীন মানুষ। কখনও যজমানি করত, কখনও ঢপের দলে ক্ল্যারিওনেট বাজাত, কখনও কোনো গঞ্জের আড়তে খাতা লিখত। বাবার নির্দিষ্ট স্থায়ী কোনো জীবিকা ছিল না। যখন যা পেত তাই করত। সব কাজ তো হাতের কাছে বসে থাকে না যে কুড়িয়ে নিলেই হল। কাজ আর রোজগারের সন্ধানে জলবাংলার একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত স্ত্রী আর ছেলের হাত ধরে চষে বেড়িয়েছে বাবা। আজীবন দিনরাত খেটেও ছেলে উমানাথের জন্য এই পৃথিবীতে এক টুকরো জমি আর স্থায়ী একটা ঠিকানা রেখে যেতে পারেনি।

বাবার মতোই জীবনটা উমানাথের। পূর্ব বাংলায় বেদেদের বলে বেবাজিয়া। বেবাজিয়াদের মতো ফরিদপুর থেকে বরিশাল, বরিশাল থেকে কুমিল্লা, কুমিল্লা থেকে নোয়াখালি চট্টগ্রাম সন্দীপ হাতিয়া—কত জায়গায় না ঘুরেছে উমানাথ। ঘুরতে ঘুরতে একদিন বিয়ে হয়েছে তার, ছেলেমেয়ে হয়েছে। কিন্তু বাবার মতোই পৃথিবীর কোথায়ও নিজস্ব একটুকরো জমি বা ছোটো একটা বাড়ি সে করে উঠতে পারেনি।

ঘুরতে ঘুরতে বছর কয়েক আগে কমলাঘাটে এসেছিল উমানাথরা। বাপ এখানে ওখানে ঘোরা-ঘুরির ফাঁকেও ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত উমানাথকে পড়িয়েছিল। পেটে ক'টা কালির অক্ষর ঢুকে গিয়েছিল। তার জোরে কমলাঘাটের এক বড় ধানচালের আড়তে খাতা লেখার কাজ পেয়ে যায় উমানাথ। থাকত আড়তদারেরই বাড়ির এক যায় ধারে মুলি বাঁশের বেড়া আর টিনের চালওলা দু'খানা ঘরে।

নিজেদের দিন তো একরকম কেটে যাচ্ছিল কিন্তু নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে উমানাথ টের পেয়েছিল, ছেলেমেয়েদের খানিকটা লেখাপড়া শেখানো দরকার। অন্তত ম্যাট্রিকটা পাশ না করালেই নয়। তা না হলে নিজের বাপ-ঠাকুরদার মতো ছেলেপুলেদের সারা জীবন উঞ্ছবৃত্তি করে কাটাতে হবে।

মুখ কাঁচুমাচু করে একদিন আড়তদার হরিদাস সাহাকে সুরথের পড়াশোনার কথা বলেছিল উমানাথ। হরিদাস সাহা লোকটা বড় মাপের মানুষ, মনটা তার বিরাট। শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে কথা দিয়েছিল, উমানাথের বড় ছেলে সুরথকে ম্যাট্রিকটা পাশ করিয়ে দেবে। মিথ্যে স্তোক যে দেয়নি তার প্রমাণস্বরূপ পরের দিনই সুরথকে কমলাঘাটের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল।

কমলাঘাটে থাকতে থাকতেই চকচিকন্দির বৈকুণ্ঠ মালোর সঙ্গে আলাপ উমানাথের। ধলেশ্বরীর নতুন-জাগা চরে কিছু মালো আর নমঃশূদ্র বসত করেছে তখন। এ ছাড়া আছে বহু নিকারি মুসলমান। চাষবাস আর মাছ ধরাই ছিল তাদের একমাত্র জীবিকা। চরচিকন্দির ক্ষীরের মতো নরম নতুন মাটিতে ধানপাট, রবিশস্যের খন্দে মুগ-মুসুর, তিল-কলাই যার বীজই ফেলা যাক, গাছ ফনফনিয়ে বাড়ে। মাটি ওখানে তে-ফসলা—আউশ, আমন, বোরো, তিন বার ধান ওঠে। আর ধলেশ্বরীর জলে ছিল অফুরন্ত রুপোলি ফসল। কাজেই চরচিকন্দির প্রতিটি ঘর বোঝাই ছিল ধান চাল মুগমুসুর কলাইপাটে, সবার হাতে ছিল অঢেল কাঁচা পয়সা। পেটের ভাবনা না থাকলে আর হাতে পয়সা থাকলে মাথায় আরও কিছু চিন্তা আসে। নিকারি মালো আর নমঃশূদ্ররা মিলে ঠিক করেছিল ছেলেপুলেদের পেটে কিছু কালির অক্ষর ঢোকাবে। মাবাপদের মাথায় হাতুড়ি মারলেও তো 'ক' অক্ষর বেরুবে না। কিন্তু ছেলেপুলেরা একটু আধটু ক—ব—ঠ শিখুক। পিরথিমীতে এসে ধানপাট রুইল কী মাছ মারল, তারপর বিয়ে শাদি, গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চার জন্ম—অবশেষে পট করে একদিন চিতায় উঠল, নইলে কবরে মাটির তলায় শুয়ে রইল। চরচিকন্দির বাসিন্দাদের আকাঙ্ক্ষাজজ ম্যাজেস্টর হওয়ার দরকার নেই, তাদের ছেলেমেয়েরা একটু আধটু লেখাপড়া শিখে জগতের হালচাল খানিকটা বুঝুক, তাদের চোখ কিছুটা ফুটুক। তাই ওরা চরচিকন্দিতে একটা ছোটখাটো স্কুল খুলতে চায়। কিন্তু চরে গিয়ে থাকার মতো লোক পাওয়া যাচ্ছে না। ঢেউ টিনের চাল আর ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া দিয়ে স্কুলের জন্য প্রকাণ্ড সাতাশের বন্দের দু'খানা ঘর তুলেছে তারা। কিন্তু মাস্টার না জোটায় স্কুল খোলা যাচ্ছে না।

বৈকুণ্ঠ মালো আরও জানিয়েছিল, যদি কোনো মাস্টার চরচিকন্দি গিয়ে পাকাপাকি থাকতে রাজি হয় তাকে পনেরো কানি চাষের ক্ষেত আর বসতের জন্য আরও খানিকটা জমি দেওয়া হবে।

এমন একটা সুযোগ ছাড়েনি উমানাথ। সারা জীবন ধরে সে যা চেয়ে এসেছে, নিজের এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য পৃথিবীর কোথাও নির্দিষ্ট স্থায়ী একটা ঠিকানা আর সামান্য একটু জমি—সেই কাম্য বস্তুগুলি তার মধ্যবয়সে হাতের মুঠোয় অপ্রত্যাশিতভাবে চলে এসেছিল।

উমানাথ সোজা গিয়ে হরিদাস সাহাকে সব বলে জিজ্ঞেস করেছিল, আমি চরচিকন্দিতে যাওন মনস্থ করছি। আপনে কী ক'ন সা' মশয়?'

হরিদাস সাহা প্রবীণ মানুষ। উমানাথের চাইতে কম করে বিশ বছরের বড়। জীবন সম্পর্কে তার বিপুল অভিজ্ঞতা।

ব্রাহ্মণ বা গুরুটুরু সম্পর্কে হরিদাস সাহার প্রচুর ভক্তিশ্রদ্ধা। সে বলেছে', নিচ্চয় যাইবেন ঠাউর কর্তা, এই সুযুগ ছাড়ন ঠিক হইব না।'

'কিন্তুক সুরথ—'

'সুরথের ভার আমার। অরে (ওকে) আমাগো কুলগুরু বৃন্দাবন গোসাইয়ের কাছে রাইখ্যা দিমু। বামনের পোলা বামনের বাড়িত্ থাকব। ছুটি হইলে তারে নিয়া যাইবেন, আবার ইস্কুল খুললে দিয়া যাইবেন।'

হরিদাস সাহার ব্যবস্থা অনুযায়ী সুরথ কমলাঘাটে থেকে যায় আর উমানাথ পঞ্জিকায় শুভদিন দেখে সরযূকে নিয়ে নৌকোয় চেপে ধলেশ্বরী পাড়ি দেয়।

চরচিকন্দিতে এসে জীবনের প্রথম নিজস্ব মাটিতে বড় যত্নে দু'খানা ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘর তোলে উমানাথ। পরম মমতায় সরযূ বাড়ির চারপাশের জমিতে ফলের গাছ ফুলের গাছ, লাগায়। স্কুল চালানোর ফাঁকে ফাঁকে কিষাণ লাগিয়ে জমি চাষ করায় উমানাথ, ধান পাট কাটায়, তিল তিসি বোনায়। ছুটির সময় ধলেশ্বরী পার হয়ে সুরথকে নিয়ে আসে।

সারা বছর ঘর বোঝাই থাকে ধান পাটে, রবিশস্যে। টিনের বাক্স বোঝাই থাকে যষ্ঠ জর্জের ছবি

আঁকা রুপোব কাঁচা টাকা আর নোটে। আজন্ম অস্থিব ছোটাছুটির পর সেই তার স্থিতি। কী সুখী দুর্ভাবনামুক্ত সুস্বাদু জীবন তখন তার! বারোমাস তাব জমিতে হয় ধানের চাবা, নইলে মুগমুসুরেব সজীব গাছগুলি ফনফন করে! দেখেও সুখ।

এদিকে উমানাথের যা বিদ্যাবুদ্ধি, চরেব স্কুল চালাবাব পক্ষে তা যথেষ্ট। প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ সড়গড় হবার পর একটু আধটু পড়তে লিখতে পাবলেই হল, অমনি বাপেরা তাদের ছেলেমেয়েদেব স্কুল ছাড়িয়ে চাষের কি মাছ মারার কাজে লাগিয়ে দিত। তারা চলে গেলে আবার আসত নতুন ছেলেবা। তারা গেলে তাদের জায়গা বোঝাই হতো আরেক দল দিয়ে। কাজেই ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়া উমানাথের এই স্কুল চালাতে এইটুকু অসুবিধা হয়নি।

এইভাবেই দিন যাচ্ছিল। উমানাথ যখন নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভাবনাশূন্য সেইসময় অচমকা দেশ দু' ভাগ হয়ে গেল।

দেশভাগেব আঁচ ধলেশ্বরীর নতুন-জাগা চরে প্রথম দিকে টের পাওয়া যায়নি। তবে খবর পাওয়া যাচ্ছিল, নদীর ওপারের গ্রামগুলোতে ভাঙন ধরেছে। সাত পুরুষের ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে হাজার হাজার মানুষ কলকাতা আসাম আর ত্রিপুরাব দিকে চলে যাচ্ছে। কমলাঘাট থেকে সেবার সুরথকে আনতে গিয়ে উমানাথ শুনে এসেছিল, শুধু তাদের ঢাকা জেলা থেকেই না, ফরিদপুর যশোব খুলনা নোয়াখালি সিলেট কুমিল্লা—সব জায়গা থেকেই ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

দেশজোড়া বাড়া আগুন শেষ পর্যন্ত চরচিকন্দিতে এসেও লাগল। মালোরা আর নমঃশূদ্রবা একে-একে বাড়ি ফেলে চলে যেতে লাগল। তাদের পরিত্যক্ত ভিটেমাটির খানিকটা দখল করে নিল চরচিকন্দিরই নিকারিরা ; বাদবাকি বাড়িঘরে এসে উঠল বিহারী মুসলমানেরা। তারা মালো আব নমঃশূদ্রদের সঙ্গে বাড়ি আর জমি এক্সচেঞ্জ করে নিয়েছিল। অর্থাৎ বিহারীরা চবচিকন্দিতে এসে বসল আর বিহারে তাদের ফেলে-আসা বাড়িঘবে চলে গেল ধলেশ্বরীচরের বাসিন্দাবা।

এই অবস্থায় চরচিকন্দিতে থাকা যায় না। কী করা উচিত, কী করলে ভালো হয়, এ-সব জানাব জন্য ধলেশ্বরী পাড়ি দিয়ে কমলাঘাটে হরিদাস সাহার গদিতে এল উমানাথ। হরিদাস বহুদর্শী অভিজ্ঞ মানুষ, তা ছাড়া সে তার শুভাকাঙ্ক্ষী। হরিদাস পরামর্শ দিল, 'দিনকাল ভালা না ঠাকুরকর্তা, ইণ্ডিযায় যান গিয়া। আমরাও বাড়িঘর 'একচেন (এক্সচেঞ্জ) কইরা কইলকাতায় যামু গা।'

গভীর মমতায় আর যত্নে গড়ে তোলা চরচিকন্দির বড় সাধের বাড়িঘর ছেড়ে যেতে প্রথম দিকে বুক ফেটে যাচ্ছিল উমানাথদের। কিন্তু পরে সে নিজেকে বুঝ মানিয়েছে, এ ছাড়া উপায়ই বা কী? চরচিকন্দিতে যে বিহারীরা এসেছিল তাদের কাছে খোঁজ নিতে এই ভিরৌলি গাঁয়ের আরেফিন মিঞার খবর পেয়েছিল উমানাথ। আরেফিন ঘরবাড়ি এক্সচেঞ্জ করে পাকিস্তানে চলে আসতে চায়। খবরটা পাওয়ামাত্র ছেলেমেয়ে বউকে কমলাঘাটে হরিদাস সাহাব বাড়িতে রেখে প্রথমে একাই সে ভিরৌলিতে এসেছিল। আরেফিনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তার বাড়ি আর পনেরো বিঘার মতো খেতি দেখেছিল। তারপর তাকে সঙ্গে করে চরচিকন্দিতে এনে নিজের জমিজমা বাড়ি দেখিয়ে ঠিক করেছিল পবস্পবের সম্পত্তি তারা 'একচেন' করবে।

আরও একবার ভিরৌলিতে আসতে হয়েছিল উমানাথকে। আরেফিন মিঞা তাকে পূর্ণিয়ার কোর্টে নিয়ে নিজের বাড়িঘর তার নামে লেখাপড়া করে দিয়েছিল। ওদিকে আরেফিনও পূর্ব বাংলায় গিয়ে মুন্সিগঞ্জের কোর্টে উমানাথের বিষয় সম্পত্তি বুঝে নিয়েছিল।

তারপর আজ তারা পৃথিবীর সুদূর প্রান্তে এই ভিরৌলি গ্রামে চলে এল আর আরেফিন মিঞারা চলে গেল ধলেশ্বরী নদীর চরে।

অসংখ্য নক্ষত্রে সাজানো যে আকাশ উমানাথ চরচিকন্দিতে দেখে এসেছে, ভিরৌলিতেও সেই একই আকাশ, একই তারার মেলা, রুপোর থালার মতো একই চাঁদ, একই বায়ুপ্রবাহ দুই দেশের মাঝখানের অদৃশ্য দেওয়াল ভেঙে বয়ে চলেছে। সবই এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। শুধু তার মতো কিছু মানুষ ওদেশ থেকে এদেশে চলে এল, কিছু মানুষ এদেশ থেকে ওদেশে গেল।

কেন যে দেশভাগ হয়!

পাঁচ

দিন দুয়েকের ভেতর সংসার মোটামুটি গুছিয়ে ফেলল সরযূ। দেশ ছেড়ে আসার সময় গোড়ায় মাটি বসিয়ে যে তুলসীর চারাগুলো আনা হয়েছিল, উঠোনের পুব কোণে মাটির উঁচু মঞ্চ করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। নেতিয়ে পড়া গাছগুলোর মধ্যে জীবনীশক্তি অটুট ছিল, শিকড়ে জলটল পেয়ে আবার তারা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তুলসীগাছই না, বাড়ির চারপাশ ঘিরে আম-জাম লাউ-কুমড়ো এবং কিছু কিছু দেশি ফুলগাছের বীজ লাগিয়েছে। একজোড়া টিয়াও সঙ্গে করে এনেছিল, পাখির খাঁচাটা সারাদিন পুবের ঘরের বারান্দায় চালের বাতা থেকে ঝুলতে থাকে। সন্ধে হলেই ওটাকে ঘরে ঢুকিয়ে ফেলে জবা। এই দু' দিনে কতবার যে সরযূ বাড়িঘর ধুয়েছে মুছেছে তার হিসেব নেই। অবশ্য তার সঙ্গে ছেলেমেয়েরা এবং উমানাথ হাতে হাতে অনেক কাজ করে দিয়েছে। শুধু কি তারা নিজেরাই—রামনগিন আজুলাল অবোধী, পাশের বাড়ির আলি রেজারা সময় পেলেই ছুটে এসে এটা-সেটা করে দিয়েছে।

সরযূ বলেছে, 'এইহানকার মানুষজন বড় ভালা।'

উমানাথ বলেছে, 'তুমি তো আগেই ডরাইয়া গেছিলা।'

'কী করুম, আগে কি এইহানে আইছি? এই মানুষগুলানের লগে থাকছি?'

'হেয়া (তা) ঠিকই।'

আজ শুক্রবার।

দুপুর পার হয়ে গেছে খানিকটা আগে। বেলা হেলতে শুরু করেছে।

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় বসে আয়েশ করে তামাক খাচ্ছিল উমানাথ। ছেলেমেয়েদের এবং সরযূরও খাওয়া হয়ে গেছে। গৌর আর জবা পূবের ঘরের বারান্দায় শতরঞ্চি পেতে সারা গায়ে কাঁথা জড়িয়ে গড়াচ্ছে। সুরথ বাড়ি নেই, খেয়েই কোথায় বেরিয়ে পড়েছে। খুব সম্ভব ঘুরে ঘুরে নতুন জায়গাটা দেখছে। আর সরযূ বাসনকোসন নিয়ে কুয়োর পাড়ে মাজতে বসেছে।

তামাক খেতে খেতে নিজের নতুন বাড়িঘর দেখছিল উমানাথ। চারিদিক ঝকঝক করছে। সরযূর এই এক স্বভাব, নতুন কোনো জায়গায় যাবার আগেই তার যত ভয় আর সংশয়। কিন্তু একবার সেখানে গিয়ে উঠলে গভীর আগ্রহে আর মমতায় সে তাকে ঘিরে ধরে ; দু' চোখে ভবিষ্যতের অপার স্বপ্ন নিয়ে নতুন জায়গায় নিজের ঘর-সংসার সাজিয়ে তোলে।

বাড়িঘর দেখতে দেখতে আরেফিনের যে পনেরো বিঘা জমি পেয়েছে তার কথা ভাবছিল উমানাথ। এখন মাঘের শেষ, রবি চাযের জন্য হাতে সময় খুব অল্পই আছে। তবু আজকালের মধ্যে কিষান জোগাড় করতে হবে, নইলে এবারের রবির খন্দটা মার খাবে।

এইসময় পাশের বাড়ির আলি রেজা এসে উঠোনে বসল। বরাম্ভনের ঘরে কি দাওয়ায় সেও উঠবে না?

আলি রেজাকে হাতের কাছে পেয়ে ভালোই হল। তার কাছে কিযানদের ব্যাপারটা জেনে নেওয়া যাবে। উমানাথ বলে, 'একহান খবর দিতে পারেন মিঞাভাই?'

আলি রেজা বলে, 'কা?'

'রবির মুসুম (মরসুম) আইসা গ্যাছে, মুগ-মুসৈর, কলই তো লাগাইতে অইব। চাষ করানের কিষান পামু কই?'

আলি রেজা মাথা এবং কাঁচাপাকা দাড়ি নেড়ে জানায়, ভিরৌলি এবং আশেপাশের দশ বিশখানা গাঁয়ে এটা বহোত ভারি সমস্যা। এখানকার যারা চাষের কাজ জানে তারা সবাই কায়াথ রাজা ত্রিলোকীপ্রসাদের বাঁধী কিষান—সোজা কথায় ভূমিদাস। তারা ত্রিলোকীপ্রসাদেরটা ছাড়া আর কারো জমি চষতে পারবে না।

উমানাথ বলে, 'রাজার জমিন ছাড়াও অন্য মাইনষের তো জমিন আছে। তারা কারে দিয়া চাষ করায়?'

'ইঁহা আমার, আরেফিন মিঞা আউর দো-চার আদিমির থোড়া কুছ কমিন আছে। এ বাদ তিন চার মিল'কা মোইলের অন্দর আউর কিসিকা কুছ নেই।'

উমানাথ অবাক হয়ে যায়। বলে কি লোকটা? সে জিজ্ঞেস করে, 'তাইলে চকের পর চক জুইড়া যে এত জমিন, হেইগুলি কার?'

'রাজা তারলোকীজিকা। চারদিকের বিশ পঁচাশটা দেহাতের বেশিব ভাগ আদমি রাজার জমিনে খোরাকির বদলে কিষান খাটে।'

কথাটা মোটামুটি আগেই শুনেছে উমানাথ। শুনেছেই শুধু, তখন ব্যাপারটা ভালো করে তলিয়ে বোঝেনি। একটু ভেবে সে বলে, 'মেঞাভাই, আপনের জমিন চাষ করান কেমনে?'

আলি রেজা বলে, 'খুদই আপনা হাতসে কুছ করতা। আউর নওলপুরাসে সাঁওতাল কিষানকো লেকে আতা হ্যায়। কাল আমি নওলপুরার হাটে যাব। হামনিকো সাথ যদি যান, কিষান ঠিক করে দেব।'

'বড় উপকার হয় তাইলে—' বলতে বলতেই উমানাথের খেয়াল হয় সে একা তামাক খেয়ে চলেছে। অথচ আলি রেজাকে এখনও আপ্যায়ন করা হয়নি। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে একটা নতুন কলকেতে তামাক সেজে আগুন টাগুন দিয়ে উঠোনের কোণে নামিয়ে দেয় উমানাথ। বলে, 'এট্টু নিশা (নেশা) করেন মেঞাভাই।'

এরপর দু'টো কলকে থেকে সুগন্ধি তামাকের ধোঁয়া মাঘের বাতাসে মিশে যেতে থাকে।

খানিকক্ষণ ভুক ভুক করে হুঁকো টানার পর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায় উমানাথের। দ্বিধান্বিতের মতো খানিকক্ষণ বসে থেকে সে বলে, 'একহান কথা জিগামু মেঞাভাই, রাগ কইরেন না—'

আলি রেজা বলে, 'আরে নায় নায়, আপ মেরা বড়ে ভেইয়া য্যায়সা, বলিয়ে না—'

'আপনেগো জাইতের হগলেই (সবাই) তো পাকিস্থান গ্যাছে গা। আপনে গ্যালেন না ক্যান?'

'কা, পাকিস্তান হামনিকো দেশ? এটা আমার দাদার ভিটে, আমার আব্বাজান এখানে পয়দা হয়েছে, আমি পয়দা হয়েছি, আমার বালবাচ্চা পয়দা হয়েছে। পচাশ ষাট সাল হামনিলোগ এখানে আছি। ইধরি হামনিকা বেহেস্ত্ হ্যায়। এ ছোড়কে কভি কিধারভি নায় যায়েগা। মরনা হ্যায় তো ইধরিই মরেগা।'

আলি রেজার কথা শুনতে শুনতে লোকটার ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায় উমানাথের। সাতপুরুষের ঘর ভদ্রাসন যা স্বর্গবাসের চাইতেও অনেক বেশি কাম্য, তা ছেড়ে কোথায় যাবে সে? আর কেনই বা যাবে? তার জাতপাতের লোকেরা ভিরৌলি ছেড়ে একে একে চলে গেছে কিন্তু দুর্জয় সাহস আর জন্মভূমির প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা আর আনুগত্য নিয়ে সে এখানকার মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে।

উমানাথ কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই দূরের কাঁচা রাস্তায় বহু মানুষের গলার স্বর ভেসে এল। সেদিকে তাকাতেই তার চোখে পড়ল বিরাট একটা হাতির পিঠে ছত্রি বসানো, তার তলায় কলিদার পাঞ্জাবি আর চুস্ত-পরা একজন মধ্যবয়সী বলশালী পুরুষ বসে আছেন। ছত্রির এধারে ওধারে আরও জনাকয়েককে দেখা যাচ্ছে। হাতিটার একেবারে ঘাড়ের ওপর বসে আছে মাহুতটা। আর পায়ে হেঁটে হাতির পিছু পিছু চলেছে এক দঙ্গল দুর্দান্ত স্বাস্থ্যবান লোক। তাদের হাতে হয় বর্শা, নইলে লাঠিটাঠি আর টিনের ক্যানেস্তারা।

গাঁয়ের পাশ দিয়ে হাতি যেতে দেখে ভিরৌলির লোকজনেরা দৌড়ে বেরিয়ে এসেছে। এ গাঁয়ে হাতি যাওয়ার ব্যাপারটা দারুণ উত্তেজনা এবং বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। সবাই খুব চেঁচামেচি করছিল। দাওয়ায় বসে তাই দেখতে পাচ্ছে উমানাথ। কয়েক পলক দেখে নিজের অজান্তেই সে উঠোনে নেমে পড়ল। তারপর বাতাবি লেবু গাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়াল। এখান থেকে হাতির শোভাযাত্রাটা আরও ভালো দেখা যাচ্ছে। সরযূও বাসনটাসন ফেলে উমানাথের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

আলি রেজাও তার সঙ্গে সঙ্গে উঠোন থেকে উঠে এসেছিল। পাশ থেকে সে বলে, 'রাজা তারলোকীজি (ত্রিলোকীজি) শিকার খেলতে পূর্ণিয়ার জঙ্গলে চলেছে।'

এই তা হলে নবলপুরার কায়াথ রাজা ত্রিলোকীপ্রসাদ? পূর্ণিয়া জেলার এই সুবিশাল মাঠ প্রান্তর জঙ্গল-পাহাড় ঘিরে যে ভূমণ্ডল, তার অধীশ্বর? সে জিজ্ঞেস করল, 'উই মানুষগুলান কারা—উই যে লাঠিডাণ্ডা লইয়া লগে লগে যাইতে আছে?'

'জঙ্গল-হাঁকোয়া। জঙ্গলে ঢুকে ওরা শোর তুলে জান্‌বরদের রাজার বন্দুকের সামনে নিয়ে আসবে। রাজা তখন শিকারের ওপর গোলি চালাবে।'

জঙ্গল-হাঁকোয়াদের কথায় হাত-কাটা মটরুর মুখটা মনে পড়ে যায় উমানাথের। সেই যে সেদিন রাত্রে চাট্টি ভাত খেয়ে সে চলে গেল, তারপর থেকে আর আসেনি। শুধু সে-ইও না, লখী এবং তার কাচ্চাবাচ্চারা কিংবা বুড়ি মণিয়া—কেউ না।

উমানাথ আলি রেজাকে কিছু বলার জন্য ঘাড় ফেরাতে যাবে সেই সময় দেখা গেল হট্টাকাট্টা চেহারার আলিসান এক জোয়ান, হাতে পাকানো লাঠি—এদিকেই এগিয়ে আসছে। একটু অবাকই হয়ে গেল উমানাথ, সেই সঙ্গে ভেতরে ভেতরে ভয়ও হতে লাগল। ঘাড় ফিরিয়ে সরযূর দিকে তাকিয়ে দেখল, স্ত্রীর মুখখানা শুকিয়ে গেছে।

সরযূ ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এক্কেরে ডাকাইতের লাখান (মতো) দেখতে; আমাগো বাড়িত্ আইতে আছে মনে লয়—'

স্ত্রীকে ভরসা দেবার জন্য উমানাথ বলে, 'আসুক না, ডরের কী। অমরা চোর না ডাকাইত? কোর্টে (কোর্টে) লিখাপড়া কইরা (তবে) না এই বাড়িতে ঢুকছি।'

ততক্ষণে বিরাট চেহারার সাই জোয়ান লোকটা কাছে এসে পড়েছে। জঙ্গল-হাঁকোয়া হলে হবে কী, রাজার সঙ্গে শিকারে যাচ্ছে বলে লোকটা যেন দু' মাইল উঁচু থেকে দুনিয়াকে দেখছে। রীতিমতো তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতেই সে বলে, 'উমানাথ কৌন হো?'

এই লোকটা তার নাম জানল কী করে? উমানাথের বুকের ভেতর হৃৎদ্‌পিণ্ডটা কয়েক পলক থমকে থাকে। ভীরু গলায় সে জিজ্ঞেস করে, 'আইজ্ঞা আমি। ক্যান?'

লোকটা বলে, 'পাকিস্থানসে তুম দো রোজ আগে এসেছ?'

'হ।'

'ঠিক হ্যায়। রাজাসাব হুকুম দিয়া, কাল উনকো সাথ ভেট-মুলকাত করনা। সমঝা?'

যে হৃৎপিণ্ডটা থমকে গিয়েছিল, এবার সেটা দারুণ জোরে লাফাতে থাকে। রাজা ত্রিলোকীপ্রসাদ তাকে চিনলেনই বা কী করে আর কেনই বা তাকে দেখা করতে বলেছেন, উমানাথ ভেবে পায় না। অদ্ভুত এক ত্রাস তার হাত-পায়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। সে বলে, 'রাজা সাবের লগে কুনহানে দেখা করুম ভাই?'

'নওলপুরা—রাজা সাহাবকা হাভেলিমে।' বলে আর দাঁড়ায় না লোকটা, দৌড়তে দৌড়তে রাজার শিকার পার্টির মিছিলে মিশে যায়। একটু পর পূর্ণিয়া জেলার ফাঁকা শস্যক্ষেত্র পেরিয়ে শোভাযাত্রা ধূ-ধূ বনভূমির দিকে অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে।

বাতাবি লেবুগাছের তলা থেকে ঘরের দিকে ফিরে আসতে আসতে উমানাথ আলি রেজাকে জিজ্ঞেস করে, 'রাজা সাবে আমার লাখান মাইনষেরে ক্যান ডাকল কইতে পার?'

আলি রেজা বলে, 'কা জানে। মালুম নেহী।' তাকেও বেশ চিন্তিত দেখায়।

এরপর বাকি দিনটা অত্যন্ত দুর্ভাবনা এবং উৎকণ্ঠায় কেটে যায় উমানাথের। রাতেও ভালো করে ঘুমোতে পারে না সে।

ছয়

পরের দিন শনিবার। সপ্তাহের এই দিনটিতে নবলপুরায় শনিচারীর হাট বসে।

আজ সকালে বেশ তাড়াতাড়িই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল উমানাথ। ডেকে ডেকে সুরথকেও তুলে ফেলল। কাল একসময় এসে রামনগিন বলে গিয়েছিল, আজ রোদ উঠবার সঙ্গে সঙ্গে সে এসে তাদের শনিচারীর হাটে নিয়ে যাবে। আলি রেজাও হাটে নিয়ে যাবার কথা বলেছিল।

অন্ধকার থাকতে থাকতে ঘুম থেকে ওঠা সরযূর চিরকালের অভ্যাস। আজও উমানাথদের আগেই সে উঠে পড়েছিল। বাসি কাপড় ছেড়ে তুলসীতলায় প্রণামটি সেরে কাঠকুটো জ্বেলে সে ফেনাভাত চাপিয়ে

দিয়েছে। স্বামী আর ছেলে খেয়ে হাটে যাবে। অবশ্য চিরদিনই সকালে তারা আলু কচু বা ডাল সিদ্ধ দিয়ে ফেনাভাত খায়।

মুখটুখ ধুয়ে সুরথ আর উমানাথ খেতে বসে গেল। ওরা যখন খেয়ে উঠল সেইসময় রামনগিন আর আলি রেজা এসে হাজির।

হাটে কেনাকাটা করার জন্য কিছু টাকাপয়সা পকেটে গুঁজে উমানাথ স্ত্রীকে বলে, 'যাই ধনবৌ-—' শনিচরীর হাটে তো যাবেই সে। সেই সঙ্গে ত্রিলোকীপ্রসাদের সঙ্গেও দেখা করতে হবে।

এমনিতে সরযূর ঘুমটা বেশ গাঢ়ই। যতক্ষণ ঘুমোয়, কোনো সাড় থাকে না। কিন্তু কাল রাত্রে উদ্বেগে সে-ও ভালো করে ঘুমোতে পারেনি। কাঁপা গলায় সরযূ বলে, 'ভালোমতো আসো গিয়া। ক্যান যে রাজা সাবে ডাকল, ভগমান জানে। অমাগো যা কপাল কুনোখানে থিতু হইয়া বইতে পারি না।'

কালকের সেই দুর্ভাবনা আর উৎকণ্ঠা অনেকখানি কাটিয়ে ফেলেছিল উমানাথ। সে বলে, 'যা হওয়ার তা-ই হইব। তুমি আমি ভাইবা কী করুম ধনবৌ। আইচ্ছা যাই গা—'

রামনগিনদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে উমানাথরা। পেছন থেকে দু হাত কপালে ঠেকিয়ে চোখ বুজে সরযূ বিড় বিড় করে বলতে থাকে, 'হে মা দুগ্‌গা, রক্ষা কইরো মা—রক্ষা কইরো।'

ভিরৌলি গাঁয়ের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে দুসাদটোলা, তাৎমাটোলা, ধাঙড় টোলা— এমনি নানা পাড়া থেকে থেকে অনেক লোকজন তাদের সঙ্গে শনিচারীর হাটের দিকে চলতে লাগল।

ভিরৌলি গাঁয়ের পুব দিক ঘেঁষে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা সড়ক গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে এসে উঠল উমানাথরা। আর উঠতেই দেখা গেল, একটা বয়েল গাড়ি ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করতে করতে মাটিতে চাকার দাগ বসিয়ে এগিয়ে চলেছে। গাড়িটা অন্য দশটা বয়েল গাড়ির মতো নয়। এটার ছত্রি ঝকঝকে টিনের তৈরি। ভেতরে রোদের তাত থেকে গা বাঁচাবার জন্য পালিশ করা দামি কাঠের প্যানেল। ছত্রির মাথায় নানা রঙের কারুকাজ। নিচের পাটাতন ফালা-করা বাঁশের নয়-মূল্যবান কাঠের। তার ওপর লাল মখমলে মোড়া পুরু গদি, সওয়ারির আরামের জন্য ঝালর-বসানো গির্দা বালিশ আর তকিয়া রয়েছে। দু'টো তেজি হরিয়ানা বয়েল গাড়িটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

বয়েল গাড়িটায় একজনই মাত্র সওয়ারি। সওয়ারি না—সওয়ারিন। সে এক পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবতী। গায়ের রং মাজা মাজা। খুঁটিয়ে দেখলে তার সর্বাঙ্গে অনেক খুঁত ধরা পড়বে। কিন্তু মেয়েটার চেহারায় পর্যাপ্ত পরিমাণে যা আছে তা হল উদ্দাম বুনো স্বাস্থ্য আর চটক। এমন চটকদার চেহারা ক্বচিৎ কখনো চোখে পড়ে। মেয়েটার মাঝারি চোখ খঞ্জনের মতো ছটফটে। সেই চোখে সরু করে কাজলের টান, দুই ভুরুর মাঝখানে সাপের উলকি আঁকা। কমলার কোয়ার মতো মোটা বসালো ঠোঁটের ওপর লাল মসুর ডালের মতো একটা তিল। ঘন চুলে মহুয়া ফুল গোঁজা। মোটা মোটা দুই হাতের পাতায় মেহেদির নকশা। কবজিতে চাঁদির ভারী কাঙনা, কানের লতির মাঝখান থেকে রুপোরই এক থোকা করে ঝুমকো ঝুলছে। নাকে লাল পাথর বসানো নাকফুল, কোমরে পৈছা, গলায় রুপোর সীতা হার, চার আঙুলে চার আংটি, পায়ের আঙুলে চটুকি। পরনে দেহাতি ধরনে ডগডগে লাল সিল্কের শাড়ি। তার দিকে তাকানো মাত্র চোখদু'টো চুম্বকের মতো সে যেন টেনে নেয়।

বয়েল গাড়ির ছইয়ের তলায় বসে মেয়েটা রামনগিনদের দেখতে পেয়েছিল। চোখাচোখি হতেই মিষ্টি করে হাসল। তারপর রামনগিনকে বলল, 'শানচরীকা হাটোমে যাতা হ্যায় চাচা?'

রামনগিন বলল, 'হঁ। তু কব আয়ী চান্দেরি।'

'কাল সামকো। মাঈকো বুখার। দাওয়া (ওষুধ) দেকে লৌট যাতী—'

'কাল আয়ী, আজ লৌটতী?'

'কা করে ; ঘরমে রহ্‌নাকা হুকুম মিলা নায় চাচা—' চান্দেরীর চোখেমুখে বিষাদের ছাপ পড়ে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রামনগিন বলে, 'হো রামজি, তেরে মর্জি—'

কথা বলতে বলতে বার বার চান্দেরির চোখদু'টো উমানাথের ওপর এসে পড়ছিল। এবার সে বলে, 'আপ ভিরৌলিমে নয়া আয়া—নায়?'

উমানাথ লক্ষ করেছিল, চান্দেরির কথাবার্তা পুরোপুরি দেহাতি ধরনের না। তার ওপর কিছুটা শহুরে পালিশ আছে। তার তাকানো এবং বলার ভঙ্গি বেশ মাজাঘষা। সে বলল 'হ।' একটু চিন্তা করে মেয়েটাকে তুমি না আপনি বলবে সেটা ঠিক করে নিল। তারপর ফের বলল, 'তুমি জানলা কেমনে?'

চান্দেরি জানায়, এই ভিরৌলি এবং তার আশেপাশের দশ বিশটা গাঁয়ের সবাইকেই সে চেনে। উমানাথের মতো একজন অচেনা লোককে দেখে তার মনে হয়েছে, সে এখানকার নতুন বাসিন্দা। তা ছাড়া উমানাথের আসার কথা সে আগেই পেয়েছিল।

রামনগিন পাশ থেকে বলে, 'উনি বরাম্ভন—দেওতা।'

দু' হাত জোড় করে সসম্ভ্রমে এবং সাষ্টাঙ্গে চলন্ত গাড়ির পাটাতনে শুয়ে পড়ে প্রণাম করে চান্দেরি। বলে, 'নমস্তে দেওতা।'

ব্রাহ্মণের প্রতি এরকম অটুট ভক্তি দেখে খুশিই হয় উনানাথ, আবার কিছুটা বিব্রতও বোধ করে। ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য আজন্ম প্রণাম পেতে সে অভ্যস্ত। এগুলো তাদের জন্ম সূত্রেই পাওনা। উদাসীন মুখেই সে এতকাল এ-সব নিয়ে এসেছে। তবু ওইরকম একটা চটকদার সুন্দরী মেয়ে প্রণাম করতে সে বলে, 'নমস্কার নমস্কার। ভগবান তুমার মঙ্গল করুক—'

চান্দেরি বলে, 'ভগেয়ান হামনিকো কা কিয়া হামনিই জানতী দেওতা—' তারপর উমানাথকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আবার বলে ওঠে, 'শানচারীর হাটে যাচ্ছেন?'

'হ।'

'হামনিভি উধরি যাতী হ্যায়। আপ বরাম্ভন, আপ পায়দল (পায়ে হেঁটে) যাচ্ছেন আর আমি গাড়ি পর। বহোত বুরাইকা বাত। লেকেন দেওতা, আপনাকে তো গাড়িতে করে লিয়ে যেতে পারব না।'

উমানাথ ব্যস্তভাবে বলে, 'না—না, কুনো দরকার নাই। আমরা হাইটাই (হেঁটেই) যাইতে পারুম। তুমি গাড়িতে যাও গা।'

তেজী বয়েলে-টানা চান্দেরিদের গাড়িটা এগিয়ে যেতে থাকে। উমানাথরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে। এক সময় উমানাথ রামনগিনকে জিজ্ঞেস করে, 'চান্দেরি খুব বড় ঘরের লেড়কি—না?' তার কথায় এই ক'দিনের মধ্যেই দু-একটা স্থানীয় শব্দ ঢুকে গেছে।

রামনগিন তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'আরে নায় নায়। ও তো গঞ্জুদের লেড়কি—আমাদের মতোই অচ্ছুৎ। দেখলেন না, বরাম্ভন বলে আপনাকে গাড়িতে তুলল না, পাপ হবে যে।'

এ-কথাটা আগে খেয়াল হয়নি উমানাথের। কিন্তু মেয়েটা যে অচ্ছুৎ তা আগেই ভাবা উচিত ছিল। অচ্ছুৎ ছাড়া এই ভিরৌলিতে অন্য জাতের লোক নেই। সে বলে, 'তবে ওইরকম গাড়ি, ওইরকম সাজ গোজ—'

'বহোত দুখিয়া লেড়কি। শরম আউর দুখকা বাত—' বলেই সুরথকে একবার দেখে নেয় রামনগিন। তার কান বাঁচিয়ে নীচু গলায় ফিসফিসিয়ে বলে, 'ও রাজার রাখনি। রাজাই এ-সব শাড়ি জেবর ওকে দিয়েছে।'

রামনগিন আরও জানায়, চান্দেরি মেয়েটার কপাল বড়ই খারাপ। আট দশ সাল আগে ওদেরই জাতের ছেলে হরদেওয়ের সঙ্গে চান্দেরির বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। হরদেওরা ওদের সঙ্গে একই টোলায় থাকে। ছেলেবেলা থেকেই জান-পয়চান, একসঙ্গে দু'জনে বড় হয়ে উঠেছে। শাদির বাত পাক্কা হবার আগে দু'জনের মনমে প্যার ভি হুয়া।

কিন্তু বিয়ের যখন তিন রোজ বাকি, ভিরৌলি গাঁয়ের পাশ দিয়ে হাতিতে চেপে জঙ্গলে শিকার খেলতে যাবার সময় ভিড়ের ভেতর আচানক চান্দেরিকে দেখে হাতি থামিয়ে তার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়েছিলেন ত্রিলোকীপ্রসাদ। অর্থাৎ কে তার বাপ, কী জাত, কোন টোলায় থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। বাস ওই পর্যন্ত। তারপর রাজার হাতি হেলে দুলে পূর্ণিয়ার ঘন জঙ্গলের দিকে চলে গিয়েছিল।

ভিরৌলি গাঁয়ের সাদাসিধে সরল মানুষেরা ভেবেছিল, চান্দেরিকে দেখে ভালো লেগেছে, তাই রাজা তার সম্বন্ধে দু' চার কথা জিজ্ঞেস করছেন। অচ্ছুৎদের মেয়ের সম্বন্ধে তিনি যে ঈষৎ কৌতূহলী হয়েছেন, এটা তার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্য বলেই সবার মনে হয়েছিল।

কিন্তু পরের দিনই একটা গদি—বসানো সুসজ্জিত বয়েল গাড়ি চান্দেরিদের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। কী—না, রাজা ওটা পাঠিয়েছেন। সঙ্গে রাজার পোষা সাত আটজন পহেলবান। তাদের হাতে লোহার গুল-বসানো লাঠি। শুধু বয়েল গাড়িই না, দামি সিল্কের শাড়ি, জরি-বসানো শুঁড়। তোলা নাগরা, চাঁদির গয়না, খুসবুওলা তেল, সাবুন, চোখের কাজল, এমনি সাজগোজেব হাজাবটা চমকদাব জিনিসও সঙ্গে পাঠিয়েছেন। কী—না, চান্দেরিকে এ-সব পরে রাজার বাড়ি যেতে হবে।

ব্যাপারটা সবাই বুঝতে পারল। গঞ্জু টোলায়, বিশেষ করে হরদেও আর আর চান্দেরিদের ঘরে মড়াকান্না পড়ে গিয়েছিল কিন্তু গলা তুলে কেউ কাঁদতে পারছিল না। পাছে রাজার পহেলবানদের কানে সে শব্দ যায়, সেজন্য কান্নাটা ছিল চাপা, অনুচ্চ।

রাজার পাঠানো শাড়ি-জামা-গয়না-নাগরা পরে চোখের জলে বুক ভাসাতে ভাসাতে একসময় বয়েল গাড়িতে গিয়ে উঠেছিল চান্দেরি। গঞ্জু টোলায়, শুধু গঞ্জু টোলায় কেন, গোটা ভিরৌলি গাঁ বিষাদে ছেয়ে গিয়েছিল। চান্দেরি মেয়েটাকে এ-গাঁয়ের সবাই ভালোবাসত। যেমন মিঠে তার কথাবার্তা, তেমনি চমৎকার চালচলন এবং ব্যবহার। তার জীবনের পরিণতি এমন করুণ হবে, কে ভাবতে পেরেছিল! কিন্তু কারো কিছু করার ছিল না। রাজার বিরুদ্ধে কে মাথা তুলে দাঁড়াবে? কারো সিনায় এত সাহস নেই।

বয়েল গাড়িটা চান্দেরিকে নিয়ে যখন চলতে শুরু করেছে সেইসময় একটা কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। হরদেও কোত্থেকে দৌড়ে এসে চিৎকার করতে করতে বলেছিল, 'নায় নায়, কভী চান্দেরি নায় যায়েগি। রাজাকো রাখনি নায় হোগি—কভী নায়, কভী নায়—'

হরদেওরা ভিরৌলি এবং আশপাশের বিশ পঁচিশটা গাঁয়ের তাবত মানুষের মতো রাজা ত্রিলোকী-প্রসাদের জমিতে বাঁধী কিষান—অর্থাৎ পেট ভাতার ক্রীতদাস।

অতি তুচ্ছ একটা ভূমিদাস যে এভাবে প্রতিবাদ জানাবে, রাজার পহেলবানেরা প্রথমে ভাবতেই পারেনি। অবাক হয়ে তারা অচ্ছুৎদের হঠকারী জোয়ানটায় কাণ্ডকারখানা দেখছিল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র। হরদেও বয়েল গাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই দু'টো মোটা লাঠি দু' দিক থেকে আড়াআড়ি এসে তার রাস্তা আটকে দিয়েছিল। একটা পহেলবান তার ঘাড় ধরে দশ হাত দূরে ছুঁড়ে দিতে দিতে বলেছিল, 'হট্ শালে, হট্—কুত্তেকে বাচ্চে—'

হরদেও লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো রাজা এবং তার পাঠানো অনুচরদের অকথ্য গালাগাল দিয়ে গিয়েছিল আর গলার শিরা ছিঁড়ে সমানে চিৎকার করেছিল, 'নায় যা চান্দেরি, নায়, উতারী আ—'

না ছিল চান্দেরির নামার উপায়, না ছিল হরদেওয়ের তার কাছে যাবার উপায়। দু' দিকেই পহেলবনোর লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে ছিল।

বয়েল গাড়িটা একসময় চলতে শুরু করেছিল। সামনে পেছনে এবং দু'পাশে—চারদিক থেকে সেটাকে পাহারা দিতে দিতে নিয়ে গিয়েছিল পহেলবানেরা।

গাঁ থেকে চান্দেরিকে বয়েল গাড়িতে চড়িয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে যাবার পর সামান্য একটা ঘটনা ঘটেছে। একদিন হরদেও রাজার খেতিবাড়িতে কাজ করতে গিয়ে আর ফিরে এল না। পর দিন দেখা গেল, জেলা বোর্ডের সড়কে সে মরে পড়ে আছে। লাঠির ঘা খেয়ে তার মাথাটা দু' ফাঁক হয়ে আছে।

সেই যে চান্দেরি গেল, তারপর থেকেই কয়েক বছর ধরে রাজার রাখনি (রক্ষিতা) হয়ে আছে সে। রাজার প্রকাণ্ড হাভেলির একধারে থাকে সে ; ক্বচিৎ কখনো ভিরৌলিতে এসে বাপ-মাকে দেখে যাবার হুকুম মেলে।

শুনতে শুনতে বুকের ভেতর শ্বাসকষ্টের মতো কিছু একটা হতে লাগল উমানাথের। এখন পর্যন্ত সে যা শুনেছে এবং দেখেছে তাতে মনে হয়েছে এখানে কোন মানুষই স্বাধীন নয়। পুরুষ এবং মেয়েমানুষ—সবাই রাজার কাছে বংশানুক্রমে বাঁধা হয়ে আছে। এখানে রাজার ইচ্ছা বা হুকুমই শেষ কথা। এর বাইরে কারো যাবার বা কিছু করার উপায় নেই। অদৃশ্য সুতোয় সবার হাত-পা আটকানো

রয়েছে। রাজা ত্রিলোকীপ্রসাদ হাজার হাজার মানুষকে এখানে ক্রীতদাস করে রেখেছেন। তিনি গাড়ি পাঠালে কারো সাহস বা তাকত নেই ঘরের যুবতী মেয়েকে ঘরে আটকে রাখে। চোখের জলে বুক ভাসাতে ভাসাতে মেয়েকে গাড়িতে তুলে দিতে হয় তাদের। কে জানে চান্দেরি ছাড়াও এই সব ভূমিদাসদের ঘর থেকে আরো কত সুন্দরী মেয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে ত্রিলোকীপ্রসাদ নিজের রাখনি করে রেখেছেন কিনা।

এরকম এক প্রবল শক্তিমান নিষ্ঠুর লম্পট রাজা উমানাথকে দেখা করতে বলেছেন। আজ নবলপুরায় গিয়ে প্রথমেই তাঁর হাভেলেতি যাবে সে। তারপর কী হবে, ভাবা যায় না। উমানাথের শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে হিমের স্রোত ওঠানামা করতে লাগল।

কাঁচা ধুলোট রাস্তা ধরে অনেকক্ষণ হাঁটার পর উমানাথ জিজ্ঞেস করল, 'এই মাইয়াটার লাখান আরও মাইয়ারে রাজায় তুইলা লইয়া গ্যাছে?'

রামনগিন বলল, 'বহোত। ইতনা যো গিনতিসে নায় মিলি (এত যে গুনে শেষ করা যাবে না।) আওরতের বহোত লালচ রাজার। সে আরও জানালো, চোখে লাগলো তো বয়েল গাড়ি পাঠিয়ে মেয়ে তুলে নিয়ে গেলেন। দু'দিন বাদে রসটুকু নিঙড়ে বার করে ছিবড়ের মতো ফেলে দিলেন। এই রাজা রাজার বাপ, দাদা—সবার এক আদত। জিন্দেগিভর ওদের আওরত নিয়ে খেল। শুধু চান্দেরীটাই অনেকদিন তারলোকীজির কাছে টিকে আছে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে উমানাথ বলে, 'কিন্তুন রাজা তো কায়েত, উচা জাত। অচ্ছুৎগো ঘরের মাইয়া নেয় কেমনে? তাগো ছুইতে ঘিন্না করে না?'

রামনগিন হাসে, 'অচ্ছুৎদের জওয়ানী লেড়কিতে দোষ নেই।'

উমানাথ আর কিছু জিজ্ঞেস করে না।

ওরা চলছে তো চলছেই। দু' ধারের গাঁগুলো থেকে আরও অনেক লোক উঠে এসে তাদের সঙ্গে শনিচারীয় হাটের দিকে চলতে থাকে।

দুপুরের খানিকটা আগে আগে উমানাথরা নবলপুরায় পৌছে যায়।

সাত

নবলপুরা প্রকাণ্ড গ্রাম। এখানে অচ্ছুৎ কম, জলচল উঁচু বর্ণের লোকই বেশি। বাড়িঘরের ছিরিছাঁদ ভিরৌলির চাইতে ঢের ভালো। এখানকার মানুষের হাতে যে পয়সা আছে, ঘরে খাদ্য আছে, মোটামুটি সেটা আন্দাজ করা যায়।

নবলপুরার পশ্চিম দিকে শনিচারীর হাট। হাটটা রাজা ত্রিলোকীপ্রসাদের বংশানুক্রমিক সম্পত্তি। পুব মাথায় ত্রিলোকীপ্রসাদের প্রকাণ্ড তিন 'মহলা তিনতলা মকান। সারা নবলপুরায়, শুধু নবলপুরায় কেন, চারপাশের বিশ তিরিশখানা গাঁয়ে এটাই একমাত্র পাকা দালান।

নবলপুরায় পৌছে রামনগিন বলল, 'পহেলে রাজাকা কোঠি যায়েঙ্গে তো দেওতা?'

উমানাথ বলল, 'হ।'

আলি রেজা বলল, 'আপনি রামনগিনা ভেইয়ার সাথ ঘুরে আসুন, আমি হাটে যাই। পরে সাঁওতাল কিষান ঠিক করব।'

'আইচ্ছা।'

রাজার দালানের কাছাকাছি এসে রামনগিন বলল, 'আপ যাইয়ে দেওতা। হামনি ইধরি এহী পিপর পেঁড়কা (পিপুলগাছ) ছাঁওমে বৈঠটা হ্যায়। আপ লৌটনেকো বাদ একসাথ হাট চলা যায়েগা।'

'তুমি রাজার বাড়িত্ যাইবা না?'

'নায় নায়—' রামনগিন ভীরু গলায় বলল, 'আপকো যানে বোলা, হামনি যানেসে রাজাসাবকা গুস্সা হোগা।'

অগত্যা উমানাথ সুরথকে নিয়ে এগিয়ে গেল।

রাজার বাড়ির লোহার ভারী ভারী গুল-বসানো প্রকাণ্ড ফটকটা হাট করে খোলা। ভেতরে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। উমানাথরা ফটকের মধ্য দিয়ে ভয়ে ভয়ে বারকয়েক উঁকি মারল। এভাবে উঁকি মারতে মারতে রাজবাড়ির নৌকর চৌকর কারো একজনের চোখে পড়ে গেল তারা। সে হেঁকে বলল, 'কাকে চাই?'

কাঁপা গলায় উমানাথ বলল, 'রাজা আমাগো আইতে কইছে।'

'ভিরৌলিসে আয়া?'

উমানাথ বুঝল, তার আসাব ব্যাপারটা এ-বাড়ির লোকজনেরা জানে। সে বলল, 'হ।'

লোকটা বলল, 'আও আন্দর।'

ভেতর ঢুকতেই চোখে পড়ল, ফাঁকা জায়গাটার একধারে দু'টো বিরাট বিরাট হাতি লোহার শেকলে বাঁধা রয়েছে। তাদের কাছাকাছি টিনের শেডের তলায় চার পাঁচটা তেজী তেল-চুকচুকে ঘোড়াও দেখা গেল। ফাঁকা জায়গার আরেক ধারে বিরাট বিরাট চাকা-ওলা পুরনো মডেলের হুডখোলা মোটর দাঁড়িয়ে আছে। আর সামনের দিকে সুবিশাল তেতলা দালান। কম করে একেক তলায় চল্লিশটা করে ঘর। প্রতিটি ঘরের প্রকাণ্ড দরজা আর পাল্লায় নানা রঙের কাচ বসানো বড় বড় জানালা।

সামনের শ্বেত পাথর বসানো কুড়ি হাত চওড়া বারান্দায় মোটা মোটা থাম। আর ছড়িয়ে আছে অগুনতি আরাম কেদারা, চেয়ার আর পুরোনো আমলের ঢাউস ঢাউস সোফা।

একজন সাই জোয়ান পুরুষ, চুমড়ানো গোঁফ তার—বারান্দায় একটা তক্তপোশের ওপর স্রেফ ল্যাঙ্গোট পরে শুয়ে আছেন। আর সুবিশাল চেহারার একটা অত্যন্ত শক্তিশালী লোক গাদা গাদা তেল ঢেলে তাঁকে ডলাইমলাই করছে। যেভাবে লোকটা তেল ডলছে, দেখতে দেখতে শরীর কেঁপে ওঠে উমানাথের। ওইরকম একটা ডলা খেলে পৃথিবীর সব চাইতে বলবান ঘোড়ারও হাড় ছাতু হয়ে যাবে।

শায়িত লোকটাকে দেখেই উমানাথ চিনতে পেরেছে—কায়াথ রাজা ত্রিলোকীপ্রসাদ। তাঁর চারপাশ ঘিরে বসে আছে জনকয়েক পা-চাটা মোসাহেব। আর আছে মোটা মোটা টিকিওলা ক'টা লোক, গলায় হলুদ রংয়ে ছোপানো মোটা পৈতার গোছা, কপালে এবং কানে চন্দনের ছাপ—দেখেই বোঝা যায়, এ অঞ্চলের বামুন। তারা কী সব কথাবার্তা বলছিল।

সেই লোকটাই উমানাথদের সঙ্গে করে ত্রিলোকীপ্রসাদের কাছে এসে বলল, 'মালিক, এহী দো আদমি ভিরৌলিসে আয়া—'

ত্রিলোকীপ্রসাদ ঈষৎ কাত হয়ে উমানাথ এবং সুরথের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধীরে ধীরে একবার দেখে নিলেন। তারপর বললেন, 'আপ উমানাথ ভটাচায হো?'

উমানাথ কাল স্ত্রীকে বলেছিল, রাজার সঙ্গে দেখা করার পর যা হবার তাই হবে। কিন্তু এখন কাছাকাছি এসে তার বুক গুরগুর করছে, পা দু'টো অসহ্য কাঁপছে। হাতজোড় করে সে বলল, 'হ রাজাসাব। নমস্কার।'

সুরথকে দেখিয়ে ত্রিলোকীপ্রসাদ জিজ্ঞেস করল 'এ কৌন—আপকা বেটা?'

'হ।'

'আপ বরাম্ভন?'

'হ রাজাসাব, শাণ্ডিল্য গোত্র।'

দু' হাত জোড় করে খুব বিনীতভাবে ত্রিলোকীপ্রসাদ বললেন, 'নমস্তে নমস্তে। আইয়ে আইয়ে—ওপরে উঠে আসুন—'

ত্রিলোকীপ্রসাদের কথাবার্তা এবং ব্যবহারে একটু যেন ভরসা পেল উমানাথ। সুরথকে নিয়ে ওপরে উঠে শ্বেত পাথরের ধবধবে মেঝেতে বসতে যাচ্ছিল, ত্রিলোকীপ্রসাদ বললেন, 'নায় নায়, ওহী কুর্সি পর বৈঠিয়ে—'

সুতরাং জড়সড় হয়ে চেয়ারে বসতে হল উমানাথদের। সে লক্ষ করল, তার সঙ্গে রাজার এই সদয়

আচরণ এবং কথাবার্তা তাঁর মোসাহেব এবং সেই স্থানীয় বামুনেরা খুব একটা পছন্দ করছে না। অন্তত তাদের কোঁচকানো ভুরু এবং মুখচোখ দেখে তা-ই মনে হচ্ছে।

ত্রিলোকীপ্রসাদ একজন নৌকরকে ডেকে বলে, 'নয়া বরাম্ভন ঘর আয়া। তুরন্ত মহেশ্বর ঝা'কো বুনিয়া (বোঁদে) লাড্ডুয়া কচৌরি লানে বোল্—'

'জি মালিক—' চাকরটা দৌড়ে চলে গেল। তারপর ত্রিলোকীপ্রসাদ আবার উমানাথের দিকে ফিরে বলে, 'আপ তো পাকিস্থানসে আয়া হ্যায়—কা?'

উমানাথ বলে, 'হ। চরচিকন্দি থনে (থেকে)। কিন্তুন একহান কথা জিগামু রাজাসাব?'

'হাঁ হাঁ, জরুর।'

'আমি তো পোকের (পোকার) লাখান মানুষ। আমার এত খবর আপনে পাইলেন কই?'

ত্রিলোকীপ্রসাদ সামান্য হাসেন, কিন্তু উত্তর দেন না। তবে তাঁর মোসাহেবদের ভেতর থেকে একজন বলে ওঠে, 'আরে বঙ্গালী বরাম্ভনিয়া, রাজসাহাবকা দো নেহী, দো হাজার আঁখে (চোখ)।'

কথাবার্তার মধ্যে সেই ডলাই মলাইটা চলছেই। ত্রিলোকীপ্রসাদ এবার বললেন, 'সব খবর রাখতে হয় উমানাথজি। আশেপাশের বিশ পঁচিশটা যে গাঁও দেখছেন, তার প্রায় সব জমিই আমার। শুধু ভিরৌলির আরেফিন মিঞা আলি রেজা, টিহড় গাঁয়ের সূরুযলাল—এমনি জনকয়েকের একটু আধটু জমি আছে। এদের কেউ এ-জায়গা ছেড়ে গেলে আমার কাছেই জমিজমা দিয়ে যায়। লেকেন আরেফিন ছুপ-ছুপকে আপনার সঙ্গে জমি 'একচেন' করেছে। শুনে মনমে বহোত ক্রোধ হুয়া থা—'

এর মধ্যে এ-বাড়ির রাঁধুনে মৈথিলি ব্রাহ্মণ মহেশ্বর ঝা উমানাথ আর সুরথকে বড় বড় দুটো পেতলের থালা ভর্তি করে লাড্ডু বোঁদে কচুরি মোতিচুর দিয়ে গিয়েছিল। একটা লাড্ডু তুলতে গিয়ে ত্রিলোকীপ্রসাদের শেষ কথায় হাত কেঁপে যায় উমানাথের। বুকের ভেতর নিশ্বাস আটকে আসে। ভয়ার্ত গলায় সে বলে, 'অইজ্ঞা। আমি তো—'

ভরসা দেবার জন্য একটা হাত তোলেন ত্রিলোকীপ্রসাদ। বলেন, 'ডরিয়ে মাত্। ক্রোধ হুয়া থা। লেকেন যখন শুনলাম একজন বরাম্ভন আসছেন তখন আর রাগটা রইল না। ভাবলাম, বরাম্ভন হল দেওতা, ভগবানের অংশ। অন্য জাত হলে এখানে আপনি ঢুকতে পারতেন না উমানাথজি। আমার এলাকায় যার জমি আছে তাকে আমি ঝামেলা করি না। লেকেন কেউ জমি ছেড়ে গেলে সেখানে নয়া কেউ উড়ে এসে বসতে চাইলে আমি সহ্য করি না। ইস জগৎমে যিতনা হী জমিন হ্যায় ও হামনিকা চাহিয়ে—'

যাক, বামুনের ঘরে জন্মাবার একটা নগদ সুফল হাতে হাতে পাওয়া গেল। আশ্বস্ত উমানাথ লাড্ডু তুলে মুখে পোরে।

ত্রিলোকীপ্রসাদ ফের বলেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করার খুব ইচ্ছে হয়েছিল, তাই লোক পাঠিয়ে কাল খবর দিয়েছিলাম।'

উমানাথ লাড্ডু চিবুতে চিবুতে বলে, 'আপনের দয়া—'

এরপর উমানাথের স্ত্রী-ছেলেপুলে এবং ছেড়ে-অসা পূর্ব পাকিস্তান, সেখানকার হালচাল, ইত্যাদি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে লাগলেন ত্রিলোকীপ্রসাদ।

এ-সব কথার ফাঁকে ত্রিলোকীপ্রসাদের মোসাহেবদের ভেতর থেকে একজন মৈথিলি ব্রাহ্মণ বলে ওঠে, 'শুনা বঙ্গাল দেশকা যো বরাম্ভন হ্যায় উনলোগকো চাল আচ্ছা নেহী হোতা। আপহী তো বঙ্গালি বরাম্ভন—গায়ত্রী জানতা?'

উমানাথ বলে, 'হ হ, নিচ্চয়। ওঁ ভূর্ভুবস্ব—' গায়ত্রী আওড়াতে শুরু করে সে এবং মৈথিলিটার কাছে প্রথম পরীক্ষায় পাশ করে যায়।

উমানাথকে থামিয়ে মৈথিলিটা আবার জিজ্ঞেস করে, 'আপ মছলি (মাছ) খাতা?'

উমানাথ এবার একটু বিব্রত বোধ করে, 'হ, মানে—'

'মাংস?'

উমানাথ চুপ করে থাকে।

মৈথিলিটা গলায় জোর দিয়ে বলে, 'ও ভী?'

উমানাথ কিসের একটা গন্ধ পেয়ে ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যায়। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে সে। কাঁপা গলায় ফিসফিসিয়ে বলে, 'হ, খাই। তয় (তবে) কালেভদ্রে। আমাগো লাখান গরিবের ঘরে রোজ মাংস খাওনের পয়সা কই?'

সমবেত তিন চারজন মৈথিলি ব্রাহ্মণের নাকমুখ ঘৃণায় কুঁচকে যেতে থাকে। সবাই দু' কানে হাত ঠেকিয়ে সমস্বরে বলে ওঠে, 'ছিয়া ছিয়া ছিয়া, বরাম্ভনকো এ কা চাল! এ কা ভোজন! বিলকুল মেলছ্ (ম্লেচ্ছ) বরাবর। হো ভগোয়ান, হো রামজি—'

উমানাথের গলায় লাড্ডু ও কচুরির পিণ্ড আটকে যায়। ব্রাহ্মণত্বের একটা দুস্তর বেড়া পার হবার পর দ্বিতীয় পরীক্ষায় এভাবে আটকে যেতে হবে, কে ভাবতে পেরেছিল। ব্রাহ্মণ হয়ে মাছমাংস খাওয়াটা এত লজ্জাজনক ব্যাপার, উমানাথ জানত না। তার মাথা হেঁট হয়ে যায়।

সেই মৈথিলিটা বলে, 'বরাম্ভন হল দেবাংশী। তার এরকম ভোজন বহোত বুরাই।'

ত্রিলোকীপ্রসাদ মিটামিটিয়ে হেসে হেসে গোটা ব্যাপারটা বেশ মজা করে উপভোগ করছিলেন। এবার বলেন, 'কা করে? যো দেশকা যো আহার। উমানাথজি আর কী করবেন?'

ত্রিলোকীপ্রসাদ উমানাথের প্রতি সামান্য সহানুভূতি দেখাতে সমবেত মৈথিলিরা চুপ করে যায়।

ত্রিলোকীপ্রাসাদ এবার উমানাথের দিকে তাকিয়ে বলে, 'একটা ব্যাপার আমার বহোত খারাপ লাগছে উমানাথজি—'

রুদ্ধশ্বাসে তাকায় উমানাথ, 'কী রাজাসাব?'

'বরাম্ভন হয়ে আপনি অচ্ছুৎদের গাঁ ভিরৌলিতে আছেন, এটা ভালো লাগছে না।'

'কী করুম রাজাসাব, আর তো কুনোখানে জমিন পাইলাম না।'

একটু ভেবে ত্রিলোকীপ্রসাদ বলেন, 'দেখি আপনার জন্যে কী করতে পারি। থোড়েসে সোচে, (চিন্তা করে) নি।'

উমানাথ বলে, 'আপনের দয়া—' ত্রিলোকীপ্রসাদ উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, বাধা পড়ল। ফটক দিয়ে একটা ফিটন ভেতরে এসে ঢুকল।

গাড়িটা থামতেই দরজা খুলে একটা গোলগাল চেহারার, ঝাড়ালো গোঁফওলা, মাঝবয়সী লোক লাফ দিয়ে নেমে এল। পরনে সাদা ঢলঢলে ফুল প্যান্ট আর কালো কোট। দেখেই বোঝা যায় উকিল।

নেমেই কোঁত কোঁত করে দৌড়ুতে দৌড়ুতে উকিলসাহেব বারান্দায় এসে উঠলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে একটা চেয়ারে বসে বললেন, 'বহোত ব্যাড নিউজ রাজাসাহেব।'

যে-লোকটা গা ডলছিল, হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসলেন ত্রিলোকীপ্রসাদ। বলেন, 'কা ব্যাড সমাচার ভকিলসার?'

'আমি সিধা পূর্ণিয়া থেকে আসছি। আমার বড়ে ভাইকে তো চেনেন?'

'হাঁ চিনি, দিল্লিতে থাকেন—সেক্রেটারিয়েটে বিগ অফিসার।'

'বড়ে ভাই কাল দিল্লি থেকে এসেছেন। বললেন, দো তিন মাহিনার মধ্যে জমিন্দারি অ্যাবলিশান হয়ে যাচ্ছে। কেউ আর রাজা বা জমিন্দার থাকতে পারবে না। কেউ দরকারের বেশি জমিন রাখতে পারবে না।'

মোসাহেবদের একজন বলে উঠল, 'ঝুট ঝুট, এ কভী নেহী হুয়া, কভী নেহী হোগা। যিতনাহী রোজ সূরয হ্যায় চান্দা হ্যায়, উতনাহী রোজ রাজাভী রহেঙ্গে, বরাম্ভনভী রহেঙ্গে, নেহী রহেনেসে দুনিয়া সমুচা উলট যায়েগা।'

উমানাথ এক টোলের পণ্ডিতের মুখে শুনেছিল, 'যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ'। মোসাহেবটার কথায় তা মনে পড়ে যায়। যতদিন আকাশে চন্দ্রসূর্য আছে ততদিন রাজা আর ব্রাহ্মণও থাকবে।

ত্রিলোকীপ্রসাদ একটু বিরক্ত হয়ে চাটুকরাটার দিকে তাকান। বলেন, 'তুম চুপ রহো।' বলে উকিলের দিকে তাকান, 'ভকিল্‌সাব আপনার কী মনে হয়, জমিন্দারি সত্যিসত্যিই চলে যাবে?'

উকিলসাহেব বলেন, 'আমার তো তাই মনে হয়। নেক্সট পার্লামেন্টে সেশন বসলে বিল পাশ হয়ে যাবে বলে শোনা যাচ্ছে।'

ত্রিলোকীপ্রসাদকে এবার বেশ চিন্তিত দেখায়। তিনি বলেন,'আমার কত জমি আছে, আপনি সবই জানেন ভকিলসাব। কানুন করে জমিন্দারি তো চৌপট করে দেওয়া হচ্ছে। লেকেন এক ইঞ্চি জমিন আমি ছাড়তে পারব না। এখন কী করা উচিত? আপনি কী করতে বলেন?'

উকিলসাহেব বলেন, 'সোচনা পড়েগা। একটু ভেবে দেখি।'

'তুরন্ত ভেবে নিন।'

'হাঁহাঁ। পার্লামেন্টে কানুন পাশ হবার আগেই সব বন্দোবস্ত্ করে ফেলব।'

ত্রিলোকীপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, 'সব জমিন বাঁচানো যাবে তো?'

উকিলসাহেব বলেন, 'তা হলে আমি আছি কী করতে? মাসে মাসে এত রুপাইয়া দিয়ে আমাকে পুষছেন কেন? রাজাসাব চিন্তা নেহী করনা। আইনকানুন যেমন আছে, তার ভেতর বড় বড় গর্তও তেমনি আছে। সেই গর্তগুলোকে দু-একদিনের ভেতর খুঁজে বার করে আপনার জমিন বাঁচিয়ে দেব।'

ত্রিলোকীপ্রসাদ পুরোপুরি আশ্বস্ত হয়ে আবার উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েন। হাতের ইঙ্গিতে সেই পহেলবানের মতো লোকটাকে গা ডলতে বলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডলাইমলাই শুরু হয়ে যায়।

উমানাথদের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। অত্যন্ত সন্তর্পণে পেতলের প্রকাণ্ড রেকাবি দু'টো তারা শ্বেত পাথরের মেঝেতে নামিয়ে রাখে। এখন বেলা দুপুর, সূর্য খাড়া মাথার ওপর এসে উঠেছে। জমিচষার জন্য কিষান ঠিক করে এবং শনিচারীর হাটে কিছু কেনাকাটা সেরে কখন বাড়ি ফেরা যাবে তার ঠিক নেই। উমানাথ ভয়ে ভয়ে যখন বলতে যাচ্ছিল, এবার তারা যেতে পারে কিনা, সেই সময় ত্রিলোকীপ্রসাদই তাদের সম্পর্কে সচেতন হন এবং বলেন, 'উমানাথজি, অনেকক্ষণ আপনাদের আটকে রেখেছি। আচ্ছা, আবার দেখা হবে। নওলপুরায় এলে গরিবের কোঠিতে আসবেন। নমস্তে—'

উমানাথও দু'হাত জোড় করে সবাইকে, বিশেষ করে রাজা ত্রিলোকীপ্রসাদকে, নমস্কার জানিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর সুরথকে নিয়ে ওধারের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতেই ত্রিলোকীপ্রসাদের মোসাহের সেই মৈথিলি বামুনদের একজন বলে উঠল, 'বঙ্গালী বরাম্ভনিয়া, মছলি আউর মাংস ছোড়নেকা কোসিস (চেষ্টা) করনা। ও দোনো চিজ মেলছ্‌কে (ম্লেচ্ছ) আহার হ্যায়।'

উমানাথ একটু হাসে। তারপর ছেলেকে নিয়ে চোখের পলকে ফটক পার হয়ে রাজার কোঠির বাইরে চলে আসে।

দূরে পিপর গাছের তলায় রামনগিন এখনও দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে যেতেই উমানাথ আর সুরথের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নেয় সে। শ্বাসরুদ্ধের মতো জিজ্ঞেস করে, 'বুরাই তো কুছ নায় হুয়া দেওতা?'

অর্থাৎ খারাপ কিছু হয়েছে কিনা? রামনগিনের ভয় ছিল, হয়তো রাজা দুর্ব্যবহার করার জন্য উমানাথদের ডাকিয়েছেন। না হলে তারলোকীজির মতো বড়ে আদমি, রাজা আদমি, মালিক আদমি উমানাথদের মতো সামান্য দরিদ্র মানুষকে তলব করবেন কেন? উমানাথ হাসতে হাসতে জানায়, ত্রিলোকীপ্রসাদ তাদের সঙ্গে খুবই সদয় ব্যবহার করেছেন। শুধু তা-ই না, লাড্ডু বোঁদে এবং কচৌরি খাইয়েছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি—

রামনগিন দু' হাত জোড় করে বলে, 'সব কুছ রামজিকো কিরপা। চলিয়ে—' আস্তে আস্তে স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে তার।

ওরা হাঁটতে শুরু করে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে শনিচারীর হাটে পৌঁছে যায়।

আট

শনিচারীর হাটটা বেশ বড়। কিছু কিছু চালা অবশ্য আছে, সেগুলোর তলায় নানা জিনিসের দোকানপাট। তবে খোলা জায়গাতেই বেশির ভাগ দোকানি তাদের সওদা নিয়ে বসেছে। জামা কাপড়, চাল-ডাল-মশলা থেকে শুরু করে হাঁসমুরগি, গরু-বকরি-মোষ, সবই এখানে বিকিকিনি হয়।

হাটে আসতেই আলি রেজার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হাটটা যেখান থেকে শুরু ঠিক সেইখানটায় একটা চায়ের দোকানের সামনে উমানাথদের জন্য সে অপেক্ষা করছিল।

আলি রেজাও রাজার বাড়ির খবর জানতে চাইল। রামনগিনকে এ-সম্পর্কে যা বলেছে, আলি রেজাকেও তাই বলে উমানাথ। শুনে দুশ্চিন্তা কাটে আলি রেজার। হঠাৎ এভাবে ত্রিলোকীপ্রসাদের কোঠিতে উমানাথের ডাক পড়ায় তার ভাবনাও কম হয়নি। সে বলে, 'পহেলা কী করবেন—হাটে কেনাকাটা না কিষান ঠিক করা?'

উমানাথ বলে, 'তুমার যা ইচ্ছা—'

আলি রেজা একটু ভেবে বলে, 'পহেলা কিষানই ঠিক করি।' সে আরও জানায়, আগে গিয়ে চাষের লোকের ব্যবস্থা করতে না পারলে অন্যেরা জোয়ান কর্মঠ কিষানদের বায়না করে ফেলবে। ঝড়তি পড়তি দুব্‌লা-পাতলা 'নিকম্মা'র (অকর্মণ্য) ধাড়ি কিছু লোক পড়ে থাকবে। দিনভর তিন বারে এক সের করে মাড়োয়া কী আটা খাবে তারা, কাজের বেলায় ঢুঁঢু।

অগত্যা আলি রেজার সঙ্গে কিষানের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে উমানাথ। রামনগিনও তাদের সঙ্গে যায়।

শনিচারীর হাটের একধারে ঝাঁকড়ামাথা এক সার শিরীষ গাছের তলায় ষাট সত্তরজন সাঁওতাল মেয়েপুরুষ বসে আছে। উমানাথরা সেখানে চলে এল।

জমির মালিক কিছু লোক পূর্ণিয়া জেলার নানা জায়গা থেকে চাষ আবাদের মরশুমে এখানে সাঁওতাল কিষানের খোঁজে চলে আসে। তাদের কেউ কেউ সাঁওতালদের কাছে ঘুর ঘুর করছে।

মানুষ যেমন দোকানে দোকানে ঘুরে হাজারটা জিনিস দেখে শুনে শুঁকে দু-একটা পছন্দ করে, তেমনি আলি রেজা উমানাথদের নিয়ে এক সাঁওতালের কাছ থেকে আরেক সাঁওতালের কাছে যেতে লাগল।

অনেক বাছাবাছির পর তাগড়া জোয়ান দেখে নিজের জন্য জনচারেক পুরুষসাঁওতাল আর জন চারেক মেয়েসাঁওতাল ঠিক করে ফেলল। উমানাথের জন্য ঠিক করল ছ'জন পুরুষ এবং ছ'জন মেয়ে।

সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে নিজের আট জন কিষান কিযানীর প্রত্যেককে পাঁচটা করে টাকা অর্থাৎ মোট চল্লিটা টাকা আগাম দিয়ে দিল আলি রেজা এবং উমানাথকে তার মোট বারো জন কিযানের জন্য ষাট টাকা আগাম দিতে বলল। চরচিকন্দি থেকে আসার সময় ঘরের মজুদ ধানপাট মুগমুসুরি বেচে হাজার দু'য়েকের মতো টাকা পেয়েছিল উমানাথ। তা ছাড়া, আগের জমানো ছিল আরও হাজার তিনেকের মতো। এই পাঁচ হাজার টাকা কত কষ্ট করে, কত রকম ঝুঁকি নিয়ে, বর্ডার পার করিয়ে এদেশে এনেছে, সে শুধু উমানাথই জানে। তার থেকে এতগুলো লোকের স্টিমার ভাড়া, রেল ভাড়া আর বয়েল গাড়ি ভাড়া বাবদে বেশ কিছু খরচ হয়ে গেছে। বাদবাকি যেটুকু সম্বল আছে তা নয়ছয় করতে ভরসা হয় না। সে আলি রেজাকে জিজ্ঞেস করে, 'ট্যাকাটা আগাম দিলে মাইর যাইব না তো?'

আলি রেজা জানালো, এখানকার মানুষ অত্যন্ত বিশ্বাসী। জান গেলেও টাকা মারবে না। মারের ভয় থাকলে সে নিজেই বা টাকা দেবে কেন?

উমানাথ আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। ফতুয়ার ভেতরের পকেট থেকে টাকা বার করে সাঁওতালদের দেয়।

আলি রেজা এবার তার এবং উমানাথের মোট কুড়িজন কিষানকে বলে, 'কবে থেকে তোরা কাজে লাগবি?'

সাঁওতালরা জানায়, 'পরশু থেকে।'

আলি রেজা সাঁওতালদের তার এবং উমানাথের ঠিকানা দিয়ে বলে, 'পরশু সুবে সুবে ভিরৌলিতে ঠিক চলে আসবি।'

'হুঁ।' সাঁওতালরা মাথা ঝাঁকায়।

উমানাথ এবার আলি রেজাকে জিজ্ঞেস করে, 'কিষানগো আগাম ট্যাকা দিলাম। পরে কামাকাইজ হইয়া গ্যালে আর কী' দিতে হইব?'

আলি রেজা জানায়, এইসব মরশুমি কিষানদের বাঁধা রেট আছে। রোজকার খোরাক আর দৈনিক এক টাকা করে মজুরি। একটু পর ওরা হাটে আসে। সওদা টওদা করে তিন কোশ পাড়ি দিয়ে ভিরৌলিতে পৌছুতে পৌছুতে সন্ধে পার হয়ে যায় এবং আকাশে পরিপূর্ণ একখানা চাঁদ উঠে আসে।

নয়

অনেকগুলো কাজ কয়েকদিনের ভেতর সেরে ফেলেছে উমানাথ। প্রথমত স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভিরৌলিতে এসে নতুন বাড়িঘরে থিতু হয়ে বসা, দ্বিতীয়ত কিষান ঠিক করা, তৃতীয়ত সেই কিষানদের দিয়ে চাষের কাজ শুরু করা, চতুর্থত চাষের জন্য হাল-বলদ জোগাড়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

দিন দুই হল, জমিতে চাষের কাজ শুরু হয়েছে। সাঁওতাল মেয়েপুরুষরা এসে তার বাড়ির পেছন দিকে লতাপাতা কাঠকুটরো দিয়ে থাকার জন্য ক'টা সাময়িক চালা তুলে নিয়েছে। দু'দিনেই উমানাথ বুঝে নিয়েছে, 'ফাঁকি' বলে কোনো কথাই তারা জানে না। রাত থাকতে থাকতে উঠেই ওরা উনুন ধরিয়ে খানকতক চাপাটি আর নানারকম সবজি দিয়ে তরকারি বানিয়ে গামছায় বেঁধে জমিতে চলে যায়। ভূতের মতো সারাদিন খাটার ফাঁকে একসময় খেয়ে নেয়। সূর্য ডুবলে তারপর ফের রান্না খাওয়া এবং মড়ার মতো ঘুম।

একদিকে উমানাথ তার সংসার জমিজমা এবং চাষবাসের ব্যাপারগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে। আরেক দিকে সুরথ সমানে ঘ্যান ঘ্যান করে যাচ্ছে, 'বাবা, আমার পরীক্ষার কী হইব? আমি কি মেট্রিকটা দিতে পারুম না?'

নানা কাজকর্মের ফাঁকে স্কুলেরও খোঁজখবর নিয়েছে উমানাথ। সুরথটা লেখাপড়ায় খুবই ভালো। প্রত্যেক ক্লাসে বরাবর ফার্স্ট সেকেণ্ড হয়ে এসেছে। ছেলেটা তার মস্ত বল ভরসা। উমানাথ খবর নিয়ে জেনেছে, পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের রিফিউজিদের জন্য প্রচুর চাকরি বাকরি রিজার্ভ করা আছে। সুরথ ম্যাট্রিক পাশ করে গেলে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পেয়ে যাবে। চরচিকন্দির কয়েকটা দিন বাদ দিলে সারা জীবন কষ্ট করে এসেছে উমানাথ। সুরথ তার পেছনে দাঁড়ালে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে একটু সুখের মুখ দেখতে পাবে। এই জন্যই তো মানুষ ছেলেপুলের আশা করে। যেভাবেই হোক, সুরথকে ম্যাট্রিকটা পাশ করাতেই হবে।

আজ সকালে সাঁওতাল কিষানরা ভাড়া-করা হাল বয়েল নিয়ে জমিতে যাবার পর অলুসেদ্ধ ডালসেদ্ধ দিয়ে ফেনাভাত খেয়ে সুরথকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ে উমানাথ। তারা পাঁচ ক্রোশ দূরে পূর্ণিয়া টাউনে যাবে। পূর্ণিয়া টাউন ছাড়া কাছাকাছির মধ্যে হাইস্কুল নেই।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাচ্চি পথ আর হাইওয়ের 'পাক্কী' রাস্তা ধরলে অনেক ঘুরতে হয়। উমানাথ শুনেছে, মাঠ ভেঙে কোনাকুনি গেলে অন্তত তিন মাইল কম হাঁটতে হবে। উমানাথ মাঠের রাস্তা চেনে না। অবোধী তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। কথা আছে, অবোধী সকাল বেলা গাঁয়ের শেষ মাথায় হাজম নেওকীরামের চায়ের দোকানে উমানাথদের জন্য অপেক্ষা করবে। ওখান থেকে ডেকে নিয়ে গেলেই হল।

নেওকীরামের দোকানের কাছে আসতেই দেখা গেল, চেরা বাঁশের বেঞ্চির ওপর উবু হয়ে বসে কলাই-করা গেলাসে চা খাচ্ছে অবোধী। তাদের দেখেই তাড়াতাড়ি বাকি চা শেষ করে দাম মিটিয়ে রাস্তায় চলে এল। সে। বলল, 'চলিয়ে—'

এরপর শুধু হাঁটা আর হাঁটা। শীতশেষের উষ্ণ আরামদায়ক রোদ গায়ে মেখে ফসলকাটা মাঠের ওপর দিয়ে ওরা চলছে তো চলছেই। বেশির ভাগ জমি ফাঁকা—একেবারে হা হা করছে। তবে কিছু ক্ষেতে রবি চাষের জন্য হাল বয়েল পড়েছে।

মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে দুপুরের খানিকটা পরে পরে ওরা পূর্ণিয়া টাউনে চলে এল। সেখানে একটা

ঝাঁকড়া-মাথা অশ্বত্থ গাছের গাছের তলায় বসে খানিকক্ষণ জিরলো। তারপর অবোধী পূর্ণিয়া হাইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে বলল, 'অব হামনি যাতা দেওতা। আপলোগন (আপনারা) গাঁও লেটিনে সাকেগা?'

'হ হ, পারুম। বড় উপকার করলা ভাই।' উমানাথ কৃতজ্ঞ সুরে বলে।

'নায় নায়, কুছু নায়। রাম রাম—' অবোধী চলে যায়।

আর সুরথকে সঙ্গে করে হেড মাস্টারের কামরায় এল উমানাথ।

শীতশেষের এই সময়টা স্কুলে পড়াশোনায় চাপ কম। এই তো সবে অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর নতুন বছরের ক্লাস শুরু হয়েছে। এখন আর লেখাপড়া কী?

হেড মাস্টার বিষুণচরিত শর্মার বেশ বয়স হয়েছে। গম্ভীর, প্রশান্ত চেহারা। পরনে মোটা খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবি। বিহারী ব্রাহ্মণ তিনি, আরা জেলায় বাড়ি। পঁচিশ বছরের ওপর এই পূর্ণিয়া হাইস্কুলে হেড-মাস্টারি করছেন। চমৎকার বাংলা বলতে পারেন।

উমানাথরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসছে শুনে সাগ্রহে ওখানকার অনেক খবর নিলেন বিষুণচরিত। তারপর গভীর বিষাদের গলায় বলেন, 'কত মানুষের যে সর্বনাশ হয়ে গেল! এত বড় ট্র্যাজেডি ভারতবর্ষে আর কখনও হয়নি।'

উমানাথ আস্তে মাথা নাড়ে।

একটু চুপ করে থেকে বিষুণচরিত সহানুভূতির গলায় বলেন, 'আমার কাছে কোনো দরকারে এসেছেন কী?'

'হ।' উমানাথ সুরথ সম্পর্কে তার প্রয়োজনীয় কথাটি এবার জানায়।

বিষুণচরিত বলেন, 'অসুবিধা হবে না। আমি ওর ম্যাট্রিকুলেশনে অ্যাপিয়ার হবার ব্যবস্থা করে দেব। ও কি দেশ থেকে টেস্ট দিয়ে এসেছে?'

উমানাথ ছেলের দিকে তাকায়। সুরথ বাবাকে এক পলক দেখেই তার তাকানোর অর্থ বুঝে নেয়। বিষুণচরিতের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আইজ্ঞা না স্যার, টেস্টের আগেই দ্যাশ ছাইড়া চইলা আইতে হইল।'

'ঠিক আছে, আমার স্কুলে এখনও টেস্ট হয়নি। তুমি এখানেই দিতে পারবে।'

'স্যার, আমি তো ঢাকার সিলেবাসে পইড়া আইছি। কইলকাতা বোর্ডের লগে অনেক মিল আছে ঢাকার। কিন্তুন বিহারের সিলেবাস কিছুই জানি না।'

'ইস্ট পাকিস্তানের রিফিউজিরা যাতে ক্যালকাটা বোর্ডের সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা দিতে পারে তার ব্যবস্থা এখানে আছে। আসছে মাসে টেস্ট। তুমি রেডি হয়ে যাও।'

সুরথ ভয়ে ভয়ে বলল, 'দ্যাশ ছাড়নের আগে অনেকদিন স্কুল করতে পারি নাই—'

ছেলের মনোভাবটা বুঝে নিয়ে উমানাথ বলে, 'তমস্তক্ষণ (সমস্ত ক্ষণ) তহন ডরের ভিত্‌রে কাটাইছি। পোলাটায় বইয়ের পাতা উলটাইয়া দেখতে পারে নাই। উই অবস্থায় কি পড়ায় মন বসে?'

বাপ-ছেলে কী বলতে চায়, বুঝতে পারছিলেন বিষুণচরিত। বললেন, 'টেস্ট দিতে অসুবিধা হবে, তাই তো?'

'হ।' মুখ নিচু করে সুরথ মাথা নাড়ে।

'ভয়ের কিছু নেই। টেস্ট দিলেই পাশ করে যাবে। দিনদশেক পর একবার এসে খবর নিয়ে যাবে, কবে টেস্ট শুরু হচ্ছে।' বলতে বলতে কী মনে পড়ে যায় বিষুণচরিতের। বলেন, 'টেস্টের সময় ভিরৌলি থেকে রোজ এসে পরীক্ষা দেবে কেমন করে? সে তো অনেক দূর। পূর্ণিয়ায় তোমাদের জানাশোনা কেউ আছে?'

উমানাথ বলে, 'আইজ্ঞা না মাস্টারমশয়। আমরা এইহানে এক্কেবারে নূতন।'

বিষুণচরিত একটু ভেবে বলেন, 'ঠিক আছে, দশ দিন পর আপনারা আসছেন তো। এর মধ্যে সুরথ যাতে এখানে থেকে পরীক্ষা দিতে পারে তার ব্যবস্থা করে ফেলব। কিছু না হলে আমার বাড়ি থেকেই পরীক্ষা দেবে।'

বিষুণচরিতের সহৃদয়তায় মুগ্ধ হয়ে যায় উমানাথ। পৃথিবীতে এখনও কত ভালো মানুষ রয়েছে। কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে সে বলে, 'আপনের দয়া, মাস্টারমশয়। এই দয়ার কথা আমি কুনোদিন ভুলুম না।'

বিষুণচরিত হাসেন। যা বলেন তা এইরকম। এর মধ্যে দয়ার কিছু নেই। উমানাথদের মতো লক্ষ লক্ষ দেশহারানো ছিন্নমূল মানুষের দুঃখকষ্টের দামে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে। তাদের জন্য ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের সব কিছু করা উচিত। তা ছাড়া, সুরথ একজন ছাত্র। বিষুণচরিতের মতো মাস্টারজিদের একটা বড় কর্তব্য হল, ছাত্রকে সামনের দিকে এগিয়ে দেওয়া, তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা।

স্কুল থেকে বেরিয়ে টাউনের ভাট্টা বাজারে গিয়ে একটা মিঠাইয়ের দোকানে কিছু খেয়ে নিল উমানাথরা। তারপর ভিরৌলির দিকে হাঁটতে শুরু করল।

এখন আর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অবোধী সঙ্গে নেই। তাকে দরকারও নেই। উমানাথ একবার যে রাস্তা দিয়ে যায়, জীবনে তা ভোলে না। সেই কোন ছোটবেলা থেকে জীবনের পঞ্চাশ বাহান্নটা বছর ঢাকা-বরিশাল-সিলেট-নোয়াখালি-যশোর-খুলনা—দু' মুঠো ভাত আর দু'টো পয়সার জন্য গোটা পূর্ব বাংলার নরম মাটির ওপর পায়ের ছাপ ফেলে হাজার হাজার মাইল হেঁটে গেছে উমানাথ। যেখান দিয়ে একবার সে গেছে, চিরকালের মতো তা তার স্মৃতির মধ্যে থেকে গেছে। পূর্ব বাংলার শ'য়ে শ'য়ে গ্রাম আর হাজার হাজার মানুষের নাম সে বলে দিতে পারবে। তার দেখা গ্রামগুলোর কোথায় ক'টা মন্দির, ক'টা মসজিদ, ক'ঘর বামুন, ক'ঘর তেলি কি বারুইর বাস—সব উমানাথের মুখস্থ।

এখন বেলা অনেকখানি হেলে গেছে। হাইওয়ের পাকা সড়ক ধরে খানিকটা হাঁটার পর উমানাথরা মাঠে নেমে পড়েছে। পূর্ণিয়া জেলার ফসলকাটা শস্যক্ষেত্রের ওপর দিয়ে হাঁটতে ভালো লাগছে তাদের। না-শীত না-গরম, দিনের এই সময়টায় বাতাস বড়ই আরামদায়ক।

মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো তোতা আর বগেড়ি উড়ছে। মাঠে অলস, মন্থর গোসাপেরা এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও কোথাও আলের ওপর একটি কি দু'টি ধবধবে সাদা বক চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার ওপর শীতশেষের ঝকঝকে নীলাকাশে থোকা থোকা সাদা মেঘ, মনে হয় তুলো বা বরফের একেকটা পাহাড়।

পাশাপাশি মাঠ ভাঙতে ভাঙতে উমানাথ ছেলেকে বলে, 'হগল ব্যবস্থা হইয়া গ্যাল। এইবার পড়াশুনায় মন দে সুরথ।'

সুরথ বলে, 'হ, দিমু। আইজই বাড়িত গিয়া বাক্স থনে (থেকে) বইগুলান বাইর করুম। টেস্টের আড়াই মাস পরে ফাইনাল পরীক্ষা। অহন পড়া না ধরলে পাশ করতে পারুম না।'

উমানাথ বলে, 'আমরা রিফুজি, দ্যাশ ভিটামাটি ফালাইয়া আইতে হইছে। আমাগো কপাল আর চৈদ্দ পুরুষের ভাইগ্যে এই পুইণ্যা (পূর্ণিয়া) জিলায় আইয়া এট্টু মাটি পাইছি। কিন্তুন হেয়াই (তাই) সব না। তর মা আর আমার তো তিন কাল গ্যাছে। আমাগো কথা ছাড়ান দে। কিন্তুন এই পিরথিমীতে টিকা থাকতে হইলে তর, গৌরের, জবার—আমাগো লাখান (মতো) রিফুজি ঘরের পোলাগো লিখাপড়া শিখতেই হইব সুরথ। কালির অক্ষরের বড় শক্তি রে। গৌর আর জবারও পড়নের (পড়ার) ব্যবস্থা এট্টা কইরা ফালাইতে হইব।'

উমানাথ সমানে কথা বলে যায়। শুধু ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারেই না, সংসারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও নিজের অগুনতি পরিকল্পনার ছবি স্বপ্নের ভাষায় অনবরত চোখের সামনে আঁকতে থাকে। রবির মরশুমে এবার সে তিল সরষে মুগ মুসুরি রাঁধুনি ধনে ইত্যাদি লাগাবে। পনেরো বিঘা জমিতে এই সব রবিফসল ফললে সারা বছর ডাল মশলা আর সরষের তেল কিনতে হবে না। মাটির চেহারা দেখে আন্দাজ করা যায়, ফলন এখানে বেশ ভালোই হবে। তা হলে দরকার মতো ফসল রেখে বাকিটা বেচে দেওয়া যাবে। তাতে দু'টো কাঁচা পয়সার মুখ দেখা যাবে। বিপদ আপদ, এটা-সেটা এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছু নগদ পয়সা হাতে থাকা খুবই প্রয়োজন।

রবির খন্দ শেষ হলেই আউশের চিন্তা। আউশ এখানে হয় কিনা, তার জানা নেই। এ-ব্যাপারে রামনগিনদের কাছে খোঁজখবর নিতে হবে। যদি একান্তই আউশ না হয়, পাট বুনে দেবে উমানাথ। অবশ্য

পাটের জন্য প্রচুর জল চাই। পাট গাছের গোড়ায় ভালো জল না থাকলেই নয়। এখানে কী রকম বৃষ্টি হয়, ধারণা নেই উমানাথের। পাটের সঙ্গে সঙ্গে আমনের ভাবনাও ভাবতে হবে। চরচিকন্দিতে থাকতে পানকাইজ দুধশাইল রূপশাইল—কত বাহারের ধান ফলাত উমানাথ। এখানে কী কী জাতের ধান হয় তারও সন্ধান নিতে হবে, ভালো বীজের বন্দোবস্ত করতে হবে।

বছর দুই তিন এভাবে চলার পর হাতে কিছু পয়সা টয়সা জমলে আরেফিন মিঞার পুরোনো ঘরের টুটো-ফুটো টিনের চাল বদলে ফেলবে উমানাথ। তার বহুদিনের ইচ্ছা, লাল বিলাতি মাটির (সিমেন্টের) মসৃণ তেলতেলে মেঝেতে শোয়। তেমন দিন এলে দু' বছরের মধ্যেই মেঝে বাঁধিয়ে ফেলবে সে। অনেক দিনের প্রাচীন কুয়োটার অবস্থাও বেশ খারাপ। বেলে জায়গা, বছরের পর বছর বালি জমে কুয়োটা আধাআধি বুজে গেছে। ওটা নতুন করে কাটাতে হবে।

চিরটা কাল এই হল উমানাথের স্বভাব। নতুন কোনো জায়গায় গেলেই সে স্বপ্নদর্শী হয়ে ওঠে। এই সব কথা সুরথকে বলছে ঠিকই কিন্তু সুরথ উপলক্ষ মাত্র। আসলে নিজেকেই শোনাচ্ছে উমানাথ। নিজের স্বপ্নের কথা অন্যকে বলে সে তৃপ্তি পায়।

'বাবা দেখ, দেখ—'

হঠাৎ সুরথের ডাকে চমকে উঠল উমানাথ বলে, 'কী হইছে?'

'উই যে—'

ওরা মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা গাঁয়ের ভেতর ঢুকে পড়েছিল। বিহারের পূর্ণিয়া জেলার এই সব দেহাত পূর্ব বাংলার গ্রামগুলোর মতো নয়। এখানকার ঘরবাড়ি ঘনবদ্ধ নয়। ছাড়া ছাড়া, এলোমেলো। মাঝখানে হয়ত খানিকটা খানিকটা করে আখ কি মকাইয়ের খেত রয়েছে।

এই গাঁয়ের ভেতর রাজা ত্রিলোকীপ্রসাদের দুই পোষা পহেলবানকে দেখা গেল। তারা ঘরে ঘরে ঘুরে কী সব কাগজপত্র দিচ্ছে।

উমানাথ জিজ্ঞেস করল, 'কিসের কাগজ দ্যায় রাজার পালোয়ানেরা?'

'কী জানি--' সুরথ অন্যমনস্কর মতো বলে।

উমানাথ বলে, 'যা ইচ্ছা অরা (ওরা) করুক গা। ল (চল), আমরা যাই—'

ছেলেকে নিয়ে আবার সে মাঠ ভাঙতে শুরু করে।

দশ

দেখতে দেখতে ক'টা দিন কেটে যায়। এর মধ্যে সুরথের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, পূর্ণিয়ার বাজারে ঘুরে ঘুরে রবিশস্যের বীজ জোগাড়—এমনি নানা দরকারে ছোটাছুটি করার জন্য চাষের কাজ দেখা হয়নি উমানাথের। সে না দেখতে পেলেও পড়ার ফাঁকে ফাঁকে সময় করে সুরথ দিনের মধ্যে দু-তিনবার মাঠে গেছে। কখনও কখনও সংসারের কাজকর্মের মধ্যে ফুরসত পেলে মাঠ ঘুরে এসেছে সরযূ। পরিবারের সবাই এই জমিটুকু পেয়ে নতুন করে বড়ই আশাবাদী হয়ে উঠেছে। টাটকা উৎসাহে তারা যেন টগবগ করে ফুটছে।

উমানাথ ঠিকই করেছে, এ-বছর জমিতে মুগ মুসুর কলাই তিল তিসি সরষে ইত্যাদি ফলাবে।

আজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে সুরথকেও জাগিয়ে দিল উমানাথ, 'ওঠ, উইঠা পড়তে বয় (বস)—'

সেই পূর্ণিয়া টাউনে গিয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা করে আসার পর থেকেই অনেক রাত পর্যন্ত পড়ে সুরথ। তাই সকালের দিকে তাড়াতাড়ি উঠতে পারে না।

চোখ ডলতে ডলতে কুয়োর পাড়ে চলে গেল সুরথ। উমানাথ আজ সকালে সাঁওতাল কিষানদের সঙ্গে মাঠে যাবে বলে সরযূও তাড়াতাড়ি উঠে পাতার জ্বালে মাটির আখায় ফেনা ভাত বসিয়ে দিয়েছে। পুবের ঘরের পেছন দিকে ভোরের আবছা আলোয় সাঁওতাল কিষানরাও চুলো ধরিয়ে চাপাটি আর ভাজি বানিয়ে নিচ্ছে।

আরও আধঘন্টা বাদে কাঁচা সোনার থালার মতো সূর্যটা যখন বহুদূর বনরেখার ওপর থেকে সবে উঠে এসেছে সেই সময় উমানাথ স্ত্রীকে বলে, 'ধনবৌ, বীজের বস্তাগুলান উত্তরের ঘর থনে বাইর কইরা দাও—'

সরযূ এক এক করে উত্তরের ঘর থেকে তিল, রাই সরষে, তিসি—এমনি নানা শস্যের বীজের বস্তাগুলো বার করে এনে দেয়। সাঁওতাল কিষানদের কিছু বলতে হয় না। তারা সেগুলো কাঁধে তুলে ক্ষেতের দিকে চলে যায়।

উমানাথ স্ত্রীকে বলে, 'যাই গো ধনবৌ—'

সরযূ বলে, 'আসো গিয়া। দুফারে কি খাইতে আইবা?'

'না। সুরথরে দিয়া ক্ষ্যাতে (ক্ষেতে) ভাত পাঠাইয়া দিও।' বলে আর দাঁড়ায় না উমানাথ। উঠোন পেরিয়ে সামনের রাস্তায় গিয়ে নামে।

এক পেট ফেনাভাত খেয়ে পূবের ঘরের দাওয়ায় এখন পড়তে বসেছে সুরথ। সে মুখ তুলে দেখে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাচ্চী ধরে উমানাথ হাঁটতে হাঁটতে ক্রমশ দূরে, আরও দূরে চলে যাচ্ছে। এই মানুষটা চিরদিন তার কাছে অপার বিস্ময়ের মতো। ইতিহাস বহু দিগ্বিজয়ী সম্রাটের অসীম বীরত্বের কাহিনী পড়ে অনেক দিন রাত্রে সে ঘুমোতে পারেনি। দেশে দেশে অসংখ্য দুঃসাহসী মানুষের মরু-পর্বত-মহাকাশ আর সমুদ্র অভিযানের ইতিহাস তার নিশ্বাস বন্ধ করে দিয়েছে। অগণিত রণনিপুণ সেনাপতির যুদ্ধজয়ের নানা চমকপ্রদ ঘটনা তাকে অভিভূত করেছে। কিন্তু বাবাকে এদের সবার চাইতে অনেক বড় মাপের যোদ্ধা বা অভিযানের নায়ক বলে মনে হয় সুরথের। আজন্ম সে দেখে আসছে, চিরকালের আশাবাদী উমানাথ দারিদ্র হতাশা বাধা বিঘ্নের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সুদক্ষ কোনো সৈনিকের মতো অবিরাম যুদ্ধরত। স্ত্রী-ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে পূর্ব বাংলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সে চিরদিন অভিযান চালিয়ে গেছে। কোনো যুদ্ধে বা অভিযানে বাবা সফল হয়েছে, আবার কখনও হেরে গেছে। কিন্তু তার মুখ থেকে হাসি আর মন থেকে অনন্ত আশা কখনও মুছে যায়নি। একবার হেরে গেলে বিপুল উৎসাহে আবার নতুন করে শুরু করেছে। ইতিহাসের সেরা বীর, কিংবদন্তির শ্রেষ্ঠ নায়কদের ছাপিয়ে বাবার সমুন্নত মাথা যেন আকাশ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে।

দেশভাগের পর লক্ষ লক্ষ মানুষ পিতৃপুরুষের জমিজমা ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে কে কোথায় ভেসে গেল কিন্তু বাবা ঠিক তাদের বিহারের এই ভিরৌলি গাঁয়ে এনে মাথার ওপর টিনের চালের আচ্ছাদন এবং পায়ের তলায় একটু মাটির ব্যবস্থা করে ফেলেছে। চারিদিকের কোনো আঁচই তাদের গায়ে লাগতে দেয়নি।

ওদিকে ভিরৌলি গাঁয়ের সীমানা পেরিয়ে মাঠে এসে পড়ল উমানাথ। তার জমি এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। একবার পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে মুখ তুলে উমানাথ দেখল, সাঁওতাল কিষানরা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ওরা তো হাঁটে না, যেন ঝড়ের বেগে দৌড়ুতে থাকে। ওদের ধরতে হলে ছুটতে হবে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই, ধীরে সুস্থে গেলেই চলবে। আলের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল উমানাথ।

ক'দিন আগেও অল্প দু-চারটে জমিতে হাল বয়েল দেখা গেছে। এখন চারিদিকের দৃশ্য অন্যরকম। ছোট বড় মাঝারি, চৌকো-তেকোনা-ছকোনা—নানারকম জ্যামিতিক নকশার মতো অগুনতি জমিতে লাঙল চলছে।

এ-অঞ্চলে রবির খন্দটা পূর্ব বাংলার মতো নয়। রবির মরশুম সেখানে শুরু হয় ঢের আগে, আর বিহারের এই প্রান্তে বেশ দেরি করেই।

আলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ডাইনে-বাঁয়ে যাকেই দেখা যাচ্ছে তাকেই উমানাথ জিজ্ঞেস করে, 'কী ভাই, জমিনে কী লাগাইবা?'

দিন পনেরো কুড়ি হল, উমানাথরা ভিরৌলিতে এসেছে। এখানকার দশ পনেরোটা গাঁয়ের মোট'মুটি সবাই এখন তাকে চেনে এবং খুবই ভক্তি শ্রদ্ধা. আর সমীহ করে। এ-সবের একমাত্র কারণ হল সে

ব্রাহ্মণ, দেওতার অংশ। উমানাথও অনেকেই চিনে ফেলেছে। তবে সবার নাম এখনও সড়গড় হয়নি।

জমি থেকে উত্তর আসে, 'রাজাসাবকো জমিন। উনকো য্যায়সা মর্জি—'

অর্থাৎ রাজার জমি। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সরষে কলাই বা তিল বোনা হবে।

উমানাথ মাঠের পর মাঠ পেরুতে পেরুতে একই উত্তর পেতে থাকে। সে বুঝতে পারে, রাজার জমিতে এই মানুষগুলো কাজ করছে।

উমানাথ জিজ্ঞেস করে, 'তোমাগো নিজের জমিন নাই?'

লোকগুলো বিষণ্ণ হাসে, 'জমিন কিধরি মিলেগা! সব কোই রাজাসাবকো জমিন—'

জমি সম্পর্কে যাকেই জিজ্ঞেস করা যাক—একই জবাব। পৃথিবীতে তাদের নিজস্ব কোন ভূমি নেই, রাজাসাবের ক্ষেতে তারা চাষ করছে।

উমানাথ জিজ্ঞেস করে, 'কত কাল তুমরা রাজার জমিনে কাম করতে আছ?'

উত্তর আসে, 'জনমভর। আমার বাপ, তার বাপ, তারও আগে যো থা ওহী ভি সব কোঈ কমসে কম এক দেড় শো সাল কাম কিয়া। উসকো বাদ হামভি করতা হ্যায়। আমার পর আমার লেড়কা, লেড়কার পর উনকো লেড়কা কাম করেগা।'

হঠাৎ মনে পড়ে যায় কায়াথ রাজা ত্রিলোকীপ্রসাদ সেদিন বলেছিলেন, পূর্ণিয়া জেলার প্রায় তাবত জমিজমা তাঁর। বলতে গেলে সসাগরা পৃথিবীর তিনি অধীশ্বর। এখানে নিজস্ব জমি বলতে আছে শুধু উমানাথের, আলি রেজার এবং এমনি আরও জনকয়েকের। আলি রেজার জমি এদিকে নয়, ভিরৌলি থেকে মাইল চারেক উত্তরে। বাকিদের জমি কোথায়, উমানাথের জানা নেই।

রাজা বললেও সত্যি সত্যিই যে পূর্ণিয়া জেলায় এ-অঞ্চলের বেশির ভাগ ভূমির মালিক তিনিই, এটা ভাবতে পারেনি উমানাথ। সে ফের জিজ্ঞেস করে, 'সারাদিন খাটলে কী পাও?'

'থোড়েসে মকাই, মাড়োয়া—কভি কভি কুছ গেঁহু (গম)। কুছ রুপাইয়া এক সাল বাদ বাদ দোঠো কাপড়া, দোঠো কামিজ—'

'এই?'

'ব্যস, আউর কা মিলেগা?'

রামনগিনের মুখ মনে পড়ে যায় উমানাথের। সে বলেছিল, রাজার জমিতে তারা বাঁধী কিযান—প্রায় ক্রীতদাসের মতো। রাজার জমিতেই তারা ঘর বেঁধে থাকে আর পুরুষানুক্রমে পেট ভাতায় বেগার দিয়ে যায়।

রামনগিন তা হলে বাড়িয়ে কিছু বলেনি! শুনতে শুনতে চারিদিকের অগুনতি মানুষগুলোর জন্য কষ্ট বোধ করতে থাকে উমানাথ। ভূমিদাসদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে একসময় নিজের জমিতে পৌঁছে যায় সে।

সাঁওতাল কিষান কিষানীরা মাঠের কোণে বসে ছিল। উমানাথ না বলে দেওয়া পর্যন্ত কোন জমিতে কী বীজ লাগাবে বুঝতে পারছে না।

উমানাথ কোথায় রাই সরষে, কোথায় রাঁধুনি, কোথায় মুগ, কোথায় মুসুর এবং অন্যান্য শস্যের দানা লাগাবে—বুঝিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালেরা কাজে লেগে গেল। ক'দিন লাঙল চলার ফলে জমি চৌরস হয়ে আছে। এখন বীজ রুয়ে দিলেই হয়। তারপর ওধারের নহর (খাল) থেকে সরু নালি কেটে জল এনে ক্ষেতে দিতে হবে। সাঁওতালেরা জল সেচেরও ব্যবস্থা করে চলে যাবে, তারপর মাস দুয়েক বাদে আবার আসবে ফসল কাটার সময়।

বুঝিয়ে দেবার পর এক মুহূর্তেও বসে থাকল না সাঁওতালেরা, বীজ দানার বস্তাগুলো নিয়ে ক্ষেতে ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ল এবং চৌরস মাটিতে বীজ ছুড়ে ছুড়ে দিতে লাগল।

উমানাথ ঘুরে ঘুরে খানিকক্ষণ সাঁওতালদের কাজ দেখল। কোথায়ও এতটুকু খুঁত নেই। মেয়েগুলো বকবকে পাখির মতো সমানে কল কল করে কথা বলছে আর হেসে হেসে ঢলে পড়ছে। টগবগে দামড়া মোষের মতো পুরুষগুলো মেয়েদের রকম সকম দেখে হাসে, রগড়ের কথা বলে। সবই ঠিক, কিন্তু তাদের হাত চলছে কলের মতো।

একসময় উমানাথ অন্য দিকে চোখ ফেরাল। পুবে-পশ্চিমে-উত্তর-দক্ষিণে, সব দিকে মাইলের পর মাইল জুড়ে পূর্ণিয়া জেলার অফুরন্ত চাষের জমিগুলিতে হয় বীজ রোয়া, নইলে হাল-বয়েল চলছে। উমানাথ আসছে পশ্চিম' দিক থেকে। ওদিকের জমিগুলোর কিষানদের সঙ্গে তার কথাবার্তা হয়েছে। আচমকা কীসের এক টানে সে উত্তরে চলল, উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে পুবে। তারপর দুপুরের ঠিক আগে আগে সূর্য যখন খাড়া মাথার ওপর, সেই সময় আবার নিজের জমিতে ফিরে এল।

কয়েক মাইল জুড়ে এই যে এতগুলো জমি উমানাথ ঘুরে এল তার প্রতিটিতে কিষানদের সঙ্গে সে কথা বলেছে। সব জেনেশুনেও কেন যেন তার মনে হয়েছিল, পশ্চিমের জমিগুলোর মালিক ত্রিলোকীপ্রসাদ হলেও অন্তত দু-এক টুকরো জমিও কি অন্য কারো হবে না?

কিন্তু না, এই সুবিপুল চরাচর জুড়ে যত ভূমি তার অধীশ্বর একজনই—রাজা ত্রিলোকীপ্রসাদ। আর এই যে এত লোক বীজ বুনছে, লাঙল চালাচ্ছে—ওরা সবাই তাঁর ভূমিদাস। জীবনের পঞ্চাশ বাহান্ন বছর ধরে পূর্ব বাংলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়িয়েছে উমানাথ। কিন্তু কোথাও একজন মানুষের এত বিশাল জমিজমা সে দেখেনি। এত ভূমিদাসও তার চোখে পড়েনি। একজন মানুষ হাজার হাজার কানি জমির মালিক আর হাজার হাজার মানুষ একেবারে নির্ভূম—এ যেন ভাবা যায় না। বুকের ভেতর শ্বাসকষ্টের মতো কী যেন অস্বস্তি অনুভব করতে থাকে সে।

কিন্তু পরক্ষণেই মন থেকে এ-সব ভাবনা ঝেড়ে ফেলতে চাইল উমানাথ। কী হবে অন্যের কথা ভেবে অনর্থক নিজের সময় নষ্ট করে? এই মানুষগুলো যে অন্যের জমিতে বংশ পরম্পরায় বেগার দিয়ে আসছে সেটা এদের কর্মফল, ওদের ভাগ্য। হয়ত পূর্বজন্মের কোনো পাপের পরিণাম।

অসংখ্য যুক্তি খাড়া করেও ভাবনাটা মুছে ফেলতে পারল না উমানাথ। ঘুরে ঘুরে শ'য়ে শ'য়ে ভূমিহীন মানুষের মুখ তার ভাবনার ভেতর ভিড় করে আসতে লাগল। আজীবন সুপ্রাচীন আকাশের তলায় এই বিশাল পৃথিবীর এক ধারে এক টুকরো মাটির জন্য উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে বেড়িয়েছে সে। স্বপ্ন দেখেছে, তার সেই নিজস্ব স্থায়ী মাটিটুকু সন্তানদের হাতে তুলে দিয়ে যাবে। মনুষ্যজাতির একটি বংশের ধারা সেই ভূমিকে ঘিরে যুগযুগান্ত পার হয়ে অবিরাম বয়ে যাবে। পৃথিবীতে তার নিজের মাটি, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা—চিরদিন এই ছিল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু। নানা ঝড়ঝাপটা, বিপদ আপদ এবং উথালপাতাল ঢেউ পেরিয়ে ভিরৌলিতে এসে শেষ পর্যন্ত সেই মাটি পেয়েছে উমানাথ কিন্তু চারপাশে অগুনতি ভূমিদাসকে দেখে বিষাদে মন ছেয়ে যায় উমানাথের। পুবে-পশ্চিমে-উত্তরে-দক্ষিণে যত মানুষ দেখা যাচ্ছে, কয়েক শ' বছর ধরে পুরুষানুক্রমে তাদের এক ছটাক জমি নেই। পূর্ণিয়া জেলার এই দিগন্তজোড়া বিপুল ফসলের মাঠগুলোতে একমাত্র তারই কয়েক হাত জমি রয়েছে। বাদবাকি সবাই নির্ভূম।

উমানাথের হয়তো গৌরব বোধ করাই উচিত ছিল। কিন্তু তার বদলে দ্বীপের মতো ছোট্ট এক টুকরো এই ফসলের ক্ষেতটুকুতে দাঁড়িয়ে তার সব কিছুই নিরর্থক মনে হতে লাগল। এই সব বঞ্চিত, পরাধীন অসহায় ভূমিদাস কয়েক শ' বছর ধরে এই পূর্ণিয়া জেলায় পড়ে আছে, অথচ এখানকার এক আঙুল জায়গার স্বত্ব তাদের নেই। আর উমানাথ কিনা বহুদূরের এক নদী ধলেশ্বরীর নতুন-জাগা চর থেকে কয়েক দিন আগে এখানে এসে কয়েক কানি ফসলী জমি এবং বাড়ির মালিক হয়ে বসেছে। কোনো অর্থ হয় না। নিজেকে কেমন যেন অনধিকারী মনে হতে থাকে তার। এই সব মানুষকে বঞ্চিত করে সে যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। সারা জীবন যে মাটির জন্য উমানাথ ছুটে বেড়িয়েছে, এই বাহান্ন বছর বয়সে দেশভাগের পরও নতুন করে তা পাবার পর অপরিমেয় খুশি হবার কথাই। ক'টা দিন সে খুবই পরিতৃপ্ত হয়ে ছিল। এবং বিভোর হয়ে রবিচাষের ব্যবস্থা আর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু এখন আবছাভাবে তার মনে হতে থাকে, পৃথিবীতে এত নির্ভূম মানুষ থাকতে পনেরো বিঘে উৎকৃষ্ট জমির মালিক হয়ে বসাটা বোধ হয় বিরাট স্বার্থপরতা।

বিষণ্ণ, ভারাক্রান্ত উমানাথ আরও কিছু ভাবতে যাচ্ছিল, সেই সময় ভাত নিয়ে আসে সুরথ। একটা সিলভারের ঘটিতে জলও এনেছে।

বেলা খানিকটা হেলে গেছে। হাতমুখ ধুয়ে আলের ওপর বসে ছেলের সঙ্গে গল্প করতে করতে

খেতে লাগল উমানাথ। ওদিকে সাঁওতাল কিষান-কিষানীরাও বীজ বোনা থামিয়ে আলের ওপর খেতে বসে গেছে। চারিদিকে যতদূর চোখ যায়, এই দুপুরবেলায় একই দৃশ্য। মাঠের কাজ সাময়িক স্থগিত রেখে সবাই খাচ্ছে।

কথায় কথায় উমানাথ আঙুল বাড়িয়ে অন্য সব জমির কিষানদের দেখাতে দেখাতে সুরথকে বলে, 'এই যে মানুষগুলারে দেখতে আছস, এয়াগো (এদের) কারো জমিন জুমিন নাই। পরের জমিনে প্যাটভাতায় কাম করে।'

অন্যের সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহল নেই সুরথের। অন্যমনস্কর মতো সে বলে, 'অ—'

'পিরথিমীতে কত মাইনষের জমিন নাই, কিন্তক আমাগো আছে। কেমুন জিনি (জানি) লাগে।'

সুরথ উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ দূরে কী দেখে একটু চেঁচিয়েই বলে, 'বাবা—'

ভাতের গরাস মুখ তুলতে যাচ্ছিল উমানাথ। নামিয়ে রেখে বলে, 'কী রে?'

'ঐ দেখ—' বলে পুব দিকে আঙুল বাড়াল সুরথ।

ছেলের আঙুল বরাবর তাকিয়ে উমানাথ দেখতে পায়, রাজা ত্রিলোকীপ্রসাদের সেই পহেলবানেরা 'উই ক্ষেত থেকে ও ক্ষেতে, ও ক্ষেত থেকে সে ক্ষেতে ঘুরে ঘুরে জমি-চষিয়ে লোকগুলোর হাতে হাতে কীসের কাগজ দিচ্ছে।

উমানাথ সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'হেই দিন তরে (তোকে) লইয়া পূইণ্যা (পূর্ণিয়া) টাউনের থনে ফিরনের সময় দেখলাম পালোয়ানেরা গেরামে গেরামে এইরকম কাগজ দিতে আছিল। তর মনে আছে সুরথ?'

সুরথ মাথা কাত করে, 'হ।'

'কিয়ের কাগজ মনে লয় (হয়)?'

ক্যাঠা (কে) জানে।'

পালোয়ানদের দিকে চোখ রেখেই আস্তে আস্তে আবার ভাতের গরাস মুখে তোলে উমানাথ।

দেখতে দেখতে আকাশের পিছল গা বেয়ে সূর্যটা আরেকটু পশ্চিম দিকে নেমে যায়। মাঠের মাঝখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোর ছায়া দীর্ঘ হতে শুরু করে।

সাঁওতালরা খাওয়াদাওয়া সেরেই ফের কাজে নেমে গেছে। সেদিকে লক্ষ্য নেই উমানাথের। সে রাজার পোষা পালোয়ানদের দিকেই তাকিয়ে আছে।

পালোয়ানরা মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে উমানাথের পাশের জমিটায় এসে পড়েছিল। তারা উমানাথকে চেনে। সেদিন রাজা তাকে বেশ সমাদর করে লাড্ডু-কচৌরি-বুন্দিয়া খাইয়েছিলেন। সে-দৃশ্য পহেলবানেরা দেখেছে। তাতে তাদের কাছে উমানাথের খাতির কয়েক শ' গুণ বেড়ে গেছে। মাঠের মাঝখানে তাকে দেখে পালোয়ানেরা সসম্ভ্রমে মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, 'রাম রাম দেওতা। তবিয়ত আচ্ছা হ্যায় তো?'

উমানাথও প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বলে, 'হ। ভালোই আছি। এইদিকে কুন (কোন) কামে?' অর্থাৎ এখানে পালোয়ানেরা কোন উদ্দেশ্যে এসেছে সেটাই তার জিজ্ঞাস্য।

পহেলবানেরা জানায়, রাজাসাব তাদের ভেজেছেন। যারা তাঁর জমিতে কাজ করে তাদের কিছু কাগজ দিতে হবে।

কাগজগুলো কী সংক্রান্ত, সে-সম্বন্ধে কৌতূহল হলেও জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না উমানাথের। তার এদেশে কেমন লাগছে, কোনো তখলিফ বা অসুবিধে ঘটছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি দু-চারটে অতি মামুলি খোঁজ-খবর নিয়ে তারা এখেত থেকে ওখেতে যায় আর একটা তালিকা থেকে ভূমিদাসদের নাম ডেকে কাগজ ধরিয়ে দেয়।

গ্রামে গ্রামে ঘুরে কেন এই কাগজ বিলি করা হচ্ছে, জানার জন্য ভেতরে ভেতরে কিছুটা অস্থিরই হয়ে উঠেছিল উমানাথ। কিন্তু পালোয়ানেরা এ-সম্পর্কে তাকে কিছু বলে নি। ইচ্ছা করলে আশেপাশের জমির যে-কোনো কিষানকে ডেকে সে কাগজ দেখতে পারে কিন্তু পালোয়ানেরা কাছাকাছি থাকায় সেটা

সম্ভব হচ্ছে না। উমানাথ মনে মনে স্থির করে ফেলে, ওরা চলে গেলেই কারো কাছ থেকে কাগজ চেয়ে দেখে নেবে।

কাগজটা কিন্তু চাইতে হয় না। পালোয়ানগুলো খেতের পর খেত পেরিয়ে অনেকদূর চলে গেলে আচমকা রামনগিন কোত্থেকে ছুটে আসে। সে-ও একখানা কাগজ পেয়েছে। কাগজটা মাটিতে নামিয়ে রেখে রামনগিন বলে, 'দেওতা, রাজাসাব এই চারগো কাগজ ভেজা। হামনিকো, বুডটীয়াকো, লেড়কা আউর লেড়কাকে বহুকো অঙ্গুঠাকা (আঙুলের) টিপছাপ লাগা কর দো চার রোজকা অন্দর দেনা পড়েগা। দেখিয়ে ক্যা হ্যায় ইসমে?'

রামনগিন অচ্ছুৎ হতে পারে কিন্তু কাগজের টুকরোর জাত নেই। হেঁট হয়ে সেটা তুলতে তুলতে সে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কুথায় আছিলা?' আজ এখানে এসে মাঠে মাঠে ঘোরার সময় রামনগিনকে দেখেনি সে।

রামনগিন সুদূর দক্ষিণ দিকটা দেখিয়ে বলে, 'ওহী জমিন পর কাম করতা থা—'

দেখেই বোঝা যায়, গর্ভমেন্টের স্ট্যাম্প-মারা কাগজ। ইংরেজিতে টাইপ-করা কী সব লেখা আছে। ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়া উমানাথ ইংরেজি হরফ চেনে কিন্তু এই সব টাইপ-করা লেখা পড়া এবং তার মানে বার করে বোঝার মতো ক্ষমতা তার নেই। ছেলের হাতে কাগজগুলো দিয়ে উমানাথ বলে, 'সুরথ দ্যাখ তো পইড়া।'

ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী সুরথও লেখাগুলো পড়ে আন্দাজে আন্দাজে সিকিভাগের বেশি বুঝতে পারে না। সে বলে, 'এইর (এর) ভিতরে জমিনের ব্যাপার আছে। গোলমাইলা (গোলমেলে) ব্যাপার।'

স্ট্যাম্প কাগজ দেখে আগেই সেরকম গন্ধ পেয়েছিল উমানাথ। সে বলে, 'উকিল টুকিল কাউরে (কাউকে) ধইরা লেখাটা পড়াইয়া লওন দরকার। তার আগে টিপছাপ মাইরো না।'

রামনগিন এবার জানায়, আগেও একবার তার দাদাজি রাজা ত্রিলোকীপ্রসাদজির বাপ ভৈরোঁ-প্রসাদজির পাঠানো খতে টিপছাপ দিয়েছিল। তারা তো আনপড়, লেখাপড়া জানে না। সেই খতটায় নাকি লেখা ছিল তারা দো হাজার রুপাইয়া করজ নিচ্ছে। সেই করজ সুদে বেড়ে বেড়ে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যাতে পুরুষানুক্রমে ওঁদের জমিতে বেগার দিয়েও নাকি শোধ হচ্ছে না। তাই যে কোনো খতে 'টিপছাপ' মারতে তার ভীষণ ভয়। অঙ্গুঠার দাগ বসিয়ে আবার কী ফ্যাসাদে পড়তে হবে, কে জানে। সে বলে, 'ভকিলবাবুকো কিধর (কোথায়) মিলগা! আপহী কুছ ব্যওস্থা কর দেনা দেওতা—'

চট করে পূর্ণিয়া হাইস্কুলের হেড মাস্টার বিষুণচরিতজির মুখ মনে পড়ে যায় উমানাথের। হৃদয়বান স্নেহশীল এই মানুষটিকে একবার দেখেই ভালো লেগে গিয়েছিল তার। সে বলে, 'ঠিক আছে, ব্যবস্থা করতে আছি। তুমার কাগজগুলান আমার কাছে থাকুক।'

সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরার পর উমানাথরা বসতে না বসতেই অবোধী হরদেও মাধোলাল চরখিরাম এবং আরও অনেকে তাৎমাটোলা দুসাটোলা ধোবীটোলা ধাঙড়টোলা অর্থাৎ গোটা ভিরৌলি গাঁ ঝেঁটিয়ে চলে এল। প্রত্যেকের হাতে দু' খানা চারখানা বা পাঁচখানা করে টাইপ-করা স্ট্যাম্প কাগজ।

ক' দিনেই এখানকার লোকজন বুঝেছে, উমানাথ ব্রাহ্মণ এবং দেবতার অংশ হলেও এখানকার নাক-উঁচু খিচখিচিয়া বামুনদের চাইতে হাজার গুণে ভালো। তার কথাবার্তা এবং ব্যবহার ভিরৌলি গাঁয়ের প্রতিটি মানুষকে মুগ্ধ করেছে। তা ছাড়া, এই ক' দিনেই উমানাথকে তাদের আপনা আদমি অর্থাৎ নিজের লোক বলে মনে হয়েছে।

অঙ্গুঠার ছাপ দেওয়ার মহিমা কী, তারা বংশপরম্পরায় বেগার দিতে দিতে টের পেয়ে আসছে। তাই নতুন করে রাজার পাঠানো কাগজে টিপছাপ দিতে তাদের বড় ভয়। এখন কী করা উচিত, তাই জানতেই উমানাথের কাছে তারা ছুটে এসেছে।

উমানাথ পরামর্শ দেবার ব্যাপারে পুরো একদিন সময় চেয়ে নেয়।

এগারো

এতকাল নিজের দিকে ছাড়া আর কারো দিকে তাকাবার কথা ভাবতে পারত না উমানাথ। তার সমস্ত ধ্যানজ্ঞান জুড়ে ছিল এক টুকরো মাটি। যেভাবেই হোক, এই পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে বংশধরদের জন্য নিজস্ব একটি বাড়ি এবং কিছু শস্যক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কিছু কল্পনাই করতে পারত না সে। জীবনের পঞ্চাশ বাহান্নটা বছর ধরে দিবারাত্রি তার ছিল ওই একটা আকাঙ্ক্ষা, একটাই স্বপ্ন। কিন্তু চরচিকন্দি থেকে বহুদূরে এই ভূমিহীন অচ্ছুৎদের দেশে আসার পর তার মনে হয়েছে, নিজে, নিজের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, এবং অনাগত বংশধরদের কথা ভাবলেই চলে না, মাঝে মাঝে অন্যের দিকেও চোখ ফেরাতে হয়। .

পরের দিন সকালবেলা উঠে সুরথকে সাঁওতাল কিষানদের সঙ্গে জমিতে পাঠিয়ে দিল উমানাথ। তারপর আলু আর কাঁঠাল বিচি সেদ্ধ দিয়ে গরম গরম ফেনাভাত খেয়ে রামনগিনদের কাগজগুলো নিয়ে মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে পূর্ণিয়া টাউনের হাইস্কুলে চলে আসে। কাগজগুলো হেড মাস্টার বিষুণচরিতজির হাতে দিয়ে বলে, 'এগুলান পইড়া অথ (মানে) কইয়া দ্যান মাস্টারমশয়।'

বিষুণচরিত দ্রুত কাগজগুলো আগাগোড়া দেখে নিয়ে বলেন, 'আচ্ছা, ত্রিলোকীপ্রসাদ তা হলে জমিদারি বাঁচাতে এইরকম শয়তানি করেছে!'

উমানাথ বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'রাজাসাবে কী করছে মাস্টার মশয়?'

'জমিদারি উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে, শুনেছেন তো?'

বিদ্যুৎ চমকের মতো উমানাথের মনে পড়ে যায়, সেদিন রাজা ত্রিলোকীপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর উকিলবাবুর এই নিয়ে কিছু কথা হয়েছে। গোলগাল মধ্যবয়সী উকিলবাবু ফিটনে করে এসে খুবই চিন্তিত মুখে বলেছিলেন, জমিদারির দিন নাকি শেষ হয়ে যাচ্ছে। দিল্লি না কোথায় যেন জমিদারি তুলে দেবার ব্যাপারে আইন পাশ হয়ে যাবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যস্তভাবে উমানাথ বিষুণচরিতজিকে, বলে, 'হ হ, শুনছি।'

বিষুণচরিতে বলেন 'তাই জমিদারি রাখার জন্য একটা দুর্দান্ত চাল চেলেছে ত্রিলোকীপ্রসাদ।'

'কিসের চাল মাস্টারমশয়?'

বিষুণচরিত এবার সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার করে উমানাথকে বুঝিয়ে দেন। নতুন 'জমিন্দারি অ্যাবলিশন' আইন অনুযায়ী একজন ব্যক্তি যতটা বাসের জমি এবং যতটা চাষের জমি রাখতে পারে তার হাজার গুণ সম্পত্তি আছে ত্রিলোকীপ্রসাদের। আইনে যাতে ধরতে না পারে সেই জন্য বাড়তি সমস্ত জমি বেনামী করে দিচ্ছে সে।

গোটা পূর্ণিয়া জেলায় মাঠের পর মাঠ জুড়ে তাঁর অফুরন্ত শস্যক্ষেত্র। তা ছাড়া যোগবানির দিকে আছে মাইলের পর মাইল জঙ্গলমহল। এই বিপুল সম্পত্তি নিশ্চয়ই প্রথম দিকে নিজের আত্মীয়স্বজন এবং অনুগত মানুষদের নামে তিনি বেনামা করে দিয়েছেন। তারপরও এত জমি উদ্বৃত্ত রয়েছে যা বেনামা করার জন্য অচ্ছুৎ ভূমিদাসদের বেছে নিয়েছেন। প্রথমে স্ট্যাম্প কাগজে টিপসই নিয়ে জমিদারি উচ্ছেদের আগেই ত্রিলোকীপ্রসাদ ওদের নামে জমিগুলো রেজিস্ট্রি করবেন।

উমানাথ এই সময় বলে ওঠে, 'রেজিস্টারি করাইলে জমিনের মালিক তো অরাই (ওরাই) হইয়া যাইব।'

'তা হবে।'

'হেয়াতে (তাতে) জমিনই যদি অন্যের মুইঠে (মুঠোয়) চইলা যায়, রাজাসাবের লাভ কী?'

হাত তুলে উমানাথকে থামিয়ে দেন ত্রিলোকীপ্রসাদ, 'এর মধ্যে কারচুপি আছে উমানাথজি। দেখুন একেক জনকে দু'টো করে স্ট্যাম্প পেপার দেওয়া হয়েছে। একটাতে রয়েছে অচ্ছুৎদের জমির মালিকানা দেবার ব্যবস্থা, আরেকটা হল করজপত্র (ঋণপত্র)। দু' নম্বর কাগজটায় কী লেখা আছে জানেন?'

'না।'

'যে-জমিটা ওদের নামে রাজা লিখে দিয়েছেন সেটাই যেন ওরা অনেক টাকা 'করজ' নিয়ে রাজারই কাছে চড়া সুদে বন্ধক রাখছে। সুদ শুধতে না পারলে পেটভাতায় জমিতে কাজ করে যেতে হবে।'

এতে রাজা দু' দিক থেকে লাভ ওঠাতে পারবেন। এক নম্বর লাভ হল, জমিগুলো বেনামা করা হলে দলিলগুলো তার কাছেই থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ জমিদারিটা যেমন চলছিল তেমনই চলবে। শুধু সিন্দুক অচ্ছুৎদের অঙ্গুঠার ছাপ-মারা কাগজে বোঝাই হয়ে যাবে।'

'আর দুই নম্বর লাভটা কী?'

'এইখানে খুব বুদ্ধি খাটিয়েছেন ত্রিলোকীপ্রসাদ। সেটা হল অচ্ছুৎদের মনে আশা জাগানো। সরকারি অফিসে রেজিস্ট্রি হবার পর ওরা ভাববে এবার জমির মালিক হল। স্বপ্ন দেখবে, সরকারি আদালতে যখন নাম 'রেকর' (রেকর্ড) হয়েছে তখন নিশ্চয়ই জমি একদিন না একদিন তাদের হাতে আসবেই। সেই আশায় বছরের পর বছর বেগার দিয়ে যাবে। ওরা তো লেখাপড়া জানে না। যে-কাগজে টিপছাপ দিতে যাচ্ছে তার মহিমা যে কী, ওরা টের পাবে অনেকদিন পর। হাজার বছর চেষ্টা করলেও ওরা কোনোদিন জমি পাবে না, নামেই মালিক হয়ে থাকবে।'

অর্থাৎ অচ্ছুৎরা যেখানে আছে সেখানেই থেকে যাবে। এইভাবে কেউ যে জমিদারি বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে পারে, উমানাথ কোনোদিন ভাবতেও পারত না। সে বলল, 'তাইলে (তা হলে) হুধাহুধি (শুধু শুধু) টিপসই দিয়া লাভ কী?'

'কিছুই না। নামকাওয়াস্তে মালিক হলে অনেক 'করজ' (ঋণ) ঘাড়ে চেপে যাবে। এখনই তো বাপ-দাদার করজের দায়ে মরছে, নতুন করজ মাথায় চাপলে ছেলে, নাতি এবং নাতির ছেলে পর্যন্ত আরও কয়েক পুরুষ আর দেখতে হবে না। সবাইকে বেগার দিয়ে যেতে হবে।'

বিষুণচরিতকে কাগজগুলো দেখিয়ে ভিরৌলিতে ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়।

ফাল্গুন মাস পড়ে গেছে কিন্তু এখনও শীতের যাবার নাম নেই। দিনের বেলাটা রোদে রোদে একরকম কাটে। সন্ধে হলেই পূর্ণিয়ার খোলা আকাশ থেকে হিম পড়তে শুরু করে। কনকনে ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে আসতে থাকে যেন।

হিমে-ভেজা মেটে রাস্তা থেকে বাড়িতে ঢুকতেই উমানাথের চোখে পড়ে উঠোনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে ভিরৌলি গাঁয়ের অচ্ছুৎরা সেটার চারপাশে বসে হাত-পা সেঁকছে। সে বুঝতে পারল, তারই জন্য ওরা অপেক্ষা করছে। আজ যে সে কাগজের ইংরেজি লেখা পড়াতে পূর্ণিয়া যাবে, সবাই তা জানত।

উমানাথ কুয়োর পাড় থেকে হাত-পা ধুয়ে দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসে।

রামনগিন গোটা অচ্ছুৎ সমাজের প্রতিনিধি হয়েই যেন শুধোয়, 'কা হুয়া দেওতা? কাগজমে কা লিখা হ্যায়?'

বিষুণচরিতের কাছে যা-যা শুনে এসেছিল, হুবহু তা বলে যায় উমানাথ।

আগুনের কুণ্ডের চারধারে ভিরৌলি গাঁয়ের লোকগুলো কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। তারপর মৃদু একটা গুঞ্জন শোনা যায়। 'ইসি লিয়ে রাজাসাব হামনিলোগনকো জমিনকে মালিক বনানে চাহ্‌তা। হো রামজি, তেরে কিরপা—'

রামনগিন উমানাথকে জিজ্ঞেস করে, 'অঙ্গুঠাকা ছাপ দেগা, কা নেহী?'

উমানাথ বলে, 'হুটাহুধি ছাপ দিয়া কী হইব? মালিক তো হইতে পারবা না।'

'ওহী ঠিক বাত—'

'নায় নায়—' আচমকা আগুনের কুণ্ডের পাশ থেকে অনেকে উঠে দাঁড়ায়, 'অঙ্গুঠা ছাপ নায় দেনেসে (না দিলে) রাজাসাব বাহুত গুস্‌সা হো যায়েগা। আরে বাপ—নায় নায়—' তারা আর দাঁড়ায় না, ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যায়।

আজুলাল বলে, 'বাহোত ডর গিয়া—'

বেশির ভাগই চলে গেছে। কিন্তু তারপরও বেশ কয়েকজন থেকে গেল। তাদের চোখেমুখেও ভয় দ্বিধা এবং সংশয়। ওরা জিজ্ঞেস করে, 'অব কা করে দেওতা?'

উমানাথ বলে, 'আমি হইলে টিপসই দিতাম না, অহন তুমারই ভাইবা দেখ।'

বারো

আরও দিন তিনেক বাদে রাজা ত্রিলোকীপ্রসাদের পোষা পহেলবানেরা ভিরৌলিতে হানা দিল! দুসাদটোলা তাৎমাটোলা গঞ্জুটোলা ধোবীটোলা, এমনি সব পাড়ারই বেশির ভাগ মানুষ মুখ বুজে টিপসই দিয়ে কাগজগুলো পহেলবানদের হাতে ফেরত দেয়। তবে রামনগিনের মতো যারা অঙ্গুঠার ছাপ দিতে রাজি হয় না, পহেলবানেরা তাদের বোঝাতে চেষ্টা করে, আ রে উল্লু, তুমলোগন জমিনকো মালিক বনেগা। দে অঙ্গুঠা ছাপ—'

অনিচ্ছুক রামনগিনরা বলে, 'এ (ফান্দা) ফাঁদ হ্যায়। দেওতা বোল দিয়া অঙ্গুঠাছাপ দেনেসে কুছ ভি ফায়দা নেই।' সে আরও বলে যায়, ফায়দা তো হবেই না, জমির আশায় থেকে থেকে নিজেদের জীওন (জীবন) বরবাদ হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যৎ কয়েক পুরুষের ঘাড়ে বেগারি চেপে বসবে।

কাকে দেওতা বলা হয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না পহেলবানদের। নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ কী পরামর্শ করে, তারপর রামনগিনদের কিছু না বলে তারা নবলপুরায় ফিরে যায়।

পরের দিনই আবার এল পহেলবানেরা। এবার এসেছে হাতির পিঠে চেপে। আগের দিন রামনগিনদের মতো যারা অঙ্গুঠার ছাপ দিতে গাঁইগুঁই করেছে, তাদের বাড়িঘর হাতি দিয়ে প্রথমে গুঁড়িয়ে দিল। ভিরৌলি গাঁয়ে বিদ্রোহের যে সামান্য একটি অঙ্কুর মাথা তুলেছিল হাতির পায়ের তলায় তা পিষে দেওয়া হল এবং অন্যদেরও বোঝানো হল, রাজা ত্রিলোকীপ্রসাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে তার ফলাফল কী হতে পারে।

কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে পহেলবানেরা উমানাথের বাড়ি এসে তাকে হাতির পিঠে চড়িয়ে সোজা নবলপুরায় ত্রিলোকীপ্রসাদজির বাড়িতে চলে এল। সুরথ খুব চেঁচামেচি করছিল বলে তাকেও নিয়ে আসা হয়েছে।

ত্রিলোকীপ্রসাদজি সেদিনকার মতো তাঁর মোসাহেবের দল এবং সেই মৈথিলি বামুনদের নিয়ে বসে ছিলেন। তবে সময়টা বিকেল বলে ডলাইমলাইটা আর হচ্ছিল না।

বুকের ভেতরটা ভয়ে কাঁপছিল উমানাথের। কিন্তু বাইরে সেটা বুঝতে দিচ্ছিল না।

ত্রিলোকীপ্রসাদ কিন্তু খুবই সদয় ব্যবহার করলেন তাঁর সঙ্গে। সেদিনকার মতোই লাড্ডু-কচৌরি-পেঁড়া এবং বুন্দিয়া আনিয়ে খাওয়ালেন। তারপর যা বললেন তা এইরকম। বঙ্গাল থেকে আগত ব্রাহ্মণ উমানাথ সম্পর্কে তাঁর প্রচুর সহানুভূতি। দেশ হারানোর দুখ এবং কষ্ট তিনি নিজে না পেলেও কিছুটা অনুভব করতে পারেন। তবে অচ্ছুৎদের সঙ্গে থাকাটা ব্রাহ্মণের উপযুক্ত কাজ নয়। জল-অচলদের সংসর্গ তাঁর এই মুহূর্তে ত্যাগ করা দরকার।

উমানাথ ভয়ে ভয়ে বলে, 'কিন্তুক ভিরৌলি ছাড়লে আমি থাকুম কুনহানে?'

ত্রিলোকীপ্রসাদ বলেন, 'তার ব্যবস্থা আমি নবলপুরায় করে দেব।'

'কিন্তুক—' ঢোক গিলে উমানাথ বলে, 'আমি তো ভিরৌলি গেরামে আচ্ছাই আছি রাজাসাব—'

সঙ্গে সঙ্গে মৈথিলি ব্রাহ্মণদের একজন বলে ওঠে, 'এ আদমি উপবীতধারী বরাম্ভন কিনা আমার সন্দেহ হয়। এর সব কিরিয়া করম (ক্রিয়াকর্ম) মেলছদের মতো। মছলিখোর মাংসখোর এই লোকটা নইলে কি অচ্ছুৎদের গাঁয়ে গিয়ে ঘাঁটি গাড়ে? আর তাদের রাজার বিরুদ্ধে তাতায়?'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে ত্রিলোকীপ্রসাদ বলেন, 'জমিদার আর রাজার কাজ হল বরাম্ভনের সম্মান করা আর বরাম্ভনের কাজ হল রাজার স্বার্থ দেখা। রাজা আর বরাম্ভনের এই সম্পর্ক হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে। যত দিন আকাশে সূরয আর চান্দা থাকবে ততদিন এই সম্পর্ক বজায়

থাকবে। নবলপুরায় একটি কোঠির ব্যওস্থা করে দিচ্ছি, কালই চলে আসবেন। অন্য সব দিক আমি দেখব।'

উমানাথের চোখের সামনে ভিরৌলি গাঁয়ের বঞ্চিত অসহায় মানুষগুলোর মুখ ভেসে ওঠে। সে বলে, 'কিন্তুন—'

ত্রিলোকীপ্রসাদ সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'বরাম্ভন বলে এতক্ষণ আপনাকে ভক্তি করে এত কথা বললাম। বরাম্ভনের গা থেকে খুন ঝরবে, এটা আমি সইতে পারব না। লেকেন আমি যখন বলছি, আপনাকে ভিরৌলি ছাড়তেই হবে। কথাটা মনে রাখবেন। ওখানে থেকে অচ্ছুৎদের তাতাবেন, সেটা হবে না।'

ত্রিলোকীপ্রসাদের বাড়ি থেকে রাস্তায় আসতেই নিজের মধ্যে কোথায় যেন দুর্জয় সাহস অনুভব করে উমানাথ। ভিরৌলি গাঁয়ের মানুষগুলোকে ছেড়ে কিছুতেই নবলপুরায় আসবে না সে। এতে যা হবার তা হোক। চরচিকন্দির কয়েকটা বছর বাদ দিলে রামনগিনদের মতো সারা জীবন সে তো ভূমিহীনই ছিল। আবার না হয় সে নির্ভূম হবে। এটা তার কাছে নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নয়। যেটা নতুন তা হল ভিরৌলি এবং তার চারপাশের গাঁগুলোর গরিবের চাইতে গরিব, হতভাগার চাইতেও হতভাগা, বঞ্চিত, শোষিত মানুষগুলোর জন্য এবার তাকে উচ্ছেদ হতে হবে। উৎখাত হলেও সে এখান থেকে যাবে না।

এতকাল নিজের ঘর সংসার স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে যে জগৎ সেই পরিধির বাইরে কোনোদিন তাকিয়ে দেখেনি উমানাথ। যা কিছু করার নিজের এবং নিজের সন্তানদের জন্যই করে এসেছে। কিন্তু এ-সব একান্ত ব্যক্তিগত আশা-আকাঙক্ষা সাধ-আহ্লাদের বাইরেও যে মানুষের আরও বিরাট এবং ব্যাপক ভূমিকা থাকতে পারে, ভিরৌলিতে না এলে জানা যেত না। এবার থেকে ভিরৌলির নির্ভূম মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে তার নতুন ভূমিকা সম্পর্কে সর্বক্ষণ সজাগ থাকবে উমানাথ।

গল্প

ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী

হেকমপুরা টৌন বা টাউনকে শহর বললে অনেক বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়। পনের কুড়িটা খোয়ার রাস্তা বাদ দিলে বাকিগুলো সবই মাটির, এখানে যাকে বলে 'কাচ্চী' অর্থাৎ কাঁচা সড়ক।

সেই উনিশ শ ছেচল্লিশে হেকমপুরায় পাকা বাড়ি আর ক'টা! বড় জোর তিরিশ কী চল্লিশ। এর ভেতর একটাই শুধু তেতলা, যার মালিক গৈবীনাথ মিশ্র। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ গৈবীনাথ এই তল্লাটের সবচেয়ে বড় ব্যবসাদার। তার বাড়ির মাথা ছাপিয়েও শহরের দুই প্রান্তে দুটো মন্দির দাঁড়িয়ে আছে — একটা শিবের, অন্যটা রামসীতার। এছাড়া বাকি বাড়িগুলোর মাথায় টিন বা টালির চাল, দেওয়াল মাটি কিংবা ইটের।

বছরের বেশির ভাগ সময় রাস্তাগুলোতে এত ধুলো জমে থাকে যে হাঁটতে গেলে পায়ের পাতা ডুবে যায়। বর্ষায় এই সব রাস্তা একেবারে নদী বনে যায়; দু'পাশের কাঁচা দুর্গন্ধওলা নর্দমার সঙ্গে তখন সেগুলো একাকার।

হেকমপুরার দক্ষিণ দিকটায় থাকে উঁচু জাতের লোকেরা—ব্রাহ্মণ, কায়েত এবং কিছু রাজপুত ক্ষত্রিয়। উত্তরে থাকে দোসাদ, গাঙ্গোতা, তাতমা, ধাঙড় আর কোয়েরিরা। তাদের বেশির ভাগই ছুঁয়াছুতের বিচারে জলচল নয়; সোজা কথায় অচ্ছুৎ। উত্তর-পশ্চিম কোণে থাকে গরিবের চেয়েও গরিব বিশ পঁচিশ ঘর মুসলমান।

শহরটাকে দু'ভাগ করে মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে চওড়া একটা নহর বা খাল; সেটার ওপর কাঠের পুল।

হেকমপুরায় সেই ছেচল্লিশে মোটর ছিল সবসুদ্ধ পাঁচ খানা। গৈবীনাথ মিশ্রর দু'খানা। বড় জমিমালিক অবোধ নারায়ণ সিং, সরযূপ্রসাদ সহায় আর লালনাথ দাসের একটা করে। এছাড়া বাদবাকি সবই ঘোড়ায় টানা টাঙ্গা আর গৈয়া বা গরুর গাড়ি। ক্বচিৎ দু-চারটে সাইকেল।

তখনও বিজলি বাতি আসেনি হেকমপুরায়। গৈবীনাথ এবং অন্য হাতে গোনা ক'জন পয়সাওলা বড় লোকের বাড়িতে ডাইনেমো চালিয়ে রাতে আলো জ্বালা হত। অন্য সকলের ঘরে কেরোসিনের কুপি বা লণ্ঠন।

পৃথিবীর হট্টগোল থেকে বহুদূরে, তুচ্ছ হেকমপুরা টাউনটা জুড়ে অগাধ শান্তি। হই চই নেই, হাঙ্গামা নেই, নেই তোলপাড়-করা উত্তেজক কোনো ঘটনা। এখানকার বাসিন্দাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল মোটামুটি ভালোই। ঢিমে চালে শহরের জীবনধারা বয়ে যেত।

শামুক যেমন শক্ত খোলের ভেতর নিজেকে লুকিয়ে রাখে, হেকমপুরাও তেমনি দুনিয়ার সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবহমান কালের শান্তি অটুট রাখা সম্ভব হল ন।

হাওয়ায় হাওয়ায় খবরটা ভেসে আসছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। অনেক দূরে কোথায় কলকাতা, কোথায় বোম্বাই, দিল্লি, পাঞ্জাব আর কোথায়ই বা লাহোর—এই সব জায়গায় নাকি দাঙ্গা শুরু হয়েছে। রোজ কত মানুষ যে খুন হচ্ছে, কত বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, কত যুবতী মেয়ের ইজ্জৎ নষ্ট হচ্ছে, তার নাকি লেখাজোখা নেই। কলকাতা বোম্বাই লাহোরের ট্রেনগুলো লাশের পাহাড় নিয়ে কোথায় কোন দরিয়ায় নাকি ফেলে আসছে। আরও শোনা যাচ্ছিল, দেশটা নাকি দু টুকরো হয়ে যাবে। এক ভাগ হবে হিন্দুর, আর এক ভাগ মুসলমানের। এই সব খবর হেকমপুরার শান্ত, নিরুদ্বেগ ধমনীতেও হঠাৎ খানিকটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। পড়শি নিরীহ মুসলমানদের পাড়াটার দিকে অনেকেই সন্দেহের

চোখে তাকাতে লাগল। সারা দেশের আবহাওয়া যখন বিষবাষ্পে ছেয়ে গেছে তখন নগণ্য এই হেকমপুরা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে কী করে?

এখানকার মানুষজনের কাছে কলকাতা বোম্বাই লাহোর তো বহুদূরের ভিন্ন কোনো গ্রহের অজানা শহর। কিন্তু হেকমপুরা থেকে মাত্র বার মাইল তফাতে বড় টাউন বারহৌলিতে যখন খুনখারাপি শুরু হল এই অঞ্চলের উত্তেজনা এক লাফে একশ গুণ চড়ে গেল।

এই সবে সকাল হয়েছে। বর্ষাকাল শেষ হয়ে এলেও আকাশে বেশ কিছু ভবঘুরে মেঘ এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছে। রোদ উঠেছে ঠিকই, তবে মেঘের জন্য তার জেল্লা নেই; কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে আর নিভু নিভু।

হেকমপুরা টাউনের উত্তর দিকে অচ্ছুৎটুলির মাঝামাঝি জায়গায় ধুন্নিলালের টিনের চালের দু-কামরাওলা বাড়ি। সামনের দিকে মাটির চবুতর। তার একধারে পাতকুয়ো, নাহানা বা স্নান করার জন্য খানিকটা বাঁধানো চাতাল। আর একধারে রসুইঘর, সেটার পাশে ধুন্নিলালের ঘোড়ার জন্য আস্তাবল, যার চারখানা নড়বড়ে খুঁটির মাথায় খড়ের ছাউনি কিন্তু দেওয়াল বলতে কিছু নেই, সব দিক খোলা। পুরো বাড়ির চৌহদ্দি কোমর সমান কাঁটা গাছ দিয়ে ঘেরা। যাতায়াতের জন্য খানিকটা জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছে।

বাঁ দিকের ঘর থেকে হাই তুলতে তুলতে বাইরের বারান্দায় এসে বসল ধুন্নিলাল। তার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। এই বয়সেও স্বাস্থ্য বেশ মজবুত। গায়ের রং তামাটে, চুল চামড়া ঘেঁষে ছোটো ছোটো করে ছাঁটা। পরনে আধময়লা চাপা পাজামা আর হাফ-হাতা গেঞ্জি।

ধুন্নিলালের চোখদুটো এই মুহূর্তে টকটকে লাল। কাল সারারাত সে ঘুমোতে পারেনি। দূর দূর থেকে চিৎকার ভেসে আসছিল। 'কালী মাঈকি জয়', 'জয় বজরঙ্গবালী কী' কিংবা 'আল্লা হো আকবর'। শুধু কি কালই, ক'দিন ধরেই রাতের দিকে এসব শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু কাল রাতে তার মাত্রাটা ছিল অনেক বেশি উত্তেজক।

ধুন্নিলাল এবার তার ডান পাশের ঘরটার দিকে তাকায়। ওটায় থাকে তার মেয়ে মুনিয়া। ওর বয়স সতের আঠারো, এখনও বিয়ে হয়নি। মুনিয়া ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ নেই তার। স্ত্রী বুধনি বছর তিনেক আগে খুব খারাপ ধরনের চেচকে (বসন্তে) মারা গেছে। জাগতিক বন্ধন বলতে ধুন্নিলালের ওই একটাই মেয়ে। এছাড়া আছে দু'টি প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী — একটা বন্দুক আর একটা ঘোড়া।

ধুন্নিলাল লক্ষ করল, মুনিয়ার ঘরের দরজা বন্ধ, অর্থাৎ এখনও মেয়েটার ঘুম ভাঙেনি। কাল রাতভর হল্লা শুনে সে ছটফট করছিল; হয়তো ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ধুন্নিলাল মেয়েকে আর ডাকাডাকি করল না, বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে গেল। আর তখনই বাঁ ধারের খড়ের ছাউনির তলা থেকে ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি ডাকটা ভেসে এল।

থমকে দাঁড়িয়ে যায় ধুন্নিলাল, মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ে বাদামি রঙের স্বাস্থ্যবান প্রাণীটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ঘোড়াটা ডাকাডাকি তো করছেই, সেই সঙ্গে মাটিতে সমানে পা ঠুকে যাচ্ছে। এটা তার আনন্দের প্রকাশ। সকালবেলা ধুন্নিলাল তার ঘরে থেকে বেরুলেই ঘোড়াটা অস্থির হয়ে ওঠে।

ধুন্নিলাল হাত তুলে বলল, 'সবুর কর থোড়েসে। আমি মুখ ধুয়ে আসছি।' বলে উঠোনের শেষ মাথায় কুয়োটার দিকে চলে গেল।

চোখে মুখে জল দিয়ে ফিরে এসে ধুন্নিলাল দেখতে পায়, ঘোড়াটা এখনও সমানে পা ঠুকে যাচ্ছে। সঙ্গে সেই চিঁহি চিঁহি আওয়াজটা তো আছেই। ধুন্নিলাল দাঁড়ায় না, সোজা ঘরের ভেতর ঢুকে কিছু শুকনো চানা এনে ঘোড়াটার সামনে একটা পুরোনো, কালচে সিলভারের গামলায় ঢেলে দেয়।

ঘোড়াটা তক্ষুনি খাওয়া শুরু করে না, গলাটা উঁচু করে সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয়। তার উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয় না ধুন্নিলালের। সে আদর চাইছে।

ধুন্নিলাল ঘোড়াটার গলায় গালে আলতো চাপড় মেরে, মাথায় এবং পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে একনাগাড়ে বলে যায়, 'মেরে মুন্না, মেরে চুন্না—'

মেয়ে মুনিয়ার সঙ্গে মিলিয়ে ঘোড়াটার সে নাম দিয়েছে মুন্না। প্রাণীটা কথাই শুধু বলতে পারে না; তবে মানুষের, বিশেষ করে ধুন্নিলালের ভাষা বোঝে। চিঁহি চিঁহি'র সঙ্গে তার গলা থেকে দুর্বোধ্য শব্দ বেরিয়ে আসতে থাকে, আরামে চোখ বুজে আসে। রোজ সকাল বেলায় এই আদরটুকু না পেলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় মুন্নার।

ঘোড়ার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে আকাশের দিকে হঠাৎ নজর চলে যায় ধুন্নিলালের। ছন্নছাড়া কিছু মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে সেখানে। সূর্যটাকে ঢেকে দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়, সেগুলোর ফাঁক দিয়ে ভাদ্রের চড়া রোদ মাঝে মাঝেই বেরিয়ে আসছে। বেশ বেলা যে হয়েছে তা টের পাওয়া যায়।

হঠাৎ ধুন্নিলালের মনে পড়ে গেল, আজ দশটার মধ্যে হেকমপুরার সবচেয়ে বড় ব্যবসাদার গৈবীনাথ মিশ্রর বাড়ির সামনের বড় মাঠে বিরাট 'মিটিন' হবে। পাটনা থেকে বড়ে বড়ে আদমীরা এসে কী সব বলবেন। ক'দিন ধরে মুখে চোঙা লাগিয়ে গৈবীনাথের ভলান্টিয়াররা হেকমপুরার টৌলিতে টৌলিতে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, আজ সবাইকে 'মিটিন'-এ হাজিরা দিতে হবে। যার যত কাজই থাক, সব ফেলে ওখানে না গেলে চলবে না। এই 'মিটিন'-এর সঙ্গে হেকমপুরা এবং তার চারপাশের তাবত গাঁ-গঞ্জের যত হিন্দু আছে তাদের বাঁচা-মরার সওয়াল নাকি জড়িয়ে আছে।

গৈবীনাথ এই এলাকার সব চেয়ে বড় ব্যবসাদার তো বটেই, হিন্দুদের সব থেকে জবরদস্ত নেতা। তাঁর হুকুমনামা অমান্য করার মতো বুকের পাটা কারুর নেই। বিশেষ করে ধুন্নিলালের। সে খানিকটা লেখাপড়া জানে। তার জোরে গৈবীনাথের আড়তগুলোতে হিসেব রাখার কাজ করে। অন্য সবার আগে তারই 'মিটিন'-এ পৌঁছনো দরকার।

ধুন্নিলাল ঘোড়াটাকে বলল, 'মুন্না, এখন আর তোর গায়ে হাত বুলোবার সময় নেই। বেরুতে হবে। তুই চানা খা—'

ঘোড়াটা যথেষ্ট বিবেচক, মাথাটা কয়েক বার ঝাঁকিয়ে গামলায় মুখ নামিয়ে দিল।

ধুন্নিলাল ফের তার ঘরে গিয়ে ঢোকে এবং একটা সেকেলে বন্দুক, পুরোনো কাপড়ের টুকরো আর তেল বার করে এনে বারান্দায় থেবড়ে বসে পড়ে। বন্দুকটা বে-আইনি নয়, দস্তুরমতো এটার লাইসেন্স আছে। গৈবীনাথ ক'দিন ধরেই ধুন্নিলালকে বলছেন, বন্দুকটা যেন ঘষে মেজে প্রস্তুত রাখে। খুব খারাপ দিন এসে গেছে। ধুন্নিলালের মারণাস্ত্রটার ভীষণ প্রয়োজন।

বন্দুকটার গায়ে দু-এক জায়গায় সামান্য মরচে ধরেছে। কাপড়ের ফালিটা ভাঁজ করে সামান্য জলে ভিজিয়ে ঘষতে থাকে ধুন্নিলাল। মরচে তোলার পর ওটার গায়ে ভালো করে কড়ুয়া তেল লাগাতে হবে। বন্দুকের যে অংশটা কাঠের তৈরি সেখানে ময়লা জমে কালচে হয়ে আছে। ময়লা তুলে দোকান থেকে বার্নিস এনে লাগতে হবে। তাছাড়া লম্বা নলের ভেতর কিছু ধুলো টুলো ঢুকে গেছে; সে সবও সাফ করতে হবে। আসলে বহুদিন এটা ব্যবহার করা হয়নি; যে চৌপায়ায় ধুন্নিলালের বিছানা তার তলায় ফেলে রাখা হয়েছিল।

এই ঘোড়া আর বন্দুকটা একসময় ছিল ফালমন সাহেবের। ফালমন অর্থাৎ ফারমোর। ফ্রান্সিস ফারমোর ছিলেন এই অঞ্চলের জবরদস্ত পুলিশ অফিসার। তখন তো হেকমপুরায় আজকালকার মতো এত চার চাকাওলা মোটর ছিল না। কোথাও যেতে হলে ঘোড়াই ছিল ফালমন সাহেবের একমাত্র ভরসা। সেই ঘোড়াটার দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ধুন্নিলালকে। বাদামি রঙের এই প্রাণীটাকে

যথেষ্ট যত্ন করত সে। স্নান করানো, সময়মতো দানা খাওয়ানো, ডলাই মলাই করা—কোথাও এতটুকু ত্রুটি ছিল না।

তাছাড়া যে বন্দুকটার গা থেকে ধুন্নিলাল এই মুহূর্তে ধুলোময়লা সাফ করছে, ফারমোর সাহেব সেটাও তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। একটি না-মানুষ প্রাণী এবং একটা আগ্নেয়াস্ত্রের পরিচর্যা যেভাবে সে করত তাতে ফারমোর খুব খুশি ছিলেন। তিনি ধুন্নিলালকে নিজের হাতে বন্দুক চালাতে শিখিয়েছিলেন। তার নামে একটা লাইসেন্সও করে দিয়েছিলেন। ফারমোর সাহেবকে না জানিয়ে ঘোড়া চালানোটা সে নিজেই শিখে নিয়েছিল।

হেকমপুরা বা তার আশেপাশে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট খুব কমই হত। সময় নির্বিঘ্নেই কেটে যাচ্ছিল। মাঝে মধ্যে কখনও ডাকাতি, রাহাজানি বা খুনখারাপির মতো ঘটনা ঘটলে এই বন্দুকটা হাতে নিয়ে ওই ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়তেন ফারমোর সাহেব। তার পেছন পেছন ঘোড়সওয়ার পুলিশের দলও যেত। ওদের ঘোড়াগুলোর দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল অন্য সহিসের, ধুন্নিলালের নয়।

ধুন্নিলাল বেশ বেশি বয়সেই ফারমোর সাহেবের কাছে কাজ নিয়েছিল। তিন চার বছর কাটার পর তার কানে কিছু কিছু খবর আসছিল, আংরেজদের সঙ্গে কাদের নাকি ভারি লড়াই শুরু হয়ে গেছে। তবে জিনিসপত্রের দাম আচমকা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যাওয়া ছাড়া সেই যুদ্ধের আঁচ এখানকার গায়ে তেমন লাগেনি।

বড় লড়াই যখন চলছে, সেই সময় হঠাৎ তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল। গান্ধিবাবার নামটা জানা ছিল ধুন্নিলালের। তিনি নাকি কোথায় হুকুম জারি করেছেন, হিন্দুস্থানে আংরেজদের থাকা চলবে না। দেশে স্বরাজ আনতে হবে।

গান্ধি বাবার নাম যেমন সে শুনেছিল তেমনি কংগ্রেসের নামটাও তার অজানা ছিল না। কংগ্রেসওলারা তখন সারা দেশ জুড়ে 'মিটিন' করে বেড়াচ্ছে। এমনকি বারহৌলিতেও গান্ধিবাবা এসে 'মিটিন' করেছেন। তাঁর কথা জানার জন্য হাজার হাজার মানুষ ভেঙে পড়েছিল সেখানে।

সেটা উনিশ শ বেয়াল্লিশ সাল। হেকমপুরায় তেমনভাবে টের না পাওয়া গেলেও, বারহৌলি টাউন একেবারে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। গান্ধিবাবা চলে যাবার পর সেই বেয়াল্লিশে দিনরাত বারহৌলিতে আকাশ ফাটানো শ্লোগান শোনা যেত, 'আংরেজ ভারত ছোড়ো'—শুধু তাই না, কংগ্রেসের লোকেরা রেল লাইন উপড়ে, টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে, পোস্ট অফিস আর থানায় আগুন লাগিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছিল।

এদিকে পুলিশ অফিসার ফারমোর সাহেব একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। স্বরাজওলা গান্ধিবাবা আর তাঁর চেলাদের ওপর প্রচণ্ড আক্রোশ লোকটার। ওই ঘোড়া অর্থাৎ মুন্নার পিঠে চড়ে যে বন্দুকটা ধুন্নিলাল এখন সাফ করছে সেটা বাগিয়ে ধরে গোটা বারহৌলি শহর তিনি একেবারে চষে বেড়াতেন। আর কুৎসিত আংরেজি গালিতে স্বরাজওলা কংগ্রেসীদের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে করতে বেপরোয়া গুলি চালিয়ে যেতেন। ফলে কত যে সোনার টুকরো ছেলে তাঁর হাতে খুন হয়েছে তার লেখাজোখা নেই। চোখের সামনে এই সব হত্যাকাণ্ড দেখতে দেখতে মন ভীষণ খারাপ হয়ে যেত ধুন্নিলালের। কিন্তু তার মতো একজন ছোটোখাটো ঘোড়ার সহিসের মুখ বুজে দেখা ছাড়া আর করারই বা কী ছিল?

ফারমোর সাহেব মানুষটা ছিলেন দিলদরিয়া মেজাজের, যাকে পছন্দ করতেন দেদার বকশিস দিতেন। ধুন্নিলাল তাঁর কাছ থেকে প্রচুর টাকা, দামি দামি খাবার, নতুন প্যান্ট-জামা উপহার হিসেবে পেয়েছে।

সবই ভালো লোকটার কিন্তু ভারতের স্বরাজ, গান্ধিবাবা আর কংগ্রেসীদের নাম শুনলে তাঁর

শরীরের সব রক্ত মাথায় গিয়ে চড়ত। এমন একটা খ্যাপামি তাঁর ওপর ভর করত যেন হাতের কাছে গান্ধিবাবা বা তাঁর সহযোদ্ধাদের পেলে একেবারে ছিঁড়ে ফেলবেন।

বেয়াল্লিশে দেশের আজাদির সেই আন্দোলন একদিন থেমে যায়। তার দু'বছর বাদে ফারমোর সাহেব ইণ্ডিয়া ছেড়ে বিলেতে ফিরে যান। যাবার সময় তাঁর নিজস্ব ঘোড়া আর বন্দুকটা ধুন্নিলালকে দিয়ে গেছেন। তারপর থেকে গৈবীনাথের আড়তে কাজ নিয়েছে সে। একমাত্র মেয়ে মুনিয়া, ঘোড়া আর বন্দুক—এই নিয়ে তার সংসার।

বন্দুকরটার মাজা ঘষা যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় পাশের ঘরের দরজা খুলে মুনিয়া বেরিয়ে এল। বয়েস সতের আঠারো হলেও তেমন বাড় নেই মেয়েটার। রোগাটে পাতলা চেহারা। গায়ের রং তামাটে। তবে মুখখানা বেশ ভরাট। ভাসা ভাসা, টানা চোখ দু'টিতে নিষ্পাপ সারল্য যেন মাখানো। পরনে রঙিন ঘাঘরা আর ঢোলা জামার ওপর ওড়না।

মুনিয়ার চোখে মুখে এখনও ঘুম জড়িয়ে আছে। ধুন্নিলালের দিকে তাকাতে তাকাতে আঙিনায় নেমে গেল সে। এক কোণে কুয়োর ধার ঘেঁষে খানিকটা ঘেরা জায়গায় স্নানের ব্যবস্থা। কুয়ো থেকে দু বালতি জল তুলে সেখানে ঢুকে গেল মেয়েটা। শীতগ্রীষ্ম বার মাস ঘুম থেকে উঠে স্নান করাটা তার অনেক দিনের অভ্যাস। সকালে 'নাহানা' করতে না পারলে সারাদিন তার শরীর নাকি খারাপ লাগে।

আচমকা দূর থেকে চিৎকার ভেসে এল।

'কালী মাঈকি—'

'জয়—'

'বজরঙ্গবালী কী—'

'জয়—'

'হর হর মাহদেও—'

কাল মাঝরাত পর্যন্ত এগুলো একটানা শোনা গেছে। তারপর থেমে গিয়েছিল। এখন ফের নতুন উদ্যমে শুরু হয়েছে।

বন্দুকের নল থেকে ঘষে ঘষে মরচে ছাড়াতে ছাড়াতে একটু চমকে উঠল ধুন্নিলাল। কান খাড়া করে আন্দাজ করে নিল, আওয়াজটা গৈবীনাথ মিশ্রর বাড়ির দিকে থেকেই আসছে। অর্থাৎ 'মিটিন'-এর জন্য লোক জমতে শুরু করেছে।

এখন বাড়িতে বসে থাকা ঠিক হবে না। ধুন্নিলাল মনে মনে ঠিক করে ফেলল, আজ রাতের দিকে বন্দুকটা পুরো সাফ করে প্রস্তুত করে রাখবে। আর দেরি করলে গৈবীনাথজি খেপে যাবেন।

বন্দুকটা নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় বালিশের তলায় রেখে একটা ঢোলা ফুল প্যান্ট আর শার্ট পরে বাইরে বেরিয়ে আসে ধুন্নিলাল। বারান্দার একধারে মোটা চামড়ার একজোড়া ভারি বুট রয়েছে। সেটা পায়ে গলিয়ে যখন সে ফিতে বাঁধছে সেই সময় 'নাহানা' সেরে আঙিনা পার হয়ে ঘরের দিকে আসছে মুনিয়া। ধুন্নিলাল বলল, 'আমি বেরুচ্ছি রে মুনিয়া।'

গৈবীনাথের বাড়ির সামনে যে জমায়েত হবে তার খবরটা মুনিয়া আগেই জেনেছে। বলল, 'তুমি কি 'মিটিন'-এ যাচ্ছ?'

'হাঁ।'

'কখন ফিরবে?'

'ঠিক নেই। 'মিটিন' কতক্ষণ চলবে, তারপর গৈবীনাথজি কী করতে বলবেন, কিছুই জানি না। এমনও হতে পারে সাম তক আটকে রাখলেন।'

মুনিয়া বলল, 'তুমি কিছুক্ষণ বসে যাও। আমি চা-পানি আর চাপাটি বানিয়ে দিচ্ছি।'

ধুন্নিলাল বলল, 'এখন 'টেইম' নেই।' ফারমোর সাহেবের কাছে কয়েক বছর কাটানোর কারণে তার কথায় মাঝে মাঝে দু-চারটে আংরেজি বুলি ঢুকে যায়।

মুনিয়া বারান্দায় উঠে এসেছিল। সে বলে, 'তা হলে হালুইকরের দুকানে কিছু খেয়ে নিও।'

'হাঁ।'

বারান্দা থেকে আঙিনায় নামার জন্য আলগা ইট পেতে সিঁড়ি বানিয়ে নিয়েছে ধুন্নিলাল। নিচে নামতে নামতে হঠাৎ তার খেয়াল হয়, মেয়েটা সারাদিন একা একা বাড়িতে থাকবে। অন্য সময় হলে চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু এখন শহর খুব গরম। কখন কী ঘটে যাবে, কেউ জানে না। আপাতত হেকমপুরায় কিছু না ঘটলেও সারা দেশ জুড়ে যে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে আর মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট হচ্ছে, এ সব খবর তো মিথ্যে নয়।

ধুন্নিলাল বলল, 'হোঁশিয়ার থাকবি। জানিস তো টৌনের হাল খুব খারাপ।'

মুনিয়া বলল, 'জানি তো। আমার জন্যে ভেব না।'

ধুন্নিলাল বলল, 'যদি দেখিস কেউ ঝামেলা করতে আসছে, শিউনাথদের বাড়ি চলে যাস।'

'ঠিক হ্যায়—'মাথাটা ডান দিকে হেলিয়ে দেয় মুনিয়া।

ধুন্নিলালদের বাড়ির গা ঘেঁষে শিউনাথের বাড়ি। সম্পর্কে সে তার চাচেরা ভাই। মুনিয়াকে বলেই ধুন্নিলাল নিশ্চিন্ত থাকল না। উঠোনের ডান দিকের শেষ মাথায় গিয়ে গলা উঁচুতে তুলে ডাকতে লাগল, 'এ শিউ—শিউ—'

একটু পরেই বাড়ির সীমানার ওপারে শিউনাথকে দেখা গেল। ধুন্নিলালেরই প্রায় সমবয়সী হবে, তবে তার মতো মজবুত স্বাস্থ্য নয়। শিউনাথের দোহারা চেহারা, সে হেকমপুরায় টাঙ্গা চালায়। ক'দিন ধরে জ্বরে ভুগছে।

শিউনাথের চোখদুটো লাল, চুল উষ্কখুষ্ক। জ্বরে সে প্রায় ধুঁকছে। তাকে লক্ষ করতে করতে ধুন্নিলাল বলল, 'আমি গৈবীনাথজির 'মিটিন'-এ যাচ্ছি। তুই তো যেতে পারবি না?'

শিউনাথ দুর্বল গলায় বলে, 'কী করে যাব! আমার হাল তো দেখতেই পাচ্ছিস।'

'না না, বুখার নিয়ে তোকে যেতে হবে না। এক কাজ করিস—'

'কী?'

ধুন্নিলাল বলল, 'তোর ঘর থেকে আমাদের বাড়ির ভেতরটা দেখা যায়। মুনিয়ার ওপর নজর রাখিস। টৌন বহুত গরম হয়ে আছে।'

শিউলাল তাকে নিশ্চিন্ত করে বলে, 'ঠিক আছে, ভাবিস না। আমি আছি, মুনিয়ার চাচী আছে। তেমন বুঝলে ওকে আমাদের কাছে নিয়ে আসব। তুই যা। 'মিটিন'-এ কী হল, ফিরে এসে বলিস—'

'বলব—'

ধুন্নিলাল আর দাঁড়াল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা ধরে হেকমপুরার সব চেয়ে বড় সড়কটায় চলে এল। খোয়া-ফেলা এই সড়কটা শহরের মেরুদণ্ডের মতো উত্তর থেকে খাড়া দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। গৈবীনাথ মিশ্রদের বিশাল বাড়িটা ওদিকেই।

খোয়ার রাস্তায় লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যেতে যেতে ধুন্নিলালের চোখে পড়ল, আরও অনেকেই গৈবীনাথের বাড়ির দিকে যাচ্ছে। লক্ষ করল, সবার চোখেমুখে উত্তেজনা। এই ছোটো টাউনে সকলেই সকলের পরিচিত। ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটতে লাগল ধুন্নিলাল। তারা শুনেছে পাটনা আর কলকাতা থেকে বড় বড় নেতারা আজকের 'মিটিন'-এ এসে বুঝিয়ে দেবেন, হেকমপুরা টাউনের বাসিন্দাদের দেশের এই সংকটে কী করতে হবে। তাই নিয়েই ওদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা চলছিল।

ধুন্নিলাল কথা বলছিল ঠিকই, তবে বার বার তার নজর চলে যাচ্ছিল সড়কের দু'ধারে। গোটা শহর ভীষণ থমথমে মনে হচ্ছে। হেকমপুরা মারাত্মক কোনো ঘটনার জন্য যেন শ্বাসরুদ্ধের মতো অপেক্ষা করছে।

কথায় কথায় ধুন্নিলালরা শহরের মাঝামাঝি জায়গায় সেই চওড়া নহরটার কাছাকাছি এসে পড়ল। আর তখনই বাঁ দিকে কোনাকুনি সে মুসলমানদের পাড়াটা দেখতে পেল। মানুষজন কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। চারদিক সুনসান। এখানে দু-একটা ছাড়া পাকা বাড়ি নেই বললেই হয়। সবই টিনের বা টালির ঘর। সব ঘরেরই দরজা জানালা বন্ধ। দেখে মনে হচ্ছে, মুসলমান টৌলির বাসিন্দারা বাড়িঘর ফেলে পালিয়ে গেছে।

নহরের ওপর যে পুলটা রয়েছে সেটা পেরিয়ে আরও খানিকটা হাঁটার পর প্রবল হইচই শোনা যায়। অর্থাৎ গৈবীনাথজির বাড়ির সামনের মাঠে নিশ্চয়ই এতক্ষণে প্রচুর লোকজন জড়ো হতে শুরু করেছে। তাদের মিলিত কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে আসছে।

ধুন্নিলাল পথের সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলছিল ঠিকই, কিন্তু তার চোখ ছিল মুসলমান পাড়াটার দিকে। আজন্মের পরিচিত ওখানকার বাসিন্দারা হেকমপুরা ছেড়ে চলে গেছে, ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। ওরা বড়ই গরিব আর নিরীহ। চারদিকে যে খুনখারাপি রক্তারক্তি চলছে তার সঙ্গে ওদের কোনো সম্পর্ক নেই। দু টুকরো রুটির জন্য তারা দিনভর খেটে যায়। অন্য কোনো দিকে নজর দেবার সময় তাদের নেই।

চলতে চলতে হঠাৎ ধুন্নিলালের চোখে পড়ে, মুসলমান টৌলার একটা ঘরের জানালার পাল্লা খোলা রয়েছে। সেখানে বুড়ো জমিরুদ্দিনকে দেখা গেল। আতঙ্কগ্রস্তের মতো সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ বুকের ভেতর কী একটা প্রতিক্রিয়া যেন ঘটে যায় ধুন্নিলালের। মুসলমান টৌলির নিরীহ বাসিন্দাদের মধ্যে জমিরুদ্দিন আরও বেশি নিরীহ। লোকটার নসিব বেজায় খারাপ। গত দু বছরের মধ্যে তার একমাত্র ছেলে, ছেলের বউ আর নিজের বিবি মারা গেছে। সংসারে একমাত্র নাতনি আসমা ছাড়া আর কেউ নেই। ওদের মতো মানুষের ঘরে অঢেল সোনাদানা টাকাপয়সা জমানো থাকে না যে পায়ের ওপর পা তুলে বসে বসে খাবে। এই বয়সেও আসমা আর তার নিজের পেট চালাবার জন্য সারা দিন 'গতরচূরণ' খেটে কাজ করতে হয়।

জমিরুদ্দিনের আতঙ্কের কারণটা বুঝতে অসুবিধা হয় না ধুন্নিলালের। সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যায়। সঙ্গীদের বলে, 'তোমরা 'মিটিন'-এ চলে যাও। আমি আসছি।'

সঙ্গীরা চলে যায়। রাস্তা থেকে বাঁ দিকের ঢালে নেমে জমিরুদ্দিনের কাছে চলে আসে ধুন্নিলাল। জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে চাচা? তুমি অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?'

জমিরুদ্দিন বলে, 'আজ গৈবীনাথজির হাভেলির সামনের মাঠে 'মিটিন' হবে। আমার বহোত ডর লাগছে রে ধুন্নি—'

'কিসের ডর?'

'তুই ভেতরে আয়। বলছি—'

একই শহরের মানুষ। ধুন্নিলালকে জন্মাতে দেখেছে জমিরুদ্দিন। তাছাড়া ধুন্নিলাল তার মৃত ছেলে রাশেদের বন্ধু। সেই সুবাদে তাকে তুই করে বলে।

ধুন্নিলাল বাড়ির ভেতর চলে আসে। রাশেদের বন্ধু হিসেবে ছেলেবেলা থেকে এ বাড়িতে তার যাতায়াত। জমিরুদ্দিন তাকে ছেলের মতোই মনে করে। তা ছাড়া, পর্দার অত কড়াকড়ি নেই এখানে।

বাড়ির ভেতর দিকের বারান্দায় একটা দড়ির চৌপায়া রয়েছে। ধুন্নিলালকে সেখানে বসিয়ে তার গা ঘেঁষে বসল জমিরুদ্দিন। বারান্দার আরেক ধারে জড়সড় হয়ে বসে আছে আসমা। তার বয়স সতের আঠারো। গায়ের রং শ্যামলা হলেও বেশ সুন্দরী; পরনে রঙচঙে ছিটের সালোয়ার-কামিজ, মাথায়

ওড়না। এমনিতে মেয়েটা খুবই প্রাণবন্ত, হাসিখুশি। আগে যখনই ধুন্নিলাল এ বাড়িতে এসেছে, হইচই করে মাতিয়ে দিত আসমা। কিন্তু আজ একবারে কুঁকড়ে আছে। তার চোখেমুখে নিদারুণ ভয় আর দুশ্চিন্তা ফুটে বেরিয়েছে।

জমিরুদ্দিন ধুন্নিলালের কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, 'বহোত বিপদে পড়ে গেছি বেটা। কী করব বুঝতে পারছি না।'

ধুন্নিলাল আসমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কীসের বিপদ চাচা?'

'চারদিকের খবর তো সবই জানিস। এই—' বলতে বলতে চুপ করে যায় জমিরুদ্দিন।

নিচু গলায় ধুন্নিলাল বলে 'হাঁ—'

'আমাদের টৌলির বেশির ভাগ মানুষ পালিয়ে গেছে। যারা আছে জানালা বন্ধ করে ভেতরে বসে আছে। লেকেন দুনিয়ায় আমার এমন কোনো রিস্তেদার নেই যেখানে যেতে পারি।'

নিরাপত্তার কারণে মুসলমান মহল্লা ছেড়ে বেশির ভাগ মানুষ যখন চলে গেছে তখন নিরুপায় হয়েই জমিরুদ্দিনকে হেকমপুরায় পড়ে থাকতে হয়েছে। ধুন্নিলাল কী উত্তর দেবে, ভেবে পায় না।

জমিরুদ্দিন এবার ব্যাকুলভাবে বলে, 'আমি একা হলে যা হবার হত। আমার তিন কাল গেছে, গোরের দিকে পা বাড়িয়ে আছি। লেকেন ওই লেড়কিটা—'আসমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে একটানা বলে যায়, 'ওর কথা ভাবলে আমার কলিজা ফেটে যায়।'

শুনতে শুনতে নিজের মধ্যে একটা চাপা কষ্ট টের পেতে থাকে ধুন্নিলাল। জমিরুদ্দিনের মতো তারও একই দুর্ভাবনা। তার মৃত্যু হলে মুনিয়াকেও দেখার কেউ নেই। এদিক থেকে জমিরুদ্দিন আর সে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

জমিরুদ্দিন থামেনি, 'গৈবীনাথজির হাভেলির সামনে আজ 'মিটিন' হবার পর আমাদের টৌনে কী ঘটবে জানি না। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ভেবে ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছিলাম না। এই সময় তোকে রাস্তায় দেখতে পেলাম। ভাবলাম ডাকি। ডরে ডাকলাম না, পাছে অন্য কেউ শুনতে পায়। লেকেন তুই আমাকে দেখতে পেয়ে চলে এলি। ধুন্নি, তুই আমার বেটা য্যায়সা। বলে দে, এখন আমি কী করব?' কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে ধুন্নিলালের দুই হাত আঁকড়ে ধরে জমিরুদ্দিন।

বাতাস যখন পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস আর আক্রোশের বিষে ভারাক্রান্ত সেই সময় জমিরুদ্দিন তার পরামর্শ চাইছে। যেন ধুন্নিলাল ছাড়া বিশ্বাস বা ভরসা করার মতো আর কেউ নেই এই পৃথিবীতে।

জমিরুদ্দিন বলতে লাগল, 'লেড়কিটার মা-বাবা মরে গিয়ে আমার ওপর সব দায় চাপিয়ে দিয়ে গেছে। দুনিয়ায় আমিই ওর একমাত্র জিম্মেদার। ওর ইজ্জৎ বাঁচাতে না পারলে মরেও আমি শান্তি পাব না ধুন্নি—'

ধুন্নিলাল বলল, 'তুমি এত চিন্তা করো না চাচা। হেকমপুরায় তোমরা আমরা একসঙ্গে কত কাল ধরে আছি। কখনও কোনো গোলমাল হয়নি। এবারও হবে না।'

'সময়টা আর আগের মতো নেই রে ধুন্নি। থাকলে কি পরোয়া করতাম? টের পাচ্ছি হাল বহোত খারাপ। আমার মন বলছে হেকমপুরায় আগুন জ্বলবে।' বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়তে লাগল জমিরুদ্দিন।

এই বৃদ্ধ মানুষটা যা বলছে, ধুন্নিলালের ধারণা সেটা শতকরা একশ ভাগ ঠিক। মিটিংটা হয়ে যাবার পর হেকমপুরা আর আগের হেকমপুরা থাকবে না। এখানেও কলকাতা, দিল্লি, বোম্বাইয়ের মতো রক্তস্রোত বয়ে যাবে। ধুন্নিলাল বলল, 'জমির চাচা, তুমি জানো গৈবীনাথজির আড়তে আমি নৌকরি করি।'

জমিরুদ্দিন বেশ একটু অবাক হয়। ধুন্নিলাল কেন গৈবীনাথের কথা তুলল, বুঝতে পারে না। আস্তে মাথা নেড়ে বলল, 'হাঁ, জানি—'

'গেবীনাথজির হুকুমে আমাকে 'মিটিন'-এ যেতে হচ্ছে।'

জমিরুদ্দিন উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে থাকে। ধুন্নিলাল কী বোঝাতে চাইছে? নিরুপায় হয়েই কি সে মিটিংয়ে চলেছে? তার নিজের তেমন ইচ্ছা ছিল না?

ধুন্নিলাল এবার বলে, 'যদি এর ভেতর দেখ, কোনো ঝামেলা হচ্ছে, আসমাকে নিয়ে সোজা আমাদের কোঠিতে চলে যেয়ো। ঘরে মুনিয়া আছে। তাকে বলো আমি তোমাদের যেতে বলেছি।' একটু চিন্তা করে বলল, 'বড় সড়ক দিয়ে যাবে না, কারুর নজরে পড়ে যাবে। কেন ওদিক দিয়ে যেতে বারণ করছি জরুর বুঝতে পারছ।'

অবশ্যই বুঝেছে জমিরুদ্দিন। মানুষের মতিগতি এখন ঠিক নেই। উত্তেজনা বা আক্রোশের বশে কে কী করে বসবে, কেউ জানে না। তাই কোনোরকম ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। সে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, 'হাঁ, লেকেন—'

'কী?'

'কোন দিক দিয়ে তা হলে যাব?'

মুসলমানদের এলাকার পেছনদিক থেকে শুরু হয়েছে ধানখেত। এই আগস্ট মাসে মাইলের পর মাইল জুড়ে, ধু ধু দিগন্ত পর্যন্ত এখন শুধু ধান আর ধান। বর্ষার গোড়ায় যে সব চারা রোয়া হয়েছিল, এখন সেগুলো বুক সমান বড় হয়ে উঠেছে। যে নহরটা হেকমপুরাকে দু'ভাগ করে মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে সেটা আধখানা বৃত্তের আকারে বেঁকে ধানখেতের ভেতর অনেক দূর পর্যন্ত চলে এসেছে।

ধানবন ঠেলে পশ্চিমে খানিকটা গেলে নহরের ওপর একটা নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো পাওয়া যাবে। ওটা পেরিয়ে মিনিট পাঁচেক হাঁটলে ধুন্নিলালের বাড়ি।

ধানখেতের দিকটা একেবারে নির্জন। ধুন্নিলাল বলল, নিরাপত্তার কারণে ঘুরপথে সাঁকো পেরিয়ে ওধার দিয়ে যেন জমিরুদ্দিনরা তার বাড়ি চলে যায়।

জমিরুদ্দিন বলল, 'ঠিক হ্যায়—'

ধুন্নিলাল আর বসল না, জমিরুদ্দিনদের সতর্কভাবে থাকতে বলে চলে গেল।

গৈবীনাথ মিশ্রর তিন-মহল বিরাট হাভেলির সামনের বড় মাঠে কাঁটায় কাঁটায় দশটায় মিটিং শুরু হয়ে গেল।

একধারে লাল শালু দিয়ে মোড়া উঁচু মঞ্চ। সেখানে পাটনা থেকে আসা বড় বড় নেতারা বসে আছেন। তা ছাড়া রয়েছেন স্বয়ং গৈবীনাথ মিশ্র এবং হেকমপুরা টাউনের গণ্যমান্য লোকজনেরা।

মঞ্চের সামনে বিশাল জনতা। শুধু হেকমপুরা নয়, চারদিকের গ্রামগঞ্জ থেকে হাজার হাজার লোক এসে জড়ো হয়েছে।

নেতারা একের পর এক উঠে যা বলতে লাগলেন সংক্ষেপে তা হল, কলকাতা নোয়াখালি লাহোরের বদলা নিতে হবে। দাঁতের বদলে দাঁত, খুনের বদলে খুন চাই। তাঁদের বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ যেন শ্রোতাদের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিতে লাগল।

উত্তেজিত জনতা মুহুর্মুহু চিৎকারে আকাশ চৌচির করে ফেলতে লাগল।

'কালী মাঈকি—'

'জয়—'

'বজরঙ্গবলীকী—'

'জয়—'

'খুনকা বদলা খুন—'

মঞ্চের কাছাকাছি একধারে দাঁড়িয়ে জনতাকে লক্ষ করছিল ধুন্নিলাল। প্রতিটি শ্রোতার চোখেমুখে হত্যা ঝিলিক দিয়ে উঠছে। তাদের মারমুখী, ভয়ঙ্কর চেহারার দিকে তাকিয়ে শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা স্রোত ওঠানামা করতে থাকে। সে যেন দেখতে পাচ্ছিল, চিরকালের শান্ত নিরুত্তেজ হেকমপুরা আজ একেবারে তোলপাড় হয়ে যাবে, শহর জুড়ে রক্তের বান ডাকবে।

আচমকা ধুন্নিলালের চোখের সামনে বুড়ো জমিরুদ্দিন আর আসমার মুখ দুটো ফুটে ওঠে। সে দ্রুত ভেবে নিল, মিটিং শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান পাড়ায় গিয়ে আসমাদের নিয়ে নিজের কোঠিতে চলে যাবে। কিন্তু যাওয়া আর হল না। সভা শেষ হলে নেতারা বড় মোটর গাড়ি চড়ে চলে গেলেন। আর গৈবীনাথ মিশ্র ধুন্নিলাল এবং তার মতো বাছা বাছা আরও কয়েকজনকে নিয়ে নিজের হাভেলিতে চলে এলেন। ধুন্নিলালকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর বন্দুক কোথায়?'

ধুন্নিলাল বলল, 'ঘরে আছে হুজৌর—'

অন্যাদের বন্দুক না থাকলেও রয়েছে নানা ধরনের মারণাস্ত্র। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন সবার হাতিয়ারই তৈরি আছে। এবার হেকমপুরা এবং এই শহরের চারপাশের গ্রামগুলোতে যে শত্রুপক্ষের লোকেরা আছে তাদের ধ্বংস করার জন্য ধুন্নিলালদের সবাইকে আলাদা আলাদা দায়িত্ব দিলেন। প্রত্যেকে পঞ্চাশ ষাট জন করে দাঙ্গাবাজ জুটিয়ে এক একটা গ্রামে হানা দেবে।

এদিকে যে শ্রোতারা চারপাশ থেকে জড়ো হয়েছিল তারা উন্মাদের মতো চিৎকার করতে করতে ছড়িয়ে পড়েছে।

আক্রমণের পদ্ধতি স্থির হবার পর গৈবীনাথজির হাভেলি থেকে বেরুতে বেরুতে দুপুর পেরিয়ে গেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে ধুন্নিলাল দেখতে পেল, সূর্যটা পশ্চিম দিকে খানিকটা নেমে গেছে। অল্প স্বল্প মেঘ এধারে ওধারে ভেসে বেড়াচ্ছে ঠিকই, তবে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

সেই সকাল বেলা সামান্য কিছু খেয়ে বেরিয়ে পড়েছিল ধুন্নিলাল। এখন পেটের ভেতর আগুন জ্বলছে। কিন্তু খিদের অনুভূতি ছাপিয়ে বার বার আতঙ্কগ্রস্ত জমিরুদ্দিন আর আসমাকে মনে পড়ে যাচ্ছে। সে ঠিক করে ফেলল, ওদের সঙ্গে নিয়ে ধানবনের ভেতর দিয়ে ঘুরে বাড়ি যাবে। মিটিংয়েব পর এখন শহরের যা হাল তাতে কোনোভাবেই জমিরুদ্দিনদের মুসলমান টৌলিতে পড়ে থাকা নিরাপদ নয়।

খোয়ায়-ঢাকা বড় সড়কটা ধরে বাড়ির দিকে যেতে যেতে হঠাৎ প্রচণ্ড হই চই, উল্লাস আর আর্ত চিৎকার ভেসে আসতে থাকে। চকিত হয়ে ওঠে ধুন্নিলাল। এধারে তাকাতেই চোখে পড়ে মুসলমান মহল্লাটা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। হই-হল্লা ওখান থেকেই ভেসে আসছে।

মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে যায় ধুন্নিলাল। জমিরুদ্দিনদের পাড়ায় যে আগুন ধরানো হয়েছে, সেটা এখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

কালো, গাঢ় ধোঁয়া ক্রমশ ওদিকের আকাশ ছেয়ে ফেলছে। ধুন্নিলাল হঠাৎ উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুতে শুরু করল। মিটিংয়ে আসার আগে জোর করে জমিরুদ্দিনদের তার কোঠিতে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। গৈবীনাথজি আক্রমণের পদ্ধতি ঠিক করে দেওয়ার আগেই যে জনতা এমন ভয়াবহ একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়বে, কে ভাবতে পেরেছিল! জমিরুদ্দিনরা বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে বলবে!

আর দাঁড়ায় না ধুন্নিলাল। দৌড় শুরু করে। আর দৌড়ুতে দৌড়ুতে টের পায় শ্বাস যেন আটকে আসছে। যদি গিয়ে দেখে জমিরুদ্দিন আর অসমার কোনো ক্ষতি হয়েছে, আপসোসের সীমা থাকবে না। তার একটা ভুলের জন্য দুটো নিরীহ, নির্দোষ মানুষের জীবন যদি বরবাদ হয়ে থাকে, এর চেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা আর কী হতে পারে?

আকাশটা কালো হয়ে ছিলই, কিন্তু আরও খানিকটা যাওয়ার পর যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল তার জন্য মন একেবারেই তৈরি ছিল না ধুন্নিলালের। ঘন্টা চারেক আগে যে মুসলমান পাড়াটা দেখে গিয়েছিল সেটা এখন একেবারে ধ্বংসস্তূপ। এখানকার একটা বাড়িও আস্ত নেই। চালার টালি বা টিন ভাঙাচোরা আর দোমড়ানো অবস্থায় ছত্রখান হয়ে আছে। বাঁশ বা কাঠের খুঁটি, জামাকাপড়, বিছানা, বালিশ, সব জ্বলছে। তারই গাঢ়, কালো ধোঁয়ায় চারদিক আচ্ছন্ন। বাসনকোসন, অর্থাৎ হাঁড়ি, বালতি, সোরাই—সব আছড়ে চুরমার করা হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, মিটিং থেকে বেরিয়ে ক্ষিপ্ত জনতা খানিক আগে এখানে তাণ্ডব চালিয়ে গেছে।

এখন কেউ কোথাও নেই। না ঘাতকবাহিনী, না এই মহল্লার মানুষজন। বিমূঢ়ের মতো এধারে ওধারে তাকাতে লাগল ধুন্নিলাল। এবার তার চোখে পড়ল, মহল্লার অন্য সব বাড়ির মতো জমিরুদ্দিনের বাড়িটাও জ্বলছে। কিন্তু বুড়ো আর তার নাতনি গেল কোথায়?

ঢাল বেয়ে রাস্তা থেকে নিচে নেমে জমিরুদ্দিনদের পাড়ায় চলে এল ধুন্নিলাল। প্রথমে চাপা গলায়, তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, 'জমির চাচা—আসমা— আসমা—কোথায় তোমরা?'

কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না।

শুধু জমিরুদ্দিনরাই না, এই মহল্লার কাকে না চেনে ধুন্নিলাল? এবার তাদেরও নাম ধরে ডাকতে থাকে, 'বজলুর—ফকিরা—হান্নান—ফরিদ—'

গোটা পাড়া নিস্তব্ধ। কেউ উত্তর দিল না।

মহল্লার ভেতর ঢুকে পড়ল ধুন্নিলাল। আতিপাতি করে চারদিকে জমিরুদ্দিনদের খোঁজ করল কিন্তু তাদের পাওয়া গেল না। তবে তিন চারটে লাশ দেখা গেল। ওরা হল ফরিদ, আমজাদ, মইনুল আর আসাদ। মৃতদেহগুলোর শরীর থেকে তখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

দু-তিনদিন আগেও এদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ধুন্নিলালের। আজ তারা সবাই লাশ হয়ে গেছে। হতবুদ্ধির মতো কিছুক্ষণ আসাদদের দেখল ধুন্নিলাল। তারপর প্রায় টলতে টলতে উঁচু সড়কে উঠে এল।

বাড়ির দিকে যেতে যেতে ধুন্নিলালের চোখে পড়ে, বড় সড়কের নানা জায়গায় থোকায় থোকায় লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রায় সবার হাতেই লাঠি, দা এবং নানা ধরনের হাতিয়ার। উত্তেজিতভাবে নিজেদের মধ্যে ওরা কী যেন বলাবলি করছে। এদের সকলকেই চেনে ধুন্নিলাল। এমনিতে এরা সাদাসিধে ভালমানুষ, নিরীহ এবং ভীরু। কারুর গায়ে একটা আঙুল ঠেকানোর সাহস ওদের নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে লোকগুলোর দিকে তাকালে সে কথা কে বলবে! চিরকালের শান্তিপ্রিয় আর গরিব হেকমপুরার এই মানুষগুলোর ভেতর থেকে মারাত্মক এক একটি হত্যাকারী যেন বেরিয়ে এসেছে।

ধুন্নিলালকে দেখে প্রতিটি জটলা থেকে কেউ না কেউ বলে উঠছে, 'শুনা ধুন্নি ভাইয়া, আজ ক্যা হুয়া?'

কোন ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে ওরা প্রশ্ন করছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না ধুন্নিলালের। সে অস্পষ্টভাবে কিছু একটা উত্তর দেয়।

লোকগুলো প্রবল উৎসাহে জানায়, হেকমপুরার সব দুশমন ভেগে গেছে। দু-চারটে যা ছিল, খতম করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন দিনরাত হাতিয়ার নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা চারদিকে শত্রুপক্ষের লোকেরা আছে, তারা যে কোনো মুহূর্তে এই টাউনে হানা দিতে পারে।

ধুন্নিলাল জবাব না দিয়ে এগিয়ে গেল।

বাড়িতে এসে সে দেখতে পায়, বারান্দায় বসে আছে মুনিয়া। তার চোখেমুখে প্রচণ্ড অস্থিরতার ছাপ। ধুন্নিলালকে দেখে সে উঠে দাঁড়ায়। চাপা গলায় বলে, 'বাপু, তুরন্ত ভেতরে এস।'

ধুন্নিলাল মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আঁচ করে নেয়, কিছু একটা ঘটেছে। জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে রে?'

উত্তর না দিয়ে ধুন্নিলালকে টেনে নিজের ঘরে নিয়ে যায় মুনিয়া। বলে, 'ওই দেখ—'

এ ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ। বাইরের আলো ভেতরে আসতে পারেনি। আবছা অন্ধকারেও ধুন্নিলাল দেখতে পায় মুনিয়ার চৌপায়ার ওপর দু'টি মানুষ বসে আছে। একটু চকিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কৌন?' পরক্ষণে অন্ধকারটা চোখে সয়ে এলে বুঝতে পারে, ওরা জমিরুদ্দিন আর আসমা। ওরা যে বেঁচে আছে এবং তার বাড়িতে এসেই আশ্রয় নিয়েছে, নিজের চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

ধুন্নিলাল এবার কিছু বলার আগে তার দুটো হাত জড়িয়ে ধরে জমিরুদ্দিন। সন্ত্রস্ত গলায় বলে, 'আমরা পালিয়ে এসেছি ধুন্নি—'

ধুন্নিলাল টের পাচ্ছিল, জমিরুদ্দিন ভীষণ কাঁপছে। তাকে সাহস দিয়ে বলে, 'ডরো মাত চাচা। আমার কোঠিতে যখন এসেছ, কেউ তোমাদের গায়ে একটা আঁচড় কাটতে পারবে না।'

জমিরুদ্দিন উত্তর দিল না। ধুন্নিলাল বলল, 'মিটিন'-এর পর আমি তোমাদের খোঁজ করতে গিয়েছিলাম। পুরা মহল্লা তখন জ্বলছে। তোমাদের দেখতে না পেয়ে মন এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে কী বলব!' একটু থেমে ফের বলে, 'আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করে চলে যাবার পর কী হয়েছিল বল তো?'

জমিরুদ্দিন বলে, ধুন্নিলাল চলে গেলে সে আর আসমা প্রচণ্ড আতঙ্ক নিয়ে ঘরের ভেতর বসে ছিল। কেননা, মিটিং ভাঙার পর কী হতে পারে, তারা ঠিক ভেবে উঠতে পারছিল না। সকাল থেকে আজ তাদের মুখে এক ফোঁটা জলও পড়েনি। রান্নাবান্না চড়ানো যে দরকার সেটা কারুর মাথাতেই আসেনি। আসলে ভয়ে, দুর্ভাবনায় খিদে এবং তেষ্টার বোধটাই তাদের নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

কতক্ষণ দমবন্ধ করে ঘরের ভেতর বসে ছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ বহু মানুষের হল্লায় তারা চমকে ওঠে। জানালা দিয়ে দেখে উত্তেজিত জনতা লাঠি বল্লম নিয়ে তাদের মহল্লার দিকে ছুটে আসছে। ওদের উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার। মহল্লায় যে ক'জন তখনও পড়ে ছিল, প্রাণভয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো যেদিকে পারে ছুটতে থাকে। সেও ধুন্নিলালের কথামতো বাড়িঘর ফেলে আসমার একটা হাত ধরে পেছন দিকের জমিতে নেমে যায়। তারপর ধানবনের ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে মেরে ঘুরপথে সাঁকোর কাছে গিয়ে দেখতে পায়, তাদের মহল্লায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কোনোরকম সাঁকো পেরিয়ে ওপারে চলে যায় জমিরুদ্দিনরা। কিন্তু রাস্তায় ওঠে না। সড়কের ধার ঘেঁষে নানা ধরনের ঝোপঝাড়, আগাছার জঙ্গল। সেগুলোর আড়াল দিয়ে দিয়ে ধুন্নিলালের বাড়ি শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুনিয়াকে জানায়, ধুন্নিলাল তাদের এখানে আসতে বলেছে। মুনিয়া বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে তক্ষুনি দু'জনকে তার ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়। শহরের হালচালের কথা তার খুব ভালো করেই জানা আছে। তাদের বাড়িতে জমিরুদ্দিনদের কেউ দেখে ফেললে তার ফলাফল যে মারাত্মক হবে সে তা জানে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাই তাদের এমনভাবে লুকিয়ে রেখেছে যাতে বাইরের কেউ দেখতে না পায়।

ধুন্নিলাল জিজ্ঞেস করে, 'ধান-জমিনের ভেতর দিয়ে যে এলে, কারুর নজরে পড়ে যাওনি তো?'

জমিরুদ্দিন বলে, 'মনে হয় না। খুনীরা দেখে ফেললে এখানে কি পৌঁছুতে পারতাম? স্রিফ লাশ হয়ে যেতাম।'

কথাটা ষোলো আনা সত্যি। হানাদারদের সামনে পড়লে জমিরুদ্দিনদের চরম সর্বনাশ হয়ে যেত। ধুন্নিলাল এবার মেয়েকে জিজ্ঞেস করল, 'জমির চাচাদের খবরটা কি শিউনাথরা পেয়েছে?'

মুনিয়া বলল, 'নেহী। শিউচাচাদের কেউ তখন এদিকে ছিল না।'

শিউনাথ কী তার ঘরবালীকে খুবই বিশ্বাস করে ধুন্নিলাল। লোক হিসেবেও ওরা ভালো। কিন্তু অনেক সময় মানুষের মুখ দিয়ে অজান্তে অনেক গোপন কথা বেরিয়ে যায়। জমিরুদ্দিনদের আসার খবরটা কোনোভাবে জানাজানি হোক, এটা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

ধুন্নিলাল বলল, 'শিউনাথদের এখন ওদের কথা বলিস না।'

'ঠিক হ্যায়।'

'তোর চাচিটাচি এলে তোর ঘরে যেতে দিস না।'

'ঠিক হ্যায়।'

'জমির চাচা আর আসমাকে কিছু খেতে দিয়েছিস?'

'খাওয়ার কথা বলেছিলাম। খায়নি।'

ধুন্নিলাল জিজ্ঞেস করে, 'খানা পাকানো হয়েছে?'

মুনিয়া মাথা হেলিয়ে দেয়, 'হাঁ। চাপাটি, সবজি আর ডাল।'

'আসমাদের জন্যে নিয়ে আয়।'

খাবার নিয়ে আসে মুনিয়া। পাশে বসিয়ে তাদের খাওয়ায় ধুন্নিলাল। তারপর ঘরের বাইরে আসে।

সে যখন ফিরে আসে ডান ধারের চালাটার তলায় ঘোড়াটা চঞ্চল হয়ে পা ঠুকছিল। আর সমানে চিঁহিহি চিঁহিহি করে ডেকে যাচ্ছিল। তখন ওর দিকে তাকানোর মতো মনের অবস্থা ছিল না। এবাব বারান্দা থেকে নিচে নেমে গিয়ে খানিকক্ষণ গলায় মাথায় হাত বুলিয়ে খানিকক্ষণ আদর করে।

ঘোড়াটাকে খুশি করার পর স্নান করে খেয়ে নেয় ধুন্নিলাল। তারপর জমিরুদ্দিনদের জিরিয়ে নিতে বলে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। আজ সকাল থেকে হেকমপুরায় যে ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটে গেছে সেগুলো তার স্নায়ুগুলিকে একেবারে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। দু-আড়াই শ বছরের এই পুরোনো, নগণ্য শহরে আগে এমন খুনখারাপি, আগুন কেউ কখনও দেখেনি। ধুন্নিলালের কপালের দু'পাশের রগদুটো সমানে দপ দপ করছে। মনে হয় ছিঁড়ে পড়বে।

কিন্তু হত্যা, রক্তপাত—এসবের কথা এই মুহূর্তে ভাবছে না ধুন্নিলাল। আসমা আর জমিরুদ্দিনকে কীভাবে বাঁচাবে, এখন সেটাই তার একমাত্র চিন্তা। সর্বক্ষণ তো ওদের ঘরের ভেতর লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তা ছাড়া দুর্ভাবনার কারণ আরও আছে। তাকে রোজই গৈবীনাথজির আড়তে যেতে হয়। তার ওপর আজ মারাত্মক একটা দায়িত্বও তাকে দেওয়া হয়েছে। দলবল জুটিয়ে হেকমপুরার কাছাকাছি দুশমনদের একটা গাঁয়ে হানা দিতে হবে। তাদের বাড়িতে প্রচুর লোকজন আসে। সে যখন থাকবে না সেই সময় কেউ যদি এসে পড়ে এবং জমিরুদ্দিনদের দেখে ফেলে, ওরা তো বিপদে পড়বেই, তাদের ওপরও হেকমপুরার লোকজন খেপে উঠবে। বিশেষ করে গৈবীনাথজির কানে খবরটা উঠলে তার পরিণতি কী হবে, ভাবতেও সাহস হয় না ধুন্নিলালের।

গৈবীনাথজি পরিকল্পনা ছকে দিয়েছিলেন, চারপাশের গাঁগুলোতে গিয়ে শত্রুপক্ষের মহল্লায় মহল্লায় কীভাবে তাণ্ডব চালাতে হবে। আজ বিকেলে ধুন্নিলালের কাছাকাছি একটা গ্রাম বিজুরিতে সশস্ত্র লোকজন জুটিয়ে যাবার কথা আছে। কিন্তু সে স্থির করে ফেলল, যাবে না। তার বাড়িতে থাকা দরকার। মুনিয়া যথেষ্ট বুদ্ধিমতী হলেও বয়সটা তো কম। লোকজন এসে গেলে সামলে উঠতে পারবে কিনা সন্দেহ। কেননা এ জাতীয় সমস্যার মুখে মেয়েটা তো আগে পড়েনি। ঘাবড়ে গিয়ে বেফাঁস কিছু বলে ফেলতে পারে।

গৈবীনাথজি ছক কষে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকেননি। ঠিকমতো কাজ হচ্ছে কিনা সে সম্বন্ধে খবরও রাখছেন।

সন্ধের ঠিক আগে আগে গৈবীনাথজি ধুন্নিলালের কাছে লোক পাঠালেন। তিনি জানতে পেরেছেন, ধুন্নিলাল বিজুরিতে যায়নি।

যাকে পাঠানো হয়েছিল তার নাম ধনপত। সে গৈবীনাথজির পোষা অত্যন্ত বিশ্বস্ত এক পহেলবান। দুশমনের মতো চেহারা তার, পাকানো গোঁফ, চৌকো মুখ, চোখে বাঘের দৃষ্টি, হাতে লোহার মুঠওলা লম্বা লাঠি। লোকটাকে দেখামাত্র টের পাওয়া যায়, খুন করাটা এর কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। ধনপত বলল, 'গৈবীনাথজি জানতে চাইলেন, তুমি বিজুরিতে যাওনি কেন?'

ধুন্নিলাল ভেতরে ভেতরে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল। হাজার হোক গৈবীনাথজি তার মনিব। ফারমোর সাহেব চলে যাবার পর তাঁর আড়তে নৌকরি পেয়েছে বলে নিজের আর মেয়ের পেট চলে যাচ্ছে। মালিকের হুকুম অমান্য করার মতো বুকের পাটা তার থাকার কথা নয়। তবু যে করেছে সেটা জমিরুদ্দিন আর আসমার জন্য। দুটো নিরীহ মানুষ যারা দুনিয়ার কারুর কোনো ক্ষতি করেনি, চোখের সামনে উত্তেজিত জনতার আক্রোশের শিকার হয়ে যাবে, এটা তার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আবার গৈবীনাথজিকেও চটানো যায় না।

ধুন্নিলাল ধনপতের মুখের দিকে তাকিয়ে কাতর সুরে বলে, 'তবিয়ত বহোত খারাপ ধনপত ভেইয়া। মাথায় খুব দর্দ হচ্ছে। তাই বেরুতে পারিনি।'

সে যে অসুস্থ সেটা বিশ্বাসযোগ্য ভাবেই বোঝাতে পেরেছে ধুন্নিলাল। ধনপত বলল, 'তবিয়ত যখন আচ্ছা নেই তখন আজ আর বেরুতে হবে না। তুমি শুয়ে থাক গিয়ে—'

ধুন্নিলাল ধনপতের একটা হাত ধরে আগের সুরেই বলল, 'তুমি তো আমাকে দেখে গেলে। গৈবীনাথজিকে বুঝিয়ে বলো, কেমন?'

'হাঁ হাঁ, বলব।'

'মালিক যেন আমার ওপর গুস্সা না হন।'

'চিন্তা মাত করনা। মালিক আচ্ছা আদমি, সব শুনলে গুস্সা হবেন না।'

ধনপত চলে গেল।

একটা দিনই শুধু না, পর পর তিনটে দিন শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে বাড়ি থেকে বেরুল না ধুন্নিলাল।

এদিকে ধনপতকে রোজই পাঠাচ্ছেন গৈবীনাথজি। তাঁর ব্যাপক পরিকল্পনায় ধুন্নিলালের জন্য খুঁত থেকে যাচ্ছে। বিজুরি গ্রামে শত্রুপক্ষের প্রচুর লোকজন। সেখানে লাঠিসোঁটার ওপর ভরসা করে হানা দিতে গেলে বিপদে পড়তে হবে। তার জন্য দরকার গুলি বন্দুক। আর হেকমপুরায় যে দু-চারটে লোক বন্দুক চালাতে পারে তাদের একজন হল ধুন্নিলাল। বলা যায় সে এই শহরের সব চেয়ে সেরা বন্দুকবাজ।

ধনপতই না, হেকমপুরার আরও অনেকেই তার শরীর খারাপের খবর পেয়ে দেখা করতে এল। অসুস্থতা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য দাড়ি কামায়নি ধুন্নিলাল। স্নান করেনি, চুলে তেল লাগায়নি। উষ্কখুষ্ক দাড়ি এবং চুল দেখলে মনে হয় সত্যিই সে রোগাক্রান্ত।

যারা বাড়িতে আসে তাদের কাছেই খবর পাওয়া গেল, হেকমপুরার চারপাশের গাঁগুলোতে তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। নির্বিচারে মানুষ খুন হচ্ছে, অগুনতি বাড়িতে আগুন ধরানো হয়েছে।

এই ভয়ঙ্কর সময়ে মানুষ যখন আর মানুষ নেই, হত্যার নেশায় তারা উন্মাদ হয়ে উঠেছে, তখন ছোট্ট একটা সুখবর পাওয়া গেল। এতদিন পুলিশ চোখ বুজে ছিল। কিন্তু এবার তারা নাকি নড়েচড়ে বসেছে। বারহৌলিতে একটা ত্রাণ শিবির অর্থাৎ রিলিফ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। দাঙ্গার মধ্যে যারা প্রাণে বেঁচে গেছে তাদের সেখানে আপাতত আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া পুলিশ কিংবা মিলিটারির একটা

বড় দল নাকি দু-একদিনের ভেতর হেকমপুরায় আসবে। তাদের নাকি খুনখারাপি বন্ধ করার জন্য পাঠানো হচ্ছে।

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আর চাপা রইল না। জমিরুদ্দিন আর আসমা যে তাদের বাড়িতে আছে, কীভাবে যেন সেটা হাওয়ায় হাওয়ায় চারদিকে রটে গেল। কে ওদের দেখে খবরটা রটিয়ে দিয়েছে তা অবশ্য জানা যায়নি।

জমিরুদ্দিনরা আসার পাঁচ দিনের মাথায় বিকেলবেলা ঘরের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিল ধুন্নিলাল, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে শিউনাথ এসে হাজির। ক'দিন জ্বরে ভুগে আজই সে টাঙ্গা নিয়ে বেরিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ রাস্তায় দেখতে পায়, একদল লোক লাঠিডাণ্ডা উঁচিয়ে এদিকে আসছে। ওদের কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারে, জমিরুদ্দিন আর আসমার খোঁজে ওরা ধুন্নিলালের বাড়িতে হানা দেবে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে দৌড়ুতে শুরু করে।

শিউনাথ ক'দিনের জ্বরে কমজোর হয়ে গেছে। এতটা রাস্তা ছুটে আসার কারণে ভীষণ হাঁপাচ্ছিল। চাপা, শ্বাসটানা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'টৌনে একটা খবর শুনে বহোত ডর লাগছে।'

চায়ের গেলাস নামিয়ে রেখে ধুন্নিলাল জিজ্ঞেস করে, 'কী খবর রে?'

'তুই কি জমিরুদ্দিন চাচা আর আসমাকে বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিস?'

ধুন্নিলাল চকিত হয়ে ওঠে 'হাঁ। নইলে ওরা খুন হয়ে যেত।'

'ওদের ভাগিয়ে দে।'

'কী বলছিস শিউ! হত্যারাদের মুখে জমিরচাচাদের ঠেলে দেব! কভ্‌ভি নেহী—'

'লেকেন্—'

শিউনাথের কথা শেষ হওয়ার আগেই দূর থেকে শোরগোল ভেসে এল।

ধুন্নিলাল বলল, 'কী হয়েছে? কারা হল্লা করছে?'

আতঙ্কগ্রস্তের মতো শিউনাথ জানায়, রাস্তায় খানিক আগে যে উত্তেজিত, মারমুখী জনতাকে দেখেছিল তারাই ধুন্নিলালের বাড়ির দিকে আসছে।

এক মুহূর্ত হতবুদ্ধির মতো বসে থাকে ধুন্নিলাল। পরক্ষণে তার মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে যায় যেন। মনে মনে সে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জমিরুদ্দিন আর আসমাকে তাদের ঘর থেকে ডেকে নিয়ে আসে। রান্নাঘরে কী করছিল মুনিয়া। তাকেও ডেকে আনে। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে কিছু টাকা আর তার সেই বন্দুকটা এনে টিনের চালা থেকে ঘোড়াটাকে বার করে নিয়ে আসে। ঘোড়া আর বন্দুক, তার এই দুই সঙ্গীই এখন পারে জমিরুদ্দিনদের বাঁচাতে।

জমিরুদ্দিন আর আসমা তো বটেই, সেই সঙ্গে মুনিয়াকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিয়ে নিজেও উঠে পড়ে। মুনিয়াকে সঙ্গে নেবার কারণ, জমিরুদ্দিন আসমা বা তাকে না পেলে হত্যাকারীদের সমস্ত আক্রোশ এসে পড়বে মেয়েটার ওপর। তাকেও তো বাঁচানো চাই। আপাতত তারা যাবে বারহৌলির ত্রাণ শিবিরে। সেখানে জমিরুদ্দিন এবং আসমাকে পৌঁছে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে কোথায় আশ্রয় নেবে, পরে ঠিক করা যাবে।

বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে ছিল শিউনাথ। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছিস ধুন্নি?'

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ধুন্নিলাল বলে, 'যদ্দিন না ফিরছি, আমার বাড়ি তোর জিম্মায় রইল শিউ।'

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, হেকমপুরার বড় সড়কের ওপর দিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে ধুন্নিলালের ঘোড়া। উলটো দিক থেকে সশস্ত্র জনতা উত্তেজিত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছিল। তারা চিৎকার করে বলে, 'রুখ যা ধুন্নি—রুখ যা—'

বন্দুক উঁচিয়ে গলার শির ছিঁড়ে ধুন্নিলাল চেঁচায়, 'হোঁশিয়ার, গোলি মারকে সিনা ফোঁড় দুঙ্গা—'
সন্ত্রস্ত দাঙ্গাবাজ জনতা পথ ছেড়ে দিয়ে রাস্তার দু ধারে সরে যায়। ধুন্নিলালের ঘোড়া একই গতিতে ছুটতে থাকে। একসময় অশ্বক্ষুরের শব্দ দূরে মিলিয়ে যায়।

প্রার্থী

তৌহরলালজি একজন বিখ্যাত জননেতা। উত্তর বিহারের পিপরগঞ্জ অঞ্চলের তিনি এম. এল. এ। স্থানীয় মানুষজন বলে 'এম্লে'।

সাতচল্লিশে দেশ যখন স্বাধীন হল তখন তাঁর বয়স মোটে সাত। বেয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন, রশিদ আলি ডে বা বোম্বাইয়ের নৌ-বিদ্রোহের সময় তৌহরলালজি অবোধ শিশু মাত্র। স্বাধীনতার জন্য যাঁরা জেল খেটেছেন, ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছেন, সুদূর আন্দামানে যাঁদের নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের সেইসব নায়কদের নামের তালিকায় তৌহরলালজিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি হলেন পোস্ট-ইন্ডিপেনডেন্স পেট্রিয়ট অর্থাৎ স্বাধীনতার পরবর্তীকালের দেশপ্রেমী।

রাজনীতিটা তাঁর শখ। আসলে তিনি একজন অত্যন্ত সফল ব্যবসাদার। পিপরগঞ্জের চল্লিশ মাইলের ভেতর তৌরলালজির মতো বড় টিম্বার মার্চেন্ট আর নেই। এছাড়া বনস্পতি তেল, স্কুটার, সাইকেল, বেবিফুড, কেরোসিন, রেডিও, সেলাই কল থেকে শুরু করে ডিটারজেন্ট পাউডার, গায়ে-মাখা সাবান, ছোটো পাম্প-সেট, ইত্যাদি যাবতীয় জিনিসপত্রের তিনি এখানকার একমাত্র ডিলার। এদিকের ছোটোখাটো দোকানদারেরা তাঁর কাছ থেকেই মাল কিনে নিয়ে বেচে থাকে। ব্যবসা বাদ দিলেও তৌহরলালজিরা ল্যান্ডেড অ্যারিস্টোক্রাট। স্বনামে এবং বেনামে তাঁদের যে কত জমি-জমা তার হিসেব রাখা মুশকিল। ফিউডাল সিস্টেমের সঙ্গে সুকৌশলে ব্যবসাদারিটা মেশাতে পেরেছেন তৌহরলালজি। ফলে ব্যাঙ্ক এবং ঘরের ভারি ভারি প্রকাণ্ড আলমারিগুলোতে টাকার পাহাড়।

এত টাকা, এত জমিজমা, এত বড় ব্যবসা, কিন্তু তাতে মান-সম্মানটা কোথায়? সামাজিক প্রতিষ্ঠা কতটুকু? এইসব প্রশ্নই একদিন তৌহরলালজিকে রাজনীতির দিকে ঠেলে দেয়। পোলিটিক্যাল পাওয়ার হাতে থাকলে সমস্ত এলাকাটা হাতের মুঠোয় চলে আসবে। যাঁর টাকা, বন্দুক এবং লাঠির জোর রয়েছে তাঁর পক্ষে গরিব, আনপড়দের ভোট আদায় করে এম. এল. এ হওয়া খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। সুতরাং দশ বছর ধরে তৌহরলালজি পিপরগঞ্জ এলাকার এম. এল. এ। অঢেল টাকা এবং প্রবল প্রতাপ সত্ত্বেও এটা মানতেই হবে স্বার্থে ঘা না পড়লে বা কেউ না খোঁচালে তিনি একেবারে মাটির মানুষ।

পিপরগঞ্জ শহরের একধারে বিশাল কম্পাউন্ডের ভেতর তৌহরলালজির প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ি।

ফি রবিবার সকালের দিকে একতলার ঢালা বারান্দায় তিনি আম-দরবার বসান। এখানে তাঁর এলাকার সব মানুষের গতিবিধি অবাধ। তারা তাঁর কাছে এদিন তাদের অভাব-অভিযোগ দুঃখ-কষ্টের কথা জানাতে আসে। এইভাবেই তৌহরলালজি জনসংযোগ করে থাকেন।

অন্য সব রবিবারের মতো আজও দরবার বসেছে। বারান্দার এক প্রান্তে ধবধবে ফরাস পাতা। চারদিকে অনেকগুলো বড় বড় তাকিয়া। উরুর তলায়, বুকে, পিঠে এবং কোমরে চার-পাঁচটা তাকিয়া ঠেসে রেখে দেড় কুইন্টাল ওজনের তৌহরলালজি আধশোয়া অবস্থায় কাত হয়ে আছেন। তাঁর পরনে ফিনফিনে পাঞ্জাবি আর চুস্ত। সোফা-সেট চেয়ার-টেবল বিশেষ পছন্দ করেন না তৌহরলালজি, ফরাস টরাসে হাত-পা ছড়িয়ে তিনি বেশ আরাম বোধ করেন। সব ব্যাপারেই পুরনো ফিউডাল চালটাকে তিনি বজায় রেখেছেন।

এই মুহূর্তে তাঁকে ঘিরে ফরাসে তাঁর কিছু ঘনিষ্ঠ লোকজন বসে আছে। এরা আসলে মোসাহেবের দল। পিপরগঞ্জের মানুষ তাদের সম্বন্ধে যা বলাবলি করে তা হল—পা-চাটা কুত্তার পাল।

বারান্দার অন্য প্রান্তে ঢালা শতরঞ্চি পাতা। সেখানে গরীব-গুর্বো-আনপড় কিছু মানুষ। এরা প্রার্থীর দল। তৌহরলালজির কাছে কোনো না কোনো আবেদন নিয়ে এসেছে। এদের মধ্যে বসে আছে রাজেশ—রাজেশ ঝা। তেইশ চব্বিশ বছরের টগবগে তাজা একটি যুবক। পলকহীন সে তৌহরলালজির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

একটা মাঝবয়সী কুঁজো ধরনের লোক প্রার্থীদের নাম লিখে তৌহরলালজির কাছে রেখে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাঁর হুকুম মতো নম্বর অনুযায়ী একেক জনকে ডাকছে। কামতালাল, চৌধারি দুসাদ—বজরঙ্গী, মহাদেও, রাম, নগিন ইত্যাদি।

নাম ডাকার সঙ্গে সঙ্গে একেক জন উঠে জোড়হাতে সোজা তৌহরলালজির কাছে চলে আসে। মাথাটা শ্বেতপাথরের বারান্দায় ঠেকিয়ে বলে, 'হুজৌব নমস্তে—' তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করেই থাকে এবং ওইভাবেই তাদের অভাব অভিযোগের ফিরিস্তি শুনিয়ে যায়।

কারো মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না টাকার অভাবে। এখন হুজৌর যদি কৃপা করে কিছু ব্যবস্থা করেন, সে চিরকাল তাঁর কেনা গোলাম হয়ে থাকবে। কারো গাঁয়ে রাস্তা নেই, রাস্তা করে দিতে হবে। কারো পড়শি জোর করে তার জমির গম কেটে নিয়ে গেছে, তাকে হুজুরের শায়েস্তা করতে হবে, ইত্যাদি।

রাজা-মহারাজার স্টাইলে হাত তুলে সবাইকে ভরসা দিয়ে যাচ্ছেন তৌহরলালজি। কাউকেই নিরাশ করছেন না। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, এই অঞ্চলের তাবত মানুষের মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করবেন। এম. এল. এ হবার পর সবাই তাঁকে কল্পতরু ঠাউরে নিয়েছে।

দূরে বসে একনাগাড়ে এত লোকের অভাব এবং দুঃখের কথা শুনতে শুনতে ক্লান্তি বোধ করছিল রাজেশ। তা ছাড়া, তৌহরলালজির রাজকীয় ব্যাপার স্যাপার দেখে ভেতরে ভেতরে বিরক্তও হচ্ছিল। এই লোকটা, পোস্ট ইন্ডিপেনডেন্স পেট্রিয়ট, স্বাধীনতার জন্য একটা আঙুলও তোলেনি। অবশ্য তার পক্ষে এটুকুই বলা যায়, চল্লিশ সালে যার জন্ম এবং সাতচল্লিশে যার বয়স মাত্র সাত তার পক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কী করেই বা সম্ভব? এটা মেনে নিলেও বড় আকারের একটা প্রশ্ন থেকে যায়। স্বাধীনতার পর মানুষের জন্য, দেশের জন্য কী করেছেন তিনি? একটা ঘষা পয়সাও নিজের পকেট থেকে খরচ করেননি। যৌবনের গোড়ায় ছিলেন দুর্ধর্ষ লম্পট। মেয়েঘটিত ব্যাপারে কত বার ফেঁসে যেতে যেতে স্রেফ পয়সার জোরে যে বেঁচে গেছেন!

পরে অবশ্য 'আওরত' সংক্রান্ত দোষটা কেটে যায়। তখন তাঁর নজর পড়ে টাকার ওপর। অঢেল অর্থ জমানোর পর এম. এল. এ হয়ে নিজের একটি সম্ভ্রান্ত ইমেজ তৈরি করতে চেষ্টা করছেন।

রাতারাতি দেশপ্রেমী বনে যাওয়া এই মানুষটাকে, যাঁর কোনো স্যাক্রিফাইস নেই, জনগণের জন্য একটা আঙুলও যে কোনোদিন তোলেনি—মনে মনে ঘৃণা করে রাজেশ। তবু যে তৌহরলালজির কাছে তাকে কৃপাপ্রার্থী হয়ে আসতে হয়েছে তার কারণ রামনাথ ঝা। রামনাথ রাজেশের বাবা।

এখানে, তৌহরলালজির আম দরবারে আসার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না রাজেশের। রামনাথই একরকম জোর করে তাকে তৌহরলালজির কাছে পাঠিয়েছেন। অথচ এটা তাঁর পক্ষে একসময় অভাবনীয়ই ছিল।

রামনাথ একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামী। জীবনের প্রায় সিকি ভাগ ইংরেজের জেলে কেটে গেছে তাঁর। মেরুদণ্ডটি তাঁর ইস্পাতের। কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি, কখনও কারো কাছ থেকে সামান্য সুযোগ নেননি। দুঃখ, নির্যাতন এবং অনটনের মধ্যেও এই সমুন্নত মানুষটি মাথা নোয়াননি।

স্বাধীনতার পর নির্যাতিত দেশপ্রেমিকদের যে তাম্রপত্র দেওয়ার রেওয়াজ চালু হয়েছে তিনি তা

গ্রহণ করেননি। এমনকি পেনশনও নেননি। সবিনয়ে হাতজোড় করে জানিয়ে দিয়েছেন, 'দেশের জন্যে কাজ করেছি, সে কি কিছু পাব বলে? দয়া করে আমাকে লোভী করে তুলবেন না। একটা কিছু পেলে আরও বড় কিছু পেতে ইচ্ছে করবে। আমি সেটা একেবারেই চাই না।'

সেই মানুষটি এখন প্রায় শয্যাশায়ী। বোঝাই যাচ্ছে, তাঁর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। সারা জীবন যিনি ইস্পাতের মতো শক্ত শিরদাঁড়া খাড়া রেখেছেন, এই শেষ সময়ে তাঁকে মাথা নোয়াতে হল। তার কারণ রাজেশ।

নিজের জন্য জীবনে যিনি কিছুই চাননি, কারো কাছে হাত পাতেননি, নিজের মর্যাদাকে কখনও কোনো কারণে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতে দেননি, শেষ পর্যন্ত তিনিই রাজেশের জন্য তৌহরলালজির কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য রাজেশের জন্য কোথাও চাকরি বাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া।

রাজেশ বছরখানেক আগে বি. এ পাস করে বসে আছে' নানা জায়গায় গাদা গাদা দরখাস্ত পাঠিয়েও চাকরি টাকরি তো দূরের কথা, ইন্টারভিউ পর্যন্ত পায়নি। অবশ্য অ্যাপ্লিকেশনে বাবার নামের জায়গায় 'রামনাথ ঝা'ই' শুধু লিখে দিয়েছে। তিনি যে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং নির্যাতিত দেশসেবক, সে সব আদৌ উল্লেখ করেনি। বাবুজির নাম ভাঙিয়ে কোনোরকম অনুগ্রহ চায় না রাজেশ।

রামনাথ বুঝতে পারছিলেন, তদ্বির ছাড়া রাজেশের চাকরি হবে না। এর জন্য জোরাল খুঁটি দরকার। তাঁর দিন তো শেষ হয়ে এল। তারপর রাজেশের কী হবে? ছেলের ব্যাপারে তিনি এতই শঙ্কিত যে জীবনের শেষ সময়ে স্বভাব বিরুদ্ধ কাজটি করে বসলেন। রাজেশ অবশ্য আপত্তি করেছিল, কিন্তু রামনাথ শোনেননি।

চিঠি পাওয়ার পর তৌহরলালজি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছেন। রামনাথকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি জানিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর কাছে রাজেশকে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করেছেন। তাঁর চিঠি পাওয়ার পর একরকম তাড়া দিয়েই রাজেশকে এখানে পাঠিয়েছেন রামনাথ।

রাজেশের ডাক পড়ে সবার শেষে। সে কাছে যেতেই তৌহরলালজি যথেষ্ট খাতির করে বলেন, 'বসো বেটা, বসো।'

রাজেশ লক্ষ করল, অন্য কোনো উমেদার বা দর্শনার্থীকে বসতে বলেননি তৌহরলালজি। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নিজেদের অভাব অভিযোগ জানিয়ে গেছে। তাকে আলাদাভাবে যে এই খাতিরদারি করা হচ্ছে রামনাথের কারণে, সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না রাজেশের। ফরাসের এক কোণে চুপচাপ বসে পড়ে সে।

তৌহরলালজি এবার বেশ ব্যস্তভাবে একটা নৌকরকে দিয়ে প্রচুর লাড্ডু, নিমকিন এবং উৎকৃষ্ট ঠাণ্ডাই আনিয়ে রাজেশকে বলেন, 'খা লেও বেটা।'

বিব্রতভাবে রাজেশ বলে, 'না না, এ সবের দরকার নেই। আমি বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি।'

'এই প্রথম আমাদের কোঠিতে এলে। একটু মুহ্‌মিঠা না করলে মনে খুব কষ্ট হবে। খাও, খাও—'

ফের আপত্তি জানালে অনেক কথা শুনতে হবে। তাই একটা লাড্ডু এবং ঠাণ্ডাই-এর গেলাস তুলে নেয় রাজেশ।

তৌহরলালজি এবার বলেন, 'তোমাকে আগেই ডাকা উচিত ছিল। তবু অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখতে হল। কারণটা কী জানো?'

প্রশ্ন না করে রাজেশ মুখ ফিরিয়ে তৌহরলালজির দিকে তাকায়।

তৌহরলালজি থামেননি। সমানে বলে যান, 'কারণটা তুমি আমার আপনা আদমী। ঐরু-গৈরু-ভৈরুদের (রামা-শ্যামা-যদু-মধু অর্থাৎ অতি সাধারণ মানুষ) সামনে তোমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা নেই। সেই জন্যে ওদের বিদায় করে দিলাম।'

রাজেশ উত্তর দেয় না।

কাত হয়ে থাকতে থাকতে এবার ধীরে ধীরে উঠে বসেন রামনাথ। একটা নৌকর দৌড়ে তার পিঠের দিকে আরও গোটাকতক তাকিয়া সাজিয়ে দেয়। তিনি সেগুলোর ওপর ঠেসান দিয়ে রাজেশের দিকে ঝোঁকেন। বলেন, 'রামনাথজি, মানে তোমার বাবুজি আমাদের গৌরব। কান্ট্রির জন্যে কত বছর তিনি জেলে কাটিয়েছেন। এরকম ত্যাগী দেশপ্রেমী সারা দেশে দু'চারজনের বেশি জন্মাননি। হোল ইন্ডিয়া তাঁর জন্যে গর্বিত। তবু আমাদের গর্বটা অন্য সবার থেকে বেশি, কেননা তিনি আমাদের এই এলাকার মানুষ।' তোড়ে কথা বলার পর কিছুক্ষণ দম নিয়ে ফের শুরু করেন তৌহরলালজি, 'রামনাথজি আমাকে চিঠি দিয়েছেন। আমারই তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করা উচিত ছিল। লেকেন যাইনি বিশেষ একটা কারণে। আমি চাইছিলাম তুমি এখানে আসো। তোমার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে।'

রাজেশ অবাক হয়ে যায়। তৌহরলালজিকে পিপরগঞ্জের রাস্তায় দূর থেকে দেখলেও তাঁর সঙ্গে আলাপ টালাপ হয়নি। আলাপের কোনো হেতুও ছিল না। সে রাঁচিতে মামাবাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেছে। ছুটিছাটায় পিপরগঞ্জে আসত। শুনেছে, দু'একবার নাকি তৌহরলালজি তাদের বাড়ি এসেছেন। তবে তার সঙ্গে কোনোবারেই দেখা হয়নি।

রাজেশ বলে, 'আমার সঙ্গে কী জরুরি কথা?'

রহস্যময় হেসে তৌহরলালজি বলেন, 'সব বলব। তার আগে একটা খবর দিয়ে রাখি।'

'কী?'

'পাটনা আর জামশেদপুরে বড় বড় চার পাঁচজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের সঙ্গে তোমার নৌকরির ব্যাপারে কথা বলেছি। সবাই তোমাকে তাঁদের কোম্পানিতে পেতে চান। এক মাসের ভেতর তোমার নৌকরি হয়ে যাবে। কোম্পানিগুলোর নাম বলে দেব। কোথায় কাজ করবে, সেটা রামনাথজির সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করে নিও।'

এত বড় একটা খবর শোনার পরও রাজেশ কোনোরকম উচ্ছ্বাস দেখায় না। সে চুপ করে থাকে।

তৌহরলালজি বলেন, 'কী, খুশি তো?'

ভদ্রতার খাতিরে কিছু একটা উত্তর দিতে যাবে, সেই সময় হঠাৎ রাজেশের মনে পড়ে যায় রামনাথ ঝা'র মতো একজন নিঃস্বার্থ শ্রদ্ধেয় দেশপ্রেমিককে তার জন্য জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তৌহরলালের মতো একজন অসৎ ধান্দাবাজ লোকের কাছে হাত পাততে হয়েছে। এক ধরনের গ্লানিতে তার মন ভরে যাচ্ছিল।

তৌহরলালজি জবাবের জন্য অপেক্ষা করেন না। বলেন, 'চাকরির ব্যাপারটা হয়ে গেল। এবার জরুরি কথাটা বলি।'

তৌহরলালের বলার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যাতে ভেতরে ভেতরে সতর্ক হয়ে যায় রাজেশ।

তৌহরলাল বলতে থাকেন, 'কথাটা বলছি এই কারণে যে তোমরা হলে আমার আপনজন। রামনাথজি ইচ্ছা করলে অন্য কাউকে তোমার নৌকরির জন্যে বলতে পারতেন। তবু কৃপা করে আমাকে বললেন কেন? কারণ উনি আমাকে নিজের লোক মনে করেন।'

এত ধানাই পানাই ভাল লাগছিল না রাজেশের। শান্ত, নিস্পৃহ মুখে সে বলে, 'যা বলার বলুন না—'

তৌহরলালজি গলা খাঁকরে নিজেকে প্রস্তুত করে নেন। তারপর বলেন, 'নিশ্চয়ই শুনেছ, তিন চার মাস পর চুনাও আসছে?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা হেলায় রাজেশ।

'এবার ইলেকশানে লড়াইটা খুব জোরদার হবে। শুনছি একজন হরিজন ক্যান্ডিডেট এবং একজন মাইনোরিটি কমিউনিটির ক্যান্ডিডেট এবার চুনাওতে নামছে। এখানে মুসলিম আর শিডউল্ড কাস্টের

প্রচুর ভোট রয়েছে। দুই ক্যান্ডিডেটেরই যথেষ্ট ইনফ্লুয়েন্স। ওরা মুসলিম আর হরিজন ভোট পুরোটাই প্রায় টেনে নেবে। এতকাল এই ভোটগুলোর ওপর ভরসা করেই আমি জিতে এসেছি। আমার প্রবলেমটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।'

রাজেশ জবাব দেয় না, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে শুধু।

তৌহরলাল ফের বলল, 'আমাকে এই সমস্যা থেকে একমাত্র বাঁচাতে পারেন তোমার বাপুজি।'

তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভুরু কুঁচকে যায় রাজেশের। সে জিজ্ঞেস করে, 'কীভাবে?'

'তিনি এখানকার সব চেয়ে রেসপেক্টেড পার্সন। হরিজন হোক, কাস্ট হিন্দু হোক, মুসলিম, কৃশ্চান, আদিবাসী, যাই হোক না রামনাথজি যাকে যা বলবেন চোখ বুজে সে তাই করবে। পাবলিকের কাছে ওঁর ভাবমূরত, মতলব ইমেজের তুলনা হয় না। তা ছাড়া উনি আমার এত বড় আপনজন—ওয়েল উইশার।'

সমস্ত ব্যাপারটা এবার জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায় রাজেশের কাছে। সে বলে, 'আপনি চাইছেন বাপুজি হরিজন আর মুসলিমদের মহল্লায় গিয়ে আপনার হয়ে ক্যামপেন করুন—এই তো?'

তৌহরলালের সমস্ত মুখ হাসিতে চকচক করতে থাকে। রাজেশের একটা হাত ধরে বলেন, 'তুমি ঠিক ধরেছ বেটা। তবে রামনাথজি অসুস্থ মানুষ। তাঁকে রোজ রোজ ঘোরাতে চাই না। স্রিফ একদিন গাড়িতে করে উনি আমাদের সঙ্গে পিপরগঞ্জের নানা এলাকায় ঘুরবেন। স্রিফ একটা দিন। তাতেই আমার কাজ হয়ে যাবে।'

হিসেবটা চমৎকার কষে নিয়েছেন তৌহরলাল। কী মসৃণভাবেই না তিনি রামনাথকে নিজের স্বার্থে কাজে লাগাতে চাইছেন! তুখোড় ফন্দিবাজ লোকটাকে দেখতে দেখতে শিরদাঁড়া টান টান হয়ে যায় রাজেশের, মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সে বলে, 'আপনি আমার নৌকরির ব্যবস্থা করে দেবেন। বাপুজি আপনাকে ইলেকশানে জিতিয়ে দেবেন। এইরকম একটা প্ল্যান বোধহয় আপনার মাথায় রয়েছে, তাই না?'

রাজেশের কথায় কোথাও কি সূক্ষ্ম খোঁচা রয়েছে? একটু থতিয়ে যান তৌহরলাল। তারপর হালকা চালে স্নেহময় অভিভাবকের মতো বলেন, 'নটি বয়। ব্যাপারটা মোটামুটি ঠিকই ধরেছ।'

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমার বাপুজির সঙ্গে এখন রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই।'

'জানি বৈকি, নিশ্চয়ই জানি।'

'এর আগের বার একজন ক্যান্ডিডেট বাপুজিকে গিয়ে ধরেছিল তাঁর হয়ে চুনাও-এর মিটিংয়ে কিছু বলার জন্যে। বাপুজি তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন।'

'তুমি ওই জগ্গিলাল সহায়ের কথা বলছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'রামনাথজি ওকে ভাগিয়ে দিয়ে খুব ভালো করেছেন। জগ্গিলাল একটা জঘন্য লোক—জানয়র য্যায়সা। অ্যান্টি-সোশাল, ভ্রষ্টাচারী।'

'সে ঠিক আছে। কিন্তু যিনি রাজনীতি করেন না তাঁকে আপনার ক্যামপেনে টেনে আনা ঠিক হবে না।'

তৌহরলাল অমায়িক হেসে বলেন, 'আমার কথা আলাগ। ওই যে বললাম আমি তোমাদের আপনজন—স্রিফ মেরে আপনে।'

স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে রাজেশ। তারপর বলে, 'আপনাকে এবার একটা কথা বলি। আমার নৌকরির দাম হিসেবে ইলেকশানে বাপুজিকে কাজে লাগাতে চাইছেন। এটা আমি কিছুতেই হতে দেব না। আমার নৌকরির দরকার নেই। আচ্ছা চলি।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় রাজেশ।

তারপর পেছন ফিরে একবারও না তাকিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বারান্দা থেকে নিচে নেমে সোজা গেটের বাইরে চলে আসে।

তার জন্য রামনাথ অনেকটাই নীচে নেমেছেন। এই শেষ বয়সে বাপুজিকে আর নামাতে পারবে না রাজেশ। তাঁর মর্যাদা তাকে রাখতেই হবে।

যেখানে সীমান্ত নেই

একান্ন বছর পর ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা কামরা থেকে আলতাফ যখন ভয়ে ভয়ে আজিমাবাদ স্টেশনে নামল, শীতের সূর্য আকাশের ঢাল বেয়ে পশ্চিম দিকে অনেকখানি নেমে গেছে। রোদে এখন বাসি হলুদের ম্যাড়মেড়ে রং। উল্টোপাল্টা উত্তুরে হাওয়া চারদিকে বেপরোয়া ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে।

পুরো নাম আলতাফ হোসেন। বয়স ষাট। মাঝারি উচ্চতা তার, রোগাটে গড়ন। চোখের তলায় কালির পোঁচ, হনুদু'টো গজালের মতো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে, তাই চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। চামড়া কুঁচকে খসখসে হয়ে গেছে। সারা শরীর জুড়ে ক্ষয়ের ছাপ। চুল এবং মুখ-ভর্তি দাড়ির বেশির ভাগটাই সাদা।

আলতাফের পরনে প্রচুর কুঁচি-দেওয়া ঢোলা পাজামা আর শেরওয়ানি। তার ওপর রোঁয়াওলা উলের পুরো-হাতা পুলওভার। উত্তর ভারতের দুর্জয় ঠাণ্ডা ঠেকাবার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। তাই পুলওভারের ওপর মোটা পশমি চাদরও জাড়িয়ে নিয়েছে। পায়ে ভারী চপ্পল।

আলতাফের ডান হাতে একটা চামড়ার ঢাউস স্যুটকেস, আরেক হাতে হোল্ড-অল। হোল্ড-অলটার ভেতর রয়েছে তার বালিশ, তোষক, একজোড়া কম্বল এবং বেড-কভার ছাড়াও টুকিটাকি অজস্র জিনিস।

দেশভাগের দু'বছর বাদে যখন তার বয়স নয়, আলতাফরা আজিমাবাদ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। উঠেছিল করাচি শহরে। পুরনো করাচির ঘিঞ্জি এলাকায় তারা থাকে। জায়গাটা ভারত থেকে চলে-যাওয়া উর্দুভাষী মুসলিম উদ্বাস্তুদের একটা কলোনি। ওখানে তাদের বলা হয় মোহাজির।

একান্ন বছর পর সে যে ইন্ডিয়ায় এল তার কারণ দু'টো। এক, আজমীর শরিফে যাওয়া। দুই, আজিমাবাদে এসে বড় বোন ফতিমার সঙ্গে দেখা করা। দেশভাগের পর তারা পাকিস্তানে চলে গেলেও ফতিমারা এখানেই থেকে গেছে। অনেকেই ওদের বুঝিয়েছিল, ইণ্ডিয়ায় তাদের নিরাপত্তা নেই, ভবিষ্যৎও অন্ধকার। এই অবস্থায় প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে এখানে পড়ে থাকার মানে হয় না। কিন্তু ফতিমার শ্বশুর শেখ বদরুদ্দিন খান ভীষণ একবগ্‌গা ধরনের মানুষ। তার এক কথা, নিজের দেশ, নিজের জন্মভূমি ছেড়ে পরিবার নিয়ে কোথাও যাবে না। এতে যা হবার হবে।

দেশভাগের আগে এবং কিছু পরেও আজিমাবাদে হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে বেশ কয়েকবার বড় আকারের দাঙ্গা বেধেছিল। যার পরিণতি আগুন, রক্তপাত আর হত্যা। দুই সম্প্রদায়ের মানুষ কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। পরস্পরের প্রতি তখন শুধুই ঘৃণা, বিদ্বেষ আর সন্দেহ। মুসলমানদের মধ্যে যখন চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, তারা দলে দলে চলে যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে, তখনও মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারায়নি শেখ বদরুদ্দিন। তার ধারণা, সবাই অমানুষ হয়ে যায়নি।

আলতাফের মতো একজন সামান্য মানুষের পক্ষে মুখের কথা খসলেই পাকিস্তান থেকে হুট করে ইন্ডিয়ায় চলে আসা সম্ভব নয়। দিনের পর দিন ছোটাছুটি করে, প্রচুর হয়রানি সয়ে যখন সে আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে সেই সময় পনের দিনের ভিসা পেয়ে গিয়েছিল। করাচি থেকে প্লেনে তাকে দিল্লি

হয়ে ট্রেনে আজমীর শরিফ যেতে হবে। সেখান থেকে আজিমাবাদে এসে ফতিমার সঙ্গে দেখা করে ফের দিল্লি গিয়ে প্লেনে করাচি। অর্থাৎ যে রুটে এসেছিল সেই রুটেই তাকে ফিরতে হবে।

দিন সাতেক আগে ইন্ডিয়ায় এসেছে আলতাফ। আসার সময় তাদের মহল্লার লোকজনেরা বার বার হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল, ইন্ডিয়া মুসলমানদের, বিশেষ করে পাকিস্তানিদের পক্ষে নিরাপদ নয়। ইন্ডিয়ায় আসার পর ট্রেনে বাসে ট্যাক্সিতে এই সাতদিন প্রচুর ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আলতাফের একবারও মনে হয়নি, তার বিপদের কোনো কারণ আছে। এই বিশাল দেশ, লাখ লাখ মানুষ, কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায়নি। তবু যে ক'দিন এখানে আছে তাকে সতর্ক হয়েই চলাফেরা করতে হবে। করাচির পড়শিদের হুঁশিয়ারিটা সে ভুলে যায়নি।

ট্রেন থেকে নেমে দাঁড়িয়ে পড়েছিল আলতাফ। দু'চোখে অসীম আগ্রহ নিয়ে চারদিকে তাকাল। সে একাই নয়, ট্রেনটা থেকে আরও অনেক প্যাসেঞ্জার নেমেছে। তা ছাড়া বেশ কিছু লোক নানা দিকে যাবার জন্য প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, মালপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে। পুরো স্টেশন চত্বরটা এখন সরগরম।

করাচিতে চলে যাবার পর গোড়ার দিকে আজিমাবাদের জন্য ভীষণ মন খারাপ হয়ে থাকত আলতাফের। কয়েক বছর বাদে এখানকার কথা সেভাবে আর ভাবেনি সে। ইন্ডিয়া থেকে তাদের সঙ্গে হাজার হাজার মুসলিম ফ্যামিলি সীমান্তের ওপারে চলে গেছে। নতুন দেশ, নতুন নতুন বন্ধু, স্কুল, পড়াশোনা—সব মিলিয়ে উত্তরপ্রদেশের এক প্রান্তে পড়ে থাকা নগণ্য আজিমাবাদ টাউন বহু দূরের আধ-চেনা কোনো সিতারার মতো অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শীতের এই বেলাশেষে পুরোনো স্মৃতি একটু একটু করে যেন ফিরে আসছে।

আলতাফের মনে পড়ছে, স্টেশনের একতলা লাল বিল্ডিং আর সুরকি-বিছানো প্ল্যাটফর্মটা একান্ন বছর আগের মতোই রয়েছে। নতুন যা যোগ হয়েছে তা এইরকম। প্ল্যাটফর্মটা ছিল ন্যাড়া, এখন সেটার মাথায় জবরদস্ত টানা একটা শেড। চড়া রোদ এবং বৃষ্টির ছাট থেকে প্যাসেঞ্জারদের মাথা বাঁচানোর জন্য এই ব্যবস্থা। স্টেশনের টিকেট-কাউন্টারের গা ঘেঁষে একটা বড় চায়ের স্টল চোখে পড়ছে। সেখানে চা তো পাওয়া যায়ই, তা ছাড়া কাচের শো-কেসে রয়েছে কত রকমের মিঠাই-লাড্ডু, গুলাবজামুন, প্যাঁড়া, বড় দানার বুন্দিয়া। শো-কেসের মাথায় বড় বড় কাচের বয়েমে নানা ধরনের বিস্কুট, চানাচুর, গাঠিয়া। বয়েমগুলোর পাশে পাউরুটির স্তূপ। এই টি-স্টলটা আগে ছিল না।

দেশভাগের সময় এখানে সিঙ্গল লাইন দিয়ে আপ এবং ডাউন ট্রেনগুলো যাতায়াত করত। এখন দেখা যাচ্ছে, আরও একজোড়া লাইন পাতা হয়েছে। ওধারের লাইনের পর শেডওলা নতুন একটা প্ল্যাটফর্মও করা হয়েছে।

একান্ন বছর আগে আজিমাবাদ ছিল খুব নগণ্য এক স্টেশন। সারাদিনে মাত্র দু'জোড়া আপ আর দু'জোড়া ডাউন ট্রেন জায়গাটাকে ছুঁয়ে যেত। ট্রেন আসার সময় এখানে যা একটু চাঞ্চল্য দেখা দিত। বাকি দিনটা গোটা স্টেশন চত্বর নিঝুম পড়ে থাকত। মনে হত, সব কিছু গভীর ঘুমের আরকে ডুবে আছে।

স্টেশনে দাঁড়িয়েই টের পাওয়া গেল, দেশভাগের পর এখানে প্রচুর মানুষ বেড়েছে, বেড়েছে তাদের ব্যস্ততা এবং নানা দিকে অবিরত ছোটাছুটি। করাচির কথা মনে পড়ল আলতাফের। দেশভাগের পর তারা যখন সেখানে যায়, কত আর মানুষ! আর এখন? একান্ন বছরে ওই শহরটায় জন-বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। চারদিকে সারাক্ষণ থিকথিকে ভিড়। দুনিয়ার সব জায়গাতেই মানুষ ক্রমাগত পোকার মতো বেড়ে চলেছে। আজিমাবাদই বা বাদ থাকবে কেন?

স্মৃতির ভেতর থেকে নিজেকে একসময় টেনে তোলে আলতাফ। কয়েক পলক প্ল্যাটফর্মের প্যাসেঞ্জারদের লক্ষ করে। কিন্তু একটা চেনা মুখও নজরে পড়ছে না। হঠাৎ খেয়াল হল, করাচিতে

যাবার সময় আজিমাবাদে যাদের দেখে গিয়েছিল তাদের চেহারা কি আর সেরকমই আছে যে দেখামাত্র চিনে ফেলবে? তা ছাড়া, সেই পরিচিত মানুষগুলোর কত জন বেঁচে আছে তা-ই বা কে জানে। থাকলেও তারা দল বেঁধে এই মুহূর্তে স্টেশনে চলে এসেছে, তা ভাবার কারণ নেই। তার নিজের কথাই যদি ধরা যায়, সেই বচপনের চেহারার সঙ্গে এখনকার চেহারার আদৌ কি কোনো মিল আছে? পরিচয় না দিলে আজিমাবাদের কেউ তাকেও চিনতে পারবে না।

আলতাফ আর দাঁড়িয়ে থাকে না। লোকজনের জটলার ভেতর দিয়ে পায়ে পায়ে গেটের দিকে এগিয়ে যায়।

দিন সাতেক আগে যখন সে ইন্ডিয়ায় আসে, দিল্লির এক ডাকঘর থেকে পোস্ট কার্ড কিনে আজিমাবাদে তার বড় বোন ফতিমাকে চিঠি লিখেছিল, খুব শীগগিরই এখানে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। কিন্তু আজই যে আসতে পারবে, সে সম্বন্ধে নিজেই নিশ্চিত ছিল না। আজকের কথা জানিয়ে দিলে ফতিমা নিশ্চয়ই তার ছেলেদের কাউকে স্টেশনে পাঠিয়ে দিত। কিন্তু পাঠালেও তাদের কি চিনতে পারত আলতাফ? যখন তারা পাকিস্তানে যায়, ফতিমার বড় ছেলের বয়স সবে এক। এক বছরের সেই বাচ্চাটিকে এখন কেমন দেখতে হয়েছে, কে বলবে। যাই হোক, কেউ স্টেশনে তাকে নিতে না এলেও, উঁচা মহল্লায় ফতিমাদের বাড়ি খুঁজে বার করতে তার অসুবিধা হবে না। এখানে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য এক জাদুতে পুরোনো আজিমাবাদের রাস্তাঘাট, নানা মহল্লা চোখের সামনে ফুটে উঠছে।

গেটের মুখে কালো কোট পরা টিকেট কালেক্টর দাঁড়িয়ে ছিল। তার হাতে টিকেট জমা দিয়ে কয়েক পা এগুলেই পাথরে-বাঁধানো সিঁড়ি। পায়ের ঘষায় খানিকটা করে ক্ষয়ে গেলেও সেগুলো দেশভাগের সময়কার মতোই রয়েছে। নামতে নামতে আলতাফের মনে পড়ল, সবসুদ্ধু পঁচিশটা ধাপ ছিল। গুনে গুনে দেখল, সংখ্যাটা একই আছে। স্মৃতি এক অদ্ভুত ব্যাপার, অদৃশ্য গোপন সিন্দুকে কত কিছু যে ধরে রাখে!

নীচে নামতেই তাজ্জব বনে গেল আলতাফ। চারপাশ একেবারে গম গম করছে। দেশভাগের সময় এখানে ছিল সুরকির সরু একটা রাস্তা, সেটার একধারে তেরপল কী ফুটোফাটা টিনের চালার তলায় তিন চারটে চা কী পানবিড়ির দোকান। আরেক ধারে ক'টা টাঙা সওয়ারির আশায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত। কিন্তু কোথায় সওয়ারি? টাঙাওলারা এবং তাদের ঘোড়াগুলো প্রায় সারাদিন ঝিমাত। এই নির্জন এলাকার অন্তহীন, গভীর ঘুম এবং আলস্য তাদের ওপর ভর করে থাকত যেন।

কিন্তু এখন জায়গাটার চেহারা আগাগোড়া বদলে গেছে। পুরোনো সুরকির রাস্তাটা দশগুণ চওড়া হয়েছে, তার ওপর কালো মসৃণ পিচ। দু'ধারে যতদূর চোখ যায়, লাইন দিয়ে দোকান। প্রতিটি দোকানদার রাস্তার চার পাঁচ ফুট করে জায়গা দখল করে তাদের মালপত্র সাজিয়ে রেখেছে। দোকানগুলোতে ভনভনে মাছির মতো খদ্দেরের ভিড়। পাকিস্তানের যে কোনো মফস্বল শহরে স্টেশনের গায়ে অবিকল এই দৃশ্য চোখে পড়ে। এ ব্যাপারে ইন্ডিয়া-পাকিস্তানে কোনো তফাত নেই।

আলতাফ লক্ষ করল, ডান পাশে ঝাঁকড়া-মাথা চার পাঁচটা পিপুল গাছের তলায় সারি দিয়ে টাঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে। দেশভাগের সময় তিন চারটের বেশি দেখা যেত না। এখন টাঙার সংখ্যা কম করে তার দশ গুণ।

টাঙার সারি যেখানে, তার উল্টো দিকে ক'টা রেন-ট্রির তলায় অনেকগুলো অটো রিকশা চোখে পড়ল। এই যানগুলো কবে এসেছে, কে জানে। ইন্ডিয়া ছেড়ে আলতাফরা যখন চলে যায়, আজিমাবাদে অটো ছিল না।

ওল্ড করাচিতে ঝাঁকে ঝাঁকে অটো রিকশা চলে। কিন্তু অটোয় চড়া খুব একটা পছন্দ করে না

আলতাফ। সে পিপুল গাছগুলোর তলায় টাঙা স্ট্যান্ডে চলে এল। একটা টাঙা ঠিক করে স্যুটকেস আর হোল্ড-অল নিয়ে উঠে বসতেই মাঝবয়সী টাঙাওলা তার গাড়ি চালিয়ে দেয়।

মানুষের ভিড়, গৈয়া গাড়ি, অটো, টাঙা, ভ্যান, ঠেলা গাড়ি ইত্যাদি মিলিয়ে রাস্তা জুড়ে জটপাকানো, দমবন্ধ-করা অবস্থা। আলতাফের টাঙার চালক হাওয়ায় সাঁই সাঁই চাবুক হাঁকাতে হাঁকাতে গলার শির ছিঁড়ে সমানে চেঁচাতে থাকে, 'হট যাও, হট যাও—' শুধু সে-ই না, অন্য টাঙাওলা, অটোওলা, ভ্যানওলারাও একইভাবে চিৎকার করতে করতে চলার মতো পথ করে নিচ্ছে।

স্টেশনের এলাকাটা পেরুতে মিনিট পনের কুড়ি লেগে যায়। তারপর রাস্তা অনেকটাই ফাঁকা।

শহরের নামেই এখানকার স্টেশনের নাম। আজিমাবাদ টাউন স্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূরে। আলতাফের পরিষ্কার মনে পড়ে, সুরকির একটা রাস্তা শহরের সঙ্গে স্টেশনটাকে জুড়ে রেখেছিল। সেটা ধরেই এখন সে চলেছে। কিন্তু রাস্তাটা আর আগের মতো নেই, পিচ ঢেলে পাকা করে ফেলা হয়েছে। একান্ন বছর আগে এটার দু'ধারে ছিল ধুধু কাঁকুরে মাঠ, সেখানে ঝোপঝাড় এবং আগাছার জঙ্গল। এখন জঙ্গল উধাও। দু'পাশেই অগুনতি বড় বড় বাড়ি, ফাঁকে ফাঁকে মন্দির।

সূর্য পশ্চিম দিকে উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর আড়ালে নেমে গেছে। ফিকে, মলিন যে লালচে আলোটুকু এখনও আকাশের গায়ে লেগে আছে, কয়েক মিনিটের মধ্যে তাও থাকবে না। ঝপ করে নেমে আসবে শীতের সন্ধে। তার আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। বেলা ফুরোতে না ফুরোতেই চারদিকে মিহি হিম ঝরে চলেছে। উত্তুরে হাওয়ায় এখন ছুরির ধার, শরীরের খোলা জায়গাগুলোতে যেন কেটে কেটে বসে যাচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশের এই মফস্বল শহরে শীতের দিনটা কীভাবে ফুরিয়ে যাচ্ছে সেদিকে লক্ষ নেই আলতাফের। হঠাৎ সে টাঙাওলাকে ডাকে, 'এ ভাইয়া—'

ধূসর কম্বলজড়ানো টাঙাওলা ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'জি—'

আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'টাউনটা অনেক বদলে গেছে, না?'

'জি, হাঁ—'

হাত বাড়িয়ে রাস্তার দু'দিকে দেখাতে দেখাতে আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'এক সময় ওখানে ফাঁকা জমিন ছিল।'

টাঙাওলা লোকটা যথেষ্ট বিনয়ী। সওয়ারিকে ইজ্জৎ দিতে জানে। সামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে জবাব দেয়, 'জি, হাঁ। এখন টৌনে দো অংলি (দু আঙুল) ফাঁকা জায়গা পাবেন না। স্রিফ মকান আউর মকান।' একটু থেমে বলে, 'আমার আঁখের সামনে টৌনটা কত বড় হয়ে গেল!' লোকটা খুব সম্ভব লেখাপড়া করেনি, টাউনকে বলে টৌন।

আলতাফ বলল, 'মানুষ বাড়লে টাউন তো বাড়বেই।'

'জি—'

যে তেজি ঘোড়াটা টাঙা টেনে নিয়ে চলেছে সেটার গলায় এক থোকা পেতলের ঘুন্টি বাঁধা। চলার তালে তালে সেগুলো থেকে মিঠে, সুরেলা আওয়াজ আসছে।

কাঠের পাটাতনের ওপর পুরু চটের শক্ত, ঠাণ্ডা সিটে বসে আলতাফের মনে হল, আদ্যিকালের এই যানটা তাকে একান্ন বছর আগের পূর্বজন্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাজ্জবের ব্যাপার, যে ফতিমাকে দেখার জন্য সুদূর করাচি থেকে এতদূরে চলে এসেছে, তাকে সরিয়ে দিয়ে রামু, লছমন, বৈজু আর ধনুয়ার মুখ চোখের সামনে ফুটে উঠছে। আরও অনেকের কথাও মনে পড়ছে যাদের নাম সে ভুলে গেছে। এরা সবাই ছিল তার বন্ধু, খেলার সাথী, আজিমাবাদ প্রাইমারি স্কুলে তারা একই ক্লাসে পড়ত।

ধনুয়ার কথা ভাবতেই হঠাৎ মুখটা শক্ত হয়ে ওঠে আলতাফের। যতদূর মনে আছে, ওর বাবা লাজপত সিং এবং তার সঙ্গীরা দেশভাগের আগে আগে আজিমাবাদে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছিল। ছেলের

বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও আলতাফেরা রেহাই পায়নি, তাদের মকানেও ওরা আগুন লাগিয়েছিল। লাজপত সিং বেঁচে আছে কিনা, কে জানে। থাকলে পাকিস্তান থেকে আজিমাবাদে তার আচমকা চলে আসাটা কীভাবে নেবে, কে জানে। ভেতরে ভেতরে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে আলতাফ।

এতকাল পর জন্মভূমিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে নানা দিক থেকে উল্টোপাল্টা নানা ভাবনা তার মস্তিষ্কে হানা দিতে থাকে। একটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই আরেকটা এসে হাজির হয়। লাজপত সিংয়ের চিন্তাটা বেশিক্ষণ তাকে উদ্বেগের মধ্যে রাখে না। হঠাৎই দুই টাঙাওলা ফকিরা আর হানিফের কথা মনে পড়ে যায়। ফকিরা ছিল বেজায় ভালমানুষ। সওয়ারি না পেলে মাঝে মাঝে আলতাফ এবং তার বন্ধুদের টাঙায় তুলে আজিমাবাদের রাস্তায় রাস্তায় এক চক্কর ঘুরিয়ে আনত। কিন্তু ফকিরা ছিল দারুণ রগচটা আর খিটখিটে। তার মাথায় সারাক্ষণ খুন চড়ে থাকত যেন। নিজের টাঙার ধারে কাছে আলতাফদের ঘেঁষতে দিত না। সামনে গেলে তেড়ে গালাগাল দিত। কিন্তু আলতাফ এবং তাঁর বন্ধুরা ছিল নাছোড়বান্দা। ফকিরা সামনের দিকে তাকিয়ে হয়তো গাড়ি চালাচ্ছে, ওরা নিঃশব্দে টাঙার পেছন দিকের পাটাতন ধরে ঝুলতে ঝুলতে যেত। কিন্তু ফকিরার ছিল দশ জোড়া চোখ। মুখ না ফিরিয়েও সব কিছু টের পেয়ে যেত সে। টাঙা চালাতে চালাতে পেছন দিকে সে সমানে চাবুক হাঁকাত।

আলতাফ ডাকে, 'ভাইয়া—'

টাঙাওলা তক্ষুণি সাড়া দেয়, 'জি—'

'ফকিরা আর হানিফকে চেন? বেঁচে থাকলে তাদের উমর এখন অনেক।'

'তারা কারা?'

'বহুৎ সাল আগে এই টাউনে টাঙা চালাত।'

টাঙাওলা কিছুক্ষণ ভাবে। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায়। বলে, 'হাঁ হাঁ, ইয়াদ হ্যায়। পুরানা টোলিতে হানিফ চাচা আর ফকিরা চাচা থাকত। লেকেন দশ বার সাল আগে দু'জনেই মারা গেছে।'

ছেলেবেলার পরিচিত দু'টি মানুষের মৃত্যুসংবাদে মনটা খারাপ হয়ে যায় আলতাফের। তারা যখন পাকিস্তানে চলে গেল, হানিফ আর ফকিরা, দু'জনেরই বয়স ছিল চল্লিশের নিচে। দশ বার বছর আগে তাদের মৃত্যু হলে কম করে ওরা চুয়াত্তর পঁচাত্তর বছর বেঁচে ছিল। আয়ুটা খুব কম নয়। বেশির ভাগ মানুষই এতদিন বাঁচে না। তবু সেই আমলের দুই টাঙাওলার জন্য বুকের ভেতরটা ভারি হয়ে ওঠে আলতাফের।

আজিমাবাদ শহরটার মাঝখানে দিয়ে ছোট একটা নদী বয়ে গেছে। নাম মোতিয়া। সেখানে এসে অবাক হয়ে যায় আলতাফ। তার ছেলেবেলায় নদীর ওপর একটা মজবুত কাঠের পুল ছিল। সেটা শহরের দুই অংশকে জুড়ে রেখেছিল। মানুষজন, টাঙা, সাইকেল রিকশা, গৈয়া কী ভৈসা গাড়ি, সামান্য দু-চারটে মোটর ওটার ওপর দিয়েই এপার ওপার করত। কিন্তু সেই পুরোনো পুলটার এক টুকরো কাঠও এখন খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই জায়গায় উঠেছে কংক্রিটের তিনগুণ চওড়া পুল। সেটার দু'ধারে ফুটপাত এবং সারি সারি ল্যাম্প পোস্ট।

পুল পেরুতে পেরুতে আলতাফ বলে, 'আচ্ছা ভাই, পুরনো পুল ভেঙে এখানে ব্রিজ কবে বানানো হয়েছে?'

টাঙাওলা বলে, 'করীব তিশ পঁয়তিশ সাল।'

আলতাফ আর কোনো প্রশ্ন করে না। অসীম আগ্রহে পুলটা দেখতে থাকে। আজিমাবাদ শহরে তার ছেলেবেলার অনেক কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

টাঙাওলা ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'এক বাত পুছুঙ্গা?'

সামান্য চমকে উঠে আলতাফ বলে, 'হাঁ হাঁ, পুছো না—'

আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, বহুৎ সাল বাদ আপনি এই টৌনে এলেন।'

'হাঁ।'

'আপনি কি এখানে থাকতেন?'

'হাঁ।'

'এখন কোথায় থাকেন?'

টাঙাওলার কৌতূহলটা খুবই নিরীহ ধরনের। যে-প্রশ্নটা সে করেছে তার ভেতর সন্দেহজনক কিছু নেই। তবু চকিত হয়ে ওঠে আলতাফ। করাচি থেকে আসার সময় পড়শিরা বার বার তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। সে যে পাকিস্তানি, এটা পারতপক্ষে কাউকে যেন না জানায়।

আলতাফ মুহূর্তে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। ন' বছর বয়স পর্যন্ত সে ইন্ডিয়ায় ছিল। তার মধ্যে একবার আগ্রা এবং দিল্লি যাওয়া ছাড়া আজিমাবাদের বাইরে কখনও পা ফেলেনি। করাচিতে যাবার পর এ দেশের সঙ্গে যে সম্পর্কটুকু ছিল, চিরকালের মতো তা ছিন্ন হয়ে যায়। এখানকার কিছুই সে প্রায় জানে না। কয়েকটা বড় বড় শহরের নাম অবশ্য শুনেছে। দিল্লিতে তো ছেলেবেলায় গিয়েছিলই, এবার পাকিস্তান থেকে আসার সময় সেখানে নেমেছেও। দিল্লি বাদ দিলে কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ, কটক, বাঙ্গালোর ইত্যাদি নামগুলোও তার জানা। প্রায় মরিয়া হয়েই আলতাফ বলে, 'কলকাত্তায় থাকি।' টাঙাওলা যাতে কোনোরকম সন্দেহ না করে, সে জন্য প্রাণপণে নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করছে।

টাঙাওলা বলে, 'কলকাত্তা তো খুব বেশি দূরে নয়। তবু এত সাল বাদে এলেন!' গলা শুনে বোঝা যায়, সে বেশ একটু অবাকই হয়েছে।

হঠাৎ আলতাফের মনে হল, লোকটা খুব গায়ে-পড়া। যেভাবে উকিলদের মতো জেরা শুরু করেছে তাতে অসাবধানে ওর কোন প্রশ্নের কী জবাব দেবে, এবং তার ফলে কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবে, কে জানে। লোকটাকে এখনই থামিয়ে দেওয়া দরকার। নিস্পৃহ সুরে আলতাফ বলল, 'কামকাজ নিয়ে এত ঝামেলায় থাকতে হয়, তাই—' শেষ না করেই সে থেমে যায়।

টাঙাওলা এবার আন্তরিক গলায় জিজ্ঞেস করে, 'এখানে আপনার কে কে আছে—পিতাজি, মাতাজি, কোঈ রিস্তেদার?'

মা, বাবা বা অন্য কোনো আত্মীয়স্বজন আজিমাবাদে থাকে কিনা সেটাই টাঙাওলার জিজ্ঞাস্য। সঠিক জবাব দিতে হলে অনেক কথা এসে পড়বে যা আলতাফের পক্ষে আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। সে অস্পষ্টভাবে, নিচু গলায় কিছু একটা বলে যা প্রায় বোঝাই যায় না।

টাঙাওলা আন্দাজ করে নেয়, তার এই প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া যাবে না। সে আর কিছু বলে না।

পুল পেরিয়ে ওপারে চলে আসে টাঙাটা। নদীর এপারে রাস্তার দু'ধারে আজিমাবাদের সবচেয়ে বনেদি এলাকা। বিশাল বিশাল কমপাউণ্ডের ভেতর পুরনো আমলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাভেলি, যেগুলোর সামনের দিকে ফুলের বাগান, লন, নুড়ির রাস্তা। পঞ্চাশ বছর আগে প্রতিটি বাড়িতেই ছিল তেল চুকচুকে, স্বাস্থ্যবান ঘোড়ায় টানা ফিটন। ক্বচিৎ কোনো হাভেলিতে মোটর চোখে পড়ত।

একমাত্র জানকীনাথজি ছাড়া এই সব বাড়ি কাদের ছিল, এতকাল পর আর মনে পড়ে না। জানকীনাথজির নাম ভুলে না যাবার কারণ, দেশভাগের দু'বছর আগে তাঁর হাভেলিতে ডিস্ট্রিক্ট টাউন থেকে ইংরেজ ডি. এম এসেছিলেন। আব্বাজানের কাছে আলতাফ শুনেছে, গোরা সাহেব নাকি ছিলেন মস্ত অফিসার। এত বড় অফিসার নাকি আগে আর কখনও আজিমাবাদে আসেননি।

শান্ত, নগণ্য, ম্যাড়মেড়ে টাউনটায় একেবারে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সে যে কী চাঞ্চল্য, বলে বোঝানো যাবে না।

জানকীনাথজি স্বয়ং দামি কোট প্যান্ট পরে, মাথায় পাঁচ গজি কাপড়ের পাগড়ি বেঁধে আজিমাবাদের মান্যগণ্য লোকেদের নিয়ে সোজা স্টেশনে চলে গিয়েছিলেন। শুধু তাই না, এই শহরের

ধুলো যাতে ডি. এমের জুতোয় না লাগে সেজন্য পুরো প্ল্যাটফর্ম এবং নিচের রাস্তায় নামার সিঁড়িগুলো পর্যন্ত জুটের তৈরি লাল কার্পেট দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন। এমন একটা ঐতিহাসিক ঘটনাকে আজিমাবাদের মানুষজনের স্মৃতিতে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য ইলাহাবাদ থেকে চারটে ব্যান্ড পার্টি আনিয়েছিলেন জানকীনাথজি। আব্বাজান আরও জানিয়েছিল, ব্যান্ড পার্টিই না, ডি. এমের খানাপিনার জন্য ইলাহাবাদের নাম-করা হোটেল থেকে বাবুর্চিও আনা হয়েছে।

মনে পড়ে, ছ'টা ঘোড়ায় টানা হুড-খোলা গাড়িতে করে ডি. এম'কে নিজের হাভেলিতে নিয়ে গিয়েছিলেন জানকীনাথজি। জমকালো উর্দি-পরা এক বেয়ারা গাড়ির পেছন দিকের স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ ডি. এমের মাথার ওপর রঙিন সিল্কের ছত্রি ধরে রেখেছিল।

দৃশ্যটা এখনও মনে আছে আলতাফের। কেননা, সে আমলে কোনো ছোট শহরে ইংরেজ ডি. এমের আগমন একটা বিরাট ঘটনা। আজিমাবাদের লোকজন তাঁকে চোখে দেখার জন্য রাস্তার দু'ধাবে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আলতাফের আব্বুও তাকে নিয়ে ছুটে গিয়েছিল।

প্রথমে ছিল দু'টো ব্যান্ড পার্টি। তারপর গাইড হিসাবে জানকীনাথজির ফিটন, মাঝখানে ডি. এমের গাড়ি, তার পেছনে আজিমাবাদের বিশিষ্ট নাগরিকেরা। এই জমকালো শোভাযাত্রার একেবারে ল্যাজের দিকে বাকি দু'টো ব্যান্ড পার্টি।

সেই যে ডি. এম এসেছিলেন তার তিন মাসের মধ্যে রায়বাহাদুর খেতাব পেয়েছেন জানকীনাথজি। এক দিন রাত্তিরে বাড়ি ফিরে বেশ গর্বের সুরে, উত্তেজিত ভঙ্গিতে খবরটা দিয়েছিল আব্বু। আজিমাবাদে এর আগে আর কেউ নাকি রায়বাহাদুর হননি। এই খেতাবটার ওজন কতটা, কতখানি ইজ্জৎ এর সঙ্গে জড়িত, ছেলেবেলায় বুঝতে পারেনি আলতাফ। তবে মনে হয়েছিল, এটা বিরাট ব্যাপার।

জানকীনাথজি কি এখনও বেঁচে আছেন? টাঙাওলাকে প্রশ্নটা করতে গিয়েও থেমে গেল আলতাফ। কেননা এ নিয়ে কৌতূহল দেখালে পাল্টা অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, যা তার পক্ষে অস্বস্তিকর।

বনেদি এলাকাটা মোটামুটি আগের মতোই আছে। তবে তার জেল্লা বহুগুণ বেড়ে গেছে।

কখন সন্ধে নেমে গিয়েছিল, খেয়াল করেনি আলতাফ। দু'ধারের বাড়িগুলোতে এবং রাস্তায় সারি সারি ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বলে উঠেছে। হিম আরও ঘন হতে শুরু করেছে।

এক সময় আজিমাবাদের উত্তর দিকের শেষ মাথায় উঁচা মহল্লায় পৌঁছে গেল আলতাফরা। অনেকটা জায়গা জুড়ে এই এলাকা। এটার একদিকে মুসলমানদের বসতি, আরেকটা দিকে থাকত হিন্দুরা।

মহল্লাটা পঞ্চাশ বছর আগের মতোই রয়ে গেছে। তাই চিনতে অসুবিধা হল না। স্যুটকেস আর হোল্ড-অল নিয়ে টাঙা থেকে নেমে পড়ল আলতাফ। টাঙাওলাকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে চারদিক ভালো করে লক্ষ করতে লাগল।

পুরো এলাকাটা জুড়েই ছিরিছাঁদহীন বাড়ির জটলা। হিন্দুদের টোলাটার তুলনায় মুসলমানদের টোলাটা অনেক বেশি ম্যাড়মেড়ে।

এই শীতের সন্ধ্যাতেও রাস্তায় বেশ লোকজন রয়েছে। আলতাফের মনে আছে, ফতিমার শ্বশুরবাড়িটা খুব কাছাকাছিই। বড় রাস্তা থেকে মিনিট পাঁচেক হাঁটলে সেখানে পৌঁছনো যায়। এই মহল্লাতেই, আরও অনেকটা ভেতর দিকে ছিল তাদের বাড়ি।

অনেকগুলো সরু সরু গলি মুসলিমদের টোলাটায় ঢুকে গেছে। কোনটা দিয়ে ঢুকলে ফতিমাদের বাড়িতে যাওয়া যাবে, এতকাল বাদে চট করে খেয়াল করতে পারল না আলতাফ। তার জিজাজি

অর্থাৎ ফতিমার স্বামীর নাম ছিল জিয়াউল খান। তার নাম বললে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ ওদের বাড়িটা দেখিয়ে দেবে। রাস্তার একটা লোককে ডাকতে যাচ্ছিল সে, তার আগেই বাঁ ধারের গলিটা থেকে দু'জন বেরিয়ে এল। একজন তারই বয়সী। ভারী চেহারা, মাঝারি ধরনের লম্বা, মোটা গোঁফ, পরনে ধুতি আর ফুলশার্টের ওপর গরম চাদর, মাথায় কম্ফোর্টার জড়ানো। বোঝা যায়, লোকটা হিন্দু। তার সঙ্গীর বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। পাতলা রোগা চেহারা, লম্বাটে মুখ, বড় বড় চোখ, চোখা নাক, সযত্নে ছাঁটা দাড়ি। পরনে পাজামা আর লম্বা ঝুলের কুর্তার ওপর মোটা উলের সোয়েটার, মাথায় গোল টুপি। আন্দাজ করা যায়, সে মুসলমান।

লোক দু'টো সোজা আলতাফের সামনে চলে আসে। বয়স্ক ভারী লোকটি অর্থাৎ যে হিন্দু, একদৃষ্টে তার দিকে কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'আপ কিয়া আলতাফ হোসেন হ্যায়?'

আলতাফ অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে বলে, 'জি, হাঁ। লেকেন আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।'

লোকটা আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে, 'উল্লুকে পাঠ্ঠে, আমি ধন্নো রে—ধনুয়া—'

ছেলেবেলায় রোগা দুব্‌লা চেহারা ছিল ধনুয়ার। সে যে একান্ন বছরে শরীরে এত বিপুল পরিমাণে মাংস আর চর্বি জমিয়ে ফেলেছে, কে ভাবতে পেরেছিল। সেদিনের সেই বালকটির সঙ্গে আজকের মধ্য বয়স পেরিয়ে যাওয়া ধনুয়ার বিন্দুমাত্র মিল নেই। তবে একটা ব্যাপার সেদিনের মতোই আছে। আনন্দ বা দুঃখের প্রকাশটা তার তীব্র। চিৎকার করে ছাড়া কথা বলতে পারে না। সমস্ত কিছু ধনুয়ার চড়া তারে বাঁধা।

অল্প বয়সের বন্ধুর সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে যাবে, ভাবতে পারেনি আলতাফ। ধনুয়ার আন্তরিকতাটুকু তার খুব ভালো লাগে। সে যেন এক লহমায় তাকে তার বচপনে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। আলতাফ দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'কত সাল বাদে তোর সঙ্গে দেখা হল ধন্নো!'

'হাঁ। বহুৎ সাল।' ধনুয়া, অর্থাৎ ধনপত বলে, 'কত উমর হয়ে গেল! এই জিন্দেগিতে ফের যে তোকে দেখতে পাব, ভাবিনি।'

একটু চুপ।

তারপর ধনপত পাশের যুবকটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'একে জরুর চিনতে পারিসনি। ও হল লতিফ, ফতিমা বহিনের ছোট বেটা, তোর ছোট ভাঞ্জা—'

দেশভাগের পর আলতাফরা যখন পাকিস্তানে চলে যায়, লতিফের জন্ম হয়নি। জীবনের লম্বা বাজি যখন শেষ হতে চলেছে, হঠাৎ ইন্ডিয়ায় না এলে বোনের এই ছেলেটার সঙ্গে তার পরিচয়ই হত না।

লতিফ ঝুঁকে মামার পা ছুঁতে যাচ্ছিল, তাকে তুলে বুকের ভেতর টেনে নেয় আলতাফ। বলে, 'বেটা, তোমার উমর শও সাল হোক।'

কিছুক্ষণ পর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লতিফ আলতাফের স্যুটকেসটা তুলে নেয়, আর ধনপত নেয় তার হোল্ড-অলটা। আলতাফ আপত্তি করতে যাচ্ছিল, ধনপত ধমকে ওঠে, 'উল্লু, তুই হলি ইন্ডিয়ার মেহমান। থোড়া কুছ খাতিরদারি তো করতে দে। চল—'

সামনের গলিটায় তারা ঢুকে পড়ে। আগে আগে চলেছে লতিফ। পেছনে পাশাপাশি হাঁটছে আলতাফ আর ধনপত।

ধনপত বলে, 'ফতিমা বহিনকে যে চিঠ্‌ঠিটা লিখেছিলি সেটা পাওয়ার পর রোজ লতিফ আর আমি স্টেশনে দু'তিন বার করে যাচ্ছি। লেকেন ইলাহাবাদ থেকে দিনে সাত আটটা ট্রেন এখানে আসে। কোন ট্রেনে আসবি বুঝতে পারছিলাম না। এখনও দু'জনে যাচ্ছিলাম, চোখে পড়ল তুই টাঙ্গা থেকে নামছিস। কবে আসবি চিঠ্‌ঠিতে লিখে জানাবি তো—'

আলতাফ বলল, 'আজমীর শরিফে ক'রোজ লাগবে, বুঝতে পারছিলাম না। ওখান থেকে কোন তারিখে আজিমাবাদে আসতে পারব, কী করে জানাই?'

আস্তে মাথা নাড়ে ধনপত, 'ঠিক বাত।'

আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'তোর মতো আমার চেহারাও বিলকুল বদলে গেছে। এত সাল বাদ চিনলি কী করে?'

'চিনিনি তো। স্রিফ আন্দাজ করেছিলাম।' ধনপত তোড়ে বলে যায়, আজিমাবাদের সব মানুষই তার চেনা। যে কোনো দিন যে কোনো সময় আলতাফের এসে পড়ার সম্ভাবনা। টাঙা থেকে বয়স্ক একটি লোককে নামতে দেখে ধনপতের মনে হয়েছিল, তার আলতাফ হোসেন হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা আশি ভাগ।

আলতাফ সামান্য হাসল।

ধনপত এবার বলে, 'তোর খবর বল। পাকিস্তানে কী কামকাজ করছিস? ছেলেমেয়ে ক'টা? তোর বিবি—'

বন্ধুকে থামিয়ে দিয়ে আলতাফ বলে, 'আমার কথা পরে শুনিস। আগে তোর কথা বল—'

শুধু নিজের কথাই না, তড়বড় করে দু'মিনিটের ভেতর আজিমাবাদ টাউনের নানা তথ্য জানিয়ে দেয় ধনপত। আলতাফরা চলে যাবার পর খুব বেশি পড়াশোনা এগোয়নি তার। এইট ক্লাসে দু'বার ফেল করে স্কুল ছেড়ে দেয় সে। ক'টা বছর বেকার আড্ডা দিয়ে, এখানে সেখানে উদ্দেশ্যহীন চলে বেড়াবার পর পিতাজির দাবড়ানিতে এটা সেটা করে শেষ পর্যন্ত মোটর মেকানিকের কাজ শিখে একটা গ্যারাজ খুলেছে। রোজগার ভালোই। তার এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে বি এ পাশ করে সরকারি নৌকরি করে। থাকে লখনউতে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তার শ্বশুরবাড়ি ইলাহাবাদে। সংসারে বড় রকমের সমস্যা নেই। তবে স্ত্রী এবং পিতাজির স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে। দু'জনেই কোনো না কোনো রোগে ভুগছে।

বহুকাল পর ছেলেবেলার বন্ধুকে দেখে, তার সহৃদয় ব্যবহারে আলতাফ এতটাই অভিভূত যে ধনপতের পিতাজি যে রাজপুত ক্ষত্রিয় লাজপত সিং এবং সেই লোকটা স্বাধীনতার আগে আগে দাঙ্গার সময় তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, সেটা খেয়াল থাকে না। তারা যে পাকিস্তানে চলে গেছে তার একটা বড় কারণ লাজপতের মতো আজিমাবাদের বেশ কিছু মানুষ। মুসলমানদের প্রতি তাদের প্রচণ্ড ঘৃণা আর ক্রোধ। দাঙ্গার সময় যে হিংস্র, মারাত্মক চেহারা তাদের দেখা গিয়েছিল, সেটা তার স্মৃতিতে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। সেদিন মনে হয়েছিল ওরা তাদের ছিঁড়ে খাবে। খোদা মেহেরবান, তাই কোনোরকমে বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু করাচিতে যাবার পরও বহুদিন আতঙ্ক কাটেনি।

অভিভূত ভাবটা কেটে যাবার পর মনে পড়ে, লাজপত সিং এখনও বেঁচে আছে এই খবরটা আলতাফকে চকিত করে তোলে। অদ্ভুত চাপা ভয় তার বুকে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।

ধনপত তার দিকে তাকাচ্ছে না। একটানা বলে যাচ্ছে। সে আমলের মান্যগণ্য লোকেদের মধ্যে কেউ আর বেঁচে নেই। রায়বাহাদুর জানকীনাথজি, বড় কারবারি মহাবীরপ্রসাদ শ্রীবাস্তব, সরকারি উকিল বাবুরাম গুপ্তা, এ-রকম সবারই মৃত্যু হয়েছে। আলতাফের বচপনের ঘনিষ্ঠ দোস্তরা সবাই জীবিত। রামু ঠিকাদারি করে এখন ক্রোড়পতি। লখনউতে বিরাট হাভেলি বানিয়ে সেখানেই থাকে। এক সাল দু'সাল বাদে আজিমাবাদে এসে হয়তো এক আধ সপ্তাহ কাটিয়ে যায়। লছমন বি এসসি পাশ করে একটা নাম-করা ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে দিল্লি চলে গেছে। বৈজু অবশ্য আজিমাবাদেই আছে। মোতিয়া নদীর ধারে ওদের ধান চাল গেঁহু তিল তিসি সর্ষের অনেকগুলো আড়ত। আড়তদারি বৈজুদের পারিবারিক ব্যবসা, সেটাই এখন দেখাশোনা করে সে।

ধনপত আরও জানায়, জমানা একেবারে বদলে গেছে। সেই দাঙ্গার সময়টা ছাড়া আজিমাবাদে

বহুদিন কোনো হাঙ্গামা হয়নি। শহরটা ছিল খুবই শান্ত, উত্তেজনাহীন। জীবনের স্রোত এখানে ঢিমে তালে বয়ে যেত। কিন্তু ক'বছর ধরে খুনখারাপি, রাহাজানি, ব্যাঙ্ক ডাকাতি অনেক বেড়ে গেছে। এর জন্য অনেকটাই দায়ী স্বাধীনতাব পরবর্তী কালের রাজনৈতিক নেতারা। তারা গুণ্ডা বন্দুকবাজ খুনিদের আশ্রয়দাতা। ক্ষমতা দখলের জন্য এদের কাজে লাগায়। ভোটের সময় এই সব হারামজাদাদের দিয়ে জালি ভোট দেওয়ায়, পিস্তল দেখিয়ে বোমা ফাটিয়ে আসল ভোটারদের বুথে ঘেঁষতে দেয় না। যারা তাদের এম এল এ বা এম পি বানাবে তারা মার্ডার করুক, ডাকাতি করুক, লিডাররা একটা অংলি তুলবে না। পুলিশ যদি তাদের পোষা খুনি বা গুণ্ডাদের ধরে, থানায় ফোন করে তক্ষুণি ছাড়িয়ে আনবে। লিডাররা এদের হাতে যা খুশি করার লাইসেন্স তুলে দিয়েছে।

ধনপতের একটানা বকবকানির মধ্যে একসময় ফতিমার শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে যায় আলতাফরা। পুরোনো ধাঁচের দোতলা বাড়ি। সদর দরজা পেরিয়ে শান-বাঁধানো চবুতর। একধারে গোসলখানা, রসুইঘর। চবুতরটার তিন দিক ঘিরে একতলা এবং দোতলায় অনেকগুলো ঘর।

আলতাফের স্মৃতিতে বাড়িটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। এখন সব মনে পড়ে গেল। ফতিমার শাদির আগে আগে তার শ্বশুর এটা তৈরি করিয়েছিল। বাড়িটার রং ছিল গোলাপি, দরজা জানালা সবুজ। নতুন বাড়ির চেহারায় একটা ঝকঝকে ভাব থাকে। বড়ি বহিনের শাদির পর মাঝে মাঝে যখন সে এখানে আসত, কী ভালো যে লাগত! কিন্তু সাবেক সেই বাড়িটা ঠিকঠাক আগের মতো নেই। দেওয়ালের নানা জায়গায় পলেস্তারা খসে নোনা-লাগা ইট বেরিয়ে পড়েছে, ছাদের কার্নিস ভাঙা, সেখানে বটের চারা মাথা তুলে আছে। সামনের চবুতরটায় কত যে গর্ত! অনেকদিন বাড়িটা সারানো হয়নি। ওটার আয়ু বেশিদিন নেই। বড় জোর আর দশ বার বছর।

ঘরে ঘরে আলো জ্বলছিল। চবুতর পেরিয়ে ওরা মূল বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

চারদিক আশ্চর্য রকমের নিঝুম। আগে এ বাড়িতে কত যে মানুষ ছিল! সারাক্ষণ হইচই, বাচ্চাদের হুটোপাটি। একতলা থেকে ছাদ পর্যন্ত গম গম করত।

এখন তারা তিনজন ছাড়া অন্য কেউ নেই। রসুইঘর থেকে ছ্যাঁকছোঁক আওয়াজ আসছে। রান্নাটান্না চলছে সেখানে।

ভেতরে বেশ চওড়া একটা প্যাসেজ। সেটার বাঁদিকে পর পর তিনটে ঘর। ডান পাশে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সেগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে এবড়ো খেবড়ো হয়ে গেছে। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে লতিফের পিছু পিছু ওপরে উঠতে উঠতে হঠাৎ বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যেতে থাকে আলতাফের। কতকাল বাদে ফতিমার সঙ্গে তার দেখা হতে চলেছে! সেই ন'বছর বয়সে পাকিস্তানে চলে যাবার আগে শেষ এ বাড়িতে এসেছিল। তারপর এই। মাঝখানে লম্বা একান্নটা বছর।

লতিফ তাকে এবং ধনপতকে একটা বিশাল ঘরে নিয়ে এল। আলতাফ জানে এটা ছিল ফতিমা এবং তার স্বামী শেখ জিয়াউলের শোবার ঘর।

দু'ধারের দেওয়ালে দু'টো চড়া পাওয়ারের আলো জ্বলছিল। আলতাফের যতদূর মনে আছে, ঘরের সাজসজ্জায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। আগের মতোই দেওয়াল ঘেঁষে তিন চারটে ভারী আলমারি, সেকেলে ডিজাইনের ড্রেসিং টেবল, কয়েকটা কুশন, দু'টো চেয়ার ইত্যাদি। ঠিক মাঝখানে কারুকাজ-করা প্রকাণ্ড খাট, সেটার পাশে ছোট ছোট তিন চারটে নিচু সাইড টেবল। একটু দূরে একটা উঁচু স্ট্যান্ডে টিভি।

আসবাবগুলো কালচে, ম্যাড়মেড়ে। পুরু হয়ে সেগুলোর ওপর ময়লা জমেছে। বোঝা যায়, বহুকাল পালিশ টালিশ করানো হয়নি।

খাটের মাঝখানে একফুট পুরু গদির ওপর আধময়লা বিছানায়, কম্বল গায়ে শুয়ে আছে একজন বয়স্কা মহিলা। ভাঙাচোরা শীর্ণ মুখ, ধবধবে সাদা চুল, চওড়া কপাল, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে।

তিনজনকে দেখে পাশ ফিরে হাতড়ে হাতড়ে বালিশের পাশ থেকে চশমা খুঁজে নিয়ে চোখে লাগাতে লাগাতে ক্ষীণ গলায় বলে, 'ধন্নো আর লতি এসেছিস!' বোঝা যায় লতিফের ডাকনাম লতি।

লতিফ বলে, 'হাঁ, আম্মি।'

চশমা পরা হয়ে গিয়েছিল। মহিলা, অর্থাৎ ফতিমা জিজ্ঞেস করে, 'তোদের সঙ্গে আরেকজনকে দেখছি। কে?'

ধনপত সামান্য মজার গলায় বলে, 'বড়ি বহিন, তুমিই বল তো কে। চিনতে পারছ?'

ফতিমা হাতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসে। তার নজর আলতাফের মুখের ওপর কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকে। একাগ্রভাবে কী যেন খোঁজে সে, তারপর শ্বাসটানা গলায় বলে, 'ও কি মুন্না? তার তো পাকিস্তান থেকে আসার কথা আছে।'

কত বছর বাদে নিজের ডাকনামটা শুনল আলতাফ! মা-বাবার মৃত্যুর পর এই নাম আর কারো মুখে শোনেনি। না শুনে শুনে ওটা ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু ফতিমা ঠিক মনে করে রেখেছে।

আলতাফ একদৃষ্টে ফতিমার দিকে তাকিয়ে ছিল। এ কাকে দেখছে সে! ইন্ডিয়া থেকে চলে যাবার সময় তাদের মালপত্রের মধ্যে একটা অ্যালবামও ছিল। সেটাতে আটকানো ছিল ফতিমার শাদির সময়কার কিছু ফোটো। তার এই বোনটিকে স্বপ্নের পরমাশ্চর্য কোনো ছবি বলে মনে হত। আর সামনের এই বৃদ্ধ, শয্যাশায়ী, রুগ্ন মহিলাটি যেন ধ্বংসস্তূপ।

একই মা-বাবার খুন তাদের দু'জনের ধমনীতে বয়ে চলেছে, কিন্তু কত অচেনা এই মহিলা। তাদের একজন পাকিস্তানি, আরেকজন ইন্ডিয়ান। তাদের মাঝখানে একান্ন বছরের ব্যবধানই শুধু নয়, রয়েছে সীমান্তের দুর্ভেদ্য দিওয়ার।

জরাজীর্ণ মহিলাটিকে দেখতে দেখতে মনে হল, হঠাৎ তীব্র আবেগে কলিজা উথালপাথল হয়ে যাচ্ছে। হৃৎপিণ্ডের অতল স্তর থেকে কান্নার মতো কিছু উঠে এসে গলার কাছে ডেলা পাকিয়ে যাচ্ছে। শ্বাসপ্রশ্বাস আটকে আটকে আসছে। বুঝিবা কোনো অলৌকিক প্রক্রিয়ায় সে দেশকালের দূরত্ব পেরিয়ে আরো একবার তার ছেলেবেলায় ফিরে গেল।

কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল আলতাফ, প্রথমটা পারল না। গলা বুজে গেছে। প্রায় ছুটে এসে ফতিমার পাশে বসে স্বরটাকে অনেক কষ্টে মুক্ত করতে পারল সে, 'আপা, আমি তোমার মুন্নাই।'

কাঁপা কাঁপা, রোগা দুই হাতে আলতাফের মাথাটা আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে ফতিমা। ঝাপসা গলায় বলে, 'এতকাল পর আমার কথা তোর মনে পড়ল! উমর শেষ হয়ে এসেছে। আর কিছুদিন পরে এলে দেখা হত না। মাটির নিচে চলে যেতাম।' উতরোল কান্নায় তার শরীর দুমড়ে মুচড়ে যেতে থাকে।

ফতিমার আবেগ আলতাফের মধ্যেও চারিয়ে গিয়েছিল। মাঝখানের একান্নটা বছরে তার ওপর দিয়ে কম ঝড় বয়ে যায়নি। দাঙ্গা, খুন, আগুন, দেশভাগ, ইন্ডিয়া থেকে চলে যাওয়া, পাকিস্তানে যাবার পর বেঁচে থাকার জন্য একটানা লড়াই—সব মিলিয়ে তাকে কঠোর, রুক্ষ, কর্কশ করে তুলেছে। সহজে সে কাঁদে না। কিন্তু এই মুহূর্তে আলতাফ টের পেল, তার দু'চোখ জলে ভরে গেছে। ধরা ধরা, ভাঙা গলায় সে বলে, 'রো মাত আপা, রো মাত—'

কিন্তু কান্না থামে না ফতিমার, বরং আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর ফতিমা খানিকটা শান্ত হলে ভাইয়ের গলা থেকে হাত নামিয়ে নেয়। কান্নার ধকলে জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল তার। আলতাফ বলে, 'তোমার খুব তখলিফ হচ্ছে আপা। শুয়ে পড়—'

ফতিমা কিছুতেই শোবে না। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'এত সাল বাদে তোকে দেখলাম। আমি শুয়ে থাকব!'

'আমি তো তোমার পাশেই বসে আছি। শুয়ে শুয়ে কথা বল।' পরম মমতায় বড় বোনের কাঁধ

ধরে তাকে ধীরে ধীরে বিছানায় শুইয়ে দেয় আলতাফ। ফতিমার একটা রুগ্ন হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার শরীরের এই হাল হল কী করে?'

এই প্রশ্নটার উত্তরে লতিফ জানায়, তিন বছর আগে ফতিমার একটা স্ট্রোক হয়েছিল। তার ওপর লিভারের দোষ, হাঁফানি। মায়ের অশক্ত শরীরে কত রকম রোগ যে কায়েম হয়ে বসে আছে তার হিসাব নেই।

লতিফের পাশ থেকে ধনপত বলে ওঠে, 'ওই দিকে দ্যাখ—' বলে খাটের পাশে একটা টেবিল দেখিয়ে দেয়। সেটার ওপর রয়েছে নানা ধরনের ওষুধের শিশিবোতল। ক্যাপসিউল আর ট্যাবলেটের অগুনতি মোড়ক।

ধনপত বলে যায়, 'বড়ি বহিন ডাক্তার আর দাওয়ার ওপর বেঁচে আছে।'

বিষণ্ণভাবে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে আলতাফ। উত্তর দেয় না।

ধনপত এবার বলে, 'আলতাফ, আমি এখন আর থাকতে পারছি না। একবার গ্যারেজে যেতে হবে। কাল সুবে সুবে চলে আসব।' ফতিমাকে বলল, 'চলি বড়ি বহিন। ভাইকে এত সাল বাদে পেয়েছ। আর কান্নাকাটি করো না। শরীর খারাপ হবে।'

ধনপত বেরিয়ে যাবার পর আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'ধন্নো কি এ বাড়িতে রোজই আসে?'

লতিফ বলে, 'রোজ না। সপ্তাহে দু'দিন জরুর আসে। আমাদের খোঁজখবর নিয়ে যায়। দেখভাল করে।'

ফতিমা বলে, 'আমার যেবার কলিজার ব্যারাম হল, ধন্নো হাসপাতালে নিয়ে গেল। তিন রোজ বেহোঁশ হয়ে ছিলাম। দিন রাত ও সেখানে পড়ে থাকত। লতিফের কারবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কত যে উপকার করে, বলে বোঝাতে পারব না। ধন্নো আমাদের বড় ভরসা। ওর মতো আদমি হয় না।'

আলতাফ অবাক হয়ে যায়। যে লাজপত সিং আজিমাবাদে দাঙ্গা বাধিয়েছে, তাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়েছে, তার ছেলে কিনা ফতিমাদের ভরসা। আলতাফ কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে ফতিমা বলল, 'বহুৎ দূর থেকে ট্রেনে করে এসেছিস, জরুর থকে গেছিস। এখন আর কথা নয়। হাতমুখ ধুয়ে, নোংরা জামাকাপড় বদলে এখানে আয়। আমার কাছে বসে চা খাবি।' লতিফকে বলল, 'মামার ঘরের বিছানা পাতা আছে তো?'

লতিফ মাথা হেলিয়ে দেয়, 'হাঁ।'

'বানোকে বলে আয়, গোসলখানায় গরম পানি দিয়ে চা আর পুরি বানিয়ে যেন ওপরে নিয়ে আসে। মিঠাইও দিতে বলবি।'

বানো কে আলতাফ জানে না। এ নিয়ে সে কোনো প্রশ্ন করল না। এ বাড়িতে যখন এসেছে, নিশ্চয়ই বানোর পরিচয় জানতে পারবে।

লতিফ ঘর থেকে বেরিয়ে মিনিট খানেকের মধ্যে ফিরে আসে।

ফতিমা ছেলেকে বলে, 'মামাকে ওর ঘরে নিয়ে যা। ওকে নয়া সাবান আর তোয়ালে দিবি। গোসলখানাটা দেখিয়ে দিস।'

দুই হাতে আলতাফের স্যুটকেস আর হোল্ড-অল তুলে নিয়ে লতিফ তাকে ডানপাশের ঘরটায় নিয়ে যায়। তারপর মালপত্র মেঝেতে নামিয়ে আলো জ্বালিয়ে দেয়।

ফতিমার মতো না হলেও এই ঘরটাও বেশ বড়। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একধারে ভারী খাটে ধবধবে বিছানা ছাড়া ও রয়েছে আলমারি, গদি-মোড়া ক'টা কুশন, দেওয়াল-আয়না, টেবিল চেয়ার ইত্যাদি।

লতিফ বলল, 'এটা আপনার ঘর।'

আলতাফ আন্দাজ করল, সে আসবে বলে ঘরটা ফিটফাট করে রাখা হয়েছে। একটা চেয়ারে বসে জুতো মোজা খুলে এক পাশে রাখল সে। তারপর স্যুটকেস খুলে ঘরে পরার পাজামা, শার্ট বার করতে করতে নতুন করে তার খেয়াল হল, বাড়িটা বড় বেশি নিঝুম। এখন পর্যন্ত লতিফ আর ফতিমা ছাড়া অন্য কাউকে সে দেখেনি। তবে বানো নামে কেউ একজন আছে, তার পরিচয়টা আলতাফের অজানা।

দেশভাগের পর বেশ কিছুদিন ফতিমাদের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। তারপর সেটা অনিয়মিত হতে হতে বন্ধ হয়ে যায়। তার মধ্যেই জানা গিয়েছিল, ফতিমার দুই ছেলে, দুই মেয়ে। অবশ্য আলতাফরা ইন্ডিয়ায় থাকতে থাকতেই প্রথম ছেলে নিয়াজের জন্ম হয়েছিল। পরে আর তিনটি সন্তান জন্মায়। ফতিমার শ্বশুর শেখ বদরুদ্দিনের মৃত্যুর খবরও চিঠিতেই পেয়েছিল আলতাফ। তবে তার স্বামী শেখ জিয়ায়ুলের মৃত্যু-সংবাদ করাচিতে কিভাবে পৌঁছেছিল এখন আর মনে নেই। ভাগনে ভাগনিরা কে কেমন আছে, কী করছে, সবই তার অজানা।

লতিফ দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে বসতে বলে আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'আপা আর তুমি ছাড়া আর কেউ এ বাড়িতে থাকে না?'

লতিফ বলে, 'না।' সে জানায়, তার বড় ভাই নিয়াজ শাদির পর মুঙ্গের চলে গেছে। সেখানেই থাকে। আজিমাবাদের বাড়িতে আসে না। অমানুষ, স্বার্থপর। দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বড় নূরবানু থাকে রায়বেরিলিতে, ছোট মমতাজ শাহারানপুরে। সংসার ছেলেমেয়ে নিয়ে দু'জনেই এমন ঝালাপালা যে ক্বচিৎ কখনও এখানে আসতে পারে।

একটু চুপচাপ।

তারপর আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কতদূর পড়াশোনা করেছ?'

লতিফ বলে, 'ম্যাট্রিক পাস করেছি।'

'কামকাজ কী কর—নৌকরি, না বিজনেস?'

'ছোটোখাটো বিজনেস। ইলাহাবাদের এক বড় শেঠের কাছ থেকে স্টেনলেস স্টিলের বর্তন কিনে এনে এখানে বেচি। ফাইফ পারসেন্ট কমিশন থাকে।'

একটু চিন্তা করে লতিফ ফের বলে, 'ধন্নো মামা শেঠের কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। সে আমার জামিনদার। বোনেদের শাদিতে সব টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল। ধন্নোমামা কিছু ক্যাপিটাল দিয়েছিল। তাই বিজনেসটা দাঁড় করাতে পেরেছি। অবশ্য তার টাকা আমি শোধ করে দিয়েছি।'

ফতিমার শ্বশুরবাড়ি এবং আলতাফদের বাড়িতেও পর্দার তেমন কড়াকড়ি ছিল না। ছেলেবেলায় আলতাফের সঙ্গে প্রায়ই এখানে চলে আসত ধনপত। শেখ বদরুদ্দিন থেকে শুরু করে এ বাড়ির সবাই তাকে খুবই পছন্দ করত। বন্ধু পাকিস্তানে চলে যাবার পরও ধনপত শুধু এ বাড়িতে যাতায়াতটাই বজায় রাখেনি, বিপদে আপদে সব সময় ফতিমাদের পাশে আছে, লতিফকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অথচ তার সঙ্গে ফতিমাদের রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই, ধর্মও তাদের আলাদা। ধনপতের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আলতাফের মন ভরে যায়।

আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'শাদি করনি?'

'করেছিলাম। লেকেন—'

'লেকেন কী?'

মুখ নামিয়ে লতিফ বলে, 'শাদিটা টিকল না—'

আলতাফ চকিত হয়ে ওঠে, 'কেন?'

লতিফ জানায়, পয়সাওলা ঘরের মেয়েকে শাদি করেছিল সে। তার ভীষণ বড়লোকি চাল। এটা চাই, সেটা চাই। বিবির খাঁই মেটানো লতিফের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সব চেয়ে যেটা বড় সমস্যা,

শাশুড়ির সঙ্গে সে থাকতে চায় না। এ ব্যাপারে লতিফের শ্বশুরবাড়ির যথেষ্ট উসকানি ছিল। কিন্তু মাকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেও পারে না লতিফ। ফলে অশান্তি, খিটিমিটি, প্রচণ্ড তিক্ততা। সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত আর টিকিয়ে রাখা গেল না।

একটু চুপ করে থাকার পর আলতাফ বলে, 'তোমার কত আর বয়েস। সামনে লম্বা উমর পড়ে আছে। ভালো ঘর, আচ্ছা লেড়কি দেখে আবার শাদি করে ফেল—'

লতিফ জানায়, নতুন আর একটা মেয়ে এলেই যে সংসার সুখশান্তিতে ভরে যাবে, সেবা যত্নে সে মায়ের মুখে হাসি ফোটাবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আরও বড় আকারের ঝঞ্ঝাট বাধবে কিনা তাই বা কে বলবে। তার চেয়ে এই ভালো আছে সে।

আলতাফ বুঝতে পারছিল, প্রথম বিয়ের অভিজ্ঞতাটা লতিফকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। তাই আর সেদিকে পা বাড়াতে চায় না। ভাগনে সুখী এবং সংসারী হলে খুশিই হত আলতাফ। কিন্তু কী আর করা যাবে? ক'দিনের জন্য এদেশে এসেছে সে। করাচিতে ফিরে যাবার পর এখানকার স্মৃতি ফিকে হয়ে যাবে। লতিফের জন্য যে চিন্তাটা তার মাথায় দেখা দিয়েছে তার অস্তিত্বও হয়তো থাকবে না।

একতলা থেকে কোনো মেয়েমানুষের গলা ভেসে আসে, 'লতিফ ভাই, গোসলখানায় গরম পানি দিয়েছি।'

চোখে না দেখলেও, আলতাফ আন্দাজ করল, আওরতটি নিশ্চয়ই বানো। কেননা খানিকক্ষণ আগে ফতিমা তাকে গরম জল দেবার জন্য লতিফকে পাঠিয়েছিল।

ডান পাশের একটা আলমারি খুলে সাবান, নতুন তোয়ালে বার করে লতিফ বলল, 'মামা চলিয়ে—'

হাতমুখ ধুয়ে, পোশাক পাল্টে লতিফের সঙ্গে ফের ফতিমার ঘরে চলে আসে আলতাফ। তখনকার মতোই বড় বোনের খাটের একধারে উঠে বসে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্টেনলেস স্টিলের বড় কাঠের ট্রেতে আটার পুরি, হালুয়া আর গুলাবজামুন এনে একটা ধবধবে ছোটো তোয়ালে আলতাফের পাশে খাটের ওপর বিছিয়ে তার ওপর ট্রেটা রাখে বানো।

তার বয়স চল্লিশের কিছু বেশিই হবে। শক্ত, কর্মঠ চেহারা। পরনে খেলো ছিটের সালোয়ার কামিজের ওপর মোটা চাদর। তামাটে রং, ভারি মাংসল মুখে চেচকের দাগ।

ফতিমা উঠে বসেছিল। আলতাফকে দেখিয়ে বানোকে বলল, 'মামা—পাকিস্তান থেকে এসেছে।' আলতাফকে বলে, 'ও আমার বেটি বরাবর। চার সাল এখানে আছে। ঘরের সব ঝামেলা সামলায়। ওকে ছাড়া একটা রোজও আমাদের চলে না।'

বানো যে কাজের মেয়ে, ফতিমা সেটা বুঝিয়ে দিল। তার স্বভাব নম্র, সহবত জানে। ঝুঁকে আদাব জানিয়ে আলতাফকে বলল, 'লতিফভাই আর আম্মির কাছে আপনার কথা শুনেছি। কবে আসবেন, সে জন্যে আমরা সবাই ইন্তেজার করছিলাম।'

আলতাফ একটু হাসল।

ফতিমা বানোকে বললেন, 'মামাকে রাতে কী খাওয়াবি?'

বানো বলে, 'গোস্ত আছে, মছলি আছে, সবজি আছে।'

'ভালো করে খানা পাকা। আর হাঁ, সিমাইয়ের ক্ষীর বানাবি। রসুই চড়াবার আগে মামাকে চা দিয়ে যাস—' বলে একটু থামে ফতিমা। তারপর বিষণ্ণ গলায় স্বগতোক্তির মতো বলে যায়, 'ভাইটার সঙ্গে এত সাল বাদে দেখা হল, কোথায় নিজের হাতে খানা পাকিয়ে খাওয়াব—' গলা বুজে আসে তার।

বানো চলে গিয়েছিল।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে খাওয়ার পর আলতাফ বলে, 'লতিফের কাছে তোমাদের সব খবর শুনলাম। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল আপা। মেয়েরা তোমাকে দেখতে আসতে পারে না, তার কারণ বুঝি। শাদির পর কোনো লেড়কিই আর আজাদ থাকে না। লেকেন নিয়াজ নাকি ওর শাদির পর আর আজিমাবাদে আসেনি?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ফতিমা। তারপর কপালে এটা আঙুল ঠেকিয়ে বিষণ্ণ সুরে বলে, 'ওকে দোষ দিই না। সবই আমার নসিব।'

আলতাফ লক্ষ করল, বড় ছেলে সম্পর্কে এতটুকু নালিশ নেই ফতিমার। একটু ভেবে বলল, 'লতিফের শাদিটাও তো বরবাদ হয়ে গেছে। ওর সংসারী হওয়া দরকার।'

'অনেক বার বলেছি। রাজি হয়নি। আমি আর কী করব?'

'তুমি যখন থাকবে না, ওর দিন কাটবে কী করে?'

'বরাতে যা আছে তাই হবে।'

অর্থাৎ অদৃষ্টের ওপর সব সঁপে দিয়ে বসে আছে ফতিমা। বয়স বাড়লে, অসুস্থ পঙ্গু হয়ে পড়লে এরকমই খুব সম্ভব হয়। সব উদ্যম, উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায়।

আলতাফ কী বলতে যাচ্ছিল, ফতিমা ফের বলে ওঠে, 'আমাদের কথা তো সব শুনেছিস। মায়ের পেটের ভাইবোন হলেও তোদের সম্বন্ধে কিছুই প্রায় জানি না। আব্বু আর আম্মির এন্তেকালের খবর পেয়েছিলাম। আসমা, নাজ্জু আর তোর কথা বল—' আসমা, আর নাজ্জু অর্থাৎ নাজিম হল আলতাফের দুই ভাইবোন। মা-বাবার সঙ্গে একান্ন বছর আগে তারাও পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল।

আলতাফ খেতে খেতে বলে যায়। দেশভাগের পর হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে, সীমান্তের ওপারে সোজা করাচিতে চলে যায় তারা। তার বাবা নবাব হোসেন এবং তার মতো লক্ষ লক্ষ ভারতীয় মুসলমানের ধারণা ছিল, পাকিস্তান নামে নতুন স্বপ্নের দেশটিতে পৌঁছুতে পারলে হাতে আসমানের চাঁদ পেয়ে যাবে। সুখের আর শেষ থাকবে না। তাদের থাকার জন্য ওখানে বড় বড় হাভেলি সাজিয়ে রাখা হয়েছে।' কিন্তু করাচিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নভঙ্গ হতে শুরু করেছিল। তাদের রাখা হয়েছিল উদ্বাস্তু ক্যাম্পে।

নবাব হোসেন কিন্তু দমে যায়নি। সে ছিল অত্যন্ত সৎ, উদ্যোগী এবং পরিশ্রমী মানুষ। উদ্বাস্তু ক্যাম্পে থাকতে থাকতেই নতুন দেশে ফের জীবনকে গড়ে তোলার কাজে হাত লাগিয়েছিল। সরকারি লোন জোগাড় করে পুরনো করাচির বাজারে কাপড়ের ছোটো একটা দোকান খোলে সে। উদ্বাস্তু ক্যাম্পে পড়ে থাকতে তার মন সায় দিচ্ছিল না। আয়ের যখন ব্যবস্থা হয়েছে তখন একটা ব্যারাক টাইপের পুরনো বাড়িতে দু'টো কামরা ভাড়া করে স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে যায়। আলতাফের তিন ভাইবোনকে স্কুলে ভর্তি করে দেয়।

কয়েক বছরের মধ্যে ব্যবসা বড় হতে থাকে। আয়ও যথেষ্ট বাড়ে। ছোটো দোকান ছেড়ে বড় দোকান নেয় নবাব হোসেন। কিছু টাকা জমেছিল। তাই দিয়ে একটা বাড়িও কিনে ফেলে।

সংসারটা যখন গুছিয়ে এনেছে সেই সময় হঠাৎ কয়েকদিনের জ্বরে নবাব হোসেনের মৃত্যু হয়। আলতাফ তখন সবে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। আসমা নাইনে পড়ছে। নাজিম সেভেনে। সবাই একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল।

আলতাফ খুব ভালো ছাত্র ছিল। ভেবেছিল, এম এ পর্যন্ত পড়বে। কিন্তু ইচ্ছাপূরণ হল না। আব্বার মৃত্যুশোক কাটিয়ে ওঠার পর সংসারটাকে বাঁচানোর জন্য তাকে নবাব হোসেনের দোকানে গিয়ে বসতে হল। একটা দোকান থেকে আরও দু'টো দোকান করেছে সে। আসমা ম্যাট্রিক পাশ করার পর তার শাদি দিয়েছে। নাজিম বি এ পাশ করে সরকারি নৌকরি করছে। তারও শাদি হয়েছে। সে থাকে সরকারি কোয়ার্টারে।

অবশ্য আসমার বিয়ের পর নিজেও বিয়ে করেছিল আলতাফ। তার এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে এম এসসি পড়ছে, মেয়ে এ বছর বি এ ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। পরীক্ষাটা শেষ হলেই তার শাদির ব্যবস্থা করবে।

আলতাফের শাদির বছর খানেক আগে আরও একটা শোকাবহ ঘটনা ঘটেছে। সেটা হল তাদের আম্মার মৃত্যু।

মা-বাবার মৃত্যুসংবাদ পেলেও ভাইবোনদের জীবনের এত সব খবর প্রায় কিছুই জানা ছিল না ফতিমার। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে সে। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'নাজ্জু আর আসমা করাচিতেই আছে তো?'

আস্তে মাথা নাড়ে আলতাফ, 'হাঁ।'

'ওদের সঙ্গে দেখা হয়?'

'হাঁ। ছুটির দিনে ওরা চলে আসে। আমিও ওদের কাছে যাই।'

'সবাই ভালো আছে?'

'হাঁ।'

'ওদের বড়ো দেখতে ইচ্ছে করে। লেকেন এ জিন্দেগিতে তো তা আর হবে না। বলিস, যদি পারে ওরা একবার যেন এখানে আসে।'

'জরুর বলব।'

কী ভেবে ফতিমা বলে, 'খবরে প্রায়ই বেরোয় করাচিতে নাকি খুব হাঙ্গামা হয়।'

আলতাফ জানায়, করাচি বিরাট পোর্ট সিটি। খুনখারাপি, বন্দুকবাজি লেগেই আছে। শিয়া-সুন্নি সমস্যা তো রয়েছেই, তা ছাড়া ওখানকার আদি বাসিন্দারা ভারত থেকে চলে যাওয়া উর্দুভাষী মুসলিমদের দু'চক্ষে দেখতে পারে না। পাকিস্তান হবার পর এতগুলো সাল কেটে গেলেও ওরা মনে করে, উড়ে এসে জুড়ে বসা এই ইন্ডিয়ানরা তাদের রুটিতে ভাগ বসাচ্ছে। ফলে সারাক্ষণ উত্তেজনা, পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং অশান্তি। এর ওপর রয়েছে রাজনৈতিক গণ্ডগোল, কথায় কথায় বন্ধ, ধরপাকড়, পুলিশের গুলি, উত্তেজনা।

ফতিমাকে উদ্বিগ্ন দেখায়, 'তোদের ওপর হামলা হয় না তো?'

আলতাফ বলে, 'চিন্তা করো না আপা। ওখানে যখন চলে গেছি, এ সব নিয়েই থাকতে হবে।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা।

একসময় আলতাফ ফের বলে, 'করাচিতে হরদম শুনতে পাই, ইন্ডিয়ায় মুসলমানদের ওপর ভীষণ জুলুম হচ্ছে। যে কোনো সময় যে কেউ খতম হয়ে যেতে পারে। তোমাদের তেমন কোনো ভয় নেই তো?'

লতিফ কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে পড়েছিল। সে জানায়, বাবরি মসজিদ ভাঙার সময় আজিমাবাদে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। বোম্বাই বিস্ফোরণের পর আবহাওয়া এমনই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে যে এখানে দাঙ্গা বেধে যেত। মুসলিম মহল্লাটাই ছিল টার্গেট। কিন্তু ধনপত আর তার মতো অনেকে তা থামিয়ে দেয়। দু'তিনটে পলিটিক্যাল পার্টি শান্তি মিছিল বার করে। সেই সময় বেশ কয়েকদিন ধনপতরা মুসলিম টোলা পাহারা দিয়েছে।

লতিফ বলে, 'তবে—'

আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'তবে কী?'

লতিফ বলে, 'মুখে না বললেও অনেকেই চায় না আমরা ইন্ডিয়ায় থাকি। পাকিস্তান কায়েম হয়েছে—মুসলিমদের জন্যে আলাদা স্টেট, আমরা যেন সেখানে চলে যাই।'

লতিফদের জন্য হঠাৎ ভীষণ উৎকণ্ঠা বোধ করে আলতাফ। ফতিমাকে বলে, 'আপা, এতদিন

তোমাদের দেখিনি। সেভাবে চিন্তাও করিনি। যদি বল, করাচিতে ফিরে গিয়ে তোমাকে আর লতিফকে আমার কাছে নিয়ে যাবার চেষ্টা করি—' কোন প্রক্রিয়ায়, কীভাবে, কাকে ধরে দু'জন ভারতীয়কে সীমান্তের ওপারে বরাবরের জন্য নিয়ে যাওয়া সম্ভব, তার জানা নেই। তবু যে বলল সেটা ভয়ে এবং উদ্বেগে।

ফতিমা বলে, 'এই যে একটু আগে বললি ইন্ডিয়ার মুসলিমদের ওরা পছন্দ করে না। তোরা ওখানে এতকাল আছিস, ঠিক আছে। আমরা অচানক গিয়ে উঠলে ওরা কি খুশি হবে?'

আলতাফ বিব্রত বোধ করে। কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

ফতিমা বলে, 'ভয় নেই। এখানে খারাপ আদমি যেমন আছে, সাচ্চা ভালো আদমিও তেমনই আছে। তারাই বেশি। ওদের বিশ্বাস করি।' একটু থেমে ফের শুরু করে, 'আজাদির পর আমার শ্বশুর, তোর জিজাজি, কেউ দেশ ছেড়ে যায়নি। যতদিন বেঁচে আছি, আজিমবাদেই থাকব।'

ফতিমার বলার ভঙ্গিতে এমন দৃঢ়তা ছিল যে তার ওপর বলার কিছু থাকে না। শ্বশুর আর স্বামীর জেদটা যেন তাকে পেয়ে বসেছে। দেশ ছেড়ে কোথাও যাবে না সে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় আলতাফ বলে, 'নিয়াজ ছাড়া অন্য ভাগনে ভাগনিদের তো আগে দেখিনি। আন্দাজে আন্দাজে কিছু সালোয়ার কামিজ দোপাট্টা, পাঠান কুর্তা, শার্ট আর প্যান্টের পিস নিয়ে এসেছি। কাল তোমাকে দেব। তুমি ওদের দিও।'

করাচির পড়শিদের হুঁশিয়ারি মাথায় রেখে আলতাফ ঠিকই করে ফেলেছিল, চুপচাপ ইন্ডিয়ায় এসে আজমীর শরিফ সেরে এবং বড় বোনকে দেখে পাকিস্তানে ফিরে যাবে। কিন্তু পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর বিপুল এক আবেগ তার ওপর ভর করে যেন। এই শহরে তার জন্ম, জীবনের প্রথম ন'টা বছর এখানেই কাটিয়ে গেছে। সেই শুধু না, তার আব্বা, দাদা, তার পরদাদা, পাঁচ পুরুষের প্রতিটি মানুষের জন্ম, বেড়ে ওঠা, লেখাপড়া, কাজ-কারবার সবই আজিমাবাদে। কতকাল পর এখানে এসেছে আলতাফ, জীবনে আর কখনও আসা সম্ভব হবে কিনা, কে জানে। সে ঠিক করে ফেলল, শহরটা ঘুরে ঘুরে দেখবে। একবার তাদের ছেড়ে যাওয়া হাভেলিতেও যাবে।

হাতমুখ ধুয়ে চা এবং নাস্তা সেরে, আলতাফ লতিফকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আজ খুব জরুরি কোনো কাজ আছে?'

লতিফ বলে, 'কেন বলুন তো?'

'তোমাকে নিয়ে আমাদের পুরোনো বাড়িটায় একবার যেতাম।'

'বেশ। যে ক'রোজ আছেন, আমি আপনার সাথ সাথ থাকব।'

'তোমার কামকাজের ক্ষতি হবে না তো?'

'না। আমার লোক আছে, সে সামলাবে। আমি ফাঁকে ফাঁকে দু-একবার গিয়ে দেখে আসব।'

কিন্তু ওরা বাড়ি থেকে বেরুবার আগেই মুসলিম মহল্লার বহু মানুষ এসে হাজির। অল্প বয়সের ছেলেমেয়ে থেকে বৃদ্ধরা পর্যন্ত কেউ বোধ হয় বাকি নেই। সবার চোখেমুখে অপার কৌতূহল। কীভাবে যেন রটে গেছে পাকিস্তান থেকে নবাব হোসেনের ছেলে এসেছে।

বয়স্কদের ঘরে এনে বসায় লতিফ। অল্পবয়সীরা দরজার বাইরে ভিড় করে দাঁড়ায়। বাচ্চাকাচ্চারা জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে।

একজন খুব রোগা চেহারার বৃদ্ধ, আশি পঁচাশির মতো বয়স, বলল, 'আমার নাম জান মহম্মদ। তোমার আব্বা ছিল আমার দোস্ত। শুনেছি নবাব আর তোমার আম্মি দু'জনেই মারা গেছে। বহুৎ আপসোস কী বাত।' একটু থেমে ফের বলে, 'বেটা, কত ছেলেবেলায় তোমাকে দেখেছি। চেহারা বিলকুল বদলে গেছে।'

জান মহম্মদকে একেবারেই চিনতে পারেনি আলতাফ। কিন্তু তা তো আর মুখের ওপর বলা যায় না। সে হেসে বলল, 'চাচা, আমার উমর ষাট হয়ে গেল। চেহারা কি আর বচপনের মতো থাকবে?'

'ঠিক—' আস্তে মাথা নাড়ে জান মহম্মদ।

আরেকটি বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করে, 'পাকিস্তানে কেমন আছ তোমরা?'

আলতাফ বলে, 'চলে যাচ্ছে—'

এরপর বয়স্করা সবাই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যায়। পাকিস্তানের হালচাল কেমন? আজিমাবাদ থেকে যারা চলে গিয়েছিল তারা কীভাবে দিন কাটাচ্ছে, কে কী করছে, ইত্যাদি।

কাল রাত্তিরে পাকিস্তান সম্পর্কে ফতিমাকে যা বলেছিল, এখনও তা-ই বলল আলতাফ। জানালো, এখান থেকে যারা চলে গিয়েছিল তারা বেশির ভাগই রয়েছে করাচিতে। তারা ব্যবসা ট্যাবসা বা নৌকরি করে। কয়েকটা ফ্যামিলি গেছে লাহোরে। তাদের সঙ্গে আলতাফের যোগাযোগ নেই। তারা কেমন আছে, সে বলতে পারবে না।

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই হইচই করতে করতে চলে এল ধনপত। ভিড় ঠেলে ঘরে ঢুকে মুসলিম মহল্লার লোকজনদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী, আলতাফের খবর পেয়ে গেছেন?'

বয়স্করা সমস্বরে বলে, 'হাঁ। পাকিস্তানের হাল হকিকতের কথা শুনছিলাম।'

ধনপত বুঝতে পারছে, যেভাবে ভিড়টা ছেঁকে ধরেছে, খুব সহজে আলতাফ ছাড়া পাবে না। অথচ সে ঠিক করে এসেছিল ওকে নিয়ে শহরে ঘুরতে বেরুবে। সময় পেলে নিজেদের বাড়িতেও একবার নিয়ে যাবে। তার গ্যারেজটাও দেখাবে।

কেউ যাতে ক্ষুব্ধ না হয়, তাই খুব বিনীতভাবে ধনপত বলল, 'চাচাজিরা, গুস্‌সা করবেন না। আলতাফ তো কয়েকদিন এখানে আছে। ও আপনাদের সবার বাড়ি যাবে। এখন ওকে কৃপা করে ছেড়ে দিন।'

ধনপত বলার পরও বৃদ্ধরা সবাই আলতাফকে দিয়ে কড়ার করিয়ে নেয়, তাদের বাড়ি যেতে তো হবেই, গরিবখানায় একবেলা দাওয়াতও খেতে হবে। নবাব হোসেনের ছেলেকে খাওয়াতে না পারলে তাদের আক্ষেপের সীমা থাকবে না।

আলতাফ মনে মনে হিসেব করে দেখল, এতজনের নিমন্ত্রণ রাখতে গেলে তাকে কম করে আজিমাবাদে কুড়ি বাইশ দিন থাকতে হয়। তা তো আর সম্ভব নয়। পরে কোনো অছিলায় এড়িয়ে গেলেই চলবে। আপাতত মুক্তি পাওয়ার জন্য বলল, সে সবার বাড়ি গিয়ে খাবে।

লোকজন চলে যাবার পর আলতাফ চোখ কুঁচকে মজাদার একটা ভঙ্গি করে জিজ্ঞেস করল, 'কী মতলব তোর? সবাইকে ভাগিয়ে দিলি যে?'

ধনপত বলে, 'তোকে বাঁচিয়ে দিলাম। নইলে কতক্ষণ আটকে রাখত কে জানে।' একটু থেমে বলল, 'ঘরে বসে থেকে কী করবি? চল, পুরানা শহরটা তোকে ঘুরিয়ে দেখাই।'

'লতিফকে সেই কথাই বলছিলাম। তুই যে সকালে আসবি খেয়াল ছিল না। বেরুব বেরুব ভাবছি, ওরা এসে গেল। আমি কিন্তু আগে আমাদের বাড়িটা দেখতে যাব।'

'ঠিক আছে। তাই চল—'

ফতিমাকে বলে তিনজন বেরিয়ে পড়ে।

আলতাফের ছেলেবেলায় মুসলিম টোলার বেশির ভাগ রাস্তাই ছিল কাঁচা, দু'একটায় কিছু খোয়া চোখে পড়ত। এখন সব রাস্তাই পিচ দিয়ে বাঁধানো। দু'ধারে বাড়িগুলো তেমনই ঘিঞ্জি, গায়ে গায়ে লাগানো।

যারা খানিক আগে আলতাফের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল তাদের অনেকেই নিজেদের বাড়ি ফিরে যায়নি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। ওদের দেখে ফেউয়ের মতো সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।

প্রতিটি বাড়ির জানালায় নানা বয়সের মেয়েদের কৌতূহলী মুখ দেখা যাচ্ছে। যে পুরুষেরা সামনের দাওয়া বা চবুতরে বসে শীতের রোদ পোহাচ্ছিল তারা ডেকে ডেকে দু'একটা কথা বলছে। ধনপত এবং লতিফের সঙ্গী যে পাকিস্তান থেকে আসা নবাব হোসেনের ছেলে সেটা তারা আন্দাজ করে নিয়েছে।

ফতিমাদের বাড়ি থেকে আলতাফদের পুরনো বাড়িটা পনের মিনিটের রাস্তা। জিলিপির মতো পেঁচানো অলিগলি দিয়ে ওরা সেখানে পৌঁছে গেল।

বাড়িটা ঠিকঠাক আগের মতো নেই। আলতাফরা যখন পাকিস্তানে যায় ওটা ছিল দোতলা, তার ওপর আরও একটা ফ্লোর তোলা হয়েছে। খুব অল্পদিন হল গোটা বাড়ি রং করানো হয়েছে। দরজা-জানালা থেকে টাটকা পেইন্টের গন্ধ আসছিল।

সামনের দিকে চবুতরটা তেমনই রয়েছে। সেখানে বালাপোষ গায়ে জড়িয়ে একটি বৃদ্ধ চাবপায়ার ওপর আধ শোওয়া হয়ে আছে। পাঁচ ছ'টা ছোটোছোটো ছেলেমেয়ে তাকে ঘিরে হুল্লোড় করছে। বাড়িটায় যে প্রচুর লোকজন, বাইরে থেকে টের পাওয়া যায়।

ধনপত লতিফ এবং আলতাফকে বৃদ্ধের কাছে নিয়ে আসে। ডাকে, 'আকবর চাচা—'

হাতের ভর দিয়ে দ্রুত উঠে বসে বৃদ্ধ। আশির ওপর বয়স। কিন্তু এখনও সে অথর্ব হয়ে পড়েনি। চোখের নজরও মোটামুটি ভালোই আছে। তিনজনকে দেখতে দেখতে বলে, 'ও ধন্নো, লতি তোদের সঙ্গে আরেক জন নয়া আদমি দেখছি।'

'হাঁ। ও আলতাফ—নবাব হোসেন সাহেবের বেটা।' ধনপত জানায়।

'কৌন নবাব হোসেন?'

'তোমাদের এই বাড়িটা যার ছিল—'

'মতলব, আজাদির পর বিবি বাচ্চা নিয়ে যে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল?'

'হাঁ।'

আকবর চকিত হয়ে ওঠে। সোজাসুজি আলতাফের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি পাকিস্তান থেকে আসছ?'

আলতাফ বলে 'জি, হাঁ—'

আকবর সন্দিগ্ধ সুরে জিজ্ঞেস করে, 'অচানক ইন্ডিয়ায় চলে এলে?'

বুড়োর সংশয়ের কারণ মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে আলতাফ। সে শুনেছে, পাকিস্তানে যাবার আগে আকবর আলি নামে একজনের কাছ থেকে নগদ কিছু টাকা নিয়ে তাদের থাকতে দিয়ে গিয়েছিল তার আব্বা। এতকাল বাদে হঠাৎ কেন নবাব হোসেনের ছেলে এখানে এসেছে তা নিয়ে সে যথেষ্ট ধন্দে পড়ে গেছে।

আলতাফ কী জবাব দিতে যাচ্ছিল, তার আগে আকবর আলি ফের প্রশ্ন করে, 'তোমরা কি ইন্ডিয়ায় ফিরে আসবে?'

অর্থাৎ বুড়ো জানতে চাইছে, ইন্ডিয়ায় এসে তারা এই বাড়িটা চেয়ে বসবে কিনা।

আলতাফ মনে মনে হাসে। বলে, 'না চাচা, এখানে ফিরে আসা আর সম্ভব নয়।' তারপর কী উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছে, জানিয়ে দেয়।

আকবর আলির দুশ্চিন্তা কাটে। হঠাৎ তার খেয়াল হয়, নবাব হোসেনের ছেলেকে মেহমানদারিটা ঠিকমতো করা হয়নি। ব্যস্তভাবে বলে, 'আরে খাড়া কিঁউ, বৈঠো বৈঠো—'

আলতাফরা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চৌপায়াতেই বসে পড়ে। সেই বাচ্চাগুলোর হইচই থেমে গিয়েছিল। তারা দূরে দাঁড়িয়ে অচেনা আলতাফকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে।

আকবর আলি বাচ্চাগুলোকে বলে, 'তোদের আম্মী চাচীদের ডেকে নিয়ে আয়। বলবি আমি আসতে বলছি। এক্ষুনি যেন চলে আসে।'

বাচ্চাগুলো দৌড়ে যায়। আকবরের তিন ছেলে এবং তাদের বিবিরা বাড়ির ভেতর থেকে এসে চৌপায়ার কাছে দাঁড়ায়। বাচ্চাগুলো তাদের সঙ্গে ফিরে এসেছে।

আকবর আলি সবার সঙ্গে আলতাফের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে, 'এই বাড়িটা একসময় ওদের ছিল। একান্ন সাল বাদে পাকিস্তান থেকে বাপ-দাদার হাভেলি দেখতে এসেছে।' একটু থেমে বলে, 'আগে চা'য় মিঠাই খাওয়াও। তারপর আমি নিজে ওকে বাড়িটা দেখাব।'

কিছুক্ষণ আগে নাস্তা করে এসেছে বলেও পার পাওয়া গেল না। আকবর আলির ছেলের বৌরা বালুসাই, লাড্ডু এবং গরম খুসবুদার চা নিয়ে এল। সে সব খেতেও হল।

চা-মিঠাই খাওয়ার পর আকবর আলতাফকে সঙ্গে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়িটা দেখায়। কোন ঘরে সে আর তার ভাই নাজিম থাকত, কোন ঘরটা ছিল ছোটো বোন আসমার, আর কোনটা তাদের আব্বা-আম্মির, সব স্পষ্ট মনে আছে। দেখতে দেখতে প্রবল আবেগ ফুটন্ত দুধের মতো কলিজার ভেতর থেকে উছলে আসতে থাকে।

লতিফ আর ধনপত ওদের সঙ্গে যায়নি, চবুতরে চৌপায়াতেই বসে ছিল। খানিক বাদে আলতাফ ফিরে এসে যখন বিদায় নিতে যাবে, হঠাৎ আকবর আলির কিছু মনে পড়ে যায়। তাকে চবুতরের এক কোণে আলাদা করে ডেকে নিয়ে নিচু গলায় বলে, 'বেটা, তুমি পাকিস্তান থেকে এসেছ, এক হিসেবে ভালোই হয়েছে। আমার একটা জরুরি কথা ছিল—'

আলতাফ বেশ অবাকই হয়। জিজ্ঞেস করে, 'কী কথা?'

আকবর আলি জানায়, পাকিস্তানে যাবার আগে হাজার দশেক টাকা নিয়ে এ বাড়ির দখল তাকে দিয়ে গিয়েছিল নবাব হোসেন। কিন্তু সম্পত্তি কোর্টে রেজিস্ট্রি করা হয়নি। তাড়াহুড়ো করে বিবি বাচ্চা নিয়ে সে চলে যায়। পরে আকবর আলি অবশ্য জায়গা মতো ঘুষটুষ দিয়ে নানা কৌশলে বাড়িটা নিজের নামে করিয়ে নেয়। তবু তার মনে একটা খিঁচ থেকে গেছে। যদি নবাব হোসেনের কাছে দলিল থেকে থাকে এবং তার ছেলেরা কোনোদিন এসে বাড়ি ফেরত চায়, বড় রকমের একটা সমস্যা হয়ে যাবে।

আলতাফ বলে, 'আব্বা এসব কথা কখনও আমাকে বলেনি। এ বাড়ির দলিলও আমাদের কাছে নেই। ফিকর মাত কীজিয়ে চাচা। আমি কখনও ইন্ডিয়ায় এসে বাড়ি ফেরত চাইব না।' একটু থেমে বলে, 'তা ছাড়া আমরা বিদেশি। আমাদের কথা ইন্ডিয়ার আদালত শুনবেই বা কেন?'

আকবর আলি বলে, 'তোমার কথা বিশ্বাস করছি। লেকেন তোমার ভাইবোনেরা—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে আলতাফ বলে, 'ওরাও চাইবে না।'

'তবু তোমার কাছে একটা আর্জি আছে।'

'কী আর্জি?'

আকবর আলি জানায়, একটা স্ট্যাম্পড কাগজে আলতাফ যদি তার ভাইবোন এবং নিজের তরফে লিখে দিয়ে যায়, এ বাড়ির দখল নিতে কোনোদিনই তারা আসবে না, তা হলে মৃত্যুর আগে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারে।

আলতাফ বলে, 'আপনি যখন বলছেন, তাই হবে।' সে শুনেছে বহু হিন্দু নাকি চায় না, যারা ইন্ডিয়া থেকে চলে গেছে তারা ফিরে আসুক। এখন দেখা যাচ্ছে, কিছু মুসলমানের কাছেও তাদের ফেরাটা কাম্য নয়।

নিজেদের পুরোনো বাড়ি থেকে বড় রাস্তায় এসে একটা টাঙা নিল আলতাফরা। ধনপত আলতাফকে দেখিয়ে টাঙাওলাকে বলল, 'আমার এই দোস্ত বহুৎ সাল বাদ আজিমাবাদে এসেছে। ওকে টাউন ঘুরিয়ে দেখাও—'

টাঙাওলা বলে, 'জি—'

কাল স্টেশন থেকে আসার সময় যতটা মনে হয়েছিল, আজিমাবাদ তার চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। নতুন নতুন কত যে মহল্লা হয়েছে তার হিসেব নেই। দু'টো বড় পার্ক, মেয়েদের কলেজ, প্রকাণ্ড হাসপাতাল, বেশ ক'টা নার্সিং হোম, এমনকি খেলাধুলোর জন্য ছোটো একটা স্টেডিয়ামও চোখে পড়ল। একান্ন বছর আগে এসব ছিল না।

ঘুরে ঘুরে শহর দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে গেল।

ধনপত আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন ঘোরাঘুরি থাক। তোদের বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি। বিকেলে এসে আমার গ্যারাজে নিয়ে যাব।'

লতিফ আর আলতাফকে মুসলিম মহল্লার সামনের বড় রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে চলে যায় ধনপত। তারপর তিন ঘণ্টা বাদে ফের এসে দু'জনকে শহরের মাঝখানে চক বাজারে তার গ্যারাজে নিয়ে গেল।

আলতাফের ছেলেবেলায় চক বাজার ছিল খুবই ছোটো। এধারে ওধারে সামান্য ক'টা দোকান। লম্বা চালার তলায় সবজিওলা মাছওলা মাংসওলারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসত। চারদিকে টিনের বাড়ি, ক্বচিৎ দু'চারটে পুরোনো একতলা কী দোতলা।

জায়গাটা এখন আর চেনাই যায় না। পুরোনো বাড়িঘর ভেঙে নতুন নতুন বিল্ডিং উঠেছে। একটা চোখধাঁধানো বড় সুপার মার্কেটও চোখে পড়ল। এছাড়া লাইন দিয়ে অজস্র দোকান, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, প্রাইভেট টেলিফোন বুথ, জেরক্স করার দোকান—কত কী যে হয়েছে তার হিসেব নেই। একধারে বিরাট চত্বরে কার পার্কিংয়ের জায়গা। সেখানে শ'খানেক স্কুটার জিপ আর প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে।

চক বাজারের একধারে ধনপতের গ্যারাজ। একপাশে উঁচু শেডের তলায় মোটর, অটো আর স্কুটার মেরামতির কারখানা। আরেক পাশে টেবল চেয়ার টেলিফোন দিয়ে সাজানো অফিস। সেখানে নিয়ে গিয়ে আলতাফ আর লতিফকে বসাল ধনপত। শেডের তলায় যারা মোটর টোটর সারাচ্ছিল তাদের একজনকে ডেকে চা আর নিমকিন আনতে বলল। তারপর নিজেই হই হই করে চারদিকের দোকানদারদের ডেকে এনে আলতাফের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। শুধু তাই না, যারা গাড়ি সারাতে আসছে তাদের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেয়।

পাকিস্তান সম্পর্কে জানার জন্য অনেকেই ভীষণ উৎসুক। ফতিমা বা মুসলিম মহল্লার জান মহম্মদের মতো এদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যায় আলতাফ। তবে দু' চারজনের বক্তব্য বেসুরো ঠেকে।

'কী মিয়া, ইন্ডিয়ায় ফিরে আসার ধান্দা করছ নাকি? কিংবা 'হিন্দুস্থানে শও ক্রোড় আদমি। আমাদের ঘাড়ে আর চাপতে চেষ্টা করো না।'

এ সব শুনে মুখ চুন হয়ে যায় আলতাফের। তবে ধনপত খেপে ওঠে, 'কী বলছেন আপনারা! কারো ঘাড়ে চাপার জন্যে ও আসেনি। ওর বড়ি বহিন ইন্ডিয়ায় আছে, ভাঞ্জা-ভাঞ্জীরা আছে, অন্য রিস্তেদারেরা আছে। তাদের দেখতে এসেছে। দো-চার রোজ পরে চলে যাবে।'

লোকগুলো বলে, 'চলে গেলেই ভালো—'

রাত আটটা নাগাদ গ্যারাজ বন্ধ করে আলতাফদের উঁচা মহল্লায় পৌঁছে দিতে দিতে ধনপত বলে, 'ওদের কথায় কিছু মনে করিস না। যত চুহা, হারামজাদাদের পাল—'

আলতাফ আস্তে মাথা নাড়ে—সে কিছু মনে করেনি। বলে, 'এরকম লোক পাকিস্তানেও আছে। ইন্ডিয়ার কেউ সেখানে গিয়ে থাক, সেটা ওরা চাইবে না।'

চক বাজার থেকে উঁচা মহল্লায় টাঙায় মিনিট কুড়ির রাস্তা। পাশাপাশি বসে যেতে যেতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় ধনপতের। সে বলে, 'তোকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম—'

আলতাফ জিজ্ঞেস করে, 'কী রে?'

ধনপত বলে, 'আমার বাপুজিকে তোর কথা জানিয়েছি। তোকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে বলেছে। কবে যাবি?'

আলতাফ চমকে ওঠে। একান্ন বছর আগে লাজপত সিংদের তাদের বাড়িতে আগুন লাগাবার দৃশ্যটা নতুন করে যেন দেখতে পায়। অদ্ভুত এক আতঙ্ক চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরতে থাকে। কী জন্য লোকটা ডেকেছে, কে জানে। না, ওই লোকটার সঙ্গে কিছুতেই দেখা করবে না। কিন্তু সরাসরি ধনপতকে তা বলা যায় না। আলতাফ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জানায়, 'ক' রোজ তো আজিমাবাদে আছি। করাচিতে ফেরার আগে চাচাজির সঙ্গে দেখা করে যাব।'

'সেদিন আমাদের ওখানে খাবি কিন্তু—'

'ঠিক আছে।'

ধনপত রোজই একবার করে ফতিমাদের বাড়ি আসে ; নিজেদের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি করে। তাকে এড়াবার জন্য উঁচু মহল্লার সেই বৃদ্ধদের দাওয়াত নেয় আলতাফ। প্রথমে সে ভেবেছিল, কারো বাড়ি নেমন্তন্ন খাবে না।

ধনপত ভীষণ ক্ষুব্ধ। রেগে উঠে বলে, 'কী হয়েছে তোর? বাপুজি রোজ আমাকে দিয়ে বলে পাঠাচ্ছে, আমি নিজে বলছি। আমাদের বাড়ি যেতে তোর এত আপত্তি কেন?'

কাঁচুমাচু মুখে আলতাফ বলে, 'গুস্‌সা করিস না ধন্নো। মহল্লার বুড়া লোকগুলো এত করে বলছে যে না বলতে পারছি না।'

'আমিও তো তোকে এত করে বলছি।'

উত্তর দেয় না আলতাফ। শুধু পুরোনো বন্ধুর একটা হাত নিজের মুঠির ভেতর তুলে নেয়।

দেখতে দেখতে করাচি ফেরার সময় হয়ে এল। ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। মাঝখানে আর মাত্র দু'টো দিন। তারপর তাকে পাকিস্তানের প্লেন ধরতে হবে।

আলতাফ ঠিক করেছে, আজ বিকেল তিনটের লোকাল ট্রেনে আজিমাবাদ থেকে এলাহাবাদ গিয়ে দিল্লির মেল ট্রেন ধরবে। পৌঁছবে কাল সন্ধেয়। রাতটা কোনো হোটেলে কাটিয়ে পরশু কিছু কেনাকাটা করবে। পরশুর রাতটাও তাকে দিল্লিতে থাকতে হবে। তার পরের দিন করাচির ফ্লাইট।

ফেরার তারিখটা আগেই জানিয়ে দিয়েছিল আলতাফ। বাড়ির আবহাওয়া আজ সকাল থেকেই ভীষণ থমথমে। মাঝে মাঝেই ক্ষীণ শব্দ করে কেঁদে উঠছে ফতিমা। তার দু'টো হাত ধরে আলতাফ বলে, 'কেঁদো না আপা, আমি আবার আসব।' বলতে বলতে তার গলা বুজে আসে। টের পায়, বুকের ভেতরটা অদ্ভুত কষ্টে দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে।

লতিফ পুরুষমানুষ। মায়ের মতো সে কাঁদছে না ঠিকই, তবে তার সারা মুখ গভীর বিষাদে ছেয়ে আছে।

ধনপত কাল বলেছিল, আজ দেড়টা নাগাদ আসবে। তারপর সে আর লতিফ তাকে স্টেশনে নিয়ে গিয়ে এলাহাবাদের ট্রেনে তুলে দেবে।

ধনপতের কাছে অস্বস্তির শেষ নেই আলতাফের। প্রথম দিকে তাদের বাড়ি যাবার জন্য জোর করত ধনপত ; পরে আর কিছু বলত না। ও যে ভীষণ ক্ষুব্ধ সেটা বোঝা যেত। কিন্তু কেন আলতাফ যায়নি তা তো আর ওকে বলা যায় না।

বেলা একটু বাড়লে ফতিমা আলমারি থেকে গয়নার বাক্স খুলে পুরোনো হার, চুড়ি, কানের দুল এবং ক'টা আংটি বার করে বলে, 'এগুলো নিয়ে যা। সবাইকে দিস।'

আলতাফ চমকে ওঠে, 'না না, এসব দিও না আমায়—'

'আমার কি ইচ্ছা হয় না, নিজের ভাইবোন, তাদের ছেলেমেয়েদের কিছু দিই?'

আলতাফ জানায়, সে বিদেশি; এখান থেকে সোনাদানা বা মূল্যবান কিছু নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এয়ারপোর্টে আটকে দেবে।

বিমর্ষ মুখে ফতিমা বলল, 'আমার জিনিস। নিজের লোকেদের তা দিতে পারব না?' দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে।

অনেক কষ্টে বড় বোনকে শান্ত করে আলতাফ। বোঝায়, এটা হল কানুন। তার খেলাপ করা যাবে না। সোনার গয়না নিয়ে গেলে তাকে বিপদে পড়তে হবে।

দেড়টা বাজার আগেই ধনপত চলে এল। এর মধ্যে স্যুটকেস হোল্ড-অল গুছিয়ে নিয়েছে আলতাফ। খাওয়াও হয়ে গেছে।

ধনপত বলল, 'সব রেডি?'

আলতাফ মাথা নাড়ে, 'হাঁ।'

'আমার সঙ্গে একবার নীচে চল—'

'কেন রে?'

'দরকার আছে।'

আলতাফকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির সামনের গলিটায় চলে এল ধনপত। সেখানে একটা অটোয় বসে আছে একজন বৃদ্ধ। বয়স পঁচাশি ছিয়াশি। দেখেই বোঝা যায় ভীষণ অসুস্থ।

ধনপত আলতাফকে দেখিয়ে বৃদ্ধকে বলে, 'বাপুজি, এই হল আলতাফ—'

লাজপত সিং যে নিজে চলে আসবে, ভাবা যায়নি। হৃৎপিণ্ডের উত্থান পতন থমকে যায় আলতাফের।

লাজপত অটো রিকশা থেকে নেমে এসে দু'হাতের ভেতর আলতাফের একটা হাত তুলে নিয়ে বলে, 'ধন্নোকে দিয়ে বার বার খবর দিলেও কেন তুমি আমাদের বাড়ি যাওনি, তা আমি জানি। বেটা, আজাদির আগে পরে সময়টা ছিল বহুৎ খারাপ। কারো মাথার ঠিক ছিল না। তোমার ওপর আমি জুলুম করেছি। তখন ভাবতাম মুসলমানরা চলে গেলে ইন্ডিয়ার ভালো হবে। পরে শির ঠাণ্ডা হলে ভেবে দেখেছি, অন্যায় হয়ে গেছে। এই কথাটা বলার জন্যে তোমাকে ডেকেছিলাম। তুমি গেলে না, তাই আমাকেই আসতে হল।'

বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে আলতাফ। এই কি সেই লাজপত সিং, একদিন যে তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়েছিল?

লাজপত থামেনি, তোমরা চলে যাবার পর ধন্নোকে বলেছি, মুসলিম মহল্লায় যারা রইল, বিশেষ করে তোমার বহিন আর ভাগনে ভাগনিদের যেন দেখভাল করে।'

কিছু একটা বলতে চেষ্টা করে আলতাফ। গলায় স্বর ফোটে না।

লাজপত বলে যায়, 'বেটা, আমার জন্যে তোমাদের বহুৎ তখলিফ হয়েছে। একান্ন সাল পর এখন আর কিছু করার নেই। আমাকে ক্ষমা করে দিও।' জোরে শ্বাস টেনে বলে, 'এরপর ইন্ডিয়ায় যখন আসবে, আমাদের বাড়ি নিশ্চয়ই এস।'

ঝাপসা গলায় আলতাফ বলে, 'জরুর আসব চাচা—'

একটানা কথা বলার কারণে ভীষণ হাঁফাচ্ছিল লাজপত। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। বলল, 'বেটা, অনেক উমর হয়েছে। শরীর কমজোর। পন্দ্র সাল বুখারে ভুগছি। এখন খুব কষ্ট হচ্ছে। বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়ব। চলি—'

লাজপত সিংয়ের অটো গলির বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হবার পরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে আলতাফ। তার মনে হল, ফতিমারা তো আছেই, এই মানুষটির জন্যও তাকে আবার ইন্ডিয়ায় আসতে হবে।

কোনো একদিন

দু'ধারে ধানের খেত। মাঝখান দিয়ে সরকারি পাকা সড়ক, এ অঞ্চলে যাকে বলে পাক্কী—এঁকেবেঁকে, পাক খেয়ে খেয়ে দিগন্তে গিয়ে মিশেছে।

আঁষাঢ় মাস শেষ হয়ে এল। ভরা বর্ষা। যেদিকে যতদূর চোখ যায়, গাভিন মোষের মতো কালো কালো মেঘ। মেঘের ভারে আকাশটা যেন অনেকখানি নেমে এসেছে।

এখন দুপুর। কিন্তু সূর্যটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। নিরেট মেঘপুঞ্জের ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে যে রুগ্ণ, ফ্যাকাসে আলোটুকু বেরিয়ে এসেছে তাতে কোনো কিছুই স্পষ্ট নয়। অনেক দূরে আকাশ যেখানে পিঠ ঝুঁকিয়ে দিগন্তে নেমেছে সেখানে আবছা আঁচড়ের মতো পাহাড়ের উঁচু নিচু একটা রেখা চোখে পড়ে।

এই দুপুরবেলায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলা দিয়ে তিন চাকাওলা বিচিত্র একটা গাড়ি চালিয়ে সোজা পুব দিকে চলেছে ধনেরি। গাড়িটা একসময় ছিল সাইকেল রিকশা। পেছনের সিট টিট ফেলে দিয়ে সেখানে বসানো হয়েছে চেরা বাঁশের পাটাতন। তার ওপর তেরপলের ছাউনি। পাটাতনে আড়াআড়ি শোয়ানো রয়েছে আড়াই হাত চওড়া, পাঁচ হাত লম্বা একটা তক্তা। আর আছে মোটা দড়ির স্তূপ, তেল-পাকানো বাঁশের লাঠি এবং ঢাউস একটা টিনের বাক্স। বাক্সটার ভেতর আছে পনেরটা খাপে ঢাকা ছুরি, আট দশটা রঙিন কাঠের বল, ইত্যাদি। নানা ধরনের খেলা জানে ধনেরি। এগুলো তার সরঞ্জাম।

এবার ধনেরির দিকে তাকানো যেতে পারে। তার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, গায়ের রং পোড়া ঝামার মতো। গাল দুটো ভাঙা। চামড়া খসখসে। চুল উঠে উঠে চাঁদির অনেকটা জায়গা ফাঁকা। কণ্ঠা ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। একসময় সে যে টগবগে, হট্টাকট্টা চেহারার একটা জোয়ান ছিল সেটা তার হাত-পায়ের মোটা মোটা হাড়গুলোর দিকে তাকালে টের পাওয়া যায়। শরীরে ভাঙচুর শুরু হলেও ধনেরি এখনও যথেষ্ট শক্তির অধিকারী।

ভোরবেলায়, তখনও কাকপক্ষির ঘুম ভাঙেনি, তাদের বারহৌলি গাঁ থেকে গাড়িতে মালপত্তর চাপিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল ধনেরি। সে যাবে চল্লিশ মাইল দূরের ধারাবনি টাউনে।—এই এলাকার সব চেয়ে বড় জমি-মালিক মৈথিলি ব্রাহ্মণ রামবহাল ঝা'র বাড়িতে। সেখানে পৌঁছুতে পৌঁছুতে বেলা হেলে যাবে।

কয়েক বছর আগে গাঁয়ে গঞ্জে আর ছোটোছোটো টাউনে ঘুরে বাঁদর, সাপ, ঘোড়া আর ভালুকের খেলা দেখাত ধনেরি। কিন্তু তার জন্তুগুলো একে একে মরে যাওয়ায় ওই সব খেলা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। নতুন করে ফের যে বাঁদর টাদর কিনবে তেমন পয়সা তার নেই। তা ছাড়া জন্তুজানোয়ার নিয়ে আজকাল খেলা দেখানোর প্রচুর ঝঞ্ঝাট। সরকার থেকে অনেক রকম কড়াকড়ি করে দিয়েছে।

তাই ধনেরিকে খেলার ধাঁচ পালটে ফেলতে হয়েছে। পেট তো চালাতে হবে। ক'বছর ধরে সে রণপায়ে চড়ে দৌড়বাজি দেখায়, দু হাতে দশটা রঙিন বল নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে লোফালুফি করে কিংবা কাউকে কাঠের পাটাতনে ঠেসান দিয়ে দাঁড় করিয়ে দূর থেকে তার চারপাশে ধারাল ছোরা ছুঁড়তে থাকে।

কিন্তু এ সব খেলার সমঝদার প্রায় নেই বললেই হয়। লোকে আজকাল সিনেমা দেখে, টিভি দেখে। নেহাত রামবহাল ঝাঁ'র মতো দু-চারজন রয়েছেন বলে ধনেরি কোনোরকমে টিকে আছে। রামবহাল সিনেমা টিনেমা পছন্দ করেন না, ছুরিখেলা লাঠিখেলার দিকেই তাঁর ঝোঁক। মাঝে মাঝে

তিনি ধনেরিকে ডেকে পাঠান। কালও লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছিলেন। তাই আজ সে ধারাবনি চলেছে। রামবহাল কোন খেলাটা দেখতে চাইবেন, আগে থেকে জানান না, তাই যখনই ডাক আসে ধনেরি তার যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে ধারাবনিতে যায়।

কাল শেষ রাত থেকে এক নাগাড়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। থামার কোনো লক্ষণ নেই। তোড়টা মাঝে মাঝে বাড়ে, কখনও একটু কমে।

বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য গাড়িটার সামনের দিকের হ্যান্ডেলে মান্ধাতার আমলেব একটা ছাতার বাঁকানো ডাণ্ডা বেঁধে রাখা হয়েছে। কিন্তু শতচ্ছিন্ন ছাতাটার অগুনতি দরজা-জানালা দিয়ে যেভাবে জলের ছাট ঢুকছে তাতে একেবারে নেয়ে গেছে ধনেরি। ধোঁকার টাটির মতো ওটা না থাকলেও চলত।

ধনেরির পরনে খাটো মাপের ফুল প্যান্ট আর তালি-মারা জামা, পায়ে টায়ার কাটা স্যান্ডেল। সে প্রাণপণে প্যাডেল করে যাচ্ছে।

গাড়িটা তার নিজস্ব নয়, দরকারমতো দু-একদিনের জন্য সে এটা ভাড়া নিয়ে থাকে।

পাক্কীর দু'পাশের খেতগুলোতে হাঁটুসমান জল। সবুজ ধানগাছগুলো তার ওপর মাইলের পব মাইল জুড়ে মাথা তুলে আছে। মাঝেমধ্যে দূরপাল্লার বাস, লরি, ভ্যান কী বয়েল গাড়ি পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোনো দিকে লক্ষ নেই ধনেরির। কখন ধারাবনিতে পৌঁছুবে সেটাই তার একমাত্র চিন্তা। আসলে হাতের পয়সাকড়ি ফুরিয়ে এসেছে। রামবহাল ঝা'র কাছ থেকে কিছু টাকা পেলে কয়েকটা দিনের জন্য সে নিশ্চিন্ত হতে পারে।

হঠাৎ কারো গলা কানে এল, 'এই-রুখো-রুখো।' চমকে সামনের দিকে তাকাতে ধনেরির চোখে পড়ল একটা তিরিশ-বত্রিশ বছরের মেয়েমানুষ সমানে হাত নেড়ে তাকে থামতে বলছে।

কাছাকাছি এসে গাড়ির গতি একেবারে কমিয়ে দেয় ধনেরি। মেয়েমানুষটার জামাকাপড় ভিজে জবজবে হয়ে গায়ে লেপটে আছে। সে জিজ্ঞেস করে, 'গাড়ি রুখতে বললে কেন?'

তার কথার উত্তর না দিয়ে অবাক বিস্ময়ে মেয়েমানুষটি বলে ওঠে, 'আরে তুম!'

ভালো করে লক্ষ করতেই ধনেরিও চিনে ফেলে। বিস্ময়টা তারও কম নয়। মেঘে ছাওয়া আকাশের নিচে, এই দুপুরবেলায় অবিরাম যখন বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে, প্রায় নির্জন পাক্কীতে চুনিয়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে, ভাবতে পারেনি সে। একই কথা বলে ধনেরি, 'তুই!'

'হাঁ, হামনি—'

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'ধারাবনি। তুমি?'

'আমিও।'

'অনেকটা রাস্তা হেঁটে হেঁটে থকে গেছি। গৈয়া গাড়ি, ভৈসা গাড়ি, যাকেই থামতে বলি কেউ থামে না। শেষ পর্যন্ত তুমি গাড়ি রুখলে। আমাকে ধারাবনি পৌঁছে দেবে?'

ধনেরি বলে, 'ঠিক হ্যায়, পেছন দিক দিয়ে উঠে পড়।'

কথামতো উঠে তেরপলের ছাউনির তলা দিয়ে ধনেরির ঠিক পেছনে কোনাকুনি বাঁশের পাটাতনে জড়সড় হয়ে বসে পড়ে চুনিয়া।

ঘাড় হেলিয়ে তাকে দেখছিল ধনেরি। চুনিয়া কতক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজেছে, কে জানে। তার হাত-পায়ের আঙুল সিঁটিয়ে গেছে। গালে কপালে ভেজা চুল লেপটে আছে। বুকের ওপর আড়াআড়ি দুটো হাত রেখে সে কাঁপছিল।

ধনেরি টিনের পেল্লায় বাক্সটা দেখিয়ে বলল, 'ওটার ওপর আরাম করে বস। কাঠের পাটার তলায় একটা গামছা আছে। সেটা বার করে মাথা মুছে নে।'

যা যা বলা হল তাই করে চুনিয়া।

ধনেরি ফের গাড়িটা চালাতে শুরু করে। বৃষ্টির জোর এখন কম, মিহি চিনির দানার মতো ঝরে যাচ্ছে।

বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটেনি ধনেরির। সামনে চোখ রেখে সে জিজ্ঞেস করে, 'তুই আসছিস কোত্থেকে?'

চুনিয়া উত্তর দেয়, 'গাঁও দুমরিয়া।'

'সে তো বহোত দূর। কমসে কম সাত মিল জরুর হোগা।'

'হাঁ।'

'এতটা রাস্তা পায়দল এসেছিস!'

'কা করে! গাড়ি চড়ার পাইসা কোথায়?'

'আমার সাথ দেখা না হলে কী হত!'

চুনিয়া অল্প হাসে, 'কী আর হত! পায়দলই ধারাবনি যেতাম।'

ধনেরি বলে, 'বহোত কষ্ট হত।'

'আমাদের মতো মানুষের কষ্ট তো জীওনভর লেগেই থাকে। তা নিয়ে ভাবলে চলে।'

'ঠিক বাত।'

হঠাৎ কী খেয়াল হতে ধনেরি শুধোয়, 'দুমরিয়া থেকে আসছিস—মতলব—'

চুনিয়া বলে, 'হাঁ, ওখানেই তো আমার সসুরাল।'

কোমরে একটা ক্ষিপ্র মোচড় দিয়ে ঘুরে বসে ধনেরি। ধন্দ-ধরা মানুষের মতো জিজ্ঞেস করে, 'মধিপুরায় শিউলালের সাথ তোর শাদি হয়েছিল না?'

চুনিয়া মুখ নিচু করে জানায়, শিউলালের সঙ্গে তার বিয়েটা কবেই কাটান-ছাড়ান হয়ে গেছে। তারপর দুমরিয়া গাঁয়ের জগনাথের সঙ্গে তার দ্বিতীয় বার বিয়ে হয়। সে দোঘরিয়া, অর্থাৎ দু'টি পুরুষের ঘর করেছে। চুনিয়া আরও জানায়, তার দু নম্বর মরদটি জীবিত নেই। প্রচণ্ড নেশাভাং করত আদমিটা ; বছর দেড়েক আগে গলায় রক্ত উঠে মারা যায়।

শুনতে শুনতে রীতিমতো দুঃখই হয় ধনেরির। চুনিয়া তাদের গাঁ বারহৌলিরই মেয়ে। কী সুন্দরই না দেখতে ছিল সে। তার জন্য কম বয়সে একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল ধনেরি। চুনিয়াও তাকে পাগলের মতো চেয়েছে। কিন্তু ওদের যে শাদি হয়নি তার কারণ একটাই। সেটা হল জাতওয়ারি সওয়াল। ধনেরিরা কোয়েরি, শুদ্ধ ভাষায় যাদের বলে কুশবাহাছত্রি। আর চুনিয়ারা দোসাদ। আলাদা জাত হওয়ায় তাদের বিয়েটা আটকে যায়।

ধনেরি যদি আবহমান কালের জাতপাতের প্রথা ভেঙে কিছু একটা গোলমাল পাকিয়ে বসে সেই ভয়ে চুনিয়ার বাপ তার চোদ্দ বছর পেরুবার আগেই রাতারাতি শিউলালের সঙ্গে শাদি চুকিয়ে ফেলে। শাদির পর মধিপুরায় চলে যায় সে। তারপর একবারও বারহৌলিতে আসেনি। আসবেই বা কার কাছে? চুনিয়ার শাদির একমাসের ভেতর তার মা-বাপ দু'জনেই পর পর মারা যায়। যদি ওর দু-চারটে ভাইবোন থাকত, যাতায়াতটা হয়তো বন্ধ হত না।

চুনিয়া মধিপুরায় চলে যাবার পর একেবারে ভেঙে পড়েছিল ধনেরি। বারহৌলি তার কাছে এতই অসহ্য হয়ে উঠেছিল যে একদিন উদ্দেশ্যহীনের মতো বেরিয়ে পড়ে। বছর দুই কখনও রাঁচি, কখনও হাজারিবাগ, কখনও ধানবাদ বা ঝরিয়ায় ঘোরার পর কষ্টটা জুড়িয়ে গেলে আবার বারহৌলিতে ফিরে আসে। একটা বিয়েও করেছিল কিন্তু আওরতটা বছর না ঘুরতেই নৌটঙ্কির দলের এক ছোকরার সঙ্গে পালিয়ে যায়। তারপর থেকে ধনেরি একবারে ঝাড়া হাত-পা। আগেই, তার ছেলে বয়সে মা-বাবা মরে ফৌত হয়ে গিয়েছিল।

বাপ মাঙ্গিলাল ছিল গরিবের চাইতেও গরিব। বড় জমি-মালিকের খেতে আর খামারে 'গতর চূরণ' খেটে সংসারের সবার পেটের দানা জোগাড় করত। ধনেরির জন্য সোনাদানা, টাকাপয়সা কিছুই রেখে যেতে পারেনি। ধসে-পড়া একটা টিনের চালা ছাড়া এক ধুর বাড়তি জমি পর্যন্ত তাদের নেই।

অল্প বয়সে এক মাদারি খেলোয়াড়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে জীবজন্তু নিয়ে নানা ধরনের চমকদার খেলা শিখে নিয়েছিল ধনেরি। সেই সঙ্গে হাতের অজস্র কসরতও। এই খেলাগুলো না শিখলে তাকে না খেয়ে ভুখা মরতে হত।

নিজের নানা ধরনের খেলা আর পেটের চিন্তা নিয়ে দিন কেটে যাচ্ছিল ধনেরির। কিন্তু এতকাল পর আবার যে চুনিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল।

বহুদিন আগের চুনিয়ার সেই 'পরী য্যায়সা' চেহারা আর নেই। অনেক ভেঙে গেছে। সফেদিয়া ফুলের পাপড়ির মতো গায়ের রং জ্বলে জ্বলে এখন কালো। চামড়ার তলা থেকে হাতের মোটা মোটা শিরাগুলো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। গালে, চোখের তলায় কালচে কালচে ছোপ। তার সমস্ত শরীর জুড়ে একটা রুক্ষ, কর্কশ পুরুষালী ভাব।

ধনেরি আবার সামনের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সে জিজ্ঞেস করে, 'তুই তো বললি তোর দুসরা মরদ মরে গেছে।'

চুনিয়া বলল, 'হাঁ।'

'সসুরালে কে কে আছে?'

'দুই বুড়হা বুড়হী—আমার সাস আউর সসুর (শাশুড়ি আর শ্বশুর), আর আমার একটা ছৌরা—উমর পাঁচ সাল।'

'ছেলেটাকে নিয়ে তুই আবার তো সাদি করতে পারতিস?'

দোসাদ কোয়েরি তাতমা বা গঞ্জুদের ঘরে কোনো মেয়ের তিন চার কী তারও বেশি বার শাদি করে তেঘরিয়া, চৌঘরিয়া বা পাঁচঘরিয়া হওয়াটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। এটা কেউ গর্হিত অপরাধ মনে করে না।

চুনিয়া বলে, 'অনেকেই তো শাদি করে তাদের ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, লেকিন শাদিটা করি কী করে?'

'কেন? অসুবিধাটা কোথায়?'

চুনিয়া জানায়, নতুন বিয়ে করে অন্য মরদের ঘর করতে গেলে বুড়ো শ্বশুর শাশুড়িকে কে দেখবে? ওরা কমজোর, সারা বছরই প্রায় নানা রোগে কাবু হয়ে থাকে। চুনিয়া ছাড়া বুড়োবুড়িকে রক্ষা করার আর কেউ নেই। সে না থাকলে ওরা ভুখা মরে যাবে।

তাদের মতো গরিব হাভাতেদের ঘরের একটি মেয়ের এমন মহানুভবতায় রীতিমত অবাকই হয় ধনেরি। চুনিয়ার প্রতি শ্রদ্ধায় তার মন ভরে যায়। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, 'হাঁ! ঠিকই বলেছিস।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ধনেরি জিজ্ঞেস করে, 'তোদের জমিন-উমিন আছে?'

চুনিয়া বলে, 'কঁহা জমিন! এক ধুর ভি নেহী।'

ধনেরি বলে, 'তা হলে সম্‌সার চলছে কী করে?'

চুনিয়া জানায়, 'চাষের মরসুমে আর ধান কাটাইয়ের সময় সে মনচুনিয়ার বড় জমি-মালিক বিন্ধ্যাচলী মিশিরের খেতি এবং খামারে কাজ করে। বছরের বাকি সময়টা কখনও ঠিকাদারদের কাছে, কখনও বড় গঞ্জের আড়তদারদের কাছে গিয়ে মাটি কাটা বা মাল বওয়ার কাজ জোটায়। অর্থাৎ চাষ টাষ ছাড়াও দুটো পয়সার জন্য নানা উঞ্ছবৃত্তিও তাকে করতে হয়।

ধনেরি জিজ্ঞেস করে, 'ধারাবনিতে যে যাচ্ছিস—কোনো কামকাজের ধান্দায়?'

'তা ছাড়া আর কী?' চুনিয়া বলে, 'গতর চুরণ' পরিশ্রম করে পয়সা কামাই আর চারটে পেটের দানা জোগাড় করা, এ ছাড়া অন্য কোনোদিকে তাকানোর ফুরসত নেই তার।

'ধারাবনিতে কী কাজ পাবি?'

চুনিয়া বলে, এখন এই ঘোর বর্ষায় আড়তদার আর ঠিকাদারদের কাছে এবং বিন্ধ্যাচলী মিশিরের খেতে খামারে কোনো কাজ নেই। তবে ধারাবনিতে রোজ যে হাট বসে সেখান থেকে বাড়ির কাজ করার জন্য অনেকে লোক নিয়ে যায়। যেমন ঘর সাফ করা, ছাউনি মেরামত করা ইত্যাদি। অর্থাৎ দিনমজুরের কাজও সে করে থাকে। সেরকম কিছুর আশায় সে ধারাবনি চলেছে।

ধনেরি বলে, 'তুই তো অনেক কাম কাজ শিখেছিস দেখছি।'

চুনিয়া বলে, 'কা করে? সিরিফ পেটকা লিয়ে।'

ধনেরি চুনিয়ার সঙ্গে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। সে বলে, 'হাঁ। আমাদের মতো গরিবদের বেঁচে থাকতে হলে কত কিছুই না করতে হয়!'

চুনিয়া বলে, 'আমার কথা একগো একগো করে সবই তো শুনে নিলে। লেকেন বারহৌলি থেকে চলে আসার পর তোমার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।'

একটু চুপ করে থেকে নিজের কথা আস্তে আস্তে সমস্ত বলে যায় ধনেরি।

শোনার পর চুনিয়া বলে, 'তোমার ওপর দিয়েও ঝড় তুফান কম যায়নি!' তার গলায় দুঃখের সুর ফুটে ওঠে।

মুখ ফিরিয়ে কপালে একটা আঙুল ঠেকিয়ে ধনেরি বলে, 'কী করব—এটাই আমার নসিব।'

খুব আন্তরিকভাবে চুনিয়া বলে, 'দুনিয়ায় একেবারে একেলা হয়ে গেলে! ঘরবালী না হয় পালিয়ে গিয়েছিল। লেড়কির তো অভাব নেই। আরেকটা ঘরবালী জুটিয়ে আনতে পারলে না?'

ধনেরি বলে, 'একটা পেট চালাতেই জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে। আরেক জনকে ঘরে আনলে তাকে কী খাওয়াব আর নিজেই বা কী খাব! এই ভালো আছি রে চুনিয়া।'

আস্তে মাথা নাড়ে চুনিয়া।

পাশ দিয়ে পরপর বার চোদ্দটি লরি জোরে জোরে হর্ন বাজিয়ে, সমস্ত চরাচর সচকিত করে বেরিয়ে গেল। তারপর আবার দু'ধারের মাঠঘাট, শস্যক্ষেত্র একেবারে নিঝুম হয়ে যায়। রাস্তার পাশ দিয়ে টেলিগ্রাফের যে তার চলে গেছে, তার ওপর গুটিসুটি মেরে বসে ক'টা মাছরাঙা আর কাক সমানে ভিজছে। দূরে কিষানদের ছাড়া ছাড়া গাঁগুলো বর্ষার এই দুপুরে ঝাপসা দেখাচ্ছে।

গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ কী এক ব্যাকুলতা বুকের ভেতর থেকে মোচড় দিয়ে উঠে আসতে থাকে ধনেরির। পনের বছর আগে যে মেয়েটাকে পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল, এত কাল বাদে সে তার পিঠের কাছে বসে আছে। গাড়ির দোলানির তালে তালে চুনিয়ার ভেজা শরীরের ছোঁয়া এসে লাগছে তার কাঁধে বা গলায়।

ধনেরি হঠাৎ বলল, 'তোর সেই কথাগুলো মনে আছে?'

চুনিয়া জিজ্ঞেস করে, 'কোনগুলো বল তো?'

ধনেরি বলে, 'আমাদের জাত আলাগ বলে তোর আর আমার শাদিটা হল না।'

'হো রামজি—' বলে ঘাড় সামান্য হেলিয়ে বৃষ্টিভেজা ভারি বাতাসে ঢেউ তুলে আচমকা হেসে ওঠে চুনিয়া। সে হাসি এমনই যে সহজে তার থামার লক্ষণ নেই।

চমকে মুখ ফেরায় ধনেরি। বলে, 'কা রে, কা হুয়া? পাগলের মতো এত হাসছিস কেন?'

প্রথমটা উত্তর দেয় না চুনিয়া। হাসির তোড় কিছুটা কমে এলে সে বলে, 'তুমি সে সব মনে করে রেখেছ নাকি?'

চুনিয়ার কথাগুলো মুখের ওপর চাবুকের মতো এসে পড়ে। তার জন্য এই মেয়েটারও তো একদিন চোখে ঘুম ছিল না। খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল সে। আর আজ? চুনিয়ার প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে ধরা গলায় ধনেরি জিজ্ঞেস করে, 'তুই কি সচমুচ সব ভুলে গেছিস?'

'হো রামজি, হো কিষুণজি—' চুনিয়া গালে হাত রেখে মজার গলায় বলে, 'কত সাল আগে কী হয়েছিল সে কথা কেউ মনে রাখে নাকি! চার চারগো পেটের ধান্দা করতে আমার জান বলে চৌপট হয়ে যাচ্ছে। আর তুমি কিনা—' ফের হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে সে।

অল্প বয়সের সেই দিনগুলোর স্মৃতির কোনো দামই নেই চুনিয়ার কাছে। কী আশ্চর্যভাবেই না বদলে গেছে মেয়েটা! সামনের দিকে ঝুঁকে ক্লান্তভাবে গাড়ি চালাতে থাকে ধনেবি।

এতক্ষণ বৃষ্টিটা ছিল ফিনফিনে, হালকা। হঠাৎ তার জোর বেড়ে গেল। সমস্ত চরাচর ঝাপসা করে দিয়ে লক্ষ কোটি সীসার ফলার মতো জল নেমে আসছে। উত্তর আর দক্ষিণ দিক থেকে পাহাড়ের মতো বিশাল কালো মেঘ বাতাসের ধাক্কা খেতে খেতে চারদিকে এলোপাথাড়ি ছোটাছুটি করছে।

একনাগাড়ে কিছুক্ষণ ঝরার পর বৃষ্টির তোড় ফের কমে আসে।

পুরোনো কথা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করল না চুনিয়া। হঠাৎ কী খেয়াল হতে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করল, 'ধারাবনিতে তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

ধনেরি বলে, 'বড়ে জমি-মালিক রামবহালজির হাভেলিতে। খেলা দেখবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

'ওখানে কতক্ষণ থাকবে?'

'তা কি বলা যায়? খেলা দেখাতে দেখাতে হয়ত সাম (সন্ধ্যা) হয়ে যাবে। যদি মালিক থেকে যেতে হুকুম করেন তা হলে কবে বারহৌলিতে ফিরব, ঠিক নেই। সবই রামবহালজির মর্জি।'

আকাশের ভাবগতিক ভাল করে দেখে নিয়ে চুনিয়া বলে, 'আসমানের যা হাল বারীষ আজ পুরা থামবে না। ধারাবনির হাটিয়ায় গিয়ে কামকাজ জুটবে কিনা বুঝতে পারছি না। কিছু পাওয়া গেলে, যারা কাজ দেবে তাদের সঙ্গে চলে যাব। না পেলে দুমরিয়ায় ফিরে যেতে হবে। তাই ভাবছিলাম—'

ধনেরি জিজ্ঞেস করে, 'কী ভাবছিলি?'

'তোমার খেলা জলদি শেষ হলে ফেরার সময় তোমার গাড়িতে করে অনেকটা রাস্তা যাওয়া যেত।'

'এক কাজ কর না—'

'কী?'

'রামবহালজির হাভেলিটা চিনিস?

'না।'

'যাকে পুছবি সেই বলে দেবে।'

'রামবহালজির হাভেলির কথা বলছ কেন?'

ধনেরি বলে, 'হাটিয়ায় গিয়ে কাজ না পেলে সিধা ওখানে চলে যাস। আমার খেলা দেখানো হলে তোকে গাড়িতে তুলে নেব। আর রামবহালাজি থেকে যেতে বললে তোকে একেলীই ফিরতে হবে।'

চুনিয়া বলে, 'ঠিক হ্যায়।'

ধারাবনি টাউনে ঢোকার মুখে, ডান দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে হাট বসে। প্রচণ্ড বর্ষার কারণে আজ সেটা জমেনি। লোকজন খুব কম। বেশির ভাগ হাটের চালাই ফাঁকা পড়ে আছে। বাকিগুলোতে মালপত্র সাজিয়ে বসেছে দোকানদারেরা। কিন্তু কেনাকাটা করার লোক নেই বললেই হয়।

হাটের কাছে এসে চুনিয়া বলল, 'রুখো ইঁহা। গাড়ি থামলে সে নেমে পড়ল, 'আমি চলি—' হাটের চালাগুলোর দিকে পা বাড়াতে গিয়ে কী ভেবে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, 'তুমনি ইঁহা থোড়েসে ঠহর্ যাও—'

ধনেরি শুধোয়, 'কায়?'

'মজুর নেবার জন্যে লোকজন এসেছে কিনা খবর নিয়ে আসি। যদি কেউ না এসে থাকে তোমার সঙ্গে রামবহালজির হাভেলিতে যাব। ওখানে কি কামকাজ কিছু জুটতে পারে?'

'জানি না।'

'রামবহালজিকে বলে দেখবে যদি উনি গরিব আওরতকে থোড়েসে কিরপা করেন—'

একটু চিন্তা করে ধনেরি বলে, 'ঠিক হ্যায়, বোলেগা। তুই তুরন্ত খোঁজ নিয়ে আয়।'

হাটের সারি সারি চালা যেখানে শেষ হয়েছে, তারপর ফুটিফাটা টিনের একটা মস্ত ছাউনি। সেটার তলায় চারদিকের দিনমজুরেরা রোজ এসে জড়ো হয়। পয়সাওলা গেরস্তরা তাদের ভেতর থেকে পছন্দমতো কাজের লোক বেছে নিয়ে যায়। আজ জায়গাটা সুনসান। যারা কাজ দেবে তারা তো আসেইনি, একটা মজুরকেও দেখা যাচ্ছে না।

কোনো আশাই যখন নেই তখন ফাঁকা ছাউনির তলায় বসে থেকে কী হবে? চুনিয়া রাস্তায় ফিরে আসে।

ধনেরি জিজ্ঞেস করে, 'কী হল রে?'

'কেউ আসেনি। কোঈ ভরোসা নেহী।'

'তা হলে আমার গাড়িতে উঠে পড়।'

পেছন দিক দিয়ে উঠে ফের সেই ঢাউস বাক্সটার ওপর বসে চুনিয়া।

শহরের দক্ষিণ দিকের শেষ মাথায় তিন বিঘে জায়গার মাঝখানে রামবহাল ঝা'র বিশাল তেতলা বাড়ি। দেওয়ালগুলো চুন-সুরকির গাঁথনি দেওয়া। কম করে চল্লিশ ইঞ্চি পুরু। বিরাট বিরাট দরজা-জানালা। প্রতিটি দরজায় পেতলের গুল বসানো। গোটা বাড়িটাকে ঘিরে দশ হাত উঁচু কমপাউন্ড ওয়াল। রাস্তার দিকে প্রকাণ্ড লোহার গেট। সেখানে গলায় টোটার মালা ঝোলানো দারোয়ান হামেহাল মজুত থাকে।

ধনেরিরা সেখানে এসে দেখল, গেটের পাল্লা দুটো হাট করে খোলা। দারোয়ান একধারে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভেতরে তখন হুলস্থূল কাণ্ড চলছে।

গেটের পর অনেকটা ফাঁকা জমি, তারপর মূল বাড়িটা। সামনের দিকে পনেরো হাত চওড়া শ্বেত পাথরের টানা বারান্দা। সেখানে ঘিউ-মালাই খাওয়া, ঘাড়ে গর্দানে ঠাসা রামবহাল ঝা বাঘের মতো গজরাচ্ছেন, 'ভুচ্চরের ছৌয়াদের লাথ মেরে বার করে দেব। পাইসা দিয়ে আমি কতগুলো নিকম্মা পুষেছি। খেয়ে খেয়ে একেক হাঁথী হয়ে উঠছে। কামের বেলায় কুছ নেহী। নিকাল যা—নিকাল যা—' রাগে তার মুখ যেন ফেটে পড়বে।

বারান্দার তলায় বাঁধানো চত্বরে কয়েক গণ্ডা নৌকর ঝিপঝিপে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

গেটের বাইরে গাড়িটা থামিয়ে দিয়েছিল ধনেরি। ভেতরের দৃশ্যটা চোখে পড়তে ভীষণ দমে যায় সে। রামবহাল যেরকম ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন তাতে খেলা দেখার মতো মেজাজ নিশ্চয়ই নষ্ট হয়ে গেছে। ক'টা টাকার আশায় প্রচুর লটবহর গাড়িতে তুলে সেই ভোর থেকে একটানা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এতটা রাস্তা এসেছে সে। খাটুনিটাই তার বরবাদ হয়ে গেল। তা ছাড়া চুনিয়াকে না বললেও মনে মনে ভেবে রেখেছিল, রামবহালজির হাতে পায়ে ধরে কিছু পয়সা ওকেও পাইয়ে দেবে। আদমিটার দিল খুব দরাজ। মনমেজাজ ভালো থাকলে কাউকে ফেরান না।

বন্দুকধারি দরোয়ানটা ধনেরিকে দেখতে পেয়েছিল। সে তাকে অনেকদিন ধরেই চেনে। রামবহালজি ধনেরির খেলার একজন বড সমঝদার, তিনি তাকে খুবই পছন্দ করেন, এটা দারোয়ানের ভালো করেই জানা আছে। সে বলে, 'খেলা দেখাতে এসেছ বুঝি?'

'হাঁ—' ভয়ে ভয়ে, নিচু গলায় ধনেরি বলে, 'লেকিন বড়ে সরকার এত গুস্সা হয়ে আছেন। কী করব, বুঝতে পারছি না। লৌট যায়গা—কা?'

দারোয়ানও ধনেরিকে কম পছন্দ করে না। রামবহাল তো একা ওর খেলা দেখেন না, বাড়ির কাজের লোকেরাও দেখে ধারবনি টাউনের লোকজনদেরও তিনি খেলার সময় ডাকিয়ে আনেন।

দারোয়ান ধনেরির একজন অত্যন্ত গুণমুগ্ধ দর্শক। সে এমন ওস্তাদ খেলোয়াড় আগে কখনও দেখেনি। বলল, 'এত কষ্ট করে এলে। ফিরে যাবে কেন? ভেতরে যাও—'

'লেকেন—'

'সরকার তোমাকে খবর দিয়ে আনিয়েছেন—তাই না?'

'হাঁ।'

দারোয়ান জানে, না ডাকলে ধনেরি কখনও এখানে আসে না। কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে বলল, 'তুমি হাভেলি পর্যন্ত এসে যদি দেখা করে না যাও সরকার তোমার ওপর গুস্‌সা হবেন।'

ধনেরি শুধোয়, 'ছে-সাত সাল আমি এ বাড়িতে আসছি। আগে কখনও বড়ে সরকারের এত চড়া মেজাজ দেখিনি। কী হয়েছে?'

'ঘোড়া ভেগে গেছে।'

'কীসের ঘোড়া?'

'অন্দর গেলেই বুঝতে পারবে।'

একরকম মরিয়া হয়েই শেষ পর্যন্ত গাড়িটা চালিয়ে ভেতরের চত্বরে চলে এল ধনেরি।

গলার শিরা ছিঁড়ে এখনও তর্জন করে চলেছেন রামবহাল। হঠাৎ ধনেরিকে দেখে শরীরের সব রক্ত মাথায় চড়ে যায় যেন তাঁর। কণ্ঠস্বর আরও কয়েক পর্দা চড়িয়ে চিৎকার করে ওঠেন, 'কী চাই এখানে? ভাগো—ভাগো ইঁহাসে—'

গাড়ি থেকে নেমে রামবহালের উদ্দেশে চত্বরে মাথা ঠেকিয়ে হাতজোড় করে জড়সড় ভঙ্গিতে ধনেরি বলে, 'সরকার, আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন—বলতে বলতে ভয়ে তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে আর দুই হাঁটু থরথর কাঁপছে।

রামবহালের হয়তো মনে পড়ে গেল। গলার স্বর সামান্য নামিয়ে বললেন, 'হাঁ, তো বলেছিলাম। লেকেন আজ খেলা দেখার সময় নেই। পরে আবার খবর দেব। এখন ভাগ—'

আর কিছু বলতে সাহস হয় না ধনেরির। এদিকে বৃষ্টি থামার আদৌ কোনো লক্ষণ নেই। অবিরাম ঝরেই চলেছে। ফের মাইলের পর মাইল গাড়ি চলিয়ে ভিজে ভিজে ফিরে যেতে হবে। হতাশায় চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসার উপক্রম। ক্লান্তিতে হাত-পা ভেঙেচুরে আসছে তার, কিন্তু ফেরা ছাড়া আর উপায়ই বা কী।

গাড়ির মুখটা ঘুরিয়ে ধনেরি চালকের সিটে উঠতে যাবে, রামবহাল পেছন থেকে ডাকলেন, 'এ ধনেরি, রুখ যা।'

ধনেরি বেশ অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। রামবহাল তাকে কাছে ডেকে বলেন, 'তুই তো জবরদস্ত খিলাড়ি। আমার একটা কাজ করে দিতে পারবি?'

ধনেরি বলে, 'কী কাজ সরকার?'

রামবহাল বলেন, 'তুই তো জানিস আমার ঘোড়ার খুব শখ।'

'জানি সরকার।'

ক'বছর ধরে নিয়মিত এখানে আসার কারণে রামবহালের মর্জি-মেজাজ, পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে ফেলেছে ধনেরি। তাঁর হাভেলির পেছন দিকে অ্যাসবেস্টসের ছাউনির তলায় তিনটে পুরনো মডেলের গাড়ি আছে। কিন্তু মোটরে তিনি কচিৎ কখনও চড়ে থাকেন। ফিটনই তাঁর বেশি পছন্দের। চার চারখানা হুড-খোলা ঘোড়ার গাড়িও আছে রামবহালের। তেজী ঘোড়াও রয়েছে পাঁচ-ছ'টা। ফিটনে তো বটেই , মাঝে মধ্যে ঘোড়ায় চড়েও তাঁকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

ঘোড়াগুলোর বয়স বাড়লে যখন কমজোর হয়ে পড়ে, আগের মতো আর ছুটতে পারে না, সেগুলো বেচে নতুন ঘোড়া কেনেন রামবহাল। এইভাবেই বছরের পর বছর চলে আসছে।

রামবহাল বললেন, 'ক' মাহিনা আগে হরিহরছত্রের (শোনপুরের) মেলা থেকে একটা ঘোড়া কিনিয়ে এনেছিলাম। লেকিন জানবরটা এমন বেয়াড়া আর বেতমিজ যে কিছুতেই পোষ মানানো যাচ্ছে না।'

অনেকদিন রামবহালের হাভেলিতে আসেনি ধনেরি। তাই মেলা থেকে ঘোড়া কেনার খবরটা তার জানা ছিল না। কিছু না বলে সে তাকিয়ে থাকে।

রামবহাল বলতে লাগলেন, 'একবার ভেবেছিলাম ঘোড়াটাকে দূর করে দিই। তারপর মাথায় রোখ চেপে গেল, এত এত ঘোড়া শায়েস্তা করেছি আর এটাকে পারব না? পোষ মানাবার জন্যে তিন তিনগো আদমি ওর পেছনে লাগিয়ে দিলাম।'

ধনেরি জিজ্ঞেস করে, 'তবু কিছু হল না?'

'নেহী।'

'কাল বারীষ ছিল না। আমার আদমিরা ঘোড়াটাকে টহল দিয়ে আনার জন্যে পাক্কীতে গিয়েছিল। আচানক ওদের চাঁট মেরে জানবরটা পছিম দিকে জঙ্গলে ভেগে গেছে। কাল পুরা দিন আমার লোকেরা ওটাকে টুঁড়েছে, আজও বারীষ মাথায় নিয়ে জঙ্গলে গেছে, লেকেন ঘোড়াটার পাত্তা নেই।'

রামবহাল ঝা নৌকরদের চত্বরে দাঁড় করিয়ে কেন ধমক ধামক দিচ্ছেন এতক্ষণে তা বুঝতে পারছে ধনেরি। শুধু তাই না, এবার তিনি তাকে কী বলবেন সেটাও আন্দাজ করা যাচ্ছে। উদ্‌গ্রীব ধনেরি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

রামবহাল নৌকরদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'এই ভূচ্চরগুলোকে দিয়ে কিছু হবে না। ঘোড়াটা আমার ফেরত চাই। ওটা যদি তুই জঙ্গল থেকে ধরে নিয়ে আসতে পারিস, পাঁচ শ রুপাইয়া বকশিস পাবি। রাজি?'

নানা ধরনের খেলা দেখিয়ে কোনো বারই এক বেলা ভরপেট খাওয়া আর পঞ্চাশ ষাট টাকার বেশি রামবহাল ঝা'র কাছ থেকে পায়নি ধনেরি। সেই লোক কিনা ঘোড়া ধরে এনে দেবার জন্য পাঁচ শ টাকা দিতে চাইছে? নিজের কানে শোনার পরও যেন বিশ্বাস হতে চায় না। নগদ এতগুলো রুপাইয়া হাতে পেলে তিনটে মাসের জন্য সে নিশ্চিন্ত। হঠাৎ চুনিয়ার কথা মনে পড়ে গেল। এই সুযোগে তারও যদি দুটো পয়সা হয়ে যায়, এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। বড় আশা নিয়ে মেয়েটা ধারাবনি এসেছে। ধনেরি ঘোড়া ধরে আনতে পারলে পাঁচ শ টাকা পাবে আর চুনিয়া মুখ চুন করে, খালি হাতে তাদের গাঁয়ে ফিরে যাবে, এটা হয় না। চুনিয়ার জন্য সে চেষ্টা করে দেখবে। যদি কিছু হয় ভালো, নইলে নিজের টাকা থেকে ওকে কিছু দেবে।

ধনেরি বলল, 'কোসিস করেগা হুজৌর। লেকেন একগো বাত—'

রামবহাল ঝা বললেন, 'কী বলবি বল—'

'আমার সাথ একজন আছে, ঘোড়া টুঁড়বার জন্যে তাকে সঙ্গে নিতে চাই।'

'কে সে?'

'নিয়ে আসছি।'

গাড়ি থেকে চুনিয়াকে নামিয়ে রামবহালের সামনে হাজির করে ধনেরি। বলে, 'এর নাম চুনিয়া—'

রামবহাল জিজ্ঞেস করেন, 'তোর কে হয়—ঘরবালী?'

'নেহী নেহী—' ধনেরি চমকে উঠে বলে, 'ও আমাদের গাঁওয়ের মেয়ে। কামকাজের খোঁজে এখানে এসেছিল।'

দু'জনের সম্পর্ক নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করেন না রামবহাল। সংশয়ের সুরে বলেন, 'ও একটা আওরত। ও কী পারবে?'

পাছে রামবহাল চুনিয়াকে নাকচ করে দেন, তাই ভীষণ ব্যগ্রভাবে ধনেরি বলে ওঠে, 'পারবে হুজৌর। চুনিয়া খুব তেজ্জী আওরত।'

কী ভেবে রামবহাল বলেন, 'ঠিক হ্যায়, ওকে শ'ও রুপাইয়া দেব। লেকেন ঘোড়া ধরে আনতে না পারলে কেউ একগো পাইসাও পাবি না। রাজি?'

হাতে কাজকর্ম নেই, রোজগারের অন্য কোনো ফিকিরও মাথায় আসছে না, অথচ টাকা চাই। রামবহালের কথায় রাজি না হয়ে উপায় কী? ধনেরি বলে, 'ঠিক হ্যায়, আপনি যা বললেন তাই হবে সরকার। তবে আউর একগো বাত—'

'আবার কী হল?'

ধনেরি জানায়, সেই ভোর থেকে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গাড়ি চালিয়ে এতদূর এসেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত পেটে একদানা খাদ্য পড়েনি। ভুখে পেট জ্বলে যাচ্ছে। হুজৌর যদি তাদের কিছু খাবার দিতে হুকুম দেন, খিদের জ্বালা থেকে রক্ষা পায়। রামবহাল একটা নৌকরকে দিয়ে অনেকগুলো চাপাটি আর লাড্ডু আনিয়ে ধনেরিদের দেন।

ধনেরি চুনিয়াকে সঙ্গে করে তার গাড়ি থেকে লাঠি, মোটা দড়ি, ছুরি, দা আর খাবারগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় যেতে যেতে চাপাটি-টাপাটি খেয়ে নেবে।

পশ্চিম দিকের জঙ্গলটা ধনেরির অচেনা নয়। ওখানে একমাত্র বরা আর বিষাক্ত কিছু সাপ ছাড়া অন্য কোনো হিংস্র জন্তু নেই। বাদবাকি হল হরিণ খরগোশ আর বুনো বেড়াল বা শিয়াল। তবু বন-বরা বা জংলি শুয়োরদের মতিগতি আগে থেকে আন্দাজ করা মুশকিল। কখন তারা খেপে উঠে তেড়ে আসবে, কে জানে। সাবধানের মার নেই, তাই ছুরি লাঠি সঙ্গে রাখা ভালো।

গাড়িটা রামবহাল ঝা'র বাড়ির চত্বরে রেখে দু'জনে বেরিয়ে পড়ে। যে পাকা সড়কটা ধরে ধনেরিরা এসেছিল সেটা ধারাবনি শহরের গা ঘেঁষে পশ্চিম দিকে চলে গেছে। একসময় ওরা সেখানে চলে আসে। চাপাটি খেতে খেতে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে।

বৃষ্টিটা হঠাৎ ধরে এল। অজস্র জল ঝরানোর পর মেঘগুলো ক্রমশ ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। সূর্যটাও মেঘের ফাঁক দিয়ে একটু একটু করে মুখ বাড়াতে শুরু করেছে। চারদিকে এখন ফিকে, নিস্তেজ আলো। বোঝা যাচ্ছে, আর কিছুক্ষণের ভেতর ঝলমলে রোদ দেখা দেবে। হাঁটতে হাঁটতে ধনেরি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'রওদ (রোদ) ফুটছে। ভালোই হল—কী বলিস?'

চুনিয়া তার কথায় সায় দিয়ে বলে, 'হাঁ। বারীষ চললে ঘোড়াটাকে খুঁজতে মুশকিল হত।'

একসময় ধনেরিরা পশ্চিমের জঙ্গলে পৌঁছে যায়।

জঙ্গলের সামনের দিকটা ফাঁকা ফাঁকা। অল্প কিছু ঝোপঝাড়, ট্যারাবাঁকা চেহারার দু-চারটে সিসম, কেঁদ আর গরান গাছ ছাড়া ছাড়া ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনে সে সবের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়।

'ধনেরি বলে, 'আমি বাঁ দিকটা দেখছি। তুই ডাইনে নজর রাখ।'

চুনিয়া আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয়, 'হাঁ।'

'সামনের দিকটাও দেখবি।'

'হাঁ।'

খানিকটা এগুবার পর জঙ্গল ঘন হতে শুরু করে।

'ধনেরির কথামতো তীক্ষ্ণ চোখে ডাইনে এবং সামনে তাকাতে তাকাতে চুনিয়া হঠাৎ বলে ওঠে, 'একটা কথা ভাবছিলাম।'

ধনেরিও সতর্কভাবে বাঁয়ে লক্ষ রাখছিল। সে জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'এই যে আমরা জঙ্গলে এসে এত মহনত করছি, কিছু ফায়দা হবে?'

'মতলব?'

চুনিয়া তার সংশয়ের কথাটা বুঝিয়ে বলে। রামবহালজির এতগুলো নৌকর দু'দিন ধরে নিশ্চয়ই জঙ্গল তোলপাড় করেছে। তারা যখন ব্যর্থ হয়েছে, চুনিয়ারা কি ঘোড়াটাকে খুঁজে বার করতে পারবে? নাকি খাটনিটাই পুরোপুরি নিষ্ফল হয়ে যাবে?

ধনেরি বলে, 'জঙ্গলটা তো খুব ছোটো নয়। এমনও তো হতে পারে, ঘোড়াটা যেখানে আছে, রামবহালজির নৌকরেরা সেদিকে যায়নি। চুনিয়ারা তো খালি হাতেই যে যার গাঁওয়ে ফিরে যাচ্ছিল। পয়সা রোজগারের একটা সুযোগ যখন হাতে এসেই গেছে, চেষ্টা করে দেখতে হবে না?

চুনিয়া তবু খুঁত খুঁত করতে থাকে, 'ঘোড়াটা আমাদের জন্যে যে জঙ্গলে বসে থাকবে তার কি কিছু ঠিক আছে?'

ধনেরি রেগে যায়, 'বকবকানি থামাবি? ইচ্ছা না হলে ফিরে যা। আমি একলাই জঙ্গল ঢুঁড়ব।'

আপসের সুরে চুনিয়া বলে, 'গুস্‌সা করো না। আচ্ছা, আমি এ নিয়ে আর কিছু বলছি না।'

এতক্ষণে রোদ বেরিয়ে গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে বনভূমিতে এসে পড়েছে। ওরা চলেছে তো চলেছেই।

হঠাৎ দুটো হড়হড়িয়া সাপ পাশ দিয়ে সর সর করে বেরিয়ে কোথায় অদৃশ্য হল। মানুষের পায়ের আওয়াজ পেয়ে অগুনতি পোকা উড়তে শুরু করেছে। চারদিকে থেকে একটানা ঝিঁঝির ডাক উঠে আসছে। সেই সঙ্গে গলা মিলিয়ে ব্যাঙেরাও ডেকে চলেছে। তার মানে বৃষ্টিটা আপাতত ধরে গেলেও পরে আবার নতুন করে শুরু হতে পারে। ব্যাঙেরা বৃষ্টির ব্যাপারটা আগেভাগে টের পায়।

দূরে, ডান দিকে কোনাকুনি চোখে পড়ল ঝাঁকে ঝাঁকে হরিণ মোটা মোটা গাছের আড়াল দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

অনেক দূর যাওয়ার পর খানিকটা জলা জায়গা পড়ল। তার পাড়ে প্রচুর কাঁক আর মানিক পাখি পাঁচমেশালি আওয়াজ করে চলেছে। ধনেরিদের দেখে তারা তুমুল হইচই বাধিয়ে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়তে লাগল।

হঠাৎ চুনিয়া চেঁচিয়ে ওঠে, 'বরা—হুই—' বলে বাঁ দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

সত্যিই একটা গরান গাছের তলায় দুটো দাঁতাল শুয়োর দাঁড়িয়ে আছে। কুটিল দৃষ্টিতে তারা ধনেরিদের লক্ষ করছে।

ধনেরি এক টানে চুনিয়াকে তার পেছনে নিয়ে এসে লাঠি বাগিয়ে ধরল। কিছুক্ষণ শুয়োর দুটো কী ভাবল কে জানে। তারপর ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে উলটো দিকে চলে গেল।

ধনেরিরাও আর দাঁড়াল না। জলার ধার দিয়ে দিয়ে ওপারে চলে এল।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় ধনেরি লক্ষ করে, মাঝে মাঝেই পিছিয়ে পড়ছে চুনিয়া। হাজার হোক, মেয়েমানুষ তো। সারাদিনের ধকলে নিশ্চয়ই কাবু হয়ে পড়েছে। সে জিজ্ঞেস করে, 'কী রে, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। বহুত থকে গেছিস?'

চুনিয়া লজ্জা পেয়ে যায়। জোরে জোরে পা চালাতে চালাতে বলল, 'নেহী। হামনি ঠিক হ্যায়।' একটু চুপ করে থেকে বলে, 'একটা ব্যাপার আমার মাথায় আসছে না।'

ধনেরি জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

চুনিয়া জানতে চায়, উদ্দেশ্যহীন হাঁটাহাঁটি করে এত বড় জঙ্গলে ঘোড়াটাকে কীভাবে পাওয়া যাবে?

ধনেরি বলে, এলোপাথাড়ি সে হাঁটছে না। আপাতত তারা জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে চলেছে। এইভাবে সোজাসুজি শেষ মাথা পর্যন্ত যাবে। যদি ঘোড়ার দেখা পাওয়া যায় ভালো, নইলে তাদের ডান দিকে যেতে হবে। সেখানে না পেলে বাঁ ধারে।

চুনিয়া গালে হাত দিয়ে অবাক বিস্ময়ে বলে, 'হো রামজি!'

মুখ ফিরিয়ে ধনেরি বলে, 'কী হল রে?'

'পুরা জঙ্গল যদি এভাবে টহল দিয়ে বেড়াও, তাহলে দিন খতম হয়ে আন্ধেরা নেমে যাবে।'

'এছাড়া আর কী করতে পারি? আজ যদি ঘোড়াটাকে খুঁজে না পাই, রাতে ধারাবনিতে কোথাও থেকে যাব। ফের সুবে সুবে এসে ঢুঁড়তে শুরু করব।'

না, সারা জঙ্গল টহল দেবার দরকার হয় না। আরও খানিকটা চলার পর আচমকা চুনিয়ার একটা হাত ধরে থামিয়ে দেয় ধনেরি। চাপা, উত্তেজিত গলায় বলে, 'সামনে দ্যাখ—'

পনের কুড়ি হাত দূরে আগাছার ঝোপ। সেটার ওধারে একটা তেতর গাছের তলায় একটা তেজী বাদামি রঙের ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। সেটার মুখ অন্য দিকে ফেরানো। জন্তুটার গলায় চামড়ার সরু গলাবন্ধে অনেকগুলো পেতলের ঘুন্টি বসানো। পিঠে গদি।

ধনেরি বলল, 'এটাই বড়ে সরকারের ঘোড়া।'

চুনিয়া বলে, 'রামজিকা কিরপা, আমাদের পুরা জঙ্গল ঢুঁড়তে হল না।'

ধনেরি বলে, 'হোঁশিয়ার। এতটুকু আওয়াজ করবি না। আয় আমার সাথ—'

ঘোড়াটা অন্য দিকে তাকিয়ে আছে বলে ধনেরি আর চুনিয়াকে দেখতে পাচ্ছে না। ওরা নিঃশব্দে পা টিপে টিপে জন্তুটার পেছনে তেতর গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়।

চুনিয়া কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে ধনেরিকে শুধোয়, 'এবার কী করবে?'

ধনেরি তেতর গাছটা তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছিল। গাছটার একটা মোটা ডাল হেলে ঘোড়াটার মাথার কাছাকাছি চলে গেছে।

ধনেরি জিজ্ঞেস করে, 'গাছে চড়তে পারিস?'

চুনিয়া বলে, 'খুব উঁচা গাছ হলে পারব না।'

তেতর গাছের মোটা ডালটা দেখিয়ে ধনেরি শুধোয়, 'ওখানে উঠতে পারবি?'

ডালটা মাটি থেকে দশ-বার হাত ওপরে। ভাল করে দেখে নিয়ে চুনিয়া বলে, 'পারব। লেকেন ওখানে উঠে কী হবে?'

ধনেরি তার উদ্দেশ্যটা জানিয়ে দেয়। প্রথমে সে গাছে চড়ে ডালটার ওপর দিয়ে বুক ঘষে ঘষে ঘোড়ার কাছে চলে যাবে। তার পিছু পিছু আসবে চুনিয়া। তারপর দু'জনে ঘোড়াটার পিঠে লাফিয়ে পড়ে ওটাকে রামবহালজির হাভেলিতে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে।

পরিকল্পনাটা তেমন মনঃপূত হয় না চুনিয়ার। সে বলে, 'তুমি ঘোড়ায় চড়তে জানো?'

'জানি। মাদারি খেল যখন দেখাতাম তখন শিখেছিলাম।'

'লেকেন আমি কখনও ঘোড়ায় চড়িনি।'

'ঘাবড়ানেকা কুছ নেহী। জানবরটার পিঠে লাফিয়ে পড়ার পর তুই আমার কোমর জাপটে ধরে থাকবি। তার পর শালেকে কী করে দাবড়ে নিয়ে যেতে হয় সেটা আমি দেখব। সমঝি?'

চুনিয়া উত্তর দেয় না। অসীম দুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে ধনেরির পিছু পিছু গাছ বাইতে থাকে।

কাজটা যত সহজ ভাবা গিয়েছিল, আদপেই সেটা তা নয়। গাছের ডাল থেকে আচমকা দুটো মানুষ পিঠের ওপর লাফিয়ে পড়তে ঘোড়াটা প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণে সামনের দিকে দু'পা তুলে গা ঝাড়া দিয়ে এক ঝটকায় ধনেরি আর চুনিয়াকে ছিটকে ফেলে দেয়। ধনেরি প্রায় দশ হাত দূরে একটা কাঁটাঝোপে গিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ের চামড়া নানা জায়গায় কেটেকুটে রক্তাক্ত হয়ে যায়। চুনিয়া পড়ে যাবার সময় জন্তুটার চাঁট লাগে ডান উরুতে। ওটার পায়ের খুরে লোহার নাল বসানো। অসহ্য যন্ত্রণায় চুনিয়ার মনে হয়, পা'টা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

এমন একটা ঘটনার পর ধনেরির ভয় হয়েছিল, জানোয়ারটা এই মুহূর্তেও আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে না, দৌড়ে জঙ্গলের অন্য কোনো দিকে উধাও হয়ে যাবে।

কিন্তু ঘোড়াটা এক কদমও নড়ে না। ঘাড় বাঁকিয়ে একটি হঠকারী পুরুষ এবং একটি আওরতকে লক্ষ করতে থাকে।

এদিকে কাঁটা ঝোপ থেকে নিজেকে বার করে এনেছে ধনেরি। তার মাথায় এখন রোখ চেপে গেছে। যে জানোয়ার তাকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়েছে তাকে সে ছাড়বে না। চুনিয়াকে বলে, 'আমরা ফের ঘোড়ায় উঠব। আয়.....'

মাটিতে কাত হয়ে পড়ে উরু দু হাতে চেপে সমানে কাতরাচ্ছিল চুনিয়া। আতঙ্কগ্রস্তের মতো সে বলে, 'নেহী। ওটা বহোত খতারনাক জানবর।'

'কেত্তে বড়ে খতারনাক, আমি দেখব। তুরন্ত উঠে আয়।'

'নেহী। আমি ওটার ধারে কাছে যাব না।'

'তা হলে আমিই ওটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। তুই জঙ্গল থেকে একেলী বড়ে সরকারের হাভেলিতে যেতে পারবি?'

'যা চোট লেগেছে, পারব না।'

'এক কাজ কর। তুই এখানেই থাক। হাতের কাছে দা রাখবি। এটা জঙ্গল। হোশিয়ার রহনা—'

'ঠিক হ্যায়।'

এবার আর গাছে উঠে নয়, সোজাসুজি মাটি থেকেই লাফ দিয়ে ঘোড়াটার পিঠে চড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে ধনেরি। কিন্তু জন্তুটা তৈরি হয়েই ছিল, বিদ্যুৎগতিতে ঝাড়া দিয়ে তাকে ফেলে দেয়।

রক্ত মাথায় চড়ে যায় ধনেরির। একটা জানোয়ার তাকে নাস্তানাবুদ করছে, কিছুতেই তা মেনে নিতে পারে না। দশ দশ বার ঘোড়াটার পিঠে ওঠে সে, প্রতি বারই ঝাড়া খেয়ে কখনও গিয়ে পড়ে মাটিতে, কখনও অন্য গাছের গুঁড়িতে, কখনও বা দূরের ঝোপঝাড়ে।

ঘোড়াটা এক জায়গায় অনড় দাঁড়িয়ে আছে। ধনেরির দৌড় কতখানি, তার বেয়াদপি কতটা সহ্য করা যায় সেটাই বোধহয় দেখতে চাইছে।

বার বার আছাড় খেয়ে ধনেরির হাত পা বুক পিঠ থেঁতলে গিয়ে রক্ত ঝরছে। কিছু হাড়গোড় ভেঙেও গেছে বুঝিবা। সে ভীষণ হতাশ আর হয়রান হয়ে পড়েছিল। জোরে শ্বাস টানতে টানতে নির্জীব গলায় বলল, 'অ্যায়সা ভূচ্চরের ছৌয়া জানবর আমার সারা জীবনে আর একটাও দেখিনি। শালে আমার জান চৌপট করে দেবে।'

চুনিয়া বলে, 'ঘোড়া নিয়ে যাবার দরকার নেই। চল আমরা ফিরেই যাই।'

কী উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ বিজলি চমকের মতো মাথায় কিছু খেলে যায় ধনেরির। তেতর গাছের কাছে তাদের দড়ি লাঠি দা এবং ছুরি পড়ে রয়েছে। সে দৌড়ে গিয়ে দড়ির ফাঁস তৈরি করে দূর থেকে ছুঁড়ে ঘোড়াটার গলায় আটকে দিয়ে দড়ির অন্য দিকটা তেতর গাছটার গুঁড়িতে তিন চার ফেরতা দিয়ে বেঁধে ফেলে।

ঘোড়টা এটা ভাবতে পারেনি। অসহ্য রাগে টানাটানি করে বাঁধনটা খুলে ফেলতে চেষ্টা করে সে। কিন্তু দড়িটা এতই মোটা আর শক্ত যে ছেঁড়া অসম্ভব।

ধনেরি চুনিয়াকে বলে, 'ও শালে এখানে বাঁধা রইল। তুইও থাক। আমি বড় সরকারের হাভেলি থেকে লোকজন নিয়ে তুরন্ত চলে আসছি।'

রামবহালজির বাড়ি থেকে তাঁর দশজন নৌকরকে সঙ্গে করে জঙ্গলে এসে ধনেরিরা সবাই মিলে আরও কয়েকটা দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে ঘোড়াটাকে। তারপর সেটাকে আর চুনিয়াকে নিয়ে ফিরে যায়।

রামবহালজি ঘোড়া ফিরে পেয়ে বেজায় খুশি। কথামতো ধনেরিকে নগদ পাঁচশ আর চুনিযাকে এক শ টাকা দিয়ে তারিফের সুরে বললেন, 'সাবাস।'

সেই আজব তিন চাকাওলা গাড়িটায় উঠে বামবহালজির হাভেলি থেকে বেরিয়ে একসময় ওরা বড় সড়কে চলে আসে। সামনে বসে গাড়ি চালাচ্ছে ধনেরি। পেছনে পিঠের কাছে বাক্সের ওপর বসে আছে চুনিয়া।

সন্ধে অনেক আগেই নেমে গিয়েছিল। মেঘ কেটে গিয়ে নীলাকাশের অনেকটা অংশ এখন দেখা যাচ্ছে। সেখানে চাঁদির কটোরার মতো পুনমেব গোল চাঁদ উঠেছে।

ডান উরু থেকে পা পর্যন্ত ভীষণ টাটাচ্ছিল চুনিয়ার। মাঝে মাঝে অস্ফুট, কাতর শব্দ করে উঠছিল সে।

ধনেরি জিজ্ঞেস করল, 'কী রে, খুব কষ্ট হচ্ছে?'

চুনিয়া বলে, 'হোক। শ'ও রুপাইয়া তো পেলাম। এখন পাঁচ সাত রোজ পেটের জন্যে ভাবতে হবে না।'

'হাঁ, আমারও তাই। কয়েক রোজ ঘর থেকে এক কদমও বেরুব না।'

'লেকেন তোমার জন্যে একগো আপসোস রয়ে গেল।'

বেশ অবাক হয়ে ধনেরি পেছন দিকে মুখ ফেরায়। বলে, 'কীসের আপসোস?'

চুনিয়া বলে, 'খেল দেখাতে এসে জঙ্গল থেকে বড়ে সরকারের ঘোড়া ধরতে হল তোমাকে।'

ধনেরি বলে, 'কা করে। পেটের জন্যে কত কিছুই তো করতে হয়।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে চুনিয়া, 'হাঁ।'

মাইল কয়েক চলার পর চুনিয়া হঠাৎ বলে ওঠে, 'রুখো, রুখো—'

ধনেরি জিজ্ঞেস করে, 'কী হল?'

'আমি এখানে নামব।'

'এখানে কেন?'

'বা রে, ঘরে লৌটব না?'

এবার ধনেরির চোখে পড়ে, বাঁ দিকে যে সরু রাস্তাটা ধানখেত চিরে চলে গেছে ওটা দিয়েই দুমরিয়া গাঁওয়ে অর্থাৎ চুনিয়ার সসুরালে যেতে হয়। গাড়ি থামিয়ে দেয় সে। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায় তার।

চুনিয়া বলে, 'চলি—'

ধনেরি ভারি গলায় জিজ্ঞেস করে, 'তোর সাথ আর দেখা হবে না?'

চুনিয়া বলল, 'পেটের ধান্দায় তুমিও ঘুরছ আমিও ঘুরছি। ঘুরতে ঘুরতে আজকের মতো আচানক কোথাও না কোথাও ফির দেখা হয়ে যাবে।' বলে আর দাঁড়ায় না, পাক্কী থেকে ওধারের সুরু পথটায় নেমে গেল।

যতক্ষণ না ধানখেতের শেষ মাথায় চুনিয়া অদৃশ্য হয়ে যায়, ধনেরি তার সিটে বসেই থাকে। তারপর পুনমের চাঁদ মাথায় নিয়ে বৃষ্টিভেজা ফাঁকা সড়কের ওপর দিয়ে ক্লান্তভাবে গাড়ি চালাতে শুরু করে।

সীমান্ত

শেষ পর্যন্ত সীয়াশরণজিকেই আসতে হল।

লাইন-বাবুরা এখানে আসতে চায় না। কীসের টানেই বা আসবে!

এখানে মানুষ বলতে বিলাসপুরী কুলি কামিন। তাদের সাময়িক আস্তানা হিসেবে গুটিকতক হোগলার ঝুপড়ি আর চটের তাঁবু।

এখান থেকে আধ মাইলের মধ্যে সীমান্ত। সীমান্ত বরাবর রেলের লাইন বসাবার কাজ চলছে।

রেলের লাইন, ভাঙা পাথর আর স্লিপার স্তূপাকার হয়ে আছে।

চারপাশে ধু ধু নিষ্ফলা মাঠ, উঁচুনিচু কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ি। নোনা মাটি ফুঁড়ে মাথা তুলে আছে কিছু ন্যাড়া শিমুল আর রুগ্‌ণ চেহারার কয়েকটা পলাশ।

এ সবও বাধা হত না। লাইন-বাবুরা হয়তো আসত যদি বাড়তি রোজগারের ভরসা থাকত। কিন্তু তার উপায় নেই।

এখানে আসার নাম শুনেই লাইন-বাবুরা ছুটির দরখাস্ত দিয়ে বসে।

অগত্যা সীয়াশরণজিকেই রওনা হতে হল। সীয়াশরণজিও লাইন-বাবু অর্থাৎ লাইন-ইনস্পেক্টর।

তিনি যখন এসে পৌঁছুলেন, আকাশে গলা কাঁসার রং ধরেছে। সেদিকে তাকানো যায় না। তাকালে চোখ ঝলসে যাবে। আকাশটা যেন পুড়ে পুড়ে গলে গলে নিচে ঝরে পড়ছে।

বিশ মাইল ট্রলিতে এসেছেন। সীয়াশরণজির মনে হল, এইমাত্র একটা আগুনের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এলেন। মনে হল, রোদের ছেঁকা খেতে খেতে চামড়া মাংস কুঁকড়ে গেছে।

আগে থেকেই খবর দেওয়া হয়েছিল। সীয়াশরণজির জন্য আলাদা একটা তাঁবুর বন্দোবস্ত হয়েছে।

ট্রলি থেকে নামতেই কুলিদের সর্দার তাঁকে তাঁবুতে নিয়ে গেল। কোনো দিকে তাকাবার মতো অবস্থা নয় সীয়াশরণজির। সিধা বাঁশের মাচানে দেহটাকে সঁপে আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইলেন।

কুলিদের সর্দার বলল, 'তখলিফ হচ্ছে ইনাসপিটারজি?'

অস্ফুট শব্দ করলেন সীয়াশরণজি। কী বললেন, ঠিক বোঝা গেল না।

সর্দার তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই একটি কামিনকে সঙ্গে নিয়ে আবার এল। ডাকল, 'ইনাসপিটারজি—'

চোখ বুজেই সীয়াশরণজি বললেন, 'হাঁ—'

'রতিয়াকে এনেছি। আপনার তখলিফ হচ্ছে। রতিয়া থোড়া হাওয়া করুক।'

সীয়াশরণজি এবারও জবাব দিলেন না। চোখও মেললেন না। তারপর কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই।

এটা কী তিথি কে জানে। সন্ধের ঠিক পরে পরেই চাঁদ দেখা দিল। ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্নায় কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ি বিভোর হয়ে আছে। আকাশটা গাঢ় নীল, আশ্চর্য স্নিগ্ধ। কে বলবে দুপুরে এই আকাশেই গলা কাঁসার রং ধরে ছিল!

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস দিয়েছে।

ঘোর ঘোর আচ্ছন্ন ভাব অনেকটা কেটে গেছে। শরীরটা বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। খানিক ধাতস্থ হয়ে উঠে বসেছেন সীয়াশরণজি। দুপুরে তাঁবুতে ঢুকেই শুয়ে পড়েছিলেন। তাঁবুর ভেতরকার কিছুই দেখেননি। এখন সীয়াশরণজি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

এক কোণে একটা লণ্ঠন জ্বলছে।

তাঁবুতে আসবাব বলতে দু'টি বাঁশের মাচান, একটি মাটির সোরাই আর নারকেল পাতার গোটা দুই পাখা।

বাইরে একটা গলা পাওয়া গেল, 'অন্দর আসব সাহাব?'

জবাবের অপেক্ষা না করেই একটি কামিন ঘরে ঢুকল। তার হাতে তিনটে পেতলেব বাসন।

প্রথমে খেয়াল করেননি সীয়াশরণজি। উদাসীন গলায় বললেন, 'তুই কে?'

'আমি রতিয়া। তামাম দিন আপনাকে দেখভাল করলাম। এখন পুছছেন আমি কে!'

সীয়াশরণজির মনে পড়ল। দুপুরে সেই ঘোর ঘোর আচ্ছন্ন অবস্থায় সর্দাবের মুখে রতিয়ার নাম শুনেছিলেন বটে।

বাসন নামিয়ে লণ্ঠনটা উসকে জোরাল করল রতিযা।

একটু আগে উদাসীন অন্যমনস্কের মতো কথা বলছিলেন সীয়াশরণজি। তেজী আলোতে বতিয়াব দিকে হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন।

সুঠাম শরীর। চকচকে তামার মতো চামড়ার রং। কাঁধ থেকে দুটো নিটোল, মসৃণ, নগ্ন হাত নেমে গেছে। সুপুষ্ট শরীর, খাটো কাপড়ে বাগ মানে না। বিড়ালীর মতো কটা চোখ। জোড়া ভুরুর মাঝখানে কালো উল্কিতে সাপ আঁকা। হাঁটু পর্যন্ত আঁটো কাপড়। তারপর উদোম পা। হাতে রুপোর কাঙনা, পায়ের আঙুলে চুটকি। সারা দেহে উগ্র বন্যতা।

রতিয়া বলল, 'যে ক' রোজ থাকবেন, সর্দার আমাকে আপনার দেখাশোনা করতে বলেছে। আপনার খানা-উনা আমিই পাকিয়ে দেব।' পেতলের বাসনগুলো দেখিয়ে বলল, 'এই আপনার রাতের খানা—'

'ঠিক আছে, তুই এখন যা।'

'আপনার বিস্তারা পেতে দিয়ে যাই।'

'দরকার নেই, আমিই পেতে নেব। তুই এখন যা।'

এরকম তাড়া দিয়েই তাঁবু থেকে রতিয়াকে বার করে দিলেন সীয়াশরণজি।

যাবার আগে রতিয়া বলল, 'কাল ফির আসব ইনাসপিটারজি।' বলে একটু হাসল রতিয়া। তিনটে চোখা ধারাল দাঁত বেরিয়ে পড়ল। তারপর শরীরটা দুলিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। তার সুপুষ্ট নিটোল মাংসল পুষ্ট পায়ের গোছ অনেকক্ষণ সীয়াশরণজির চোখে আটকে রইল।

পর দিন সকাল থেকেই কাজ শুরু হল।

কাজ আর কী! সীমান্ত-বরাবর রেলের লাইন আর স্লিপার পাতা হচ্ছে। সিগন্যাল-পোস্ট, সিগন্যাল-পুলি বসানো হচ্ছে। এই সবের ইন্সপেকশন অর্থাৎ তদারকি করা।

বিলাসপুরী কুলিরা ভারি ভারি লোহার লাইন টানে। আর হাঁকে, 'মারে জু—য়া- য়া—ন—নী—'

'হাঁইও—'

তাদের ঘামে-মাজা পিঠ আর মুখ রোদে চকচক করে।

দুপুরের আগে আগেই কাজ শেষ হয়ে যায়।

সেই সকাল থেকে মহড়া চলে। রোদের তাত বাড়তে বাড়তে এক সময় আকাশে গলা কাঁসার রং ধরে। কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে লু বয়ে যায়। অনেক—অনেক দূরে আকাশ যেখানে ধনুরেখায় দিগন্তে নেমে গেছে, ঠিক সেইখানে হিল হিল করে আগুনের একটা হলকা কাঁপতে থাকে।

এ বেলার মতো কাজ চুকল। বিকেলের পর যখন ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁকুরে ডাঙা আব বালিয়াড়ি জুড়োতে শুরু করবে, আবার কাজ আরম্ভ হবে।

সীয়াশরণজি তাঁবুতে ফিরলেন।

রতিয়া স্নানের জল আর দুপুরের খাবার রেখে গেছে।

রতিয়া ছিল না। না থাকাতে মনে মনে স্বস্তিই বোধ করেন সীয়াশরণজি। ধীরেসুস্থে স্নান সেরে খেতে বসেই চমকে উঠলেন। পেতলের থালায় রোটি আর মাংস রেখে গেছে রতিয়া। থালাটা ঠেলে উঠে পড়লেন সীয়াশরণজি। হাঁকলেন, 'সর্দার—সর্দার—'

কুলিদের সর্দার ছুটতে ছুটতে তাঁবুতে ঢুকল, বলল, 'জি—'

'এ কী খানা দিয়েছে!'

যেমন এসেছিল, ছুটতে ছুটতে তেমনি বেরিয়ে গেল সর্দার। একটু পর রতিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আবার ঢুকল। ভয়ে ভয়ে বলল, 'আপনার চাপানি ই রতিয়া পাকিয়েছে।'

সীয়াশরণজি বললেন, 'কী সব পাকিয়েছিস!'

'কেন, গোস্ত আর চাপাটি।' লাইন-বাবু বলে ভয়ডর নেই রতিয়ার। সহজ স্বাভাবিক গলায় সে জবাব দিল।

সীয়াশরণজি বললেন, 'আমি মছলি-গোস্ত খাই না। এগুলো নিয়ে যা।'

থালাটা নিয়ে যেতে যেতে রতিয়া বেজার মুখে বলল, 'আপনার জন্যে বহুত আচ্ছা করে গোস্ত পাকিয়েছিলাম ইনাসপিটারজি। লেকেন আমার নসিবই খারাপ। আপনাকে খাওয়াতে পারলাম না।'

রতিয়া চলে গেল। এ বেলা সীয়াশরণজির খাওয়া হল না।

সন্ধে পর্যন্ত লাইন পাতার কাজ চলল।

রাতে তাঁবুতে ফিরে সীয়াশরণজি দেখলেন লণ্ঠন জ্বলিয়ে রতিয়া বসে আছে। তাঁকে দেখেই মেয়েটা হেসে উঠল। হাসল কিন্তু শব্দ হল না। দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে তিনটে চোখা ধারাল দাঁত বেরিয়ে পড়ল। ভুরু দুটো কুঁচকে যেতে উল্কির সাপটা আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেরুল।

রতিয়া বলল, 'আপনার চাপাটি এনেছি ইনাসপিটারজি—'

সীয়াশরণজি জবাব দিলেন না। কেন যেন তাঁর মনে হল, রতিয়ার সঙ্গে যত কম কথা বলা যায়, ততই মঙ্গল।

এ বেলা রোটি, ঢুলা শাক ভাজি, আলুর ছোকা আর মরিচের আচার নিয়ে এসেছে রতিয়া। খেতে বসে বেশ খুশিই হলেন সীয়াশরণজি। মরিচের আচার তাঁর খুব প্রিয়।

খেতে খেতে সীয়াশরণজি মুখ তুললেন। রতিয়া এখনও যায়নি। লণ্ঠনটার পাশে বসে ঘাড় বাঁকিয়ে চকচকে চোখে তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে।

সীয়াশরণজি বললেন, 'তুই এখনও যাসনি?'

'না ইনাসপিটারজি। আপনার খাওয়া হলে তাম্বু সাফ করব। তারপর বর্তন নিয়ে যাব।'

আর কিছু না বলে সীয়াশরণজি চাপাটি ছিঁড়তে লাগলেন।

খাবার পর আঁচিয়ে বাঁশের মাচানে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লেন সীয়াশরণজি। রতিয়া ঠুক ঠাক, ঠুন ঠান শব্দ করে তাঁবু পরিষ্কার করতে লাগল।

বাইরে কালকের মতো ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্না দেখা দিয়েছে। কাঁকুরে ডাঙা স্নিগ্ধ দুর্জ্ঞেয় রহস্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। দূরের ন্যাড়া শিমুল আর রুগ্‌ণ পলাশগুলি অদ্ভুত এক শ্রী পেয়েছে।

মুগ্ধ হয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন সীয়াশরণজি। কতক্ষণ জ্যোৎস্না-ধোয়া রাতের দৃশ্য দেখছিলেন, হুঁশ নেই। হঠাৎ পায়ের ওপর ঠান্ডা হাত পড়তেই চমকে উঠলেন। পা দুটো দ্রুত টেনে নিয়ে গুটিয়ে খাড়া হয়ে বসলেন। দেখলেন, সামান্য ঝুঁকে ধূর্ত চতুর হাসি হাসছে রতিয়া।

মুখোমুখি সাপ দেখলে যেমন হয় সীয়াশরণজির অবস্থা ঠিক তেমনি। অস্ফুট, ভয় ভয় গলায় তিনি বললেন, 'কী—কী—কী মতলব?'

'কুছ না ইনাসপিটারজি। আপনার পা দাবিয়ে থোড়া আরাম দেব।'

সীয়াশরণজি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না, না, দরকার নেই। তুই যা।'

'আচ্ছা, আচ্ছা জি।' তাঁবু থেকে বেরুবার আগে ফিস ফিস করে রতিয়া বলল, 'বাতে কুছু দরকাব হলে আমাকে বুলাবেন ইনাসপিটারজি। আমি পাশের ঝোপড়িতেই আছি।

রতিয়া চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ একই ভাবে বসে রইলেন সীয়াশরণজি। বুকেব মধ্য থেকে কেমন এক ধরনের ঠাণ্ডা সিরসিরে কাঁপুনি উঠছে। কিছুতেই সেটা ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

সামলে উঠতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। নিজের কথা ভাবতে শুরু করলেন সীযাশবণজি।

তিনি মৈথিলী ব্রাহ্মণ। সুগৌর ঋজু চেহারা। বেশ বয়স হয়েছে। চল্লিশ পার হযেছেন। কিন্তু দু-একটা চুলে পাক ধরানো ছাড়া বয়স তাঁর চেহারায় আঁচড় কাটতে পারেনি। একই সঙ্গে গাম্ভীর্য আর প্রসন্নতা তাঁর মুখে চোখে আলাদা ব্যক্তিত্ব দিয়েছে।

সীয়াশরণজি বিয়ে করেননি। কামিনীতে তাঁর মোহ নেই, কাঞ্চনে লোভ নেই। জীবন সম্বন্ধে তাঁব দৃষ্টিভঙ্গি নির্বিকার এবং নির্মোহ।

এটুকুই সীয়াশরণজির সমস্ত পরিচয় নয়। জীবনে তিনি মিতাচারী, অদ্ভুত সংযমী। এমন খাদ্য খান না যাতে শরীর উত্তেজিত হয়, এমন কথা ভাবেন না যাতে মন বিচলিত হয়। নীতি এবং সংযমে তাঁব অটুট নিষ্ঠা।

সীয়াশরণজি লাইন-ইন্সপেক্টর। সমস্ত জীবন তিনি রেলের লাইন পেতে আসছেন। রেলের লাইনই শুধু নয়, নিজের জীবনে নীতি আর সংযমের লাইনও তিনি বসিয়ে চলেছেন। তার বাইবে যাবাব উপায় নেই।

এখানে, এই কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়িতে লাইন পাততে এসেছেন তিনি। সীমান্ত বরাবর রেলের লাইন টেনে নিতে মাস দুই সময় লাগবে।

দু মাস মেয়াদের সঙ্গে রতিয়ার কথাটা যতই ভাবলেন, বিচিত্র এক ভয চার পাশ থেকে তাঁকে ঘিরে ধরল।

সীয়াশরণজি ঠিক করলেন, রতিয়াকে এড়িয়ে চলবেন। পারতপক্ষে তার সঙ্গে কথা বলবেন না।

সীয়াশরণজি আসার পর দিন দশেক পার হল। লাইন পাতার কাজ পুরোদমে চলছে। দুপুবে আকাশ বাতাস কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ি যখন অস্বাভাবিক তেতে থাকে, সেই সময়টুকু ছাড়া কাজের কামাই নেই। এ ক'দিনে অনেকখানি লাইন বসানো হয়েছে।

কাজ যেই চুকে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুতে চলে আসেন সীয়াশরণজি। তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও, অজান্তেই একটা ব্যাপার ঘটে চলেছে।

সেই যে তিনি ভেবে রেখেছিলেন, রতিয়াকে এড়িয়ে চলবেন, তার সঙ্গে যতটা সম্ভব কম কথা বলবেন, তা আর হয়ে ওঠেনি।

এই বিলাসপুরী কামিনটা ভারি ফিচেল। হেসে হেসে ঢলে ঢলে প্রচুর কথা বলে। আশ্চর্য! সীয়াশরণজি তাকে নিজের অজান্তে কবে থেকে যেন খানিকটা প্রশ্রয়ও দিয়ে যাচ্ছেন। তার সঙ্গে তাল রেখে পাল্লা দিয়ে কথা বলছেন, হাসছেন।

রতিয়া বলে, 'ইনাসপিটারজি কী শাদি-উদি করেছেন?'

'না।'

গালে একটা হাত রাখে রতিয়া। চোখের কটা তারা দুটো চরকির মতো ঘোরে। কপট দুঃখ করে একটা নিশ্বাস ফেলে। তারপর বলে, 'হায় রামজি, এখনও শাদি করেননি!'

সীয়াশরণজি হাসেন। বলেন, 'শাদি করিনি তো হয়েছে কী?'

'জনমটাই আপনার বেফায়দা হয়ে গেল ইনাসপিটারজি। সমঝালেন?'

'হাঁ।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন সীয়াশরণজি।

এমনিতে তাঁর ভুলো মন। লাইনের তদারকিতে হয়তো গিয়েছেন। ভুলে ছাতাটা সঙ্গে নেননি। রোদের তাতে চামড়া পুড়ে যাচ্ছে।

ছুটতে ছুটতে ছাতা নিয়ে আসে রতিয়া। ফিস ফিস করে বলে, 'আপনার বহুত ভুল হয় ইনাসপিটারজি। ভুল সজুত করার জন্যে একটা শাদি করুন। ঘরে জেনানা এলে আর ভুল হবে না।'

সস্নেহে ধমক দেন সীয়াশরণজি, 'যা যা তামাশাবালী—'

নধর ভুট্টাগাছের মতো শরীর দোলাতে দোলাতে চলে যায় রতিয়া।

জোর কাজ চলছে। আর মাসখানেকের মধ্যেই সীমান্ত পর্যন্ত লাইন পাতা হয়ে যাবে।

সীয়াশরণজি আসার পর পুরো দেড়টা মাস পার হতে চলল। এই দেড় মাসে রতিয়ার হাসি ঢলানি তামাশা নিজের অজান্তেই তাঁর সমস্ত সত্তাটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

আজকাল রতিয়াকে ছাড়া সীয়াশরণজির চলে না।

সকাল-দুপুর-সন্ধে—দিনে তিনবার তাঁর তাঁবুতে আসে রতিয়া। তাঁবু সাফ করে। চাপাটি-ভাজি সাজিয়ে দেয়। মাটির সোরাইতে জল ভরে রাখে। বিছানা পাতে। লণ্ঠনের কাচ মোছে। টুকিটাকি কাজ সারে আর হেসে হেসে মজার মজার কথা বলে, রসের কথা বলে।

ইদানীং আরও একটা কাজ বেড়েছে রতিয়ার। রাত্তিরে খেয়েদেয়ে সীয়াশরণজি শুয়ে পড়লে নরম ঠাণ্ডা হাতে তাঁর পা টিপে দেয়।

এখানে আসার পরের দিন তাঁর পায়ে রতিয়া হাত ঠেকাতেই চমকে উঠে বসেছিলেন সীয়াশরণজি। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুকের ভেতর কাঁপুনি চলেছিল। কিন্তু কখন যে নিজের অজান্তে রতিয়ার এই সেবাটুকু মেনে নিয়েছেন, খেয়াল নেই তাঁর।

রতিয়ার আসতে দেরি হলেই সীয়াশরণজি অস্থির হয়ে ওঠেন। তাঁবুর বাইরে এসে পায়চারি করেন, এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজতে থাকেন। রতিয়া যতক্ষণ না আসে, যেন স্বস্তি পান না।

এদিকে সিগন্যাল-পোস্ট, সিগন্যাল-পুলি পোঁতা হচ্ছে, স্লিপার বসানো হচ্ছে। আর পনের দিনের মধ্যেই রেল-লাইন সীমান্ত ছোঁবে।

কুলি কামিন এবং ইন্সপেক্টরজির শ্বাস ফেলার ফুরসত নেই।

আজ একটানা সমস্ত দিন কাজ হয়েছে। দুপুরে খেতে আসতে পারেননি সীয়াশরণজি। রতিয়া বার দুই ডেকে ফিরে গেছে।

সন্ধের পর আকাশে চাঁদ দেখা দিল। কাঁকুরে ডাঙা আর বালিয়াড়ি থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ উঠে আসছে। দুপুরে গনগনে আকাশটা স্নিগ্ধ এক রহস্যে বিভোর হয়ে আছে। ঝিরঝিরে, মিঠে বাতাসে সমস্ত দিনের অবসাদ জুড়োতে জুড়োতে তাঁবুতে ফিরে এলেন সীয়াশরণজি। কারণ নেই, তবু অদ্ভুত এক খুশিতে মন ভরে আছে।

তাঁবুর বাইরে থেকেই সীয়াশরণজি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'রতিয়া—রতিয়া—'

অন্য দিন ডাকতে হয় না। পায়ের শব্দ পেলেই লণ্ঠন হাতে বাইরে বেরিয়ে আসে রতিয়া।

বার তিনেক ডাকার পরও সাড়া মিলল না। অগত্যা তাঁবুর ভেতরে ঢুকলেন সীয়াশরণজি। রতিয়া নেই। এক কোণে একটা তেলের লণ্ঠন জ্বলছে।

লাইন থেকে ফিরে রতিয়াকে দেখা, তার সঙ্গে গল্প করা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আজ কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। অহেতুক খুশিতে মনটা ভরিয়ে তাঁবুতে ফিরেছিলেন সীয়াশরণজি। এখন কেমন যেন উদাস লাগছে।

মাচানের ওপর নিঝুম হয়ে পড়ে রইলেন সীয়াশরণজি।

খানিকটা পর তাঁবুর বাইরে খচমচ শব্দ হল। ধড়মড় করে উঠে বসলেন সীয়াশরণজি। আকুল আগ্রহে ডাকলেন, 'আয় আয় রতিয়া।'

কিন্তু তাঁবুর ভেতর যে ঢুকল, সে রতিয়া নয়। অন্য একটা কামিন। সে পেতলের থালায় চাপাটি-ভাজি এনেছে।

থালা নামিয়ে কামিনটা চলে গেল।

সিয়াশরণজি একবার ভাবলেন, কামিনটাকে ডেকে রতিয়ার কথা জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু কেমন যেন সঙ্কোচ হল। সঙ্কোচটকে ছাপিয়ে তাঁর ইচ্ছা জয়ী হল না।

অনেকক্ষণ বসে রইলেন সীয়াশরণজি। মনের সঙ্গে অনেক যুঝলেন। কিন্তু একটা অবুঝ চাপা কষ্ট তাঁকে অস্থির করে ফেলল। আর সেই কষ্টটাই তাঁকে তাঁবুর বাইরে টেনে আনল।

লাইনের ধারে টিকারা বাজিয়ে কুলিরা হোলির গীত গাইছে তখন। সন্তর্পণে তাদের এড়িয়ে যেখানে ন্যাড়া শিমুল আর রুগ্ণ পলাশগাছগুলো সারি-বাঁধা জমাট অন্ধকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে চলে এলেন সীয়াশরণজি।

শিমুল আর পলাশের নিচে কামিনদের ঝুপড়ি। ঝুপড়িগুলোর চারপাশে কিছুক্ষণ ঘুর ঘুর করলেন। বার বার ভাবলেন, রতিয়াকে ডাকেন। এতে দোষের কিছু নেই। রতিয়া রোজ তাঁর তাঁবুতে যাচ্ছে। তা ছাড়া ইন্সপেক্টরজি যদি তাঁকে রাতে ডাকেনই, কুলিরা খারাপ চোখে দেখবে না। সীয়াশরণজিকে বিশ্বাস করে তারা।

কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত রতিয়াকে আর ডাকা হল না। অসহ্য অবুঝ এক যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে তাঁবুতে ফিরে এলেন সীয়াশরণজি।

সারা রাত ঘুম হয়নি। ভোরের বাতাসে চোখদুটো জুড়ে এসেছিল।

কে যেন ডাকল, 'ইনাসপিটারজি—'

চোখ মেলেই সীয়াশরণজি যাকে দেখলেন সে রতিয়া। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলেন। প্রথমেই যে কথা বললেন তা এই, 'কাল রাতে আসিসনি কেন রতিয়া?'

রতিয়া জবাব দিল না। ঠোঁট টিপে সেই হাসি হাসল, যাতে শব্দ নেই।

একটা রাত না ঘুমিয়ে চোখ বসে গেছে। হনু দুটো ফুঁড়ে বেরিয়েছে। মুখ শুকনো, চুল উড়ুউড়ু। সীয়াশরণজিকে দেখতে দেখতে রতিয়া বলল, 'চেহারার এ কী হাল হয়েছে!'

ব্যস্তভাবে সীয়াশরণজি বললেন, 'ও কিছু না, কিছু না। কাল তুই আসিসনি কেন?'

রতিয়া এবারও জবাব দিল না। ঠোঁট টিপে আগের মতোই হাসতে লাগল।

সীয়াশরণজি ফের বললেন, 'হাসছিস কেন?'

'বলব?' জবাবের অপেক্ষা না রেখেই ফিস ফিস করে রতিয়া বলল, 'কাল রাতে একটা বেকুব মুরুখ আমার ঝোপড়ির পাশে ঘুর ঘুর করছিল। লেকিন ভরোসা করে ঝোপড়িতে ঢুকল না। মুরুখটার জন্যে কষ্ট হল।' খিল খিল করে দমকে দমকে হেসে উঠল রতিয়া, 'আমি চাইছিলাম সে আমার তাঁবুতে আসুক, এক সাথ রাতটা কাটাই। লেকেন বদ নসিব! কা করে? কাওয়ার (কাপুরুষ) কাঁহিকা!'

সীয়াশরণজি শিউরে উঠলেন। নিজেকে কোথায় নামিয়ে এনেছেন তিনি! শেষ পর্যন্ত একটা কামিনের কাছে তাঁর চাপা লোভ ধরা পড়ে গেল! তীব্র গলায় চিৎকার করে উঠলেন, 'নিকাল যা—'

হাসি থামিয়ে সীয়াশরণজির মুখের দিকে তাকাল রতিয়া। সে মুখে কী দেখল সে-ই জানে। আর একটা কথাও না বলে বেরিয়ে গেল।

আজ আর বেরুলেন না সীয়াশরণজি। সমস্ত দিন তাঁবুতে বসে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করলেন। এতকাল নিজের জীবনে নীতি আর সংযমের লাইন পেতে এসেছেন। জীবনের চাকা মসৃণ নিয়মেই তার ওপর দিয়ে চলছিল। কিন্তু এখানে, দেশের এই সীমান্তে এসে, চল্লিশটা বছর পার হয়ে জীবনেব সীমান্তে পৌঁছে সেটা বেচাল হয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়ার উপক্রম করেছে। প্রায় দু'টি মাস অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে কাটিয়ে সীয়াশরণজি আজ আত্মস্থ হলেন।

স্থির করে ফেললেন, আজই এখান থেকে চলে যাবেন।

বিকেলে কুলি-কামিনদের অবাক করে দিয়ে ট্রলিতে উঠলেন সীয়াশরণজি।

সকলের সঙ্গে রতিয়াও ট্রলির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার কটা চোখ দুটো ধক ধক করছে। রতিয়ার চোখের দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলেন সীয়াশরণজি।

বিড় বিড় করে দুর্বোধ্য গলায় রতিয়া বলল, 'ডরপোক—'

ট্রলি চলতে শুরু করল। জীবনের ভয়ানক এক সীমান্ত থেকে পালিয়ে গেলেন সীয়াশরণজি।

পাড়ি

কিষুণপুরা উত্তর বিহারের ছোট্ট একটি শহর। এ অঞ্চলের লোকজনেরা বলে 'টৌন'।

শহর আর কী! ধুলো বোঝাই কয়েকটা এবড়ো খেবড়ো খোয়ার রাস্তা, হতচ্ছাড়া চেহারার টালি বা টিনের চালের সারি সারি ঘর, কাঁচা নর্দমার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে মশা, অলিতে গলিতে শিবমন্দির কী বজরঙ্গবলীর মূরত, টাঙ্গা, সাইকেল রিকশা, গৈয়া কি ভৈসা গাড়ি—এইসব নিয়ে শহর কিষুণপুরা উত্তর বিহারের এক কোণে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে।

বছর দেড়েক আগে 'বিজলি' এসেছে এবং একটা মিউনিসিপ্যালিটিও আছে এখানে। কিন্তু এ শহরের মানুষ এতই গরিব আর এমনই হাভাতে যে তাদের বেশির ভাগেরই ঘরে রাত্তিরে এখনও আবহমান কালের সেই কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলে। ক্বচিৎ দু একটা বাড়িতে বিজলি বাতি দেখা যায়। তবে সন্ধের পর রাস্তায় রাস্তায় টিমটিমে ইলেকট্রিকের আলো চোখে পড়ে। রাত ন'টার পর সেগুলো অবশ্য নিভিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু কিষুণপুরায় পুবদিকের শেষ মাথায় এলে যে কেউ চমকে যাবে। গোটা শহরটার ছোঁয়া বাঁচিয়ে এখানে চতুর্বেদী বা চৌবেদের বিশাল তেতলা বাড়ি। প্রায় দু একর জায়গা ঘিরে উঁচু কমপাউন্ড ওয়াল, বাড়িটা ঠিক তার মাঝখানে। সামনের গেটে গলায় টোটার মালা ঝুলিয়ে ভোজপুরি দারোয়ানেরা দিনরাত পাহারা দেয়। বাড়িটার ছাদে রয়েছে রামসীতা মন্দির, সেটার চূড়া দেড় দু'মাইল দূর থেকেও নজরে পড়ে।

চৌবেরা কিষুণপুরা, শুধু কিষুণপুরাই বা কেন, আশপাশের পঞ্চাশ-ষাট মাইলের মধ্যে সবচেয়ে বড় জমিমালিক।

এই শহরের দক্ষিণ দিকের শেষ প্রান্ত থেকে শুরু হয়েছে মাঠ। মাঝখান দিয়ে একটা নহর বা খাল সোজা চলে গেছে দিগন্ত পর্যন্ত। তার এক ধারে ফসলের খেত, আরেক ধারে বালি আর কাঁকরে-ভরা পড়তি জমি। দু'ধারের শস্যক্ষেত্র এবং বাঁজা মাঠ—এ সবই চৌবেদের।

ফাল্গুন মাস শেষ হয়ে এল।

ক'দিন আগে এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় তৌহর হোলির মাতামাতি শেষ হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী আরও কিছুদিন এখানে বসন্তের সুখদায়ক ঝিরঝিরে হাওয়া বয়ে যাবার কথা। কিন্তু আবহাওয়ার মতিগতি বোঝা মুশকিল। ফাল্গুন শেষ হতে না হতেই এখানে গরম পড়ে গেছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উলটোপালটা লু-বাতাস চারদিকে ঘোড়া ছোটাতে থাকে।

এখন দুপুর। সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে। প্রবল আক্রোশে সেটা গনগনে আগুন ছড়িয়ে যাচ্ছে। সূর্যের দিকে তাকালে চোখ যেন ঝলসে যাবে।

কিছুক্ষণ আগে কিষুণপুরা টাউন থেকে বেরিয়ে একটা বয়েল গাড়ি দক্ষিণ দিকের বাঁজা মাঠের ওপর দিয়ে এখন এগিয়ে চলেছে। গাড়িটার তেলহীন চাকা থেকে কর্কশ ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজ বেরুতে থাকে।

মাঠটা আড়াআড়ি চিরে একটা ভাঙাচোরা রাস্তা অনেক দূরে হাইওয়েতে গিয়ে ঠেকেছে। রাস্তা আর কী! বছরের ন'মাস ওটা হাঁটুভর ধুলোয় ডুবে থাকে, বৃষ্টির তিনটে মাস সেই ধুলো থকথকে গলা মাংসের মতো হয়ে যায়।

বয়েল গাড়িটা চালাচ্ছে মাঝবয়সী ভিরগুরাম। রোগা ক্ষয়াটে চেহারা তার। কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ফুঁড়ে বেরিয়েছে। গালে খাপচা খাপচা কাঁচাপাকা দাড়ি, চোখ এক আঙুল ভেতরে ঢোকানো। পরনে তালি-মারা ময়লা জামা, কোমরে নেংটির মতো এক ফালি নেকড়া, মাথায় রোদ ঠেকাবার জন্য ঢাউস পাগড়ি। তার সারা শরীরে অভাব আর উপোসের ছাপ।

ভিরগুরামের বয়েল দুটোর হালও তারই মতো। তেমনই হাড়-বার করা, তেমনই কমজোর। প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে কোনোরকমে গাড়িটা টেনে নিয়ে চলেছে জন্তু দুটো।

পরপর তিন বছর এ অঞ্চলে মারাত্মক খরা চলছে। ফসল প্রায় কিছুই হয়নি। এমন অজন্মা চোদ্দপুরুষে কেউ কখনও চোখে দেখেনি। ইদানীং মানুষের হাতে পয়সা নেই। কাজেই মাল বা সওয়ারি বওয়ার জন্য কে আর ভিরগুরামকে ডাকবে! তার কামাই সিকিভাগে নেমে গেছে। এখন তার যা রোজগার তাতে নিজের এবং বয়েল দুটোর দু'বেলা পেটের দানা জোটানো প্রায় অসম্ভব। বেশির ভাগ দিনই তাদের আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়, কোনো কোনো দিন পুরো উপোস। ফলে তাদের শরীরে সারবস্তু আর কিছু নেই।

এই প্রচণ্ড রোদে গাড়ি বার করে বয়েল দুটোকে কষ্ট দেবার ইচ্ছা একেবারেই ছিল না ভিরগুরামের কিন্তু তার কোনো উপায় নেই। কেননা আজ চার দিন পর বিষুণগঞ্জে সে ভাড়া পেয়েছে।

মাঠের ওপারে যে হাইওয়ে সেটা ধরে আরও খানিকটা দক্ষিণে গেলে বিষুণগঞ্জ বাজার। ওখানকার এক কাঠগোলার মালিকের ছেলের আজ শাদি। বর এবং ছ'জন বরযাত্রী নিয়ে ভিরগুরামকে যেতে হবে আরও দু মাইল দূরের এক দেহাতে। ভাড়া মিলবে পঁচিশ টাকা, সেই সঙ্গে ভরপেট উৎকৃষ্ট ভোজন এবং বয়েল দুটোর জন্য চানা খোল আর ভূষি। এই দুঃসময়ে কেউ যখন তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না তখন এতগুলো টাকা ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব। রোদে পুড়ে খাক হয়ে গেলেও গাড়ি নিয়ে তাদের বেরুতেই হয়।

জ্বলন্ত আকাশটা গলা কাঁসার রং ধরে আছে। যেদিকে যতদূর নজর যায়, আগুনের হলকার মতো গনগনে রোদ। মনে হয়, একসঙ্গে হাজারটা চুলা জ্বলছে চারপাশে। কোথাও একটা পাখি টাখি চোখে পড়ে না। অনেক দূরে কালো কালো ফুটকির মতো দু'চারটে ভৈসা কী বয়েল গাড়ি দেখা যায়। ক্বচিৎ এক-আধটা মানুষ। ভিরগুরামের গা বেয়ে ঘামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। আলজিভ পর্যন্ত মুখের ভেতরটা শুকিয়ে ঝামা হয়ে গেছে যেন। তার বয়েল দুটোর গালের কষ বেয়ে গাঁজলা বেরুতে শুরু করেছে, তাদের আরক্ত চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসবে যেন। মনে হয়, যে কোনো মুহূর্তে জন্তু দুটো মুখ থুবড়ে হুড়মুড় করে পড়ে যাবে।

ভিরগুরাম বুঝতে পারে তার প্রাণী দুটোর জীবনীশক্তি ফুরিয়ে আসতে শুরু করেছে। তবু ভরসা দেবার জন্য গভীর স্নেহে বলে, 'চুন্নুয়া মুন্নুয়া, আজ বহোৎ ধূপ (রোদ), থোড়েসে তখলিফ কর। বিষুণগঞ্জে গিয়েই তোদের গলা পর্যন্ত দানা খাওয়াব। ঘাবড়াও মাত।'

দুনিয়ায় কেউ নেই ভিরগুরামের। দশ বছর আগে এখানে পরপর চার সাল ভয়ঙ্কর বন্যা হয়। খরার সময় যেমন রোজগার বন্ধ, বানের সময়ও সেই একই হাল। মাল বা সওয়ারি বওয়ার জন্য ভিরগুরামের ডাক আসে না। সেবার বানের সময় তার ঘরবালী একটা কম বয়েসের ছোকরার সঙ্গে ধানবাদ পালিয়ে যায়। মানুষ কদ্দিন আর উপোস দিতে পারে!

থাকার মধ্যে কিষুণপুরার এক কোণে টুটো ফুটো টিনের চালের ছোটো একটা ঘর রয়েছে ভিরগুরামের। আর সঙ্গী বলতে গাড়িটানা এই বয়েল দুটো—চুন্নুয়া মুন্নুয়া।

ঘরবালী চলে যাবার পর মানুষের সঙ্গে বিশেষ মেশে টেশে না ভিরগুরাম। তার সুখ-দুঃখের যাবতীয় কথা চুন্নুয়া মুন্নুয়ার সঙ্গে। ভিরগুরাম কিছু বললে ওরা কান লটপট করতে করতে শুনে যায়। তার প্রতিটি কথায় এবং কাজে প্রাণীদুটোর নিঃশর্ত সায়।

এই যে ভিরগুরাম বলল, একটু কষ্ট করে মাঠ পেরিয়ে বিষুণগঞ্জ যেতে হবে, তা-ই শুনে চুন্নুয়া মুন্নুয়া আস্তে আস্তে তাদের ঝোলা কান নাড়ে। অর্থাৎ তারা রাজি।

ভিরগুরাম এবার বলে, 'ওরা বলেছে, তোদের বঢ়িয়া ভোজন করাবে। হুঁ হুঁ, শাদি বলে কথা: যত পারবি খেয়ে নিবি—সমঝা?'

চুন্নুয়া মুন্নুয়া কান লটরপটর করে শুনে যায়।

ভিরগুরাম থামেনি, 'ওরা যা খিলাবে পিলাবে তেমনি খানাপিনা তোদের কোন জন্মে করাতে পারব, জানি না। চানা ভুষি খোল কিচ্ছু ফেলবি না। মনে রাখবি, শাদির যে ভোজ খেয়ে আসবি তারপর হয়তো তিন চার রোজ কিছুই জুটবে না। সমঝা?'

একটি মানুষ এবং দু'টি জন্তুর মধ্যে যখন এ জাতীয় কথাবার্তা চলছে, সেই সময় দূর থেকে কারো চিৎকার ভেসে আসে, 'এই রুখো, রুখো, রুখো—'

প্রথমটা খেয়াল করেনি ভিরগুরাম। কিন্তু চিৎকারটা যখন কাছাকাছি এগিয়ে আসে, তাকে পেছন ফিরতেই হয়। গাড়ির চালির ভেতর দিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ে, ঝলসানো মাঠের ওপর দিয়ে একটা মেয়েমানুষ উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়ুতে দৌড়ুতে আসছে। তার দিকে চোখ রেখেই সে চুন্নুয়া মুন্নুয়াকে বলে, 'থোড়া ঠহব্ যা বেটোয়া—'

বয়েল দুটো দাঁড়িয়ে যায়।

একটু পরেই মেয়েমানুষটি হাঁপাতে হাঁপাতে সামনে এসে পড়ে। তার চোখে মুখে ভয়, আতঙ্ক। সে বলে, 'আমাকে বাঁচাও—'

দূর থেকে ভালো করে বোঝা যাচ্ছিল না। মেয়েমানুষটি কাছে এসে দাঁড়াতেই ভীষণ চমকে ওঠে ভিরগুরাম। তাকে ভালো করেই চেনে সে—কিষুণপুরার বড় জমিমালিক বিন্ধ্যচলী চৌবের ছোটো পুতহু অর্থাৎ পুত্রবধূ। নামটাও কার কাছে যেন শুনেছিল—কৌশল্যা। কৌশল্যার শাদিতে গোটা কিষুণপুরাকে ভোজ খাইয়েছিল চৌবেরা। ভিরগুরামের মতো তুচ্ছ গাড়িওলাও বাদ পড়েনি। তখন তো দেখেছেই, তা ছাড়া শাশুড়ির সঙ্গে শিউশঙ্করজির মন্দিরে পুজো চড়াতেও বার কয়েক তাকে দেখেছে সে।

কিন্তু উত্তপ্ত লু-বাতাস যখন সমস্ত চরাচরকে পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে তখন এই ফাঁকা মাঠের মাঝখানে অত বড় ঘরের বহু এভাবে দৌড়ে আসবে, নিজের চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। বিমূঢ়ের মতো সে তাকিয়ে থাকে।

কৌশল্যার পরনে ভাল দামি শাড়ি আছে ঠিকই, কিন্তু পায়ে কিছু নেই। বাঁজা মাঠের বালি এবং কাঁকরের ওপর দিয়ে ছুটে আসার কারণে পায়ের তলা ফেটে রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। জামাকাপড় এলোমেলো। জোরে জোরে শ্বাস পড়ার কারণে বুক তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। ফর্সা মুখ এখন টকটকে লাল, চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। গলগল করে ঘামছে সে।

কৌশল্যা ভীত গলায় আবার বলে, 'আমাকে রক্ষা কর গাড়িবালা—'

এতক্ষণে ভিরগুরাম বলতে পারে, 'কা হুয়া মা-জি?'

কৌশল্যা জানায়, তার খুব বিপদ। শ্বশুরবাড়ি থেকে সে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু শ্বশুর বিন্ধ্যাচলী চৌবে তার পোষা পহেলবানদের লেলিয়ে দিয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে শিকারি কুত্তার মতো ওই লোকগুলো এসে তাকে টেনে হিঁচড়ে ফের শ্বশুরের কোঠিতে নিয়ে ঢোকাবে।

ভিরগুরাম ভয় পেয়ে যায়। বিন্ধ্যাচলী চৌবের মতো বিপুল শক্তিমান জামিমালিক এবং তার পহেলবানদের হাত থেকে কৌশল্যাকে রক্ষা করার ক্ষমতা বা সাহস তার কোনোটাই নেই। কাঁপা গলায় সে আবার জিজ্ঞেস করে, 'কা হুয়া মা-জি?'

'পরে শুনো। শুধু এটুকু জেনে রাখো, ওরা যদি আমাকে ধরতে পারে, একেবারে শেষ করে ফেলবে।' বলতে বলতেই আচমকা পেছন ফিরে একবার তাকিয়েই ভয়ার্ত চাপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'ওই যে ওরা আসছে।'

দ্রুত কিষুণপুরা টাউনের দিকে তাকায় ভিরগুরাম। অনেক দূরে যেখানে আগুনের হল্‌কা থিরথিব করে কাঁপছে সেখানে কালো কালো ক'টা মানুষের চেহারা ফুটে ওঠে। বোঝা যায়, তারা এদিকেই ছুটে আসছে।

আতঙ্কে মুখ থেকে সব রক্ত নেমে যায় কৌশল্যার। ঝাপসা গলায় সে বলে, 'আর দেরি করো না গাড়িবালা, কিছু একটা কর। তুমি কি চাও, আমি খুন হয়ে যাই?'

ভিরগুরাম ভালো করেই জানে, কৌশল্যাকে সাহায্য করলে তাকে চড়া দাম দিতে হবে। বিন্ধ্যাচলীর পহেলবানেরা নির্ঘাত তাকে এই মাঠে পুঁতে রেখে যাবে। তবু তার মধ্যে কী এক প্রতিক্রিয়া যেন ঘটে যায়। ভিরগুরাম টের পায়, তার দুর্বল ভঙ্গুর শরীরে বিজলি চমকেব মতো কিছু খেলে যাচ্ছে। সে বলে, 'তুরন্ত গাড়িতে উঠে পড়ুন।'

কী কারণে কৌশল্যা পালিয়ে এসেছে, কেন তার পেছনে পহেলবান লাগানো হয়েছে, কিছুই ভিরগুরামের কাছে স্পষ্ট নয়। তবু এই মেয়েটা যে অত্যন্ত বিপন্ন তা বুঝতে অসুবিধা হয না। তাকে বাঁচাবার জন্য ভিরগুরামের মস্তিষ্কে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে একটা পরিকল্পনা এসে যায়। কৌশল্যা গাড়িতে উঠে পড়লে সে বলে, 'মা-জি, চালির তলায় ক'টা পুরনো গান্ধা কাপড়া উপড়া আছে. ওগুলো গায়ে জড়িয়ে ঘুঙ্ঘট গলা পর্যন্ত টেনে বসে থাকুন। ওইসব কাপড়া গায়ে চড়ালে আপনার তখলিফ হবে। লেকিন এছাড়া উপায় নেই।'

'আমার কষ্ট হবে না।' কৌশল্যা ভিরগুরামের কথামতো নোংরা কাপড় জড়িয়ে, ঘোমটা টেনে চালির তলায় জড়সড় হয়ে বসে থাকে।

ভিরগুরাম বলে, 'আপনাকে কি কোথাও পৌঁছে দেব?'

'হাঁ। আমার বাপের কোঠি বইহারি গাঁয়ে। সেখানে যদি পৌঁছে দাও—'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না ভিরগুরাম। হাইওয়েতে উঠে দক্ষিণ দিকে মাইল খানেক গেলে বিষুণগঞ্জ বাজার। কিন্তু বইহারি একেবারে উলটো দিকে। হাইওয়ে থেকে উত্তরে মাইল চারেকের পথ হল বইহারি। সেখানে কৌশল্যাকে পৌঁছে দিয়ে বিষুণগঞ্জে যেতে যেতে সন্ধে নেমে যাবে। বর আর বরযাত্রীর দল কি তার জন্য ততক্ষণ বসে থাকবে? কিন্তু কৌশল্যাকে গাড়িতে তোলার পর এসব কথা ভাবার মানে হয় না। সামনে দিকে ঘুরে বসে ভিরগুরাম বলে, 'চল রে চুন্নুয়া মুন্নুয়া। এই ধুলোর ভেতর দাঁড়িয়ে থেকে কী আর হবে! মা-জি'কে জবান দেওয়া হয়ে গেছে, বইহারি পৌঁছে দেব। দিতেই হবে, না কী বলিস?'

ঝোলা কান নাড়তে নাড়তে বয়েল দুটো আবার চলতে শুরু করে।

ভিরগুরাম বলতে থাকে, 'মা-জি'কে বইহারিতে নামিয়ে আন্ধেরা নামার আগে কি বিষুণগঞ্জে যেতে পারবি? পারবি না মনে হচ্ছে।'

প্রাণী দুটো আগের মতোই কান নাড়ে।

ভিরগুরাম বলতে থাকে, 'তোদের আজ বহুত কষ্ট হবে। লেকেন কা করে! মা-জি'র যে বড় বিপদ!'

রুক্ষ বন্ধ্যা প্রান্তরের ওপর দিয়ে ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজ তুলে বয়েল গাড়ি ধু ধু দিগন্তের দিকে এগিয়ে যায়।

কিষুণপুরা টাউন থেকে ভিরগুরামেরা যখন বেরিয়েছিল, সূর্য তখন সরাসরি মাথার ওপরে। এখনও একই জায়গায় সেটা অনড় দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয়, উত্তর বিহারের এই আদিগন্ত প্রান্তরে পৃথিবীর আহ্নিক গতি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

খানিকটা যাওয়ার পর সামনের দিকে চোখ রেখেই ভয়ে ভয়ে ভিরগুরাম জিজ্ঞেস করে, 'একগো বাত পুছেগো মা-জি?'

কৌশল্যা দুই হাঁটুর ফাঁকে চিবুক রেখে চুপচাপ বসে ছিল। বলে, 'কী?'

'আপনি এত বড় ঘরের বহু। এভাবে চলে এলেন কেন?'

'দহেজ (পণ), স্রেফ দহেজের জন্যে।'

'দহেজ!'

'হাঁ। আমার বাপুজিকে ওরা চুষে খেয়েছে।' বলতে বলতে চমকে ওঠে কৌশল্যা। খানিকটা দূরে অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। প্রায় ফিসফিস করে ভীরু গলায় এবার সে বলে, 'ওই যে ওরা এসে গেল। হুঁশিয়ার—'

পলকে ঘাড় ফেরায় ভিরগুরাম। অর্ধগোলাকার চালির তলায় এখন ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে আছে কৌশল্যা। তার মাথার ওপর দিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ে হট্টাকট্টা চেহারার পাঁচ ছ'টা তাগড়া জোয়ান বয়েল গাড়িটার কাছে চলে এসেছে। তাদের গালে চওড়া জুলপি এবং ঠোঁটের ওপর পাকানো গোঁফ। হাতে পেতলের পটি-বসানো মজবুত লাঠি।

ওদের সবাইকেই চেনে ভিরগুরাম। চৌবেদের এই পোষা পহেলবানেরা হিংস্র জানোয়ারদের চেয়েও মারাত্মক। খুন জখম থেকে শুরু করে ঘরে আগুন লাগানো পর্যন্ত এমন কোনো কুকর্ম নেই যা বিন্ধ্যাচলী চৌবেরা ওদের দিয়ে করায় না। পহেলবানদের দেখতে দেখতে বুকের ভেতরটা আড়ষ্ট হয়ে যায় ভিরগুরামের। পরক্ষণেই অলৌকিক কোনো নিয়মে দুর্জয় কোনো শক্তি যেন তার ওপর ভর করে। দ্রুত সামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বয়েল দুটোর লেজ আস্তে করে মুলতে মুলতে বলে, 'চুন্নুয়া মুন্নুয়া, বহোত বিপদ। বিলকুল ডানাবালা ঘোড়া বনে যা, মা-জি'কে উড়িয়ে নিয়ে চল। উরর-র-র—উর—'

ইঙ্গিতটা যেন বুঝতে পারে বয়েল দুটো। রোদের অসহ্য উত্তাপ এবং নিজেদের শারীরিক অক্ষমতা অগ্রাহ্য করে তারা আচমকা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুতে থাকে।

পেছন থেকে একটা পহেলবান বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'হো গাড়িবালা, রুখ যা, রুখ যা—' বলতে বলতে সে সামনে এসে পড়ে. তার পেছন পেছন বাকি সবাই।

অগত্যা ভিরগুরাম বয়েল দুটোকে বলে, 'আরে চুন্নুয়া মুন্নুয়া, থোড়েসে ঠহর যা। উরর-র-র-র—' তালুতে জিভ ঠেকিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে সে। গাড়ির গতি কমে এলে, সর্তক ভঙ্গিতে বলে, 'কা পহেলবানজি, কুছ জরুরত হ্যায়?'

পহেলবানরাও ভিরগুরামকে চেনে। সেই পহেলবানটা, যে তাকে গাড়ি থামাতে হুকুম করেছিল, এবার কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কোনো আওরতকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছিস?'

ভিরগুরাম টের পায়, তার বুকেব ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাইরে থেকে তা বুঝবার উপায় নেই। কোনোরকমে ঢোক গিলে সে বলে, 'নেহী—'

'ভালো করে ভেবে দ্যাখ। খুবসুরত জেনানা, গায়ে জগমগ জগমগ কাপড়া, গলায় সোনার হার, হাতে সোনার চুড়ি, কানে করণফুলী—'

'নেহী—'

আর কোনো প্রশ্ন না করে নিজেদের মধ্যে চাপা নিচু গলায় খানিকক্ষণ কী পরামর্শ করে নেয় পহেলবানেরা। একজন ভিরগুরামকে বলে, 'ঠিক হ্যায়, যা—'

'চুন্নু মুন্নু, চল বেটোয়া—' ভিরগুরামের মুখ থেকে এই কথাগুলো বেরুতে না বেরুতেই পহেলবানটার নজর এসে পড়ে চালির তলায়। তার চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কয়েক পা এগিয়ে এসে সে শুধোয়, 'এ কৌন হ্যায়?'

বুকের ভেতর শ্বাস আটকে যায় ভিরগুরামের। ওরা যদি বুঝতে পারে চালির ভেতরকার

আওরতটি আর কেউ নয়, বিন্ধ্যাচলী চৌবের ছোট পুতহু তা হলে কয়েক মিনিটের মধ্যে কী মারাত্মক ব্যাপার ঘটে যাবে সেটা যেন চোখের সামনে দেখতে পায় ভিরগুরাম। সাঁতার না-জানা মানুষ যেমন মরিয়া হয়ে অগাধ জলে ঝাঁপ দেয় সেইভাবে রুদ্ধগলায় সে বলে, 'আমার জেনানা—'

পহেলবানটার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত ঘষে সে বলে, 'শালে ভুচ্চরকা ছৌয়া, তোর জেনানা না চার সাল আগে ভেগে গেছে!' বলে চোখ কুঁচকে পলকহীন নোংরা কাপড়ে মোড়া কৌশল্যাকে দেখতে থাকে।

ভিরগুরাম ভাবে কৌশল্যার ব্যাপারে যতদূর সে এগিয়েছে তাতে আর পিছিয়ে যাওযা সম্ভব নয়। এখন সামান্য একটু ভুলচুক হয়ে গেলে তার জান চলে যাবে। সে বলে, 'কাল রাত্তিরে আবার ফিরে এসেছে পহেলবানজি—'

ভিরগুরামের চোখেমুখে এমন সারল্য রয়েছে যে তাকে হুট করে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। তাছাড়া কিষুণপুরায় সৎ ভালমানুষ হিসেবে তার কিঞ্চিৎ সুনাম রয়েছে। পহেলবান এবার বলে, 'ঠিক বলছিস?'

'হাঁ, পহেলবানজি—' বলেই ভিরগুরাম টের পায়, তার বুকের ভেতরটা ভয়ে উথলপাথল হয়ে যাচ্ছে। আগে আর কখনও এমন বিরাট ঝুঁকি নিয়ে এ জাতীয় মিথ্যে বলেনি সে।

পহেলবানটা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে যা বলে তা এইরকম। নিজের যে জরুকে এক লুচ্চা বদমাস ভাগিয়ে নিয়ে চেটেপুটে খেয়েছে, সেই এঁটো পাতেই কিনা মুখ নামিয়ে দিল ভিরগুরাম! ঘেন্না বলে তার মধ্যে কি কিছুই নেই! জানবর কাঁহিকা!

ভিরগুরাম আকাশের দিকে দু হাত তুলে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলে, 'কা করে, ভগোয়ানকা মর্জি।'

এবার পহেলবানেরা নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় জরুরি কিছু আলোচনা সেরে নেয়। তারপর ভিরগুরামকে 'যা শালে, ভুচ্চরকে ছৌয়া' বলে মাঠের ওপর দিয়ে ঝলসানো দিগন্তের দিকে ছুটে যায়।

এত সহজে বিপদ কেটে যাবে, ভাবা যায়নি। ভিরগুরাম গলার ভেতর বিড় বিড় করে, 'হো শিউশঙ্করজি, তেরে কিরপা।' তারপর বয়েল দুটোর লেজ মুচড়ে বলে, 'চল বেটোয়া—' ফের গাড়ি চলতে শুরু করলে পেছন ফিরে চালির দিকে তাকায়। হাতজোড় করে, অপরাধীর মতো মুখ করে কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বলে, 'মা-জি, আমার কসুর মাপ করবেন। আপনার সম্বন্ধে যা বলেছি, সিধা নরকে চলে যাব। লেকেন ঝুট বলা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। আপনি নাবাজ হননি তো?

কৌশল্যা বলে, 'না না। ঝুট না বললে আমি ধরা পড়ে যেতাম।'

বুকের ভেতর একটা নিদারুণ পাপবোধ পাষাণভারের মতো চেপে বসে ছিল। সেটা এবার নেমে যায়। বেশ হালকা বোধ করে ভিরগুরাম।

সূর্যের অসহ্য তাপে পুড়তে পুড়তে গাড়ি এগিয়ে চলে। আকাশের কোথাও একটুকরো মেঘ বা একটা পাখির চিহ্নমাত্র নেই।

তিন চারটে ভৈসা গাড়ি পেছন থেকে এসে ভিরগুরামের পাশ দিয়ে চলে যায়। এইসব গাডিব মোষ রীতিমত তাগড়া, তাদের শরীরে প্রচুর শক্তি।

ভিরগুরাম জিভের জাগায় চুক চুক আওয়াজ করে দুঃখিতভাবে বলে, 'চুন্নুয়া মুন্নুয়া, ওরা সব আমাদের পিছে ফেলে চলে গেল। তোদের যদি পেট ভরে দানাপানি খাওয়াতে পারতাম, কী করে হারিয়ে দেয়—দেখতাম!'

চুন্নুয়া মুন্নয়ার লম্বা কান শুধু লটর পটর করতে থাকে।

আরও কিছুক্ষণ বাদে ভিরগুরাম আস্তে করে ডাকে, 'মা-জি—'

কৌশল্যা অন্যমনস্কর মতো সাড়া দেয়, 'কী বলছ?'

ভয়ে ভয়ে ভিরগুরাম বলে, 'একটা কথা বলব?'

'কী কথা?'

'এভাবে সসুরাল থেকে চলে এলেন কেন?'

এই প্রশ্নটা আগেও একবার করেছিল ভিরগুরাম কিন্তু তখন ভালো করে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলে না কৌশল্যা। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে সে জানায়, শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে না এসে তার উপায় ছিল না। বিন্ধ্যাচলী চৌবের ঘরে ছ ছ'টা সিন্দুক বোঝাই সোনাদানা, হীরেমোতি। স্বনামে এবং বেনামে হাজার একর জমি। কিষুণপুরা টাউনের বিশাল বাড়িটা ছাড়াও পাটনায় ঝরিয়ায় এবং দ্বারভাঙায় তাদের আরও বারোটা বাড়ি রয়েছে। তবু চৌবেদের জমি এবং পয়সার খাঁই মেটে না। এক একটা ছেলের তারা বিয়ে দেয়, তারপর দহেজের জন্য পুতহুদের ওপর ক্রমাগত চাপ দেওয়া চলতে থাকে। প্রথম প্রথম চাপ, তারপর নির্যাতন। ওই দহেজের কারণে চৌবেদের বাড়ির দু দুটো বউকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হয়েছিল, যদিও এই মৃত্যুকে চৌবেরা আত্মহত্যা বলে চালিয়েছে।

কৌশল্যার ওপর অনবরত চাপ দিয়ে তার বাবার কাছ থেকেও অজস্র সোনাচাঁদির গয়না এবং জমি আদায় করেছে বিন্ধ্যাচলী। বাবার দেবার মতো আর কিছু নেই। তাকে একেবারে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে বিন্ধ্যাচলী, প্রায় পথের ভিখিরি করে ছেড়েছে। তবু তার খাঁই মেটে না। আরো টাকা, আরো সোনাদানার জন্য ইদানীং কৌশল্যাকে শাসানো তো হচ্ছেই, মাঝে মাঝে মারধরও করা হচ্ছে। তাকে বলা হয়েছে, একমাসের ভেতর বাপের বাড়ি থেকে আরো দশ হাজার টাকা না আনতে পারলে তার ফলাফল হবে মারাত্মক।

কৌশল্যা বিয়ের কিছুদিন পরে শুনেছে, চৌবেরা দহেজের জন্য তিন তিনটে বউকে পুড়িয়ে মেরেছে। বউ পোড়ানোটা ওদের কাছে মশা মারার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। দু বছর চৌবেদের বাড়িতে থাকার পর কৌশল্যা বুঝে নিয়েছে, ওদের অসাধ্য কোনো কাজ নেই।

এদিকে দশ হাজার কেন, দশটা টাকা দেবার মতো সামর্থ্যও কৌশল্যার বাবার নেই। এর পরিণতি কী হতে পারে সেটা আন্দাজ করেই সে আজ বাড়ির পেছন দিকের দরজা দিয়ে পালিয়ে এসেছে। মা-বাবার কাছে যেতে পারলে প্রাণটা তো অন্তত বাঁচবে।

একনাগাড়ে এতগুলো কথা বলার পর চুপ করে যায় কৌশল্যা।

বিষণ্ণ মুখে ফিস ফিস করে ভিরগুরাম বলে, 'বড়ে আদমিকা বড়ে লালচ।'

কৌশল্যা উত্তর দেয় না।

এরপর তেলহীন চাকার কর্কশ আওয়াজ তুলে বয়েল গাড়িটা মাঠের ওপর দিয়ে এগিয়ে যায়। আকাশ থেকে আগুন ঝরতেই থাকে, গরম বাতাস দিগন্তের ওপর দিয়ে হু হু করে ছুটে যায়।

পেছন থেকে এসে আরও কয়েকটা ভৈসা এবং বয়েল গাড়ি ভিরগুরামদের পাশ দিয়ে হাইওয়ের দিকে চলে গেল।

এ পর্যন্ত কতগুলো গাড়ি তাদের পেছনে ফেলে চলে গেছে, সব গুনে রেখেছে ভিরগুরাম। সে তার বয়েল দুটোকে বলে, 'দেখলি তো চুন্নুয়া মুন্নুয়া, পন্দ্রগো (পনেরটা) গাড়িয়া আমাদের পেছনে ফেলে চলে গেল। তোদের গায়ে তাকত থাকলে পারত!'

চুন্নুয়া মুন্নুয়া যথারীতি কান নাড়তে থাকে।

একসময় গনগনে বিশাল বাঁজা মাঠ যখন প্রায় পেরিয়ে এসেছে এবং খানিকটা দূরে হাইওয়ে দেখা যাচ্ছে, সেই সময় কৌশল্যা হঠাৎ ছইয়ের তলা থেকে বলে ওঠে, 'আমার সৌভাগ্য যে তোমার মতো লোককে পেয়ে গেছি। নইলে কী যে হত, ভাবতে পারি না।'

ভিরগুরাম বলে, 'মা-জি, সব শিউশঙ্করজির কিরপা।'

কৌশল্যা আধফোটা গলায় কী বলে, বোঝা যায় না।

আরও খানিকটা যাবার পর দেখা যায়, বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে রাস্তা ভেঙে চুরে বড় গর্ত হয়ে

আছে। গর্ত থেকে গাড়ি টেনে তুলতে জিভ বেরিয়ে যায় চুন্নুয়া মুন্নুয়ার, তাদের চোখ ফেটে যেন রক্ত ছুটবে। কিন্তু গাড়ি একচুলও নড়ে না। অথচ বয়েল দুটো যদি নিয়মিত ভরপেট দানাপানি পেত, আরেকটু শক্তি যদি থাকত তাদের শরীরে, এক হ্যাঁচকায় ওপরে তুলে ফেলতে পারত। অগত্যা নিচে নেমে, বয়েল দুটোর সঙ্গে কাঁধ লাগিয়ে, টেনে হিঁচড়ে গর্ত থেকে গাড়িটা ওপরে তোলে ভিরগুরাম।

তারপর আবার চলার শুরু।

হাইওয়েতে এসে চমকে যায় ভিরগুরাম। চৌবেদের সেই পহেলবানেরা ওখানে একটা ঝাঁকড়া-মাথা প্রকাণ্ড কড়াইয়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। মাঠ পেরিয়ে যে সব বয়েল বা ভৈসা গাড়ি হাইওয়েতে গিয়ে উঠছে, তারা প্রত্যেকটার আগাপাশতলা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখছে।

চাপা ভীরু গলায় ভিরগুরাম বলে, 'মা-জি, সত্যনাশ হো গিয়া! পহলবানেরা পাক্কীতে দাঁড়িয়ে আছে।'

কৌশল্যা বলে, 'আমাদের গাড়িও দেখবে নাকি?'

'একবার তো দেখেছে, আর দেখবে বলে মনে হয় না। তবু ভুচ্চরদের বিশোয়াস নেই।'

কৌশল্যা উত্তর দেয় না।

ভিরগুরাম একটু চিন্তা করে এবার যা বলে তা এইরকম। হাইওয়েতে গিয়ে তাবা আপাতত ডাইনে বইহারির দিকে যাবে না। তা হলে পাহেলবানদের সন্দেহ হতে পারে। তারা প্রথমে বিষুণগঞ্জেব দিকে যাবে, তারপর অন্য রাস্তা দিয়ে অনেকটা ঘুরে কৌশল্যাকে বইহারিতে পৌঁছে দেবে।

কৌশল্যা বলে, 'সেই ভালো।'

হাইওয়েতে উঠে পহেলবানদের পাশ দিয়ে বিষুণগঞ্জর দিকে যেতে গিয়ে বুকেব ভেতরটা ঢিব ঢিব করতে থাকে ভিরগুরামের। 'হো রামজি, হো শিউশঙ্করজি, মা-জি'কে রক্‌ষা কর'—ইত্যাদি বিড় বিড় করতে করতে গাড়ি নিয়ে সে এগুতে থাকে।

পহেলবানদের পেছনে ফেলে কিছুটা এগিয়েও গিয়েছিল ভিরগুরাম কিন্তু শেষবক্ষা আর হয় না। হঠাৎ কী ভেবে পহেলবানরা দৌড়ে আসে। 'রুখ যা, ভিরগুয়া, রুখ যা—'

গাড়িটা থেমে যায়। সেই পহেলবানটা যে মাঠের মাঝখানে ভিরগুরামের ঘরবালীকে নিয়ে কুৎসিত রসিকতা করছিল, বলে, 'তোর জেনানা তো মুখে কাপড়া দিয়ে বসে আছে। এত্তে রোজ বাদ ফিরে এল, তার মুখটা একবার দেখি। আসলী না নকলী কাকে ফেরত পেলি, বড় জানতে ইচ্ছে করছে।'

ভিরগুরাম হাতজোড় করে করুণ গলায় বলে, 'আওরতটা এমনিতেই লজ্জায় মরে আছে। তাকে আর দুখ দিও না পহেলবানজি।'

পহেলবানের চোখ জ্বলতে থাকে। চিৎকার করে সে বলে, 'তোর জরু কাপড়া সরাবে কিনা বল, নইলে আমরাই সরিয়ে মুখ দেখব—'

'তোমাদের পায়ে পড়ি, অ্যায়সা মাত কর—'

কিন্তু ভিরগুরামের কথা শেষ হতে না হতেই সেই পহেলবানটা লাফিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের ভীরু, গরিবের চেয়ে গরিব, দুর্বল, অসহায় ভিরগুরামের মাথার ভেতর প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে যায়। অপার্থিব কোনো শক্তি যেন তার ওপর ভর করে। গলার শির ছিঁড়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'হোঁশিয়ার—' পরক্ষণেই হাত বাড়িয়ে চালির মাথায় গোঁজা একটা লাঠি টেনে নেয় সে কিন্তু সেটা পহেলবানের ঘাড়ে বসাবার আগেই অন্য এক পহেলবানের লাঠি তার মাথায় এসে পড়ে। মুহূর্তে চারপাশের ঝলসানো পৃথিবী চোখের সামনে অন্ধকারে ডুবে যায়। ঘাড় গুঁজে গাড়ি থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে পড়তে সে শুধু নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত একটি চিৎকার শুনতে পায়।

ভিরগুরামের জ্ঞান যখন ফেরে, চরাচর জুড়ে সন্ধে নামতে শুরু করেছে। রাস্তায় এখন গাড়ি এবং মানুষজন বেশ কম। শুধু বহুকালের দুই বিশ্বস্ত সঙ্গী চুন্নুয়া মুন্নুয়া বিমর্ষ মুখে একধারে দাঁড়িয়ে আছে।

ভিরগুরাম লক্ষ করল, মাটিতে অনেকটা রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। তার নিজেরই রক্ত। মাথায় হাত দিয়ে বুঝল, এক'আঙুলের মতো জায়গা ফেটে হাঁ হয়ে আছে।

গাড়ির চালির এককোণে একটা ছেঁড়া ধুতি আর জামা কাগজে মোড়া রয়েছে। ধুতিটা বার করে মাথার ফাটা জায়গাটায় ফেট্টি বেঁধে নিল ভিরগুরাম।

কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল, তার গাড়ি হাইওয়ের ওপর দিয়ে বিষুণগঞ্জের দিকে চলেছে। ভিরগুরাম বয়েল দুটোকে বলে, 'চৌবেজির পুতহুকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। লেকেন পারলাম না। কা করে?'

চুন্নুয়া মন্নুয়া কান নেড়ে হয়তো সায় দেয়।

ভিরগুরাম এবার বলে, 'বিষুণগঞ্জে গিয়ে আগে অসপাতাল যাব। পহেলবান ভূচ্চরটা আমার মাথাটাকে বিলকুল ছেঁচে দিয়েছে। তারপর যাব বিয়ে বাড়ি। লেকেন ওরা কি আমাদের জন্যে এতক্ষণ আর বসে থাকবে? যদি থাকে আমাদের জন্যে বহুত বঢ়িয়া ভোজন (উৎকৃষ্ট খাওয়া দাওয়া), নইলে ভুখাই থাকতে হবে। কা করে! ভুখা থাকা তো আমাদের কাছে নতুন কিছু না—কী বলিস?'

চুন্নুয়া মুন্নুয়া যথারীতি কান নাড়তে থাকে।